লং ওয়াক টু ফ্রিডম

নেলসন ম্যান্ডেলা

দক্ষিণ আফ্রিকায় সবাই তাকে 'মাদিবা' নামেই চেনে। এটি তার গোত্রীয় নাম। ১৯১৮ সালের ১৮ জুলাই জন্ম। জন্মের পর থেকেই সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম এখনও থেমে নেই। সুদীর্ঘ সাতাশ বছর জেলখানায় কাটিয়ে ১৯৯০ সালে মুক্তি পান নেলসন রোলিহলাহলা ম্যান্ডেলা। ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারের প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৯৩ সালে এই মহান নেতা নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। এখন অবসরে আসলেও তিনি থেমে নেই। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি গড়ে তুলেছেন এক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'ম্যান্ডেলা ফাউন্ডেশন'। এ ফাউন্ডেশনের প্রধান হিসেবে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন এই চিরসংগ্রামী।

তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ব হারায় এক কিংবদন্তি নেতাকে।

মূল্য : পাঁচশ' টাকা মাত্র

'লং ওয়াক টু ফ্রিডম' শুধু আত্মজীবনী নয়, মূর্তিমান দক্ষিণ আফ্রিকার এক জীবন্ত দলিল

– দ্য গার্ডিয়ান

এ বই না পড়ে ম্যান্ডেলাকে পুরোপুরি আবিষ্কার করা অসম্ভব

– টাইমস

বর্ণবাদ কী এবং তার বিরুদ্ধে কালোদের সংগ্রাম কত তিতিক্ষানির্ভর ছিল তার সাক্ষী এই 'লং ওয়াক টু ফ্রিডম'

– নিউ ইয়র্কার

লং ওয়াক টু ফ্রিডম

নেলসন ম্যান্ডেলা

অনুবাদ

অন্যধারা
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ৭ মার্চ ২০১৪
প্রথম প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক ■ মোঃ মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১
পরিবেশক – কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ ৩৮/৪ বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা ১১০০
মিশু প্রকাশন ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা-১১০০
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ■ সংগীতা UK. LTD
22 ব্রিকলেন, লন্ডন
Tel 0044-2072475954
Fax : 0044-2072475941
প্রচ্ছদ ■ গুপু ত্রিবেদী
কম্পোজ – বিস্‌মিল্লাহ্ কম্পিউটার্স ৪৭/১ বাংলাবাজার ঢাকা ০১৭১১ ৯৫৮১২৩
মুদ্রণ – আমানত প্রিন্টিং প্রেস, ৩/২, কবিরাজ লেন ঢাকা ১১০০

মূল্য : পাঁচশ' টাকা মাত্র

ISBN 984-833-121-2

আমার প্রাণপ্রিয় ছয় সন্তান মাদিবা, মাকাজিউই, (এরা দুজনই আমাদের ছেড়ে পরলোকে চলে গেছে) মাকাগাথো, মাকাজিউই, (পরলোকগত মাকাজিউইর নামানুসারে এই মেয়ের নাম রাখা হয়) জেনানি এবং জিনজি। এদের অসীম ভালোবাসা ও সহযোগিতা আমার পাথেয়। এছাড়া আমার ২১ জন নাতি ও নাতনিদের তিন ছেলেমেয়ে আমার অফুরন্ত আনন্দের উৎস। এদের সবাইকে এ বই উৎসর্গ করছি। একই সংগে এটি উৎসর্গ করছি আমার সেইসব রাজনৈতিক সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে যাদের দেশপ্রেম আমাকে আজীবন সাহস যুগিয়েছে।

ভূমিকা

প্রত্যেক পাঠকই বুঝতে পারবেন এ বইয়ে উঠে এসেছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। রোবেন দ্বীপের কারাগারে থাকাকালীন ১৯৭৪ সালে আমি এ বই লেখার কাজ শুরু করেছিলাম। আমার প্রাণপ্রিয় সহযোদ্ধা ওয়াল্টার সিসুলু ও আহমেদ কাদরাদা বিরামহীনভাবে এ বইয়ের কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তারা আমার বহু ভুলে যাওয়া স্মৃতি মনে করিয়ে না দিলে এ বই লেখা হয়তো শেষ করা সম্ভব হতো না। আমার পাণ্ডুলিপির একটি অনুলিপি একবার জেল কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়েছিল। কিন্তু আমার কারাসঙ্গী ম্যাক মহারাজ এবং ইশু চিবা আমাকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে পাণ্ডুলিপির মূল কপি নিরাপদে আছে এবং যথাস্থানে পাঠানো হয়েছে। ১৯৯০ সালে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আমি আবার ওই পাণ্ডুলিপি নিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করলাম।

মুক্তির পর আমাকে প্রতিদিন এতসব কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে লেখালেখির সময় বের করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো আমি এমন সব সহযোদ্ধা ও বন্ধু পেয়েছি যারা আমাকে বইটি শেষ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। বন্ধু কাদরাদাকে আরও একবার ধন্যবাদ এজন্য যে বইটিকে নির্ভুল তথ্যসমৃদ্ধ করার জন্য তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপির কারেকশন করেছেন। এছাড়াও অকৃত্রিম সহযোগিতাদানের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধুপ্রতীম রিচার্ড স্টেনজেলকে। তিনি ট্রান্সকেইতে থাকাকালীন প্রতিদিন আমার সংগে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। ওই সাক্ষাৎকার থেকে স্ক্রিপ্ট তৈরির ক্ষেত্রে রিচার্ডকে সহযোগিতা করেছিলেন মেরি পাফ। আমি তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক সহযোগিতা পেয়েছি ফাতিমা মীর, পিটার মাগুবানে, নাদিন গর্ডিমার এবং ইজেকিল এমফালের কাছ থেকে।

এএনসি অফিসের স্টাফরা এ বইয়ের মুদ্রণ বিষয়ে যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে বারবারা মাসেলেকা এক্ষেত্রে যে সহযোগিতা করেছেন তা ভোলার নয়। একইভাবে বইটির বিপণনের ক্ষেত্রে ইকবাল মীর সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। লিটল ব্রাউনের সম্পাদক উইলিয়াম ফিলিপসের কাছেও আমি ঋণী। তিনি ১৯৯০ সাল থেকে এই প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাকে সাহায্য করেছেন জর্ডান পাভলিন এবং স্টিভ স্নেইডার। প্রফেসর গেইল গেরহার্টকেও ধন্যবাদ। তিনি অনেক কষ্ট করে পাণ্ডুলিপির ফ্যাকচুয়াল রিভিউ করেছেন।

এদের সবার কাছে আমি ঋণী। এদের সবাইকে ধন্যবাদ।
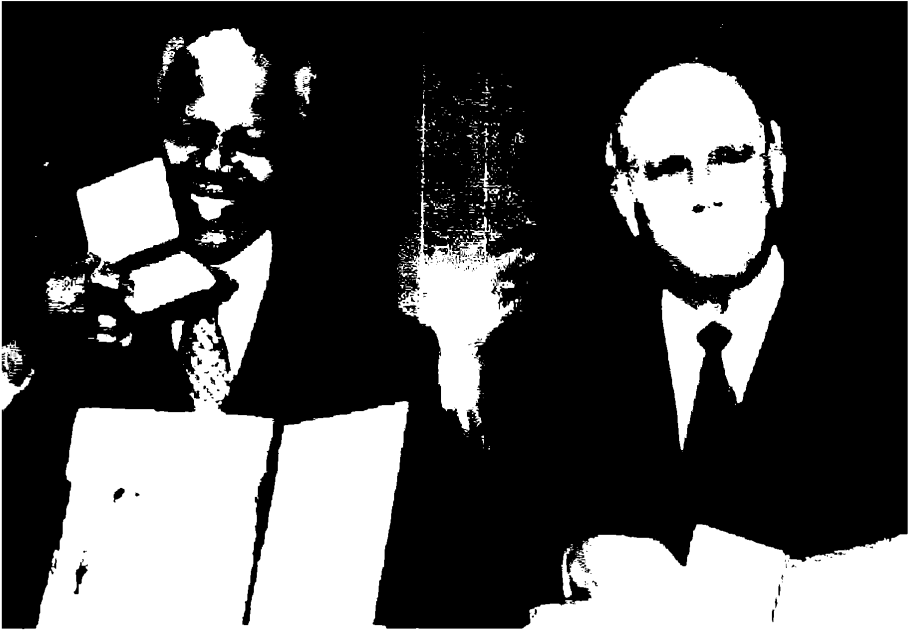
শান্তিতে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করছেন যৌথভাবে নেলসন ম্যান্ডেলা ও এফ ডি ক্লার্ক

বৃটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও হাস্যোজ্জ্বল নেলসন ম্যান্ডেলা

উৎসর্গ

মা রাবেয়া খাতুনকে

– ওমর ফারুক

মোঃ নাজমুল ইসলাম

এক বিরলপ্রজ সংগঠক

– সারফুদ্দিন আহমেদ

বারাক ওবামার স্ত্রী মিশেল ওবামার সাথে বই দেখছেন নেলসন ম্যান্ডেলা

ম্যান্ডেলা হাউসের সামনে কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরা

'অরণ্য ডাকে ওই যাই
হেইডি হাইডি হাই
সিংহের নোখে ধার, সিংহের দাঁতে ধার
চোখে তার মৃত্যুর রোশনাই

'বুনোপথ বিভীষিকা বিঘ্ন
আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ
কাপুরুষ সিংহ তো মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই
হেইডি হাইডি হাই...'

প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই কবিতায় আফ্রিকার যে কালো মানুষদের কথা বলা হয়েছে তারা 'ভরাট করা সমুদ্র আর উচ্ছেদ করা অরণ্যের জগতে গড়ে তোলা ক্রিমি-কীটের সভ্যতার মানুষ নয়। তারা জানে কচ্ছপের মতো স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ু লালন করার চেয়ে বল্লম হাতে সিংহের সাথে লড়ে মৃত্যুবরণ করা অনেক সম্মানের।

সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর অরণ্যসংকুল মহাদেশের কিংবদন্তী লড়াকু সৈনিক নেলসন রোলিহ্লাহ্লা ম্যান্ডেলা। পুরোটা শৈশব কাটিয়েছেন উপজাতিয় পরিবেশে। আদিবাসী পোশাক পরে শিশু ম্যান্ডেলা ছুটে গেছেন ঝর্ণার জলে সাঁতার কাটতে।

মাতা আফ্রিকার স্নেহপূর্ণ প্রকৃতিই তাকে শিখিয়েছিল কী করে এক লাফে বুনো ঘোড়ার পীঠে চড়ে তাকে বশ মানাতে হয়; কী করে গাভীর ওলানে মুখ দিয়ে কবোষ্ণ পীযুষধারা পান করতে হয়; কী করে উড়ন্ত পাখিকে তীর ধনুকের এক নিশানায় মাটিতে ফেলে দিতে হয়; কী করে ফাঁদ পেতে বুনো শুয়োর ধরে আগুনে ঝলসে খেতে হয়। এ এক অন্য জীবন।

যার পূর্বপুরুষদের কেউ কোনদিন ইশকুলের চৌকাঠ মাড়ায়নি। উপজাতিয় গোলপাতার কুড়েঘরে কাঁচা গোবরে লেপা মাটির মেঝেতে যার জন্ম; সেই ম্যান্ডেলা ছিলেন পৃথিবীর বিস্ময়। কিশোর বয়স থেকে যার সংগ্রামী জীবনের শুরু; দীর্ঘ ২৭টি বছর যাকে কারা প্রকোষ্ঠে কাটাতে হয়েছে সেই ম্যান্ডেলা ছিলেন এক চলমান ইতিহাস।

নিছক একটি আত্মজীবনী নয়। এটি দক্ষিণ আফ্রিকার এক বহুরৈখিক ইতিহাস। দক্ষিণ আফ্রিকাকে জানতে হলে এ বই অবশ্যপাঠ্য।

শ্বেতাঙ্গদের নিপীড়ন, কৃষ্ণাঙ্গদের মানবেতর জীবন, তৎকালীন রাজনীতি, সহিংসতা, গেরিলা যুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম অত্যন্ত চমৎকারভাবে উঠে এসেছে এই আত্মজীবনীতে। বইয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে রাজনীতি, গেরিলা যুদ্ধ, গ্রেফতার, পারিবারিক ও জেল জীবন। ম্যান্ডেলা প্রায় ২৭ বছর জেল খেটেছেন। এর মধ্যে দুই দশকের বেশিকাল বন্দি ছিলেন রোবেন দ্বীপে। তার সুদীর্ঘ সংগ্রামী ও বন্দিজীবনের বিবরণ পাঠককে নিয়ে যাবে এক রোমাঞ্চকর ইতিহাসের রাজ্যে। এক নতুন আবিস্কার করবে পাঠক।

পৃথিবীতে যত জটিল, ধৈর্য ও স্থৈর্যনির্ভর কাজ রয়েছে অনুবাদ সম্ভবত তার মধ্যে প্রথমসারির কাজ। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ শব্দ সক্ষমতা দিয়ে এর ভাষাকে সহজবোধ্য ও ঝরঝরে রাখার চেষ্টা করেছি। মূল ইংরেজীতে যেখানে জটিল বাক্যের প্রয়োগ করেছেন, বাংলাদেশী পাঠকের সহজবোধ্যতার কথা মাথায় রেখে সেটিকে সরলবাক্যে নিয়ে আসা হয়েছে।

বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় অন্যধারার স্বত্বাধিকারী মনির হোসেন পিন্টুকে ধন্যবাদ দিলে ছোট করা হবে। তিনি আমাদের যেভাবে তাড়া দিয়েছেন, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তার প্রশংসা করার ভাষা আমাদের নেই। মত এক মহান ব্যক্তির আত্মজীবনী বাংলায় পাঠকদের হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিজেও বিশাল মনের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়াও এ বিষয়ে নানাভাবে যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সারফুদ্দিন আহমেদ
ওমর ফারুক

সূচি

বিশাল জনসমাবেশে হাস্যোজ্জ্বল নেলসন ম্যান্ডেলা

কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সাথে আন্তরিক মুহূর্তে নেলসন ম্যান্ডেলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

একটি গ্রাম্য ছেলেবেলা

নিজ জন্মস্থান কুনুতে চিরনিদ্রায় শায়িত মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা

১

থেম্বু রাজপ্রাসাদ আর শক্তিশালী একটা সংবিধানের সংগে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব আমাকে আমার জন্মের পর একটা দশাসই নাম ছাড়া আর তেমন কিছুই দিয়ে যেতে পারেন নি। তার দেওয়া নামটাও ছিল বেশ মজার— 'রোলিহ্‌লাহ্‌লা'। ঝোসা সম্প্রদায়ের স্থানীয় ভাষায় রোলিহ্‌লাহ্‌লার আক্ষরিক অর্থ হল 'কোন একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়া'। কিন্তু ঝোসা সম্প্রদায়ের (যে সম্প্রদায়ে আমার জন্ম) সোজাসাপ্টা কথ্য-ভাষায় সাধারণত রোহ্‌লিাহ্‌লা বলতে যা বোঝায় তা হলো 'ঝামেলাবাজ'। নাম মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে বা ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্দেশ করে এমন কথায় কোনদিনই আমার বিশ্বাস নেই। আমার বাবা এই নাম দিয়ে আমার ভবিষ্যত জীবনকে উজ্জ্বলতর করে দিয়েছেন এমন উদ্ভট কথাও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু বড় হওয়ার পর জীবনে আমি এতবার ঝক্কি ঝামেলা ও বিপদাপদের মুখে পড়েছি এবং ঝামেলা সৃষ্টির কারণ হয়েছি যে আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই এর জন্য বাবার দেওয়া এই নামকেই দায়ী করে এসেছে। এখন আমাকে সবাই যে ইংরেজী ও খ্রিস্টান নামে ডাকে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে সেটার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু স্কুলের নাম নিয়েই আমি বাকি জীবনের পথে উঠে এসেছি।

ট্রান্সকেই'র 'রাজধানী' ও জেলা শহর উমতাতার একটি বিখ্যাত নদী এমবাশে। এর পাশেই রয়েছে এমভেজো নামের ছোট্ট একটা গ্রাম। ১৯১৮ সালের ১৮ জুলাই এ হাভাতে অজ গ্রামেই আমার জন্ম। যে বছর আমার জন্ম সে বছর তিনটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। প্রথমত, সে বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। দ্বিতীয়ত, সে বছর বিশ্বব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী আকারে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে লাখ লাখ লোক মারা পড়ে। তৃতীয় ঘটনাটি হল, দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের দুর্বিসহ ও মানবেতর জীবনের আসল অবস্থা তুলে ধরার জন্য আফ্রিকান ন্যাশনাল

কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল ভার্সাইলেস শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে আসে। আমার জন্মস্থান এমভেজো গ্রামটি সে সময় ছিল সভ্য দুনিয়ার জীবনযাত্রা থেকে বহু দূরবর্তী। বিশ্বে যত বড় ঘটনাই ঘটুক সে খবর সেখানে পৌছত না। শত শত বছর আগে মানুষ যেভাবে সাদামাটা ট্যাবু টোটেমের জীবনযাপন করত এখানে ছিল প্রায় সেরকম জীবন ব্যবস্থা।

কেপটাউনের ৮শ' মাইল পূর্বে আর দক্ষিণ জোহান্সবার্গের সাড়ে পাঁচ শ' মাইল দক্ষিণে ট্রান্সকেই'র অবস্থান। এর এক পাশে কেই নদী আরেক পাশে নাটাল সীমান্ত। উত্তরে ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতমালা আর পূর্বে ভারত মহাসাগরের সুনীল জলরাশি। অপূর্ব সুন্দর এই ট্রান্সকেই রাজ্য ঢেউ খেলানো পাহাড়শ্রেণী, উর্বর উপত্যকা আর অগণিত ছোটবড় নদী এ রাজ্যকে চিরযৌবনা করে রেখেছে। শীতকালেও এখানকার সবুজ সম্ভার বিন্দুমাত্র ম্লান হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম সীমান্ত রাজ্য হিসেবে পরিচিত ট্রান্সকেই আয়তনে প্রায় সুইজারল্যান্ডের সমান। বিশাল দেশের জনসংখ্যা মাত্র ৩৫ লাখ। এদের বেশিরভাগই ঝোসা সম্প্রদায়ের। এছাড়া কিছু বাসোখো ও শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকও আছে। থেম্বু জনসাধারণের আদি মাতৃভূমি এটা। থেম্বুরা ঝোসা সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ আমি যে সম্প্রদায়ের লোক) অংশ।

আমার বাবা গাডলা হেনরি এমফ্যাকানিশওয়া উত্তরাধিকারসূত্রে ও সাংস্কৃতিক দিক— উভয় দিক থেকেই গোত্র প্রধানের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। আদিবাসী থেম্বু জনগোষ্ঠীর রাজা বাবাকে এমভেজোর প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য থেম্বুরাজ যে একেবারে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তা নয়। ওই এলাকা ছিল ব্রিটিশদের শাসনাধীন। তবে ব্রিটিশ সরকার থেম্বু রাজের ওই সিদ্ধান্তের অনুমোদন দিয়েছিলেন। তাদের ভাষায় এমভেজো গ্রামের স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বাবাকে। সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত গ্রামপ্রধান হিসেবে সম্প্রদায়ের ভালোমন্দ দেখা, কলহ বিবাদ মেটানোর সব দায় দায়িত্ব ছিল তার ওপর। গোত্র প্রধানের ক্ষমতা অনেক বেশি থাকার কথা থাকলেও অসহিষ্ণু শ্বেতাঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকায় তিনি খুব একটা স্বাধীন ছিলেন না।

সে সময় যিনি থেম্বু রাজ ছিলেন, তার বিশ প্রজন্ম আগেকার এক পূর্বপুরুষ এ উপজাতির পত্তন করেন। কথিত আছে, থেম্বুরা বহু আগে ড্রাকেন্সবার্গ পাহাড়ের ঢালে বাস করত। ষষ্ঠ শতকে এরা উপকূলীয় এলাকায় নেমে আসে। এখানে এসে তারা স্থানীয় ঝোসা সম্প্রদায়কে শাসন করা শুরু করে। ঝোসাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন এনগুনি সম্প্রদায়ভুক্ত। একাদশ শতক পর্যন্ত এরা দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এলাকায় মাছ ধরে ও বন্য প্রাণী শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। এনগুনি জাতি আসলে দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তরাঞ্চলীয় গ্রুপ ও দক্ষিণাঞ্চলীয় গ্রুপ। উত্তরাঞ্চলীয় গ্রুপের মধ্যে পড়েছে জুলু ও সোয়াজি সম্প্রদায়ের লোক। দক্ষিণ গ্রুপে পড়েছে অ্যামাবাকা, অ্যামবোম্ভানা,

অ্যামাগকালেকা, অ্যামাম্‌কেনগু, অ্যামাম্‌পোভোমাইজ, অ্যামামপোন্ডো, অ্যাবেস্‌ওযো ও অ্যাবে থেম্বু। এই সব গোত্র মিলে ঝোসাজাতি গঠিত।

শিক্ষা-দীক্ষা ও আইন-কানুনে পারদর্শীতা ও স্বকীয় ভাষাভিত্তিক জ্ঞানার্জনের জন্য ঝোসারা বরাবরই এগিয়ে। এ নিয়ে তাদের গর্বেরও শেষ নেই। খুব ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যতা মেনে ঝোসা সমাজ পরিচালিত হয়। এখানে প্রত্যেক লোকই তার নিজস্ব গোত্রপরিচয় ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। প্রত্যেক ঝোসা তার পূর্বপুরুষদের নাম ও ইতিহাস ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে। প্রত্যেক ঝোসা কোন না কোন গোষ্ঠী বা সংগঠনের সদস্য। আঠার শতকে ট্রান্সকেই শাসন করতেন যে থেম্বু রাজ; তার নাম মাদিবা। এই মাদিবার নামে একটি গোত্রের নাম করণ হয়। আমি ছিলাম সেই মাদিবা গোত্রের সদস্য। সম্মানসূচক উপাধি হিসেবে এখনও আমার সম্প্রদায়ের লোক আমাকে মাদিবা বলে ডাকে।

এ অঞ্চলে যে কয়জন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন তাদের মধ্যে এনগুবেনকুকা অন্যতম। থেম্বু উপজাতিকে তিনিই সুসংহত করেছিলেন। ১৮৩২ সালে এনগুবেনকুকা মারা যান। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রধান দুই রাজকীয় বাড়ির কন্যাদের বিয়ে করেন তিনি। দুই রাজবাড়ির একটি হলো গ্রেট হাউস। এই বাড়ির কন্যার গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানেরই রাজা হবার অধিকার ছিল। এটাকে অনেকে রাইট হ্যান্ড হাউস বলে ডাকে। অন্য বাড়িটার নাম *ইক্সিবা*। এটা গ্রেট হাউস থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট বলে এটাকে বলা হতো লেফট্‌ হ্যান্ড হাউস। ইক্সিবা বা লেফট হ্যান্ড হাউসের রানীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তান সন্ততির গোত্রপ্রধান হবার অধিকার ছিল না। তবে স্থানীয় বিচার শালিশে এদের প্রাধান্য থাকতো।

আমার বাবার দেহ সৌষ্ঠব ছিল মাঝারি গড়নের। স্লিম ফিগারের মানুষ ছিলেন তিনি। গায়ের রং ছিল ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের। সম্ভবত তার চেহারা ও শারিরীক গঠনের সংগে আমার প্রচুর মিল রয়েছে। তার কপালের ওপরে একগোছা চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলায় তার চুলের মতো রং বানানোর জন্য আমি মাঝে মাঝে কপালের ওপর দিককার চুলে সাদা ছাই মাখাতাম।

ছেলেমেয়ে শাসন করার ক্ষেত্রে বাবা ছিলেন ভীষণ কঠোর। ডিসিপ্লিন ভাঙলে এমন কঠিন শাস্তি দিতেন যে আমরা ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতাম।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে দালিনদিয়েবো এবং পরবর্তীতে তার ছেলে সাবাতার শাসনামলে আমার বাবাকে থেম্বুল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাবা হতো। সরকারীভাবে তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা না দেওয়া হলেও তার দায়িত্ব ও কাজকর্ম পরিচালনার যে ধরণ ছিল তার সংগে আধুনিক আমলের প্রধানমন্ত্রী পদটির খুব একটা অমিল নেই। রাজা দালিনদিয়েবো ও তার ছেলে (পরবর্তীতে রাজা) সাবাতা দুজনেরই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পরামর্শক ছিলেন আমার বাবা। সেই সূত্রে তারা যখন কোথাও ভ্রমণে যেতেন অথবা ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের

সংগে আলোচনায় বসতেন তখন তাদের পাশে স্বভাবতই বাবাকে দেখা যেত। তিনি ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত একজন দায়িত্বশীল ঝোসা ইতিহাসবিদ। অনেকটা সে কারণেই তাকে সবাই উপদেষ্টা হিসেবে মান্য করতো। আমার নিজের ক্ষেত্রে বলতে পারি, ইতিহাস বিষয়টি খুব ছোটবেলায় আমাকে আকর্ষণ করেছিল; আর এর নেপথ্যে প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন বাবা। বাবা লিখতে অথবা পড়তে পারতেন না। কিন্তু অসাধারণ বাচনভঙ্গি ছিল তার। বাবা যখন কোন বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করতেন তখন দর্শক শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শুনতে বাধ্য হতো। তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কাছে একজন শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হতেন।

মজার ব্যাপার হলো, বড় হয়ে জেনেছি, বাবা শুধু রাজপরিবারের উপদেষ্টাই ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের কিংমেকার। ১৯২০ সালে জঙ্গিলিজবির মৃত্যুর পর তার প্রথম স্ত্রীর ছেলে সাবাতাকে রাজার আসনে বসানো হয়। এ সময় সাবাতা ছিলেন একেবারেই নাবালক। অনেকে নাবালক সাবাতাকে রাজার আসনে বসানোর ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল সাবাতার চেয়ে বয়সে অনেক বড় তার কয়েকজন চাচাতো ভাই ছিল। তারা তাদের কোন একজনকে ক্ষমতায় বসানোর প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু আমার বাবা তাদের বোঝালেন এই বলে যে সাবাতা বয়সে ছোট হলেও লেখাপড়ায় সেই সবার চেয়ে এগিয়ে। তিনি বললেন, তার বিশ্বাস যুবরাজ সাবাতা দায়িত্বশীলভাবেই রাজকর্ম পরিচালনা করতে পারবে। রাজভবনে আমার বাবার মতো আরও বেশ কিছু বর্ষীয়ান প্রভাবশালী লোক ছিলেন যারা শিক্ষাদীক্ষাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। তারা বাবার কথায় সমর্থন দিলেন। অনেকে বিরোধীতা করলেও শেষ পর্যন্ত তারা বাবার যুক্তির সামনে দাঁড়াতে পারেন নি।

আমার বাবা মোট চারটি বিয়ে করেছিলেন। তার চার স্ত্রীর মধ্যে তৃতীয় জনের নাম নোসেকেনি ফ্যানি। ঝোসা উপজাতির *অ্যামামপেমভু* গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি এনকেদামার কন্যা ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন রাইট হ্যান্ড হাউসের কন্যা। এই নোসেকেনি ফ্যানীই হলেন আমার গর্ভধারিনী মা। এই চার স্ত্রীর (গ্রেট ওয়াইফ, রাইট হ্যান্ড ওয়াইফ, লেফট হ্যান্ড ওয়াইফ ও ওয়াইফ অব সাপোর্ট হাউস) প্রত্যেকেই তাদের আলাদা আলাদা *ক্রালে* বাস করতেন। উপজাতিয় লোকেরা স্থানীয় গাছ লতা ও গোলপাতা দিয়ে কুড়েঘর বানায় তাকে ঝোসারা ক্রাল বলে। এক স্ত্রীর ক্রাল থেকে অন্য স্ত্রীরটার দূরত্ব ছিল কয়েক মাইল। বাবা স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ দিতেন আর পালাক্রমে তাদের ক্রালে গিয়ে স্ত্রীদের সংগে দেখা করতেন। এর মাধ্যমেই তিনি যতগুলো বাচ্চা-কাচ্চার জন্ম দিয়েছিলেন তার সংখ্যা নেহাত কম নয়।

চার স্ত্রীর ঘরে তার ঔরসে মোট ১৩ সন্তানের জন্ম হয়। এদের মধ্যে ৯ জন মেয়ে ও ৪ জন ছেলে। রাইট হ্যান্ড হাউসে আমিই বড় সন্তান। তবে আমার অন্য ৪ জন সৎ ভাইয়ের চেয়ে আমি বয়সে ছোট। আমার তিন বোনের মধ্যে বালিবি সবার বড়। তারপর নোতানকু এবং সবচেয়ে ছোটবোনের নাম

মাখুৎসাওয়ানা। এম লাহ্‌লাওয়া আমার পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তার নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী ছিলেন দালিগকিলি। কারণ তিনি গ্রেট হাউসের মায়ের গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। অবশ্য ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে দালিগকিলি নামের আমার ওই ভাইটা মারা যায়। বর্তমানে আমি বাদে আমার পিতার কোন পুত্র সন্তানই আর জীবিত নেই। মৃত ভাইদের সবাই আমার চেয়ে শুধু বয়সেই বড় ছিলেন তাই নয়; যশ-সম্মানের দিক থেকেও তারা আমার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন।

আমার জন্মের মাত্র কিছুদিনের মধ্যে বাবা সরকারী কর্মকর্তাদের সংগে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। তার আরেকটি 'দোষ' আমি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছিলাম। সেটি হল অবাধ্যতা। বাবার মতো আমিও সারাজীবন নতি স্বীকারকে ঘৃণা করে এসেছি। নিজের বিদ্রোহী মনোভাব ও উচ্চ ব্যক্তিত্ববোধ নিয়ে বাবা চিরকাল গর্ব করেছেন। আমি তার সেই অহমবোধকে আজও সম্মান করি।

বাবা এমভেজো গোত্রের প্রধান হওয়ায় স্থানীয় বিচার শালিস তাকেই দেখতে হতো। থেম্বু রাজ ও ব্রিটিশ সরকার উভয়ের কাছে তার জবাবদিহি করতে হত। একবার স্থানীয় একজন কৃষকের একটি ষাড় হারিয়ে যাওয়ায় তার প্রতিবেশীর সংগে তার বিবাদ বাধে। লোকটি বাবার কাছে না এসে বিচারের জন্য সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যায়। যেহেতু ঘটনাটি ঘটেছে বাবার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সেহেতু ঘটনা তদন্তের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট বাবাকে তার অফিসে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠায়। নির্দেশপত্র পেয়ে বাবার তরফ থেকে ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি মেসেজ পাঠানো হয়। তাতে বলা হয়েছিল মাত্র দুটো শব্দ *'আন্দিজি, এনদিসাকুয়ালা'* ঝোসা ভাষার এ মেসেজটির অর্থ হল 'আমি যাবো না'। সে আমলে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অমান্য করার সাহস কারো ছিল না। বাবা যেটা করলেন তা ছিল ভয়ানক অবাধ্যতা ও বিদ্রোহাত্মক কাজ।

তবে বাবার এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে তিনি কোন অন্যায় করেন নি। আইনত ওই ম্যাজিস্ট্রেট তাকে কোন শাস্তি দিতে পারেন না বলেই তার বিশ্বাস ছিল। তিনি ভালো করেই জানতেন, উপজাতিয়দের গোত্রীয় সমস্যা বিট্রিশরাজের আইনে নয় থেম্বু সমাজের আভ্যন্তরিণ আইনে ফয়সালা করা হয়। তিনি যা করেছেন তা কোন ব্যক্তিগত ঔদ্ধত্যের কারণে করেন নি; করেছেন আদর্শগত কারণে।

ম্যাজিস্ট্রেট তার নামে তলবনামা পাঠানোয় তিনি যাবেন না ঘোষনা দিয়ে ওই ম্যাজিস্ট্রেটের অধিকারের সীমাকে মনে করিয়ে দেন।

বাবার মেসেজ পাওয়া মাত্র ম্যাজিস্ট্রেট যথারীতি রেগে আগুন হলেন এবং বাবার বিরুদ্ধে সরকারি কাজে অসহযোগিতার অভিযোগ আনলেন। সে সময় স্থানীয় উপজাতি অথবা কৃষ্ণাঙ্গদের অপরাধের অভিযোগ সত্য না মিথ্যা তা খুব একটা তদন্ত করে দেখা হতো না। ওসব ছিল শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত। ফলে

ম্যাজিস্ট্রেটের এক রায়েই বাবাকে গোত্রপ্রধানের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। আর এর মধ্য দিয়ে ম্যান্ডেলা পরিবারের গোত্র প্রধানের ধারাবাহিকতার অবসান হয়।

সেসময় যদিও আমার ভালো-মন্দ বোঝার মত বয়স হয়নি; তথাপি এ ঘটনা আমাকেও সংকটের মুখে ফেলেছিল। সেই সময়ের জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী আমার বাবা সমাজে একজন ধনবান ও প্রভাবশালী লোক ছিলেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের ওই হুকুমে বাবা হঠাৎ করেই তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত আর পদবী দুই-ই হারালেন। সেই সাথে বেহাত হয়ে গেল অসংখ্য গবাদী পশু, বহু জমিজমা আর খাজনার অর্থ।

এই বিপর্যয়ের মুখে আমার মা আমাকে নিয়ে এমভেজোর উত্তরে অবস্থিত কুনু গ্রামে চলে আসতে বাধ্য হন। তার কিছু বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় তাকে সেখানে বসবাসের জন্য সহযোগিতা করেছিল। এমভেজোতে যেরকম অভাবমুক্ত জৌলুস নিয়ে মা বাস করছিলেন এখানে ঠিক ততটা না হলেও এই কুনু গ্রামেই আমার শৈশবের সবচেয়ে মধুর দিনগুলো কেটেছে। এখান থেকেই আমি স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তুলে এনেছি শৈশবের বহু বহু মুক্তো মানিক।

২

নদীর মতো আঁকাবাকা সবুজ ঘাসে মোড়ানো এক উপত্যকায় ছিল আমার শৈশবের গ্রাম কুনু। দু'পাশে উঁচু উঁচু পাহাড়। ঘন সবুজ বৃক্ষে ঢাকা পাহাড়। এ গ্রামে সব মিলিয়ে মাত্র কয়েক শ' মানুষ বাস করত। এরা সবাই থাকতো উপজাতিয় কায়দায় বানানো কুড়েঘরে। প্রায় গোলাকৃতির কুড়েঘর। ঘরের মাঝখানে লম্বা একটা কাঠের থাম পুঁতে সেটাকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকৃতির শনের চাল বসানো হতো। গম্বুজের মতো শনের চালের নিচে ঘরের দেয়াল বানানো হতো ম্যাটি দিয়ে। পুরু মাটির দেওয়াল বিশিষ্ট ওই ঘরের মেঝেতে যে মাটি ব্যবহার করা হতো তা একেবারে সাধারণ মাটি নয়। বিশেষ এক ধরণের পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ওই গুড়ি গুড়ি মাটি এনে তার সংগে পিঁপড়ে পিষে মণ্ড বানানো হত। সেই প্রক্রিয়াজাত মাটি দিয়েই বানানো হতো মেঝে। এসব ঘরের মেঝে নিয়মিত কাঁচা গোবর দিয়ে লেপা হতো। রান্নার সময় ঘরের চাল ভেদ করে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উড়ে যেতো। এসব ঘরে ঢোকার জন্য ছিল একটিমাত্র ছোট্ট দরজা। একজন মানুষ কোনরকম মাথা নুইয়ে সে ঘরে ঢুকতে পারত। শস্য ক্ষেত থেকে কিছুটা দূরবর্তী আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে কুড়েগুলো তৈরি করা হতো। এক একটা গ্রুপে দশ পনেরটা বা তারও বেশি ঘর ছিল।

আমার সময়ে ওই গ্রামে রাস্তাঘাট বলতে যা বোঝায় তার কিছুই ছিল না। পদপিষ্ট ঘাসের আলপথ মাড়িয়ে সবাই যাওয়া আসা করত। এ গাঁয়ের মহিলা আর শিশুরা পোড়া লাল মাটি দিয়ে রং করা মোটা কম্বল পরত। শুধুমাত্র অল্প কিছু খ্রিস্টান পরিবারের নারী ও শিশুদেরই পশ্চিমা ধাচের পোশাক পরতে দেখা যেত। গরু, ভেড়া, ছাগল আর ঘোড়া পালন প্রত্যেক পরিবারের সাধারণ পেশা ছিল।

কুনু গ্রামের চারপাশে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিল ফসলের ক্ষেত। বড় ধরণের তেমন কোন গাছ ছিল না। তবে গ্রাম ছাড়িয়ে দূরে পাহাড়ের ঢালে বিশাল বিশাল সাইজের অসংখ্য গাছ ছিল। আদিবাসী অথবা উপজাতিয়দের সার্বিক স্বাধীনতা ছিল না; কারণ তারা সবাই সরকার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বসবাস করত। সে সময় হাতেগোনা কিছু লোক ছাড়া সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষকে ব্রিটিশ সরকারকে খাজনা দিতে হয়েছে। জমি তখন কাউকে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে ভোগ করতে দেওয়া হত না। চাষবাস বাবদ জমি অনুযায়ী প্রত্যেককে জমির ভাড়া অনুযায়ী বাৎসরিক ভিত্তিতে সরকারি তহবিলে অর্থ জমা দিতে হত। ওই এলাকায় বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য দুটো প্রাইমারি স্কুল ছিল। বাজার সদাই করার জন্য ছিল একটিমাত্র মুদি দোকান। আমরা যারা সেখানে থাকতাম তাদের অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য ছিল যব, ভুট্টা, সীম আর লাউজাতীয় সব্জি। পূর্বপুরুষরা এসব খাবারে অভ্যস্ত ছিল বলেই যে আমরা এগুলোকে প্রধান খাবার হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, ব্যাপারটা আসলে সেরকম নয়। আসল ব্যাপার হলো এর চেয়ে দামী খাবার খাওয়ার মতো সামর্থ্যই আমাদের ছিল না। গ্রামের মধ্যে যারা সবচেয়ে বিত্তশালী ছিল তারা এসব খাবারের পাশাপাশি চা, কফি, চিনি খেত। কিন্তু কুনু গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের কাছে এগুলো ছিল দুর্লভ বস্তু। ক্রয় ক্ষমতার বাইরে হওয়ায় চা-কফিকে তারা বড়লোকের বিলাস বলে ভাবতো।

চাষাবাদ, রান্নাবান্না এবং গোসল করার জন্য নিকটবর্তী ছোট নদী অথবা ঝর্ণা থেকে বালতিতে করে পানি আনতে হতো। এই কঠোর পরিশ্রমের কাজ মহিলাদেরই করতে হতো। আসলে কুনু গ্রামটাই ছিল শিশু আর মহিলাদের। পুরুষরা বছরের অধিকাংশ সময় হয় দূরবর্তী খামারে নয়তো খনিতে শ্রমিকের কাজ করত। জোহান্সবার্গের দক্ষিণ সীমানা প্রাচীর হিসেবে পরিচিত পাহাড়ে ছিল খনি। সেখানেই পুরুষরা কাজ করতে যেত।

বছরে এরা বারদুয়েক গ্রামে বউ ছেলেপুলের কাছে আসতো। মূলত জমিতে লাঙল দেয়ার মৌসুমেই তারা গ্রামে ফিরতো। হালচাষ দিয়ে আবার তারা কর্মস্থলে ফিরে যেতো। জমিতে বীজ ফেলা, নিড়ানি দেওয়া এবং ফসল কেটে ঘরে তোলার সব দায়ভার পড়তো মহিলা ও শিশুদের ওপর। গোটা গ্রামে প্রায় কেউই লিখতে অথবা পড়তে জানতো না। লেখাপড়ার ধারণাকে অনেকেই একটি বিদেশী কনসেপ্ট হিসেবে মনে করত।

কুনু গ্রামে পাশাপাশি তিনটি কুড়ের তত্ত্বাবধানে ছিলেন আমার মা। যদ্দুর মনে পড়ে ওই তিনটি কুড়েই আমার আত্মীয়দের ছেলে পুলেতে ভরপুর ছিল। তিনটি ঘরে একগাদা বাচ্চা সারাদিন কিলবিল করতো। ওই গ্রামে আমি আমার সমবয়সীদের সাহচর্য ছাড়া একা একটি দিনও কাটিয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না।

আফ্রিকান সংস্কৃতি অনুযায়ী সেখানে চাচাতো, খালাতো অথবা ফুপাতো ভাইবোন বলে কিছু নেই। চাচা, ফুফু অথবা খালার ছেলে-মেয়েকে সেখানে শুধুমাত্র ভাই অথবা বোন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শ্বেতাঙ্গরা যেরকম রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের বিভাজন করে আমাদের মধ্যে তা করা হয় না। আমাদের সমাজে সৎভাই অথবা সৎ বোন বলেও কিছু নেই। মায়ের বোন আমাদের কাছে খালা নয় 'মা'; চাচার ছেলে আমাদের কাছে চাচাতো ভাই নয়; কেবলই ভাই; ভাইয়ের ছেলে অথবা মেয়ে আমাদের কাছে ভাতিজা-ভাতিজি নয়; তারা আমাদের ছেলে বা মেয়ে।

আমার মায়ের তত্ত্বাবধানে যে তিনটি কুড়ে ছিল তার একটিতে রান্নাবান্না করা হত; একটিতে আমরা সবাই একসংগে ঘুমাতাম, আরেকটি ব্যবহৃত হত ভাঁড়ার ঘর হিসেবে। আমরা মাটিতেই বসতাম। ঘুমানোর সময় হাতে বানানো মাদুর বিছিয়ে নিতাম। এমখেকেজওয়েনিতে আসার আগমুহূর্ত পর্যন্ত বালিশ কী বস্তু তা আমার জানা ছিল না। তিনটা পায়া লাগানো একটা বিরাট লোহার কড়াইয়ে আমার মা কখনও কুড়ের মধ্যে কখনও বাইরে রান্না করতেন। এতে রান্না করতে চুলার দরকার হতো না। আগুন জালিয়ে পায়াযুক্ত ওই কড়াই তার ওপরে চেয়ারের মতো বসিয়ে দিলেই হতো। আমরা যা খেতাম তার সব কিছুই ছিল আমাদের নিজেদের হাতে উৎপাদিত ফসল থেকে বানানো।

আমার মা নিজে যব-ভুট্টা লাগানো থেকে শুরু করে তা কেটে ঘরে তোলার কাজ করতেন। ভুট্টা পেকে শক্ত হওয়ার পর তা কেটে জমি থেকে ঘরে তোলা হত। আঙিনা অথবা ঘরের মেঝেতে গর্ত খুঁড়ে সেখানে ভুট্টা সংরক্ষণ করা হত। যব এবং ভুট্টা থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আটা ময়দা বানানো হত। সাধারণত পাথর কেটে বানানো পাটা পুঁতো দিয়ে সেগুলো পিষে আটা ময়দা বানানো হতো। তা দিয়ে মহিলারা *'উমফোতুলো'* (টক দইয়ে ভুট্টার ছাতু মিশিয়ে বানানো বিশেষ খাবার) অথবা *'উমংকুশো'* (সুজি আর সীম দিয়ে রান্না করা খাবার) তৈরি করত। মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে আমরা আটা ময়দার সংকটে পড়তাম। কিন্তু আমাদের গরু-ছাগল এত বেশি দুধ দিত যে আমরা নিজেরা তা খেয়ে শেষ করতে পারতাম না।

খুব ছোটবেলা থেকে কৈশোর পর্যন্ত অবসরের বেশিরভাগ সময়ই আমি মাঠে অন্যান্য সমবয়সীদের সংগে খেলাধুলা অথবা মারামারি করে কাটাতাম। খেলার সময় মাঠে না এসে যে ছেলেরা তাদের মায়ের সংগে ঘরে বসে কাপড় সেলাই

করতো তাদের আমরা 'কুনো ব্যাঙ' বলে ডাকতাম। অবশ্য রাতের বেলায় ঠিকই সেই 'কুনো ব্যাঙ'দের সংগে ভাগাভাগি করে খাবার খেতাম। কম্বল ভাগাভাগি করে ঘুমাতাম।

আমার বয়স পাঁচ বছর হওয়ার আগেই আমি পুরোদস্তুর রাখাল হয়ে গিয়েছিলাম। একাই ভেড়া আর ছাগলের বাচ্চা নিয়ে মাঠে যেতাম। তাদের সামাল আর পাহারা দিতাম। বড় হয়ে বুঝেছি ঝোসা সম্প্রদায়ের কাছে গবাদী পশু শুধু খাদ্য পানীয়র উৎসই ছিল না এটা ছিল ঈশ্বরের এক মহান আশীর্বাদ। মাঠের ডানপিটে জীবন থেকেই আমি শৈশবে শিখেছিলাম তীর ধনুকের একটিমাত্র শরাঘাতে কী করে উড়ন্ত পাখিকে ধরাশায়ী করতে হয়। কী করে জঙ্গলের মৌচাক থেকে মধু আর মাটি খুঁড়ে খাবার উপযোগী মূল-কন্দ সংগ্রহ করতে হয়; গাভীর ওলানে মুখ দিয়ে কী করে উষ্ণ দুগ্ধ ধারার স্বাদ উপভোগ করতে হয়, কী করে হীম ঠাণ্ডা নদীতে উলঙ্গ হয়ে উদ্দাম ঝাপাঝাপি করতে হয়; বড়শি দিয়ে কী করে মাছ ধরতে হয়— এসব কিছুর শিক্ষাদাতা ছিল আমার খেলার মাঠ; আমার সতীর্থরা।

এ সময়ই আমি প্রত্যেক আফ্রিকান শিশুর অবশ্য শিক্ষণীয় বিদ্যা লাঠিখেলা রপ্ত করি। তীর ছোড়ার বহুমাত্রিক কৌশল শিখে ফেলি। একদিকে তাক করা তীরকে হাতের কৌশলে অন্যদিকের লক্ষ্যে বিদ্ধ করার মতো সুক্ষ্ম শিল্প এসময়ই আমি অর্জন করেছিলাম। এই বয়সেই আমি প্রথম প্রেমে পড়েছিলাম। তবে সেটা কোন মানবীর প্রতি নয়; প্রকৃতির প্রতি। শান্ত স্নিগ্ধ দিগন্ত রেখাকে ভালোবেসেছিলাম এই বয়েসটাতেই।

ছেলেবেলায় আমাদের খেলার জগৎটাই ছিল বিদ্যালয়। খেলনা বলতে যা কিছু ছিল তার সবই ছিল নিজেদের হাতে বানানো। কাদা ছেনে নিজেরা মাটির পশুপাখি তৈরি করতাম। ডাল কেটে কুকুর টানা স্লেজ গাড়ির মতো গাড়ি বানাতাম। তারপর সেটাকে ষাড়ের সংগে জুড়ে দিয়ে তাতে চড়ে বসতাম। ষাড় যখন ছুটতো আমরা তখন গাড়িতে বসে মহা আনন্দে হৈ হুল্লোড় করতাম। প্রকৃতিই ছিল আমাদের খেলার রাজ্য। কুনু গ্রামের দু'পাশেই মেঘের মতো পাহাড় আকাশে উঠে গেছে। আমরা বন্ধুরা মিলে পাথুরে পাহাড়ের তেলতেলে পীঠ খুঁজে বের করতাম। তারপর ওপরে উঠে ওই ঢালু পাহাড়ের গায়ে বসে পড়তাম। পিছলে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসতে খুব মজা লাগতো। অবশ্য এতে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটতো। অনেকবার ছোটখাটো আঘাতপ্রাপ্তির পর আমি হরিণের দ্রুততায় পাহাড়ে উঠা শিখেছিলাম।

একদিন একটা গাধার কাছ থেকেও আমি বড় ধরণের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। এক সন্ধ্যায় একটা গাধার পিঠে পালাক্রমে আমরা উঠছিলাম। যখন আমার পালা এলো আমি লাফ দিয়ে ওটার পিঠে চড়ে বসলাম। কিন্তু আমি বসতেই সে

লাফালাফি শুরু করলো। আমাকে কিছুতেই পিঠে রাখতে চাইলো না। সে লাফ দিয়ে একটা কাটা ঝোপের মধ্যে দৌড় দিল। আমি পড়ে গেলাম। একটা কাটাযুক্ত ডালে আমার কপাল চিড়ে গেল। আহত হওয়ার চেয়ে তখন সম্মানসংকটই আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। পুবের দেশগুলোর মানুষের মতো আফ্রিকানদের সম্মানবোধ সাংঘাতিক প্রখর। চীনারা সম্মানকে অনেক সময় 'মুখ' বলে থাকে। বন্ধুদের সামনে গাধাটা আমাকে পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ায় আমার যেন আর 'মুখ' থাকছিল না। হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য আমি বেপরোয়া গাধাটাকে বাগে আনার জন্য আবার তার পিঠে চড়ে বসলাম। দীর্ঘসময় পর সে আমার বাধ্য হল। ঠিক একইভাবে আমি ছোটবেলা থেকেই পরাজয় বিষয়টাকে কোনদিনই মেনে নিতে পারিনি। আমার এই জীবনের দীর্ঘ ইতিহাসে আমি বহুবার বহুভাবে অপমান না করেও আমার বিরোধীদের পরাজিত করেছি।

আমরা যখন খেলতাম তখন সাধারণত ছেলেরাই তাতে অংশ নিত। তবে মাঝে মাঝে আমাদের বোনদেরও আমরা খেলতে নিতাম। ছেলেমেয়ে একসাথে হয়ে সবচেয়ে বেশি যে দুটি খেলা খেলতাম সে দুটি হল *এনদাইজ* (লুকোচুরি) এবং *আইসকেওয়া* (দৌড়ঝাপ বিশেষ)। কিন্তু মেয়েদের সাথে আমাদের খেলাধুলার মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দের খেলা ছিল *খেদা* বা পছন্দের মানুষ খুঁজে বের করার খেলা। অন্য খেলার মতো এটাতে কোন কঠিন নিয়ম-কানুন ছিল না। আমাদের সমবয়সী সমানসংখ্যক মেয়েকে প্রথমে দাঁড় করানো হতো। তারপর তাদের প্রত্যেককে তার পছন্দের ছেলেকে বেছে নিতে বলা হতো। খেলার নিয়ম ছিল কোন মেয়ে তার পছন্দের ছেলেকে বেছে নেওয়ার পর ওইদিন ছেলেটি তার 'দায় দায়িত্ব' নেবে। তার মূল দায়িত্ব হবে মেয়েটিকে ঠিকমতো বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসা। একটি ছেলেকে একাধিক মেয়ে পছন্দ করতে পারতো। মজার ব্যাপার হলো এ খেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের কাছে ছেলেরা বুদ্ধির মারপ্যাচে হেরে যেতো। অনেক সময় মেয়েগুলো নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে যে গোবেচারা তাকে সবাই একসংগে তাদের পছন্দের কথা বলতো। খেলার নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেককে তখন ওই ছেলেটির বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হতো। তখন মেয়েরা তাকে সারাপথ জ্বালিয়ে মারতো।

ছেলেদের মধ্যে যে খেলাটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বীরোচিত বলে গণ্য হতো তার নাম *থিনটি*। এ খেলাটির সংগে যুদ্ধকৌশলের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এ খেলায় কয়েকশ মিটার পর পর উঁচু উঁচু খুটি অথবা লাঠি পোঁতা হতো। খেলায় অংশ নিত দুটি দল। প্রত্যেক দলের জন্য আলাদা আলাদা ধরণের খুঁটি নির্ধারিত ছিল। খেলোয়াড়দের কাজ ছিল দৌড়ে গিয়ে প্রতিপক্ষের খুঁটিগুলো উপড়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া এবং নিজেদের খুঁটি প্রতিপক্ষের হাত থেকে রক্ষা করা। একটু বড় হওয়ার পরই আমরা প্রতিবেশী গ্রামের ছেলেদের নিয়ে বড় আকারের

থিনটি ম্যাচের আয়োজন করতাম। যারা এ খেলায় ভালো করত তাদের বিশেষ বীরোচিত সম্মান দেওয়া হতো। লোকজন তাকে পালোয়ান হিসেবে বেশ খাতির যত্নও করতো।

সারাদিন খেলাধুলা দৌড়ঝাপের পর রাতে যখন মায়ের ক্রালে (কুড়ে) ফিরতাম তখন দেখতাম তিনি আমাদের রাতের খাবারের আয়োজন করছেন। আমাদের বাবাকে একবার মাত্র ঝোসা বীরদের নায়কোচিত গল্প বলতে শুনেছিলাম। কিন্তু কুনু গ্রামে আসার পর মা রাতের খাওয়া শেষ হলে প্রতিদিন আমাদের ঘুমপাড়ানি গল্প বলতেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা আফ্রিকান উপকথা শুনতাম মায়ের মুখ থেকে। এসব গল্প আমার কল্পনা শক্তির বিস্তার ঘটিয়েছে। পাশাপাশি বহু নৈতিক শিক্ষাও পেয়েছি মায়ের এসব রূপকথা থেকে।

আমার মনে পড়ছে মা প্রায়ই এক কানাবুড়ি আর অচেনা আগন্তুকের একটা গল্প বলতেন। গল্পটার কাহিনীতে দেখা যায় প্রায় দৃষ্টিহীন থুত্থুড়ে বুড়ির চোখে ময়লা জমার কারণে সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছিল। বুড়ি পথচারিদের তার চোখ পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকে। কিন্তু কেউ তার কথা ভ্রুক্ষেপে আনে না। অবশেষে এক আগন্তুকের মায়া হয়। বুড়ির জামাকাপড় ও শরীর ছিল নোংরা ও উৎকট গন্ধে ভরা। আগন্তুক তা সত্ত্বেও তার চোখ পরিষ্কার করে দেয়। আর তার পরপরই অলৌকিকভাবে সেই কানাবুড়ি এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীতে পরিণত হয়। শেষে সেই যুবতী বিয়ে করে আগন্তুককে। তাকে বিয়ে করার পর দরিদ্র আগন্তুক এক ধনাঢ্য বণিকে পরিণত হয়। এটা একটা সাধারণ রূপকথা। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ছোটবেলাতেই যে শিক্ষা পেয়েছি সেটা হল মহত্ব ও সততার পুরষ্কার কীভাবে প্রকৃতি আমাদের দেবেন তা কারুরই জানা নেই।

অন্য জোসা শিশুদের মতো আমিও শৈশবে দেখে দেখে সব শিখেছি। আমাদের মধ্যে অলিখিত নিয়ম ছিল দেখে শেখা। কোন প্রশ্ন নয়, যা ঘটছে যা করা হচ্ছে তা অনুসরণ করে করতে হবে এটাই ছিল ঝোসা শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতি। আমি প্রথম যখন শ্বেতাঙ্গদের বাড়িতে যাই তখন যে ব্যাপারটি আমাকে হতবাক করেছিল, সেটি হল শিশুদের সীমাহীন জিজ্ঞাসা। দেখলাম তারা অবিরাম তাদের বাবা মাকে 'এটা কী', 'ওটা কী' বলেই যাচ্ছে। তাদের বাবা মাও সীমাহীন ধৈর্য নিয়ে ছেলেমেয়েদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছেন। আমাদের বাড়িতে প্রশ্ন করাকে বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হিসেবে ধরা হতো। ছোটদের কাজ ছিল বড়দের কাজকর্মের দিকে খেয়াল রাখা আর সে মতো করার চেষ্টা করা। তবে বড়রা বিশেষ প্রয়োজন হলে পরস্পর জিজ্ঞাসা করে অনেক সময় সমস্যার সমাধান করে।

আমার সময়ে এমনকি এখনও ঝোসা সম্প্রদায়ের জীবন প্রণালী নিয়ন্ত্রিত হতো স্থানীয় সংস্কৃতি অনুশাসন ও ট্যাবুর মাধ্যমে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিধি নিষেধ আমাদের কাছে ছিল আইন। এ সমস্ত বিধি বিধানের ব্যাপারে আমরা

কখনই প্রশ্ন তুলতাম না। পুরুষরা তাদের পিতা যা করেছে; যেভাবে জীবনযাপন করেছে তাকেই অনুসরণ করেছে। মহিলারা তাদের মায়েদের যেভাবে যেসব কাজ করতে দেখেছে তারাও তাই করেছে।

ছেলেবেলায় আমাকে কেউ না বললেও আমি নিজেই নারী-পুরুষের অনুশাসনগুলো বুঝতে পেরেছিলাম। খুব অল্প বয়সেই আমি আবিস্কার করলাম দু'একদিনের মধ্যে বাচ্চা প্রসব করেছে এমন মহিলাদের ঘরে পুরুষদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। বিয়ের পর উৎসব না করে নতুন বৌকে নতুন ঘরে তোলা হয় না। তখনই জেনেছি ঝোসা সমাজে বাপদাদা বা পূর্বপুরুষদের অবজ্ঞা করা মহা অন্যায়। ঝোসারা বিশ্বাস করে পূর্ব পুরুষদের অবজ্ঞাকারীর মতো কপালপোড়া আর নেই; তার জীবনে কোনদিন ভালাই হয় না।

কেউ যদি বাপ দাদার প্রতি কোনরকম অসম্মান প্রদর্শন করে তাহলে তার পাপস্খলনের জন্য উপজাতিয় বর্ষীয়ান নেতা অথবা ট্র্যাডিশনাল ওঝার শরণাপন্ন হতে হয়। যাকে অসম্মান করা হয়েছে তিনি বেঁচে থাকলে ক্ষমাপ্রার্থনাকারীর হয়ে তিনি তাদের কাছে মাফ চান। বেঁচে না থাকলে তাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। এ সমস্ত বিশ্বাসকে আমার চিরকালই স্বাভাবিক ও সঠিক মনে হয়েছে।

কুনুতে আসার পর প্রথম জনকয়েক শ্বেতাঙ্গের সংগে আমার পরিচয় হয়। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও নিকটবর্তী মুদি দোকানদার দুজনই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। মাঝে মাঝে সাদা চামড়ার পর্যটক ও পুলিশকে আমাদের এলাকায় আসতে দেখতাম। দূর থেকে ওইরকম ধবধবে ফর্সা মানুষ দেখে আমার কেমন ভয় ভয় করত। মনে হতো এরা দেবতাশ্রেণীর মানুষ। এদের প্রতি আমাদের ভয় ও শ্রদ্ধা দুটোই থাকা উচিত। তবে এ ধারণা আমার সত্ত্বায় স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি। যখন শ্বেতাঙ্গদের দেখতাম কেবল তখনই তাদের অন্যরকম শক্তিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে মনে হতো। দৃষ্টির আড়ালে গেলে তারাও মন থেকে হারিয়ে যেত। শ্বেতাঙ্গদের সংগে আমাদের কোন বিবাদও ছিল না, তাদের আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিও ভাবতাম না।

আমাদের ছোট্ট কুনু গ্রামটাতে মাত্র দুটো গোত্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এদের একটি হল আমরা যে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম অর্থাৎ ঝোসা, আরেকটি হলো এমাফেঙ্গু। আমাদের গ্রামে খুব কমসংখ্যক এমাফেঙ্গু বাস করতো। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত শাকা ও জুলু সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল লড়াই বাধে। এই সময়কালকে আফ্রিকানরা *ইফেকেন* বলে। জুলুরা এসময় তাদের সমস্ত গোত্রকে একীভূত করে শাকাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওই সময় শাকাদের পক্ষ নিয়েছিল এমাফেঙ্গুরা। সে কারণে জুলুরা তাদের ওপর চড়াও হয়। জুলুদের ভয়ে এমাফেঙ্গুরা কেপটাউনের পূর্বাঞ্চলে সরে আসে। এমাফেঙ্গুরা মূলত ঝোসাভাষী ছিল না। তারা এখানে ছিল শরণার্থী হিসেবে। সে কারণে জোর করে তাদের দিয়ে এমন সব কাজ করানো হত যা অন্য কোন আফ্রিকান কখনও করতো না।

এরা সাধারণত শ্বেতাঙ্গদের খামারে কাজ করতো, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি রান্নাঘরেও পরিচারকের কাজ করতো। স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত ঝোসারা এ

কারণে তাদের পাত্তা দিত না। কিন্তু ঝোসারা তাদের যতই অবজ্ঞা করুক এমাফেঙ্গুরা সব সময়ই প্রচণ্ড পরিশ্রম করত। ইউরোপীয়দের সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকায় এরাই পরবর্তীতে আফ্রিকান আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ও পশ্চিমা স্টাইলের চালচলনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

আমি যখন বালকবয়সী, তখন এমাফেঙ্গুরা শিক্ষাদীক্ষায় বেশ এগিয়ে গেছে। পুলিশ, শিক্ষক, কেরানী ও দোভাষীসহ নানা ধরণের সরকারি কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিলেন এমাফেঙ্গু। ভালো ঘর বাড়ি তৈরি আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার আশায় আফ্রিকানদের মধ্যে এরাই প্রথম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। এর ফলে তারা দ্রুত সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং ঝোসাদের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যায়। খ্রিস্টান মিশনারীরা এই বলে প্রচার চালাতো যে সভ্য হতে হলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে আর খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে হলে সভ্য হতে হবে। এমাফেঙ্গুরাই প্রথমবারের মতো সাদাদের এই স্লোগান মেনে নেয়। এ সময় এমাফেঙ্গুদের ওপর ঝোসারা চটে ছিল একথা সত্যি; কিন্তু তা বলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ানক কোন সংঘর্ষের ঘটনা কখনই ঘটেনি।

ধর্মান্তরিত হওয়ায় এমাফেঙ্গুদের আমার বাবা মোটেও অবজ্ঞার চোখে দেখতেন না। জর্জ এম্বেকেলা এবং বেন এম্বেকেলা নামের এমাফেঙ্গু সম্প্রদায়ের দুই সহোদর বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

কুনু গ্রামে এই দুই ভাইয়ের কথাবার্তা চালচলন অন্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। এরা দুজনই ছিলেন শিক্ষিত এবং খ্রিস্টমতাবলম্বী। দুই ভাইয়ের মধ্যে জন ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আর তার ভাই বেন ছিলেন পুলিশের সার্জেন্ট। এরা দুজনই খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে বাবাকে বুঝিয়েছেন এবং এ ধর্মগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু বাবা তার বাপদাদার ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টান হতে চাননি। তিনি পূর্বপুরুষের দেবতা ঝোসা ও কোমাতার উপাসনা করতেন। ঝোসা সম্প্রদায়ের অঘোষিত পুরুজিত ছিলেন স্বয়ং আমার বাবা।

বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে পাঠা বলি দেওয়া, নবজাতকের বরণ অনুষ্ঠান, বিয়ে, শেষ কৃত্যানুষ্ঠান, নতুন ফসল ঘরে উঠানোর আনুষ্ঠানিকতা— এসব কিছুতে বাবাকে পৌরহিত্য করতে হতো। ঝোসাদের ঐতিহ্যিক এ লোকধর্মের বৈশিষ্ট্য হল এরা তাবৎ প্রকৃতির পুজারী। এদের ধর্মীয় আচার ও নীতিমালা বলতে যা বোঝায় তার সংগে খ্রিস্টিয়ানিটির কোন মিল নেই। আধ্যাত্মবাদ ও পার্থিব লোকাচারের মধ্যে তাদের ধর্মীয় রীতি খুব একটা পার্থক্য নির্দেশ করে না। এদের না আছে কোন ধর্মগ্রন্থ, না কোন ধর্মীয় জীবন বিধান। এ ধর্ম প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয়েও কোন পার্থক্য নির্দেশ করে না। এ কারণে কোন তন্ত্রমন্ত্র অথবা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন না করেও বাবা সহজেই ধর্মীয় নেতা হয়ে উঠেছিলেন।

এম্বেকেলা ভাতৃদ্বয় বাবার ধর্মীয় বিশ্বাস টলাতে না পারলেও তারা মাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এক সময় মা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। তার

'ফ্যানি' নামটা ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় গীর্জার পাদ্রীরা দিয়েছিলেন। মায়ের ধর্মান্তরের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে এম্বেকেলা ভাতৃদ্বয়ের ধর্ম প্রচারণা। এদের মাধ্যমেই আমি ছেলেবেলাতেই মেথোডিস্ট (সে সময়ে এর নাম ছিল ওয়েসলিয়ান চার্চ) চার্চে ধর্মান্তরিত হই। আমাকে এর পরপরই স্কুলে পাঠানো হয়। এম্বেকেলা ভাইরা প্রায়ই আমাকে মাঠে খেলতে অথবা ছাগল চরাতে দেখতেন। একদিন জর্জ এম্বেকেলা আমাদের বাড়িতে এসে আমার মাকে বললেন, 'আপনার ছেলেটা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত। ওকে স্কুলে পাঠানো উচিত।' তার কথা শুনে মা কোন জবাব দিলেন না। আমাদের পরিবারের কেউ কোনদিন লেখাপড়া করেনি। মা বিষয়টি নিয়ে দ্বিধায় পড়লেন। একবার আমাকে স্কুলে পাঠানো অর্থহীন মনে হল। আরেকবার জর্জের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে হল। তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বাবার সংগে পরামর্শ করলেন। বাবা অশিক্ষিত হলেও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি খানিক ভেবে আমাকে স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে মত দিলেন।

কুনুর পাহাড়ের নিচে এক রুম বিশিষ্ট স্কুল। পশ্চিমা স্টাইলে স্কুলের ছাদ। ঠিকমতো দেয়াল অথবা বেড়া নেই। একপাশ খোলা। সেটাই দরজা, সেটাই জানালা। আমার বয়স তখন ৭ বছর। পরিষ্কার মনে আছে স্কুলে যাবার দিন বাবা আমাকে কাছে ডেকে বলেছিলেন স্কুলে যেতে হলে একটু ভদ্রস্থ পোশাক পরে যাওয়া উচিত। তখন আমি কুনুর অন্যসব ছেলেদের মতো উপজাতিয় পোশাক পরতাম। পোশাক বলতে যা ছিল তা হলো একপ্রস্থ কম্বল। সেটাকে কাঁধের নিচ দিয়ে আড়াআড়িভাবে প্যাচ মেরে কোমরের কাছে এনে গিঁট দিয়ে রাখতাম। স্কুলে ভদ্রস্থ পোশাক পরে যাওয়া উচিত ভেবে বাবা তার একজোড়া পুরনো পাজামা এনে সে দুটোর হাটুর নিচ থেকে কেটে ফেললেন। এই কাটা পাজামা যখন আমাকে পরিয়ে দেওয়া হল তখন দেখা গেল লম্বায় কিছুটা হেরফের হলেও তা পরার উপযোগী। কিন্তু কোমর এত বড় যে তা আর মাজায় রাখা যাচ্ছিল না। বাবা তখন একটা শক্ত দড়ি এনে পাজামার কোমরে শক্ত করে বেঁধে দিলেন। এ সময় হয়তো আমাকে সার্কাসের ভাঁড়দের মতো দেখাচ্ছিল। কিন্তু ওইদিন বাবার নিজের হাতে কেটে দেওয়া পাজামা পরে যে গর্ববোধ করেছিলাম সেরকম আনন্দময় অনুভূতি বাকি জীবনে খুব কমই উপভোগ করেছি।

স্কুলের প্রথম দিনে আমাদের শিক্ষিকা মিস এমডাইনজেন আমাদের সবাইকে একটি করে ইংরেজী নাম দিলেন এবং এখন থেকে স্কুলে এ নামই ব্যবহার করতে হবে। সে সময় ব্রিটিশদের কাছে শিক্ষা নিতে গেলে তারা প্রথমেই এ কাজটি করতো। আমি যে শিক্ষা অর্জন করেছি সেটা ব্রিটিশ শিক্ষা। এর মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ আইডিয়া, ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাকে সর্বোচ্চ ধারণা পোষণ করার জন্য মোটিভেট করা হয়েছে। আমাদের

চেয়ে ব্রিটিশরা অনেক উচ্চস্থানীয় মানুষ ব্রিটিশ শিক্ষার মাধ্যমে তা আমাদের জানানো হয়েছে। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোথাও কোন একটি আফ্রিকান সংস্কৃতিকে ভাল অথবা সভ্য বলে নির্দেশ করা হয়নি।

আমার সময়ে; এমনকি আজকের দিনেও আফ্রিকানদের দুটো নাম থাকে। একটি নাম পশ্চিমা ধাঁচের আরেকটি নাম থাকে আফ্রিকান। শ্বেতাঙ্গরা প্রথম দিকে আফ্রিকান নামগুলো উচ্চারণ করতে পারতো না অথবা উচ্চারণ করতে চাইতো না। তারা আমাদের নামকে 'অসভ্য' নাম বলে মন্তব্য করত। এ কারণে স্কুলের শিক্ষিকা আমাকে বললেন আজ থেকে তোমার নাম 'নেলসন'। এত নাম থাকতে তিনি কেন আমার নাম নেলসন রাখলেন সে প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। হয়তো তিনি ব্রিটেনের মহান নৌ ক্যাপ্টেন লর্ড নেলসনের কথা মনে করেই আমার এ নামটি দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা শুধু আন্দাজের কথা। এটা সত্য হতেও পারে; নাও পারে।

৩

আমার বয়স তখন মাত্র ৯ বছর। একদিন রাতে হৈচৈ শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। উঠে শুনি মায়ের কুড়েঘর থেকে কেমন কান্নামতো আওয়াজ আসছে। ভেতরে গিয়ে দেখলাম বাবা মেঝের ওপর শোয়া। অবিরাম কাশছেন। গ্রাম প্রধানের চাকরি চলে যাওয়ার পর অর্থাভাবে বাবা বেশ কিছুদিন তার চার স্ত্রীকে ভরণ পোষণের খরচ দিতে পারেন নি। সে কারণে তিনি আমাদের নিয়মিত দেখতে আসতেন না। সম্প্রতি তিনি সেই দায়িত্ব আবার পালন করা শুরু করেছিলেন। মাসের চার সপ্তাহ চার স্ত্রীর কুড়েতে কাটাতেন। নিয়মিত খরচ-পাতিও দিতেন। যে রাতের কথা বলছি সেদিন তার মায়ের বাড়িতে আসবার কথা ছিল না। সময়সূচী ভেঙে তিনি মায়ের কাছে এসেছিলেন। বয়সে খুব ছোট হলেও শয্যাশায়ী বাবাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম তিনি আর এ যাত্রায় টিকবেন না। বাবা বক্ষ্যব্যাধিতে ভুগছিলেন বহুদিন ধরে। কিন্তু যেহেতু তিনি কোনদিন ডাক্তার দেখাতেন না, সেহেতু তার রোগ পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। মায়ের ওই কুড়েঘরে অসুস্থ্য বাবা টানা কয়েকদিন কোন কথা না বলে ও নড়াচড়া না করে সটান পড়ে রইলেন। একদিন রাতে অবস্থার আরও অবনতি হল। আমার মা আর বাবার ছোটবউ নোদাইমানি তাকে সেবাযত্ন করছিলেন। শেষরাতের দিকে বাবা নোদাইমানিকে ডেকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি আমার তামাক সেজে দাও।' একথা শুনে আমার মা আর নোদাইমানি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে এ অবস্থায় তাকে তামাক সেবন করতে দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু বাবা বারবার তাদের পাইপে তামাক ভরে দেওয়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন। তার পীড়াপীড়িতে নোদাইমানি পাইপে তামাক ভরে

তাতে অগ্নিসংযোগ করে বাবার হাতে দিলেন। এতক্ষণ বাবা অবিরাম কেশে যাচ্ছিলেন। পাইপে টান দিতেই তিনি কিছুটা শান্ত হলেন। কাশিও বন্ধ হল। প্রায় এক ঘন্টা ধরে তিনি পাইপ টানছিলেন। পাইপ টানতে টানতেই হঠাৎ খিঁচুনি ওঠে। কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যান তিনি। বাবা যখন মারা যান তখনও পাইপের আগুন জ্বলছিল।

বাবার মৃত্যুতে আমি খুব শোকাহত হয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। আমার অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন আমার মা। পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতার পরিচয়কে ব্যবহার করতে হত। কিন্তু মাই আমার লালন পালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বাবাকে কোনদিন খুব কাছে পাইনি বলেই হয়তো তার চলে যাওয়া আমার জন্য গভীর শোকের কারণ হয়নি। তবে তার মৃত্যুই যে আমার জীবন আমূল বদলে দিতে যাচ্ছে তা তখন টের পাইনি। সংক্ষিপ্ত শোকবিহ্বল সময় কাটিয়ে ওঠার পর মা আমাকে কাছে ডেকে বললেন, আমাকে কুনু গ্রাম ছাড়তে হবে। কেন গ্রাম ছাড়তে হবে, কোথায় যেতে হবে আমি সেসব কিছুই তখন মাকে জিজ্ঞেস করিনি।

জামাকাপড় আর জিনিসপত্র বলতে যা ছিল সব একটা পুটলিতে বেঁধে এক সকাল বেলা আমার মা আমাকে নতুন ঠিকানায় রেখে আসার উদ্দেশ্যে আমাকে সংগে নিয়ে পশ্চিমে রওনা হলেন। বাবাকে হারিয়ে যত না কষ্ট পেয়েছিলাম আমার এই স্বপ্নের পৃথিবী ছাড়তে হচ্ছিল বলে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছিলাম। বুঝতে শেখার শুরু থেকেই আমি কুনুতে ছিলাম। আমার সমস্ত ভালোবাসা কুনুর প্রতিটি পাহাড় বৃক্ষের সংগে এক হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে এ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া আমার জন্য ছিল মর্মান্তিক; বেদনাদায়ক। পাহাড়ের আড়ালে নিজের গ্রামকে ফেলে আসার আগে দূর থেকে একবার তাকে চোখ ভরে দেখে নিলাম। আমার মনে হচ্ছিল এ গ্রামে আমার সম্ভবত আর কোনদিনই ফেরা হবে না। আমি দূর থেকে দেখছিলাম ছোট ছোট কুড়েঘর। লোকজন মাঠে যাচ্ছে। একটি শুভ্র রেখার মতো কুনুর ছোট খালটি বয়ে চলেছে যেখানে আমি দিনের পর দিন খেলার সাথীদের সাথে বন্য সাঁতারে কাটিয়ে দিয়েছি। দেখলাম সামনে দিগন্ত জোড়া গম আর যবের ক্ষেত যেন ঘুমিয়ে আছে। তার শরীর বেয়ে অসংখ্য ছাগল, মেষ আর ভেড়ার দল চড়ে বেড়াচ্ছে। বন্ধুদের সংগে দল বেধে পাখি শিকার করা, গাভীর ওলানে মুখ দিয়ে সুমিষ্ট দুগ্ধধারার আস্বাদ নেওয়া, পুকুরে অবাধ সাঁতারে হারিয়ে যাওয়ার সব কথা আমাকে তন্ময় করে ফেললো। সর্বোপরি, গাঁয়ের তিনটি কুড়ের দিকে চেয়ে আমার বুকটা হু হু করে উঠলো। ওই তিনটে কুড়েঘরে আমার মা আর ভাইবোনদের সংগে আমার যে কত শত মধুর স্মৃতি লুকিয়ে আছে তার কোন শেষ নেই। হঠাৎ আমার মনে পড়লো বাড়ি ছেড়ে আসার সময় সবাইকে আমি চুমু খেয়ে আসিনি। আমি হয়তো তখন বুঝতে পারিনি, যাদের ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে তাদের আমি কী ভীষণভাবে ভালোবাসি।

যাহোক, মায়ের সংগে খালি পায়ে হেঁটে এগুতে থাকলাম। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়া পর্যন্ত হাঁটতেই থাকলাম। এর মধ্যে মা ছেলের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় হলই না। দুজনই নিঃশব্দে হাঁটছিলাম। কথা না বললেও আমাদের দুজনেরই হৃদয় নিশ্চুপ ছিল না। তারা যেন এক অদৃশ্য তরঙ্গের মধ্যে অনর্গল নিঃশব্দে কথা বলে যাচ্ছিল। এমনিতেই মা আর আমার মধ্যে খুব বেশি কথাবার্তা হতো না। তার খুব একটা প্রয়োজনও ছিল না। তিনি আমার সংগে কম কথা বলতেন বলে আমার প্রতি তার ভালোবাসা কম ছিল একথা আমি কস্মিনকালেও ভাবিনি। তার স্নেহ মমতা নিয়ে আমার মধ্যে কোনদিন প্রশ্ন জাগেনি। পশ্চিমের উদ্দেশ্যে মা ছেলের এই যাত্রা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ও বিড়ম্বনাপূর্ণ। উঁচু নিচু পাথুরে পাহাড়ি পথ। হাঁটতে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে মাঝে যাত্রাপথে বেশকয়েকটা গ্রাম সামনে পড়েছিল। কিন্তু আমরা হাঁটা থামাইনি। সন্ধ্যার একটু আগে আমরা বৃক্ষশোভিত একটা উপত্যকার নিচে একটা গ্রামে এসে পৌছলাম। গ্রামের ঠিক মাঝখানে আসামাত্র বিশাল একটা বাড়ি চোখে পড়ল।

এত বড় আর বিলাসবহুল বাড়ি আমি আগে কখনও দেখিনি। বাড়িটার মূল ভবনের দুটি *ইংজানদি* (চারকোণাকৃতির ঘর) এবং এর দুপাশে সাতটা কুড়েঘরের মতো ঘর। বলাবাহুল্য ভবনটি ছিল পাকা। এর দেয়ালে চুনকাম করা ছিল। পড়ন্ত বিকেলের তীর্যক আলো দেয়ালে পড়ে চক চক করছিল। বাড়িটার সামনে বিরাট একটা যব ক্ষেত আর একটা ফলের বাগান। বাগানে অসংখ্য পীচ ফল ধরে রয়েছে। বাড়ির পেছনে ছিল আপেল বাগান, সবজির ক্ষেত আর গোলাপের ঝাড়। বাড়ির পাশেই একটা সাদা গীর্জা।

এ বাড়িতে ঢুকতে যে মূল গেট অতিক্রম করতে হয় তার দুপাশে দুটো বড় গাম ট্রি ছিল। ঢোকার সময় দেখলাম ওই গাছ দুটোর ছায়ায় প্রায় বিশজন উপজাতিয় বয়স্ক লোক বসা। বাড়ির সীমানারেখার বাইরে শত শত একর উর্বর জমি। এ বাড়ির বিশাল খামারে প্রায় পঞ্চাশটা গরু আর পাঁচশ'র ওপরে ভেড়া দেখলাম। এখানকার বিত্ত বৈভব ও জৌলুসের বিষয়টি আমার ধারণারও বাইরে ছিল। পরে মায়ের কাছে জানলাম এটা কোন সাধারণ আবাসিক ভবন নয়। থেম্বু ল্যান্ডের প্রাদেশিক রাজধানী এমখেকেজওয়েনির প্রধান জনজিনতাবা দালিনদিয়েবোর রাজকীয় বাসভবন। ইনি থেম্বু গোষ্ঠীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আমি যখন অবাক বিস্ময়ে চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছি আর এখানকার বিলাসবহুল পরিবেশ দেখে সাতপাঁচ ভাবছি, এমন সময় পশ্চিম গেট দিয়ে বিশাল আকৃতির একটা মোটর গাড়ি ঢুকলো। গেটের পাশে ও শেডের নিচে যারা বসা অথবা দাঁড়ানো ছিল তারা হুড়মুড় করে গাড়ির দুপাশে এসে দাঁড়ালো। মাথার টুপি খুলে সবাই কুর্নিশ করে ঝোসারা যেভাবে তাদের প্রধানদের অভিনন্দন জানায় সেভাবে একসাথে বলে উঠলো, *'বেয়েতে আ-আ-আ-জনজিনতাবা!'* (জনজিনতাবা

জিন্দাবাদ!) মোটরগাড়ি থেকে (পরে জেনেছি ওটা রাজকীয় ফোর্ড ভি এইট ব্রান্ডের গাড়ি) লম্বায় খাটো আর হাল্কা পাতলা গড়নের একজন মানুষ নেমে এলেন। তার গায়ে ছিল কেতাদূরস্ত স্যুট। গায়েগতরে ছোট দেখা গেলেও তার চেহারায় পূর্ণাঙ্গ আত্মবিশ্বাস দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার বিষয়ে তিনি অভ্যস্ত। তার নামই তার পরিচয় বহন করে। আফ্রিকান শব্দ জনজিনতাবার মানে হলো 'পর্বতের দিকে চেয়ে থাকা উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক'। তার ব্যক্তিত্ব দেখে পর্বতের মতোই মনে হল। তার দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে সবাইকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। তার গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এবং চেহারায় বুদ্ধিদীপ্ততা স্পষ্ট। গাড়ি থেকে নামার পর তিনি নিচের অপেক্ষমান লোকগুলোর সংগে খুব ক্যাজুয়ালি হ্যান্ডসেক করলেন। পরে জেনেছি এরা সবাই ছিলেন থেম্বু আদালতের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। তখন আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি এই রাজপ্রতিনিধিই আমার অভিভাবক হতে যাচ্ছেন এবং পরবর্তী এক যুগকাল ধরে তিনিই প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আমার দায়িত্ব নেবেন।

ছোট কোন গাছকে ডালপালাসহ উপড়ে ফেলে তাকে যদি নদীতে ছুঁড়ে ফেলা হয় তাহলে সেই গাছের যেমন প্রবল ঢেউকে বাধাগ্রস্ত করার কোন ক্ষমতা থাকে না; রাজপ্রতিনিধির এই ক্ষমতা ও প্রতাপ দেখে আমার তেমনটাই অনুভূতি হল। ভয় এবং হতবুদ্ধিতার এক মিশ্র অনুভূতি আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। ইতিপূর্বে খেলাধূলা ছাড়া আর কিছুকেই আমি বিনোদন হিসেবে ভাবিনি। পেটপুরে খাওয়া আর লাঠি খেলায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া আর কোন উচ্চাশা ছিল না। অর্থ, বিত্ত, সম্মান, ক্ষমতা এসবের অর্থও তখন বুঝতাম না। কিন্তু হঠাৎই যেন একটা নতুন পৃথিবীর দরজা আমার সামনে খুলে গেল। খুব দরিদ্র পরিবারের বাচ্চাদের সামনে দামী খাবার, কাপড় চোপড় আর বিলাসবহুল খেলনা আনলে তারা সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমিও ব্যতিক্রম ছিলাম না। রাজ প্রতিনিধির এই ক্ষমতা আর রাজকীয় চালচলন দেখে আমার পিতা মাতা আমাকে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষাশূন্য একটি বায়বীয় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন তা কেঁপে উঠলো। প্রথমবারের মতো মনে হল, লাঠি খেলায় চ্যাম্পিয়ন হওয়াই শেষ কথা নয়। এর চেয়ে আরও অনেক অনেক বড় সাফল্য আমাকে ছিনিয়ে আনতে হবে।

পরে জেনেছি, বাবার মৃত্যুর খবর শুনে জনজিনতাবা আমাকে পোষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে মায়ের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। মাকে জানিয়েছিলেন আমাকে তার কাছে পাঠালে তিনি তার আপন ছেলেমেয়েদের মতো আমাকেও লেখাপড়া শেখাবেন। তার ছেলেমেয়ে যেভাবে থাকে আমাকেও সেভাবে রাখবেন। তার এ প্রস্তাবে রাজী হওয়া ছাড়া মায়ের কোন পথ খোলা ছিল না। বাবা মারা যাওয়ায় আমাকে লালনপালনের খরচ দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার ওপরে রাজবাড়িতে গিয়ে নিজের ছেলে থাকবে-খাবে এটা তার জন্য অবশ্যই সুখের খবর ছিল। আমাকে যদিও তিনি খুব মিস করবেন তারপরও ছেলের ভবিষ্যতের

কথা ভেবে মা আমাকে তার কাছে রেখে আসারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমার বাবা থেম্বু প্রাসাদের একজন উচ্চপদস্থ কূটনীতিক হওয়ায় তিনি আমাকে বিশেষ যত্ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

আমাকে এমখেকেজওয়েনিতে রেখে কুনুতে ফিরে যাওয়ার আগে মা এখানে দিন দুয়েক থাকলেন। কোনরকম বিদায়ী আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই তারপর একদিন চলে গেলেন। যাবার সময় কোনরকম কান্নাকাটি করলেন না। কোন উপদেশবাণী দিলেন না। আমাকে চুমুও খেলেন না। চুপচাপ চলে গেলেন। আমার ধারণা এরকম আচরণের মাধ্যমে তিনি আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি খুব দূরে চলে যাচ্ছেন না; তার এ যাওয়াটা কোন বেদনার বিষয় নয়।

আমি জানতাম, আমার মা চেয়েছিলেন আমি যেন উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হই; আমার যেন জগৎজোড়া নাম হয়। কিন্তু মা ভালো করেই জানতেন কুনুতে থাকলে সেটা কোনভাবেই সম্ভব হবে না। তার মমতামাখা দৃষ্টি আমার বড় প্রয়োজন ছিল। তিনি তা জানতেন। যাওয়ার সময় শুধু বলে গেলেন, *'উকিনিসু ফোকোযো; কেওদিনি!'* (বড় হও, সোনা মানিক!)। ছোট্ট শিশুরা সব সময়ই নতুনত্বের প্রতি খুব বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। বিশেষ করে নতুন পরিবেশ পেলে তারা আত্মভোলা হয়ে যায়। মা যখন আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন তখনও আমার মধ্যে আমার নতুন ঘরবাড়ি পাওয়ার আনন্দ কিলবিল করছিল। মায়ের চলে যাওয়ায় আমি কান্নাকাটি অনুভবই করতে পারছিলাম না। আমার গায়ে তখন সদ্য কেনা দামী পশ্চিমা পোশাক। ভালোভাবে খাবার খেয়ে তখন আমি সাংঘাতিক খুশি মনে রয়েছি। মায়ের বিয়োগব্যথা অনুভব করার সময় কোথায়?

এমখেকেজওয়েনির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সংগে আমি দ্রুত তাল মিলিয়ে ফেললাম। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এরা নতুন পরিবেশে হয় দ্রুত খাপ খাইয়ে নেয় নয়তো কোনদিন পারে না। নতুন রাজবাড়িতে এসে আমি শিগগিরই এই পরিবেশের সংগে এমনভাবে মিশে গেলাম যেন এখানেই আমার জন্ম হয়েছে।

এ বাড়িটা আমার কাছে ছিল এক জাদুর রাজ্য। এখানকার প্রত্যেকটি জিনিসই আকর্ষণীয়; আনন্দদায়ক। কুনুতে থাকতে যা আমার কল্পনারও অতীত ছিল এমখেজেওয়েনিতে তা আমি হাতের মুঠোয় পেয়েছিলাম। স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগের দিনগুলোতে আমি কখনও ছিলাম এক চাষা বালক, কখনও ওয়াগন গাইড কখনও বা রাখাল শিশু। গাধা অথবা ঘোড়ার পিঠে চড়তাম, এক নিশানায় পাখি শিকার করে মাটিতে ফেলে দিতাম। সন্ধ্যায় থেম্বু মহিলারা উঠোনে বসে যখন হাততালি দিয়ে গান গাইতো তখন তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচতাম। সব সময় মা আর কুনু'র কথা মনে পড়লেও এই নতুন জগতে আমি সুখেই দিন কাটাতে লাগলাম।

রাজপ্রাসাদের বাইরেই বিরাট এক কক্ষবিশিষ্ট স্কুল ছিল। আমাকে সেখানে ভর্তি করা হল। সেখানে ইংরেজী, ঝোসা, ইতিহাস ও ভূগোল পড়ানো হত। 'চেম্বার্স

ইংলিশ রিডার' নামে আমাদের বাল্যশিক্ষার বই ছিল। সেখান থেকে পড়া মুখস্থ করে কালো স্লেটে সেগুলো লিখতে হতো। আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে প্রথমে মিস্টার ফাদানা ও পরে মিস্টার গিকবা আমার শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দিলেন। পড়াশুনায় ভালো করছিলাম। অবশ্য এর কৃতিত্ব আমার নয়। প্রাসাদে ফাদিউই নামে এক খালা থাকতেন। তিনি প্রতি রাতে হোমওয়ার্ক করার জন্য আমাকে কঠোর অনুশাসনে রাখতেন। তার কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার জন্য স্কুলের পড়া ঠিক ঠিক ভাবে আমাকে তৈরি করতে হতো।

এমখেকেজওয়েনি ছিল মেথোডিস্ট চার্চের মিশন স্টেশন। তবে কুনুতে তাদের যে মিশন স্টেশন ছিল সেটা এটির চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়া ও অ-পশ্চিমা স্টেশন। এখানে সবাই আধুনিক জামাকাপড় পরে। পুরুষরা পরে স্যুট আর মেয়েরা লম্বা স্কার্টের সংগে কলার ওয়ালা ব্লাউজ। তাদের মাথায় স্কার্ফ; আর একটা চাদর কাঁধের দুপাশে ঝুলিয়ে দেওয়া থাকে।

পুরো এমখেকেজওয়েনির জগৎ আবর্তিত হচ্ছিল রাজ্যপ্রধানকে কেন্দ্র করে আর আমার জগৎ আবর্তিত হচ্ছিল তার ছোট ছেলে মেয়েকে ঘিরে। তার দুটো ছেলে মেয়ে ছিল। ছেলেটার নাম জাস্টিস। সেই ছিল রাজপ্রতিনিধির একমাত্র উত্তরাধিকারী। মেয়েটার নাম নোমাফু। প্রায় সমবয়সী হওয়ায় আমি তাদের সংগেই থাকতাম। বাড়িতে ওদের যেভাবে লালন-পালন করা হতো আমাকেও ঠিক একইভাবে দেখভাল করা হতো। তারা যা খেত আমাকেও তাই খেতে দেওয়া হত। তারা যা পরতো আমাকেও একই পোশাক দেওয়া হত।

পরে আমাদের সংগে যুক্ত হল সাবাতার বড় ভাই এনজেকো। এই চারজন মিলে আমরা চারমূর্তি হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হলাম। রাজপ্রতিনিধি আর তার স্ত্রী আমাকে তাদের নিজের সন্তানের মতো গ্রহণ করেছিলেন। গভীর স্নেহ থেকেই তারা আমার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতেন, ভালোবাসতেন আবার শাস্তিও করতেন। জনজিনতাবা কঠোর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রুক্ষ আচরণ করলেও আমার প্রতি তার ভালোবাসার বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। তারা আমাকে *তাতোমখুলু* নামে ডাকতেন। তাতোমখুলু মানে 'বুড়ো দাদু'। আমি যখন কথা বলতাম তখন নাকি আমাকে বড়দের মতো গম্ভীর আর সিরিয়াস মেজাজের মনে হতো। সে কারণেই তারা ওই মজার নাম দিয়েছিলেন।

জাস্টিস ছিল আমার চেয়ে চার বছরের বড়। বাবার পর আমার কাছে সেই ছিল নায়ক। সব সময় আমি তাকে অন্যদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার চোখে দেখতাম। জাস্টিস তখন ৬০ মাইল দূরের একটা বোর্ডিং স্কুলে পড়তো। দীর্ঘাংগী, পেশীবহুল ও হ্যান্ডসাম জাস্টিস পড়াশুনা খেলাধুলা সবকিছুতেই দক্ষ ছিল। খুব ভালো ট্র্যাকিং করতে পারতো সে। ক্রিকেট, রাগবি, ফুটবল সব খেলায় সে ছিল প্রথম শ্রেণীর। এছাড়া সে ছিল এক ধরণের স্বভাবকবি টাইপের ছেলে। সে যখন কবিতা পড়ত অথবা গান গাইতো তখন সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতো। সে যখন বলরুমে নাচতো তখন সবাই তার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকিয়ে থাকতো।

একসংগে এতগুলো গুণ থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তার অনেক মেয়ে ভক্ত জুটে গিয়েছিল। তার প্রশংসাকারীর পাশাপাশি সমালোচকদেরও অভাব ছিল না। ঈর্ষা করে অনেকেই তাকে মেয়ে পটাতে ওস্তাদ বাউণ্ডুলে ছেলে বলতো। জাস্টিস ও আমি দুজনে খুব ভালো বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম যদিও আমাদের মধ্যে অনেক চরিত্রগত অমিল ছিল। যেমন, ও ছিল বহির্মুখী স্বভাবের, আমি ছিলাম অন্তর্মুখী প্রকৃতির।

সে ছিল হাল্কা মেজাজের ছেলে কিন্তু আমি বরাবরই সিরিয়াস টাইপের ছিলাম। সফলতা সহজেই তার হাতে এসে ধরা দিতো আর আমাকে তার জন্য কঠোর সাধনা করতে হতো। একটা ছেলের মধ্যে যত গুণ থাকা উচিত বলে আমার মনে হতো এবং যেসব প্রতিভার জন্য আমি মনে মনে সাধনা করতাম তার সবটাই জাস্টিসের মধ্যে ছিল। আমাদের একইরকম লালন-পালন করা হলেও আমাদের দুজনের জীবনের গন্তব্য ছিল দুই ধরণের। জাস্টিসের উত্তরাধিকার সূত্রে থেম্বু উপজাতিয় প্রধান হওয়ার কথা। অন্যদিকে রাজপ্রতিনিধি বা আমার পালক পিতা আমাকে যা বানাতে চায় আমাকে তাই হতে হবে।

রাজপ্রতিনিধি মানে আমার পালক পিতা বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে এবং তার ফিরে আসার পরে আমাকে প্রতিদিনই তার কিছু কাজ করে দিতে হতো। আমি তার যেসব কাজ করে দিতাম, তার মধ্যে সবচেয়ে পছন্দের কাজ ছিল স্যুট ঝেড়ে দেওয়া। এ কাজটা করার সময় রীতিমতো আমার গর্ব হত। তার প্রায় হাফ ডজন স্যুট ছিল। এগুলো সাবধানে ভাঁজ করতে আমার কমপক্ষে আধঘণ্টা সময় লেগে যেতো। দুটো বিশাল টিনের ছাদওয়ালা ঘর নিয়ে ছিল 'রাজপ্রাসাদ'। দুটো ঘরই ছিল পশ্চিমা কায়দায় বানানো। তখনকার দিনে খুব কম আফ্রিকানের বাড়িতে পশ্চিমা কায়দার ঘর ছিল। যার বাড়িতে এ ধরণের ঘর ছিল তাকে অত্যন্ত সম্পদশালী বলে মনে করা হতো। রাজবাড়ির ঘরের মেঝে ছিল কাঠের তৈরি। কাঠের পাটাতনের মেঝের অনেক নিচে ছিল মাটি। অর্থাৎ ভূমি থেকে মেঝে বেশ উঁচুতে ছিল। এর আগে আমি কাঠের মেঝে দেখিনি। মূল প্রাসাদে ছয়টি বড় বড় কক্ষ ছিল। রাজ্যপ্রধান ও রানী দক্ষিণ ঘরে ঘুমাতেন। প্রাসাদের মাঝখানের ঘরটাতে থাকতেন রানীর এক বোন। বামপাশের ঘরটা এ বাড়ির খাদ্যগুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হত। রানীর বোন যে ঘরে থাকতো তার মেঝের নিচে মৌমাছি চাক বেঁধেছিল। আমরা প্রায়ই তার ঘরে ঢুকে পাটাতনের একটা দুটো কাঠ সন্তর্পণে সরিয়ে চাক থেকে মধু চুরি করে খেতাম। আমি এ বাড়িতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই থেম্বু প্রধান ও রানী মাঝের ঘরে চলে এলেন। কাজেই সেটা অটোমেটিকভাবেই গ্রেট হাউসে পরিণত হল। বাকি তিনটা ঘরের একটিতে থাকতেন থেম্বু প্রধানের মা, একটিতে অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা ছিল আর সর্বশেষ ঘরে থাকতাম আমি আর জাস্টিস।

এমখেকেজওয়েনিতে থাকাকালীন দুটি আদর্শিক অনুশাসন আমার জীবনকে পরিচালনা করেছে। এর একটি হলো গোত্রপ্রধানগিরি বা রাজনীতি আরেকটি হলো গীর্জার অনুশাসন। এ দুটি আদর্শ পরস্পরবিরোধী এবং একটির সংগে

আরেকটি তেমন একটা মানানসই নয়। অবশ্য সে বয়সে আমি এসব নিয়ে এত ভাবিনি। আমি কখনওই খ্রিস্টিয়ানিটিকে কঠোর ধর্মবিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করিনি, এটা আমার কাছে কঠোর অনুসরণযোগ্য কোন ধর্মপদ্ধতিও ছিল না। কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের কাছে খ্রিস্টিয়ানিটি এক অবশ্য অনুসরণীয় ধর্মমত। তেমনই একজন হলেন রেভারেন্ড মাতিওলো। তাকে দেখলেই আমার মনে হতো তিনি সর্বত্র ঈশ্বরকে দেখতে পেতেন। আমার দত্তক পিতার মতো তিনিও ব্যাপক জনপ্রিয় লোক ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ওপর মাতিওলোর প্রভাব ছিল অনেকগুণ বেশি। সাধারণ জনগণের ওপর তার এই অসাধারণ প্রভাব বিস্তারী ক্ষমতা আমার মনোজগতে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। শ্রদ্ধেয় ধর্মযাজক হিসেবে সবাই মাতিওলোকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতো।

তার অসাধারণ বাচনভঙ্গিতে সবাই তার প্রতি ঝুঁকে পড়তো। আমি লক্ষ্য করলাম, আফ্রিকানদের যাবতীয় সাফল্য চার্চের মিশনারি কাজের ফলাফল হিসেবে বেরিয়ে আসছে। সর্বত্র গীর্জার সংস্কারমূলক উদ্যোগের ছাপ রয়েছে। সরকারি কর্মচারি, দোভাষী, পুলিশসহ আফ্রিকানদের যারা প্রতিনিধিত্ব করে তাদের সবাইকে চার্চ থেকে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

পঞ্চাশের কোঠার মানুষ হলেও যথেষ্ট শক্তসমর্থ ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিলেন রেভারেন্ড মাতিওলো। তার মিষ্টি অথচ দরাজ কণ্ঠের কারণে তিনি একদিকে যেমন সুন্দর ধর্মসংগীত গাইতে পারতেন অন্যদিকে ধর্মতত্ত্বের ওপর ভালো বক্তৃতাও করতে পারতেন। এমখেকেজওয়েনির সর্বপশ্চিমে অবস্থিত একটা গীর্জায় ধর্মকথা শোনাতেন মাতিওলো। তার কথা শোনার জন্য হলরুম কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠতো। বিশ্বাসীদের গুঞ্জনে হলরুম গমগম করতো। মহিলারা পাপস্খলনের জন্য তার পায়ের নিচে গিয়ে পড়তো। রাজবাড়িতে আসার পর তার সম্পর্কে আমি প্রথম যে গল্পটা শুনেছিলাম সেটা হল, তিনি নাকি একবার শুধুমাত্র বাইবেল আর লণ্ঠনের সাহায্যে এই এলাকা থেকে ভয়ঙ্কর এক ভূতকে তাড়িয়েছিলেন। এ গল্প আমার বিশ্বাসও হয়নি অবিশ্বাসও হয়নি। মাতিওলো খ্রিস্টিয়ানিটি সম্পর্কে যখন বক্তৃতা করতেন তখন শুধু বাইবেল যীশু আর ঈশ্বরকে মাথায় রাখতেন না। যেহেতু এখানকার মানুষ আফ্রিকান জড়বাদ বা সর্বপ্রাণবাদে বংশপরম্পরায় বিশ্বাসী ছিল সে কারণে তিনি খ্রিস্টিয়ানিটির সংগে জড়বাদকে মিলিয়ে বক্তব্য দিতেন। সর্বপ্রাণবাদীদের মতো তিনি বলতেন ঈশ্বর মহাজ্ঞানী এবং প্রকৃতির সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সবার পালনকর্তা। কিন্তু কেউ পাপ করলে তিনি তাকে অবশ্যই শাস্তি দেন।

কুনুতে থাকতে আমি মাত্র একবার গীর্জায় গিয়েছিলাম; ধর্মান্তরের জন্য আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল। মায়ের কারণেই আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল। সে বয়সে ধর্মান্তর তো দূরের কথা ধর্মের মানে কী তাই তো জানতাম না। কিন্তু

এমখেকেজওয়েনিতে আসার পর ধর্মচর্চা আমার জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছিল। প্রতি রোববার আমার ধর্মপিতা আর তার স্ত্রীর সংগে আমাকে গীর্জায় যেতে হতো। আমার ধর্মপিতা ধর্মচর্চাকে খুব গুরুত্বের সংগে নিয়েছিলেন। ওই বাড়িতে থাকার সময় আমি মাত্র একবার সাপ্তাহিক প্রার্থনায় যাইনি। আমাদের গ্রামের ছেলেদের সংগে পাশের গ্রামের ছেলেদের মারামারি বেধে গিয়েছিল। সেদিন ছিল রোববার সাপ্তাহিক প্রার্থনার দিন। আমি ফাঁকি দিয়ে ওই মারামারিতে অংশ নিয়েছিলাম। অবশ্য এর জন্য আমাকে প্রচুর গালমন্দ শুনতে হয়েছিল। তবে এর পরে আর চার্চের হাজিরা ফাঁকি দেই নি।

মাতিওলোর বিরাগভাজন হওয়ার মতো এটাই আমার সর্বশেষ কাজ নয়। আরও অনেক দুষ্টুমি করেছি যা বড়দের আহত করবে। একদিন বিকেলে আমি মাতিওলোর ভুট্টা ক্ষেতে ঢুকে পড়েছিলাম। ভুট্টা ছিড়ে সেখানেই আগুন জ্বালিয়ে তা সেদ্ধ করে খেয়েছিলাম। একটা কিশোরী মেয়ে আমাকে চুরি করে পোড়ানো ভুট্টা খেতে দেখে মাতিওলোর কাছে গিয়ে বলে দিল। এ খবর আমার ধর্ম মায়ের কাছে পৌছতে সময় লাগলো না। বাড়িতে ফেরার পর প্রথমে তিনি কিছু বললেন না। সন্ধ্যায় প্রার্থনা শেষ করার পর তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'ঈশ্বরের এক দরিদ্র সেবকের রুটি রুজিতে হাত দিয়ে তুমি শুধু পাপই করনি, এর মাধ্যমে তুমি রাজবাড়ির মান সম্মানও নষ্ট করেছো'। তিনি বললেন, আমার এই পাপকর্মে খুশি হয়ে শয়তান নাকি তার দলে আমাকে নিয়ে নেবে। তার কথায় আমার ভয় ও লজ্জার এক মিশ্র অনুভূতি হল। ছোটবেলা থেকেই সর্বপ্রাণবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলাম। সেদিন থেকে নিজেকে পাপী মনে হওয়ায় ভয় পেলাম। অন্যদিকে, এ কাজের মাধ্যমে আশ্রয়দাতাদের ছোট করা হয়েছে ভেবে ভীষণ লজ্জা পেলাম।

শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় শ্রেণীর কাছ থেকে আমার রাজ্য প্রধান ধর্মপিতাকে শ্রদ্ধা পেতে দেখে এবং তার নেতৃত্বের ক্ষমতা উপলব্ধি করতেই আমার মনে হল নেতৃত্বকে ঘিরেই মানবজীবন আবর্তিত হয়। এমখেকেজওয়েনিতে আমাদের প্রতিদিনকার জীবন দলপ্রধান, গোত্রপ্রধান অথবা রাজ্যপ্রধানকে ঘিরে চলছে। যে শীর্ষ নেতৃত্বে রয়েছে সে সামাজিক প্রভাব ও সম্মান অর্জন করতে পারছে।

পরবর্তীকালে আমার জাতীয় নেতৃত্বে আসার পেছনে এ পরিবারের সীমাহীন প্রেরণা রয়েছে। রাজ্যপ্রধানের ক্ষমতা ও প্রভাব খুব কাছ থেকে দেখার পর এ বিষয়ে আমার প্রচণ্ড আগ্রহ তৈরি হয়। রাজবাড়িতে উপজাতিয় নেতাদের বৈঠক বসত। আমি প্রত্যেক বৈঠকে হাজির থাকতাম। ধরাবাধা নির্দিষ্ট সময়ে ওই বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হতো ব্যাপারটা সে রকম নয়। জরুরি প্রয়োজন অথবা কোন সংকট দেখা দিলে স্থানীয় নেতারা সেখানে জড়ো হয়ে আলোচনা করতেন। প্রাকৃতিক দূর্যোগ, গরু নিধন, ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশিত নীতিমালা অথবা সরকার ঘোষিত নতুন আইন পর্যালোচনার মতো জাতীয় ইস্যুতে তারা

বৈঠক করতেন। বেশিরভাগ মিটিংয়ে হাজির থাকার ব্যাপারে বিধি নিষেধ ছিল না। সবাই উপস্থিত থাকতে পারতো। এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোক আসতো। কেউ আসতো পায়ে হেঁটে কেউবা ঘোড়া-গাধার পীঠে চড়ে।

এসব বৈঠকে রাজ্যপ্রধানের চারপাশে থাকতেন তার *অ্যামাফাকাথিরা*। এরা হলেন তার প্রধান মন্ত্রণাদাতা গোষ্ঠী। তারা তার পার্লামেন্ট ও জুডিশিয়ারি হিসেবেও কাজ করতেন। বর্ষীয়ান এসব লোক উপজাতিয়দের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান রাখতেন এবং মিটিংয়ে তাদের মতামতকে সাংঘাতিক গুরুত্ব দেওয়া হতো।

মিটিংয়ের আগে রাজ্যপ্রধান বিভিন্ন গোত্রপ্রধানের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিতেন। তারা অন্যান্য প্রতিনিধিদের জানাতেন। নির্ধারিত সময়ে থেম্বুল্যান্ডের সব জায়গা থেকে লোকজন এসে যেত। গমগম করে উঠতো সমস্ত বাড়িটা। অবশ্য অতিথিদের ইচ্ছেমতো বাড়িতে ঢুকে পড়ার রেওয়াজ ছিল না। তারা সবাই প্রথমে রাজবাড়ির বাইরে জড়ো হতো। রাজ্যপ্রধান এসে সদর দরজা খোলার নির্দেশ দিতেন। দরজা খুলে দিলে তিনি তাদের তলব করার কারণ বলতেন এবং ভেতরে আসার অনুমতি দিতেন। মিটিং শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি আর কথা বলতেন না।

মিটিংয়ে যে কেউ মতামত প্রকাশ করতে পারতো। এটা ছিল গণতন্ত্র চর্চার শুদ্ধতম জায়গা। পদমর্যাদার কারণে কারও কারও বক্তব্যকে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো একথা সত্যি, কিন্তু সবার কথাই ধৈর্য ধরে শোনা হত। রাজ্যপ্রধান ও তার পরামর্শক থেকে শুরু করে যোদ্ধা, কবিরাজ, দোকানদার, খামারী, জোতদার ও শ্রমিকসহ সবাইকে স্ব স্ব মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হত। কোনরকম বিরতি ছাড়াই লোকজন একের পর এক মত প্রকাশ করত এবং এইভাবে কয়েক ঘণ্টা চলার পর সবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। স্বায়ত্তশাসনের পূর্বশর্তই হলো সবার বাকস্বাধীনতা এবং সবার সমান মূল্য নিশ্চিত করা। এখানে সেই চর্চাটা ছিল। তবে দুঃখের বিষয় এখানে মহিলাদের মতামত নেওয়া হত না। তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হত।

মিটিংয়ের পর বিশাল ভোজসভার আয়োজন করা হত। একের পর এক বক্তার কথা শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়ার পর আমি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি খাবার খেতাম। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি অনেক বক্তা মূল কথা না বলে আনুষঙ্গিক প্রসংগে প্যাচাল পাড়তো। কিছু বক্তা কোনরকম গৌরচন্দ্রিকা ছাড়াই সরাসরি মূল প্রসংগে কথা বলা শুরু করতেন। অনেককে দেখতাম শ্রোতাদের মনযোগ আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরণের আবেগপূর্ণ কথা বলতো। আবার অনেককে দেখেছি তারা কোনরকমের আবেগের ধার না ধেরে টান টান ভাষায় তাদের মন্তব্য করতেন।

যে বিষয়টি আমাকে হতবাক করেছিল, সেটি হল প্রকাশ্য সভায় রুঢ় সমালোচনা করে রাজ্যপ্রধানের মুণ্ডুপাত করা। অবাক হয়ে দেখলাম অত্যন্ত দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন কীভাবে উন্মুক্ত সভায় কঠোর ভাষায় রাজ্যপ্রধানকে সমালোচনা করছে। রাজা নীরবে মাথা নিচু করে সব শুনছেন। সমালোচকের বক্তব্যের কোন প্রতিবাদ করছেন না। এমন কি এসব সমালোচনায় তার মুখে সামান্যতম বিরক্তির চিহ্নও ফুটে ওঠেনি।

উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে ঐক্যমত্য না হওয়া পর্যন্ত মিটিং চলত। সমাধানে হয় ঐক্যমতের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা হত; নয়তো সিদ্ধান্ত ছাড়াই মিটিং ভেঙে দেওয়া হত। সমাধানে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনে আবার আলোচনার সময় নির্ধারণ করা হতো। গণতন্ত্রের মানে হল সবার বক্তব্য শুনতে হবে এবং সবার মত হলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার শাসন ব্যবস্থা তাদের কাছে ছিল বিদেশী ধারণা। তারা বিশ্বাস করতেন সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের ধ্বংস করে ফেলবে এটা কোন গণতান্ত্রিক নীতি হতে পারে না।

দিন শেষে মিটিং শেষ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে রাজ্যপ্রধান বক্তব্য রাখতেন। এর আগে তিনি একটি কথাও বলতেন না। সারাদিন ধরে যেসব বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে তার একটা উপসংহার টানা এবং পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তিকে একটা ঐক্যমতের জায়গায় নিয়ে আসাই ছিল তার কাজ। তবে লোকজন দ্বিমত পোষণ করতে পারে এমন কোন সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাব তিনি কখনও চাপিয়ে দিতেন না। যদি কোন সিদ্ধান্ত না হয় তাহলে আবার মিটিংয়ে বসার সিদ্ধান্ত হতো। ঐক্যমতে পৌঁছানো গেলে একজন কবি অথবা সংগীতজ্ঞ কবিতা অথবা গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করতেন। সেসব কবিতা বা গানে প্রাচীন রাজাদের প্রশংসা করা হতো; বর্তমান রাজার জন্য আশীর্বাদ বর্ষণ করা হতো। রাজাসহ অন্য শ্রোতাদর্শক তুমুল হর্ষোধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানতেন।

পরবর্তী জীবনে নেতা হিসেবে যখনই আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেছি তখনই আমার পালক পিতা রাজ্যপ্রধানকে অনুসরণ করেছি। তার মতো আমিও কোন সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাব দেওয়ার আগে প্রত্যেক সহগামীর বক্তব্য মন দিয়ে শুনেছি। তাদের কথা শোনার পর সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাব দিয়েছি। প্রস্তাবে সবাই রাজী হলে তখনই সেটা সিদ্ধান্ত হিসেবে চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছি। রাজ্যপ্রধানের একটি কথা আমি সব সময় মনে রেখেছি। তিনি বলতেন, একজন নেতা হলেন রাখাল বালকের মতো। রাখাল ভেড়ার পাল ছেড়ে দিয়ে পেছন থেকে তাদের অজান্তেই নির্দেশ দেয়। প্রথম দিককার ভেড়াগুলোকে সঠিক পথে হাঁটিয়ে দিতে পারলে আর অসুবিধা হয় না। পেছনের ভেড়াগুলো তাদের অনুসরণ করে ঠিক পথে এগুতে থাকে। পেছন থেকে রাখাল বালক যে তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে তা তারা বুঝতেও পারে না। ঠিক একইভাবে নেতাও অনুসারী অথবা অধস্তনদের পরিচালনা করেন।

এমখেকেজওয়েনিতে আসার পরই আফ্রিকার ইতিহাস সম্পর্কে আমার আগ্রহ বাড়তে শুরু করে। এখানে আসার আগে আমি শুধু ঝোসা নায়কদের গল্প শুনেছিলাম। কিন্তু এই রাজবাড়িতে আসার পর শেখুখুনে, বেপাদির রাজা, বাসোথোর রাজা, মোশোয়েশোয়ে, ডিনজানে, জুলুরাজ, বামবাথা, হিনৎসা, মাকানা, মোনৎসিওয়া ও কেগামার মতো আফ্রিকান নেতাদের সম্পর্কে জানতে পারলাম। যেসব গোত্রপ্রধান বিভিন্ন নালিশ মিমাংসার জন্য এসব বাড়ি আসতো তাদের কাছ থেকে এসব গল্প শুনেছি। এরা কেউই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আইনের ওপর পড়াশুনা করেননি; কিন্তু তারা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মামলা পরিচালনা করতেন। কোন কোনদিন বিচারের শুনানি আগেভাগে শেষ হয়ে যেত এবং তখন তারা এ বাড়িতে অবস্থান করতেন। রাতে তারা গল্প শুরু করতেন। আমি চুপচাপ তাদের পাশে বসে মহান নেতাদের বীরত্বগাঁথা শুনতাম। তারা মাঝে মাঝে এমন সব উচ্চমার্গীয় ভাষা শৈলী ব্যবহার করে শিক্ষামূলক গল্প বলতেন যার অর্থ বুঝতে পারতাম না। টেনে টেনে লম্বা উচ্চারণে, একেবারে স্লো মোশনে নাটকীয় ভঙ্গিতে তারা কথা বলতেন। আমি তন্ময় হয়ে শুনতাম।

প্রথম দিকে আসরে তারা আমাকে বসতে দিতে চাইতো না। বলতো আমার নাকি ওদের গল্প শোনার মতো বয়স হয়নি। কিন্তু আমার নাছোড় আব্দার শুনে পরে তারা শর্ত সাপেক্ষে আসরে বসার অনুমতি দিল। শর্ত হচ্ছে আসরে কারও তামাক ধরাবার জন্য আগুন অথবা পিপাসা মেটানোর জন্য পানির দরকার হলে তা এনে দিতে হবে। চায়ের সময় হলে রান্নাঘরে গিয়ে মহিলাদের কাছে চায়ের কথা বলে আসতে হবে। আমি শর্তে রাজি হলাম। প্রথম কয়েক মাস তারা আমাকে এত বেশি খাটিয়েছিল যে অনেকগুলো গল্পের আগামাথা ধরতে পারিনি। ধীরে ধীরে তারা তাদের সংগে একটানা বসে আফ্রিকান বীরদের কেচ্ছা শোনার অনুমতি দিল। তাদের কেচ্ছার মধ্য দিয়ে আবিস্কার করলাম, আফ্রিকায় এমন অনেক বীরপুরুষের জন্ম হয়েছে যারা দেশপ্রেমের কারণে আগ্রাসী পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আফ্রিকান এসব বীরসেনানীদের গল্প আমার শিশুমনে সর্বপ্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

যেসব বর্ষীয়ান নেতা পূর্বপুরুষের এসব বীরত্ব গাঁথা শোনাতেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ছিলেন যিনি তার নাম জুয়েলিবহানজিলে জোয়ি। রাজা এনজুবেনকুকার গ্রেট হাউস পক্ষের ছেলে ছিলেন তিনি। সবাই তাকে চীফ জোয়ি বলে ডাকতো। ভদ্রলোক এত বয়সী ছিলেন যে তার কাঁধের চামড়া কাপড়ের মতো ঝুলে পড়েছিল। খুব ধীরে ধীরে তিনি তার গল্পের ঝাঁপি খুলতেন। আস্তে আস্তে কাহিনী বলতেন। খানিকক্ষণ বলার পর জোরে জোরে কাশতেন। কাশি বন্ধ হলে মিনিটখানিক চোখ বন্ধ করে থাকতেন। তারপর

আবার শুরু করতেন। থেম্বু সমাজের আসল ইতিহাসের একটা বিশাল অংশ জোয়ির দখলে ছিল। প্রাচীন এ লোকটা থেম্বু সমাজের বহু উত্থান পতন দেখেছিলেন।

রাজা এনজানজেলিজওয়ের বাহিনীর বীর সেনানীদের বীরত্ব বর্ণনার সময় চীফ জোয়ি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন। পশ্চিমাদের হাতে তার বাহিনীর লোকজনের পরাজয় ও মৃত্যুর বর্ণনা দেওয়ার সময় তিনি কেমন ধূসর বর্ণের হয়ে যেতেন। এনজানজেলিজওয়ের বীরত্ব, মানবতাবোধ ও শৌর্যের বর্ণনায় তাকে সবচেয়ে বেশি উদ্দীপ্ত মনে হত।

চীফ জোয়ি যেসব নায়কের গল্প বলতেন তারা সবাই যে থেম্বুল্যান্ডের ছিলেন তা নয়। তার মুখে প্রথম যেদিন আমি অ-ঝোসা যোদ্ধাদের গল্প শুনেছিলাম; সেদিন অবাক হয়ে ভাবছিলাম তিনি কেন বাইরের যোদ্ধাদের প্রশংসা করছেন। আমার তখন এমন বয়স যে স্থানীয় বীরদের ছাড়া কারও বীরত্বের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু তার গল্পের মধ্য দিয়েই বুঝতে পেরেছি থেম্বুল্যান্ডের বাইরে যারা সেই আফ্রিকানরাও আমাদের উপজাতিয় ভাই। তারাও আমাদের ইতিহাসের অংশ।

কথা বলার সময় চীফ জোয়িকে শ্বেতাঙ্গদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করতে দেখেছি। তার ধারণা ছিল শ্বেতাঙ্গরা ঝোসা উপজাতিয় গোষ্ঠীকে তছনছ করে দিয়েছে; ভাইয়ের সংগে ভাইয়ের বিবাদ বাধিয়েছে। শ্বেতাঙ্গরা থেম্বুবাসীকে বলতো, তাদের সত্যিকারের 'নেতা' হলেন এক শ্বেতাঙ্গ রানী। সমুদ্রের ওপারে সুদূর ইংল্যান্ডে থাকেন তিনি। কৃষ্ণাঙ্গরা সবাই তার প্রজা। জোয়ি বলতেন, এই শ্বেতাঙ্গ রানী আফ্রিকানদের জন্য দুঃখ দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই উপহার দেয়নি; সে যদি আফ্রিকানদের প্রধান হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সে একজন জালিম প্রধান। উৎপীড়ন জারি শাসক। চীফ জোয়ির গল্প এবং ব্রিটিশদের সম্পর্কে তার ঘৃণাব্যাঞ্জক মন্তব্য শুনে আমার সাংঘাতিক রাগ হতো এবং নিজেকে প্রতারিত মনে হতো। আমার মনে হতো তারা যেন আমার সব অধিকার হরণ করে নিয়ে গেছে।

চীফ জোয়ি বলতেন, সাগর পাড়ি দিয়ে আগুন উগরানো অস্ত্র (বন্দুক) হাতে *আবেলুঙ্গরা* (শ্বেতাঙ্গ) না আসা পর্যন্ত আফ্রিকানরা ভাইয়ে ভাইয়ে মিলেমিশে ছিল। এক সময় থেম্বু, পোন্ডো, ঝোসা এবং জুলুরা এক পিতার সন্তানের মতো থাকতো। সাদারা এসে বিভিন্ন গোত্রের *আবানতু* (বিনয় ও নমনীয়তা) নষ্ট করে দিয়েছে। জমির ওপর সাদাদের লোভ ছিল সীমাহীন। পানির দখল ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে তারা কালোদের কাছ থেকে তাদের জমি কেড়ে নিত। জোয়ি বলতেন, অন্যান্য জিনিসপত্রের মতো জমির কোন একক মালিকানা আগে ছিল না। যার যেখানে খুশি ফসল ফলাতো। কিন্তু সাদারা এসে একজন লোক যেভাবে অন্যজনের ঘোড়া ছিনতাই করে নেয়, সেভাবে কালোদের জমি ছিনতাই করে নিল।

চীফ জোয়িয়র কথা শোনার আগ পর্যন্ত আমি জানতাম না আমাদের স্কুলে ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ডের যে পাঠ্য বই তাতে আফ্রিকার আসল ও আদি ইতিহাস নেই। ওই পাঠ্য বইতে পড়েছি ১৬৩২ সালে গুড হোপের কেপ এলাকায় জ্য ভ্যান রাইবিক ল্যাণ্ড করার পর দক্ষিণ আফ্রিকায় সভ্যতার শুরু হয়।

চীফ জোয়িয়র কাছেই জানতে পারি উত্তর আফ্রিকার বহু আগেই আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় আদিবাসীদের বসবাস শুরু হয়েছিল। অবশ্য পরে আমি নিজে আবিস্কার করেছি আফ্রিকার ইতিহাস, বিশেষ করে ১৬৫২ সালের পরের বিভিন্ন ঘটনা প্রসংগে জোয়ি যেসব তথ্য দিয়েছেন তা সর্বৈব সঠিক নয়।

এমখেকেজওয়েনিতে এসে আমি প্রথম দিকে কিছুটা ভড়কে গিয়েছিলাম। গ্রাম থেকে হঠাৎ কোন বড় শহরে আসলে যেরকম দশা হয় আমার অবস্থাও অনেকটা সেরকম হয়েছিল। কুনুর চেয়ে এমখেকেজওয়েনি সবদিক থেকে উন্নত ছিল। এখানকার লোকজন কুনুর অধিবাসীদের গরীব, পশ্চাৎপদ আর ছোটজাত বলে অবজ্ঞা করত। কুনুতে আমার বেড়াতে যাওয়া রাজ্যপ্রধান পছন্দ করতেন না। তার ধারণা ছিল সেখানে গেলে আমার পুরনো অশিক্ষিত বন্ধুদের সাহচর্যে আমি গোল্লায় যেতে পারি। সম্ভবত এ ব্যাপারে তিনি আমার মাকে একান্তে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কুনুতে বেড়াতে গেলে আমাকে মা সম্ভবত এ কারণে সবার সংগে মিশতে দিতেন না। আমি কার সাথে মিশি, কার সাথে খেলাধুলো করি তার খোঁজ খবর রাখতেন। আমাকে যাতে মায়ের সংগে দেখা করার জন্য বারবার কুনুতে আসতে না হয় সেজন্য বহুবার রাজ্যপ্রধান আমার মা আর ভাইবোনকে এমখেকেজওয়েনিতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মা রাজি হননি।

যখন আমি এমখেকেজওয়েনির প্রাসাদে এলাম তখন আমার কিছু সহপাঠী আমাকে এই রাজকীয় পরিবেশের সাথে বেমানান অথর্ব গেঁয়ো ভূত ও বর্বর চাষা বলে মনে করত। তরুণ বয়সের প্রতি সম্মান রেখে আমি যথাসম্ভব কেতাদুরস্ত ও স্মার্ট থাকার চেষ্টা করতাম। চার্চে একদিন প্রার্থনার জন্য গিয়ে খুব সুন্দর একটা মেয়ের ওপর আমার চোখ আটকে গেল। জানলাম সে হল রেভারেন্ড মাতিওলোর ছোট মেয়ে উইনি। আমি তাকে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব দিলাম। উইনিও প্রায় সংগে সংগে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলো। আমার প্রতি উইনির আগ্রহ থাকলেও তার বড়বোন নোমামপোন্ডো আমাকে ফালতু টাইপের গেঁয়ো চাষা বলে ধরে নিয়েছিল। সে উইনিকে আমার সম্পর্কে বললো, যেহেতু আমি একটা চাল-চুলোহীন গেঁয়ো ছেলে সেহেতু মাতিওলোর মেয়ে হয়ে আমার সংগে তার মেলামেশাটা ভালো দেখায় না। আমি কতটা অসভ্য ও গেঁয়ো প্রকৃতির ছেলে তা বোনকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য নোমামপোন্ডো একদিন আমাকে তাদের সংগে লাঞ্চ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। বাড়িতে আমি হাত দিয়েই খাবার খেতাম। সচরাচর ছুরি অথবা কাটাচামচ ব্যবহার

করতাম না। লাঞ্চ টেবিলে বসার পর নোমামপোন্ডো আমার প্লেটে একটা আধ সেদ্ধ মুরগীর পাখনা দিল। সংগে একটা ছুরি আরেকটা কাটা চামচ দিল। আমি বারবার চেষ্টা করেও ছুরি-চামচ দিয়ে ওই পাখনা থেকে মাংস আলাদা করতে পারছিলাম না।

অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সবাই সহজ ভঙ্গিতে কাটা চামচ ব্যবহার করে খাচ্ছে। আমি বেশ কয়েকবার কাটাচামচ দিয়ে নাড়া চাড়া করেও কিছু করতে পারছি না দেখে নোমামপোন্ডো উইনিকে আড়চোখে ইশারা করতে লাগলো। যেন সে ইশারায় বলতে চাইলো, 'কি, বলেছিলাম না?'

আমি তার ভ্রুকুটিকে পরোয়া না করে চামচ-ছুরি ফেলে খালি হাতেই সেই আধসেদ্ধ মুরগীর পাখনা খাওয়া শুরু করলাম। তবে অপ্রস্তুত বোধ করায় সেদিন সামান্য কিছু খেয়েই টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম।

বড়বোন বীরদর্পে ছোটবোনকে বললো, 'এরপরও যদি এই গেঁয়ো হাঁদার প্রেমে নিজেকে জড়াও তাহলে তোমার সারাটা জীবন মাটি হয়ে যাবে বলে রাখছি!' কিন্তু সুখের কথা হলো উইনি তার কথা মানলো না। সে এই গেঁয়ো ভূতটাকেই ভালোবাসার মানুষ হিসেবে গ্রহণ করলো। ঘটনাক্রমে আমরা দুজন আলাদা হয়ে পড়লাম। তাকে দূরের একটা ভিন্ন স্কুলে ভর্তি করা হল এবং সে শিক্ষিকা হয়ে উঠলো। কিছুদিন আমাদের মধ্যে নিয়মিত পত্রযোগাযোগ ছিল। তবে হঠাৎ তার সন্ধান হারিয়ে ফেললাম। সে অন্য কোথাও চলে গেছে। ততদিনে আমি কাটাচামচের সঠিক ব্যবহার ভালভাবেই শিখে গেছি।

৪

আমার বয়স যখন ষোল বছরে পা দিল, তখন রাজ্যপ্রধান আমাকে নাবালক থেকে সাবালক করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঝোসাদের মধ্যে বালক থেকে পরিণত মানুষ হওয়ার একটিমাত্র পথ রয়েছে; সেটি হলো খৎনা। আমাদের স্থানীয় আদি সংস্কৃতি অনুযায়ী খৎনা করানো হয়নি এমন কোন ব্যক্তি তার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না, তাকে কেউ বিয়ে করতে রাজী হয় না এমনকি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাকে অংশ নিতেও দেওয়া হয় না। ঝোসা সম্প্রদায়ের খৎনা না নেওয়া লোক কখনও পূর্ণাঙ্গ পুরুষের মর্যাদা পায় না। বয়সে যতই বড় হোক তাকে আজীবন বালকের মর্যাদা নিয়েই সমাজে থাকতে হয়। আসলে একজন পুরুষ মানুষকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতেই এ খৎনা পদ্ধতি চালু ছিল। খৎনার বিষয়টি শুধুমাত্র একটি তুচ্ছ অস্ত্রোপচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়; এর জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী আনুষ্ঠানিকতা ও উৎসবেরও

আয়োজন করা হতো। একজন ঝোসা হিসেবে, খৎনার দিন থেকেই আমিও নিজেকে পরিণত মানুষ হিসেবে গণ্য করি।

রাজ্যপ্রধান অর্থাৎ আমার পালক পিতার ছেলে জাস্টিসের খৎনা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মূলত খৎনা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। জাস্টিস ছাড়া আমাদের ২৬ জনকেও তার সংগেই খৎনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। তার সংগে আমাদের খৎনা দেওয়ার উদ্দেশ্য হল তাকে সংগ দেওয়া। পরিকল্পনা মতো, নতুন বছরের শুরুতেই এমবাশি নদীর পাড়ে অবস্থিত টাইহালারহা উপত্যকায় বানানো দুটো শনের ঘরের উদ্দেশ্যে আমরা সবাই রওনা দিলাম। ওই ঘরেই বিশেষ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে থেম্বুরাজদের খৎনা দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। ঘর দুটো জনবসতি থেকে বেশ দূরে অবস্থিত ছিল। সামাজিক রীতি অনুযায়ী আমরা যারা খৎনা নিতে যাচ্ছি তাদের সবাইকে খৎনার আগে বেশ কয়েকদিন এ নির্জন ঘরে কাটাতে হবে। এ সময়টা আমাদের সবার কাছেই ছিল পবিত্র আর বরকতময়। কয়েকদিনের মধ্যেই বালক থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে সমাজের স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছি ভেবে আমার খুব ভালো লাগছিল।

খৎনা উৎসব শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগেই আমরা যথারীতি এমবাশি নদীর পাড় ধরে হেঁটে টাইহালারহা উপত্যকার সেই বিরাণ বাড়িতে পৌঁছলাম। বালকবেলার শেষ কয়েকটা দিন অন্যান্য সাথীদের সংগে এখানে কাটাতে হবে। এ বিষয়টি আমাদের সবার জন্যই খুব আনন্দদায়ক ছিল। আমাদের এ সাময়িক আবাসস্থলের সবচেয়ে কাছে যার বাড়ি তার নাম বানাবাখে ব্লেয়াই। এ ছেলেটা আমাদের গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। বিত্তশালী পরিবার বলতে যা বোঝায় ও ছিল সেই পরিবারের। লাঠি খেলায় বার বার চ্যাম্পিয়ন হওয়া সুঠামদেহী ব্লেয়াই মেয়েদের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিল। এ জনপ্রিয়তার কারণে ওর গার্লফ্রেন্ডের সংখ্যাও কম ছিল না। টাইহালারহাতে থাকাকালীন ব্লেয়াইয়ের কিশোরী ভক্তরা একের পর এক তাকে দেখতে আসছিল। সাথে করে নিয়ে আসছিল প্রচুর খাবার আর নানা রকম উপহার। ব্লেয়াই লিখতে অথবা পড়তে পারতো না কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই ছিল প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে। সে কবে একবার জোহান্সবার্গ গিয়েছিল, সেই অভিযাত্রার গল্প আমরা গভীর আগ্রহ নিয়ে তার কাছ থেকে শুনতাম। আমরা সবাই গোল হয়ে বসতাম আর সে জোহান্সবার্গ ভ্রমণের রোমাঞ্চকর গল্প বলতো। সেখানকার খনি সম্পর্কে সে এমন অ্যাডভেঞ্চারের বর্ণনা দিত যে আমার মনে হতো রাজা বাদশাহ হওয়ার চেয়ে খনি শ্রমিক হওয়া আরও অনেক বেশি গৌরবজনক। খনি শ্রমিকদের দুঃসাহসিক কাজ কারবারের কথা শুনে আমার মাথায় তালগোল পাকিয়ে যেতো। মনে হতো নিজেকে বীরপুরুষ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য এর চেয়ে আর ভালো কোন পেশা দুনিয়ায় থাকতে পারে না। অনেক পরে বুঝতে পেরেছি, ব্লেয়াইয়ের মতো লোকদের অতিরঞ্জিত ফাঁপা গল্পের ফাঁদে পড়ে বহু মানুষ জোহান্সবার্গের খনিতে

কাজ করতে যেতো আর বেঘোরে প্রাণ হারাতো। তখনকার দিনে খনিতে কাজ করার জন্য খনি মালিকরা জনগণকে যতটা না উদ্দীপ্ত করতো তার চেয়ে বেশি করতো ব্রেয়াইয়ের মতো স্থানীয় লোকজন।

গণখৎনার উৎসবে যোগ দেওয়ার আগে যাদের খৎনা করানো হবে তাদের দুঃসাহসী অথবা বুদ্ধিদীপ্ত কিছু একটা করে দেখানোর রীতি প্রচলিত ছিল। যে সময়ের কথা বলছি, তারও বহুকাল আগে ছেলেরা গরুর পাল সামলানো অথবা সম্মুখসমরে অংশ নিয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করতো। কিন্তু আমাদের সময় শারীরিক কসরত দেখানোর চেয়ে ধূর্ত বুদ্ধির মারপ্যাচে অ্যাডভেঞ্চারস কিছু একটা করে দেখানোকেই বেশি নায়কোচিত কাজ বলে গণ্য করা হতো। এ কারণে টাইহালারহার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার দুদিন আগে আমরা কাছের একটা খামার থেকে শুকর চুরি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। খামার থেকে শুকর নিয়ে আসতে যাতে ঝক্কি ঝামেলা না হয় এবং খামারি যাতে টের না পায় সেজন্য আমরা অনেক ভেবে একটা বুদ্ধি বের করলাম। আফ্রিকান ভল্লুক ধরার জন্য সে সময় এক ধরণের সুগন্ধী টোপ ব্যবহার করা হতো। আমরা মুঠোয় করে ওই টোপ নিয়ে রাতে খামারের কাছে গেলাম। শুকরের ঘরের পাশে ছড়িয়ে দিতেই একটা বড়সড় শুকর বেরিয়ে এল। আমরা সুগন্ধি টোপের গুঁড়ো ফেলতে ফেলতে পাশের একটা মাঠে নিয়ে এলাম। শুকরটা ওই গুঁড়োর রেখা ধরে এগিয়ে মাঠে চলে এল। সে সুগন্ধী খাবার খেতে খেতে মাঠে আসার সময় লক্ষ্য করেনি আমরা তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছি। সুযোগ বুঝে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা ধরে ফেললাম এবং ছুরির এক পোচে ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেললাম। সেদিন রাতে মাথার ওপর অনেক তারা ছিল। চারপাশে ছিল ঘন অন্ধকার। আমরা আগুন জ্বেলে তাতে চুরি করা শুয়োরটাকে পুড়িয়ে সিদ্ধ করে খেলাম। জীবনে কতবার কত ধরণের মাংস খেয়েছি, কিন্তু সে রাতের পোড়ানো শুকরের মাংসের মতো দুর্লভ স্বাদ আর কোনদিন উপভোগ করতে পারিনি।

আমাদের যেদিন খৎনা করানো হলো তার আগের রাতে নাচ গানের এক জম্পেশ উৎসবের আয়োজন করা হল। উপত্যকার নিকটবর্তী গ্রাম থেকে মহিলারা দল বেঁধে আসল। তাদের গান আর ছন্দোময় হাততালির সংগে আমরাও নাচতে লাগলাম। ধীরে ধীরে বাজনা দ্রুতলয়ে এবং চড়া শব্দে হতে লাগলো। বাজনার তালে তালে আমরাও নাচের লয় বাড়িয়ে দিলাম। উন্মাতাল নৃত্যের মধ্যে ভুলেই গেলাম কয়েক ঘন্টা পরে আমাদের কী ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

রাতভর গানবাজনা শেষে ভোরের আলো ফুটতেই আমরা খৎনার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। শীতের দিন হলেও আমাদের স্নান করানোর জন্য কাছের নদীতে নিয়ে

যাওয়া হল। খৎনা করানোর আগে দেহমন পবিত্র করার জন্য বিশেষ এই স্নানরীতি তখন প্রচলিত ছিল। সূর্য মাথার ওপর আসার পর পরই খৎনা দেওয়ার কাজ শুরু হল। নদীর পাড়ে সবাইকে পাশাপাশি দাঁড় করানো হল। এই উৎসবমুখর গণখৎনা দেখার জন্য প্রত্যেক ছেলের বাবা মা আত্মীয় স্বজনের পাশাপাশি স্বয়ং রাজ্যপ্রধান তার পাত্রমিত্র সভাসদ নিয়ে হাজির হলেন।

আমাদের সবার পরনে ছিল এক টুকরো কম্বল। সামরিক কমান্ডের মতো ঢোল বাজানো শুরু হল। বড়দের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা যার যার কম্বল গা থেকে খুলে সেটা বিছিয়ে নিলাম। সবাই তখন একেবারে নগ্ন। এক সারিতে সবাই সামনের দিকে দুপা ছড়িয়ে বসলাম। কঠিন মুহূর্তটা যখন আসবে তখন কী অবস্থা হবে এই ভেবে উদ্বেগ আর উত্তেজনায় আমি তখন কাঁপছিলাম। ভয় পাওয়া অথবা কান্নাকাটি করলে মান সম্মান কিচ্ছু থাকবে না। একারণে যাই হোক না কেন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কোন ধরণের দূর্বলতা প্রকাশ করে নিজেকে, নিজের গোত্রকে এবং আমার অভিভাবকদের ছোট করব না। সে সময় খৎনাকে সাহসিকতা ও সহ্যক্ষমতার পরীক্ষা হিসেবে গণ্য করা হত। এ সময় কোন ধরণের ব্যথানাশক অথবা অ্যানাস্থেটিক ব্যবহার করা হতো না। যারা নিজেদের 'বাপের বেটা' প্রমাণ করতে চাইতো তাদের ওই দুঃসহ যন্ত্রণা নিরবে সহ্য করতে হতো।

বসা অবস্থায় ডান দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি একজন বয়স্ক লিকলিকে দেহের লোক তাঁবুর মধ্য থেকে বেরিয়ে এল এবং আমাদের সারির প্রথম ছেলেটার সামনে উবু হয়ে বসলো। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে প্রচণ্ড হর্ষধ্বনির আওয়াজ পাওয়া গেল। বুঝলাম নিম্নাগ্র কর্তন উৎসব শুরু হচ্ছে। হাল্কা পাতলা যে লোকটা এসেছে সে এ তল্লাটের বিখ্যাত *ইনগচিবি* (হাজাম)। জিকালেকোল্যান্ড থেকে তাকে আনা হয়েছে। তার হাতে যে বিশেষ ছুরি দেখা যাচ্ছে তা দিয়ে ঘ্যাচ করে এক পোচে সে যে কত ছেলের শিশ্নাগ্র কেটে ফেলেছে তার হিসাব নেই।

হঠাৎ শুনলাম কাতর কণ্ঠে ডান দিকের প্রথম ছেলেটা *এনডিইনডোডা!* (আমি একজন পুরুষ মানুষ!) বলে চিৎকার করে উঠলো। খৎনা করানোর সময় আমাদের এটা বলার জন্য আগেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারপরে ছিল রাজ্যপ্রধান মানে আমার পালক পিতার ছেলে জাস্টিস। মিনিট দুয়েকের মধ্যে সেও 'এনডিইনডোডা!' বলে চিৎকার করে উঠলো। এর পর আরও দুজন, তারপর আমি। আমার মাথা ফাঁকা হয়ে গেল। তাদের খৎনা কখন হয়ে গেছে বলতে পারবো না। দেখলাম লোকটা আমার সামনে। হাতে রক্তমাখা ছুরি। আমি যথাসম্ভব মন শক্ত করে সরাসরি তার চোখের দিকে চাইলাম। তাকে যেন কেমন বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। এই শীতের দিনেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে। তার হাত দুটো এত ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন যেন ভিন্ন গ্রহের কোন শক্তি তাকে পরিচালিত করছিল। লোকটা কোন কথা না বলে আমার শিশ্নের অগ্রভাগের চামড়া এক হাত দিয়ে সজোরে টেনে ধরলো। তারপর অন্য হাতে স্যাৎ করে ছুরি চালিয়ে দিল। সংগে সংগে আমার মনে হলো যেন আমার শিরা

উপশিরা দিয়ে আগুনের দগ্‌দগে রেখা ছুটে চলেছে। এত ব্যথা লাগল যে আমি দাঁতে দাঁত চেপে বুকের ওপর মুখ নামিয়ে আনলাম। কান্নার কথা মনে আসতেও বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো। কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকার পর বলে উঠলাম *'এনডিইনডোডা!'*

কর্তিত শিশ্নের দিকে তাকিয়ে দেখলাম গোল আংটির মতো করে চামড়া কেটে নেওয়া হয়েছে। যখন দেখলাম অন্যরা আমার চেয়ে শক্ত আর দৃঢ় মনোবল নিয়ে আছে তখন খুব লজ্জা পেলাম। ব্যথার চোটে কিছুক্ষণের জন্য আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম। হুঁশ হতেই সর্বোচ্চ চেষ্টায় যন্ত্রণা লুকানোর চেষ্টা করলাম। ব্যথা পেলে একটা ছোট ছেলে কান্নাকাটি করতেই পারে; কিন্তু খৎনা করানো সদ্য স্বীকৃতি 'ব্যাটা ছেলে'র চোখে পানি আসবে সেটা কোন কাজের কথা হতে পারে না।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ঝোসা যা যা করতে পারে এখন তার সব কিছু করার অধিকার আমার হয়েছে। ইচ্ছে করলে এখন আমি বিয়ে করতে পারব, নিজের জন্য আলাদা ঘর বানাতে পারব এবং আলাদাভাবে জমি চাষও করতে পারবো। আমার সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিচার শালিসিতে অংশ নিতে পারবো এবং সেখানে সভাসদরা আমার বক্তব্যকে গুরুত্বের সাথে শুনতে বাধ্য হবে। খৎনার পর সবাইকে একটা নতুন নামও দেওয়ার রীতি ছিল। আমার নাম দেওয়া হল *'ডালিভুঙ্গা'* যার অর্থ 'ভুঙ্গা'র প্রতিষ্ঠাতা। ট্রান্সকেই'র স্থানীয় প্রশাসন পরিষদকে ভুঙ্গা বলা হত।

ঝোসার সমাজপতিরা আমার পূর্ববর্তী নাম 'রোলিহ্‌লাহ্‌লা' অথবা 'নেলসন' নাম দুটোর চেয়ে এ নামটিকেই বেশি পছন্দ করলেন। নতুন নাম পেয়ে আমিও খুব খুশি। কেউ যখন আমাকে ডালিভুঙ্গা নামে ডাকতো তখন রীতিমতো গর্ব অনুভব করতাম।

সবার খৎনা হয়ে গেলে পুরুষাঙ্গের কেটে ফেলা যে চামড়াগুলো আমাদের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল হাজামের এক সহযোগী তা কুড়িয়ে আমাদের যার যার পাতলা কম্বলের কোনায় বেঁধে দিল। হাজাম ক্ষত শুকানোর ভেষজ ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত এক ধরণের কাটা গাছের পাতা বেটে তা ক্ষতস্থানে বেঁধে দিলেন। রক্তপড়া বন্ধে এ ওষুধটি সাংঘাতিক কার্যকর ছিল।

আনুষ্ঠানিকতার শেষ পর্যায়ে আমাদের নদীর পাড় থেকে ধরাধরি করে কুড়ের মধ্যে নিয়ে আসা হল। কুড়ের মধ্যে ভেজা কাঠে বিশেষ কায়দায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ভেজা কাঠ থেকে ভক্ ভক্ করে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে। ধোঁয়ায় ভরা ঘরে আমাদের শুইয়ে দেওয়া হল। এক পা টান টান করে ছড়ানো, আরেক পা ভাজ করে উর্ধমুখে দাঁড়ানো। বিশেষ ধরণের ভেজা কাঠ থেকে যে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল সেটা ক্ষত শুকানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করে বলে এই ব্যবস্থা।

এ মুহূর্তে আমরা হচ্ছি ঝোসাদের ভাষায় *অ্যাককোয়েযা* বা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরাজ্যেগামী লোক। আমাদের সার্বিক দেখাশুনার জন্য একজন *'অ্যামাখানকাতা'* বা অভিভাবক দেওয়া হল। পূর্ণাঙ্গ পুরুষদের জগতে ঢুকতে আমাদের কী কী নীতিমালা ও অনুশাসন মেনে চলতে হবে সেটা বুঝিয়ে দেওয়াই ছিল তার মূল কাজ। এর জন্য প্রথমেই তিনি আমাদের উলঙ্গ শরীরের নোখ থেকে চুল পর্যন্ত কাদা ও ছাই দিয়ে ঘষলেন। পুরো দেহ ছাইতে ঢেকে যাওয়ায় আমাদের ভূতের মতো লাগছিল। সাদা ছাইকে ঝোসাদের মধ্যে শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। গায়ে লাগানো কাদা শুকিয়ে টান ধরার সময় মনে হচ্ছিল চামড়ার মধ্যে ব্লেড দিয়ে কেউ যেন ধীরে ধীরে চিরে দিচ্ছে।

ওই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝরাতে একজন *ইকানকাথা* বা পরিচারক এসে আমাদের আস্তে আস্তে ডাক দিয়ে ঘুম থেকে জাগালেন। তিনি বললেন, যার যার কম্বলের কোনায় শিশ্নাগ্রের যে কাটা চামড়া রয়েছে তা বাইরে গিয়ে কোন একটা গর্তে রেখে আসতে হবে। উপজাতিয়রা বিশ্বাস করে ওই কাটা চামড়া ব্যবহার করে টিকটিকি ও গিরগিটি অনেক অশুভ কাণ্ড ঘটায়। তাই তাদের চোখ এড়ানোর জন্য অন্ধকারের মধ্যে এ চামড়া গর্তে পুঁতে ফেলতে হয়।

এছাড়াও ঝোসারা মনে করে এই চামড়া পুঁতে ফেলে খৎনার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ হওয়া লোকটা তার নাবালক জীবনটাকেই দাফন করে দেয়। শীতের রাতে গরম কুড়েঘর ছেড়ে আমি বাইরে যেতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু ওই লোকটার পীড়াপীড়িতে অন্ধকারের মধ্যে আমাকে বাইরে আসতে হলো। ঘর থেকে কিছুদূর গিয়ে আমি একটা জায়গায় মাটি খুঁড়ে সেখানে চামড়াটাকে পুঁতে ফেললাম। মনে হল, এইমাত্রই আমি চূড়ান্তভাবে নাবালক থেকে সাবালক, মাস্টার থেকে মিস্টার হয়ে উঠলাম।

খৎনার ক্ষত শুকানোর আগ পর্যন্ত দুটো কুড়েঘরে আমাদের ২৬ জনকে থাকতে হয়েছিল। এক ঘরে ১৩ জন অন্য ঘরে বাকি ১৩ জন। কুড়ের বাইরে আসতে হলে আমাদের আপাদমস্তক কম্বলে ঢেকে আসতে হতো কারণ এসময়ে কোন মহিলার চোখে পড়ার অনুমতি ছিল না। এর মাধ্যমে এক ধরণের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। আমরা সবেমাত্র বালক থেকে 'পুরুষ' হলাম। আগামী দিনগুলোতে আমাদের মানসিকতায় যে ভারিক্কি আসা দরকার এর মাধ্যমে তারই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। ক্ষত শুকিয়ে গেলে কুড়ের বাইরে, অর্থাৎ প্রকাশ্যে আসতেও কিছু নিয়ম মানতে হতো। খৎনা দেওয়ার পরপরই আমাদের গায়ে সাদা কাদামাটি মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেদিন কুড়ের বাইরে আনা হলো সেদিন গা থেকে সাদা মাটির রং ধুয়ে ফেলার জন্য ভোরে সবাইকে এমবাশি নদীতে নিয়ে স্নান করানো হল। তারপর গা মুছিয়ে দেবার পর শুকনো শরীরে আবার মাটি রং লাগানো হল। তবে এবার সাদা নয়, এবারের রং ছিল গেরুয়া লাল; পোড়ামাটি রং। ঝোসাদের সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী স্নানের পর প্রত্যেক 'পুরুষ'কে এক রাতের জন্য শয্যাসংগী হিসেবে একজন অবিবাহিতা মেয়েকে

দেওয়া হত। মেয়েটা তার নিজের শরীর 'পুরুষ'টার শরীরে ঘষে সেই লাল মাটির রং উঠিয়ে দিত। পরবর্তীতে তারা চাইলে তাদের মধ্যে বিয়ে দেওয়া হতো। তবে এটা বাধ্যতামূলক ছিল না। কেউ চাইলে মেয়েদের সংগ পরিহার করতে পারতো। জানিয়ে রাখা দরকার, আমাকে কোন মেয়ের সংগে শুয়ে গা থেকে রং তুলতে হয়নি। শুকরের চর্বি ঘষে তারপর পানি দিয়ে গা ধুয়ে ফেলেছিলাম। তাতেই পুরোদস্তুর 'পাক সাফ' হয়ে উঠেছিলাম আমি।

খৎনার প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলো। টাইহালারহা ত্যাগ করার আগে আমাদের অস্থায়ী নিবাস হিসেবে বানানো বিশাল কুড়ে দুটোই আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এর মাধ্যমে প্রতীকী অর্থে আমাদের নাবালক জীবনকে ধ্বংস করে দেওয়া হল। বাড়িতে ফেরার পর নতুন পৌরুষপ্রাপ্তি উপলক্ষে আমাদের জন্য এক জমকালো অভ্যর্থনা উৎসবের আয়োজন করা হল। আমাদের পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব, স্থানীয় গোত্রপ্রধানরা অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। গণ্যমান্যরা এ উপলক্ষে ভাষণ দিলেন। নাচ-গান হল। আমন্ত্রিতরা আমাদের জন্য নানা ধরণের উপহার নিয়ে এলেন। উপহার হিসেবে আমি পেলাম দুটো বকনা বাছুর এবং চারটি ভেড়া। এসব পেয়ে নিজেকে আগের যেকোন সময়ের চাইতে অনেক ধনী মনে হল। এর আগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে আমার কিছুই ছিল না। হঠাৎ করে এতগুলো ভেড়া ও বাছুরের মালিক হয়ে নিজেকে আসলেই সামর্থ্যবান পুরুষ বলে মনে হচ্ছিল। যদিও রাজ্যপ্রধানের ছেলে জাস্টিসের উপহারের সামনে আমার পাওয়া উপহার কিছুই ছিল না। বিভিন্ন গোত্রপ্রধান এসে তাকে সব মিলিয়ে শতাধিক ভেড়া আর কয়েকশ মুরগী উপহার দিয়েছিলেন। তবে তাতে আমি মোটেও ঈর্ষান্বিত হইনি। আমি ভালোভাবেই জানতাম জাস্টিস রাজার ছেলে। তার উপহারের পাল্লা ভারি হওয়াই স্বাভাবিক। যা কিছু পেয়েছি তাই নিয়েই আমি যথেষ্ট খুশি ও গর্ববোধ করেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল নিশ্চয়ই একদিন ধনসম্পদ আর সম্মান আমার হাতে আসবে।

অনুষ্ঠানে যারা বক্তব্য দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে প্রধান বক্তা ছিলেন পার্শ্ববর্তী এলাকার সাবেক গোত্রপ্রধান দালিনদিয়েবোর ছেলে সর্দার মেলিগকিলি। তার ঝাঁঝালো ভাষণ শুনে আমি এতক্ষণ যে ধনসম্পদ আর সম্মানের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলাম তা মুহূর্তে খান খান হয়ে গেল। প্রথমে প্রচলিত নিয়মেই তিনি বক্তব্য শুরু করলেন। বললেন, বহু বহু বছর ধরে প্রচলিত এ খৎনা উৎসব ঝোসাদের জন্য খুবই মজার আর উৎসব মুখর বিষয়। ভাষণের গৌরচন্দ্রিকা শেষ করে তিনি সারিবদ্ধভাবে বসা আমাদের দিকে ফিরলেন। তার কণ্ঠ হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি আমাদের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন,

'এখানে আমাদের যেসব সন্তান বসে আছে, এরা সবাই শৌর্যে বীর্যে শক্তিতে অতুলনীয়। এরা সবাই ঝোসা উপজাতির গর্ব। এরা একেকটি সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল। এরা সমগ্র আফ্রিকান জাতির গর্ব। খৎনা করিয়ে সদ্যই আমরা তাদের

দায়িত্বশীল পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করেছি। তাদের এক সমৃদ্ধ জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কিন্তু দুঃখের সংগে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তাদের সম্মানে আয়োজিত এই উৎসব, এই ভোজসভা সবই অর্থহীন। সব ফাঁকি। আমরা তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা কোনদিনই পূরণ হবার নয়। কারণ আমরা ঝোসারা; আফ্রিকার সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ জাতি এখন সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়েছি। নিজের দেশে আমরা ক্রীতদাস হয়ে আছি। নিজের জমিতে আমরা বর্গাদার হয়ে আছি। আমাদের গন্তব্যের ওপর আমাদের না আছে নিয়ন্ত্রণ, আমাদের না আছে ভবিষ্যত জয়ের কোন শক্তি। এই সব সোনার ছেলেরাই একদিন যথারীতি হতাশায় ডুবে শহরের অলিতে গলিতে গিয়ে গ্লানিময় জীবন কাটাবে। সস্তা মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবে। আর এর সবকিছুর কারণ, আমরা তাদের উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য কিছুই রেখে যেতে পারছি না। সাদা চামড়ার মানুষগুলোর বিলাসী জীবনের ফূর্তির রসদ জোগাড় করার জন্য আমাদের সন্তানেরা তাদের কয়লা খনিতে রাতদিন খেটে মরছে। দিনের পর দিন সূর্যের মুখ পর্যন্ত তারা দেখতে পাচ্ছে না। পশুর মতো খেটে একদিন কাশতে কাশতে রক্তবমি করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। আমাদের এই তরুণদের মধ্যে অনেকেই সর্দার হবে কিন্তু কোনদিন প্রকৃত পক্ষে শাসন ক্ষমতা পাবে না। কারণ আমাদের নিজেদের শাসন করার ক্ষমতা খোদ আমাদের হাতেই নেই। আমাদের শৌর্যবান বহু যোদ্ধা আছে কিন্তু তারা লড়তে পারবে না কারণ লড়াই করার মতো কোন অস্ত্র তাদের হাতে নেই।

আমাদের মধ্যে বহু মেধাবী ও প্রজ্ঞাবান রয়েছেন কিন্তু তারা এসব তরুণদের শিক্ষা দিতে পারবেন না; কারণ তাদের শিক্ষাদানের উপযুক্ত জায়গা এখনও আমরা দিতে পারিনি। এসব সম্ভাবনাময় তরুণদের স্বপ্ন শুধুমাত্র ওইসব সাদা চামড়ার মানুষগুলোর জন্য মধ্যবিত্ত একটি জীবনের চারদেয়ালে আটকা পড়ে থাকবে। আমরা যেহেতু তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এনে দিতে পারিনি, সেহেতু এসব উপহার সামগ্রী তাদের জন্য উপহাসের শামিল। আমরা জানি কামাতা (ঈশ্বর) সবকিছু দেখেন এবং কখনও ঘুমান না। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, কামাতা হয়তো এখন ঝিমুচ্ছেন। যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে আমার যাতে তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয় আমি সেই কামনা করি যাতে যথাশীঘ্র আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি; যাতে আমি তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বলতে পারি আমার এনগুবেনকুকার সন্তানেরা, আমার ঝোসা সমাজের সোনালী ফুলেরা মরে যাচ্ছে; তুমি ওঠো। তুমি তাদের বাঁচাও কামাতা! দোহাই তোমার!"

সর্দার মেলিগকিলি যখন কথাগুলো বলছিলেন তখন উপস্থিত সবাই পুতুলের মতো স্থির হয়ে তার কথা শুনছিলেন। তার বক্তব্যে আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। এমন একটি আনন্দ উৎসবের দিন তিনি যা বলেছিলেন তা কারুরই প্রত্যাশিত ছিল না। আমি তখন তার কথার মর্মার্থ বুঝতে পারিনি।

আমার মনে হচ্ছিল শ্বেতাঙ্গরা আমাদের কত শিক্ষামূলক বিষয় উপহার দিয়েছে; কত কিছু দিচ্ছে, কতকিছু শেখাচ্ছে। আর এই বুড়োটা নিজের মুর্খতার জন্য সেসব অস্বীকার করছে। সাদারা আমাদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে; আর বুড়োটা নিজ অজ্ঞতার কারণে তার মূল্য বুঝতে পারছে না। সে সময় আমার কাছে শ্বেতাঙ্গরা ছিল দেবতা। আমার ধারণা ছিল তারা আমাদের শোষণ করতে আসেনি; উপকার করতে এসেছে। সর্দারের মুখে এসব কথা শুনে তখন তাকে চরম অকৃতজ্ঞ এক বুড়ো ধাঁড়ি মনে হয়েছিল। উৎসবে উপহারসামগ্রী পাওয়ার পর নিজেকে যখন আমি বিত্তশালী ভেবে গর্ব উপভোগ করছিলাম; যখন আমি বড় হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলাম তখন তার এ 'উস্কানিমূলক ও হতাশাব্যাঞ্জক' কথা শুনে মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! তার সেই জালাময়ী বক্তব্য শিগগিরই আমার চেতনায় কাজ করতে শুরু করল। কেন করল তা আজও বুঝতে পারি না। তবে এটুকু বুঝেছি, সেদিনের সেই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সর্দার মেলিগকিলি আমার হৃদয়ে একটি বিদ্রোহের বীজ বুনে দিয়েছিলেন। প্রথমে আমি তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই বীজে অঙ্কুরোদগম হয়ে একটি চারা বড় হতে লাগলো।

পরে বুঝতে পারলাম সেদিন যে 'অজ্ঞ' লোকটা জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি আমার বিদ্রোহী স্বত্ত্বা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

যাহোক, অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে আমি কি মনে করে আবার এমবাশি নদীর পাড়ে এলাম। তখন সূর্য ডুবু ডুবু। নদীর গতিপথের দিকে চেয়ে রইলাম। মাইলের পর মাইল আঁকাবাকা পথে এই নদী ভারত মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে। এই নদী আমি আগে কোনদিন পার হইনি। নদীর ওপারে যে জগৎ তার কিছুই আমি দেখিনি। কিন্তু সেদিন মনের ভেতরটা যেন কেমন করছিল। একটা নতুন পৃথিবী যেন আমাকে সেদিন হাত ইশারায় ডাকছিল। খৎনার পর আমাদের কুড়েঘর দুটোতে রাখা হয়েছিল আমি সেখানে ছুটে গেলাম। ঘর থেকে বের হওয়ার পর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু আমরা সে দৃশ্য দেখতে পারিনি। ঝোসা রীতি অনুযায়ী ঘর থেকে বের হওয়ার পর পেছনে তাকানোর অনুমতি ছিল না। প্রতীকী অর্থে হলেও যে শৈশব ও তারুণ্যকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে তাই হয়তো সেখানে ছুটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি পিরামিডের মতো দুটো কুড়ের ধ্বংসাবশেষ কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে।

পড়ে থাকা ছাইয়ের স্তুপে মনে হল কুনু আর এমখেকেজওয়েনির মধুর দিনগুলো ওর নিচে চাপা পড়ে আছে। এখন আমি একজন পুরুষ। আমি চাইলেও এখন আর থিনটি খেলতে পারবো না। অন্যের ক্ষেতের ভুট্টা চুরি করে আগুনে ঝলসে

খাওয়ার স্বাদ উপভোগ করতে পারবো না। এখন আমি ইচ্ছে করলেই গাভীর ওলানে মুখ দিয়ে কবোষ্ণ পীযূষধারা পান করতে পারব না। আমার কাঁধে এখন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাকে যারা পুরুষ বানিয়েছে তারা কি জানে, আমার ভেতরের শিশুটি এখনও সবুজ, এখনও তরুণ?

৫

টাইহালারহাতে আমরা যারা এক সংগে খৎনা করিয়েছিলাম; তাদের সবার মতো গিরিখাতের স্বর্ণখনিতে কাজ করার বাসনা আমার ছিল না। ঝোসারাজ আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'লেখাপড়া না শিখে সাদা চামড়াওয়ালাদের সোনার খনিতে জীবন কাটানো তোমার জন্য নয়।' আমার লক্ষ্য ছিল সাবাতার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হওয়া; আর এজন্য আমাকে পড়ালেখা শিখতেই হবে। খৎনা উৎসব হওয়ার পর আমি আবার এমখেকেজওয়েনি ফিরে এলাম। তবে সেখানে বেশি দিন থাকা হল না। পড়াশুনার জন্য আমাকে ইংকোবো জেলার ক্লার্কবারি বোর্ডিং ইন্সটিটিউটে ভর্তির সিদ্ধান্ত হল। এই প্রথমবারের মতো আমাকে এমবাশি নদী পার হয়ে ইংকোবোর উদ্দেশ্যে যেতে হবে ভেবে বেশ রোমাঞ্চবোধ হচ্ছিল।

আবার ঘর ছাড়ার পালা। মনটা কেমন করছিল কিন্তু পাশাপাশি এমখেকেজওয়েনির বাইরের বিশাল জগত দেখার সুযোগ পেয়ে সে দুঃখবোধ ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। ঝোসারাজ নিজে তার রাজকীয় ফোর্ড ভিএইট গাড়ি চালিয়ে আমাকে ইংকোবো পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন। আমার স্ট্যান্ডার্ড ফাইভের পরীক্ষায় পাশ করা ও ক্লার্কবারিতে ভর্তি হওয়া উপলক্ষে তিনি বাড়িতে একটা উৎসবেরও আয়োজন করেছিলেন।

একটা বড় মেষ জবাই করে অতিথিদের খাওয়ানো হল। খাওয়াদাওয়া শেষে শুরু হলো নাচ-গান। জীবনে প্রথমবারের মতো শুধুমাত্র আমার একার সম্মানে এমন একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে দেখে নিজেকে তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল। পরিণত পুরুষ হওয়া উপলক্ষে আমার পালক পিতা একজোড়া বুট জুতো কিনে দিলেন। এর আগে আমি কখনও বুট জুতো পায়ে দেইনি। জুতো জোড়া পেয়ে এত খুশি হয়েছিলাম যে মাঝরাতে জুতো দেখার জন্য ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। নতুন জুতো এমনিতেই চকচক করছিল। কিন্তু অতিআনন্দে সেকথা ভুলে আমি মাঝরাতেই একা একা ওই জুতো দীর্ঘসময় ধরে পালিশ করেছিলাম।

ট্রান্সকেইতে যতগুলো প্রাচীন ওয়েসলেইয়ান মিশন ছিল তার একটির সীমানায় ১৮২৫ সালে ক্লার্কবারি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার দিনে গোটা থেম্বুল্যান্ডের সমস্ত আফ্রিকানদের লেখাপড়ার জন্য ক্লার্কবারিকেই সর্বোচ্চ

বিদ্যাপীঠ হিসেবে ধরা হতো। আমার পালক পিতা আমাকে ক্লার্কবারিতে নিয়ে এলেন। আমাদের সাথে ছিল জাস্টিস। একই সংগে ক্লার্কবারি ছিল মাধ্যমিক স্কুল ও টিচার ট্রেনিং কলেজ। তবে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার বাইরে এখানে কাঠমিস্ত্রির কাজ, দর্জিগিরি, টিন বানানোসহ বহু কাজের প্রশিক্ষণও দেওয়া হতো।

ক্লার্কবারিতে যাওয়ার পথে আমার পালক পিতা সেখানে গিয়ে কার সাথে কী আচরণ করতে হবে, ভবিষ্যতে কীভাবে চলতে হবে সে বিষয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি বারবার বলছিলেন আমার আচরণে যেন সাবাতা ও তার মানসম্মানে কোন আঘাত না লাগে। আমি তাকে কথা দিলাম, সেখানে আমি ভালো থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। এরপরই তিনি স্কুলের গভর্নর রেভারেন্ড সি. হ্যারিস সম্পর্কে ধারণা দিলেন। তিনি বললেন, সে সময় যে অল্পকয়জন শ্বেতাঙ্গ থেম্বু এখানে থাকতেন তাদের মধ্যে হ্যারিস একজন। তিনি আন্তরিকভাবেই থেম্বুল্যান্ডকে ভালবাসতেন এবং থেম্বু জনতার মানসিকতা চালচলন বুঝতে পারতেন। আমার পালক পিতা বললেন, সাবাতা বুড়ো হয়ে যাওয়ার পর তিনি হ্যারিসকেই রাজা করতে চেয়েছিলেন। হ্যারিস নিজে একই সংগে একজন খ্রিস্টিয়ান ও সমাজপতি ছিলেন। আমার পালক পিতা বললেন, যেহেতু আমি রাজপরামর্শক হিসেবে কাজ করতে চাই সেহেতু আমাকে অবশ্যই উপজাতিয় ও স্থানীয় আইন-কানুন ও আদব-কায়দা শিখতে হবে আর এক্ষেত্রে রেভারেন্ড হ্যারিসই আদর্শ শিক্ষাদাতা।

এমখেকেজওয়েনিতে থাকাকালীন আমি পুলিশ অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেটসহ অনেক শ্বেতাঙ্গ সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী দেখেছি। রাজবাড়িতে এরা বিভিন্ন প্রয়োজনে আসতেন। এরা সবাই গুরুত্বপূর্ণ লোক বলে আমার পালক পিতা তাদের যত্নআত্তি করতেন। তবে সে খাতির যত্নের মধ্যে তাদের প্রতি তোষামোদ করার মতো ভাবমূর্তি প্রকাশ পেত না। তিনি ওই শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তাদের নিজের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর জীব ভাবতেন না। বরং তার কোন কোন আচরণে মনে হতো সাদাদের ওপর তিনি মানসিকভাবে প্রাধান্য বিস্তার করতেই ভালবাসতেন। সাদারা বাড়িতে আসতেন, কাছ থেকে তাদের দেখতাম; কিন্তু তাদের সংগে আমার সরাসরি কোন কাজ কারবার ছিল না। তাদের সংগে কিভাবে কথা বলতে হবে তা আমার পালক পিতা কোনদিনই আমাকে শিখিয়ে দেননি। তিনি যখন তাদের সংগে বাৎচিত করতেন তখন তাকে লক্ষ্য করতাম। কিন্তু রেভারেন্ড হ্যারিসের সংগে কথা বলার আগে তিনি প্রথমবারের মতো কীভাবে তার সংগে কথা বলতে হবে; তার সংগে কী ধরণের আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তব্য দিলেন। তিনি বললেন, তাকে আমি যতটা শ্রদ্ধা ও মান্য করি রেভারেন্ডকেও ঠিক ততটাই মান্য করতে হবে।

এমখেকেজওয়েনির চেয়ে ক্লার্কবারি ছিল সব দিক থেকেই অনেক অনেক বেশি উন্নত। স্কুল কম্পাউন্ডে ছোটবড় মিলিয়ে দুই ডজনের মতো উপনিবেশিক স্টাইলের বিল্ডিং। ক্লাসঘর ছাড়াও এসব বিল্ডিংয়ে ছিল ডরমেটরি, লাইব্রেরি

বিভিন্ন ইন্সট্রাকশনাল হল। আফ্রিকান স্টাইলের বাসভবন ছেড়ে এই প্রথমবারের মতো আমি কোন ইউরোপীয় ঘরানার ভবনে থাকতে যাচ্ছি। এখানকার বিধি ব্যবস্থা দেখে মনে হলো আমাকে এমন এক নতুন জগতে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যার নিয়মকানুন সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অজ্ঞ।

আমার পালক পিতা প্রথমেই আমাকে রেভারেন্ড হ্যারিসের কাছে নিয়ে গেলেন। স্টাডিরুমে হ্যারিস তখন পড়ছিলেন। পিতা আমাকে তার সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি হ্যারিসের সংগে হাত মেলালাম। এটাও এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই প্রথম আমি কোন শ্বেতাঙ্গের সংগে করমর্দন করলাম। হ্যারিস খুবই উষ্ণ ও বন্ধুবৎসল আচরণ করলেন। তিনি পালক পিতাকে আলাদা মর্যাদায় অভ্যর্থনা জানালেন। পিতা তাকে জানালেন আমাকে রাজার কাউন্সিলর হিসেবে নিয়োগ করার কথা রয়েছে সে কারণে তিনি যেন আমাকে বাড়তি যত্ন নিয়ে পড়ালেখা শেখান। তার কথায় হ্যারিস সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। পাশাপাশি এটাও বললেন, ক্লার্কবারির সমস্ত আবাসিক ছাত্রকে স্কুল শেষে কায়িক পরিশ্রম করতে হয় এবং সে হিসেবে আমাকে বাগানের কাজকর্ম করতে হবে।

কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গেলে পালক পিতা আমাকে বিদায় জানালেন এবং যাওয়ার আগে আমার পকেটে হাতখরচ বাবদ কয়েক পাউন্ড গুজে দিয়ে গেলেন। এর আগে আমি এত অর্থ ছুঁয়েও দেখতে পারিনি। যাই হোক, আমি তাকে খুশি মনেই বিদায় দিলাম এবং আমার কারণে তার কোন সম্মানহানী হবে না বলেও তাকে কথা দিলাম।

ক্লার্কবারি ছিল মূলত থেম্বুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমার পূর্বপুরুষ বিখ্যাত থেম্বু রাজা এনগুবেঙকুকা এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তার জমি দান করেছিলেন। এনগুবেঙকুকার উত্তরসূরী হিসেবে এমখেকেজওয়েনির রাজবাড়িতে আমাকে যেভাবে খাতির করা হয়েছিল আমার ধারণা ছিল এখানেও সবাই সেভাবে আমাকে সমাদর করবে। সম্মানের চোখে দেখবে। কিন্তু শিগগিরই আমার মোহভঙ্গ হল। দেখলাম ক্লার্কবারিতে কেউ আমাকে আলাদা সম্মানের নজরে দেখছে না; কোনরকম পাত্তা দিতেও চাচ্ছে না। আমি যে রাজা এনগুবেঙকুকার বংশধর সে বিষয়টি প্রায় কেউই জানে না; আর জানলেও তারা আমাকে সে কারণে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতো তাও আমার মনে হয়নি। ক্লার্কবারিতে প্রচুর প্রতিভাবান ছেলে ছিল যারা তাদের স্ব স্ব মেধা দিয়ে সবার নজর কেড়েছিল। অন্যদিকে আমার উল্লেখ করার মতো কোন গুণই ছিল না। এই সময় অন্যদের উপেক্ষা আমাকে একটা বড় শিক্ষা দিয়েছিল। আমি দ্রুতই বুঝে ফেললাম এখানে আমার বংশ পরিচয়ের হম্বিতম্বি কোন কাজে আসবে না; নিজের যোগ্যতা তৈরি করে অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। খেলার মাঠে অধিকাংশ সহপাঠী প্রথমদিকে আমাকে এড়িয়ে চলতো এবং ক্লাসে আমাকে তেমন একটা পাত্তা দিতে চাইতো না।

ক্লার্কবারিতে ক্লাসের প্রথম দিনেই মহাবিড়ম্বনার শিকার হলাম আমি। বিল্ডিংয়ের দোতলায় ছিল ক্লাসরুম। প্রথম ক্লাস হিসেবে সকাল সকাল সেজেগুজে স্কুলে হাজির হলাম। দোতলায় ওঠার জন্য ছিল কাঠের সিড়ি। রুমের মেঝেও পালিশ করা কাঠ দিয়ে তৈরি। উপহার পাওয়া নতুন বুট পায়ে দিয়েই ঘটলো বিপত্তি। প্রথম ঘোড়ায় চড়লে যে দশা হয় এই জুতো পায়ে দিয়ে আমার অবস্থাও সেরকম হল।

এর আগে আমি কোনদিন বুটজুতো পায়ে দেইনি। ফলে এ জুতো পরে আমি ভারসাম্য রাখতে পারছিলাম না। তার ওপরে ক্লাসের মেঝে ছিল তেলতেলে। দু'তিনবার পা পিছলে যাওয়ায় ক্লাসে হাঁটা চলার সময় খুব সাবধানে পা ফেলছিলাম। আমার অবস্থা দেখে দুটো মেয়ে খুব মজা পাচ্ছিলো। দুজনের মধ্যে যে বেশি সুন্দরী সে অন্যজনের দিকে ঝুঁকে এল। বললো, 'এ গেঁয়ো ভূতটা আগে কোনদিন জুতো পরেছে বলে তো মনে হয় না!' মেয়েটা অপেক্ষাকৃত নিচুস্বরে কথাটা বললেও ক্লাসের সবাই তা শুনে ফেললো। সবাই এক সংগে হো হো হাসিতে ফেটে পড়ল। রাগে তখন আমি যেন অন্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম; আমার সারা শরীর কাঁপছিল।

যে মেয়েটা আমাকে গেঁয়ো বলেছিল ওর নাম ছিল মাদোনা বা ম্যাদোনা। দেখতে বেশ স্মার্ট। ওর সংগে সেদিন তো নয়ই বেশ কিছুদিন পর্যন্ত আমি কোন কথা বলিনি। তবে পায়ের সংগে বুট জোড়া ভালোভাবে খাপ খাইয়ে যাওয়ার পর তার সংগে পরিচিত হয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে ক্লার্কবারিতে এই ম্যাদোনাই আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠে। আসলে ম্যাদোনাই আমার প্রথম মেয়ে বন্ধু যার সংগে আমার ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় সুখ দুঃখের কথা শেয়ার করেছি। এ জীবনে যতো মেয়ের সংগে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে তাদের সবাইকে মনে মনে ম্যাদোনার সংগে তুলনা করে দেখেছি। মনে হয়েছে ম্যাদোনাই বন্ধুর সত্যিকারের মডেল।

খুব কম সময়ের মধ্যেই আমি ক্লার্কবারির গতিময় জীবনের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলাম। খুব কম বয়স থেকেই আমার খেলাধুলায় আগ্রহ ছিল। এখানে এসে পুরোদমে খেলাধুলায় অংশ নেওয়া শুরু করলাম। তবে আমার পারফর্মেন্স যা দাঁড়ালো তাকে মাঝারি মানের চেয়ে ভালো বলা যাবে না। তবে সম্মানের জন্য নয় ক্রীড়ানুরাগ থেকেই আমি খেলাধুলায় যোগ দিতাম। এবং এর জন্য টাকা পয়সাও কিছু নিতাম না। হাতে বানানো কাঠের র‍্যাকেট দিয়ে আমরা লন টেনিস খেলতাম। বিকেলে ধুলোময় মাঠে খালি পায়ে খেলতাম ফুটবল।

এই প্রথমবারের মতো আমি এমন সব শিক্ষকের সংস্পর্শে এলাম যারা ছাত্রদের পড়ানোর আগে নিজেরা যথেষ্ট পড়াশুনা করে এসেছে। এখানকার অনেক শিক্ষকই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে তারপর শিক্ষকতায় এসেছেন।

তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি পাওয়া চাট্টিখানি কথা ছিল না। একদিন ম্যাদোনার সংগে বসে পড়াশুনা করার সময় তাকে চুপি চুপি বললাম ইংরেজী আর ইতিহাসে আমার প্রস্তুতি খুব খারাপ। এ দুটো বিষয়ে কাঁচা হওয়ায় বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করতে পারি বলে ভয় পাচ্ছি। ম্যাদোনা আমাকে অভয় দিয়ে বললো, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই কারণ আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকার মধ্যে মিসেস গারট্রুড এনতালাবাদি রয়েছেন।

ম্যাদোনা জানালো, তিনি হচ্ছেন প্রথম আফ্রিকান মহিলা যিনি বি.এ পাশ করেছেন। তখন বি.এ. কি জিনিস তা ভাল করে জানতাম না। বি.এ. পাশ মানে কি? ম্যাদোনাকে বোকার মতো এ প্রশ্ন করায় সে বললো, 'বি.এ. কি তাও জানো না? বি.এ. হলো বিশাল সাইজের সাংঘাতিক কঠিন ধরণের একটা বই।' লেখাবাহুল্য ম্যাদোনার ওই রসিকতা আমি ধরতে পারিনি। সরলভাবে তার কথা সেদিন বিশ্বাস করেছিলাম।

আরেকজন আফ্রিকান স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষক ছিলেন। তার নাম বেন মাহলেসেলা। শুধু মেধাবী শিক্ষক বলে নয়, অধ্যক্ষ রেভারেন্ড হ্যারিসের সামনে নির্ভীকভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলার কারণে আমরা সবাই তাকে শ্রদ্ধা করতাম। কলেজে কালোরা তো বটেই, শ্বেতাঙ্গরা পর্যন্ত রেভারেন্ড হ্যারিসের ভয়ে তটস্থ থাকতেন। একমাত্র মাহলেসেলাকেই রেভারেন্ডের সামনে নির্ভীক থাকতে দেখেছি। এমনকি রেভারেন্ডের রুমের পাশ দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় তিনি মাথার হ্যাট খুলতেও মাঝে মাঝে ভুলে যেতেন। তার সংগে মাহলেসেলা যখন কথা বলতেন তখন তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলতেন। অন্যরা রেভারেন্ডের যে কোন আদেশ নির্দেশ অথবা সিদ্ধান্ত মুখ বুঝে মেনে নিলেও মাহলেসেলা ছিলেন ব্যতিক্রম। কোন বিষয়ে তার আপত্তি থাকলে তিনি সরাসরি রেভারেন্ডকে তার আপত্তির কথা জানিয়ে দিতেন।

রেভারেন্ড হ্যারিসকে আমি অবশ্যই শ্রদ্ধা করতাম। তা সত্ত্বেও হ্যারিসের একান্ত বাধ্যগত না থাকার জন্য মাহলেসেলাকে খুব ভাল লাগতো আমার। সে সময়ে, সামান্য প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষা নেওয়া একজন শ্বেতাঙ্গের সামনেও বি.এ. পাশ করা কৃষ্ণাঙ্গরা কুঁকড়ে যেত। একজন কৃষ্ণাঙ্গ যতই শিক্ষিত ও প্রতিভাবান হোক তাকে সর্বনিম্ন স্তরের শ্বেতাঙ্গের চেয়েও নিম্ন শ্রেণীর মনে করা হতো। কিন্তু মাহলেসেলা তাদের থোড়াই কেয়ার করতেন। নিজের ব্যক্তিত্ববোধে তিনি ছিলেন সব সময়ই সচেতন।

রেভারেন্ড হ্যারিস কঠোর নিয়মে ক্লার্কবারি চালাতেন এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বচ্ছ। এখানকার নিয়ম এত কড়াকড়ি ছিল যে আমার ধারণা, কোন মিলিটারি স্কুলও এত কঠোর নিয়মে পরিচালিত হয় না। এখানে ছোটখাটো নিয়মভঙ্গের জন্যও তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেওয়া হত। এসেম্বলির সময় রেভারেন্ড সর্বদাই বিধি-নিষেধসূচক একটি মুখভঙ্গি নিয়ে হাজির হতেন।

তার কাছে কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হতো না। তিনি যখন মিলনায়তনে ঢুকতেন তখন ট্রেনিং এবং সেকেন্ডারি স্কুলের শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলের কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যক্ষরাসহ সমস্ত স্কুল স্টাফ তার ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন।

স্কুলে আমরা ছাত্ররা রেভারেন্ডকে যতটা না শ্রদ্ধা করতাম তার চেয়ে বেশি ভয় পেতাম। কিন্তু তার বাগানে কাজ করতে গিয়ে আমি এক নতুন রেভারেন্ডকে আবিস্কার করলাম। রেভারেন্ডের বাগানে কাজ করতে এসে আমার দু'দিক থেকে উপকার হল। প্রথমত, এখানে কাজ করার সুবাদে আমার সারাজীবনের জন্য নিজের হাতে শাকসব্জী ফলানো ও বাগান করার নেশা জন্ম নেয়। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে রেভারেন্ডের মানে একজন শ্বেতাঙ্গের পরিবারের সবার সংগে মেশা; তাদের জীবন যাপন সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়া আরেকটি বিষয়ও জেনেছিলাম এই বাগানের কাজ করতে এসে। সেটি হল রেভারেন্ডের চরিত্রের দুটি দিক (একটি পাবলিক অন্যটি প্রাইভেট) সম্পর্কেও ধারণা পেয়েছি কাজ করতে এসেই। স্কুলে তাকে লৌহমানবের মতো মনে হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে তিনি যেন মাটির মানুষ।

কঠোরতার মুখোশের আড়ালে তার ছিল একটি প্রচ্ছন্ন ও উদার হৃদয়। তরুণ আফ্রিকানদের শিক্ষা দেবার ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ মানুষ। বাগানে কাজ করার সময় তাকে প্রায়ই আনমনা হয়ে যেতে দেখতাম। অযথা কথা বলে আমি তার সেই ঘোর কাটিয়ে দিতাম না। আসলে তার সংগে আমার খুব কমই কথা হতো। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে একটি সৎকাজ করে যাওয়ার জন্য রেভারেন্ড হ্যারিস তখন থেকেই আমার কাছে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন।

রেভারেন্ড কম কথার মানুষ হলেও তার স্ত্রী ছিলেন ঠিক উল্টো প্রকৃতির। ভদ্রমহিলা ফড়ফড় করে বাচাল প্রকৃতির মেয়েদের মতো কথা বলে যেতেন। তবে খুব সুন্দরী আর পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ ছিলেন তিনি। আমি যখন বাগানে কাজ করতাম তখন তিনি প্রায়ই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার সংগে গল্প করতেন। তার সংগে আমার কী নিয়ে কথা হতো তা মনে নেই। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা তিনি যে আমার জন্য নাস্তা বানিয়ে আনতেন তা স্পষ্ট মনে আছে।

পড়াশুনায় আমার শুরুটা ধীর ও মধ্যম গোছের হলেও কিছুদিনের মধ্যেই পাঠ্যসূচি আয়ত্বে নিয়ে এলাম। জুনিয়র সার্টিফিকেট কোর্স শেষ করতে সাধারণত তিন বছর লাগে কিন্তু আমি মাত্র দু'বছরেই তা শেষ করে ফেললাম। প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মেধাসম্পন্ন ছাত্র হিসেবে দ্রুত আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি ছাত্রাবস্থায় প্রচণ্ড অধ্যবসায়ী ছিলাম। এ কারণেই সম্ভবত এ সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ক্লার্কবারি ছাড়ার পরই ম্যাদোনার সংগে আমার যোগযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মেয়েটা অসাধারণ মেধাবী ছিল। কিন্তু

মাধ্যমিক পাশ করার পর তার বাবা মা তাকে আর পড়াতে রাজি হয়নি। যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সে উচ্চশিক্ষা নিতে পারেনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় তখনকার দিনে এরকম ঘটনা ছিল খুবই স্বাভাবিক। আফ্রিকানদের পশ্চাৎপদতার পেছনে তার অযোগ্যতা নয় বরং সুযোগের অভাবই মূল কারণ ছিল।

ক্লার্কবারিতে ভর্তি হওয়ার পর আমার জ্ঞানবুদ্ধি ও সংস্কৃতিগত উন্নয়নসীমা অনেক প্রসারিত হয়েছিল। অবশ্য আমি একথাও বলছি না, ক্লার্কবারি ছাড়ার পরই আমি সমস্ত কুসংস্কার মুক্ত হয়ে একেবারে উন্নত আধুনিক মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলাম। এখানে পড়াশুনার সময় ট্রান্সকেই'র সমস্ত ছাত্রের সংগে আমার ওঠাবসা হয়েছে। এছাড়া জোহান্সবার্গ ও বাসুটোল্যান্ডের (লেসোদো) বহু অভিজাত ছেলেমেয়ের সংগেও তখন ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। এ কারণে তখন আমি অন্তত প্রাথমিক মানের আধুনিক মানুষ হিসেবে নিজেকে তখন গণ্য করেছিলাম। তাদের সংগে মিশলেও কখনও মনে হয়নি আমার মতো একটা গেঁয়ো ছেলে কখনও তাদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। আমি অভিজাত ছেলে মেয়েদের মোটেও ঈর্ষা করতাম না। পোশাক-আশাক ও চালচলনে কিছুটা পরিবর্তিত হলেও মনের দিক থেকে আমি সব সময়ই নিজেকে একজন থেম্বু হিসেবে বিবেচনা করেছি। সব সময়ই আমার মনে হয়েছে শেকড়ই আমার গন্তব্য। অভিভাবকের ইচ্ছানুযায়ী থেম্বু রাজার কাউন্সিলর হওয়াই আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল। আমার আকাঙ্ক্ষার দিগন্ত থেম্বুল্যান্ডকে অতিক্রম করেনি। আমার সমস্ত স্বপ্ন ছিল এ জায়গাকে ঘিরেই। আমার বিশ্বাস ছিল একজন আদর্শ থেম্বু হয়ে উঠতে পারার চেয়ে আমার জন্য পৃথিবীতে আর কোন ভালো কিছু হতে পারে না।

৬

১৯৩৭ সালে যখন আমি উনিশে পা দিয়েছি তখন উমতাতা থেকে ১শ' ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ফোর্টবিউফোর্টের হিল্ডটাউনের ওয়েসলিয়ান কলেজে অধ্যয়নরত জাস্টিসের সংগে যোগ দিলাম। উনিশ শতকে তথাকথিত সম্মুখযুদ্ধে ফোর্টবিউফোর্ট ছিল ব্রিটিশ সেনাদের অন্যতম ঘাঁটি। এখানে ঘাঁটি গাড়ার পর ব্রিটিশরা আস্তে আস্তে বিভিন্ন গোত্রের ঝোসাদের তাদের নিজ জমি থেকে উচ্ছেদ করেছিল। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চলা সংঘর্ষে হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ ঝোসা শ্বেতাঙ্গদের হাতে নিহত হয়। এ যুদ্ধে স্যান্দাইল, মাখান্দা ও মোকোমার মত বহু বীর সাহসিকতা দেখানোর জন্য ঝোসা সমাজে শ্রদ্ধাভাজন বীর হিসেবে অমর হয়ে রয়েছেন। এদের মধ্যে মাখান্দা ও মোকোমা ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তাদের রবিন দ্বীপের কারাগারে আটকে রাখা হয় এবং বন্দী অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়। আমি যখন হিল্ডটাউনে এলাম তখন প্রধান দূর্গ

এলাকা ছাড়া বাকি প্রায় সব জায়গা থেকেই গত শতকের যুদ্ধ চিহ্ন মুছে গিয়েছিল। যুদ্ধের আগে এখানে একমাত্র ঝোসারাই বাস করতো এবং চাষবাস করে ফসল ফলাতো।

ছোটখাটো একটা উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা আঁকাবাকা রাস্তার শেষ মাথায় ছিল হিল্ডটাউন শহর। প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগতভাবে ক্লার্কবারি থেকে হিল্ডটাউন ছিল অনেক বেশি সুন্দর। এখানে যে কলেজে আমি ভর্তি হলাম সেটা ছিল আফ্রিকার সর্বদক্ষিণের সবচেয়ে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে এখানে হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ছিল। ধবধবে সাদা রঙের ঔপনিবেশিক ভবন এবং তার চারপাশের গাছপালা পড়াশুনার সত্যিকারের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ক্লার্কবারির মতো হিল্ডটাউনও মেথোডিস্ট চার্চের আওতাধীন একটা মিশন কলেজ ছিল। ইংলিশ মডেলের ভিত্তিতে এখানে খ্রিস্টিয়ান ও লিবারেল আর্টস সম্পর্কে পাঠদান করা হতো।

হিল্ডটাউনের প্রিন্সিপাল ছিলেন ড. আর্থার ওয়েলিংটন। খুব চটপটে ও পরিপাটি স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি। ডিউক অব ওয়েলিংটনের সংগে রক্তের সম্পর্ক থাকায় তিনি খুব গর্ববোধ করতেন। এসেম্বলির সময় ড. ওয়েলিংটন স্টেজে গিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত অথচ ভারী কণ্ঠে বলতেন, 'ওয়াটার লু'র যুদ্ধে ফরাসী যুদ্ধবাজ নেপোলিয়ানকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ইউরোপের সভ্যতাকে যিনি রক্ষা করেছিলেন, যিনি তোমাদের মতো আদিবাসীদের উৎপীড়ন থেকে বাঁচিয়েছিলেন সেই মহাবীর ডিউক অব ওয়েলিংটন আমার পূর্বপুরুষ। তার রক্ত বইছে আমার ধমনীতে।' তার কথা শুনে আমরাও গর্ববোধ করতাম এই ভেবে যে ডিউক অব ওয়েলিংটনের সম্মানিত বংশধরের মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক আমাদের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন। সে সময় শিক্ষিত ইংরেজদের আমরা রোল মডেল হিসেবে ভাবতাম। আমাদের মানে কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে কেউ উচ্চ শিক্ষিত হলে তাকে 'ব্ল্যাক ইংলিশম্যান' বলে ডাকা হতো। ছাত্রাবস্থায় আমাদের শেখানো হতো এবং বিশ্বাসও করতাম ইংরেজদের ধ্যানধারণাই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন দর্শন, ইংরেজ সরকারই শ্রেষ্ঠ সরকার এবং ইংরেজরাই শ্রেষ্ঠ মানুষ।

হিল্ডটাউনের জীবনযাত্রা ছিল ক্লার্কবারির চেয়েও কঠোর নিয়মতান্ত্রিক। ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে ওঠার জন্য ঘণ্টা বাজানো হতো। ঠিক ৬টা ৪০ মিনিটে ডাইনিং হলে নাস্তা দেওয়া হতো। নাস্তা বলতে শুকনো রুটি আর তা ভিজিয়ে খাওয়ার জন্য গরম চিনির শিরা বা রস। মাথার ওপরে ইংরেজ সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের ছবি টানানো ছিল। নিচে বসে সস্তা দরের নাস্তা খেত শিক্ষার্থীরা। যাদের টাকা পয়সা বেশি ছিল তারা ব্যক্তিগতভাবে মাখন কিনে রাখতো। প্রতিদিন সেই মাখন দিয়ে তারা রুটি খেতো। আমি ওসব খেতাম না। শুকনো টোস্ট দিয়েই নাস্তা সেরে নিতাম। ঠিক আটটায় ডরমেটরির বাইরের আঙিনায় সবাই অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়াতাম। মূলত উপস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যই এই এসেম্বলির রেওয়াজ চালু ছিল। পৌনে একটা পর্যন্ত একটানা ক্লাস চলত। তারপর লাঞ্চ ব্রেক। লাঞ্চে

খেতে দেওয়া হত স্যাম্প আর টক দইয়ের সংগে সীম দিয়ে বানানো ঘন্ট। অবশ্য কালেভদ্রে মাংসও দেওয়া হত। লাঞ্চ শেষে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পড়াশুনা। এরপর একটু ব্যায়াম করা অথবা খেলাধুলার জন্য ১ ঘন্টা ছাড়া হতো। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই রাতের খাওয়া শেষ করে ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত আবার পড়তে বসতে হত। পড়া শেষ হলে ঘুমাতে যেতে হত। ঠিক সাড়ে ৯টায় সব বাতি নিভিয়ে দেওয়া হত।

পুরো দেশে হিল্ডটাউনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। থেম্বুল্যান্ড তো বটেই বাসুটোল্যান্ড, সাওয়াজিল্যান্ড ও বেখুয়ানাল্যান্ডের মতো জায়গা থেকেও এখানে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসতো। এখানকার বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী ঝোসা হলেও অন্য অনেক উপজাতির ছেলে মেয়েরাও এখানে পড়তে আসতো।

স্কুল শেষ হলে এবং সপ্তাহান্তে ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ উপজাতিয় বন্ধুদের সংগে মিলিত হত। ঝোসা সমাজে অনেকগুলো উপজাতি ও গোত্র ছিল। এরা স্ব স্ব গোত্রের লোকদের সংগে বেশি মিশতো। যেমন অ্যামামপোন্ডো উপজাতির ছাত্রটি অ্যামামপোন্ডোর কোন ছেলের সংগে বেশি সদ্ভাব রাখতো। আমি নিজেও বিষয়টি অনুসরণ করতাম। কিন্তু হিল্ডটাউনে সোথোভাষী জাকারিয়াহ্ মোলেতে ছাড়া প্রথম দিকে আমার আর কোন বন্ধু ছিল না।

আমাদের প্রাণীবিদ্যার শিক্ষক ফ্রাঙ্ক লেবেনটেলেও একজন সোথোভাষী ছিলেন। এ ভদ্রলোক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও তুমূল জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি আমাদের সংগে বন্ধুর মতো মিশতেন। এমন কি কলেজের প্রথম ফুটবল লীগে তিনি খেলেছিলেন এবং সে খেলায় রীতিমতো তারকা খ্যাতি পেয়েছিলেন। তার বিষয়ে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল নিজে উমাতা উপজাতির লোক হয়েও তিনি একটি ঝোসা মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। আলাদা আলাদা উপজাতিতে বিয়ে তখনকার দিনে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। লেবেনটেলেকে দেখার আগ পর্যন্ত এক জাতের লোক অন্য জাতের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে তা আমার কল্পনায়ও আসেনি। এরকম অসবর্ণে বিয়েকে আমাদের সমাজে 'ট্যাবু' (নিষিদ্ধ) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু লেবেনটেলে আর তার বউকে দেখে আমার মানসিকতা একটু উদার হওয়া শুরু করলো। ধীরে ধীরে আমার এই বোধ আসতে শুরু করলো যে আমি শুধু একজন থেম্বু বা ঝোসা নই; আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় আমি আফ্রিকান।

আমি যে ডরমেটরিতে থাকতাম সেটাতে মোট ৪০টি বেড ছিল। মাঝখানে বিশাল একটা প্যাসেজ। তার দু'পাশে ২০টি করে বেড। আমাদের হাউস মাস্টার ছিলেন রেভারেন্ড এস.এস. মোকিতিমি। এই মোকিতিমিই পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকার মেথোডিস্ট চার্চের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। মোকিতিমিও একজন সোথো ভাষাভাষী ছিলেন। তিনিও ছাত্রদের কাছে খুব জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। ছেলে মেয়েদের সুবিধা অসুবিধার কথা খুব

মন দিয়ে শুনতেন এবং সে মতো তাদের সমস্যা সমাধানে তড়িৎ ব্যবস্থা নিতেন বলে শিক্ষার্থীরা তাকে সাংঘাতিক পছন্দ করতো।

আরেকটা কারণে মোকিতিমির প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। কারণটা হলো ড. ওয়েলিংটনকে একবার তিনি ভেড়া বানিয়ে ছেড়েছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় ছাত্রদের বিষয় নিয়ে দুই ক্লাস ক্যাপ্টেনের মধ্যে তুমুল বিবাদ বাধে। ক্যাপ্টেনদের কাজ ছিল সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা; তাদের গণ্ডগোলে উস্কে দেওয়া নয়। বিবাদ মিমাংসার জন্য মোকিতিমিকে ডাকা হলো। সুপারভাইজার হিসেবে তিনি সবাইকে নিয়ে সালিশে বসলেন। এসময় ড. ওয়েলিংটন ছিলেন না। তিনি কোন কারণে শহরে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ফিরলেন তখন মিমাংসা বৈঠক চলছে। দু'পক্ষের মধ্যে বেশ বাদানুবাদ চলছে। ড. ওয়েলিংটন কক্ষে ঢোকার সংগে সংগে সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল। মনে হল কলহরত মানবসম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের পথ দেখানোর জন্য স্বয়ং ঈশ্বর সেখানে স্ব মহিমায় আবির্ভূত হয়েছেন।

ড. ওয়েলিংটন নিজেকে অত্যন্ত রাশভারি ভাবমূর্তিতে রেখে কিসের হট্টগোল চলছে তা জানতে চাইলেন। মোকিতিমি ওয়েলিংটনের পাশে দাঁড়ালে ওয়েলিংটনের কাছে তাকে সব দিক থেকেই শিশু মনে হতো। উচ্চতায় মোকিতিমি বড়জোর ওয়েলিংটনের কাঁধ সমান। ওয়েলিংটন ছিলেন কলেজের সর্বেসর্বা। সর্বোপরি তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ। এসব কারণে সালিশি বৈঠকে ওয়েলিংটনের ঢুকে পড়া এবং ঘটনা জানতে চাওয়া আমাদের কাছে খুব একটা অযৌক্তিক মনে হয়নি। কিন্তু মোকিতিমি ওয়েলিংটনের হস্তক্ষেপে সম্ভবত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি খুব আস্তে যথেষ্ট বিনয় নিয়ে ওয়েলিংটনকে বললেন, 'ড. ওয়েলিংটন, পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আমি আগামীকাল সকালে আপনাকে পুরো ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট দেব।' এ কথায় ওয়েলিংটন বললেন, 'না, এখানে কি সমস্যা হয়েছে তা আমি এ মুহূর্তে জানতে চাই।' রেভারেন্ড মোকিতিমি এতক্ষণ চেয়ারে বসা ছিলেন। এবার তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সরাসরি ওয়েলিংটনের দিকে চেয়ে বললেন, 'ড. ওয়েলিংটন, আমি এখানকার হাউসমাস্টার। আমি আপনাকে বলেছি যা হয়েছে, আগামীকাল আমি সে বিষয়ে রিপোর্ট দেব। এর বাইরে এখন আপনাকে আমি কিছুই বলবো না।'

মোকিতিমির কথা শুনে আমাদের কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগলো। ড. ওয়েলিংটনের মুখের ওপর কৃষ্ণাঙ্গ মোকিতিমি এতবড় কথা বলে ফেলতে পারলো! আমরা তক্ষুণি একটা বড় ধরণের বিস্ফোরণ আশা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে ড. ওয়েলিংটন বললেন, 'ভেরি ওয়েল!' বলেই গট গট করে চলে গেলেন। আমি সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম ড. ওয়েলিংটন কত মহান আর ভদ্রমানুষ; একই সংগে মোকিতিমি কত সাহসী আর আত্মবিশ্বাসী ছিলেন।

রেভারেন্ড মোকিতিমি কলেজের নিয়ম-কানুনের খোল নলচে বদলে ফেলতে চেয়েছিলেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের খাওয়া-দাওয়া ও চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে চেয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি আমাদের স্ব স্ব দায়িত্ব ঠিক সময়ে পালনের ওপরও জোর তাগিদ দিতেন। আমরা তার প্রচেষ্টার প্রতি সর্বাঙ্গীন সমর্থন দিয়েছিলাম। হোস্টেলের নিয়ম-কানুনে তিনি যেসব সংস্কার আনলেন তার একটি বাদে সবগুলোই আমার মতো গ্রাম থেকে আসা ছেলেদের জন্য কঠিন হয়ে পড়লো। সেই একটি বিশেষ সংস্কার হলো, প্রতি রোববার তিনি ছেলে মেয়েদের একত্রে খাবার ব্যবস্থা চালু করলেন। আমি এ ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলাম। কারণ আমি তখনও ডাইনিং টেবিলে বসে ছুরি ও কাটা চামচের সাহায্যে খাবার খাওয়ার কায়দাটা আয়ত্বে আনতে পারিনি। এমখেকেজওয়েনিতে থাকতে উইনির বোন কাটা চামচে খেতে দিয়ে আমাকে গেঁয়ো প্রমাণিত করেছিল। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে করে আমি দ্বিতীয়বার তীক্ষ্ণ নজরওয়ালা মেয়েদের সামনে বসে খেতে চাইলাম না। কিন্তু মোকিতিমি আমার বিরোধীতাকে পাত্তা দিলেন না এবং যথারীতি রোববার যৌথ ভোজের আয়োজন করলেন। আমাকে ওই দিন বাধ্য হয়ে উপোষ থাকতে হল।

ছোটবেলা থেকে খেলার মাঠেই আমি বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলাম। তবে ক্লার্কবারি থেকে হিল্ডটাউনের খেলাধুলার মানে আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল। ক্লার্কবারিতে পরিচিত ক্রীড়াবিদ হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও হিল্ডটাউনে এসে আমি প্রথম বছরে কোন দলে খেলার সুযোগই পেলাম না। সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর আমার বন্ধু লোকি এন্ডিজামেলা আমাকে দূরপাল্লার দৌড়ে প্র্যাকটিস করার পরামর্শ দিল। হাল্কা পাতলা ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী হওয়ায় লং ডিস্টেন্স রানিংয়ে আমার নাকি সম্ভাবনা আছে। তার কথামতো আমি দৌড় শুরু করলাম। প্রতিদিন বহুদূর পর্যন্ত দৌড়ের অনুশীলন করতাম।

এ সময় আমার ভালোই লাগতো। পড়াশুনা আর নিয়মমাফিক একাডেমিক আদেশ নিষেধের বাইরে চলে আসতে পারতাম। তবে দৌড়ানোর পাশাপাশি আমি আরেকটা খেলায়ও অনুশীলন শুরু করেছিলাম। সেটা হল বক্সিং। প্রথমে খুব হেলাফেলা মনোভাব নিয়ে বক্সিং শুরু করেছিলাম। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই আমি নিয়মিত বক্সার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করি।

হিল্ডটাউনে সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর রেভারেন্ড মোকিতিমি ও ড. ওয়েলিংটন আমাকে ছাত্রদের সর্দার বা গ্রুপ ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব দেন। ক্যাপ্টেনের বাড়তি অনেক দায়িত্ব ছিল এবং নতুন দলনেতা হিসেবে আমার ঘাড়েও যথারীতি অনেক দায় চেপে বসলো। শুরুর দিকে আমার কাজ ছিল ক্লাস শেষে বিকেল বেলা যেসব ছাত্রদের জানালা দরজা পরিষ্কার করার দায়িত্ব ছিল তাদের দিকে নজর রাখা। কোন বিল্ডিং পরিষ্কারের দায়িত্ব কোন দলকে দেওয়া হবে তাও আমি ঠিক করে দিতাম। কিছুদিন পর আমার দায়িত্ব বাড়লো। 'নাইট ডিউটি' যোগ হল। ডরমেটরিতে আমাদের কোন টয়লেট ছিল না। বিল্ডিং থেকে প্রায় একশ' ফুট

দূরে বাথরুম ছিল। রাত-দিন সব সময় সেখানেই ছাত্রদের বাথরুম সারতে হতো। কোন কোন রাতে বৃষ্টি হলে ছাত্র বৃষ্টিতে ভিজে ওই বাথরুমে যেতে চাইতো না। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েই কাজ সারতে চাইতো। ছাত্ররা যাতে এ কাজ করতে না পারে সেজন্য আমাকে রাত জেগে পাহারা দিতে হতো।

একদিন রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হল। আমি সন্তর্পনে বারান্দার কাছে গিয়ে আড়ি পাতলাম। দেখলাম জন পনের ছেলে বারান্দায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছে। আমি তাদের হাতে নাতে ধরে ফেললাম। যথারীতি নিয়মভঙ্গের তালিকায় সব কটার নাম লিখে ফেললাম। ঠিক একই রাতে (ভোর রাতের দিকে) আবার শব্দ পেয়ে বারান্দায় এলাম। দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে কে যেন প্রস্রাব করছে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরেই চিৎকার শুরু করলাম। আশপাশের ঘর থেকে সবাই ছুটে এল। ছেলেটা আমাদের দিকে ফিরতেই দেখি সে আমারই মতো একজন ছাত্রসর্দার। এবার সবাই আমাকে এক যোগে প্রশ্ন করলো, *'কুইস কাস্টোডিয়েট ইপসোস কাস্টোডেজ?'* (গার্ডিয়ানদের গার্ড দেবে কে?) তাদের কথা খুবই সত্য। দলনেতা নিজেই যদি আইন ভঙ্গ করে তাহলে সাধারণ ছাত্র ছাত্রী কীভাবে তাকে মান্য করবে? কিন্তু কার্যত দলনেতারা আইনের উর্ধে থাকত। কারণ সে নিজেই হচ্ছে 'আইন'। আর নৈতিকভাবে একজন দলনেতা হয়ে আরেকজন দলনেতার নামে নালিশ করাটাকে আমিও ভালো চোখে দেখলাম না। ফলে তার সাজা মওকুফ করতে গিয়ে বাকি পনের জনের পুরো লিস্টটাই আমাকে ছিঁড়ে ফেলতে হল। আমি কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনলাম না।

রাতের আকাশ চিরে যেমন উল্কা ছুটে যায় থার্ড ইয়ারে ওঠার পর তেমনি একটি আকস্মিক ঘটনা আমার জীবনে ঘটে গেল। বছর শেষ হওয়ার দু'একমাস বাকি আছে। খবর এল বিখ্যাত ঝোসা কবি ক্রুনি এমখাওয়ি আমাদের স্কুল পরিদর্শনে আসবেন। আসলে এমখাকওয়ি ছিলেন একজন জাত 'ইমবোঙ্গি' বা স্বভাব গীতিকবি। তিনি মুখে মুখে সমসাময়িক ও ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে কাব্যিক ছন্দে বর্ণনা করতেন।

তার আগমন উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ স্কুলে সেদিন ছুটি ঘোষণা করে দিলেন। কবিকে আমন্ত্রণ জানাতে সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা-কালো পোশাক পরে এসেম্বলি রুমে হাজির হলাম। হল রুমটার শেষে মাথায় ছিল একটা স্টেজ। স্টেজের পাশে একটা দরজা ছিল। ওই দরজা খুললে ড. ওয়েলিংটনের বাড়ি দেখা যেত। দরজাটার তেমন কোন বিশেষত্ব ছিল না। তবে আমরা ভাবতাম সেটা কেবলমাত্র ড. ওয়েলিংটনের জন্য বানানো হয়েছে কারণ তিনি ছাড়া ওই দরজাটা অন্য কেউ ব্যবহার করত না।

যাহোক আমরা যখন হলরুমে বসে আছি তখন হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। সবাই প্রথমে ভেবেছিল ড. ওয়েলিংটন ঢুকছেন। কিন্তু পরে দেখা গেল তিনি নন। আমাদের সবাইকে অবাক করে গায়ে চিতাবাঘের চামড়ায় তৈরি পোশাক আর মাথায় হ্যাট পরে এক কৃষ্ণাঙ্গ লোক ঢুকলেন। তার হাতে একটা বল্লম। তার

পিছু পিছু ঢুকলেন ড. ওয়েলিংটন। একজন উপজাতিয় কৃষ্ণাঙ্গের পিছনে ড. ওয়েলিংটন ঢুকছেন— এ দৃশ্যে সবাই কেমন হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

এটা আমাদের মধ্যে কী ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা বোঝানো মুশকিল। মনে হচ্ছিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বুঝি উল্টে গেছে। আমাদের আরও অবাক করে কবি এমখাকওয়ি ড. ওয়েলিংটনের পাশে বসলেন। আমরা তখন রীতিমতো উত্তেজনা বোধ করছি। তখন তাকে কোন এক মহাপুরুষ বলে মনে হচ্ছিল।

কিন্তু কবি এমখাকওয়ি যখন উঠে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুরু করলেন, তখন সত্যি কথা বলতে কি আমার আশাভঙ্গ হয়েছিল। তার কথাবার্তা শুনে চরম হতাশ হলাম। একজন ঝোসা নায়ক হিসেবে তাকে আমি একজন দীর্ঘদেহী দৃঢ় ভাষী ও বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টির লোক বলে মনে করেছিলাম।

কিন্তু তাকে দেখে আর দশটা সাধারণ ঝোসার মতোই মনে হল। ঝোসা ভাষায় তিনি যখন বক্তব্য দেওয়া শুরু করলেন তখন আরও বিরক্তিকর মনে হল। তার কণ্ঠ একে তো ছিল মৃদু আর মেয়ে মানুষের মতো, তারওপর তিনি কথা বলছিলেন ধীর লয়ে। যুৎসই শব্দটি প্রয়োগ করার জন্য সময়ক্ষেপণ করে করে বক্তব্য রাখছিলেন।

কবি এমখাওয়ি স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে যখন কথা বলছিলেন, তখন তিনি মাঝে মাঝে হাতের বল্লম ওপরের দিকে তুলে ধরছিলেন। মাথার ওপর পর্দা টানানোর জন্য যে তার ঝোলানো ছিল বল্লমটা ওই তারে গিয়ে আঘাত করছিল। রাজনৈতিক প্রসংগে কথা বলার সময় তিনি কিছুক্ষণ পর পর তার বল্লমের দিকে চাইছিলেন। তারের সংগে বল্লমের গুতো লাগায় বিরক্তিকর ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল। কবি হঠাৎ একটু থামলেন। আবার বলা শুরু করলেন। অবাক করার মতো বিষয় হল তার কণ্ঠ ধীরে ধীরে চড়তে এবং ভাষণের শব্দশৈলী দৃঢ় ও জোরালো রূপ নিতে শুরু করলো। তিনি স্টেজের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পায়চারি করার মতো হাঁটছিলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন এবং সরাসরি দর্শকদের দিকে চেয়ে বললেন, 'তারের ওপর আমার বল্লমের আঘাতে যে ঝনঝন শব্দ হচ্ছে সেটি ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংগে আফ্রিকান সংস্কৃতির সংঘর্ষের প্রতীক।' তিনি হঠাৎই বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'আমার হাতে তোমরা যে বল্লম দেখছো সেটা আফ্রিকান ইতিহাসের মহিমান্বিত ও সত্য সুন্দর বিষয়াবলীর প্রতীক। একজন আফ্রিকান যোদ্ধা অথবা একজন আফ্রিকান শিল্পী উভয়কেই এ বল্লম তার আত্মপরিচয় প্রকাশে সাহায্য করে। এ বল্লম আফ্রিকার সংস্কৃতির প্রতীক। আর এই যে মাথার ওপরে পর্দা টানানোর জন্য ঝোলানো তামার তার দেখছো এটা পশ্চিমা শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের একটা আলামত। এ তার খুব চিকন অথচ শক্ত; চতুর কিন্তু প্রাণহীন।'

কবি ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তিনি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'আমি একটা লম্বা হাড়ের ওপর লোহা বসানো বল্লমের গুণকীর্তন অথবা ধাতব

তারের সুক্ষ্ম কারচুপি বর্ণনার জন্য এখানে আসিনি। আমি শুভ আর অশুভ, স্থানীয় আর বিদেশী বেনিয়াদের সংঘাতের কথা বলতে এসেছি। আমি বলতে এসেছি, যারা আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে বিনষ্ট করে তাদের সভ্যতা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় সেই বিদেশীদের আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি এবং এই সমবেতজনগণের সামনে ভবিষ্যদ্বানী করতে পারি যে আফ্রিকা জাগবেই। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে আফ্রিকা ঘুরে দাঁড়াবে। সাদা চামড়ার নকল দেবতারা বেশিদিন আমাদের জুজুর ভয় দেখাতে পারবে না। আমরা আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে জাগবো। বিদেশী কু ধারণাকে ছুঁড়ে ফেলে আমরা জাগবোই।'

তার কথা শুনে আমি নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মঞ্চে বসা ছিলেন খোদ ড. ওয়েলিংটনসহ আর বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক। তাদের সামনে এইভাবে আক্রমণাত্মক ভাষায় তিনি যে কথা বলতে পারবেন তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তার বক্তব্যে আমার সেদিন নতুন করে বোধোদয় হল। ড. ওয়েলিংটনের মতো যেসব শ্বেতাঙ্গকে আমি এতকাল প্রভুর মতো দেখে এসেছি কবি এমখাওয়ির বক্তব্য শুনে আমার সে ধারণা পাল্টে গেল।

বক্তব্য শেষ করে এমখাওয়ি তার বিখ্যাত একটি কবিতা সুরে সুরে আবৃত্তি করা শুরু করলেন। কবিতাটির বিষয়বস্তু হল তিনি আসমানের সমস্ত নক্ষত্র পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীর মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়েছেন। বল্লমখানা একবার স্টেজের এদিকে আর একবার ওদিকে তুলে ধরে তিনি ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজসহ সমস্ত ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্যে বললেন, 'সর্বাধিক নক্ষত্রের আধার এই সুবিশাল ছায়াপথ তোমাদের দিলাম। সর্বাধিক নক্ষত্র তোমাদের দিলাম কারণ তোমরা অদ্ভুত ঈর্ষাপরায়ণ এক লোভাতুর জাতি। এত আছে তবু তোমাদের 'চাই চাই' শেষ হয় না। তোমাদের 'খাই খাই' বন্ধ হয় না।' এরপর তিনি এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে নক্ষত্র বন্টন করলেন। এর পর আফ্রিকার দেশগুলোকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করলেন তিনি। একেকটি আফ্রিকান দেশের জন্য একেকটি তারা বরাদ্দ করলেন। একেকটি উপজাতির জন্য উপহার দিলেন একেকটি বিশেষ নক্ষত্র।

আবৃত্তির সংগে সংগে তিনি অদ্ভুত ভঙ্গিমায় নাচতে লাগলেন। হাতের বল্লম এদিক-ওদিক নেড়ে প্রাচীন আদিবাসীদের কায়দায় দাপাতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ শান্ত ও স্থির হয়ে দর্শকদের দিকে মুখ বাড়ালেন। খুব নিচু স্বরে বলতে লাগলেন,

'এবার এসো আমার প্রিয় ঝোসা সমাজ! তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি আমার সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ একটি তারা। তোমরা যেহেতু অসম সাহসী এক জাতি। তোমাদের জন্য তাই দিয়ে যাচ্ছি ভোরের শুকতারা। সময় গুনতে, বছর গুনতে, বয়স

শুনতে প্রয়োজন এ তারার। তোমার জন্য, তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি অদম্য এই শুকতারা!' কবিতার শেষ লাইনটা বলে তিনি বুকের ওপর মাথা ঝোকালেন। আমরা হাততালি দিয়ে হর্ষোধ্বনি করতে করতে উঠে দাঁড়ালাম। তার কবিতা শুনে নিজেকে নিয়ে আমার তখন খুব গর্ব হচ্ছিল। একজন আফ্রিকান নয়; একজন ঝোসা পরিচয়ে পরিচিত হতে পেরে আমার মনে হচ্ছিল আমি সত্যিই বিশেষ এক শ্রেণীভুক্ত বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ।

কবি এমখাওয়ির বক্তব্য ও কবিতা আমার অন্তরাত্মাকে যেন জাগিয়ে দিল। তিনি নিজে একজন ঝোসা ছিলেন। তবে তার জাতীয়তাবোধ ঝোসা উপজাতিকে ঘিরে ছিল না। পুরো আফ্রিকাকে তিনি এক সংগে সংহত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

আমার হিল্ডটাউন ছাড়ার সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো মাথার মধ্যে ততই নতুন নতুন প্রথাবিরোধী আইডিয়া জমা হতে থাকল। কবি এমখাওয়ি যদিও সবচেয়ে বেশি ঝোসাদের প্রশংসা করেছিলেন তারপরও আফ্রিকার সব উপজাতি ও আদিবাসীকে এক ছাতার নিচে দেখার স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম। যদিও তখন পর্যন্ত আমার শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের মানসিকতা ছিল; এবং এর জন্য তাদের কাছে সময় অসময়ে মাথানত করতে হয় তাও জানতাম। তারপরও একজন সাদার পাশে একজন কালো সমান সম্মান নিয়ে দাঁড়াবে এমন স্বপ্ন আমার মধ্যে দ্রুত বড় হতে লাগলো। আসলে কবি এমখাওয়ির বক্তব্যে আমি সম্ভবত প্রথমবারের মতো নিজেকে একজন গর্বিত ঝোসা এবং জাতীয়তাবাদী আফ্রিকান হিসেবে আবিস্কার করি।

৭

১৯৬০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের একমাত্র আবাসিক উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল অ্যালিস মিউনিসিপ্যালিটির ফোর্ট হেয়ার ইউনিভার্সিটি কলেজ। হিল্ডটাউন থেকে ২০ মাইল পূর্বে ছিল কলেজটি। এটিকে শুধু সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বললে ভুল হবে। এ প্রতিষ্ঠানে ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার সমস্ত জ্ঞানতাপসদের আলোকবর্তিকা ছিল এই ফোর্ট হেয়ার কলেজ। তখনকার দিনে আমার মতো তরুণ কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে এটিই ছিল অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, হার্ভার্ড অথবা ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়।

ফোর্ট হেয়ারে ভর্তি হওয়া নিয়ে আমার পালক পিতা যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু সহজেই সেখানে ভর্তির যোগ্যতা প্রমাণ করলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে তিনি আমাকে প্রথমবারের মতো একটা স্যুট বানিয়ে দিলেন। ধূসর রঙের ওই স্যুট পরার পর আমার নিজেকে বেশ ওজনদার ও অভিজাত বলে মনে হচ্ছিল।

তখন আমার বয়স ২১ বছর। স্যুট পরে কলেজে ঢোকার পর আমার মনে হচ্ছিল পুরো ফোর্ট হেয়ারে আমার চেয়ে স্মার্ট কোন ছাত্র নেই।

আমি বুঝতে পারছিলাম সাফল্যের দিকে অবিরাম এগিয়ে যাওয়ার জন্যই আমার জন্ম হয়েছে। আমার সবচেয়ে বড় মানসিক সান্ত্বনার বিষয় ছিল আমি আমার পালক পিতাকে খুশি করতে পেরেছিলাম। তার গোত্রে আমিই প্রথম কেউ যে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি অর্জন করতে পেরেছে। পালক পিতার ছেলে জাস্টিস তখনও হিল্ডটাউনে জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাশের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। পড়াশুনার চেয়ে খেলাধুলার প্রতি তার ঝোঁক ছিল বেশি। এ কারণে সে পাশ করতে পারছিল না।

১৯১৬ সালে স্কটিস মিশনারীরা ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। উনিশ শতকের সবচেয়ে বড় দূর্গ এলাকা ছিল এখানে। পাথুরে জমিনের ওপর বানানো হয়েছিল এ দূর্গ। পাশেই ছিল তিউমি নদী। উনবিংশ শতকে ঝোসার রারহাবি রাজবংশের শেষ স্বাধীন রাজা স্যানডিলেকে এ দূর্গের সৈন্যরাই চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। এর মাধ্যমেই ঝোসারা ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায়।

ফোর্ট হেয়ারে সব মিলিয়ে আমরা মোট ছাত্র ছিলাম দেড়শ জন। এর মধ্যে ডজন খানেক বা তারও কিছু বেশি ছাত্র ক্লার্কবারি অথবা হিল্ডটাউনে আমার সংগে পড়ত। সে হিসেবে আমরা আগে থেকেই একে অন্যকে চিনতাম। ফোর্ট হেয়ারে এসে পূর্ব পরিচিতদের মধ্যে প্রথম যার সংগে আমার দেখা হয় সে হলো কে. ডি. মাতানজিমা। গোত্র পরিচয়ের সূত্রে কে. ডি. সম্পর্কে আমার ভাইপো হলেও বয়সে সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিল। আমি যখন সেখানে গেলাম তখন সে থার্ড ইয়ারের ছাত্র। লম্বা, সুদর্শন ও আত্মবিশ্বাসী কে. ডি. আমাকে তার স্নেহছায়ায় টেনে নিল। জাস্টিসকে আমি যেমন একটু সমীহের নজরে দেখতাম কে. ডিকেও সেভাবে সম্মান করতাম।

আমি আর কে.ডি. দুজনেই মেথোডিস্ট খ্রিস্টান ছিলাম। সে ওয়াইসলি হাউস নামে একটা দোতলা হোস্টেলে থাকত। আমারও সেখানে থাকার ব্যবস্থা করা হল। ক্যাম্পাসের এক প্রান্তে ছিল ভবনটা। কে. ডি. সব সময় আমার খোঁজ খবর নিত। আমাকে কাছের একটা গীর্জায় সে কাজ করাতে নিয়ে যেতো। আমার পালক পিতা স্কুলে পড়াশুনার সময় বাড়ি থেকে ছেলেমেয়েদের কাছে টাকা পাঠানোর নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কে. ডি. আমার হাতখরচের অর্থ উপার্জনের জন্য কাজ জুটিয়ে দিত। আমার পালক পিতার মতো কে.ডি.ও আমাকে রাজা সাবাতার ভবিষ্যত কাউন্সিলর হিসেবে দেখতো। সম্ভবত সে কারণে সেও আমাকে আইন পড়ার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিত।

ক্লার্কবারি ও হিল্ডটাউনের মতো ফোর্ট হেয়ারও একটা মিশনারী কলেজ ছিল। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্যপ্রদর্শন এবং সরকার

ও গীর্জা কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্যপ্রদর্শন এবং সরকার ও গীর্জা কর্তৃপক্ষের দেওয়া শিক্ষাসেবার জন্য কৃতজ্ঞ থাকার ব্যাপারে আমাদের সব সময় সতর্ক করে দেওয়া হতো।

এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের ঔপনিবেশিক নীতিমালা ও ভাবমূর্তির জন্য প্রায়শই চরমভাবে সমালোচনার মুখে পড়তো। তবে আমার বিশ্বাস, এতে সামগ্রিক ফলাফলটা ভালোই হতো। সরকার যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে চাইতো না অথবা সরকারের সামর্থে কুলাতো না তখন মিশনারীরা তা করতো। আরেকটা ব্যাপার হলো সাধারণ সরকারি স্কুলে যেরকম বর্ণবাদী মনোভাব বজায় রেখে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া হতো মিশনারী স্কুলে সেটা প্রায় ছিলই না। তবে মিশনারী স্কুলে নৈতিক শিক্ষা ও আচরণের ক্ষেত্রে সব সময়ই কড়াকড়ি নীতি মেনে চলা হতো।

পুরো আফ্রিকা অঞ্চলে যেসব মহান জ্ঞানতাপস ও মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে তাদের অনেকের ছাত্রজীবন কেটেছে ফোর্ট হেয়ারে। এটা একইসংগে ছিল তাদের আবাসস্থল তথা 'ইনকিউবেটর'। তখনকার শীর্ষতম বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম ছিলেন প্রফেসর জেড. কে. ম্যাথিউস। ম্যাথিউস ছিলেন একজন সাধারণ খনি শ্রমিকের সন্তান। বুকার ওয়াশিংটনের আত্মজীবনী 'আপ ফ্রম স্লেভারি' (এতে কী করে কঠিন পরিশ্রম আর অধ্যবসায় দিয়ে সাফল্য জয় করা যায় তা দেখানো হয়েছে) পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ বইটিই তাকে বড় হওয়ার পথে সহায়তা করেছিল।

জেড. কে ম্যাথিউস আমাদের সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও আফ্রিকান আইন পড়াতেন। তিনি খোলামেলাভাবেই সরকারের সামাজিক নীতির কঠোর সমালোচনা করতেন।

আরেক অন্যতম শিক্ষক ছিলেন প্রফেসর ডি.ডি.টি. জাবাভু। ফোর্ট হেয়ার ও জাবাভুকে অভিন্ন আত্মা মনে করা হতো। ১৯১৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু হওয়ার সময় তিনি প্রথম নিয়োগপ্রাপ্তদের একজন শিক্ষক ছিলেন। প্রফেসর জাবাভু লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ভাষা ও ব্যাকরণের ওপর স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও জাবাভু আমাদের ঝোসা ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি ইতিহাস ও নৃবিজ্ঞান পড়াতেন। ঝোসাদের বংশগতি সম্পর্কিত ইতিহাসের ব্যাপারে তিনি ছিলেন এক জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। তিনি আমার বাবা সম্পর্কে এমন কিছু দুর্লভ তথ্য দিয়েছিলেন যা আমি আগে জানতাম না। এছাড়া তিনি আফ্রিকানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সব সময় স্পষ্টভাষী ছিলেন। ১৯১৬ সালে অল আফ্রিকান কনভেনশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন প্রফেসর জাবাভু। কেপ শহরে সার্বজনীন ভোটাধিকার রহিত করার প্রস্তাব দিয়ে পার্লামেন্টে যে আইন পাশের পায়তারা শুরু হয়েছিল এই সংগঠনই তার তীব্র বিরোধীতা করেছিল।

একদিনের একটি মজার ঘটনা মনে পড়ছে। আমি একবার ফোর্ট হেয়ার থেকে ট্রেনে করে উমতাতা যাচ্ছি। আমি আফ্রিকান কম্পার্টমেন্টে উঠলাম। ওই কম্পার্টমেন্ট শুধুমাত্র কালোদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। একজন শ্বেতাঙ্গ টিকেট চেকার আমাদের টিকিট যাচাই করতে এলেন। আমার টিকিট হাতে নিয়ে দেখলেন আমি এলিস স্টেশন থেকে উঠেছি। সেটা দেখেই ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি কি জাবাভু'র স্কুল থেকে আসছো?' আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম। তিনি খুব আনন্দিত হলেন বলে মনে হল। তিনি হাসিমুখে টিকেটে ছাপ দিলেন এবং 'জাবাভু খুবই জাঁদরেল প্রফেসর' টাইপের কিছু কথা বিড়বিড় করে বলে চলে গেলেন।

ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে আমার পাঠ্য ছিল ইংরেজী, নৃবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ন্যাটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও রোমান ডাচ ল্। ন্যাটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সাবজেক্টটির বিষয়বস্তু ছিল আফ্রিকানদের স্থানীয় আইন। যারা স্থানীয় প্রশাসনিক বিভাগে কাজ করতে আগ্রহী তাদের জন্য এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল। যদিও কে.ডি. আমাকে সাধারণ আইন বিষয় পড়তে বিশেষভাবে উৎসাহ দিত; কিন্তু আমার মূল আকর্ষণ ছিল ন্যাটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রতি।

যেহেতু আমি একজন দোভাষী ও ঝানু কাউন্সিলর হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলাম তাই হয়তো ওই সাবজেক্ট আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল। তখনকার দিনে একজন আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গের সর্বোচ্চ স্বপ্ন ছিল একটা সরকারি চাকরি পাওয়া। সে সময় একজন সরকারি কর্মকর্তা হওয়া মানে আফ্রিকান সমাজের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালীদের একজন হয়ে ওঠা। গ্রাম এলাকায় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের দোভাষী হিসেবে চাকরি করলে স্থানীয় মানুষ তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের পরে তাকেই প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য করতো। দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পর দোভাষীর কাজ সম্পর্কিত একটি কোর্স চালু হয়। আমি ওই কোর্সের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলাম। আমাদের ক্লাস নিত প্রখ্যাত সাবেক আদালতি দোভাষী মিস্টার টায়ামজাশি।

ফোর্ট হেয়ার অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান হলেও এখানে অন্যসব সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো নানা ধরণের অসুবিধা ছিল। বড়রা নতুন শিক্ষার্থীদের সংগে রাশভারি আচরণ করতো এবং সব সময় তাদের অধীনস্থ রাখার চেষ্টা করত। আমি যখন প্রথম এ ক্যাম্পাসে এলাম তখন জামালিয়েন ভাবাজা নামে এক সিনিয়র ছাত্রের সংগে আমার বাদানুবাদ লাগে। ক্লার্কবারিতে থাকতেই তার সংগে আমার পরিচয় ছিল। সে আমার বেশ কয়েক বছরের সিনিয়র ছিল। ফোর্ট হেয়ারে এসে আমি তাকে খুব আনন্দচিত্তে অভিনন্দন জানালেও সে নিস্পৃহ থাকতো। শীতলভাবে আমার কথার জবাব দিতো। সে যে ডরমেটরিতে থাকতো আমারও সেখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সে আপত্তি করে বসল। ভাবাজা বললো, 'তুমি যেহেতু একেবারে নতুন ছাত্র সেহেতু তোমাকে সাধারণ ডরমেটরিতে চলে যেতে হবে।' সে জানালো সে আমাদের

ডরমেটরির হাউস কমিটির প্রধান। সুতরাং সে আমাকে বের করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। শুধুমাত্র বয়সে বড় হওয়ার কারণে এমন অগণতান্ত্রিক চর্চা আমি মেনে নিতে পারলাম না। কিন্তু আমাকে সরে আসতে হল।

এ ঘটনার কিছুদিন পরই এক রাতে আমি জুনিয়র সব ছাত্রকে ডাকলাম। তাদের ব্যাপারটা বোঝালাম এবং বললাম আমরা ভোটের মাধ্যমে নিজেদের মধ্য থেকে হাউস কমিটি নির্বাচিত করব। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নির্বাচন দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। জুনিয়রদের মধ্য থেকে আমাকে দাঁড় করানো হয়েছিল। আমরা সহজেই সিনিয়রদের হারিয়ে হাউস কমিটির নেতৃত্বে চলে এলাম।

কিন্তু সিনিয়ররা এটা সহজে মেনে নিতে পারেনি। তারা আমাদের শায়েস্তা করতে মিটিং ডাকলো। মিটিংয়ে ইংরেজীতে চালু এক সিনিয়র ছাত্র রেক্স তাতানি বললো, 'জুনিয়রদের এহেন আচরণ কোনভাবে মেনে নেওয়া যায় না। ম্যান্ডেলার মতো একটা গেঁয়ো ছেলে যে কিনা ভালো করে ইংরেজী বলতেই পারে না, তার কথা মতো হাউস কমিটি চলবে; তা হতে পারে না।' এরপর আমি যেসব আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতাম তার দু'একটা উদাহরণ দিয়ে বিকৃতভাবে আমাকে উপহাস করা শুরু করলো। সিনিয়ররা সবাই এ ওর ঘাড়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তাদের এই আচরণে জুনিয়রদের সবাই ভীষণভাবে রুষ্ট হল। আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম সিনিয়রদের চোখ রাঙানিকে আর পরোয়া করা হবে না। তারা যা যা অপছন্দ করে; যা যা করলে তারা অপমানিত হয় সে সব কাজ এখন থেকে করতে হবে।

কলেজের ওয়ার্ডেন রেভারেন্ড এ. জে কুক ব্যাপারটা জানার পর উভয়পক্ষকে তার অফিসে ডাকলেন। আমরা আমাদের মনের কাছে পরিষ্কার ছিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা দৃঢ়ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করব এবং কোন অবস্থাতেই নতিস্বীকার করবো না। তাতানি দীর্ঘসময় ধরে রেভারেন্ডের কাছে আমাদের নামে নালিশ জানালো এবং বক্তব্য দেওয়ার এক পর্যায়ে সে কেঁদে ফেলল। সে আমাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য সিনিয়রদের পক্ষ থেকে বিনীত আবেদন জানালো। রেভারেন্ড আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে বললেন। আমি কোনভাবেই আমাদের দোষ স্বীকার করলাম না। আমি রেভারেন্ডকে জানিয়ে দিলাম সিনিয়রদের সংগে আমরা মোটেও অযৌক্তিক আচরণ করিনি। আমাদের বিরুদ্ধে যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে আমরা সবাই এক যোগে হাউস কমিটি থেকে পদত্যাগ করবো। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংহতি বজায় রাখার বিষয়ে আমাদের কোন বাধ্য বাধকতা থাকবে না। সালিশীর শেষে আমাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না। আমরা শেষ পর্যন্ত দৃঢ় থাকায় রায় আমাদের পক্ষেই চলে আসলো। জীবনে প্রথমবারের মতো আমি কর্তৃপক্ষের সংগে লড়াই করে জিতলাম। এর মাধ্যমেই আমি প্রথমবারের মতো ন্যায় ও সত্যের শক্তি ও তেজ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পেয়েছিলাম। অবশ্য এর পর কর্তৃপক্ষের সংগে আমার আরও অনেকবার বিবাদ বেধেছে। সেসব ক্ষেত্রে অবশ্য জয় এত সহজে আসেনি।

ফোর্ট হেয়ারে ক্লাসের পাশাপাশি ক্লাসের বাইরেও আমি সমানভাবে শিক্ষা অর্জন করেছিলাম। হিল্ডটাউনে থাকতে আমি যতটুকু খেলাধুলা করেছি এখানে এসে তার মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। এর পেছনে অবশ্য দুটো কারণ ছিল। প্রথমত আমি এখানে এসে আগের চেয়ে বেশি লম্বা আর শক্তিশালী হয়েছিলাম। দ্বিতীয়ত, হিল্ডটাউনের মতো এখানে এত বেশি ঝানু প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল না। ফুটবল এবং ক্রসকান্ট্রি রানিং এ দুটোতে আমি খুবই ভালো ছিলাম। দৌড় বিষয়টি আমাকে অনেক মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছে।

ক্রস কান্ট্রি দৌড়ের ক্ষেত্রে সামর্থ্যের চেয়ে প্র্যাকটিস বেশি কার্যকরী। এর জন্য কঠোর অধ্যবসায়ী এবং নিয়মানুবর্তী হতে হয়। আমি অনেক যোগ্য শক্তিশালী ও সুঠামদেহী যুবক দেখেছি যারা শুধুমাত্র ডিসিপ্লিন প্র্যাকটিসের অভাবে খেলাধুলায় ভালো করতে পারেনি। তবে প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আমি কখনও ফাঁকি দেইনি।

খেলাধুলার বাইরে আমি নাট্য সংঘে যোগ দিয়েছি। আব্রাহাম লিংকন হত্যাকাণ্ড নিয়ে রচিত একটি মঞ্চ নাটকে অভিনয়ও করেছি। আব্রাহাম লিংকনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল আমার বন্ধু ও সহপাঠী লিংকন এমকেনতানি। অভিজাত ট্রান্সকেইয়ান পরিবারের ছেলে ছিল এমকেনতানি। পুরো ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র সেই আক্ষরিক অর্থে আমার চেয়ে লম্বা ছিল।

নাটকে আমার চরিত্র ছিল লিংকনের হত্যাকারী উইলকিস বুথ। এমকেনতানির অভিনয় শৈলী খুবই প্রখর ছিল। লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণের দৃশ্য সে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছিল যে সবাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুরো নাটকে আমার উপস্থিতি খুব বেশি না থাকলেও নাটকের নৈতিক বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে গুপ্তঘাতক বুথের চরিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে কারণেই হয়তো আমিও যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সাথে সাথে আমি স্টুডেন্টস খ্রিস্টিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য হয়েছিলাম। প্রতি রোববার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে স্থানীয় লোকজনকে বাইবেল পড়া শেখাতাম। অন্য সদস্যদের একজন অলিভার ট্যাম্বো। ট্রান্সকেইর পোডোল্যান্ড থেকে আসা ওই ছাত্রটির সংগে আমার প্রথম পরিচয় হয় ফুটবল মাঠে। অসাধারণ মেধাবী ছিল অলিভার। তার ক্ষুরধার মেধাশক্তি ও অনলবর্ষী বক্তব্য শুনে আমরা সবাই আপনাআপনি তাকে সমীহের চোখে দেখতাম। অ্যাংলিকান খ্রিস্টানদের জন্য নির্ধারিত বেডা হলে থাকতো সে। তার সংগে আমার খুব বেশি দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও বুঝতে পারছিলাম ভবিষ্যতে সে অবশ্যই মহান কোন স্থান দখল করে নেবে।

কোন কোন রোববার আমরা হেঁটে এলিস শহরে বেড়াতে যেতাম। শহুরে রেস্তোঁরায় খাওয়ার লোভটাও উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল। শহরের রেস্তোঁরাগুলো যারা চালাত তাদের প্রায় সবাই ছিল শ্বেতাঙ্গ। তখনকার দিনে কালোরা সদর দরজা

দিয়ে রেস্তোঁরায় ঢুকতে সাহস পেত না। কিন্তু আমরা দল বেঁধে বুক ফুলিয়ে রেস্তোঁরার সদর দরজা দিয়ে ঢুকে যা খেতে মনে চায় তার অর্ডার দিতাম। সাদাদের তোয়াক্কা করতে চাইতাম না।

ফোর্ট হেয়ারে আমি যে শুধু ফিজিক্স পড়েছিলাম তাই নয়, আরেকটা 'ফিজিক্যাল সায়েন্স'ও এখানে ভালোভাবে রপ্ত করেছিলাম। সেটা হল বলরুম ড্যান্সিং। আমরা যে রেস্তোঁরাটায় যেতাম সেখানে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ উৎপাদনকারী একটা পুরনো ফোনোগ্রাফ ছিল। ওটা যখন বাজতো তখন আমরা তার তালে তালে নাচতাম। বলরুম ড্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের আইডল ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বলড্যান্সার ভিক্টর সিলভাস্টার। আর আমরা যার কাছে এ ড্যান্স শিখতাম সে আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট এক ছাত্র। তার নাম ছিল স্মালি সিউন্ডলা। আমরা তাকে সিলভাস্টারের যোগ্য শিষ্য ও আমাদের মহান শিক্ষক হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম।

ফোর্ট হেয়ারের পাশের এক গ্রামে এনতেসেলামানজি নামের একটা আফ্রিকান ড্যান্স হল ছিল। শুধুমাত্র স্থানীয় গণ্যমান্য কৃষ্ণাঙ্গরাই সেখানে আনন্দফুর্তি করতে যেতে পারতো। আন্ডার গ্রাজুয়েটদের সেখানে ঢোকার কোন অনুমতি ছিল না। কিন্তু একদিন আমাদের কয়েকজনের মাথায় বেপরোয়া খেয়াল চাপল। বিপরীত লিঙ্গের কোন সংগীর সংগে নাচার লোভ সামলাতে না পেরে এক মহা ঝুঁকি নিয়ে বসলাম। রাতে সবাই যার যার সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্যুট পরে লুকিয়ে ডরমেটরি থেকে বেরিয়ে এলাম। এটা খুবই সংরক্ষিত এলাকা জেনেও ড্যান্স হলে ঢুকে পড়লাম। ড্যান্স ফ্লোরে দেখলাম খুব সুন্দরী এক যুবতী। আমি স্মার্টলি তাকে সরাসরি আমার সংগে নাচার প্রস্তাব দিয়ে বসলাম। দেখলাম কাজ হয়েছে। এক মুহূর্তের মধ্যে সে আমার বাহুবন্দী হয়ে গেল। মেয়েটার নাম জিজ্ঞেস করতেই সে বললো, 'মিসেস বোকবি'। শুনে আমার হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আড়চোখে চেয়ে দেখি তদানীন্তন প্রখ্যাত আফ্রিকান নেতা ও বুদ্ধিজীবী ড. রোজবেরি বোকবি তার শ্যালক অর্থাৎ আমার শিক্ষক জেড. কে. ম্যাথিউ'র সংগে আলাপ করছেন। না জেনে ড. বোকবির স্ত্রীকে নাচের আমন্ত্রণ জানিয়েছি বুঝতে পেরে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। আমি মুহূর্তমাত্র দেরি না করে মিসেস বোকবিকে ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক একটা সৌজন্যতা দেখিয়ে সরে পড়তে গেলাম। ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে গেছে। আমি ইতিমধ্যেই মিস্টার বোকবি এবং প্রফেসর ম্যাথিউর নজরে পড়ে গেছি। আমার মনে হচ্ছিল মেঝে ফাঁক করে যদি আমি তার ভেতরে ঢুকে যেতে পারতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করেছি আমার ভয় ভয় করছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল ফোর্ট হেয়ারের ডিসিপ্লিন ইনচার্জ হওয়া সত্ত্বেও ম্যাথিউ আমাকে একটা কটুকথাও বললেন না। সাহস করে সেখানে আমাদের ঢুকে পড়ার মতো মানসিকতাকে হয়তো তিনি সম্মান করেছিলেন। তবে ওই রাতের পরে আর কখনও এনতেসেলামানজিতে আমরা ভুলেও পা বাড়াইনি।

বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই ফোর্ট হেয়ার তখনকার দিনে সমাজের কাছে আভিজাত্যের প্রতীক ও আমার কাছে এক অদ্ভুত নতুন জগৎ হিসেবে বিবেচিত হত। পশ্চিমা জীবনে অভ্যস্থদের কাছে ফোর্ট হেয়ারের ভেতরকার জগৎ হয়তো খুব একটা অপরিচিত নয়। কিন্তু আমার মতো গ্রাম্য পরিবেশে বেড়ে ওঠা ছেলের কাছে সেটা ছিল এক বিশাল আবিস্কার। এখানে এসেই আমি প্রথম পাজামা পরি। প্রথমে খুব অস্বস্তিকর লাগলেও ধীরে ধীরে তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলাম। এখানে আসার পরই আমি প্রথম টুথপেস্ট ও টুথব্রাশ ব্যবহার করি। এর আগে আমরা দাঁতমাজার জন্য কয়লা অথবা ছাই ব্যবহার করতাম। ওয়াটার ফ্লাশ টয়লেট এবং গরমপানির ঝর্ণা এখানে এসেই প্রথম দেখি। এখানে এসেই প্রথম আমি টয়লেটে হাত ধোয়ার জন্য সাবান ব্যবহার করতে দেখি। ছোটবেলা থেকেই আমি এবং আমার ভাইবোন টয়লেট শেষে নীল ডিটারজেন্ট পাউডার ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলাম।

এসব নাগরিক জীবনযাত্রা আমার পূর্বপরিচিত না থাকার কারণেই হয়তো এখানকার জীবনমান আমার ভালোই লাগছিল। পাশাপাশি আমি যে গ্রাম্যজীবন পেছনে ফেলে এসেছি তাও আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে বহুবার। তবে এখানে শুধু আমি একা নই; আমার মতো আরও অনেকেই ছিল যারা গ্রাম থেকে এসেছে। সেই গ্রাম্যজীবনের টানেই আমরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে বিকেল বেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের খামারে ছুটে যেতাম। গোধুলির সময় মাঠে খড় জড়ো করে তাতে আগুন জ্বালাতাম। সেই আগুনে ভুট্টা পুড়িয়ে সবাই গোল হয়ে খেতে বসতাম। খেতে খেতে লম্বা লম্বা গল্প আমাদের আসরটাকে মাতিয়ে রাখতো। নেহাত খিদে মেটানোর জন্যই যে আমরা এভাবে ভুট্টা পুড়িয়ে খেতাম তা নয়। আমাদের গ্রাম্য ঘরোয়া স্মৃতি উপভোগের জন্যই ছিল এ আনন্দ আয়োজন। আড্ডার মধ্যে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। গ্রাজুয়েশনের পর কী পরিমাণ মাইনের চাকরি পাব, কাকে বিয়ে করব এসব নিয়ে আলোচনা করতাম। এ সময়টাতে আমি যদিও পোশাক ও চালচলনে যথেষ্ট অভিজাত হয়ে উঠেছিলাম; তারপরও আমার মনের মধ্যে বাস করছিল এমন এক গ্রাম্য কিশোর যে অহরাত্রি তার ফেলে আসা গ্রামকে মিস করছিল।

আধুনিক বিশ্ব থেকে ফোর্ট হেয়ার প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থানে থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খবরাখবর জানার জন্য আমরা মরিয়া হয়ে থাকতাম। আমার অন্য সহপাঠীদের মতো আমিও গ্রেট ব্রিটেনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলাম। সেজন্য আমাদের প্রথম বর্ষ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানের স্পীকার হতে যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও ইংল্যান্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান কৌশুলি জ্যান স্মুথস্– একথা জানতে পেরে আমার দারুন লাগছিল। স্মুথসের মতো বিশ্বনেতা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি হয়ে আসছেন শুনে আমরা যারপরনাই গর্ববোধ করছিলাম।

ফোর্ট হেয়ারে দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পর আমি আমার বন্ধু পল মাহাবানিকে ট্রান্সকেইতে এসে আমার সংগে শীতের ছুটিটা কাটিয়ে যাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করলাম। পল এসেছিল বোয়েসফনটিন থেকে এবং প্রভাবশালী পিতার কারণে ক্যাম্পাসে সবাই তাকে এক নামে চিনতো। তার বাবা রেভারেন্ড জাক্কেউস মাহাবানি দুই দুইবার আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট জেনারেল নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সংগঠনের সংগে জড়িত থাকার কারণেই যদ্দুর মনে পড়ে তিনি একজন বিদ্রোহী নেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ছুটির মধ্যে একদিন আমি আর পল ট্রান্সকেইর রাজধানী উমতাতা গেলাম। উমতাতায় তখন কয়েকটা বড়সড় রাস্তা এবং বেশ কিছু বিল্ডিং ছাড়া তেমন কিছু ছিল না। উমতাতার পোস্ট অফিসের বাইরে কী একটা কাজে আমরা দুজন দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ সেখানে স্থানীয় একজন ষাটোর্ধ ম্যাজিস্ট্রেট এলেন। তিনি পলকে পোস্ট অফিসের ভেতর থেকে তার জন্য কয়েকটা পোস্ট স্ট্যাম্প এনে দিতে বললেন। লোকটা একে তো শ্বেতাঙ্গ তার ওপর একজন ম্যাজিস্ট্রেট। পল তাকে সম্মানের সাথে স্ট্যাম্পগুলো এনে দিল। তখনকার দিনে শ্বেতাঙ্গরা কালোদের দিয়ে কাজ করানোকে রীতিমতো অধিকার বলে মনে করতো। ম্যাজিস্ট্রেট স্ট্যাম্প এনে দেওয়ার বদলে পলকে কিছু খুচরো পয়সা দিতে গেল। কিন্তু পল তা কোনভাবেই নিতে চাইল না। এতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অপমানবোধ করলেন। তিনি রাগতস্বরে পলকে বললেন, 'তুমি কি জান আমি কে?' সাহেবের মুখ তখন রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পল নির্বিকারভাবে বলে ফেললো, 'আপনি কে তা জানার কোন দরকার নেই; কারণ আপনি কি তা আমি ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেছি।' ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'তার মানে? তুমি কি বলতে চাইছো?' পল বললো, 'আমি বোঝাতে চাইছি যে আপনি একজন বদরাগী ও অভদ্র লোক!' ম্যাজিস্ট্রেট রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'তোমাকে এর জন্য উচিত মূল্য দিতে হবে হে ছোকড়া!' বলে লোকটা গটগট করে চলে গেলেন।

পলের এই আচরণে আমি খুব বিব্রতবোধ করছিলাম। আমি যদিও তার সাহসের প্রশংসা করতাম তবু এটা যেন একটু মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেছে। পলের জায়গায় আমি হলে তার দেওয়া পয়সাগুলো হয়তো নিতাম না কিন্তু তাকে ওভাবে অপমানও করতাম না। তবে কিছুদিনের মধ্যেই ওই ঘটনার জন্য পলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। আমি বুঝতে শুরু করি সাদারা দিনের পর দিন কালোদের অপমান করাকে তাদের অধিকার হিসেবে ধরে নিয়েছিলো এর প্রতিবাদ করা উচিত। পল ওই ম্যাজিস্ট্রেটের অপমানের উচিত জবাব দেওয়ায় আমি পরে তাকে বাড়তি সম্মানের চোখে দেখতাম।

শীতের ছুটি শেষ হওয়ার পর নতুন বছরের শুরুতেই আমি স্কুলে ফিরে এলাম। নতুন ক্লাসে ওঠার পর নিজেকে আরও পরিণত ও নবায়নকৃত মনে হল। অক্টোবরের পরীক্ষায় ভালো ফল করতেই হবে ভেবে পুরোদমে পড়াশুনায় ডুবে গেলাম। আর বছরখানেক পরেই আমি বিএ পাশ করব। বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি

নেবার পর আমি যে শুধু আমার সম্প্রদায়ের নেতৃত্বেই আসব তাই নয় আমার হাতে প্রচুর অর্থও আসবে– এসব ভাবনা আমাকে বেশ রোমাঞ্চিত করছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ড. আলেকজান্ডার কের, প্রফেসর জাবাভু ও প্রফেসর ম্যাথিউ বারবার আমাদের বোঝাতেন এখান থেকে ভালভাবে পাশ করে বেরুতে পারলে আমরা কতখানি অভিজাত পর্যায়ে চলে যেতে পারব। তাদের কথায় মনে হতো পাশ করার পর পুরো পৃথিবীটাই মনে হয় আমার পায়ের নিচে চলে আসবে।

আমার সব চেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল বিএ পাশের পর আমি আমার দুঃখিনী মাকে স্বচ্ছলতায় ভরে দেব। বাবার মৃত্যুর পর মায়ের জীবনে যে সীমাহীন দারিদ্র্য নেমে এসেছিল তা থেকে তাকে মুক্তি দেব। কুনু গ্রামে তার জন্য বিশাল একটা বাড়ি আর খামার গড়ে দেব। তার ঘরে থাকবে আধুনিক আসবাব আর পশ্চিমা ধাঁচের ফিটিংস সামগ্রী। আমার মা ও বোনেরা এতদিন যেসব জিনিস কিনতে পারেনি তা তাদের হাতের নাগালে এনে দেব। এসবই ছিল আমার প্রথম স্বপ্ন এবং মনে হচ্ছিল সে স্বপ্ন শিগগিরই বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে।

ফোর্ট হেয়ারের সর্বোচ্চ ছাত্র সংগঠন ছিল স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টিটিভ কাউন্সিল। দ্বিতীয় বর্ষে উঠে আমি ওই সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হই। আমি তখনও বুঝতে পারিনি ছাত্র পরিষদের নির্বাচনকে ঘিরে সংঘটিত ঘটনাগুলো এমন সব জটিলতা সৃষ্টি করবে যা আমার পুরো জীবনটাকেই ওলটপালট করে দেবে। ছাত্র প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচন হতো বছরের শেষভাগে। এ সময়টা ছিল আমাদের পরীক্ষা প্রস্তুতির চুড়ান্ত মুহূর্ত। ফোর্ট হেয়ার সংবিধান অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রের ভোটে ছাত্র প্রতিনিধি পরিষদের ৬ জন সদস্য নির্বাচিত হতো। নির্বাচনের মাত্র কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অসুবিধা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য একটা সভা ডাকা হয়। সব ছাত্রই বুঝতে পারছিল ফোর্ট হেয়ারে যে খাবার দেওয়া হয় তা সন্তোষজনক নয় এবং খাবার মানসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ছাত্রপরিষদের শক্তি অকার্যকর রয়েছে। এ পরিষদ নামেমাত্র কলেজ প্রশাসনের অংশীদার হয়ে ছিল। ছাত্ররা চাইল এবার এমন একটি পরিষদ গঠন করতে হবে যারা ছাত্রদের দাবি-দাওয়া ঠিকমতো আদায় করে আনতে পারে। এজন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পরিষদের কর্তৃত্বসীমা বাড়ানোর জন্য দাবি তুললো। আমি ছাত্রদের সংগে একাত্মতা ঘোষণা করলাম। ছাত্ররা আল্টিমেটাম দিয়ে জানিয়ে দিল কর্তৃপক্ষ যদি পরিষদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বসীমা না বাড়ায় তাহলে তারা নির্বাচন বর্জন করবে।

এই মিটিং হওয়ার কয়েক দিনের মাথায় নির্ধারিত ভোট গ্রহণ শুরু করা হল। অধিকাংশ ছাত্র এ ভোট বর্জন করলেও মোট ছাত্রের এক ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ জনা পঁচিশেক ছাত্র ভোট দিয়ে তাদের পছন্দের ৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করল। মজার ব্যাপার হলো তারা যে ৬ জনকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিল আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। যেহেতু আমাদের অধিকাংশই এ ভোটের বিরোধী ছিলাম, তাই আমি নির্বাচিত অন্য পাঁচ প্রতিনিধিকে নিয়ে মিটিংয়ে বসলাম।

আমি তাদের বোঝালাম অধিকাংশ শিক্ষার্থী এ নির্বাচন চায়নি। সুতরাং আমাদের এ নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করে স্বপ্রণোদিত হয়ে পদত্যাগ করা উচিত। তারা আমার কথায় রাজি হল। পদত্যাগ পত্রের খসড়া তৈরি হল। যথারীতি তা ড. কে'র কাছে হস্তান্তর করলাম।

কিন্তু ড. কের খুবই চালাক লোক ছিলেন। তিনি আমাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেই ঘোষণা দিলেন, পরের দিন রাতের খাবারের পর ডাইনিং হলে নতুন করে প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচন হবে। তার পরিকল্পনায় ছিল রাতের খাবারের সময় সব ছাত্রছাত্রী ডাইনিং হলে হাজির থাকবে। প্রতিনিধি পরিষদকে তারা তার সামনে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। যথারীতি নির্বাচন হয়ে যাবে।

কিন্তু পরদিন মজার ঘটনা ঘটল। অধ্যক্ষের নির্দেশ মতো ভোটাভুটি হল। কিন্তু এবারও সেই পঁচিশজন ভোট দিল। বাকিরা ভোট বর্জন করল। নির্বাচিতও হলাম আমিসহ সেই ৬জন। তারমানে ব্যাপারটা দাঁড়ালো আমরা ঘুরে ফিরে সেই আগের জায়গাতেই ফিরে এলাম।

তবে আগেরবারের সাথে এবারের পার্থক্য হল আগেরবার ভোটের সময় বর্জনকারীরা উপস্থিত ছিল না; কিন্তু এবার তারা সেখানে ছিল। আমি বাদে অন্য পাঁচ নির্বাচিত প্রতিনিধি এবার যুক্তি দেখাল যেহেতু সবার উপস্থিতিতে দ্বিতীয় দফা ভোট হয়েছে এবং তারা পুনঃনির্বাচিত হয়েছে, সেহেতু তারা দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আগেরবারের মতো পদত্যাগ করবে না। কিন্তু আমি বাধ সাধলাম। আমার বক্তব্য– আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিনিধি পরিষদকে শক্তিশালী করা। অধিকাংশ শিক্ষার্থী যেখানে ভোটের বিপক্ষে সেখানে কর্তৃপক্ষের চালাকির নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমি অন্য পাঁচ প্রতিনিধিকে পদত্যাগ করার অনুরোধ জানালাম। কিন্তু তারা আমার অনুরোধ রাখল না। ফলে উপায় না দেখে আমি একাই দ্বিতীয়বারের মতো পদত্যাগ করলাম।

পরের দিন অধ্যক্ষের কক্ষে আমাকে ডাকা হল। অধ্যক্ষ ড. কের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করা লোক। ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সবাই তাকে সম্মানের চোখে দেখত। তিনি শান্তভাবে গত কয়েক দিনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলেন এবং ধীর কণ্ঠে আমাকে পদত্যাগের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি তাকে জানিয়ে দিলাম যে আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। তিনি বললেন, এক্ষুণি সিদ্ধান্ত দেওয়ার দরকার নেই। একদিন ভেবেচিন্তে পরের দিন যেন আমি তাকে সিদ্ধান্ত জানাই। পাশাপাশি তিনি এ হুমকিও দিলেন যে তিনি কখনো কোন দায়িত্বহীনতাকে বরদাশত্ করেন না। আমি যদি পদত্যাগের সিদ্ধান্তে অটল থাকি তাহলে তিনি আমাকে ফোর্ট হেয়ার থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হবেন।

নিজের রুমে ফিরে এসে সারারাত আমার ঘুম হলো না। ছটফট করতে লাগলাম। এমন ধরণের ওজনদার সিদ্ধান্ত আমাকে আগে কোনদিন নিতে হয়নি। ওই রাতেই আমি আমার বন্ধু ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা কে.ডি.র সংগে কথা বললাম। সে বললো, 'এটা তোমার ব্যক্তিগত দৃঢ়চেতনার সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে তোমার আপোষ করা ঠিক হবে না।' আমি ভেবেছিলাম প্রিন্সিপালের চেয়ে আমার সিদ্ধান্তের কথা শুনে কে.ডি. বেশি রাগ করবে। কিন্তু তার কথা আমার ভালো লাগলো। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি নিজের রুমে ফিরে আসলাম।

যদিও আমি বুঝতে পারছিলাম, আমি যা করছি তা নৈতিক জায়গা থেকে অবশ্যই সঠিক। কিন্তু তারপরও মনের মধ্যে একটা খচখচানি কাজ করছিল। সন্দেহ হচ্ছিল, আদর্শ রক্ষার অজুহাতে আমার ভবিষ্যত নষ্ট করার কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে না তো? আমি যদি পদত্যাগ করি তাহলে ছাত্রদের কতটুকু স্বার্থ সংরক্ষিত হবে? নেহায়েত জিদ পূরণের জন্য আমার এ কাজ করা ঠিক হবে? একদিকে অধ্যক্ষের কথায় রাজি হয়ে আমি আমার সমর্থকদের কাছে ছোট হতে চাইছিলাম না, অন্যদিকে তার অবাধ্য হয়ে ফোর্ট হেয়ারের ক্যারিয়ার ধ্বংস করতেও মন সায় দিচ্ছিল না।

পরদিন একটা সিদ্ধান্তহীন মানসিকতা নিয়ে ড. কের'র অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা তিনি জানতে চাইলেন। আমি আদৌ তখনও কোন সিদ্ধান্ত নেইনি। কিন্তু তারপরও আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ছাত্রপ্রতিনিধি পরিষদে যোগ দেবার মানসিক অবস্থা আমার নেই। আমার জবাবে ড. কের অত্যন্ত অবাক হলেন বলে মনে হল। তিনি দু'এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "ভেরি ওয়েল! তুমি কী করবে না করবে তা অবশ্যই তোমার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। তবে আমার দিক থেকে একটা সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি। পাশাপাশি তোমাকে একটা প্রস্তাবও দিচ্ছি। সেটা হল, তোমাকে সাময়িকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। তবে তুমি যদি ছাত্রপ্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে রাজি হও তাহলে আগামী বছর তুমি আবার দ্বিতীয় বর্ষেই ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। তার মানে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পুরো একটা গ্রীষ্মকাল তোমার সামনে থাকছে মিস্টার ম্যান্ডেলা।"

আমার জবাব শুনে ড. কের যেভাবে অবাক হয়েছিলেন, আমিও তার জবাব শুনে ঠিক ততটাই ধাক্কা খেয়েছিলাম। আমি ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম ফোর্ট হেয়ার ত্যাগ করা আমার জন্য চরম বোকামী হচ্ছে; কিন্তু সমঝোতা করতে যে সময় ও পরিস্থিতির দরকার ছিল তা আমার হাতে ছিল না। আমার মনের মধ্যে এমন একটা অনুভূতি কাজ করছিল যা কোনমতেই আপোষ করতে চায়নি। দ্বিতীয়বার ভর্তি হওয়ার মতো সুযোগ রাখার জন্য একদিকে প্রিন্সিপালের প্রতি এক ধরণের শ্রদ্ধাবোধ কাজ করলেও তার একনায়কোচিত সিদ্ধান্তে আমি তার ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। আমার কথা হল যে কোন সময় পরিষদ থেকে

পদত্যাগ করার স্বাধীনতা আমার আছে। তিনি জোর করে আমাকে দিয়ে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করাতে পারেন না। যাই হোক, বছরান্তে আমাকে ফোর্ট হেয়ার ছাড়তে হল। এ সময় আমার নিজেকে ফোর্ট হেয়ারের উচ্ছিষ্ট বলে মনে হচ্ছিল।

৮

সাধারণত আমি যখন এমখেকেজওয়েনিতে বেড়াতে আসতাম তখন খুব স্বাভাবিক ও সহজাত মানসিকতা নিয়ে বেড়িয়ে যেতাম। কিন্তু এবার আর তা পারলাম না। বাড়ি ফিরে কেমন যেন সহজ হতে পারছিলাম না। সহজ হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছিল তা আমার পালক পিতাকে বললাম। শুনে তিনি প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন। আমি কেন আপোষ করতে পারিনি সে ব্যাপারে তিনি কোনো ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন না। তার ধারণা আমি যা করেছি তা চরম খামখেয়ালির বশে করেছি। তিনি কোন ব্যাখ্যা না শুনে বললেন আমার প্রিন্সিপালের নির্দেশ মেনে নেওয়া উচিত ছিল এবং পরবর্তী হেমন্তকালে আমাকে ফোর্ট হেয়ারে ফিরে যেতে হবে। তার কণ্ঠে এমন রুঢ়তা ছিল যে এ নিয়ে তার সংগে আর কোন আলোচনা করার অবকাশ ছিল না। আসলে ওই মুহূর্তে তার সংগে তর্কাতর্কি করতে গেলে সেটা বেয়াদবির পর্যায়ে চলে যেত। সে কারণে আমি তার সংগে আর কথা না বাড়িয়ে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার জন্য তার সামনে থেকে সরে এলাম।

ইতিমধ্যে জাস্টিস বাড়ি ফিরে এসেছে। অনেক দিন পর একজনের সংগে অন্য জনের দেখা হওয়ায় আমরা দুজনই খুব উচ্ছসিত হয়েছিলাম। জাস্টিস আর আমার মধ্যে কতদিন দেখা হয়নি; কতদিন যোগাযোগ ছিল না; সেটা কোনও ব্যাপারই ছিল না। দু'বন্ধু দেখা হওয়ার সংগে সংগেই পুরনো সম্পর্কেই ফিরে গিয়েছিলাম। কেপ টাউন ছাড়ার আগের বছরই জাস্টিস স্কুল ছেড়েছিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমি আমার পুরনো গার্হস্থ্য জীবনের সংগে মিশে গেলাম। আমার পালক পিতার সব ধরণের কাজ করা শুরু করলাম। গরু ছাগল দেখাশুনা থেকে শুরু করে অন্যান্য গোত্রপতিদের সংগে তার কাজ কারবারে সহায়তা করা শুরু করলাম। ফোর্ট হেয়ারে আমাকে এসব করতে হতো না। কিন্তু যারা প্রতিবাদ করে তাদের নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও অনেক কাজ করতে হয়। জীবনের নিয়মটাই বোধ হয় এ রকমের। আমি এখন এমখেকেজওয়েনিতে যা করছি তা আমার খুব ভালো লাগার কথা নয়। পড়াশুনা ছেড়ে কারুরই এসব করতে ভালো লাগবে না। কিন্তু আমাকে তাই করতে হয়েছে।

বাড়ি ফেরারমাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে আমার পালক পিতা আমাকে ও জাস্টিসকে তার বৈঠকখানায় ডাকলেন। বুঝলাম বিশেষ কোন গভীর আলোচনার জন্য তিনি আমাদের তলব করেছেন। তার পাশে গিয়ে বসতেই তিনি বললেন, 'দেখ বাবারা, আমি বুড়ো হয়েছি!' তার কণ্ঠ কিছুটা যেন ধরে আসছিল। তাকে সেদিন যেন একটু অসহায় মনে হচ্ছিল।

"আমার বিশ্বাস আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না। শিগগিরই আমাকে আমার পূর্বপুরুষদের পথে পাড়ি জমাতে হবে। মরার আগে তোমাদের দুজনকে সংসারী করে যাওয়া আমার কর্তব্য। এ কারণে তোমাদের দুজনকেই আমি এক আসরে বিয়ে দিয়ে যেতে চাই।"

তার একথা শুনে আমি আর জাস্টিস দুজনই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আমরা দুজনই হতবিহ্বল ও অসহায়ের মতো একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 'দুটো মেয়েই অনেক বড় ঘর থেকে আসছে। থেম্বুল্যান্ডের অন্যতম সম্ভ্রান্ত খলিফার মেয়ের সংগে জাস্টিসের বিয়ে হবে। আর থেম্বু যাজকের মেয়ের সংগে রোলিহ্‌লাহ্‌লার (এই নামেই তিনি আমাকে সব সময় সম্বোধন করতেন) বিয়ে ঠিক হয়েছে। খুব শিগগিরই তাদের সংগে তোমাদের বিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের ঝোসা সমাজে বরপক্ষ কনে পক্ষকে গরু-মহিষের মতো গবাদি পশু লোবোলা বা যৌতুক হিসেবে দিত। বরের পিতার পক্ষ থেকে তো দেওয়া হতোই; সমাজপতিদের পক্ষ থেকেও কনে পক্ষকে উপহার দেওয়া হতো। আমাদের ক্ষেত্রে অনেক আগে থেকে ঠিক করা ছিল, যথা নিয়মে জাস্টিসের যৌতুক তার পিতা (আমার পালক পিতা) এবং সমাজপতিরা দেবেন। আমার ক্ষেত্রে পালক পিতা নিজের এবং সমাজপতিদের উভয় যৌতুক নিজে পরিশোধ করবেন।

জাস্টিস আর আমি শুধু চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলাম। আমাদের বলার প্রায় কোন সুযোগই ছিল না। পালক পিতার বক্তব্যের ধরণ শুনে এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে সব কিছু চূড়ান্তভাবে ঠিক হয়ে গেছে। এখন কথা বলা অর্থহীন। সব চেয়ে বড় ধাক্কা খেলাম যে কথা শুনে সেটি হল ইতিমধ্যেই কনে পক্ষকে লোবোলা দেওয়া হয়ে গেছে। অর্থাৎ বিয়ের অর্ধেক কাজ আমাদের না জানিয়েই তিনি সেরে ফেলেছেন।

তার কথা শুনে জাস্টিস আর আমি দুজনই মাথা নিচু করে বিষণ্ন মনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। থেম্বু সমাজের আইন-কানুন মেনে নিজের গোত্রশক্তিকে আরও দৃঢ় করতেই আমাদের পিতা এ বিয়ে ঠিক করেছেন। তিনি আমাদের ভালোর জন্যই এ বিয়ে ঠিক করেছেন এ নিয়ে কারও মনে সন্দেহ নেই। অভিভাবকরা আমাদের বিয়ে দেবেন সেটা আমরাও ছোটবেলা থেকে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু

সমস্যা হল আমাদের জন্য যে দুজন পাত্রী ঠিক করা হয়েছিল তাদের কেউই আমার কাছে রক্ত মাংসের মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

আমি দুজনকেই চিনতাম। মজার ব্যাপার হল আমার জন্য যে পাত্রীটি ঠিক করা হয়েছিল তাকে আমি ছোটবেলা থেকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে কামনা করেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি খুশি হতে পারলাম না। পারলাম না এ কারণে যে এই মেয়েটির সংগে জাস্টিসের দীর্ঘ দিন ধরে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ছেলেমেয়ের ভালোবাসার মানুষ সম্পর্কে প্রত্যেক বাবা-মা তখনকার দিনে খুব কমই জানতেন। এক ধরণের রক্ষণশীলতার কারণে পিতা-মাতা জানতে পারতেন না কোন ছেলে বা কোন মেয়ের সংগে তার ছেলে বা মেয়েটির রোমান্টিক সম্পর্ক রয়েছে। যথারীতি আমার পালক পিতাও জানতেন না যে মেয়েটির সংগে তিনি আমার বিয়ে ঠিক করেছেন তার সংগে তার ছেলে জাস্টিসের গভীর প্রণয় রয়েছে। আমি ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম এই মেয়েকে বিয়ে করলে সেটা আমার, জাস্টিসের এবং সেই মেয়েটার জীবনে চরম অশান্তি নেমে আসবে।

সে সময়টার কথা বলছি যে সময় রাজনীতির চেয়ে আমার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক এগিয়ে ছিল। শ্বেতাঙ্গদের রাজনৈতিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার স্বপ্ন তখনও আমার মধ্যে জন্মায় নি। কিন্তু আমার সমাজের প্রচলিত অপপ্রথাগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস তখন আমার মধ্যে ঠিকই জন্ম নিয়েছিল। অবশ্য এর জন্য আমার পালক পিতাও পরোক্ষভাবে দায়ি ছিলেন। তিনি আমাকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর ফলে আমার মধ্যে যে আধুনিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ হয়েছিল সেটা এখন তার বিরুদ্ধেই অবস্থান নিতে শুরু করল। আমি বেশ কয়েক বছর ধরে একটানা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছি। এ সময়ের মধ্যে বহু মেয়ের সংগে পরিচয় ও ওঠাবসা হয়েছে। কারও কারও সংগে একটু আধটু রোমান্টিক সম্পর্কের মতো উষ্ণ সম্পর্কও তৈরি হয়েছিল। প্রথমত জাস্টিসের প্রেমিকাকে বিয়ে করাটা কল্যাণময় হবে না বলেই আমার মনে হল। দ্বিতীয়ত, রোমান্টিক মানসিকতার তরুণ হলেও ওই বয়সে বিয়ের ভাবনা আমি কিছুতেই মাথায় ঢোকাতে পারছিলাম না।

বিয়ে নামক এই মহা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি বাধ্য হয়ে রানীমা অর্থাৎ আমার পালক মায়ের কাছে গেলাম। আমি যে কোন অবস্থাতেই এ মুহূর্তে বিয়ে করতে চাই না সে কথা তাকে বলতে পারলাম না। একথা বললে তিনিও রেগে যেতেন। এজন্য কৌশলের আশ্রয় নিলাম।

রানীমাকে বললাম, বাবা আমার জন্য যে মেয়ে পছন্দ করেছেন তাকে আমার পছন্দ নয়। আমি অন্য একটি পাত্রীর কথা বললাম। পাত্রীটি রানীমা'র আত্মীয় ছিল। মেয়েটা দেখতে শুনতে খুবই ভালো। যদিও তাকেও বিয়ে করার ইচ্ছে আমার ছিল না; তবু এই অজুহাত তুলে যদি বিয়েটা ঠেকানো যায় সেই চেষ্টা করলাম। রানীমাকে বললাম, ওই মেয়ের সংগে বিয়ে ঠিক করা হলে বিএ পাশ

করার পর তাকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই। রানীমা আমার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনলেন। আমার পক্ষ নিয়ে তিনি পালক পিতার কাছে বিষয়টি জানালেন। কিন্তু তিনি রানীমার কথায় কান দিলেন না। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার তিনি নিয়ে ফেলেছেন। এর নড়চড় হবে না। তিনি এ ব্যাপারে কোন ধরণের ওজর আপত্তি বরদাশ্ত করবেন না বলেও জানিয়ে দিলেন।

আমার মনে হল আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে যে কিছু একটা আছে তা তিনি মোটেও স্বীকার করছেন না। আমি এ বিয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলাম না। মনে হল আমার ওপর অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আরেকটি বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম তার সিদ্ধান্ত না মানলে এখানে আমাকে তিনি থাকতে দিতে চাইবেন না। আমি আর জাস্টিস সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ করলাম। দু'জনে ঠিক করলাম এ বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল চম্পট দেওয়া। পালানোর একমাত্র জায়গা হল জোহান্সবার্গ। ঠিক হলো কাউকে কিছু না বলে দু'জনে বাড়ি ছেড়ে জোহান্সবার্গের উদ্দেশ্যে রওনা হব।

বিনীতভাবে বলতে গেলে আমি কিছুটা অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলাম। আমি পালক পিতাকে বোঝানোর সবগুলো পন্থা অবলম্বন করতে পারতাম। তার এক চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনিও একজন গোত্র সর্দার ছিলেন। তার নাম ছিল সর্দার জিলিন্ডলোভু। তিনি বেশ প্রভাবশালী লোক ছিলেন। আমার সংগে তার সম্পর্কও ভালো ছিল। আমার উচিত ছিল তাকে দিয়ে পালক পিতাকে বোঝানোর চেষ্টা করা। কিন্তু আমি এতটাই রেগে গিয়েছিলাম যে এসব করতে যাওয়ার মতো ধৈর্য আমার ছিল না। একারণে পালানোকেই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ মনে হয়েছিল।

কীভাবে বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে সটকে পড়া যায় তা নিয়ে আমি আর জাস্টিস দু'জন পরামর্শ করতে বসলাম। আমাদের পরিকল্পনার কথা তৃতীয় কাউকে জানাইনি। আমরা দুজনই বুঝতে পারছিলাম পালাতে হলে প্রথমেই দরকার একটা মোক্ষম সুযোগ। আমাদের পিতা আমরা এ ধরণের কিছু একটা করে বসতে পারি– তা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে জাস্টিস আর আমার দুজনের পক্ষে যে কোন কিছু করে বসা অস্বাভাবিক নয় বলেই তার ধারণা ছিল। এজন্য তিনি আমাদের এক সংগে মেশা এমনকি কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বাইরে কোথাও গেলে তিনি আমাদের দুজনের যে কোন একজনকে সংগে নিয়ে যেতেন। তার ভয় ছিল আমরা দুজন একসংগে থাকলে একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি জাস্টিসকে সংগে নিয়ে বের হতেন। আমাকে গরু বাছুর দেখাশুনার ভার দিয়ে যেতেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম আমার পালক পিতা ট্রান্সকেইয়ানদের মন্ত্রীসভা বুংঘার একটি অধিবেশনে যোগ দিতে যাবেন। বাড়ি ফিরতে সপ্তাহখানেক লেগে যাবে। অন্যান্যবার তিনি আমাকে অথবা জাস্টিসকে সফরসংগী হিসেবে নিয়ে গেলেও এবার তিনি একাই যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন। আমরাও বুঝলাম বাড়ি পালানোর এটাই মোক্ষম সুযোগ। ঠিক করলাম তিনি বুংঘার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পরপরই আমরা জোহান্সবার্গের পথে পাড়ি জমাবো।

এমনিতেই আমার খুব বেশি জামাকাপড় ছিল না। একটা ছোট স্যুটকেসে যা ধরে সেইমতো দুজনের জামাকাপড় গাদাগাদি করে ঢুকালাম। সোমবার সকালের দিকে তিনি গাড়িতে চেপে রওনা হলেন। আমরা সকাল গড়িয়ে দুপুর হওয়ার আগে আগে রওনা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। স্যুটকেস নিয়ে যেইমাত্র বাগানের পথ দিয়ে সামনে এগিয়েছি; অমনি দেখি তার গাড়ি আমাদের দিকে ফিরে আসছে। তার ফিরে আসাটা এতটাই অপ্রত্যাশিত ছিল যে আমাদের সারা শরীর ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। আমরা ঝটপট গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। তিনি ঘরে ফিরে এসে বাড়ির লোকজনকে প্রথমে যে প্রশ্নটি করলেন, সেটি হল, 'ওই হতচ্ছাড়া দুটো কোথায়?' তার প্রশ্নে উপস্থিত সবাই বেশ ভড়কে গেল। একজন বললেন, 'আশেপাশেই আছে হয়তো, যাবে আর কোথায়?'

রাজা চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে সন্দেহজনক কিছু ঘটেছে কিনা তা বোঝার চেষ্টা করলেন। আমরা যেহেতু তেমন কিছুই সংগে নিয়ে বের হইনি সেহেতু আমাদের পালানোর কোন আলামত তার চোখে পড়লো না। তিনি বললেন, যাওয়ার সময় তার হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, তিনি তার নিত্যসেব্য বিটলবন সংগে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেটা নিতেই তিনি ফিরে এসেছেন।

আমার কাছে একথা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। তিনি শহরে পৌঁছে সহজেই বিটলবন কিনে নিতে পারতেন। এই সামান্য জিনিসের জন্য তার মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে আসার কথা না। আমার ধারণা আমাদের বাড়ি পালানোর বিষয়ে তার নিশ্চয়ই সন্দেহ হয়েছিল। সে কারণে তিনি এসে দেখলেন সব ঠিক আছে কিনা। তিনি খোঁজখবর নিয়ে কিছুটা সন্দেহমুক্ত হয়ে আবার রওনা হলেন। তার গাড়ি পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে যেতে আমরা জোহান্সবার্গের পথে পা বাড়ালাম।

জোহান্সবার্গে যাবার মতো অত খরচ আমাদের কারও কাছে ছিল না। পয়সা পাতির ব্যবস্থা করতে বাড়ি ছাড়ার দিন খুব ভোরে আমরা পালের দুটো বড় ষাড় স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দিয়েছিলাম। লোকটা ভেবেছিল আমরা রাজার পক্ষ থেকে গরু দুটো বেচতে এসেছি। সম্ভবত রাজাকে খুশি রাখার

উদ্দেশ্যেই লোকটা অনেক দাম দিল। ষাঁড় বেচা টাকা নিয়ে আমরা কিছুদূর গিয়ে একটা ট্যাক্সিভাড়া করলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল ট্যাক্সিতে চড়ে প্রথমে স্টেশনে যাব। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে যাব জোহান্সবার্গ।

সব কিছুই পরিকল্পনা মাফিক এগুচ্ছিল। হঠাৎ মাঝপথে বাধল বিপত্তি। আমরা যে কোন সময় বাড়ি পালাতে পারি এমনটা আগেই সন্দেহ করেছিলেন আমার পালক পিতা। তিনি বুংঘাতে যাবার পথে স্টেশনে এসেছিলেন। এসে স্টেশন ম্যানেজারকে আমাদের চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলে গেছেন এরকম চেহারার দুটো ছেলে যদি টিকিট চায় তাহলে তারা যেন টিকিট বিক্রি না করেন। আমরা স্টেশন ম্যানেজারের কাছে টিকিট চাওয়ামাত্রই লোকটা সন্দিহান চোখে আমাদের দিকে চোখ বুলালেন। তারপর বললেন, 'তোমাদের কাছে টিকিট বেচা যাবে না। নিষেধ আছে।' আমরা বললাম, 'কার নিষেধ আছে?' ম্যানেজার বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে তোমাদের বাবা নিজে এসে আমাকে মানা করে গেছেন। তোমরা বাড়ি থেকে না বলে এসেছো। এক্ষুণি বাসায় ফিরে যাও!'

তার কথা শুনে মাথায় যেন বাজ পড়ল। উপায় না পেয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, 'সামনে স্টেশনে চলো। ওখান থেকে নিশ্চয়ই ট্রেন পাওয়া যাবে।' পরবর্তী স্টেশন প্রায় ৫০ মাইল দূরে। সেখানে যেতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লেগে গেল।

শেষ পর্যন্ত ট্রেন ধরা গেল। কিন্তু ওই ট্রেনে সরাসরি জোহান্সবার্গ যাওয়া সম্ভব হল না। কুইন্সটাউন এসে সেখানেই আমাদের নেমে যেতে হল। ১৯৪০'র দশকে একজন আফ্রিকানকে ট্রেনে চড়তে হলে তাকে নানা ধরণের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পার হতে হত।

যাদের বয়স ১৬ বছরের বেশি তাদের সবাইকে ট্রেনে চড়তে হলে বাধ্যতামূলকভাবে 'ন্যাটিভ পাশ' সংগে রাখতে হত। স্থানীয় ন্যাটিভ অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ওই 'পাশ' বের করতে হত। ট্রেনে যাওয়ার সময় অথবা নিজ এলাকার বাইরে যাওয়ার পর সেখানকার শ্বেতাঙ্গ পুলিশ, সরকারি কর্মকর্তা, কিংবা চাকরিদাতা যে কোন সময় 'ন্যাটিভ পাশ' চেয়ে বসতে পারে। পাশ চাওয়ামাত্র তা দেখাতে হত। ওই পাশ বা ছাড়পত্রে সেটার বাহকের যাবতীয় তথ্য উল্লেখ করা থাকতো। পাশে'র বাহক কোথায় বাস করে, তার গোত্রের সর্দার কে, সে বাৎসরিক খাজনা দিয়েছে কিনা এসব কিছু সেখানে লেখা থাকতো। পরবর্তীকালে 'পাশে'র বদলে বুকলেট বা রেফারেন্স বুক চালু করা হয়। ওই বুকলেটে বাহকের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উল্লেখ করতে হত এবং প্রত্যেক মাসে বাহকের চাকরিদাতার স্বাক্ষর নিতে হত।

আমার এবং জাস্টিসের উভয়ের কাছেই বৈধ ন্যাটিভ পাশ ছিল। কিন্তু তখনকার দিনে একজন আফ্রিকানকে তার নিজের ম্যাজিস্টেরিয়াল জেলা থেকে অন্য জেলায় যেতে হলে ন্যাটিভ পাশ ছাড়াও অন্যান্য ট্রাভেল ডকুমেন্টস দেখাতে হত।

অর্থাৎ কেউ যদি তার নিজের জেলা থেকে অন্য জেলায় কাজ করতে যেতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে ওয়ার্ক পারমিট অথবা চাকরিদাতার স্বীকৃতিপত্র দেখাতে হবে। কেউ বসবাস অথবা ঘুরতে যেতে চাইলে তার অভিভাবকের স্বীকৃতি পত্র দেখাতে হবে। বলা বাহুল্য, আমাদের কাছে এসব কোন কাগজপত্র ছিল না। এই সমস্ত আইনগত জটিলতার কারণে অনেক সময় বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বহু লোককে পুলিশি হয়রানির শিকার হতে হতো। কাগজপত্রে ঠিকমতো সই করা হয়নি অথবা তারিখ ভুল দেওয়া হয়েছে– এমন অজুহাত তুলে প্রায়ই লোকজনকে হয়রানি করা হতো। যাদের কাছে কোন ধরণের কাগজ থাকতো না তাদের ভয়াবহ শাস্তি দেওয়া হতো। আমাদের পরিকল্পনা ছিল; আমরা প্রথমে কুইন্সটাউনে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠবো। সেখান থেকে ধীরে সুস্থে কাগজপত্র যোগাড় করে জোহান্সবার্গের দিকে রওনা হব। এ পরিকল্পনায়ও ভুল ছিল। আসলে ভুলও বলা যাবে না। আমাদের ভাগ্যই সেদিন আসলে খারাপ ছিল। কুইন্সটাউনে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখি সেখানে আমার পালক পিতার ভাই সর্দার এমপোভোমবিনি। দুর্ঘটনাক্রমে তিনিও সেদিন ওই বাড়িতে এসেছেন। ওই চাচার সংগে আমার এবং জাস্টিসের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি আমাদের দুজনকেই খুব স্নেহ করতেন।

সর্দার এমপোভোমবিনি আমাদের দেখে খুশি হলেন। তিনি আমাদের স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকে কী কী কাগজপত্র যোগাড় করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলেন। আসলে কী জন্য আমাদের এসব কাগজপত্র লাগবে তা তার কাছে চেপে গেলাম। তাকে বললাম, কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য আমাদের পিতা আমাদের জোহান্সবার্গ পাঠাচ্ছেন। এমপোভোমবিনি এক সময় ন্যাটিভ অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টে দোভাষী হিসেবে চাকরি করতেন। বর্তমানে অবসরে গেছেন। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সংগে তার খুব ভালো জানাশোনা ছিল। আমাদের বানানো গল্পে এমপোভোমবিনির সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না। তিনি সানন্দে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেলেন এবং কেন আমাদের ছাড়পত্র দরকার তা তাকে বুঝিয়ে বললেন। তার কথা শুনে খুব দ্রুত ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোক আমাদের ট্রাভেল ডকুমেন্টস তৈরি করে তাতে অফিশিয়াল স্ট্যাম্প বসিয়ে দিলেন। জাস্টিস আর আমি দুজন দুজনের দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসছিলাম।

কিন্তু কাগজপত্র আমাদের হাতে দেওয়ার আগে হঠাৎ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আপনাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। তবে সাধারণ সৌজন্যতার খাতিরে উমতাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেটকে একবার বিষয়টি জানানো দরকার। এতক্ষণ আমরা সহজ ছিলাম। তার একথা শুনে কিছুটা ভয় ভয় লাগলো। তারপরও তার অফিসে যথাসাধ্য সহজ ভঙ্গিমা নিয়ে বসে রইলাম। ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোক উমতাতার ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোন করলেন। ভাগ্যের এমনই খেলা ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের পিতা তখন উমতাতার ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে তার সংগে দেখা করতে এসেছেন।

উমতাতার ম্যাজিস্ট্রেটকে যখন এই ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের বিষয়টি ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন ওপাশ থেকে তিনি বললেন, 'ও আচ্ছা, তাদের বাবা তো আমার সামনেই বসে আছে; নিন কথা বলুন!' এই বলে তিনি আমাদের পিতার হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিলেন। আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট পিতাকে জানালেন যে আমরা তার জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনতে জোহান্সবার্গ যেতে চাইছি এবং এজন্য আমাদের ট্রাভেল ডকুমেন্টস্ দরকার। এই কথা শুনে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভয়ানক খেপে গেলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'এক্ষুণি ওই দুটোকে গ্রেফতার করুন। ওদেরকে বেঁধে বাড়ি পাঠিয়ে দিন।' তিনি এত জোরে চিৎকার করে কথাগুলো বলছিলেন যে রিসিভার থেকে সহজেই আমরা তার কথা শুনতে পারছিলাম। চীফ ম্যাজিস্ট্রেট কথা না বাড়িয়ে খট করে ফোন রেখে দিলেন। তিনি এমনভাবে আমাদের দিকে চাইলেন যে আমরা ভয়ে গুটিসুটি মেরে গেলাম। মিনিটখানিক চোখ বন্ধ করে থাকার পর তিনি বললেন, 'তোমরা দুজনই একই সংগে চোর এবং মিথ্যুক। তোমরা আমার কাজের সুনামকে কলঙ্কিত করেছ। আমার সংগে প্রতারণা করেছ। এ কারণে আমি তোমাদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হচ্ছি।'

উনি গ্রেফতারের কথা বলামাত্রই আমি প্রতিবাদ করার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। ফোর্ট হেয়ারে পড়ার সময় আইন বিষয়ে আমি কিছুটা পড়াশুনা করেছিলাম। সেগুলোই এখানে প্রয়োগ করা শুরু করলাম। আমি বললাম, আমরা মিথ্যে কথা বলেছি এটা ঠিক। কিন্তু আমরা আইন ভঙ্গ করার মতো কোন কাজ করিনি। মিথ্যে বলার কারণে তিনি বড়জোর আমাদের কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু একজন গোত্র প্রধানের (আমাদের পিতা হওয়া সত্ত্বেও) সুপারিশে আমাদের আটক করার অধিকার তার নেই। আমার কথায় ম্যাজিস্ট্রেট একটু দমে গেলেন মনে হল। তিনি আমাদের গ্রেফতার করলেন না। তবে আমরা যেন ভুলেও আর তার অফিসের চৌকাঠ না মাড়াই সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন।

সর্দার এমপোন্ডোমবিনিও আমাদের ওপর চরম বিরক্ত হয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের বাইরে এসে তিনি জানালেন আমাদের আচরণে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছেন এবং এখন থেকে আমাদের বিষয়ে তার কোন মাথাব্যাথা নেই। তিনি আমাদের মাঝপথে ফেলে চলে গেলেন। অপরিচিত এই কুইন্সটাউন শহরে এখন আমরা করবটা কী? উপায় খুঁজতে দুজন ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ জাস্টিস বললো, তার এক বন্ধু এ শহরেই একজন শ্বেতাঙ্গ অ্যাটর্নির সহকারী হিসেবে কাজ করে। তার নাম সিন্ডি এনজু। আমরা দ্রুত তার ঠিকানা খুঁজে বের করলাম। সব ঘটনা তাকে খুলে বললাম। সিন্ডি বললো, অ্যাটর্নির মা আজ তার নিজস্ব গাড়িতে চড়ে জোহান্সবার্গ যাবেন। আমাদেরকে সংগে নেওয়ার জন্য সিন্ডি তাকে অনুরোধ করবে। ভদ্রমহিলার সংগে কথা বলে সিন্ডি জানালো, ভদ্রমহিলা আমাদের লিফট দিতে রাজি আছেন, তবে তার বিনিময়ে তাকে ১৫ পাউন্ড স্টার্লিং দিতে হবে। ট্রেনের টিকেটের যে দাম তার চেয়ে বহুগুণ অর্থ দাবি করে বসলেন মহিলাটি। এই অর্থ যদি দিতে হয় তাহলে আমাদের কাছে থাকা ষাঁড় বেচা তহবিলের একটা বিরাট অংশ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প উপায় ছিল না। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে করেই হোক আগে জোহান্সবার্গ পৌঁছতে হবে। সেখানে গেলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। আমরা মহিলাকে ১৫ পাউন্ড দিতে রাজি হলাম। ঠিক হলো পরদিন ভোরে আমরা তার গাড়িতে করে রওনা হব।

পরদিন কাকডাকা ভোরে রওনা হলাম। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল কোন শ্বেতাঙ্গ যদি গাড়ি চালায় তাহলে কৃষ্ণাঙ্গ যাত্রীকে তার পাশে নয়, বরং তার পেছনে বসতে হত। ভদ্রমহিলা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই জাস্টিস আর আমি পেছনের সিটে বসলাম। জাস্টিসের আসন ছিল ড্রাইভিং সিটের ঠিক পেছনে। জাস্টিস বরাবরই বাচাল টাইপের ছেলে ছিল। কথা না বলে সে একেবারেই থাকতে পারতো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আমার সংগে কথা বলা শুরু করে দিল। ওর কথার যন্ত্রণায় বৃদ্ধা খুবই বিরক্ত হচ্ছিলেন। আমার ধারণা মহিলাটি এর আগে এত দীর্ঘ সময়ের জন্য কোন কৃষ্ণাঙ্গের পাশে বসেন নি। কৃষ্ণাঙ্গদের চালচলন সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। কয়েক মাইল যাওয়ার পর ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি জাস্টিসকে আমার জায়গায় এবং আমাকে জাস্টিসের জায়গায় বসাতে চান। আমাদের এই সিট বদলের উদ্দেশ্য হল জাস্টিসের বকবকানি বন্ধ করা। ড্রাইভিং সিট থেকে এবার তিনি সহজেই জাস্টিসের ওপর নজর রাখতে পারবেন এবং সে মুখ খুললেই তিনি তাকে চোখ কটমট করে থামিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু এর পরই মজার ঘটনা ঘটল। জাস্টিসের হাত নিশপিশানি আর মুখের উসখুশ ভাব দেখে ভদ্রমহিলা হেসে ফেললেন। তিনি জাস্টিসের কথাবার্তায় এতক্ষণ বিরক্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু এবার দেখা গেল আমাকে বাদ দিয়ে জাস্টিসের সংগেই তিনি সমানে গল্প গুজব করে যাচ্ছেন।

রাত দশটা নাগাদ আমরা জোহান্সবার্গের কাছাকাছি চলে এলাম। দূর থেকে হাজার হাজার ঝলমলে আলো চোখে পড়ল। বিজলী বাতি সব সময়ই আভিজাত্য আর বিলাস সামগ্রী হিসেবে আমার কাছে মনে হত। ছোটবেলায় বড়দের কাছে রঙিন বিজলী বাতির গল্প শুনে জোহান্সবার্গকে এক স্বপ্নভূমি হিসেবে কল্পনায় এঁকেছিলাম। আমার কল্পনায় যে রঙিন আলোর দৃশ্য ছিল বাস্তবের সেই আলোকচ্ছটা আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হল। গাড়িটা যত বেশি কাছে আসতে লাগলো শহরটাকে ততবেশি উজ্জ্বল মনে হতে লাগল। মনে হল পুরো শহরটাই রং বেরংয়ের আলো দিয়ে তৈরি।

ছোটবেলা থেকে জোহান্সবার্গ আমার কাছে ছিল এক স্বপ্নের শহর। যেখানে কেউ একবার গেলে আর ফিরতে চায় না। পথের ফকিরও যদি জোহান্সবার্গে পা রাখতে পারে তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই সে বিরাট বড়লোক বনে যায়। সেখানে হাজার হাজার কাজের সুযোগ। জোহান্সবার্গের আকাশে বাতাসে টাকা ওড়ে। একটু বুদ্ধি খাটাতে পারলে সেই টাকা ধরে ধরে টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলা যায়। অবশ্য এর পাশাপাশি একটা আতঙ্কও আমার মধ্যে ছিল। ছোটবেলায় শুনেছি সেখানে নাকি ভয়ঙ্কর সব গুণ্ডাপাণ্ডাও বাস করে। তাদের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষে নেই। খৎনা করানোর পর আমাদের যেখানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল সেখানে বানাবাখে নামের একটা ছেলে ছিল। তার মুখে শুনেছিলাম জোহান্সবার্গে নাকি এত উঁচু একটা বিল্ডিং আছে, মাটিতে দাঁড়িয়ে যার ওপরতলা দেখা যায় না। সে আরও বলেছিল সেখানকার মানুষ এমন সব ভাষায় কথা বলে যা আমি জীবনে কোনদিন শুনিই নি। রাস্তায় নাকি ঝাঁক ঝাঁক সুন্দরী মেয়েরা হেঁটে বেড়ায়। আর ভয়ানক সব গ্যাংস্টাররা গাড়ি নিয়ে শহর দাপিয়ে বেড়ায়। জোহান্সবার্গকে তখন বলা হত *ইগোলি* বা স্বর্ণশহর। এই শহরে আজ আমি পা রাখতে যাচ্ছি। দূর থেকেই রাতের জোহান্সবার্গ দেখে আমি উত্তেজনা অনুভব করছিলাম।

শহরে ঢোকার সময় আমি প্রথম হোঁচট খেলাম রাস্তা এবং গাড়ির আধিক্য দেখে। এর আগে জীবনে এক সংগে এত গাড়ি আমি কখনও দেখিনি। উমতাতায় পাঁচ দশটা গাড়ি দেখেছি। কিন্তু এখানে দেখলাম হাজার হাজার গাড়ি এখান দিয়ে সেখান দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সরাসরি শহরের মধ্যে না ঢুকে বেশ খানিকটা ঘুরপথে আমাদের গাড়ি এগিয়ে গেল। অন্ধকার রাত হলেও আলোর ঝলকানিতে সারি সারি বহুতল ভবন চোখে পড়ছিল। রাস্তার পাশে সিগারেট, ক্যান্ডি এবং বিয়ারের বিজ্ঞাপন দেওয়া বিলবোর্ড চোখে পড়ছিল। সব মিলিয়ে রাতের এই অপরূপ জোহান্সবার্গ আমাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছিল।

বাণিজ্যিক এরিয়া ছেড়ে ক্রমশ আমাদের গাড়ি একটা আবাসিক এলাকায় চলে এলো। আবাসিক এলাকা হলেও এখানকার বিল্ডিংগুলো পাঁচ ছয় তলার কম না। এ এলাকার সবচেয়ে ছোট বিল্ডিংটাও আমার পালক পিতা অর্থাৎ গোত্ররাজের বাড়ির চেয়ে অনেক বড়। প্রতিটি বাড়ির সামনে লম্বা লন আর উঁচু উঁচু লোহার গেট। এই এলাকাটা আসলে শহরতলী; জোহান্সবার্গের কেন্দ্রস্থল থেকে বেশ দূরে। এখানেই আমাদের গাড়িওয়ালা বৃদ্ধার মেয়ে থাকে। বাসার সামনে গাড়ি থামানোর পর ভদ্রমহিলাকে বললাম রাতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই শুনে তার দয়া হল। তিনি আমাদের সাথে করে তার মেয়ের বাড়িতে ঢুকলেন। সিঁড়িকোঠায় বানানো চাকরদের ঘরে আমাদের থাকতে দেওয়া হল। ঘর বলতে খুব নিচু একটা কামরার মতন। বিছানা বালিশ কিচ্ছু নেই। খালি মেঝেতে ঘুমাতে হবে। মজার ব্যাপার হল আমার মোটেও কষ্ট হল না। জোহান্সবার্গে টিকে থাকতে পারলে কী কী সাফল্য আসবে, কীভাবে বিলাসী জীবন কাটাবো, এসব ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তখন ওই কঠিন মেঝেকেই আমার 'দুগ্ধফেননিভ শয্যা' মনে হল।

আমার স্বপ্নে তখন সম্ভাবনা ছিল সীমাহীন। ঘুমিয়ে পড়বার আগে মনে হয়েছিল আমি এক বিশাল যাত্রা শেষ করে এইমাত্র বিশ্রামের কোলে মাথা রেখেছি। অথচ তখন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি আসল যাত্রাপথে আমি সবেমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছি। আমার আসল যাত্রা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। সে যাত্রা কত দীর্ঘ; কত দূর্গম আমি তা সেদিন কল্পনাও করতে পারিনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জোহান্সবার্গ

৯

সকাল বেলায়ই আমরা 'ক্রাউন মাইনস্' বলে পরিচিত স্বর্ণ-খনি এলাকায় পৌঁছে গেলাম। শহর ছেড়ে খানিক দূরে পাহাড়ি এলাকায় খনিগুলোর অবস্থান। খনি এলাকার পাহাড় থেকে নিচে তাকালে বড় বড় বিল্ডিংগুলোকে খুব ছোট ছোট খুপরি ঘরের মতন দেখায়। ১৮৮৬ সালের দিকে উইটওয়াটারস্র্যান্ড এলাকায় সোনার খনি আবিস্কৃত হওয়ার পর এই খনিগুলোকে কেন্দ্র করেই জোহান্সবার্গ শহর গড়ে ওঠে। এ অঞ্চলে যতগুলো সোনার খনি রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় খনি এলাকা হল এই ক্রাউন মাইনস্। আমার ধারণা ছিল খনি এলাকায় মূল শহরের মতো বিশাল বিশাল বিল্ডিং না থাকলেও নিদেনপক্ষে উমতাতার সরকারি অফিসভবনের মতো কিছু ভবন থাকবে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর দেখলাম খনির পাশে টিন শেডের ছোট ছোট ঘর। এগুলোই নাকি খনি কর্মকর্তাদের অফিস ভবন।

ছোটবেলায় সোনার খনি কথাটা শুনলেই চোখের সামনে যেন এক জাদুপুরী ভেসে উঠতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল খনি এলাকা মানে বিরাট একেকটা পতিত জমি। চারপাশে দেয়াল তোলা এলাকা। ভেতরে একটা গাছও নেই। এখানে সেখানে নোংরা আবর্জনার মতো কালো কালো মাটির স্তুপ। জায়গাটাকে অনেকটা মধ্যযুগীয় যুদ্ধবিধ্বস্ত রণক্ষেত্র বলে মনে হবে। অনবরত বিভিন্ন ভারী মেশিনের খ্যাচ্ খ্যাচ্, ধুমধাম শব্দ হচ্ছে। বৈদ্যুতিক ড্রিল মেশিন, মোটরের একঘেয়ে শব্দ তো আছেই। মাঝে মাঝে মাটির নিচে ডিনামাইট বিস্ফোরণের শব্দও শোনা যাচ্ছে। খনি এরিয়ায় ঢুকে আমি যেদিকে তাকাচ্ছি সেদিকেই দেখতে পাচ্ছি কালো কালো মানুষগুলো ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যেন ঢলে পড়তে যাচ্ছে। তাদের গায়ে নোংরা পোশাক। কাদামাটিতে সারা শরীর ঢেকে গেছে। আন্ডারগ্রাউন্ডে এদের থাকার জন্য কয়েদিদের মতো ব্যবস্থা রয়েছে। কোনরকমে

শুয়ে থাকার মতো একটুখানি জায়গা। প্রত্যেকের শোবার জায়গার মাঝখানে পাতলা দেওয়াল তুলে দেওয়া। অর্থাৎ বিশ্রামের সময় তারা যে একজন আরেকজনের সংগে একটু সুখ দুঃখের গল্প করবে কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থাও রাখেনি।

উইটওয়াটারস্র্যান্ড এলাকায় খনি থেকে সোনা উত্তোলন খুবই ব্যয়বহুল ব্যাপার ছিল। প্রথমত এ এলাকায় যে স্বর্ণ আকর পাওয়া যেত তা তেমন ভালো মানের ছিল না। দ্বিতীয়ত, এসব খনির সোনা ছিল অন্যান্য খনির তুলনায় অনেক গভীরে। শুধুমাত্র দু'চার পয়সার বিনিময়ে এখানে সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার মতো হাজার হাজার কালো শ্রমিক সহজেই পাওয়া যেত বলেই এ খনি চালু করা সম্ভব হয়েছিল। খনি মালিকরা ছিল ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ। তারা শ্রমিকদের জোর করে এখানে খাটাতো। দিন শেষে যে পারিশ্রমিক দিত তা দিয়ে দু'বেলা রুটি কেনাও কষ্টকর ছিল। অথচ তাদের রক্তপানি করা সোনা বেচে শ্বেতাঙ্গ মালিকরা লাখ লাখ পাউন্ডের মালিক বনে গিয়েছিল। এখানে আসার আগে আমি কখনও এত বড় বড় যন্ত্রপাতি, এমন পদ্ধতিগত কার্যক্রম ও এমন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করা দেখিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পুঁজিবাদের কর্মযজ্ঞ এই প্রথমবারের মতো আমি প্রত্যক্ষ করলাম। এক নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা আমার ব্যবহারিক শিক্ষাজীবনের খাতায় অন্তর্ভুক্ত হল।

আমরা সরাসরি খনির প্রধান পরিচালক বা *'ইনদুনা'*র কাছে গেলাম। ভদ্রলোক বয়সে বৃদ্ধ হলেও সবাই তাকে যমের মতো ভয় করতো। তার নাম পিলিসো। দয়ামায়া বলে তার অভিধানে কোন শব্দ ছিল না। তিনি জাস্টিসের ব্যাপারে আগে থেকেই অবগত ছিলেন। আমাদের পিতা মাস কয়েক আগে তাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি জাস্টিসের জন্য একটা ক্ল্যারিক্যাল চাকরির ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। খনি এলাকায় এই কেরানীর চাকরিকে অত্যন্ত সম্মানজনক পদাধিকার বলে বিবেচনা করা হতো। জাস্টিসের ব্যাপারে পিলিসোর পূর্বধারণা থাকলেও আমি তার কাছে ছিলাম সম্পূর্ণ অচেনা। জাস্টিস তাকে জানালো যে আমি তার ভাই। আমাকেও যেন একটা কাজ দেওয়া হয় সে ব্যাপারে সে তার কাছে বিনীত আবেদন জানালো।

জাস্টিসের কথায় পিলিসো যেন একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, 'আমি শুধু জাস্টিসকেই আশা করেছিলাম। তোমার বাবা তো তোমার কোন ভাই সম্পর্কে আমাকে কিছুই জানাননি।' লোকটা আমার দিকে কিছুটা অবজ্ঞার নজরে তাকালেন। জাস্টিস তাকে বললো, 'বাবা আসলে ওর বিষয়টা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি ওর ব্যাপারেও আপনার নামে আরেকটা চিঠি দিয়েছেন।' খানিক ভেবে পিলিসো বললেন, 'ঠিক আছে আপাতত তোমার ভাইকে আমি খনির পুলিশম্যান হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছি। আগামী তিন মাসের মধ্যে যদি তার কাজ দেখে সন্তুষ্ট হতে পারি তাহলে ওকেও ক্ল্যারিক্যাল কাজে নিয়োগ দেবো।'

খনি এলাকায় গোত্র রাজদের সুপারিশ যে খুব কার্যকর হয় তা এই প্রথমবার স্বচক্ষে দেখলাম। আসলে পুরো দক্ষিণ আফ্রিকার গোত্র প্রধানদের খনি কর্তৃপক্ষরা তোয়াজ করতো। খনির মালিকরা সব সময়ই নিভৃত পল্লী এলাকার শ্রমিক নিয়োগ করতে চাইতো। তাদের চাহিদা পূরণ করতো এইসব গোত্র প্রধানরা। তারা তাদের প্রজাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে খনিতে কাজ করতে পাঠাতো। এ কারণে তারা কারও চাকরির ব্যাপারে সুপারিশ করলে খনি কর্তৃপক্ষ তা উপেক্ষা করতো না। এমনকি গোত্র সর্দাররা খনি পরিদর্শন করতে এলে তাদের খুব যত্ন আত্তিও করতো। ভালো থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতো। আমাদের চাকরি পাওয়ার জন্য পালক পিতার একটা চিঠিও যথেষ্ট ছিল। আমরা তার সন্তান বলে অন্য সহকর্মীরা আমাদের সমীহের চোখে দেখতো।

বেতনের পাশাপাশি আমাদের থাকার কোয়ার্টার ও ফ্রি রেশনেরও ব্যবস্থা করা হল। কাজে যোগদানের দিন আমাদের সাধারণ কর্মচারীদের মতো ব্যারাকে থাকতে হলো না। আমাদের পিতার সম্মানে পিলিসো তার বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। কর্মজীবনের প্রথম রাতটা তার কোয়ার্টারেই কাটালাম।

থেম্বুল্যান্ডের প্রধান হিসেবে আমাদের পিতা যখন খনি শ্রমিকদের খোঁজ খবর নিতে আসতেন তখন তারা, বিশেষ করে থেম্বুল্যান্ডের শ্রমিকরা তাকে প্রচলিত সংস্কৃতি অনুযায়ী নজরানা দিয়ে সম্মান জানাতো। মজার ব্যাপার হলো গোত্র প্রধানের ছেলে হিসেবে জাস্টিসকেও তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ উপহার দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করল। খনিতে সাধারণত শ্রমিকরা নিজ নিজ গোত্রের লোকের সংগে আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ হয়ে থাকতো। মালিক পক্ষও চাইতো তারা আলাদা থাক। মালিকপক্ষের ভয় ছিল সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে একাত্মতা গড়ে উঠলে শ্রমিক বিদ্রোহ হতে পারে। এ কারণে পরিকল্পিতভাবেই তাদের আলাদা আলাদা গ্রুপে রাখা হত। মাঝে মাঝে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ঝগড়া ফ্যাসাদ ও মারামারি লেগে যেতো। মালিকপক্ষ এসব সংঘর্ষ বন্ধে খুব একটা আগ্রহ দেখাতো না। তারা চাইতো শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে কলহ বাধিয়ে শতধা বিভক্ত হয়ে যাক।

জাস্টিস এদিক সেদিক করে প্রচুর পয়সা কামাতো। বোনাস হিসেবে মাঝে মাঝেই সে আমাকে ভালো অংকের অর্থ দিতো। চাকরিতে যোগদানের কয়েক দিনের মধ্যেই দেখলাম আমার পকেটে প্রচুর অর্থকড়ির আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। এ সময় নিজেকে আমার লাখপতি মনে হত। নিজেকে আমি ভাগ্যদেবীর বরপুত্র মনে করা শুরু করলাম। মনে হল খালি খালি এতদিন পড়াশুনা করে সময় নষ্ট করেছি। স্কুল কলেজে না গিয়ে এখানে আসলে এতদিনে আমি বিশাল ধনী হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না ভাগ্য আমাকে নিয়ে শিগগিরই কী নিদারুণ পরিহাসে মেতে উঠতে যাচ্ছে।

চাকরির শুরুতে আমার দায়িত্ব ছিল রাতে খনির নিরাপত্তার দিকে নজর রাখা। এক কথায় আমি ছিলাম নাইটগার্ড। আমাকে একটা ইউনিফর্ম, একজোড়া বুট জুতো, একটা হেলমেট, একটা ফ্ল্যাশলাইট, একটা সতর্কীকরণ বাঁশি ও গদাজাতীয় লম্বা একটা মোটা কাঠের লাঠি দেওয়া হল। খুব কঠিন কোন কাজও ছিল না। কম্পাউন্ডে ঢোকা ও বেরুনোর সদর দরজায় লেখা ছিল, 'সাবধান! এখান দিয়ে ন্যাটিভরা (স্থানীয়রা) যাওয়া আসা করে।' আমাকে ওই লেখাটার নিচে দায়িত্বশীল নাইটগার্ডের মতো বসে থাকতে হতো।

শ্রমিকরা ঢোকার ও বেরুনোর সময় তাদের দেহ তল্লাশি করা ছাড়া প্রথমদিকে তেমন কোন কাজই ছিল না। তেমন কোন চ্যালেঞ্জিং ঘটনায়ও জড়াতে হয়নি। শুধু একদিন সন্ধ্যায় একজন শ্রমিক মাতাল হয়ে ঢোকার সময় তাকে দাঁড় করিয়েছিলাম। সে খুব সহজ ভঙ্গিমায় প্রবেশপত্র দেখিয়ে তার হোস্টেলের দিকে চলে গেল।

এমখেকেজওয়েনির অনেকেই এ খনিতে এসে কাজ নিয়েছিল। ওদের মধ্যে একজন আমার ও জাস্টিসের পূর্ব পরিচিত ছিল। বাড়ি পালিয়ে এখানে এসে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাফল্যে আমি এবং জাস্টিস দুজনেই রীতিমতো গর্ববোধ করছিলাম। আমরা দুজনেই ওই বন্ধুটির কাছে নিজেদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতাম। আমরা কীভাবে খনি প্রধানকে মিথ্যে বলে চাকরি বাগিয়ে নিলাম সব তার কাছে আনন্দের আতিশয্যে বলে ফেললাম। বলার আগে অবশ্য তাকে শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম যাতে সে এই কথা আর কারুর কাছে না বলে। কিন্তু আমাদের এ উড়ে এসে জুড়ে বসার বিষয়টি বোধ হয় সে মেনে নিতে পারেনি।

সে কোন রকম শপথ-টপথের ধার ধার ধারল না। সোজা গিয়ে *'ইন্দূনার'* কাছে আমাদের গোপন কথা ফাঁস করে দিল। পরদিনই পিলিসো আমাদের দুজনেক ডাকলেন। জাস্টিসকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার বাবা তোমার ভাইয়ের জন্য যে সুপারিশ করেছেন তার প্রমাণপত্র কোথায়?' জাস্টিস বলল, 'তিনি ইতিমধ্যে সুপারিশনামা পোস্ট করে দিয়েছেন। দু'একদিনের মধ্যে আপনার হাতে চলে আসবে।' পিলিসো একথায় সন্তুষ্ট হলেন না। আমরাও বুঝে ফেললাম কোথাও একটা মস্তবড় গড়বড় হয়েছে। তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে তার ডেস্কে গেলেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের পিতা গতকালই আমাকে এ টেলিগ্রামটি করেছেন।' আমরা চিরকুটখানা হাতে নিয়ে দেখলাম তাতে লেখা, 'এক্ষুণি ছেলে দুটোকে ফেরত পাঠান।'

এরপর মিথ্যে বলার অপরাধে পিলিসো যা মুখে এলো তাই বলে আমাদের গালাগাল করলেন। তিনি বললেন, আমাদের ট্রান্সকেইতে ফেরত পাঠানোর জন্য খনি কর্মচারিদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হবে। সেই টাকায় ট্রেনের টিকেট কিনে আমাদের ট্রান্সকেইতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। জাস্টিস একথার প্রতিবাদ করলো। সে বললো, আমরা এখানেই মন দিয়ে কাজ করতে চাই। নিজেদের

ইচ্ছামাফিক কাজ করার মতো বয়স আমাদের হয়েছে। কিন্তু পিলিসো কোন কথা শুনতে চাইলেন না। উল্টো কড়া ভাষায় বকাঝকা শুরু করলেন। আমরা তার কথায় লজ্জা পাওয়ার চেয়ে অপমানবোধ করছিলাম বেশি। তবে আমরা মনস্থির করলাম খনির চাকরি গেলেও ট্রান্সকেইতে আর ফিরবো না।

দ্রুত নতুন প্ল্যান মাথায় খেলে গেল। আমরা সরাসরি ডা. এবি জুমার কাছে চলে গেলাম। জুমাও জাস্টিসের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এক সময় তিনি ট্রান্সকেইতে থাকতেন। সেখানে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত চিকিৎসক হিসেবে জুমা দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি জোহান্সবার্গে বাস করছেন।

ডা. জুমা আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। আমাদের জোহান্সবার্গ আসার উদ্দেশ্য কী, কীভাবে এখানে এলাম– সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে ঝিলিয়ে তাকে অর্ধসত্য তথ্য দিলাম। পাশাপাশি তাকে আমাদেরকে যে কোন একটা ভালো খনিতে কাজ জুটিয়ে দেবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানালাম। তিনি জানালেন, আমাদের একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে তিনি নিজেও খুব খুশি হবেন। খুব বেশি কথা না বাড়িয়ে ডা. জুমা তার বন্ধু মিস্টার ওয়েলবিলোভেডের কাছে ফোন করলেন। জোহান্সবার্গে যতগুলো খনি আছে তার সবগুলোর এসোসিয়েশন সংস্থার উর্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন ওয়েলবিলোভেড। খনি শ্রমিক নিয়োগ অথবা ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

ডা. জুমা ফোন করে আমাদেরকে তার ওয়েলবিলোভেডের সাথে দেখা করতে বললেন।

মিস্টার ওয়েলবিলোভেডের অফিসে এসে আমার চক্ষু চড়কগাছ। এত বড় অফিসরুম এর আগে কোনদিন দেখিনি। তার টেবিলটাকে ছোটখাটো একটা ফুটবল মাঠ বলা যেতে পারে। ফেসআইলি নামের এক খনি সর্দার আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে গেলেন। ড. জুমার কাছে সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে যা যা বলেছি তার কাছেও ঠিক একই কথা বললাম। তাকে বললাম উইটওয়াটারস্র্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার উদ্দেশ্যেই আমি জোহান্সবার্গে এসেছি। ভদ্রলোক আমার এই জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন, 'খুব ভালো কথা। তোমরা পড়াশুনা ও চাকরি একসংগে চালিয়ে যেতে চাও– এটা আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছে। তোমরা এক কাজ করো। তোমরা ক্রাউন মাইনসের ম্যানেজার মিস্টার পিলিসোর কাছে যাও। আমি তাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। সেখানে গেলে তিনি তোমাদের চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন।' তার কথা শুনে আমরা যেন আকাশ থেকে পড়লাম। যে পিলিসো আমাদের খনি থেকে বের করে দিয়েছেন, তার কাছেই আমাদের পাঠানো হবে! ওয়েলবিলোভেড বললেন, ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি পিলিসোর সংগে কাজ করেছেন এবং এই সুদীর্ঘ সময়ে পিলিসোর কোন রকম কর্তব্যে অবহেলার রিপোর্ট পাননি। আমরা ওয়েলবিলোভেডের কথা শুনে পাথরের মতো নিশ্চুপ হয়ে রইলাম। তবে মনে একটা জোর পেলাম এই ভেবে যে ওয়েলবিলোভেড পিলিসোর উর্ধতন

অফিসার। আমাদের পক্ষে তিনি যেহেতু সুপারিশ করছেন সেহেতু পিলিসো তার নির্দেশ উপেক্ষা করতে পারবেন না।

যাই হোক আমরা ওয়েলবিলোভেডের চিঠি নিয়ে পরদিনই ক্রাউন মাইনসের অফিসে চলে এলাম। অফিসে আমাদের ঢুকতে দেখেই পিলিসো গর্জে উঠলেন, 'বজ্জাত ছেলেরা! তোমরা আবার এসেছো? কী চাই তোমাদের?' তার তর্জন গর্জন জাস্টিস যেন গায়েই মাখলো না। সে শান্তভাবে বললো, 'মিস্টার ওয়েলবিলোভেড আমাদের পাঠিয়েছেন।' তার কণ্ঠে রক্ষণাত্মক জোরালো একটা ঝাঁঝ স্পষ্টতই প্রকাশ পাচ্ছিল। পিলিসো চিঠিটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা যে তোমাদের বাবা মাকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছো একথা কি মিস্টার ওয়েলবিলোভেড জানেন?' একথার জবাবে আমরা চুপ করে রইলাম। কোন উত্তর দিলাম না।

পিলিসো এবার রাগে অন্ধ হয়ে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমার আন্ডারে যতগুলো খনি আছে তার কোনটাতেই তোমাদের নেওয়া হবে না। এই মুহূর্তে তোমরা আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও। ওয়েলবিলোভেড তো দূরের কথা তার চেয়ে বড় কেউ চিঠি দিলেও আমি তার তোয়াক্কা করবো না। বাঁচতে চাইলে এক্ষুণি বিদেয় হও।' আমি ভেবেছিলাম আর যাই হোক ওয়েলবিলোভেডের খাতিরে হলেও পিলিসো আমাদের সংগে দুর্ব্যবহার করতে পারবেন না। কিন্তু তার মূর্তি দেখে আমরা হকচকিয়ে গেলাম। তাকে শান্ত করার মতো সেখানে তেমন কোন মধ্যস্থতাকারীও ছিল না। ফলে চুপচাপ মাথা নিচু করে অফিস থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না।

অফিসের বাইরে এসেই বুঝলাম আমাদের সৌভাগ্য এখন দুর্ভাগ্যে রূপ নিয়েছে। আমাদের কাজ নেই, থাকার জায়গা নেই– এমনকি কিভাবে কী করা যায় সে পরিকল্পনাও নেই।

জোহান্সবার্গে জাস্টিসের বহু পরিচিত লোক ছিল। চাকরি বাকরি তো পরের কথা এখন যেটা সবচেয়ে দরকার সেটা হল একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই। জাস্টিস আমাকে রেখে কোথাও থাকার জায়গা পাওয়া যায় কিনা তা খুঁজতে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, ইত্যবসরে আমি যেন পিলিসোর কোয়ার্টার থেকে আমার স্যুটকেস নিয়ে আসি। ঠিক হলো দক্ষিণ জোহান্সবার্গের শহরতলী জর্জ গোচে ওই দিন বিকেলেই দুজন মিলিত হব।

খনি এলাকা থেকে বের হওয়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই গার্ডরা তল্লাশি করে। স্যুটকেস নিয়ে বের হওয়ার সময় তারা যাতে কোন হয়রানি না করে সেজন্য বিকিৎসা নামের এক লোকের সাহায্য নিলাম। বিকিৎসা আমার পূর্ব পরিচিত ছিল। এমখেকেজওয়েনিতে তার বাড়ি ছিল। যে কয়দিন খনিতে পুলিশের কাজ করেছি সে কয়দিন সে আমার অধীনেই ছিল। গোত্রপ্রধানের ছেলে অথবা সাবেক

বস্ অথবা অন্য কিছু মনে করে সে আমার স্যুটকেস মাথায় নিয়ে এলো। সদর দরজায় আসতেই গার্ড তাকে থামিয়ে দিল।

গার্ড বললো সে স্যুটকেস সার্চ করতে চায়। বিকিৎসা তার কথায় মহাবিরক্ত হয়ে তাকে সার্চ করতে দিতে চাইলো না। ব্যাগের মধ্যে যে কিছুই নেই বিকিৎসা এ ব্যাপারে একশভাগ নিশ্চিত ছিল। কিন্তু গার্ড জানালো এটা তার রুটিন ওয়ার্ক এবং সেকারণে তাকে তল্লাশি করতেই হবে। সে বাক্সের ডালাটা খুলে জামাকাপড়ের ভাজ নষ্ট না করে একবার চোখ বুলালো। গার্ড বাক্সটা বন্ধ করে তাকে ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল। ঠিক এমন সময় বিকিৎসা চোখ কটমট করে গার্ডকে বললো, 'আমি বললাম ব্যাগে অবৈধ কিছু নেই। তারপরও সার্চ করে তুমি সময় নষ্ট করলে কেন?'

বিকিৎসার কর্কশ কণ্ঠ ও রুক্ষ বাচনভঙ্গি দেখে পাহারাদারের মেজাজ চড়ে গেল। সে খপ করে তার হাত থেকে স্যুটকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে বললো, 'আমার তল্লাশি শেষ হয় নি। আবার সার্চ করতে হবে।' সে এবার ব্যাগে চিরুনি অভিযানের মতো তল্লাশি চালিয়ে প্রত্যেকটি জামা কাপড় চেক করে দেখতে লাগলো। সে এক একটা করে পোশাক নামাচ্ছিল আর শার্ট প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পই পই করে তল্লাশি করা শুরু করল। এবার আমার ভয়ে অস্থির হওয়ার পালা। সে একটা একটা করে শার্ট প্যান্ট নামাচ্ছিল; আর আমার বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস বেড়েই চলছিল। আমি প্রাণপণে ঈশ্বরকে ডাকছিলাম যাতে সে সবচেয়ে নিচে রাখা প্যান্টের পকেটে হাত না দেয়। কিন্তু আমার প্রার্থনায় কাজ হলো না। সবচেয়ে নিচে রাখা প্যান্টের ভাঁজ থেকে সে বের করে আনলো একটা চকচকে লোড করা ভয়ঙ্কর রিভলবার।

পাহারাদার বিস্ফোরিত চোখ নিয়ে আমার বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে বললো, 'ইউ জাস্ট আন্ডার অ্যারেস্ট!' বলেই লোকটা তার ওয়ার্নিং হুইসেল বাজিয়ে দিল।

মুহূর্তের মধ্যে একদল গার্ড বিকিৎসাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। তারা যখন তাকে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো আমার দিকে হতবিহ্বল চোখে চেয়ে রইল। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমি তাদের ফলো করা শুরু করলাম। কি করা যায় ভাবতে লাগলাম। অস্ত্রটা আসলে ছিল আমার বাবার। মারা যাওয়ার আগে ওটা বাবা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি অস্ত্রটা কোন দিন ব্যবহার করিনি। কিন্তু জোহান্সবার্গ আসার সময় আত্মরক্ষার কথা মাথায় রেখে যন্ত্রটা সংগে নিয়েছিলাম।

আমার দিক থেকে বিকিৎসাকে দোষারোপ করার কোন উপায় ছিল না। সে সরল মনে আমার স্যুটকেস বয়ে দিতে গিয়ে বিপদে পড়েছে। ভাবনাটা আমাকে অস্থির করে ফেলল। গার্ডরা বিকিৎসাকে পুলিশ স্টেশনের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সেখানে গেলাম। ভেতরে ঢুকে সরাসরি ওসির সংগে দেখা করতে চাইলাম। ওসি অনুমতি দেওয়ার পর আমি তার রুমে ঢুকলাম।

আমার সর্বোচ্চ বদান্যতা প্রয়োগ করে তাকে বললাম, 'স্যার, আমার বন্ধুটির কোন দোষ নেই। পিস্তলটি আসলে আমার। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রয়াত বাবার কাছ থেকে এ অস্ত্রটি আমি পেয়েছিলাম। জোহান্সবার্গে অসংখ্য সন্ত্রাসী রয়েছে শুনে ট্রান্সকেই থেকে আসার সময় আমি রিভলবারটি সংগে নিয়ে এসেছি।' তাকে জানালাম আমি ফোর্ট হেয়ারের ছাত্র। জোহান্সবার্গে মাত্র কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছি। আমার কথায় ওসি কিছুটা নরম হলেন এবং তক্ষুণি তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন। তবে তিনি এটাও জানালেন অস্ত্র রাখার অপরাধে আমার বিরুদ্ধে তাকে মামলা করতেই হবে। পরবর্তী সোমবার আমাকে আদালতে হাজির হয়ে আনীত অভিযোগের জবাব দিতে হবে। আমি তার প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললাম, অবশ্যই আমি সোমবার আদালতে হাজির হব। কথামতো আমি আদালতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাকে অল্প কিছু জরিমানা করে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল।

মামলা মোকদ্দমার ঝামেলা চুকে যাওয়ার পর অনেক কষ্টে আমার এক চাচাতো ভাইয়ের কাছে থাকার ব্যবস্থা হল। আপন নয়, জ্ঞাতি চাচাতো ভাই। নাম গার্লিক এমবেকেনি। ও থাকতো জর্জ গোচ শহরতলীতে। গার্লিক পেশায় ছিল হকার। ফেরী করে জামাকাপড় বেচতো। ও থাকতো বাক্সের মতো ছোট একটা ঘরে। আমি গিয়ে সেখানেই সাময়িক আস্তানা গাড়লাম। গার্লিক খুবই মিশুক টাইপের ছেলে ছিল। খুব দ্রুত মানুষকে আপন করে ফেলতে পারতো। তার ওখানে কিছুদিন থাকার পর তাকে বললাম আমার জীবনের আসল উদ্দেশ্য হল আইনজীবী হওয়া। সে আমার আকাঙ্ক্ষার কথাকে খুব গুরুত্বের সাথে নিল। গার্লিক বললো এ বিষয়ে সে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

কয়েকদিন পর গার্লিক বললো সে আমাকে 'জোহান্সবার্গের সবচেয়ে ভালোমানুষদের একজনের সংগে দেখা করতে নিয়ে যাবে। যথাসময়ে সে আমাকে নিয়ে তার 'শ্রেষ্ঠ মানুষ' দর্শনের জন্য রওনা হল। আমরা ট্রেনে চেপে বসলাম। মার্কেট স্ট্রীটের স্টেশনে নামলাম কিছুক্ষণ পরই। বুঝলাম শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে এসে পড়েছি আমরা। চারপাশে অসংখ্য গাড়ি, মানুষের হাঁকাহাকি ডাকাডাকি। এদিক ওদিক উঁচু উঁচু পাহাড়ের মতো সব দালানকোঠা। চোখের সামনে যত মানুষ দেখলাম তাদের প্রায় সবাইকেই ধনী শ্রেণীর মনে হল।

ওই সময়টাতে জোহান্সবার্গ পুরোদস্তুর আধুনিক শহর। বিভিন্ন দিক থেকে বড় বড় রাস্তা শহরের সংগে এসে মিশেছে। অফিস ভবনের পাশেই মাংসের দোকানে কসাইকে মাংস কাটতে দেখা যাচ্ছে। বিশাল বিশাল বহুতল ভবনের জানালায় ধোয়া কাপড় নেড়ে দেওয়া। যেদিকে তাকাই সেদিকেই জনস্রোত। যুদ্ধের কারণেই জোহান্সবার্গ আগের চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে দাঁড়িয়েছিল।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ায় ১৯৩৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। যুদ্ধে অসংখ্য সেনা ও রসদ সরবরাহ

করতে হয়। যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অন্যান্য রসদ সরবরাহের জন্য জোহান্সবার্গে অসংখ্য কলকারখানা গড়ে তোলা শুরু হয়। এ কারণে সেখানে প্রচুর জনশক্তির চাহিদা সৃষ্টি হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক কাজের সন্ধানে জোহান্সবার্গ আসতে থাকে। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ সাল– এই পাঁচ বছরে জোহান্সবার্গে আফ্রিকানদের সংখ্যা দ্বিগুণ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

সে সময় প্রত্যেকটি নতুন সকালে জোহান্সবার্গের শহরতলীকে গতকাল সকালের চেয়ে লক্ষ্যণীয়ভাবে জনবহুল বলে মনে হতো। অ-ইউরোপীয় বলে পরিচিত নিউক্লেয়ার, মার্টিনজ্যালে, জর্জ গোচ, আলেকজান্দ্রা, সোফিয়া টাউন ইত্যাদি শহরে প্রচুর ফ্যাক্টরি ও হাউজিং গড়ে উঠছিল। প্রত্যন্ত অঞ্চলের আফ্রিকানরা সেখানে এসে কাজ করা শুরু করলো। এ ছাড়া উত্তরাঞ্চলীয় উপশহর এলাকাগুলোতেও ব্যাঙের ছাতার মতো ঘনবসতি গড়ে উঠতে লাগলো। ঠিক এমনই একটা সময়ে আমি একটা কাজের ধান্দায় গার্লিকের সংগে তার 'শ্রেষ্ঠতম ভদ্রলোকটির' সংগে দেখা করতে এসেছি।

এস্টেস এজেন্টের ওয়েটিং রুমে গিয়ে গার্লিক আর আমি চুপচাপ বসে পড়লাম। কর্তব্যরত সুন্দরী এক আফ্রিকান রিসিপশনিস্ট ভেতরে গিয়ে তার বসের কাছে আমাদের আসার খবর জানালেন। আমাদের উপস্থিতির খবর দিয়ে নিজের সিটে ফিরে এলেন ভদ্রমহিলা। আসনে বসে আশ্চর্য দ্রুততায় চিঠি জাতীয় কিছু একটা টাইপ করতে লাগলেন। তার আঙুলগুলো যেন কী-বোর্ডের ওপর চমৎকার এক ছন্দোময় গতিতে নাচছিল। এর আগে আমি কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা তো দূরের কথা কোন আফ্রিকানকেই টাইপ করতে দেখিনি। উমতাতা এবং ফোর্ট হেয়ারে ইতিপূর্বে আমি যেসব সরকারি-বেসরকারি অফিসে গিয়েছি সেখানে অনেককেই টাইপ করতে দেখেছি। তবে তাদের সবাই ছিল শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। এই মহিলার টাইপিং স্পীডও আমাকে মুগ্ধ করলো। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ টাইপিস্টদের আমি দুই হাতের দুটি আঙুল ব্যবহার করে খুব ধীর গতিতে টাইপ করতে দেখেছি। কিন্তু এ ভদ্রমহিলাকে প্রায় সবগুলো আঙুল ব্যবহার করে ঝড়ের গতিতে টাইপ করতে দেখলাম।

যাই হোক, কিছুক্ষণ পরই রিসিপশনিস্ট মহিলাটি আমাদের ভেতরে যাওয়ার ইশারা দিলেন। ভেতরে ঢোকার পর গার্লিক আমাকে 'বসের' সংগে পরিচয় করিয়ে দিল। আমার ধারণা ছিল তিনি মধ্যবয়সী রাশভারি কোন লোক হবেন। কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিল। লোকটার বয়স আটাশ কি উনত্রিশ। হাল্কা পাতলা গড়ন। চোখে মুখে চৌকস মেধার ঝিলিক ধরা পড়ছিল।

ডাবল ব্রেস্টেড স্যুট পরা লোকটাকে অসম্ভব স্মার্ট দেখাচ্ছিল। বয়সে তরুণ হলেও তাকে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞ বলেও মনে হচ্ছিল। ট্রান্সকেই থেকে এখানে আসলেও তিনি ব্রিটিশদের মতো সাবলীল ইংরেজীতে কথা বলছিলেন। ওয়েটিং রুমে তার অসংখ্য সাক্ষাৎপ্রার্থী এবং টেবিলে প্রচুর ফাইলপত্র দেখে সহজেই তাকে একজন সফল ও ব্যস্ত মানুষ হিসেবে আন্দাজ করতে পারছিলাম। কিন্তু

ভদ্রলোক একটুও ব্যস্ততা দেখালেন না। তার অভিব্যক্তি দেখে মনে হল তিনি যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে আমাদের কথা শুনতে রাজি আছেন। চৌকস ও মেধাবী এই তরুণ কর্মকর্তাটির নাম ওয়াল্টার সিসুলু।

সিসুলুর অফিসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সেখানে যত কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন তাদের সবাই ছিলেন আফ্রিকান। ১৯৪০'র দশকে খুব কম সংখ্যক আফ্রিকান নিজস্ব প্রতিষ্ঠান খুলে স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালানোর সুযোগ পেত। আলেকজান্দ্রা ও সোফিয়া টাউনের মতো শহরে হাতেগোনা মাত্র কয়েক জন আফ্রিকান উদ্যোক্তা এ সুবিধা ভোগ করতে পারতেন। এ দুটি শহরে আফ্রিকানরা কয়েক পুরুষ ধরে তাদের জমির মালিকানা টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। এর বাইরে যেসব মিউনিসিপ্যাল টাউনশীপ ছিল সেখানকার প্রায় সব ভবনই ছিল সরকারের মালিকানাধীন। জোহান্সবার্গ সিটি কাউন্সিল থেকে এগুলোর ভাড়া ধার্য করা হতো। নির্দিষ্ট ভাড়া দিয়ে আফ্রিকানরা সেখানে থাকার সুযোগ পেত।

ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় নেতা উভয় পরিচয়েই সিসুলু স্থানীয় পরিমণ্ডলে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন। সুশীল সমাজে এই বয়সেই তার ব্যাপক প্রভাব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ফোর্ট হেয়ারে কলেজ কর্তৃপক্ষের অন্যায্য নির্দেশ মেনে না নেওয়ায় কীভাবে আমাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তা তাকে খুলে বললাম। তাকে জানালাম যে আমি আইনজীবী হতে চাই এবং জোহান্সবার্গ আসার মূল উদ্দেশ্যই হল আমার এলএলবি কমপ্লিট করা। তবে আমি যে বাড়ি পালিয়ে এখানে এসেছি এবং ক্রাউন মাইনস থেকে বরখাস্ত হয়েছি সে কথা তার কাছে পুরোপুরি চেপে গেলাম। সব কথা বলে আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে তার উত্তরের আশায় থাকলাম। তিনি মিনিটখানিক কী ভাবলেন। তারপর বললেন, লেজার সাইডলস্কি নামে তার ঘনিষ্ঠ একজন আইনজীবী বন্ধু আছেন। তাকে তিনি একজন প্রগতিশীল ও উন্নত মানসিকতার লোক বলেই জানেন। বললেন, সাইডলস্কি আফ্রিকানদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। সিসুলু জানালেন তিনি সাইডলস্কিকে তার ব্যক্তিগত কেরানী হিসেবে নিয়োগ করার জন্য অনুরোধ করবেন।

তখনকার দিনে ইংরেজীতে সাবলীল এবং ব্যবসায় সফল হতে গেলে উচ্চতর ডিগ্রি থাকা অপরিহার্য বলেই আমার ধারণা ছিল। স্বাভাবিকভাবেই আমি ধরে নিয়েছিলাম সিসুলু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। কিন্তু তার অফিস থেকে বের হবার পর আমার ভাইয়ের কাছে জানলাম সিসুলু বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠও মাড়ায়নি। তিনি মাত্র স্ট্যান্ডার্ড সিক্স ক্লাস পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। আমি বিস্ময়ে হা হয়ে গেলাম। জোহান্সবার্গ সম্পর্কে আমার নতুন আরেকটি ধারণার জন্ম হল। ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন আমাদের শেখানো হয়েছিল যে কোন নেতৃত্বে যেতে হলে আগে বি.এ. ডিগ্রি দরকার এবং কেউ বি.এ. পাশ মানেই সে কোন না কোন ক্ষেত্রের নেতা। কিন্তু জোহান্সবার্গ এসে দেখলাম সব ক্ষেত্রের বেশিরভাগ নেতা অথবা কর্মকর্তারই কোন বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি নেই। বিএ পাশের জন্য ফোর্ট হেয়ারে পুরোপুরি ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশুনা করতে

হয়েছিল। এ কারণে আমার ধারণা ছিল ইংরেজীতে আমার যথেষ্ট দখল রয়েছে; আমার ইংরেজী উচ্চারণ যথেষ্ট মানসম্পন্ন। কিন্তু জোহান্সবার্গ এসে সে ভুল ভেঙে গেল। আমি দেখলাম এখানে যারা এখনও স্কুল সার্টিফিকেট পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি তারাও আমার চেয়ে বহুগুন সাবলীল। তাদের স্পীকিং স্ট্যান্ডার্ডের সামনে আমার যোগ্যতাকে একেবারেই নবীশীদুর্বল মনে হল।

চাচাতো ভাইয়ের কাছে দিন কয়েক থাকার পর আমি আলেকজান্দ্রা টাউনশীপের অষ্টম অ্যাভিনিউতে চলে এলাম। সেখানকার অ্যাংলিকান চার্চের রেভারেন্ড ছিলেন হে মাবুযো। তিনি থেম্বুল্যান্ড থেকে এসেছিলেন। থেম্বুল্যান্ডে থাকাকালীন আমাদের পরিবারের সংগে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেই সূত্রে এ বাড়িতে আমাকে আশ্রয় দেওয়া হল। মোবুযো অসম্ভব ভাল ও ধর্মপরায়ন লোক ছিলেন। তার স্ত্রীও খুব আমুদে ও স্নেহময়ী মহিলা ছিলেন। আমরা তাকে *গোগো* (চাচী) বলে ডাকতাম। রেভারেন্ড মোবুযো যেহেতু আমার পরিবারকে আগে থেকেই চিনতেন সেহেতু আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করাকে তিনি দায়িত্ব হিসেবে দেখলেন। অনেক আগে তার মুখে শুনেছিলাম, 'আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের সুখ দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার শিক্ষা দিয়ে গেছেন।'

যেভাবে এবং যে পরিস্থিতিতে আমি বাড়ি পালিয়েছি তা ক্রাউন মাইনসে যেভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলাম এখানেও তাই করলাম। মিথ্যে বলার কারণে ক্রাউন মাইনস থেকে বহিষ্কৃত হয়েও আমার শিক্ষা হল না। সত্য বললে যদি মোবুযো আমাকে আশ্রয় না দেন; এমন আশংকায় তার কাছেও বাড়ি পালানোর ঘটনা চেপে গেলাম। এই সত্য গোপন করাটাই কাল হয়ে দাঁড়ালো। একদিন সন্ধ্যায় মোবুযো, তার স্ত্রী এবং আমি বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি; এমন সময় বাড়িতে একজন মেহমান এলেন। মেহমানটির নাম মিস্টার ফেস্টাইল। ফেস্টাইল মোবুযোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই ফেস্টাইল হলেন চেম্বার অব মাইনসের 'ইন্দুয়ানা' বা প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। মিস্টার ওয়েলবিলোভেডের সংগে আমি আর জাস্টিস যখন কথা বলেছিলাম তখন সেখানে ফেস্টাইল উপস্থিত ছিলেন। মিস্টার ফেস্টাইল আমাদের চায়ের আড্ডায় হাজির হলে আমরা দুজনই দুজনকে দেখে চমকে উঠলাম। তবে সে চমকানিটাকে তাৎক্ষণিকভাবে আড়াল করে দুজনেই এমনভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম যেন আমাদের মধ্যে আগে থেকেই ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আড্ডা আলোচনা শেষে ফেস্টাইল চলে গেলেন। পরদিন মোবুযো আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, তার কাছে আসল সত্য না বলায় তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছেন এবং তাদের সংগে আমার একই ছাদের তলায় বসবাস করা সম্ভব হবে না।

এবার নিজের প্রতি আমার চরম বিতৃষ্ণা জন্ম নিল। আমি বুঝতে পারলাম যেখানে কোনরকম চালাকি করার দরকারই নেই সেখানেও আমি নয়ছয়

কথাবার্তা বলা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম, যদি রেভারেন্ডকে আগাগোড়া সব খুলে বলতাম তাহলে তিনি তেমন কিছুই মনে করতেন না। অন্তত আমাকে তার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলতেন না।

কিন্তু আমার সব কথা তিনি যখন ফেস্টাইলের মুখে শুনলেন তখন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন। আমি তার সংগে প্রতারণা করেছি বলেই তিনি ধরে নিলেন। জোহান্সবার্গ আসতে না আসতেই আমি একের পর এক মানুষের আস্থা হারাচ্ছিলাম। একটা মিথ্যে ঢাকতে গিয়ে নতুন নতুন মিথ্যের জালে আটকে যাচ্ছিলাম। মানুষের অবিশ্বাস ও ঘৃণা আমাকে তাড়া করে ফিরছিল। রেভারেন্ড যখন আমাকে তার বাড়ি ছাড়তে বললেন, তখন মনে হল আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে। জোহান্সবার্গে এমনিতেই আমি নতুন। কাউকেই তেমন একটা চিনি না। কোথায় যাবো, কার কাছে থাকব কিছুই মাথায় আসছিল না। আমার অসহায়ত্বের ব্যাপারটা রেভারেন্ড মোবুযো ধরতে পেরেছিলেন। তিনি আমার বিকল্প আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। তার বাড়ির পাশেই এক বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। বাড়িওয়ালার নাম ছিল মিস্টার ঝোমা।

ঝোমা যথেষ্ট স্বচ্ছল লোক ছিলেন। আলেকজান্দ্রায় বেশ কিছু জমি জিরাত ছিল তার। সেভেন্থ এভিনিউ'র ৪৬ নং বাড়িটাই ছিল মিস্টার ঝোমার। স্ত্রী ও ছয় ছেলে মেয়ে নিয়ে তিনি যে ঘরটাতে থাকতেন সেটা খুব বড় ছিল না। কিন্তু তার পরিবারে শান্তি ছিল। ঘরের সংগে বিশাল একটা বারান্দা ছিল। বারান্দার সামনেই ফুলের বাগান। আলেকজান্দ্রার বহু বাড়িওয়ালার মতো মিস্টার ঝোমাও ব্যাচেলরদের রুম ভাড়া দিতেন। অবশ্য রুম বলতে তার নিজের ঘরের রুম নয়। তার ঘরের পেছনে টিনের চাল দিয়ে তিনি অন্য একটা ঘর তুলেছিলেন। সেখানে অল্প আয়ের ব্যাচেলর ও ছাত্ররা থাকতো। সেখানেই আমাকে একটা রুম দেওয়া হল। স্যাতস্যাতে নোংরা মেঝে, আলোবাতাস নেই। সে ঘরে না আছে বিদ্যুৎ না সাপ্লাইয়ের পানি। কিন্তু তারপরও এ ঘর পেয়ে আমি খুশি। আপাতত এখানে আমি স্বাধীন– এই ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম।

ইতিমধ্যে ওয়াল্টারের সুপারিশে লাজার সাইডলস্কি আমাকে তার একজন ক্লার্ক হিসেবে নিয়োগ দিতে রাজি হলেন। ঠিক হলো তার ওখানে কাজ করার পাশাপাশি আমি বি.এ. ডিগ্রিটা শেষ করব। সাইডলস্কি যে ল'ফার্মের শেয়ারহোল্ডার ও কর্মকর্তা ছিলেন সেটার নাম উইটকিন, সাইডলস্কি অ্যান্ড ঈডেলম্যান। এ শহরে তখনকার দিনে সবচেয়ে বড় যে কয়টা ল-ফার্ম ছিল এটি তাদের মধ্যে একটি। এরা কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ উভয় শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের মামলা পরিচালনা করতো। দক্ষিণ আফ্রিকায় তখনকার দিনে অ্যাটর্নি হতে হলে শুধু আইন বিষয়ের নির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলোতে পাশ করাই যথেষ্ট ছিল না; পাশ করার পর নাম করা আইনজীবীদের শিক্ষানবীশ হিসেবে কয়েক বছর উমেদারি করা লাগত। অর্থাৎ উমেদারি করতে গেলেও আমাকে অপরিহার্যভাবেই বিএ পাশ করতে হবে। এ লক্ষ্যে আমি বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি অব সাউথ আফ্রিকা বা

ইউনিসা'তে নাইট শিফটে ভর্তি হলাম। রাতে ক্লাস করতাম। দিনে সাইডলস্কির ল'ফার্মে কাজ করতাম। আমার কাজ ছিল আফ্রিকান জমি ক্রেতা-বিক্রেতাদের মালিকানা হস্তান্তর বিষয়ক কাগজপত্র ঠিকঠাক আছে কীনা তা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে সেইমতো তাদের পরামর্শ দেওয়া। ওয়াল্টার সিসুলু এই ফার্মে জমি মর্টগেজ রাখতে আগ্রহী মক্কেলদের পাঠাতেন। আমাদের ফার্মের কাজ ছিল মক্কেলদের লোনের দরখাস্ত ঠিকঠাক মতো তৈরি করে দেওয়া। লোন পাশ হলে শর্ত অনুযায়ী তারা ফার্মকে একটা নির্দিষ্ট অংকের কমিশন দিতো। কমিশনের এই অর্থ আবার ভাগ হয়ে যেতো এস্টেট এজেন্টদের মধ্যে। তবে কমিশনের বৃহৎ অংশটাই নিত প্রতিষ্ঠান। এজেন্ট অর্থাৎ আফ্রিকান দালালদের দেওয়া হতো ছিটেফোঁটা অংশ। কালোদের কোনরকম রশিদপত্র ছাড়াই লামসাম ধরিয়ে দেওয়া হতো। না নিয়ে তাদের উপায়ও ছিল না।

এত কিছুর পরও অধিকাংশ ল'ফার্মের চেয়ে আমাদের ফার্ম যথেষ্ট উদারনৈতিক ছিল। এটি ছিল ইহুদীপ্রধান প্রতিষ্ঠান। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি বর্ণবাদ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহুদীরা বেশিরভাগ শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে উদার মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। হয়তো ঐতিহাসিকভাবে তারা সুদীর্ঘকাল থেকে নানা নিগ্রহের শিকার হওয়ার কারণে এ উদার মানসিকতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংশীদার লেজার সাইডলস্কি আমার মতো একজন তরুণ আফ্রিকান সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন কিছু না জেনেশুনেই ক্লার্ক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এটা যে কত বড় উদারনৈতিক পরিচয় তা বলে শেষ করা যাবে না।

৩৫/৩৬ বছর বয়সী সাইডলস্কি উইটওয়াটারস্র্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছিলেন। ভদ্রলোক আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন এবং আমিও তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। তিনি আফ্রিকানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর কাজে যুক্ত ছিলেন। আফ্রিকান স্কুলগুলোর উন্নয়নে তিনি সময় ও অর্থ দুই-ই দিতেন। পাতলা গোঁফওয়ালা চিকনা গড়নের এই মানুষটি সত্যিকার অর্থেই আমার ভালো চাইতেন। আমার সাফল্য কামনা করতেন। এ কারণেই বারবার তিনি আমাকে লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা; শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ আর পরামর্শ দিতেন। তিনি বলতেন একমাত্র গণশিক্ষাই আফ্রিকানদের মুক্ত করতে পারে। তার যুক্তি ছিল মানুষ যখন শিক্ষিত হয়ে যায় তখন আর তাকে ঠেকানো যায় না; দমিয়ে রাখা যায় না। তিনি দিনের পর দিন আমাকে একজন সফল অ্যাটর্নি হওয়ার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন। আমার সমাজ যাতে আমাকে নিয়ে গর্ব করতে পারে সেই অবস্থান দখল করে নেওয়ার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন।

ল'ফার্মে প্রথম অফিস করার দিনই আমি অধিকাংশ সহকর্মীর সংগে পরিচয় পর্ব সেরে নিলাম। শ্বেতাঙ্গদের পাশাপাশি এখানে আমার মতো গাউর রাদেবে নামক আরেকজন আফ্রিকান সহকর্মী পেলাম। একই রুমে আমাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমার চেয়ে বয়সে দশ বছরের বড় গাউর এখানে একই সংগে করনিক, দোভাষী ও মেসেঞ্জার বা বার্তাবাহকের দায়িত্ব পালন করত। বেঁটে ও

পেশীবহুল শক্তসমর্থ লোকটা ইংরেজী, সোথো ও জুলু ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারত। তার কথাবার্তা ও চালচলনে আত্মবিশ্বাস ও আমুদে মনোভাব সহজেই প্রকাশ পেত। জোহান্সবার্গের কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সে খুব মেধাবী ও আপোষহীন ব্যক্তি হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

অফিসের প্রথম দিনে, সকালের দিকেই মিস লিবারম্যান নামের এক সুন্দরী শ্বেতাঙ্গ সেক্রেটারি আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'আমাদের এই ল' ফার্মে সাদা-কালোর কোন ভেদ-বিভেদ মানা হয় না।' প্রসংগ ছাড়াই তার এ ধরণের মন্তব্যে একটু কেমন খটকা লাগলো। তারপর মহিলা আমতা আমতা করে বললেন, 'মধ্য সকালে সামনের পার্লারে আমাদের সবার জন্য চা আসবে। ট্রেতে অনেকগুলো কাপ থাকবে। দুটো কাপ বাদে সবগুলোই পুরনো। তোমাদের সম্মানে দুটো নতুন কাপ কেনা হয়েছে। একটি তোমার অপরটি গাউরের জন্য। তিনি বললেন, পার্সোনাল সেক্রেটারিরা সেখান থেকে চা নিয়ে সিনিয়র বস্‌দের ঘরে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আমার মতো তুমি এবং গাউর দুজনেই নিজে গিয়ে নিজের চা নিয়ে আসবে। একই সংগে তিনি বারবার বললেন, আমরা, মানে আমি আর গাউর যেন পুরনো কাপ না নেই; নতুন কেনা দুটো কাপই যেন ব্যবহার করি। মিস লিবারম্যান আমাকে এ কথাগুলো গাউরকে জানিয়ে দেওয়ারও অনুরোধ করলেন। হাসিখুশি আচরণের জন্য আমি লিবারম্যানের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু 'নতুন দুটো কাপ' প্রসংগে তিনি যে বয়ান করলেন তা মোটেও ভালো লাগলো না। শুরুতে তিনি এখানে কোন সাদা-কালো'র তফাৎ মানা হয় না বললেও আমাদের জন্য আলাদা কাপের ব্যবস্থা হয়েছে জেনে আমি যা বোঝার বুঝে গেলাম। বুঝলাম এ ফার্মের 'সাদা' কর্মচারীরা আমাদের সংগে চা খেতে রাজি থাকলেও একই কাপে চা খেতে তাদের আপত্তি রয়েছে।

মিস লিবারম্যান যা বলেছেন তা গাউরের কাছে বলতেই তার চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেল। ছোট বাচ্চাদের মাথায় দুষ্টু কোন বুদ্ধি খেলে গেলে যেমন দেখায় তেমন একটা ভঙ্গিমা করে সে আমাকে বললো, 'নেলসন, টিটাইম নিয়ে চিন্তা করো না। ওই সময় আমার দিকে খেয়াল রেখো; আমি যা করি তুমিও তাই করবে।'

১১টা বাজতেই মিস লিবারম্যান চা এসে গেছে বলে খবর দিয়ে গেলেন। গাউর কী কাণ্ড বাধিয়ে বসে আমি তাই দেখার জন্য তার দিকে নজর রাখলাম। দেখলাম বিভিন্ন সেক্রেটারি এবং ফার্মের অন্যান্য মেম্বারদের সামনে দিয়ে সহজ ভঙ্গিমায় সে চায়ের ট্রের কাছে হেঁটে গেল। নতুন কাপ দুটোর কোনটা না নিয়ে অন্যগুলো থেকে একটা কাপ তুলে নিল। তারপর ইচ্ছেমতো চিনি আর দুধ মিশিয়ে আরাম করে খেতে লাগলো। সাদা সেক্রেটারিরা গাউরের স্পর্ধা দেখে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। গাউর তখন আমার দিকে চেয়ে মাথা ঝাকিয়ে ইশারা করলো। তার ইশারায় বুঝলাম যে আমাকে বলছে, 'নেলসন, এবার তোমার পালা।'

আমি কয়েকমুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম। আমি অন্যান্য সেক্রেটারিকে আহত করতে চাইছিলাম না; আবার আফ্রিকান বন্ধুটিকেও আঘাত দিতে মন সায় দিল না। আমার তখন 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থা। শেষ পর্যন্ত উভয়ের শ্যেন দৃষ্টি থেকে বাঁচতে মধ্যপন্থা বেছে নিলাম। বললাম, আমি চা খাবো না। আমার একদম তেষ্টা পায়নি। এই মুহূর্তের আপোষকামীতার পেছনে অবশ্য বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। এ অফিসে আমি তখন একেবারেই নতুন। বয়স মাত্র তেইশ বছর। এই শ্বেতাঙ্গদের ফার্মে কাজের মাধ্যমে সবেমাত্র একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছি। এখনই সবাইকে খেপিয়ে আমার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতে চাইছিলাম না। এ সমস্ত কারণে মধ্যপন্থা অবলম্বনই আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হল। ওই দিনের পর থেকে চা খাওয়ার সময় আমি অফিসের ছোট রান্নাঘরটাতে চলে যেতাম। চুপচাপ নিজের মতো করে চা বানিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েই খেয়ে আসতাম।

'সাদা' সেক্রেটারিরা যে সব সময়ই আমাদের ছোট করার তালে থাকতো তা নয়। তবে আরেক দিনের ঘটনা আমাকে খুব পীড়া দিয়েছিল। কিছুদিন কাজ করার কারণে আমি ফাইল পত্র সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলাম। মাঝে মাঝেই দু'একজন সহকর্মী আমার কাছ থেকে ডিকটেশন নিত। একদিন সাধারণভাবে এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা সেক্রেটারিকে কি একটা মামলার ব্যাপারে ডিকটেশন দিচ্ছিলাম। ঠিক সে সময় তার পরিচিত একজন শ্বেতাঙ্গ মক্কেল রুমে ঢুকলেন। তাকে দেখে ভদ্রমহিলা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। একজন আফ্রিকানের কাছ থেকে তিনি ডিকটেশন নিচ্ছেন এটা ওই মক্কেলকে তিনি বুঝতে দিতে চাইছিলেন না। ভদ্রমহিলা দ্রুত অন্য প্রসংগে কথা বলা শুরু করলেন। তারপর পার্স থেকে কিছু পয়সা বের করে আমাকে দিয়ে মিষ্টি গলায় বললেন, 'নেলসন, দোকানে গিয়ে আমার জন্য একটা শ্যাম্পু এনে দাও না, প্লিজ।' আমি রুম ছেড়ে বাইরে এলাম। তার শ্যাম্পু কেনার জন্য দোকানের দিকে রওনা হলাম।

ল' ফার্মে আমাকে প্রায় সব ধরণের কাজ করতে হত। বিশেষত কাজে যোগদানের শুরুর দিকে আমাকে ক্লার্ক থেকে শুরু করে মেসেঞ্জারের দায়িত্ব পালন করতে হত। মক্কেলের ফাইলপত্র তৈরি করা, সেগুলো ঠিকঠাক মতো নথিবদ্ধ হয়েছে কিনা তা দেখা, এমন কি জোহান্সবার্গের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট জায়গায় সেগুলো পৌঁছে দিতে হতো। আফ্রিকান ক্লায়েন্ট যোগাড় করার বিষয়েও আমাকে বাইরে ছোটাছুটি করতে হতো। মিষ্টার সাইডলোস্কি আমাকে প্রায়ই বলতেন আমাকে যত ছোট ও গুরুত্বহীন দায়িত্বই দেওয়া হোক না কেন সেটা যেন আমি ভালোভাবে পালন করি। তিনি প্রত্যেকটি কেসের খুটিনাটি বিষয় আমাকে শুধু খোলাসা করে বোঝাতেনই না প্রত্যেকটি বিষয়ের দার্শনিক দিকগুলোও ব্যাখ্যা করতেন। আইন সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ ছিল না। আইন বিষয়টি তিনি অত্যন্ত উদার মনোভাব নিয়ে দেখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজ বদলানোর জন্য আইনের চেয়ে বড় হাতিয়ার আর নেই।

আইন বিষয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও সাইডলস্কি রাজনীতি সম্বন্ধে আমাকে বার বার সতর্ক করতেন। তিনি বলতেন মানুষের ভেতরকার কদাকার মানুষটাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে যে জিনিস; তার নামই হল পলিটিকস্। তার ধারণা ছিল যাবতীয় সমস্যা ও দুর্নীতি সৃষ্টির মূলে থাকে রাজনীতিকরা। এ কারণে সর্বক্ষেত্রেই পলিটিকস্ থেকে দূরে থাকা দরকার। আমি যদি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি তাহলে কী ধরণের বিপদে পড়তে পারি তার একেকটা ভয়াবহ চিত্র একেকদিন তুলে ধরতেন। পাশাপাশি যারা রাজনীতির সংগে জড়িয়ে সমাজে ঝগড়া ফ্যাসাদের সৃষ্টি করছে তাদের থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতেন। সাইডলস্কি এরকম শ্রেণীর বিশেষ দুজনের নামও উল্লেখ করলেন। এদের একজন গাউর রাদেবে আরেকজন ওয়াল্টার সিসুলু। এই দুজনের পেশাগত যোগ্যতাকে তিনি সন্দেহাতীতভাবেই শ্রদ্ধা করতেন। তবে রাজনীতির সংগে তাদের সংশ্লিষ্টতা তিনি একদম মেনে নিতে পারতেন না।

সাইডলস্কি গাউরকে 'ঝামেলাবাজ' বলে ভাবতেন যে অর্থে সে অর্থে গাউর ছিল 'জাত ঝামেলাবাজ'। অর্থাৎ কিনা আফ্রিকান সম্প্রদায়ের কাছে তার ব্যাপক প্রভাব ছিল। ওয়েস্টার্ন ন্যাটিভ টাউনশীপের অ্যাডভাইজরি বোর্ডের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল গাউর। স্থানীয় লোকজনের প্রত্যক্ষ ভোটে ৪ সদস্য বিশিষ্ট এই বোর্ড গঠিত হত। মহল্লার ভালোমন্দ নিয়ে এই বোর্ড কর্তৃপক্ষের সংগে কথা বলত। এই বোর্ডের ক্ষমতা খুব বেশি না থাকলেও মহল্লার মানুষের কাছে বোর্ড সদস্যরা যথেষ্ট সম্মানিত বলে বিবেচিত হতেন। বোর্ড সদস্য হিসেবে গাউরকেও তারা বেশ মান্য করতেন। কিছুদিনের মধ্যেই আমি আবিস্কার করলাম গাউর শুধু একজন অ্যাডভাইজরি বোর্ড সদস্যই নয়; সে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা এএনসি এবং কম্যুনিস্ট পার্টিরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

গাউর স্বাধীনচেতা লোক ছিল। আমাদের চাকরিদাতা অর্থাৎ মালিকপক্ষের লোকজনকে সে কখনও অতিমাত্রায় সমীহ তো করতই না, আফ্রিকানদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের জন্য সে উল্টো তাদেরই মাঝে মধ্যে দু'কথা শুনিয়ে দিত। সে তাদের বলতো, 'তোমরা সাদারা উড়ে এসে জুড়ে বসেছো। আমাদের জায়গা জমি চুরি করে আমাদেরই গোলাম বানিয়ে রেখেছো। আর এখন সেই জমির ছিটে ফোঁটা ফিরিয়ে দেওয়ার নামে আমাদের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছ।' গাউরের জোরালো স্থানীয় প্রভাবের কারণে তারা তাকে কিছু বলতে পারত না। একদিনের ঘটনা; আমি চিঠিপত্র বিলির কাজ শেষ করে সবেমাত্র মিস্টার সাইডলস্কির অফিসে ঢুকেছি। ঢুকে দেখি সাইডলস্কির সংগে গাউরের বাদানুবাদ চলছে। গাউর প্রবল আক্রোশে তার দিকে চেয়ে বলছে, 'লুক মিস্টার সাইডলস্কি! আপনি এখানে লর্ডের মতো বিশাল একটা চেয়ার চেপে বসে আছেন। আর আপনার কাগজপত্র বিলি করে বেড়াচ্ছে আমার টিম প্রধান। (টিম প্রধান বলতে সে আমাকে বোঝাচ্ছিল)। কিন্তু এই দিন থাকবে না। দিন বদলাবে। সেদিন আপনাদের সবগুলোকে পাঁজাকোলে করে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে

দেবো।' একথা বলেই গাউর ঘর ছেড়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল। সাইডলস্কি গাউরের স্পর্ধা ও আত্মবিশ্বাসী শক্তি দেখে বোবার মতো চেয়ে রইলেন।

গাউর ছিল সেই সমস্ত স্ব শিক্ষিত মেধাবীদের একজন যে কিনা বি.এ. পাশ না করেও ফোর্ট হেয়ার থেকে উজ্জ্বলতর ডিগ্রি নেওয়া যে কোন লোকের চেয়ে বেশি যোগ্যতা রাখে। সে শুধু মেধাবীই ছিল না; তার ছিল প্রচণ্ড সাহস আর সাবলীল আত্মবিশ্বাস। যদিও আমি ডিগ্রি কোর্স শেষ করার জন্য আইন কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম; তথাপি গাউরের কাছ থেকেই প্রথম জানলাম নেতৃত্বের যোগ্যতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি অপরিহার্য নয়। ভুরি ভুরি ডিগ্রি পাওয়া লোক যদি তার নিজের সম্প্রদায়ের সমীহ অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার পক্ষে বড়জোর আঁতেল বুদ্ধিজীবী হওয়া সম্ভব; কিন্তু নেতা হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।

উইটকিন, সাইডলস্কি অ্যান্ড আইডেলম্যান ল' ফার্মে আমি একাই যে শুধু আর্টিকেলড্ ক্লার্ক ছিলাম তাই নয়; আমার সংগে আরও কয়েকজন একই পদে কাজ করতো। ওদের মধ্যে ন্যাট বার্গম্যান নামে একটা ছেলে ছিল। আমি আসার কিছুদিন আগে সে ওই ফার্মে জয়েন করেছিল। ন্যাট খুব মেধাবী, শান্ত এবং চিন্তাশীল ছেলে ছিল। তার সবচেয়ে বড় গুণ হল সে কখনোই সাদা-কালোর বিভেদ খুঁজতো না। এই ন্যাটই আমার প্রথম শ্বেতাঙ্গ বন্ধু। তার অনেক মজার যোগ্যতার একটি হল কণ্ঠ নকল করা। সেদিক থেকে তাকে হরবোলা বলা যেতে পারে। সে জ্যান স্মুটস্, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট এবং উইন্সটন চার্চিলের কণ্ঠ হুবহু নকল করতে পারত। আমি বিভিন্ন ধরণের আইন ও অফিস প্রসিডিউর বিষয়ক সমস্যা সমাধানে তার কাছে সাহায্য চাইতাম। সে খুব সহজেই আমাকে সমাধান বাৎলে দিত।

একদিন লাঞ্চের সময় হয়ে যাওয়ার পরও আমরা অফিসে কাজ করছিলাম। আমার পাশে বসা ন্যাট হঠাৎ তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা স্যান্ডউইচের প্যাকেট বের করে আনলো। প্যাকেট ছিঁড়ে একটা স্যান্ডউইচ আলাদা করলো। সেটির এক প্রান্ত ধরে আমাকে অন্য প্রান্ত ধরতে বললো। সে আমাকে এটা করতে বলছে কেন তা বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছিল বলে তার কথামতো স্যান্ডউইচটার অন্য প্রান্ত ধরলাম। ও বললো, 'এবার টান মারো।' আমি টান দিতেই স্যান্ডউইচটা ছিঁড়ে দুভাগ হয়ে গেল। একভাগ আমার হাতে অন্যভাগ ন্যাটের হাতে।

ন্যাট বললো, 'খাও'। আমি যখন স্যান্ডউইচ চিবুচ্ছিলাম; তখন ন্যাট বললো, 'নেলসন, এইমাত্র আমরা যেটা করলাম সেটা কম্যুনিস্ট পার্টির দর্শনের প্রতীক। কম্যুনিজমের মূলমন্ত্র হল তোমাদের কাছে যা আছে তা সমানভাবে ভাগ করে খাও।' ন্যাট আমাকে জানালো যে সে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। প্রসংগক্রমে সে পার্টির লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও দর্শন ব্যাখ্যা করতে লাগলো। গাউর কম্যুনিস্ট দলের

সদস্য ছিল তা আগেই জানতাম। তবে তাকে ইতিপূর্বে ন্যাটের মতো দলীয় দর্শন প্রচার করতে দেখিনি। ওইদিন ন্যাটের কাছ থেকে কম্যুনিজমের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারলাম। এরপর সে তাদের কয়েকটি দলীয় সভায় আমাকে নিয়ে যায় এবং আমি যাতে দলে যোগ দেই সেজন্য আমাকে নানাভাবে বোঝাতে থাকে। আমি তার বক্তব্য শুনি, রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করি কিন্তু পার্টিতে যোগ দিতে রাজি হই না। আসলে সে সময় আমি কোন রাজনৈতিক দলের সংগেই নিজেকে জড়াতে চাইছিলাম না। রাজনীতিতে না জড়ানোর জন্য সাইডলস্কি আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলো তখন আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। ধর্মের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল; ঈশ্বর ভীতি ছিল। ধর্মকে এড়িয়ে যাওয়ায় কম্যুনিজম থেকে দূরে থাকাকেই আমার উচিত বলে মনে হল। তবে স্যান্ডউইচ ভাগ করে খাওয়ার ব্যাপারটি খুব ভালো লেগেছিল।

ন্যাটের সাহচর্য আমার ভালো লাগত। তার সংগে প্রায়ই কম্যুনিস্ট পার্টির মিটিংয়ে গিয়ে সমাজতান্ত্রিকতা বিষয়ক বক্তৃতা শুনতাম। অবশ্য আমার সেই যওয়ার পেছনে কোন রাজনৈতিক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতুহল ছিল না। বর্ণবাদী উৎপীড়নের ইতিহাস সম্পর্কে আমার আগ্রহ ছিল। আমার মনে হত দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন যে লড়াই সংগ্রাম চলছে তার মূলে ছিল সাদা ও কালোর বিভেদ। কিন্তু কম্যুনিস্টরা শ্রেণী বৈষম্যকেই দক্ষিণ আফ্রিকার মূল সমস্যা বলে ধারণা করত। তারা বলতো ধনী-গরীবের বৈষম্যই মূল সমস্যা। পুঁজিপতিরা প্রলেতারিয়েতদের ওপর যে নিষ্পেষণ চালাচ্ছে সেটাই আফ্রিকান সমাজের মূল সমস্যা।

তাদের বক্তব্য আমার কাছে আংশিক সত্য বলে মনে হত। শ্রেণীবৈষম্য অবশ্যই বড় সমস্যা ছিল। কিন্তু আমার বিবেচনায় তার চেয়ে বড় সমস্যা ছিল বর্ণবাদ। আমার মনে হল কম্যুনিজমের এই দর্শন তখনকার আফ্রিকার জন্য প্রযোজ্য ছিল না। জার্মানি অথবা ইংল্যান্ড অথবা রাশিয়ায় এ নীতি খাটতে পারে। আমি যে আফ্রিকায় বড় হচ্ছিলাম সেখানে শ্রেণীসংগ্রাম নয় বরং বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামকেই আমার বেশি প্রাসংগিক ও যুক্তিপূর্ণ মনে হত। কিন্তু তারপরও আমি তাদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনতাম; জানার চেষ্টা করতাম।

ন্যাট আমাকে বেশ কয়েকটি পার্টিতে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে সব ধরণের লোকের উপস্থিতি থাকতো। সাদা, কালো, আফ্রিকান, ইন্ডিয়ান, ককেশীয় হরেক কিসিমের লোক ওইসব পার্টিতে আসতো। এ সমস্ত গেট টুগেদার পার্টির আয়োজন করা হতো কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে। যারা এখানে আসতো তাদের প্রায় সবাই দলের নেতা-কর্মী অথবা সদস্য। আমার মনে পড়ছে প্রথম যেদিন আমি এ ধরণের একটি গেট টুগেদার পার্টিতে যাই সেদিন পোশাক নিয়ে আমার অস্বস্তি লাগছিল। মনে হচ্ছিল সাধারণ পোশাক পরে আমার এ ধরণের

পার্টিতে আসা ঠিক হয়নি। ফোর্ট হেয়ারে আমাদের যে কোন ধরণের সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে টাই পরার নির্দেশ দেওয়া হতো। সে সময় থেকেই আমি যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে জ্যাকেটের সংগে টাই পরতে অভ্যস্ত ছিলাম।

ল' ফার্মে চাকরি করার সময় আমার ওয়ারড্রোবে খুব বেশি কাপড়-চোপড় না থাকলেও আমি সেখানে একটা টাই ঠিকই রেখেছিলাম যাতে এজাতীয় মুহূর্তে বিব্রতবোধ করতে না হয়। কিন্তু অসাবধানতাবশত সেদিন টাই না পরেই ওই পার্টিতে যোগ দিলাম।

পার্টিতে গিয়ে দেখলাম সেখানে অসংখ্য গণ্যমান্য মানুষ এসেছে। কারও মধ্যে কোন ধরণের বর্ণবাদী মনোভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। সব শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতিসম্পন্ন এজাতীয় অনুষ্ঠানে আমি আগে কোনদিন আসিনি। ফলে আমি অবাক হয়ে কে কী করছে না করছে তাই লক্ষ্য করছিলাম। আগতদের উচ্চমার্গীয় আলোচনায় পাছে আমার কোন মুর্খতা ধরা পড়ে যায় অথবা সামাজিক কায়দা-কানুন বিরোধী কোন আচরণ প্রকাশ পায় সেজন্য আমি খুবই তটস্থ ছিলাম। আমার চারপাশে যারা আলাপ আলোচনা করছিল তাদের বেশভূষা ও কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছিল যে তারা শিক্ষাদীক্ষায় আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে। তাদের তুলনায় নিজেকে খুবই তুচ্ছ মনে হচ্ছিল আমার।

ওই সন্ধ্যায় মাইকেল হার্মেল নামের এক কম্যুনিস্ট কর্মীর সংগে আমার পরিচয় হয়। ন্যাট আমাকে জানিয়েছিল হার্মেল রোডস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছিল। তার উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন আমাকে মুগ্ধ করলেও তার পোশাক পরিচ্ছদের স্টাইল আমার মোটেও পছন্দ হল না। আমি যখন হার্মেলের সংগে কথা বলছিলাম তখন মনে মনে ভাবছিলাম, যে লোকটা ইংরেজীতে এম. এ. করেছে সে টাইটা পর্যন্ত ঠিকমতো বাঁধতে শেখেনি। পরবর্তীতে এই মাইকেলের সংগে আমার বন্ধুত্ব হয়। ক্রমশই তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়তে থাকে। যখন বুঝতে পারলাম আমি এতদিন পশ্চিমাদের যেসব তথাকথিত সভ্য সংস্কৃতিকে রপ্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছি সেসব কিছুকে মাইকেল হার্মেল সচেতনভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গেল। সে শুধু একজন উঁচুদরের লেখকই ছিল না; সে ছিল এক নিবেদিত প্রাণ সাম্যবাদী মানুষ।

ইচ্ছে করলেই সে ভোগ-বিলাসী জীবনযাপন করতে পারতো। কিন্তু কম্যুনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার কারণে সে একজন সাধারণ আফ্রিকানের মতো জীবনযাপন করতো। এমন মানুষকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায়?

১০

আলেকজান্দ্রার জীবন একদিকে যেমন ছিল উল্লাসমুখর অন্যদিকে ছিল সাংঘাতিক বিপজ্জনক। এখানকার পরিবেশে এক ধরণের প্রাণ ছিল। জীবন ছিল গতিময়। অনেক ধনী লোকের পাশাপাশি অসংখ্য নিঃস্ব রিক্ত মানুষের বাস ছিল এখানে। যদিও কয়েকটা হ্যান্ডসাম বহুতল ভবন থাকার সুবাদে এ শহর গর্ব করতে পারতো। তারপরও এটাকে বস্তির শহর বললে খুব একটা অন্যায় হবে না। এখানকার ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট দেখেই বোঝা যেত কর্তৃপক্ষ এলাকাটাকে কী পরিমাণ অবহেলা করত। সংকীর্ণ নোংরা রাস্তা জুড়ে অর্ধ উলঙ্গ ক্ষুধাতুর কঙ্কালসার শিশুরা গিজ গিজ করতো। মিল ফ্যাক্টরির চিমনি দিয়ে কয়লা পোড়া ধোঁয়া বদ্ধ বাতাসকে আরো ভারী করে তুলতো। কয়েকটা বাড়ির পানির চাহিদা মেটাতে কর্তৃপক্ষ মাত্র একটা করে পানির ট্যাপের ব্যবস্থা রেখেছিল। পানির অভাবে লোকজন রাস্তার পাশের নালায় জমে থাকা মজার লাভা মেশানো বিষাক্ত পানি তুলে তাই ব্যবহার করতে বাধ্য হত। আলেকজান্দ্রার কোথাও বিদ্যুৎ ছিল না। এ কারণে লোকজন তখন এ শহরকে 'ডার্ক সিটি' নামে ডাকতো। রাতে বাসায় ফেরার সময় গা ছমছম করতো। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আসার সময় শোনা যেত ছিন্নমূল মানুষের বিভৎস সম্মিলিত হাসির শব্দ। মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ। ট্রান্সকেইতে যে অন্ধকার ছিল তার সংগে এখানকার অন্ধকারের এক রহস্যময় পার্থক্য ছিল সুস্পস্ট।

আলেকজান্দ্রার এই পৌরপল্লীর ঘিঞ্জি বসতিতে ঠিক কত লোকের বাস ছিল তা জানা নেই। তবে এটুকু বলতে পারি সেখানকার প্রত্যেক বর্গফুট জায়গা হয় রিয়েল এস্টেটের নয়তো টিনের চাল দিয়ে বস্তি উঠানো লোকদের অধীনে ছিল।

একেবারেই গরীব মহল্লাগুলোতে প্রত্যেকটি রাত ছিল আতঙ্কে মোড়া। সেখানকার জীবন ছিল দারিদ্র্যে ঢাকা এক দুঃসহ সময়ের চাদরে ঢাকা। রাতে সেখানকার পথ ঘাট শাসন করতো ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের বন্দুকের নল অথবা ছুরির ফলা। কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের সেখানে 'তোৎলা' বলা হতো। খাপে পোরা ভোজালি অথবা সুইচব্লেড হাতে নির্ভয়ে ঘুরতো তারা। আমেরিকান মুভিস্টারদের অনুকরণে তারাও ডাবলব্রেস্টেড স্যুট এবং রঙিন চ্যাপ্টা টাই পরতো। পুলিশি তল্লাশি ছিল আলেকজান্দ্রার নৈমিত্তিক চিত্র। অনুমতিপত্র না থাকা, মেয়াদোত্তীর্ণ অনুমতিপত্র সংগে রাখা, মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা, পোল ট্যাক্স না দেওয়া– এরকম বহু অসংখ্য অভিযোগ এনে পুলিশ নিয়মিত গণগ্রেফতার করতো। মহল্লার মোড়ে মোড়ে ভাসমান শুঁড়িখানা ছিল। ঘরে তৈরি বিয়ার অথবা নিম্নমানের মদ বিক্রি হতো সেখানে।

এতসব নারকীয় বিষয় থাকার পরও আলেকজান্দ্রার পৌর এলাকাটি আমার কাছে একদিক থেকে ছিল স্বর্গ। স্বর্গ বলছি এ কারণে, যে এখানে স্থানীয় আফ্রিকানদের উড়ে এসে জুড়ে বসা শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার সহ্য করতে হতো না। এখানে তারা নিজেরাই নিজেদের ভালো মন্দের দেখাশুনা করতো। আলেকজান্দ্রা অনুমোদিত স্বতন্ত্র পৌরসভা হওয়ার ফলে শ্বেতাঙ্গপ্রধান মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তারা এখানকার বিষয়ে নাক গলাতে পারতো না। আলেকজান্দ্রা ওই সমস্ত আফ্রিকান পৌরসভার মডেল হয়ে উঠেছিল যেখানে গ্রাম্য আফ্রিকানরা নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী শহুরে জীবন উপভোগের সুযোগ পেত।

সরকার সব সময়ই আফ্রিকানদের শহর থেকে দূরে একেবারে অজো পাড়াগাঁয়ে রাখার চেষ্টা করতো। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের শহর থেকে বহু দূরে বিভিন্ন খনিতে কাজের ব্যবস্থা করা হতো। আফ্রিকানদের বোঝাতে চাইতো যে তারা জন্মগতভাবেই গ্রামের জীবনাচরণে অভ্যস্ত; নাগরিক জীবন তাদের জন্য নয়। দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও আলেকজান্দ্রা সরকারের এই মনোভাব ভুল প্রমাণ করতে পেরেছিল। এখানে আফ্রিকানরা নিজের অর্থে জমি কিনে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলে দেখিয়ে দিয়েছিল যে তারাও শহরে বাস করার যোগ্যতা রাখে। আফ্রিকার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা বিভিন্ন ভাষাভাষী এই সব গ্রাম্য মানুষগুলো শহুরে জীবনের সংগে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল; একই সংগে তারা হয়ে উঠেছিল যথেষ্ট রাজনীতি সচেতন। উপজাতিয় ও আদিবাসী কৃষ্টি কালচারের গোঁড়ামি ভুলে ঝোসা, সোথো, জুলু, সংগান– এরকম সব সম্প্রদায়ের মানুষ আলেকজান্দ্রান হয়ে উঠেছিল। এক ধরণের সংহতি চেতনার সম্মিলন ঘটেছিল এখানে। স্বভাবত সে কারণেই সাদা শাসকদের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল আলেকজান্দ্রা। সরকার সব সময় এমনভাবে সেখানে শাসন চালাতে চাইল যাতে এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়; তারা যাতে সংগঠিত হতে না পারে। কিন্তু সরকারের সে অপচেষ্টা এখানে সফল হয়নি। এক প্রবল আফ্রিকান জাতীয়তাবোধ এখানকার মানুষকে দৃঢ় ও সংহত করে রেখেছিল।

আমার মনের মণিকোঠায় এক বিরাট জায়গা দখল করে আছে আলেকজান্দ্রা। বাড়ি ছেড়ে এখানেই প্রথমবারের মতো আমি সম্পূর্ণ একাকীত্বের জীবন শুরু করেছিলাম। আলেকজান্দ্রার পর আমি সোয়েটোর একটা ক্ষুদ্র এলাকা অরল্যান্ডোতে বহুদিন কাটিয়েছি। আলেকজান্দ্রায় যতদিন ছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি দিন কেটেছে অরল্যান্ডোতে। আলেকজান্দ্রায় আমার নিজের বলতে নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না। কিন্তু অরল্যান্ডোতে আমার নিজের টাকায় কেনা বাড়ি হয়েছিল। তারপরও আলেকজান্দ্রাকে আমার নিজের বাড়ি বলে মনে হয়েছে। আর ঘর থাকা সত্ত্বেও অরল্যান্ডোকে আমি নিজের বাড়ি বলে ভাবতে পারিনি।

কুনুতে প্রবল দারিদ্রের মধ্যে আমার শৈশব কেটেছে। কিন্তু আলেকজান্দ্রায় কাটানো প্রথম বছরে দারিদ্র্য সম্পর্কে আমার আরও অনেক বেশি অভিজ্ঞতা

হয়েছিল। ল ফার্ম থেকে আমাকে সপ্তাহে ২ পাউন্ড বেতন হিসেবে দেওয়া হত। ২ পাউন্ড থেকে ঝোমার বাসা ভাড়া দিতে হতো ১৩ শিলিং। যাতায়াতের জন্য সবচেয়ে সস্তা পরিবহন 'ন্যাটিভ' বাসে চড়তাম। এই বাসগুলো শুধুমাত্র আফ্রিকানদের জন্য ছিল। এতে মাসে লাগতো ১ পাউন্ড ১০ শিলিং। এরপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি তো রয়েছেই। খাওয়া খরচা বাদে সপ্তায় এক পাউন্ড খরচ হতো। এর মধ্য দিয়ে অপরিহার্য কিছু জিনিসও কিনতে হতো। যেমন রাতে পড়াশুনার জন্য মোমবাতি কিনতেই হতো। প্যারাফিন ল্যাম্প কেনার সামর্থ ছিল না। তাই মোমবাতির আলোতেই আমাকে পড়তে হতো।

'সংসার' চালাতে প্রতি মাসেই অর্থ সংকটে পড়তে হতো। এমন অনেক দিন গেছে, বাসে চড়ার পয়সা না থাকায় আমাকে ৬ মাইল হেঁটে শহরে গিয়ে কাজ সেরে আবার ৬ মাইল হেঁটে বাসায় ফিরতে হয়েছে। বহুবার আমাকে খালি পেটে না বদলানো জামা কাপড় পরে কাজে যেতে হয়েছে। মিস্টার সাইডলস্কি আমাকে তার ব্যবহার করা একটা পুরনো স্যুট দিয়েছিলেন। দু'এক জায়গায় ছেড়া ছিল। রিপু করে সেই পুরনো স্যুট আমি একটানা পাঁচ বছর পরেছিলাম। যখন সেটাকে আর স্যুট বলে চেনা যাচ্ছিল না তখন সেটা ফেলে দিতে বাধ্য হলাম।

একদিন সন্ধ্যায় অফিস শেষ করে বাসে চড়ে আলেকজান্দ্রায় ফিরছি। পাশে বসেছিল আমারই বয়সের একটা ছেলে। আমেরিকান মুভির গ্যাংস্টারদের অনুকরণে তখন তরুণদের মধ্যে যে স্টাইলের পোশাকের প্রচলন শুরু হয়েছিল তেমনই একটা ড্রেস পরেছিল ছেলেটা। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার অতি পুরনো স্যুটটার সংগে তার সেই হালফ্যাশনের জ্যাকেটে ঘষা লাগছিল। ব্যাপারটা সেও লক্ষ্য করছিল এবং আমার স্যুটের ঘষা লেগে তার জ্যাকেটের যাতে জাত না যায় সেজন্য যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখছিল সে। সেই অস্বস্তি কর মুহূর্ত এখনও আমাকে বিদ্ধ করে।

দারিদ্র্যের স্বপক্ষে বলার মতো তেমন কিছু নেই। কিন্তু একথা সত্যি যে সত্যিকার বন্ধুত্ব আবিস্কারের জন্য দারিদ্র্যের মতো এত মোক্ষম কষ্টিপাথর আর দ্বিতীয়টি নেই। অঢেল টাকা পয়সা থাকলে বহু লোক আপনার সংগে বন্ধুত্ব করার জন্য ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে; কিন্তু না থাকলে তাদের দু'একজন ছাড়া বেশিরভাগেরই টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাবে না। বিত্ত বৈভব মানুষকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে আর দারিদ্র্য মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। তবে দারিদ্র্য মানুষের ভেতরের আসল চেহারা বের করে আনে। একদিন ভোরে বাস ভাড়া বাঁচানোর জন্য শহরের উদ্দেশ্যে হাঁটছিলাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম সামনে আমার এক মহিলা সহকর্মী। তার নাম ফিলিপস মাসেকো। ছেড়া ময়লা জামাকাপড়ে এ মুহূর্তে তার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হল না। আমি নিজেকে আড়াল করার জন্য রাস্তা পার হয়ে অন্য পাশে এসে হাঁটা ধরলাম। ভেবেছিলাম সে আমাকে চিনতে পারবে না। হঠাৎ শুনলাম, 'নেলসন! নেলসন!' বলে মাসেকো আমাকে ডাকছে। ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর রাস্তা পার হয়ে এমনভাবে তার সংগে দেখা করলাম যেন সে ডাকার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাকে খেয়াল করিনি।

দু'জনে আলাপ করতে করতে হাঁটছিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর সে বললো, 'নেলসন, আমার বাসার নম্বর ২৩৪, পূর্ব অরল্যান্ডো। তুমি যাওয়া আসার পথে আমার ওখান থেকে বেড়িয়ে যেও।' তার ওখানে গিয়ে নিজেকে ছোট করার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু একদিন ফেরার পথে খিদেয় আর পারছিলাম না। লাজ লজ্জা ফেলে মাসেকোর বাসায় ঢু মারলাম। মাসেকো আমার দারিদ্র্য নিয়ে কৌতুহল, সহানুভূতির মতো বিব্রতকর কোন অভিব্যক্তিই প্রকাশ করল না। আপন স্বজনের মতো আমাকে অনেক যত্ন করে পেট পুরে খাওয়ালো। এরপর প্রায়ই আমি তার বাসায় 'খেতে' যেতাম।

আমার বাড়িওয়ালা মিস্টার ঝোমা নিজে তেমন একটা স্বচ্ছল ছিলেন না; কিন্তু যথেষ্ট মানবতাবাদী লোক ছিলেন তিনি। প্রত্যেক রোববার আমি বাসায় থাকতাম। ঝোমার স্ত্রী ওই দিন আমাকে দুপুরবেলা খাওয়াতেন। বেশিরভাগ সময়ে দিতেন ধোঁয়া উড়তে থাকা প্লেটভর্তি গরম শুকরের মাংসের কাবাব; সংগে সব্জী। সপ্তাহে ওই একবারই আমার কপালে গরম খাবার জুটতো। আমি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকতাম না কেন গরম শুকরের মাংসের লোভে রোববার দুপুরে ঠিকই মিস্টার ঝোমার বাসায় চলে আসতাম। সপ্তাহের বাকি দিনগুলো কাটতো শুকনো রুটি খেয়ে। কখনও কখনও ফার্মের অন্য সেক্রেটারিরা কিছু না কিছু খাওয়াতো।

শহুরে জীবন থেকে দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম্যসমাজ থেকে এই বিরাট শহরে এসে আমাকে বিভিন্ন সময় নানা ধরণের বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে এমন অনেক ঘটনা আছে যা মনে পড়লে আমি এখনও হেসে ফেলি। একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। আমি তখন মিস্টার ঝোমার বাড়িতে উঠেছি। একদিন জোহান্সবার্গ থেকে অফিস শেষ করে বাসায় ফিরছি। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। পকেটে কয়েকদিনের বাসভাড়া বাঁচানো বেশ কিছু পয়সা ছিল। বেশ কিছুদিন মাংস খাওয়া হচ্ছিল না বলে মাংস খেতে মন চাইল। ভাবলাম সামনের যে কোন কসাই'র দোকান থেকে মাংস কিনে বাসায় গিয়ে রান্না করে খাবো। কিন্তু আশেপাশে কোথাও কোন মাংসের দোকান খুঁজে পেলাম না। শেষে বাধ্য হয়ে একটা অভিজাত সুপার শপে ঢুকলাম। জোহান্সবার্গ আসার পর ইতিপূর্বে আমি এ ধরণের শপিং মলে আগে কোনদিন ঢুকিনি। সেখানে গিয়ে দেখলাম কাঁচের বাক্সে তাজা মাংসের বড় বড় খন্ড সাজানো রয়েছে। আমি সেলস্‌ম্যানকে একটি খন্ড প্যাক্ করে দিতে বললাম। সে প্যাকেট করে দিল। আমি প্যাকেটটি বগলদাবা করে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রাতে একটা জম্পেশ ডিনার হবে ভাবতে খুব ভাল লাগছিল।

আলেকজান্দ্রায় নিজের রুমে ফিরে আমি বাড়িওয়ালার ছোট মেয়েকে ডাকলাম। মাত্র ৭ বছর বয়সী হলেও মেয়েটা যথেষ্ট বুদ্ধিমতি ছিল। তাকে বললাম, 'খুকি, তুমি কি আমার এই মাংসটুকু নিয়ে তোমার বড় বোনকে রান্না করে দিতে বলবে? আমার খুব খিদে লেগেছে।' দেখলাম মেয়েটা আমার দিকে চেয়ে হাসি

চাপার চেষ্টা করছে। হেসে ফেললে আমি কিছু মনে করতে পারি বা তাকে অভদ্র ভাবতে পারি সম্ভবত সে কারণে সে হাসতে পারছিল না। বুঝতে পারছিলাম কোথাও কোন গড়বড় হয়েছে। কিছুটা বিরক্ত হয়ে তাকে বললাম, 'হাসছ কেন?' মেয়েটা খুব মিষ্টি করে বলল, 'এ মাংস তো রান্না করাই আছে।' আমি বললাম, 'সেটা কী রকম?' তখন সে বললো, 'এটা হল স্মোকড্ হ্যাম' (বাষ্পের মাধ্যমে সিদ্ধ করা শুকরের মাংস)। এটা আপনি যখন কিনেছেন তখনই খেতে পারতেন, এখনও পারেন।' তার কথায় আমি থতমত খেয়ে গেলাম। এ জিনিস ছিল আমার কাছে একেবারেই নতুন। কিন্তু সহজভাবে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার না করে আমি গম্ভীরভাবে তাকে বললাম, 'সেতো আমি জানিই। তোমাকে শুধু একটু গরম করে আনতে বলেছি।' বুঝলাম মেয়েটা আমার কথা বিশ্বাস করেনি। তারপরও ভদ্রতার খাতিরে মাংস খন্ড নিয়ে গরম করে আনতে চলে গেল। বলা দরকার, মাংসটা খুবই সুস্বাদু ছিল।

হিল্ডটাউনে থাকাকালীন ইলেন এনকাবিনদে নামে একটা মেয়েকে চিনতাম। আলেকজান্দ্রায় এসে সদা প্রাণবন্ত ও হাসিখুশি ওই মেয়েটার সংগে আমার দেখা হল। এখানকার একটা স্কুলে পড়াতো সে। পূর্ব পরিচয় থাকার কারণে আমাদের মধ্যে দ্রুত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। সত্যি বলতে কি আমরা একে অপরের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। হিল্ডটাউনে থাকতে তার সংগে দু'একবার কথা হয়েছিল মাত্র। সেই চেনাজানা ভালোবাসায় রূপ নিয়েছিল।

আলেকজান্দ্রায় থাকাকালীন আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ ছিল খুবই কম। চারপাশে সব সময় লোকজনের ভীড় থাকতো। একান্তে কথা বলার জায়গা ছিল না। মাথার ওপর সূর্য অথবা তারা নিয়ে খোলা জায়গাতেই দেখা করতে হতো। কোন ঘরের ছাদের তলায় একটু একান্ত হবার 'জো' ছিল না। বাধ্য হয়েই ইলেন আর আমি শহরের বাইরে পাহাড়ের কাছে ঘুরতে যেতাম। দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটতাম। টুকটাক কথা হতো। আমাদের সেই ভালোবাসায় কোন উদ্দামতা ছিল না।

ইলেনের গোত্রের নাম সোয়াজি। শহুরে এলাকায় জাত-বেজাত বিচারের বিষয়টি অনেকটাই ম্লান হয়ে এসেছিল। কে কোন গোত্রের তা নিয়ে এখানকার লোক খুব একটা মাথা ঘামাতো না। কিন্তু উপজাতিয় অনুশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এ সম্পর্ক মেনে নিতে পারলো না। সে আমাকে মেয়েটার সংগে কোন রকম সম্পর্কে জড়াতে নিষেধ করলো। আমি আমার স্বভাবজাত কারণেই তার কথায় পাত্তা দিলাম না। আমি জাতে ঝোসা আর ইলেন সোয়াজিয়ান। এই গোষ্ঠীগত অমিল বেশ কিছু ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। পৌরমন্ত্রী মাবুযোর, স্ত্রী মিসেস মাবুযো ইলেনকে সহ্য করতে পারতেন না। এর একমাত্র কারণ ছিল ইলেন অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণ সোয়াজি গোত্রের মেয়ে। একদিন আমি মাবুযো

পরিবারের সংগে তাদের বাড়িতে বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ বাইরে থেকে দরজায় কেউ কড়া নাড়লো। আসলে যে কড়া নাড়ছিল সে ছিল ইলেন। আমাকে খুঁজতেই সে এ বাড়িতে এসেছিল। মিসেস মাবুযো তাকে দেখেই বিরক্ত হয়ে বললো, 'নেলসন এখানে আসেনি।' বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বললেন, 'ওহ নেলসন, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, একটা মেয়ে তোমাকে খুঁজতে এসেছিল। মেয়েটা কি শাগান?' শাগান সম্প্রদায় এখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত বংশ বলে স্বীকৃত হলেও তখনকার দিনে এদের খাটো চোখে দেখা হতো। এ গোষ্ঠীর লোকেরা পরনিন্দা-পরচর্চা করতো বলে জনমনে তাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছিল। মিসেস মাবুযোর কথায় আমি বিরক্ত হলাম। তাকে 'ওর নাম ইলেন, সে মোটেও শাগান না। ও একজন সোয়াজি। মিসেস মাবুযো আমাকে বোঝালেন, ঝোসা ছাড়া অন্য কোন গোত্রের মেয়েদের সংগে আমার মেলামেশা করাটা ভালো দেখায় না।

কিন্তু আমি কারও কথাই কানে তুললাম না। আমি ইলেনকে ভালোবাসতাম। শ্রদ্ধা করতাম। সে ঝোসা কন্যা ছিল না বলে আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা কাজ করেনি। বরং সমাজের বর্ণবাদী প্রথার বিপক্ষে অবস্থান নিতে পেরে আমি গর্ববোধ করতাম। আলেকজান্দ্রায় আমার এতিম ও অসহায় দুঃসহ জীবনে ইলেন শুধু একজন বন্ধুই ছিল না। একজন মা অথবা অভিভাবক যেভাবে সাহস আর স্বান্ত্বনা দেয় সেভাবে ইলেন আমাকে সাহস যুগিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েক মাস বাদেই সে আলেকজান্দ্রা ছেড়ে চলে যায়। আমরা একজন আরেকজনকে হারিয়ে ফেলি।

আমি যে ঝোমা পরিবারে ভাড়া থাকতাম, সেই গৃহকর্তা মিস্টার ঝোমার পাঁচ মেয়ে ছিল। এদের সবাই মোটামুটি সুন্দর ছিল। তবে বোনদের মধ্যে সবচেয়ে যে সুন্দরী ছিল তার নাম দিদি। দিদি আমার সমবয়সী ছিল। মাসের বেশিরভাগ সপ্তাহই সে জোহান্সবার্গের শহরতলীতে শ্বেতাঙ্গদের বাসা বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতো। ঝোমা পরিবারে আসার পর প্রথম বেশ কয়েকদিন তার দেখাই পেতাম না। কিন্তু কিছুদিন পর তাকে যখন একদিন খুব কাছ থেকে দেখলাম, তাকে ভালো লাগল। প্রেমেও পড়ে গেলাম। কিন্তু দিদি আমাকে পাত্তা দিতে চাইতো না। কয়েকদিনের মধ্যেই সে যখন বুঝতে পারলো একটামাত্র ছেড়া স্যুট আর জামা ছাড়া আমার কিছু নেই তখন সে আমার দিকে তাকানো পর্যন্ত বাদ দিয়ে দিল।

প্রত্যেক সপ্তাহান্তে দিদি আলেকজান্দ্রায় তার বাবার বাসায় ফিরে আসতো। এক সুদর্শন যুবক তাকে পৌছে দিতে আসতো। ছেলেটা সম্ভবত তার বয়ফ্রেন্ড ছিল। বেশ-ভূষা দেখে তাকে স্পষ্টতই ধনী পরিবারের ছেলে মনে হত। নিজের গাড়ি ছিল তার। সেই আমলে এটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। ডাবল ব্রেস্টেড স্যুট আর চওড়া বারান্দাওয়ালা হ্যাট পরত সে। এ বাড়িতে আসার সময় সংগে অনেক খাবার-দাবার নিয়ে আসতো। নিশ্চিত না হলেও আমার জোরালো ধারণা ছিল সে নিশ্চয়ই কোন গ্যাংস্টার হবে। উঠোনের এক কোনায় ওয়েস্ট কোটের

পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে ফিটবাবুর মতো দাঁড়াতো সে। খুব নম্রভাবেই সে আমার সংগে সৌজন্য বিনিময় করতো। কিন্তু আমাকে যে সে তার সমকক্ষ মনে করতো না তা তার বিভিন্ন অভিব্যক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিত।

আমি তোমাকে ভালোবাসি– দিদিকে এই কথাটা বলার জন্য আমার মন ছটফট করতো। পাছে আমার প্রেমপ্রস্তাবে সে রেগে যেতে পারে– এ আশংকায় আমি তা বলতে পারছিলাম না। আমি ডন জুয়ানের মতো সাহসী ছিলাম না। মেয়েদের সাহচর্যে আমি সব সময়ই কাচুমাচু হয়ে যেতাম। এক কিসিমের ছেলেরা আছে যারা মেয়ে পটাতে দারুণ ওস্তাদ। মেয়েদের তাদের প্রতি দুর্বল করে ফেলতে বেশি বেগ পেতে হয় না। কিন্তু আমার মধ্যে ওই পাওয়ারটি একেবারেই ছিল না।

সাপ্তাহিক ছুটির দিন আমি বাড়িতেই থাকতাম। দিদির মা তাকে দিয়ে আমার ঘরে খাবারের প্লেট পাঠাতেন। দিদি মায়ের কথা শুনতে হবে তাই বাধ্য হয়েই খাবারের প্লেট নিয়ে আমার ঘরে আসতো। তবে সে ঘরের ভেতরে ঢুকতো না। দরজায় দাঁড়িয়ে প্লেটটা বাড়িয়ে ধরতো। সেটা দিয়েই চলে যেতে চাইতো। আমি তাকে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করার অজুহাতে কিছুক্ষণ আটকে রাখতে চাইতাম। আর সে দ্রুত আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে সটকে পড়তে চাইতো। তাকে আমি কী বলবো খুঁজে পেতাম না। শেষে পড়ালেখার মতো অতি সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করতাম। প্রথম দিনের আলাপেই জেনেছিলাম সে স্ট্যান্ডার্ড ফাইভ পর্যন্ত পড়ালেখা করে ছেড়ে দিয়েছে। ওই বিষয় নিয়ে প্রায় প্রত্যেকবারই তার সংগে কথা বলতাম। গৎ বাঁধা সুরে বলতাম, 'তোমার পড়াশুনা ছাড়া ঠিক হয় নি। তোমার আবার শুরু করা উচিত। তুমি দেখতে সুন্দরী। কিন্তু নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আবার পড়াশুনা করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ভালো করেই জানি যে কোন মেয়ে প্রত্যেকবার এসব জ্ঞানী জ্ঞানী কথা শুনতে পছন্দ করবে না। এর মধ্যে রোমান্টিকতার কোন ছোঁয়া নেই। কিন্তু এ ছাড়া তার সাথে অন্য কী নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে তা আমার মাথায়ই আসতো না। সে শান্তভাবে আমার কথার জবাব দিতো। তারপর নিরুত্তাপ একটা মনোভঙ্গি নিয়ে চলে যেতো। বুঝতাম এসব কথা তার ভালো লাগতো না। তবে এটাও বুঝতাম সে ক্রমান্বয়ে আমাকে কিছুটা 'উন্নত শ্রেণীর জীব' বলে ভাবতে শুরু করেছিল।

আগেই বলেছি আমি তাকে প্রেম প্রস্তাব দিতে চাইতাম। কিন্তু সে যদি রাজি না হয় সে ভয়ে বলতে পারতাম না। আমি তার প্রেমে পড়েছিলাম এটা সত্য। কিন্তু আমাকে প্রত্যাখ্যান করে আত্মতৃপ্তি উপভোগের সুযোগ কিছুতেই আমি তাকে দিতে চাইনি। ভেতরে ভেতরে তাকে আমার করে পাওয়ার একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম; কিন্তু ভয়ে মুখ খুলতে পারছিলাম না। রাজনীতিতে বুঝে শুনে পা ফেলাটাকে বড় যোগ্যতা হিসেবে ধরা হয়; কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে হিসাব-নিকাশের কোন দাম নেই। আমি না পারছিলাম আমার ভালোবাসার কথা তাকে মুখ ফুটে বলতে, না পারছিলাম মাথা থেকে পুরো ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলতে।

আমি তাদের বাড়িতে ছিলাম বছরখানেক সময়। এর ভেতরে বহু চেষ্টা করেও আমি তাকে আমার কথা বলতে পারিনি। এর মধ্যে দিদি তার বন্ধুর প্রতি কম অথবা আমার প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে বলে মনে হয়নি। তাদের বাড়ি ছেড়ে আসার সময় অকৃত্রিম আতিথেয়তার জন্য তাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে এলাম। দিদির কাছ থেকেও আনুষ্ঠানিক বিদায় নিয়ে আসলাম। এরপর বহুদিন তাদের সংগে আমার দেখা হয়নি। বছর কয়েক পরে, আমি যখন জোহান্সবার্গ আদালতে আইন প্র্যাকটিস করি সেই সময় একদিন আমার অফিসে দুজন মহিলা এলেন। এদের একজন তরুণী আরেকজন হলেন ওই তরুণীর মা। তরুণী মহিলার কোলে একটা ফুটফুটে বাচ্চা। আমি তাদের দেখে চমকে উঠলাম। সন্তান কোলে ওই তরুণী ছিল দিদি। বিয়ের আগেই বয়ফ্রেন্ডের সংগে তার শারীরীক সম্পর্ক হয়। তার ঔরসে দিদির গর্ভে এই সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু দিদি গর্ভবতী হওয়ার পর সেই হ্যান্ডসাম বয়ফ্রেন্ড তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। তারা আমার কাছে এসেছে তার বিরুদ্ধে মামলা করার উদ্দেশ্যে। নাটকীয় ব্যাপার হলো দিদি বা তার মা জানতেন না যে তারা যে উকিলের কাছে এসেছেন সেই উকিল হচ্ছি আমি। তাদের এক সময়ের হাড়হাভাতে ভাড়াটিয়া।

দেখলাম দিদির চেহারায় এক ভয়াবহ বিষণ্নতা। একটা বিবর্ণ ড্রেস পরা অবস্থায় হাসিখুশি আর ফ্যাশন সচেতন মেয়েটাকে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এক পর্যায়ে সে আমাকে বললো, আমি যে তাকে ভালোবাসতাম তা সে জানতো; কিন্তু ধনী ওই ছেলেটার মোহে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই নিয়তি তাকে এক নির্মম শিক্ষা দিয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে আলাপের পর দিদি বললো সে তার সন্তানের পিতার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্যই এসেছিল কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজন নেই। সে জানালো, তার বিরুদ্ধে সে আর কোন অভিযোগ করতে চায় না। একথা বলে দিদি আমার অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাকি জীবনে তার সংগে আমার আর কোনদিন দেখা হয়নি।

আমার ভেতরে রোমান্টিকতার ঘাটতি থাকলেও আস্তে আস্তে আমি শহুরে জীবনের সংগে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। আমার ভেতরে আত্মবিশ্বাস বাড়ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম জোহান্সবার্গের এই নাগরিক জীবনে আমাকে বড় হতেই হবে; এবং আমি সেটা করতে পারবো। ধীরে ধীরে আবিষ্কার করলাম সামনে এগিয়ে চলার জন্য এখন আর আমার রাজবাড়ির (আমার পালক পিতার পরিবার) ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। তাদের পরিচয় ভাঙিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে হচ্ছে না। আমি দেখলাম এমন অসংখ্য নতুন মানুষের সংগে আমার জানা শোনা হয়েছে যাদের সংগে থেম্বু রাজবাড়ির কোন সম্পর্ক নেই। আমি ভাবছিলাম, আমি যত ছোট এবং নোংরা সস্তা ঘরেই থাকিনা কেন, সেটা আমার নিজের ঘর। দ্বিতীয় কেউ এসে আমার ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করতে পারছে না। বুঝলাম আমার মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো প্রত্যয় জন্ম নিচ্ছে।

১৯৪১ সালের শেষ দিকে খবর পেলাম আমার পালক পিতা জোহান্সবার্গ এসেছেন এবং তিনি আমার সংগে দেখা করতে চান। এ খবর পেয়ে কিছুটা নার্ভাস হয়েছিলাম ঠিকই তবু দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। জোহান্সবার্গে উইটওয়াটারস্র্যান্ড ন্যাটিভ লেবার এসোসিয়েশন (ডব্লিউএনএলএ) নামে একটা রিক্রুটিং এজেন্সি ছিল। এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা খনি শ্রমিকদের নিয়োগ করা হতো। খবর পেলাম আমার পিতা ডব্লিউএনএলএ কম্পাউন্ডে উঠেছেন। সেখানেই আছেন।

বহুদিন পর পিতার সামনে দাঁড়ালাম। দেখলাম তিনি একেবারে বদলে গেছেন। অথবা হয়তো আমিও ততদিনে অনেকখানি ভিন্ন মানুষ হয়ে উঠেছি। যতক্ষণ আলাপ হলো ততক্ষণের মধ্যে একবারও তিনি কেন বাড়ি পালালাম, কেন ফোর্ট হেয়ার ছাড়লাম, কেন বিয়ে করতে রাজি হলাম না– এর কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। তিনি খুব আন্তরিকভাবে এখানে কেমন আছি, পড়াশুনার কী খবর ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী এসব জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমার প্রতি তার কোন রাগ নেই। আমি যেন পড়াশুনা শেষ করে বড় হতে পারি তিনি সেই প্রার্থনা করলেন।

তার সংগে দেখা হওয়ায় আমার দুই দিক থেকে লাভ হয়েছিল। প্রথমত আমি বিবেকতাড়না থেকে মুক্ত হতে পারলাম; দ্বিতীয়ত পালক পিতার ও থেম্বু রয়্যাল হাউসের প্রতি আমার যে বিরুপ মনোভাব ছিল তা কেটে গেল। আমি আবার তাকে আগের মতো শ্রদ্ধার জায়গায় বসাতে পারলাম। পিতার উষ্ণ আলিঙ্গনে বন্দী হবার আরেকটি সুযোগ পাওয়া গেল।

আমার খোঁজ খবর নেওয়ার পর তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও জাস্টিসের প্রতি রেগে কাঁই হয়েছিলেন। তিনি বললেন, জাস্টিসকে অবশ্যই এমখেকেজওয়েনিতে ফিরে যেতে হবে। এখানে আসার পর একটি মেয়ের সাথে জাস্টিসের সম্পর্ক হয়। জাস্টিস তার বাবাকে জানিয়ে দেয় এমখেকেজওয়েনিতে ফিরে যাওয়ার কোন ইচ্ছেই তার নেই। এই নিয়ে জাস্টিসের সংগে তার বাবার তীব্র ঝগড়া হয়ে গেল। তিনি চলে যাওয়ার পর তার প্রধান সহকারীদের একজন বাঞ্জিনদাও জাস্টিসের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিলেন। তিনি আদালতের কাছে জাস্টিসকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে রায় দেওয়ার আর্জি করেন। এ অবস্থায় আমি জাস্টিসকে আইনগত সহায়তা দিতে রাজি হই। ন্যাটিভ কমিশনার জাস্টিসকে তলব করে। শুনানি শুরু হলে আমি কমিশনারের সামনে এই যুক্তি তুলে ধরি যে জাস্টিস এখন সম্পূর্ণ সাবালক। শুধুমাত্র তার বাবা তাকে নির্দেশ দিয়েছেন বলেই তাকে এমখেকেজওয়েনিতে ফিরতে হবে আইন তা বলে না। যখন

বাঞ্জিনদাও কথা বলতে উঠলেন, তিনি আমার যুক্তি খণ্ডন না করে রাজার প্রতি আমার আনুগত্য বোধ নিয়ে কথা বলা শুরু করলেন। তিনি আমাকে মাদিবা (আমার গোত্রীয় নাম) বলে ডাকতেন। তিনি বললেন, 'মাদিবা' রাজা তোমাকে পিতৃস্নেহে পালন করেছেন, পড়ালেখা শিখিয়েছেন, তোমাকে পিতার অভাব বুঝতে দেননি। এখন তার আসল উত্তরাধীকারীকে তুমিই তার কাছ থেকে দূরে রাখার বদ মতলব এঁটেছো। এটা তার সংগে তোমার বেয়াদবি ও প্রতারণারই বহিঃপ্রকাশ। তার প্রতি তোমার যদি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে তাহলে তার সন্তানকে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অসহযোগিতা নয়, সহযোগিতা করো।'

বাঞ্জিনদাওর কথা আমাকে ভীষণভাবে বিদ্ধ করলো। আমিও ভেবে দেখলাম আমার ও জাস্টিসের গন্তব্য এক নয়। সে রাজার ছেলে। পিতার অবর্তমানে তাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। শুনানি শেষে আমি জাস্টিসকে বললাম, 'ভাই, আমি তোমার ব্যাপারে আমার মত বদলেছি। আমার মনে হচ্ছে তোমার ফিরে যাওয়া উচিত।' সে আমার কথা শুনে রেগে গেল। আমার কোন কথা শুনতে চাইলো না। সে এখানেই থেকে যাওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিল। সে তার বান্ধবীকে আমার মত বদলানোর কথা জানাতে বান্ধবীও আমার ওপর রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল। ওর পর থেকে মেয়েটা আমার সংগে আর কোনদিন কথা বলেনি।

১৯৪২ সালের শুরুতে বাড়িভাড়া বাঁচাতে এবং জোহান্সবার্গের কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি আসার জন্য আমি ঝোমা পরিবারের বাসাটা ছেড়ে দেই। সেখান থেকে ডব্লিউএনএলএ কম্পাউন্ডে এসে উঠি। খনি চেম্বারের ইন্দুয়ানা মিস্টার ফেস্টাইলের সাহায্য নিয়েই এবার এ কম্পাউন্ডে আসি। ইনি হলেন সেই ভদ্রলোক যিনি আগে আমাকে এখান থেকে বের করে দিয়েছিলেন। পিতা এখান থেকে ঘুরে যাওয়ার পর ফেস্টাইল নিজ দায়িত্বে এখানে বিনা ভাড়ায় থাকার বন্দোবস্ত করে দেন।

ডব্লিউএনএলএ কম্পাউন্ডে হরেক শ্রেণী ও জাতের মানুষ বাস করতো। দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক জীবনের একটা বিশেষ দিকই ছিল এখানকার নানাবর্ণের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

এখানে সোথো, টেসওয়ানা, ভেন্দাস, জুলু পেডিস, শাংগান, নামিবিয়ান, মোজাম্বিকান, সোয়াজি ও আমার মতো ঝোসারা একসাথে থাকতো। এদের মধ্যে দু'চারজন ইংরেজী বলতে পারতো। সবার জন্য মোটামুটি বোধগম্য ভাষা ছিল ফানাগালো।

সেখানে শুধু যে জাতীগত দ্বন্দ্বমুক্ত পরিবেশ ছিল তাই নয়, বিভিন্ন পেশাগত ব্যাক গ্রাউন্ডের মানুষ সেখানে স্বচ্ছন্দে এক ছাদের তলায় কাজ করতে পারতো। এ

কম্পাউন্ডে যারা থাকতো আমি বাদে অন্যদের প্রায় সবাইকেই মাটির নিচে সারাটা দিন কাটিয়ে দিতে হত। আর পড়াশুনা করে অথবা ল' অফিসের ফাইলপত্র নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে আমার দিন কেটে যেতো।

বিভিন্ন গোত্রপ্রধানদের ওয়েস্টেশন ছিল ডব্লিউ এনএলএ কম্পাউন্ড। এখানে তারা আসতেন। দু'একদিন থাকতেন; কাজ কর্ম সেরে চলে যেতেন। রাজপরিবার থেকে আসার কারণে আমি এখানে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা সব গোত্ররাজের সংগে সহজেই দেখা সাক্ষাৎ করতে পারতাম। একবারের ঘটনা মনে পড়ছে। বাসুতোল্যান্ডের লেসোযো, মানতোসবো ও মোসবেশবিদের রানী একবার এখানে এলেন। তার সংগে দুজন গোত্র সর্দার ছিলেন। তাদের দুজনই যাবাতার বাবা জঞ্জিলিজবিকে চিনতেন। আমি জঞ্জিলিজবি সম্পর্কে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই তারা পুরনো দিনের গল্পের ঝাঁপি খুলে বসলেন। তারা তাদের শৈশবে ফিরে গেলেন। তাদের গল্পের সূত্র ধরে আমি যেন ফিরে গেলাম আমার ফেলে আসা থেম্বুল্যান্ডে। এক গভীর স্মৃতিমদূরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো আমাদের গল্পের আসর।

ডব্লিউএনএলএ কম্পাউন্ডে আসা বাসুতোল্যান্ডের রানীমা আমাকে বিশেষ স্নেহের নজরে দেখছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে সরাসরি কি সব প্রশ্ন করলেন। কিন্তু তিনি কথা বলছিলেন সোথোদের ভাষা সোসোযোয়। আমি ওই ভাষার দুটো একটা শব্দ ছাড়া তেমন কিছুই জানি না। অবশ্য ওই ভাষায় যে শুধু সোথোরাই কথা বলতো তা নয়; ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জফ্রি স্টেটের লোকেরাও সেসোযোতে কথা বলতো। আমি তার কথা বুঝতে পারছি না খেয়ালে আসার পর তিনি ইংরেজীতে আমাকে বললেন, 'তুমি কেমন হবু উকিল যে তার নিজের লোকের ভাষা জানে না?'

আমি তার কথার কোন জবাব দিতে পারিনি। তার একথায় আমি ভেবে দেখলাম, 'সত্যিই তো! আমি আমার লোকের পক্ষে মামলায় লড়বো; অথচ তাদের ভাষাটাও আমার ঠিক মতো জানা নেই। আমি বুঝতে পারলাম, সাদারা আমাদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে রেখেছে। আমাদের ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রলোভন দেখিয়ে নিজের ভাইবোনদের সংগে বিভাজিত করে রেখেছে। আমি বুঝতে পারলাম, নিজেদের ভাষা ঠিকমতো না জানলে নিজেরা পরস্পরকে বুঝতে পারবো না। একজন আরেকজনের আকাঙ্ক্ষাকে শেয়ার করতে পারবো না। রানীর কথায় পুনর্বার আমার এই উপলব্ধি হল যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ছিলাম না; আমাদের ভাষা ছিল ভিন্ন। আমরা ছিলাম ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অভিন্ন জাতীয় মানুষ।

আমাদের সংগে জোহান্সবার্গ এসে দেখা করে যাওয়ার ৬ মাসেরও কম সময় পরে ১৯৪২ সালের শীতকালে জাস্টিস আর আমি খবর পেলাম জাস্টিসের পিতা মারা গেছেন। শেষবার তাকে যখন দেখেছিলাম তখন তাকে খুবই অসুস্থ্য ও দুর্বল মনে হয়েছিল। হয়তো সে কারণেই তার মৃত্যুর খবর আমার কাছে খুব আশ্চর্য হওয়ার মতো কোন ঘটনা ছিল না। খবরের কাগজে প্রথম তার মৃত্যুর খবর পাই। জাস্টিসকে তার মৃত্যুর খবর জানিয়ে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা তার হাতে পৌছায়নি। আমরা খবর পড়েই ট্রান্সকেই রওনা হলাম। আমরা যেদিন রাজবাড়িতে পৌছলাম তার একদিন আগেই তার অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকতে না পেরে একদিকে আমার যেমন খারাপ লাগছিল, অন্যদিকে তার মৃত্যুর আগে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে পেরেছিলাম বলে একদিক থেকে সান্ত্বনাও পাচ্ছিলাম। কিন্তু অপরাধবোধের যন্ত্রণাদায়ক ছুরিকাঘাত থেকে আমি যে একেবারে মুক্ত হতে পেরেছিলাম তাও নয়। অবশ্য আমি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম; এমন কি বাড়ি পালানোর সময়ও আমার বিশ্বাস ছিল আমি যাই করি না কেন আমার পালক পিতা আমাকে কখনও ত্যাগ করতে পারবেন না। আমি তার সব আশা আকাঙ্ক্ষা চুরমার করে দিয়েছিলাম। এত কিছুর পরও তিনি আমাকে অস্বীকার করেন নি। আজ তার মৃত্যুতে নিজেকে বড় অসহায় ও অভিভাবকহীন মনে হচ্ছিল।

পিতার মৃত্যুতে তার এলাকার লোকজন এমন এক বিরল প্রতিভাধর ও প্রগতিশীল নেতাকে হারালো যিনি তার অসামান্য নেতৃত্বের ক্ষমতা দিয়ে পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। উদারপন্থি, রক্ষণশীল, ঐতিহ্যবাদী, সংস্কারবাদী হোয়াইট কলার অফিসার অথবা নীল কলার খনি শ্রমিক সবাই তার অনুগত ছিল। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করতো। তাকে সবাই মান্য করার কারণ এই নয় যে সব শ্রেণীর মানুষ তার সব কাজকে সমর্থন করতো। বরং মূল কারণ হলো, তিনি সব পক্ষের মতামত মন দিয়ে শুনতেন এবং সবার মতামতকে শ্রদ্ধাশীল মনোভাব নিয়ে বিবেচনা করতেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরবর্তী প্রায় সপ্তাহখানেক এমখেকেজওয়েনিতে ছিলাম। এই সময়টাতে আমি নিজেকে নতুন করে আবিস্কার করলাম। ফিরে দেখলাম এখানকার সব কিছুই আগের মতো আছে। তারপরও কোথায় যেন কী নেই। পরে বুঝলাম আসলে আমিই বদলে গেছি। বাইরের জগৎ সম্পর্কে অর্জিত সম্যক ধারণা আমার মনোজগতকে বদলে দিয়েছিল। এক সময় সরকারি চাকরি অথবা ন্যাটিভ অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের দোভাষী হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। এখন এসব আমাকে আর টানছে না।

থেম্বুল্যান্ড অথবা ট্রান্সকেইর গণ্ডিতে ভবিষ্যতকে আটকে ফেলতে মন চাইছিল না। আমি জানতে পারলাম ঝোসাদের আগের সেই প্রভাব প্রতিপত্তি আর নেই। তারা এখন জুলুদের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত। জুলু ভাষার জৌলুসে থেম্বুল্যান্ডে ঝোসারা যেন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে জোহান্সবার্গে আমার সর্বশেষ যাপিত জীবন, গাউর রাদেবের মতো আত্মবিশ্বাসী লোকজনের সংগে ওঠা বসা এবং ল' ফার্মে কাজ করার অভিজ্ঞতা– এ সবকিছু আমার জীবন সম্পর্কিত বিশ্বাসকে আমূল পাল্টে দিয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম আমি এখন আর সেই একদা এমখেকেজওয়েনিতে দৌড়ঝাপ করা গ্রাম্য জীবনে বিশ্বাসী নই। বাইরের গতিময় জীবন আমাকে টানছে। স্বীকার্য যে জোহান্সবার্গের ঝলমলে জীবন আর এখানকার গ্রামীণ পরিবেশের হাতছানি দুটোই আমার ভালো লেগেছিল।

এমখেকেজওয়েনি ছেড়ে আবার জোহান্সবার্গের দিকে যাওয়ার আগে আমার ভেতরে একটা যুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধটা হচ্ছিল আমার মাথা আর মনের মধ্যে। মন আমাকে বলছিল, 'তুমি একজন থেম্বু। এই থেম্বুল্যান্ডে তুমি জন্মেছ। এখানকার আলো বাতাসে তুমি বড় হয়েছ। এখানকার রাজকার্যে আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে; থেম্বু জাতির সেবা করার লক্ষ্যে তোমাকে স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। যে লোকটা মারা গেল তার প্রতি কি তোমার কোন ঋণ নেই? সে কি ভুলেও কোনদিন তোমাকে পরের ছেলে বলে অবজ্ঞা করেছে? তাহলে কেন তুমি স্বার্থপরের মতো আপনজনদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?' কিন্তু মাথা তার যুক্তি অগ্রাহ্য করে বললো, 'প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজস্ব পছন্দের জীবন বেছে নেওয়ার অধিকার আছে। নিজের ইচ্ছেমতো স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার আছে। তোমার কি সে অধিকার নেই?'

আমার সংগে জাস্টিসের তফাৎ ছিল। তার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। রাজার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে তাকে দায়িত্ব নিতেই হল। এ দায় এড়ানো তার পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব ছিল না। সমাজপতিরা এমখেকেজওয়েনির রাজভার একরকম জোর করে তার মাথায় চাপিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাকে সব মায়ামমতা ও বিবেক তাড়না উপেক্ষা করে জোহান্সবার্গের দিকে হাঁটা দিতে হলো। জাস্টিসের অভিষেক অনুষ্ঠানেও আমি হাজির থাকতে পারলাম না। আমার নিজের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে *'এনদুয়েলিমিলামবো এনামাগামা'* (বহু বিখ্যাত নদী আমি পার হয়ে এসেছি)। অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাচ্ছি যাকে যোজন দূরত্বের পথ পাড়ি দিতে হয় তাকে বহু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। সেখান থেকে সে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করতে পারে। জোহান্সবার্গে একা ফিরে আসার পর আমার এই উপলব্ধি হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে হিল্ডটাউনে যাওয়ার পথে এমবাশি ও গ্রেট কেউর মতো বড় বড় নদী আমাকে পার হয়ে আসতে হয়েছিল।

জোহান্সবার্গ আসতে গিয়ে অরেঞ্জ এবং ভাল' নদীও পার হয়ে এসেছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম আমার সামনে আরও বহু বহু নদী। এসব 'নদী' আমাকে পার হতেই হবে।

১৯৪২ সালের শেষ দিকে আমি বি.এ. পাশ করি। একদা যে ডিগ্রিটাকে আমি এক বিরল ও দুর্লভ সম্মান হিসেবে মনে করতাম সে সম্মান হাতে পেয়ে ততটা আপ্লুত হতে পারলাম না। কারণ ততদিনে আমার মধ্যে এই বোধ জন্ম নিয়েছে যে জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য বড় ধরণের কোন ডিগ্রি চূড়ান্ত মাপকাঠি অথবা পাসপোর্ট হতে পারে না।

ল' ফার্মে থাকাকালীন আমি গাউরের সংগে খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। সে বলতো, 'সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের শিক্ষা অর্জন করা দরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন জাতি বা গোষ্ঠীকে পাওয়া যায়নি যারা শুধুমাত্র শিক্ষার দ্বারা সার্বিক মুক্তি নিশ্চিত করতে পেরেছে।' সে বলতো, 'শিক্ষা গ্রহণ ভালো। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার জন্য আমরা যদি শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি তাহলে স্বাধীনতা পেতে আমাদের হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে। আমরা গরিব জাতি। আমাদের হাতেগোনা মাত্র কয়েকটা স্কুলে গুটিকয়েক ভালো শিক্ষক আছেন। তার মানে নিজেদের শিক্ষিত করে তোলার শক্তি আমাদের নিজেদেরই নেই।'

গাউর বিশ্বাস করতো প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার চেয়ে আফ্রিকানদের দ্রুত এগিয়ে আনতে দরকার মৌখিক শিক্ষা। অর্থাৎ মৌখিক বক্তব্য প্রচারের মাধ্যমে তাদের মধ্যে গণচেতনা জাগিয়ে তোলা সম্ভব। তার বিশ্বাস ছিল আফ্রিকায় পরিবর্তন আনতে পারে একমাত্র যে সংগঠন; সেটি হলো আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা এএনসি। এ দলের নীতিমালা অনুসরণই আফ্রিকানদের হৃতক্ষমতা পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারে। ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই সংগঠনটি সুদীর্ঘ সময় ধরে আফ্রিকানদের স্বার্থে কথা বলে আসছে। এএনসির সংবিধানে বর্ণবাদের কোন স্থান নেই। বিভিন্ন উপজাতির মধ্য থেকে বিভিন্ন সময়ে এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে। আফ্রিকানদের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠনটি আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও গাউর জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় আমার চেয়ে সে অনেক এগিয়ে ছিল। লাঞ্চ ব্রেকের সময় সে প্রায়ই রাজনৈতিক বক্তৃতা দিত। সে আমাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক বই পত্তর পড়তে দিতো। বিভিন্ন রাজনৈতিক লোকের সংগে কথা বলতে অনুরোধ করতো। এছাড়া তাদের দলীয় মিটিংয়েও আমাকে ডাকতো। ফোর্ট হেয়ারে থাকতে আমাকে আধুনিক ইতিহাসের ওপরে দুটো কোর্স করতে হয়েছিল। ফলে ইতিহাসের অনেক কিছু সম্পর্কে আমার

মোটামুটি ধারণা ছিল। কিন্তু গাউর যখন ইতিহাসের ওপর বক্তৃতা করতো তখন আমি তার পাণ্ডিত্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতাম। কোন বিশেষ জাতি অথবা মানুষের প্রসংগে যখন সে কথা বলতো তখন তাদের কাজ এবং সেই কাজের নেপথ্যের ঘটনা সে দারুণভাবে ব্যাখ্যা করতো। আমার মনে হতো আমি যেন আমার পড়া ইতিহাসকে আবার ঝালিয়ে নিতে পারছি।

গাউরের চরিত্রের যে বিশেষ দিকটি আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল; সেটি হল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তার নিষ্ঠা ও প্রতিশ্রুতিশীল মনোভাব। মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগের আশায়ই যেন সে বেঁচে আছে। গাউর প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন মিটিংয়ে যেতো এবং সেখানে ঝাঁঝালো বক্তব্য রাখতো। তাকে দেখে মনে হতো বিপ্লব ছাড়া সে অন্য চিন্তা করতে পারে না।

শহরতলীর উপদেষ্টা বোর্ড এবং এএনসি– উভয় মিটিংয়েই আমি গাউরের সংগে গেছি। আমি তার সংগে যেতাম দলীয় কর্মী হিসেবে নয়; অবজারভার বা কৌতুহলী পর্যবেক্ষক হিসেবে। সেখানে বক্তব্য রাখার চিন্তা আমার মাথায় আসার প্রশ্নই আসে না। এদের কার্যক্রম সম্পর্কে আমার সাধারণ কৌতুহল ছিল। আলোচনা, যুক্তিতর্ক উপভোগ করা এবং এদের সংগে যারা জড়িত তাদের বোধবুদ্ধি পরিমাপের মতো চিন্তা নিয়ে আমি মিটিংয়ে যেতাম। অ্যাডভাইজারি বোর্ড মিটিংগুলোর ধরণ কিছুটা আমলাতান্ত্রিক ঘরানায় হলেও এএনসির সভা সত্যিকার অর্থেই আকর্ষণীয় ছিল। এএনসির মিটিংয়ে পার্লামেন্ট, পাশ আইন, বাসা ভাড়া, গাড়ি ভাড়া থেকে শুরু করে আফ্রিকানদের যাবতীয় বিষয়ের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা হতো।

১৯৪৩ সালে আলেকজান্দ্রা বাস বয়কটে দশ হাজার বিক্ষোভকারীর সংগে আমি যোগ দেই। চার থেকে পাঁচ পেনি বাস ভাড়া বাড়ানোর কারণে ওই বাস বয়কটের কর্মসূচী নেওয়া হয়। এই বয়কট কর্মসূচীর অন্যতম সংগঠক ছিল গাউর। এই সময়ে আমি খুব কাছ থেকে তার অ্যাকশন দেখার সুযোগ পেয়েছি। এই বিক্ষোভ প্রচারণা আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

এর পরে দলীয় মিটিংয়ে আমার উপস্থিতি আগের মতো ছিল না। আগে আমি নিজেকে একজন কৌতুহলী দর্শক মনে করতাম। কিন্তু এখন থেকে একজন দলীয় কর্মী হিসেবে মিটিংয়ে যোগ দেওয়া শুরু করলাম। আমি বুঝতে পারলাম জনতার বিক্ষোভে শামিল হওয়ার পরই আমার মধ্যে এক ধরণের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। টানা নয় দিন কেউ কোন বাসে না চড়ায় বাসগুলো যাত্রীছাড়া পড়ে রইলো। পরে বাধ্য হয়ে বাস মালিক কর্তৃপক্ষ আগের ভাড়া রাখতে রাজি হল। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দাবি আদায়ের এ ঘটনা আমাকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করলো।

ল' ফার্মে থাকাকালীন আমি যে শুধুমাত্র গাউরের রাজনৈতিক বক্তব্যের একনিষ্ঠ শ্রোতা হয়ে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। রাজনীতির বিপক্ষের বিভিন্ন মত ও 'ভাষণও' আমি মন দিয়ে শুনতাম। কোনটা ভালো কোনটা খারাপ তা বোঝার চেষ্টা করতাম। হ্যান্স ম্যুলার নামে আমাদের ফার্মের একজন এস্টেট এজেন্ট বা রাজ্য-প্রতিনিধি ছিলেন। শ্বেতাঙ্গ এই ভদ্রলোক আমাদের ফার্মের অন্যতম অংশীদার মিস্টার সাইডলস্কির সংগে ব্যবসা করতেন। ম্যুলার প্রায়ই ফার্মে আসতেন। আমাকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতেন। লোকটা ছিল আপাদমস্তক ব্যবসায়ী। 'সাপ্লাই' ও 'ডিমান্ড' দিয়েই তিনি সব সময় পৃথিবীকে বিচার করতেন। একদিন এই ম্যুলার সাহেব আমাকে জানালার কাছে এনে রাস্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'নেলসন! বাইরে ওই রাস্তার দিকে চেয়ে দেখ। কী দেখতে পাচ্ছ? অসংখ্য মানুষ চরম ব্যস্ততায় হন হন করে ছুটে চলেছে। এরা কেন এভাবে ছুটছে জানো? তুমি হয়তো বলবে এরা কাজে ছুটছে। আমি বলবো কাজটা মাধ্যম মাত্র। আসলে এরা টাকার জন্য পাগলের মতো ছুটছে। কারণ অর্থ-বিত্ত মানে সুখ আর শান্তি। অর্থ নাই তো শান্তিও নাই। এই যে মানুষের এত সংগ্রাম এর সব কিছুর মূলে একটাই উদ্দেশ্য– অর্থ। তোমার হাতে যখন অঢেল বৈভব এসে যাবে তখন তুমি যা চাইবে তাই তোমার পায়ের তলায় এসে আছড়ে পড়বে।'

ঠিক একই ধারণায় বিশ্বাসী আরেকজনের নাম উইলিয়াম স্মিথ। তিনি আফ্রিকানদের জমি-জমা কেনা বেচার ব্যবসা করতেন। শ্রমিক নেতা ক্লেমেন্টেস কাডালির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক ইউনিয়ন আইসিইউ'র (দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) সাবেক নেতা ছিলেন উইলিয়াম স্মিথ। শ্রমিক সংগ্রামের পক্ষে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকার পর হঠাৎ করেই তার চিন্তা চেতনা বদলে যায়। উইলিয়াম স্মিথ আমাকে একদিন বললেন, 'দেখ নেলসন, জীবনের একটা লম্বা সময় আমি রাজনীতি করে কাটিয়েছি। এখন প্রতিটি মুহূর্তে তার জন্য আমাকে অনুতাপ করতে হচ্ছে। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টা এমন কিছু স্বার্থপর ও ধোঁকাবাজ লোকের স্বার্থে ব্যয় করেছি যারা মুখে জনস্বার্থের কথা বলে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত ছিল। আমার অভিজ্ঞতায় বলে, রাজনীতি অশিক্ষিত গরিব মানুষগুলোর কাছ থেকে সব কিছু চুরি করবার মোক্ষম হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু নয়।'

মিস্টার সাইডলস্কি এসব আলোচনায় কথাই বলতেন না। রাজনীতি নিয়ে কথা বলা আর অহেতুক সময় নষ্ট করা তার কাছে একই মনে হতো। তবে তিনি বারবার আমাকে রাজনীতি থেকে গা বাঁচিয়ে চলতে বলতেন। তিনি গাউর

ওয়াল্টার সিসুলুর ব্যাপারে আমাকে বারবার সতর্ক করে দিতেন। তিনি বলতেন, 'এই লোক দুটো তোমার মাথা খেয়ে ফেলবে। সাবধান!'

একদিন সাইডলস্কি আমাকে বললেন, 'নেলসন, তুমি একজন আইনজীবী হতে চাও। বল চাও না?' আমি বললাম, 'চাই।' তিনি বললেন, 'ভালো কথা। আইনজীবী হলে আইন পেশায় সাফল্য আশা করো; করো না?' আমি বললাম, 'অবশ্যই করি।' তিনি বললেন, 'কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, যেই না তুমি রাজনীতিতে জড়িয়েছ, অমনি তোমার ক্যারিয়ার ফেঁসে যাবে। জিজ্ঞেস করো কীভাবে?' আমি বললাম, 'কীভাবে?' সাইডলস্কি বললেন, 'এ পেশায় ভালো করতে হলে সরকারের অনুগত কর্মকর্তা, ব্যবসায়ীসহ তাবৎ গণ্যমান্যদের সংগে সম্পর্ক ভালো রাখতে হবে। কিন্তু যখনই তুমি রাজনীতিতে যাবে তখনই তাদের সংগে তোমার বিরোধ বেধে যাবে। তুমি মক্কেল হারাবে। তুমি দেউলিয়া হয়ে পড়বে। তোমার পরিবারে চরম অশান্তি নেমে আসবে। সর্বশেষ পরিণতি হিসেবে তোমাকে জেলের ঘানিও টানা লাগতে পারে। এই হলো রাজনীতিতে জড়ানোর পুরস্কার।'

আমি এসব রাজনীতি বিরোধীদের কথাও মন দিয়ে শুনতাম। সতর্কভাবে তাদের কথার ওজন মেপে দেখতাম। তাদের প্রত্যেকের কথায়ই কিছু না কিছু জোরালো যুক্তি ছিল। এই সময়ে আমি কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়েছিলাম। রাজনীতিতে আমার কী করণীয় তা অবশ্য তখনও ঠিক জানতাম না।

আমার পেশাগত উন্নতি নিয়ে সাইডলস্কি, স্মিথের মতো লোকজন উপদেশবাণী দিয়েই খালাস। কিন্তু গাউর আমার পেশাগত উন্নয়নের স্বার্থে যা করেছিল তা উপদেশবাণীর চেয়ে অনেক বেশি কিছু। ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে যখন ল' ফার্মে আমার চাকরির বয়স দুই বছরের কিছু কম তখন একদিন গাউর আমাকে আড়ালে ডেকে নিল। বললো, 'নেলসন, আমি যতদিন এ ফার্মে থাকবো ততদিন তোমাকে এরা নিবন্ধিত করবে না। তোমার ডিগ্রি থাক বা না থাক তাতে কিচ্ছু যায় আসে না।' আমি তার কথায় চমকে গেলাম। তাকে বললাম, তার কারণে আমাকে নিবন্ধন করবে না কেন; তার তো ওকালতির প্রশিক্ষণও নেই। কিন্তু গাউর বললো, "তোমার যুক্তি তারা মানবে না। তারা বলবে, 'আইনগত বিষয় নিয়ে ক্লায়েন্টদের সংগে কথা বলার জন্য তো আমাদের গাউর আছে। সে থাকতে আমরা নতুন কাউকে নিবন্ধিত করবো কেন? গাউর তো ভালোই কাজ চালিয়ে নিচ্ছে।" কিন্তু তারা তোমার জন্য কাজ করবে না। তোমাকে নিবন্ধিত করলে বেশি বেতন দিতে হবে। একারণেই তারা এটা চাইবে না। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হলে তোমাকে অবশ্যই বড় উকিল হতে হবে।

মহান সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে আমি পদত্যাগ করবো। আমি চলে যাওয়ার পর তোমাকে নিবন্ধন না করে তাদের কোন উপায় থাকবে না।"

সে যাতে পদত্যাগ না করে সেজন্য তাকে যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করলাম। কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই সে মিস্টার সাইডলস্কির কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিল এবং স্বাভাবিকভাবেই সাইডলস্কি আমাকে তাদের নিবন্ধিত আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দিলেন। গাউরের এই পদত্যাগ তার চরিত্রের একটি দৃঢ় দিক আমার সামনে উন্মোচিত করে দেয়।

১৯৪৩ সালের গোড়াতেই ইউএনআইএসএ'র মাধ্যমে আমি ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই বিএ পাশ করি। গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি আনার জন্য আমাকে ফোর্ট হেয়ারে যেতে হয়। ফোর্ট হেয়ারে যাওয়ার আগে আমি নিজেকে অন্তত একটা নতুন স্যুটে সজ্জিত করে নিতে চাইছিলাম। স্যুট কেনার জন্য ওয়াল্টার সিসুলুর কাছ থেকে বেশ কিছু অর্থ ধার করতে হয়েছিল। ফোর্ট হেয়ারে ভর্তির পর প্রথম যেদিন ক্লাস করতে গিয়েছিলাম; সেদিন আমার গায়ে ছিল পালক পিতার কিনে দেওয়া একটা নতুন স্যুট। আজ অনেকদিন পর আবার যখন ডিগ্রি আনতে যাচ্ছি তখনও নতুন স্যুট। এ ছাড়া র‍্যান্ডাল পেটেনি নামে এক বন্ধুর কাছ থেকেও একটা একাডেমিক ড্রেস ধার করে সংগে নিয়েছিলাম।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমার জ্ঞাতি ভাতিজা কে.ডি. মাতানজিমা আমার নিজের মা ও পালক মা দুজনকেই নিয়ে এসেছিল। আমার পালক মা অর্থাৎ জাস্টিসের মা ও প্রয়াত রাজার বিধবা স্ত্রীর নাম ছিল নো-ইংল্যান্ড। ফোর্ট হেয়ারে নিজের মাকে পেয়ে অসম্ভব খুশি হয়েছিলাম। অন্যদিকে, নো-ইংল্যান্ডের উপস্থিতিতে আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার পালক পিতা নিজে তাকে আশীর্বাদ স্বরূপ এখানে পাঠিয়েছিল।

গ্রাজুয়েশনের পর বেশ কয়েকটা দিন কামাতায় দালিওয়াংগার (কেডি'র গোত্রীয় নাম। এ নামেই আমি তাকে সম্বোধন করতাম) বাড়িতে কাটালাম। দালিওয়াংগা ঐতিহ্য অনুসারে গোত্রীয় নেতৃত্বের পথই বেছে নিয়েছিল। ট্রান্সকেইর একেবারে পশ্চিম প্রান্তের এমিগ্র্যান্ট থেম্বুল্যান্ডের প্রধান হিসেবে সে তখন প্রায় দায়িত্ব নেওয়ার পথে। আমি যখন তার ওখানে বেড়াচ্ছিলাম ও তখন আমাকে উমতাতায় ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। সে চাইল আমি যেন সেখানে গিয়ে এটর্নি হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। সে বললো, 'তুমি কেন জোহান্সবার্গ যেতে চাইছো? তোমাকে এখানে আরও বেশি প্রয়োজন।'

তার কথায় যুক্তি ছিল। ট্রান্সকেইতে যে কয়জন মেধাবী ও উচ্চশিক্ষিত আফ্রিকান বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি ছিল ট্রান্সভালে। আমি দালিওয়াংগাকে বললাম, তার পরামর্শ ঠিক আছে। নিজের এলাকায় এসে

নিজের লোকদের জন্য কিছু করা অবশ্যই আমার কর্তব্য। কিন্তু অন্তরের মধ্যে আমার যে আরেকটি বৃহৎ বাসনা ঘুরপাক খাচ্ছিল। গাউর ও ওয়াল্টার সিসুলুর সংস্পর্শে এসে আমার মধ্যে এই বোধ জন্ম নিয়েছিল যে কোন বিশেষ গণ্ডি নয় বরং সমগ্র আফ্রিকার উন্নয়নে আমাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আমি বুঝতে পারছিলাম জীবনের সমস্ত ঘটনা প্রবাহ আমাকে যেন জোহান্সবার্গের দিকেই ঠেলে দিচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম জোহান্সবার্গ আমার জন্য আদর্শ জায়গা। এটা আফ্রিকার কেন্দ্রবিন্দু। এখানে সমগ্র আফ্রিকার সব উপজাতির মানুষ আসে। আফ্রিকার জন্য কিছু করতে হলে এর চেয়ে আদর্শ জায়গা তখন আমার সামনে আর ছিল না।

ফোর্ট হেয়ারের গ্রাজুয়েশন পাওয়ার পর আমার মধ্যে এক নতুন 'আমি'র জন্ম হলো। এতদিন ভেবে এসেছি বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি থাকলে সহজেই থেম্বু রাজপরিবারের কাছাকাছি চলে যেতে পারবো। মোটা মাইনে, বড় পদ সব হাতের মুঠোয় চলে আসবে। এর চেয়ে সফলতা আর কিসে থাকতে পারে? কিন্তু এতদিনে আমার চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে। আমি বুঝতে পেরেছি মোটা মাইনের চাকরি আর সাধারনের সম্মান পাওয়াই জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। পুরনো বিশ্বাসকে আমি দ্রুত ঝেড়ে ফেললাম। মনস্থির করলাম, আমাকে বৃহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে রাজনীতির জগতে ঢুকতে হবে। রাজনৈতিক আদর্শ ছাড়া ব্যক্তিগত সফলতা অর্জন সম্ভব কিন্তু সামগ্রিক সফলতা কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়।

জোহান্সবার্গে এসে আমি এমন একটা মহলের সংগে ওঠাবসা শুরু করলাম যাদের দৃষ্টিতে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জনের চেয়ে সাধারণ জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেওয়ার সময়ও আমি বুঝতে পারছিলাম আমার নতুন জগতে এ বিদ্যে নিয়ে বড়াই করা সম্ভব হবে না। বর্ণবাদী নিস্পেষণ, কর্মক্ষেত্রে আফ্রিকানদের ওপর বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ এবং আফ্রিকানদের বিচার বঞ্চিত হওয়ার প্রসংগগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা সলজ্জ ভঙ্গিমায় এড়িয়ে যেতেন। তারা এ বিষয়ে কথাই বলতেন না।

কিন্তু জোহান্সবার্গে আমাকে প্রতিদিনই এসব বিষয়ের মুখোমুখি হতে হতো। ছাত্রজীবনে কেউ কোনদিন আমাকে এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে খোলাখুলি কিছু বলেনি। কিন্তু এই জগতে এসে আমার চোখ খুলে গেল। বুঝলাম এমন বহু বিষয় আমার অজানা রয়ে গেছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে কোনদিনই অর্জন করা সম্ভব হতো না।

১৯৪৩ সালের শুরুতে জোহান্সবার্গ ফিরে আমি উইটওয়াটারস্র্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাচেলর অব ল' ডিগ্রির জন্য তালিকাভুক্ত হই। আইনজীবী হওয়ার জন্য প্রস্তুতিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হিসেবে ওই কোর্সটিকে বিবেচনা করা হতো। উত্তর-মধ্য জোহান্সবার্গের এলাকা ব্রামফন্টেইনে অবস্থিত উইটওয়াটারস্র্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে সবাই সে সময় 'উইটস্' বলতো। অনেকে এটাকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইংরেজীভাষী আফ্রিকানদের বিশ্ববিদ্যালয় বলেও মনে করতো।

ল' ফার্মে কাজ করার সুবাদে প্রথমবারের মতো নিয়মিত শ্বেতাঙ্গদের সংগে আমার ওঠাবসার সুযোগ তৈরি হয়। তবে তাদের অধিকাংশই ছিলেন বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। ফলে একেবারে বন্ধুত্বপূর্ণ আবহে তাদের সংগে আলাপ আলোচনার সুযোগ কম ছিল। উইটওয়াটারস্র্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সমবয়সী অনেক শ্বেতাঙ্গ শিক্ষার্থীর সংগে পরিচয় হলো। ফোর্ট হেয়ারে থাকতে বিভিন্ন উপলক্ষে রোডস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা সাদা ছাত্র-ছাত্রীদের সংগে দেখা হতো। কিন্তু একসংগে ওঠাবসার সুযোগ ছিল না। কিন্তু উইটসে এসে শ্বেতাঙ্গ শিক্ষার্থীদের সংগে এক টেবিলে ক্লাস করার সুযোগ হলো। তারা আমার কাছে যেমন নতুন মুখ ও কৌতুহলের বিষয় ছিল আমিও তেমনি তাদের চোখে নতুন মানুষ ছিলাম। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো আইন অনুষদে আমিই ছিলাম একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইংলিশ স্পীকিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিঃসন্দেহে উদারপন্থি ছিল। এসব প্রতিষ্ঠান কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষার্থী ভর্তি করতো। শুধুমাত্র এই একটি কারণে তাদের শ্রদ্ধা না করে উপায় ছিল না। আফ্রিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এটা কল্পনাও করা যেত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যহীন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও আমি কখনোই সেখানে স্বাচ্ছন্দবোধ করতে পারিনি। পুরো ফ্যাকাল্টিতে আমি ছাড়া আর কোন কালো ছাত্র ছিল না। সবাই আমার দিকে বিশেষ কৌতুহলী চোখে তাকাতো বলে মনে হতো। সব সময় আমি অস্বস্তিতে থাকতাম। উইটসে বেশিরভাগ ছাত্র উদারপন্থি অথবা বর্ণবৈষম্যবাদবিরোধী না হলেও আমি কিছু শ্বেতাঙ্গ বন্ধু খুঁজে পেয়েছিলাম যারা যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ও উদারমানসিকতা সম্পন্ন মানুষ ছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তীতে আমার সহকর্মীও হয়েছে। তবে অনেক সময় প্রচণ্ড আঘাতও পেতে হয়েছে।

একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন ক্লাসে হাজির হতে আমার কয়েক মিনিট দেরী হয়েছে। টিচার লেকচার করছিলেন। আমি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ক্লাসে ঢুকলাম। দেখলাম স্যারেল টিহাই নামে এক সহপাঠীর (এই টিহাই পরবর্তীতে

ইউনাইটেড পার্টির পার্লামেন্ট সদস্য হয়েছিলেন) পাশের সিটটি খালি। আমি বসে পড়লাম। লেকচার চলছিল। সে মন দিয়ে তা শুনছিলও। আমি বসার সংগে সংগে দেখলাম সে তার ডেস্ক থেকে বইখাতা গুছিয়ে একটু দূরের আরেকটি ডেস্কে চলে গেল। এ জাতীয় অপমানজনক আচরণ আমাকে প্রায়ই সহ্য করতে হতো। এরা আমাকে মুখে 'কাফির' বলে গালাগাল দিতো না; কিন্তু নিঃশব্দে এমন সব আচরণ করতো যে আমি সেই পরিমাণ অপমান বোধ করতাম।

মিস্টার হাহ্‌লো নামে আমাদের এক ল' প্রফেসর ছিলেন। লোকটা সাংঘাতিক কড়া ছিলেন। শিক্ষার্থীদের অতিস্বাধীনতা তিনি একদম সহ্য করতেন না। আইন বিষয়ের জন্য তিনি মহিলা ও আফ্রিকানদের যোগ্য মনে করতেন না। তার ধারণা ছিল আইন বিষয়টি হচ্ছে একটি সামাজিক বিজ্ঞান। এর জন্য কঠোর নিয়মানুবর্তীতা দরকার যা তার ভাষায় মহিলা ও আফ্রিকানদের মধ্যে নেই। তিনি একদিন আমাকে বলেই ফেললেন যে আমার উইটসে ভর্তি হওয়া ঠিক হয়নি। ডিগ্রি নেওয়া অপরিহার্য হলে আমার নাকি ইউএনআইএসএ'র মাধ্যমে ফোর্ট হেয়ার থেকে যেভাবে বাইকরেসপন্ডেন্সে পাশ করেছিলাম; সেভাবে এখান থেকেও নাকি পাশ করা উচিত ছিল। অবশ্য আমি তার কথায় পাত্তা দিতাম না। আমি জানতাম আমাকে হাতে-কলমে আইন পেশার নাড়ি-নক্ষত্র শিখতে হবে।

একটি কথা স্বীকার করতেই হবে উইটসে এসে আমি এমন কিছু বন্ধু পেয়েছি স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের সাহায্য ছাড়া আমার একার পক্ষে খুব বেশি কিছুও অর্জন করা সম্ভব হতো না। উইটসে প্রথম বর্ষে পড়ার সময় জো স্লোভো ও তার হবু স্ত্রী রুথ ফার্স্টের সাথে আমার পরিচয় হয়। জো সাংঘাতিক মেধাবী ছাত্র এবং কম্যুনিস্ট পার্টির একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিল। আর রুথ ছিল অনন্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এক তরুণী। রুথের লেখালেখির হাত ছিল ভালো। জো এবং রুথ দুজনই আফ্রিকায় অভিবাসনপ্রাপ্ত ইহুদি। এরা ছাড়াও ফার্স্ট টার্মে জর্জ বিজোস ও ব্রাম ফিশার নামে দুই বন্ধু জুটে যায়। এরা দুজনই পরবর্তীতে আমার আজীবনের বন্ধু হয়ে যায়। জর্জের বাবা মা গ্রীস থেকে এখানে এসেছিলেন। তারপর আর ফিরে যান নি। খুব উদার মানিসকতার ছেলে ছিল জর্জ। ওদিকে ব্রাম ফিশার ছিল বিরাট ধনী পরিবারের আদুরে ছেলে। ওর দাদা ছিলেন অরেঞ্জ রিভার কলোনির প্রধানমন্ত্রী আর বাবা ছিলেন অরেঞ্জ রিভার এস্টেটের প্রধান বিচারক। তার সামনে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা উপেক্ষা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে। কম্যুনিস্ট পার্টির একনিস্ট কর্মী টনি ডি ডোঢাড, হ্যারল্ড ওলপে, জুলেস ব্রাউডি ও তার স্ত্রী এসব বর্ণবাদবিরোধী কর্মীদের সংস্পর্শে এসেছিলাম আইন পড়তে এসে।

শ্বেতাঙ্গ ছাড়াও এ সময় বেশ কয়েকজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছাত্রের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। ফোর্ট হেয়ারে প্রচুর ইন্ডিয়ান শিক্ষার্থী ছিল। কিন্তু তারা আলাদা হোস্টেলে থাকতো বলে তাদের সংগে তেমন একটা কথাবার্তা হতো না। উইটসে এসে যেসব ভারতীয় ছাত্রের সংগে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল ইসমাইল মীর, জে. এন. সিং, আহমেদ ভুলা ও রামলাল ভুলিয়া। ইসমাইলের অ্যাপার্টমেন্ট ছিল আমাদের আড্ডাস্থল। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত খোলভাদ হাউসের ১৩ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকতো ইসমাইল।

ওই ফ্ল্যাটে বিশাল আকৃতির চারটি রুম ছিল। আমরা কয়বন্ধু সেখানে একত্রিত হয়ে আড্ডা দিতাম; পড়াশুনা করতাম। অরল্যান্ডো থেকে আমি ভার্সিটিতে আসতাম। ট্রেনে চেপে আসতাম। ক্লাস শেষ করে শেষ ট্রেনে আবার ফিরে যেতাম। যেদিন শেষ ট্রেন ধরতে পারতাম না সেদিন ওর ফ্ল্যাটে রাতটা গল্পে আড্ডায় কাটিয়ে দিতাম। এমনও হয়েছে নাচ-গান করে আমরা সেখানে রাত পার করে দিয়েছি।

ইসমাইলের বাবা-মা ইন্ডিয়ান হলেও তার জন্ম হয়েছিল নাটাল'য়ে। খুব মেধাবী ও চালাক চতুর ছিল সে। উইটসে থাকা অবস্থায় ট্রান্সভাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছিল ইসমাইল। জে.এন. সিং খুব সুদর্শন ছিল। সাদা-কালো সবার সংগে খুব সহজেই সে মানিয়ে নিত। জে. এন. সিং'ও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিল। একদিন ইসমাইল, জে. এন. আর আমি খোলভাদ হাউসে যাওয়ার জন্য ট্রামে চেপে বসেছি। ওই ট্রামে ইন্ডিয়ানদের ওঠার অনুমতি থাকলেও আফ্রিকানরা তাতে চড়তে পারতো না। তা সত্ত্বেও ইসমাইল আর জে.এন. আমাকে নিয়ে ট্রামে উঠে পড়লো। কিছুদূর যাওয়ার পর ট্রামের কন্ডাকটর এসে ইসমাইল আর জে.এন.কে বললো, "এ ট্রামে আপনাদের যেতে বাধা নেই কিন্তু আপনাদের এই 'কাফির বন্ধু'টাকে নেওয়া যাবে না।" তার কথায় জে.এন. এবং ইসমাইল দুজনই ভয়ঙ্কর খেপে গেল। ওরা বললো, "কাফির মানে তুই জানিস। ওকে কাফির বলার জন্য এক্ষুণি তোকে জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেবো।" কন্ডাকটার দ্রুত ট্রাম থামালো এবং পুলিশ ডাকলো। পুলিশ এসে আমাদের তিনজনকেই গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। ওই রাতেই আমাদের ব্যাপারে তদবির করার জন্য ইসমাইল এবং জে.এন. ব্রাম ফিশারের সংগে যোগাযোগ করলো। পরের দিন আদালতে আমাদের চালান করে দেওয়া হল। ম্যাজিস্ট্রেটের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল ব্রাম ফিশারের ফ্যামিলি ব্যাক গ্রাউন্ড শুনে সে নিজেই ভয় পেয়ে গেছে। আমাদের তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।

আসলে উইটস্ আমার সামনে এক বিচিত্র ধারণা ও রাজনৈতিক বিতর্কের নতুন জগৎ খুলে দিয়েছিল।

উইটস্ ছিল এমন এক পরিমণ্ডল যেখানে প্রায় সবাই রাজনীতি সচেতন ছিল। সাদা ও ভারতীয় সমবয়সীদের মধ্যে আমিই ছিলাম এখানকার একমাত্র আফ্রিকান ছাত্র যে নাকি ধীরে ধীরে তার নিজের জাতিকে নেতৃত্ব দেবার স্বপ্ন দেখছিল। এখানে এসেই আমি প্রথমবারের মতো অনেক সমবয়সী বন্ধুদের আবিষ্কার করলাম যারা মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত রয়েছে। এখানে আমি এমন অনেক বন্ধু পেলাম যারা সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মালেও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সব ভোগ বিলাস ত্যাগ করার জন্য তৈরি হয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক মুক্তিযোদ্ধার জন্ম

১১

ঠিক কোন মুহূর্তে আমি রাজনীতির সংগে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে গেলাম অথবা কখন আমি বুঝতে পারলাম যে স্বাধীনতা সংগ্রামেই আমি বাকি জীবন কাটিয়ে দেবো তা সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকরা তাদের জন্মলগ্ন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে যেতো; তা সে স্বজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানেই হোক। শুধুমাত্র কোন না কোন আফ্রিকান হাসপাতালে আফ্রিকানদের জন্ম হতো। হাসপাতাল থেকে তাদের যে গাড়িতে করে তাকে বাড়ি আনা হতো সেটিও ছিল আফ্রিকানদের জন্য সংরক্ষিত বাস। নবজাতকটি যেখানে বড় হতো সেখানে আফ্রিকানরা ছাড়া আর কেউ থাকতো না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আফ্রিকান শিশুদের পড়াশুনার সুযোগ ছিল না। ওদের মধ্যে যারাও বা স্কুলে যেত সে স্কুলটিও ছিল কোন না কোন আফ্রিকান স্কুল। তার মানে জন্ম মুহূর্ত থেকেই সে বর্ণবাদের শিকার হয়ে জীবন শুরু করতো।

শৈশব ছেড়ে বড় হওয়া একজন আফ্রিকানকে শুধুমাত্র আফ্রিকানদের কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিতে হতো। ঘর ভাড়া নিতে চাইলে আফ্রিকানদের পৌর এলাকার কোন বাড়িতে যোগাযোগ করতে হতো। দূরপাল্লার যাত্রায় একজন আফ্রিকানের জন্য একমাত্র অনুমোদিত বাহন ছিল ট্রেন। সেই ট্রেনে উঠতে তাদের বিভিন্ন ধরণের সরকারি অনুমতিপত্র বা পাশ থাকতে হতো। ঠিকমতো কাগজপত্র না দেখাতে পারলে দিন হোক রাত হোক যে কোন সময়ই আফ্রিকান যাত্রীদের ঘাড় ধরে নামিয়ে দেওয়া হতো; নয়তো পুলিশ ডেকে জেলে পুরে দেওয়া হতো। এই ছিল আফ্রিকানদের তখনকার দিনের বাস্তবতা। তারা এসব বৈষম্য যেন মেনেই নিয়েছিল।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ছোটবেলা থেকে দিনের পর দিন বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছি। অপমানিত হয়েছি। প্রতিটি অপমানকর মুহূর্তে আমার ভেতরের আফ্রিকান মানুষটা ক্রোধে উন্মত্ত হয়েছে। রাগে ক্ষোভে জ্বলেছি। আর এক সময় আমি এই পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। জ্ঞান বুদ্ধি হবার পর এমন একটা দিনও যায়নি যেদিন মনে মনে বলিনি এসব

হাবিজাবি নিয়ম মানি না। আনুষ্ঠানিক রাজনীতির জগতের কাছাকাছি এসে একটা সময় মনে হয়েছে মুক্তির সংগ্রাম ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। আমাকে সংগ্রামে নামতেই হবে।

আমাকে যারা রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছিল তাদের বেশ কয়েকজনের নাম বলেছি। কিন্তু যে আমাকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি হলেন ওয়াল্টার সিসুলু। সিসুলু ছিলেন আদর্শিকভাবে দৃঢ়, বাস্তববাদী ও নিবেদিত প্রাণ। সংকটময় মুহূর্তে তাকে কখনোই ঘাবড়ে যেতে দেখিনি। উত্তেজনায় অন্য সবাইকে যখন চিৎকার চেঁচামেচি করতে দেখেছি তখন তাকে দেখেছি এক প্রশান্ত ভঙ্গিমায়। তিনি বিশ্বাস করতেন দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবর্তন এএনসির মাধ্যমেই সম্ভব।

এএনসিই কালো আফ্রিকানদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে। একটা সংগঠন ভালো না মন্দ তা অনেক সময় সে সংগঠনের পরিচালক অথবা নেতা-কর্মীদের দেখে বোঝা যায়। ওয়াল্টার সিসুলুকে আমি যতটুকু চিনতে পেরেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল তার মতো লোক যে সংগঠনেই থাকুক না কেন তাতে যুক্ত হতে পারলে আমি ধন্য হবো। সে সময় বেশ কয়েকটি বিকল্প দল ছিল। কিন্তু এএনসি ছিল সবার মধ্যে ব্যতিক্রম। এ সংগঠনটি ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু সবাইকে ডাকতো। সর্বসাধারণের আশ্রয়স্থল হিসেবে এ সংগঠনটি নিজেকে বিবেচনা করতো।

১৯৪০'র দশকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসল পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। গণতান্ত্রিক আদর্শকে সামনে রেখে প্রত্যেক মানুষের স্ব স্ব অধিকার নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়ে ১৯৪১ সালে রুজভেল্ট ও চার্চিলের মধ্যে এক সংহতি সনদ স্বাক্ষরিত হয়। এটি আটলান্টিক সনদ নামে পরিচিত। পশ্চিমের অধিকাংশ মানুষ এ সনদকে একটি সারশূন্য ও বায়বীয় সনদ বলে অভিহিত করে। কিন্তু আফ্রিকায় আমাদের মতো কিছু আশাবাদী মানুষ এ সনদের মধ্যে অনেক সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছিল। উৎপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আফ্রিকানদের সংগ্রাম ও আটলান্টিক সনদের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে এএনসি নিজেই একটি নতুন সনদ তৈরি করে।

সমস্ত আফ্রিকানকে পূর্ণাঙ্গ নাগরিকত্ব প্রদান, প্রত্যেক আফ্রিকানের জমি ক্রয়ের অধিকার নিশ্চিত করা এবং যাবতীয় বর্ণবৈষম্যমূলক আইন বাতিল করার দাবি নিয়ে ওই সনদ প্রণয়ন করা হয়। আমাদের স্থানীয় সরকার এবং সাধারণ দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ইউরোপে এই দাবিগুলোই দীর্ঘদিন থেকে উপস্থাপন করে আসছিল। আমাদের আশা অভিন্ন দাবি তোলায় তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

মুসলমানদের জন্য মক্কা যেমন তীর্থস্থান তেমনি এএনসি মেম্বারদের তীর্থস্থান ছিল অরল্যান্ডোতে অবস্থিত ওয়াল্টার সিসুলুর বাস ভবন। এ বাড়িটা সব সময়ই আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় গ্রহণ করতো। আমি প্রায়ই রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার জন্য অথবা মিসেস সিসুলুর রান্না খাওয়ার লোভে এখানে আসতাম। ১৯৪৩ সালের এক রাতে ওই বাড়িতে প্রথমবারের মতো অ্যানতোন লেমবেডে ও এ.পি. এমডা'র সংগে আমার দেখা হয়। লেমবেডে মাস্টার্স ডিগ্রির পাশাপাশি আইন বিষয়েও ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। ওই রাতে লেমবেডের বক্তৃতা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন এমন এক চৌম্বকীয় মানবের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি যিনি আমাকে তার বক্তব্যের প্রভলতায় টেনে রেখেছেন। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার খ্যাতনামা আইনজীবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। একই সংগে এএনসির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড. পিক্সলি কাসেমের একজন লিগ্যাল পার্টনারও ছিলেন এই লেমবেডে।

লেমবেডে বলতেন, কৃষ্ণাঙ্গদের আদি আবাসস্থল হলো আফ্রিকা। তাদের জমি, তাদের সম্পত্তি ও তাদের সম্মান পুনরুদ্ধারের দাবি তাদেরকেই তুলতে হবে। নিজেদের ক্ষুদ্র ও নিচু জাতের মানুষ মনে করা এবং বর্ণবাদী মানসিকতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। নিজেদের ছোট মনে করা ইউরোপীয়দের পুঁজা করারই নামান্তর।

তার বক্তব্য হলো, নিজেদের অস্পৃশ্য মনে করাই হলো স্বাধীনতার পথে প্রধান বাধা। তিনি সেই রাতে বলেছিলেন, যেখানেই আফ্রিকানদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেখানেই তারা শ্বেতাঙ্গদের সমান; অনেক ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে ভালো কৃতিত্ব দেখিয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি মার্কুস গার্ভে, ডব্লিউ. ই. বি. দু বোইস এবং হাইলে সেলাসির নাম উল্লেখ করলেন।

তিনি বললেন, 'জননী আফ্রিকার মাটির মতোই আমার চামড়ার রং কালো। এ কালো চামড়া আমার কাছে সুন্দর। এ কালো রং আমার কাছে গর্বের।' তিনি বিশ্বাস করতেন সাফল্য অর্জনের লক্ষে যে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার আগে এই কালো মানুষদের আগে স্ব স্ব ভাবমূর্তি ও যোগ্যতা উজ্জ্বল করতে হবে। তিনি স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী হওয়ার জন্য সবাইকে জোর আহ্বান জানাতেন। তিনি এই আফ্রিকান জাতীয়তাবাদকে 'আফ্রিকানিজম' বলে বর্ণনা করতেন। আমরা তার বক্তব্য শুনে ধরেই নিয়েছিলাম একদিন অবশ্যই তিনি এএনসির নেতৃত্ব দেবেন।

লেমবেডে ঘোষণা করলেন, আফ্রিকাবাসীর জন্য সবচেয়ে সুখবর হলো সবার মধ্যে একটি জাতীয়তাবাদ কাজ করছে। গোত্রীয় কলহ ও বিবাদ ক্রমশ কমে আসছে। আধুনিক ছেলে-মেয়েরা এখন নিজেকে প্রথমেই একজন আফ্রিকান বলে ভাবা শুরু করেছে। কে ঝোসা, কে এনডেবেলেস, কে টিওয়ানাস এসব বিভাজন নিয়ে তারা আর আগের মতো মাথা ঘামাচ্ছে না। নাটালের এক নিরক্ষর চাষার ছেলে লেমবেডে আমেরিকান বোর্ড অব মিশনের প্রতিষ্ঠান অ্যাডামস্ কলেজ থেকে শিক্ষকতার ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। অরেঞ্জ ফ্রি এস্টেটের শিক্ষিত

আফ্রিকানদের এলাকায় তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। এর পর তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে রাজনীতিতে নেমে পড়েন। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নাটাল থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র *'ইনকুন্ডলা ইয়া বান্ত'*তে তিনি পরবর্তীতে একটা আর্টিকেল লিখেছিলেন। লেখাটার খানিক অংশ তুলে ধরছি ঃ

'সমকালীন ইতিহাস মানেই হল জাতীয়তাবাদের ইতিহাস। গণমানুষের সংগ্রাম আর রণক্ষেত্রে গুলির সামনে জাতীয়তাবাদকে বার বার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। বিদেশী শাসন ও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের সামনে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে এই নব্যশক্তি। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের ক্ষুণ্নিবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য সব ধরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয়তাবাদীদের দমিয়ে রাখার জন্য তারা কাড়ি কাড়ি অর্থ খরচ করে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। তারা আমাদের 'সংকীর্ণ', 'পশ্চাৎপদ', 'বর্বর', 'অসভ্য', 'শয়তান' এসব বলে দমিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কিছু প্রোপাগান্ডা সফল হয়েছে। বিদেশীদের আনুগত্য মেনে তাদের মতো পোশাক পরলে, তাদের মতো খাবার খেলে তারা তখন অনুগত আফ্রিকানদের 'সংস্কৃতিমনা', 'উদারপন্থি', 'প্রগতিশীল' ইত্যাদি বলে বাহবা দেয়। আসলে তারা তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য আফ্রিকানদের যেভাবে দমিয়ে রাখা যায় তার সব পথ অবলম্বন করছে।'

লেমবেডের কথা শুনে আমার কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অভিভাবকসুলভ আচরণ এবং তারা নিজেদের 'সংস্কৃতিমনা,' 'প্রগতিশীল' ও 'সভ্য' বলে যে দাবি করে আসছে তার প্রতি আগে থেকেই আমি সন্দিহান ছিলাম। ব্রিটেন আফ্রিকায় যে কৃষ্ণাঙ্গ এলিট শ্রেণী তৈরি করতে চাচ্ছিল আমি তখন প্রায় সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছি। আমার পালক পিতা থেকে শুরু করে মিস্টার সাইডলস্কি; অর্থাৎ আমার সমাজের প্রত্যেকেই আমার কাছে যে সাফল্য চেয়েছিলেন আমি তখন প্রায় তা দেবার গোড়ায়! কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম এ সবই শুভঙ্করের ফাঁকি। লেমবেডের মতো আমিও আফ্রিকানদের মুক্তির সমাধান হিসেবে সশস্ত্র বিপ্লবকেই প্রাধান্য দিতে শুরু করলাম।

লেমবেডের বন্ধু ও ব্যবসায়িক পার্টনার ছিলেন পিটার এমডা। লোকে তাকে এ.পি. নামেই চিনতো। লেমবেডে আবেগতাড়িত ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু এমদা ছিলেন ঠিক তার উল্টো। ঠান্ডা মেজাজের মানুষ ছিলেন তিনি। সুনির্দিষ্ট ও বিজ্ঞানসম্পন্ন যুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি।

জর্ডান এনগুবানে, এ. পি. এমডা এবং উইলিয়াম এনকোমোসহ সবাই আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটানোর পক্ষে রায় দিলেন। লেমবেডেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হল। অলিভার ট্যামবোকে করা হল সেক্রেটারি; আর ওয়াল্টার সিসুলুকে করা হল কোষাধ্যক্ষ। অন্যদিকে এ. পি. এমডা. জর্ডান এনগুবানে, লিওনেল এমজোমবোজি, কনগ্রেস এমবাতা, ডেভিড বোপাপে এবং আমি নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলাম। পরবর্তীতে আমাদের সংগে যুক্ত হলেন সে সময়কার উদ্দীপ্ত তরুণ নেতা গডফ্রে পিৎজে (তরুণ আইনজীবী), আর্থার

লেতেলে, উইলসন কনকো, ডিলিজা এমজি, এনথেতো মোতলানা (এদের সবাই তরুণ ডাক্তার), ড্যান ট্লুমি (শ্রমিক নেতা), জো ম্যাবিউস, দ্যুমা নোকবি এবং রবার্ট সোবুকবি (এরা সবাই ছাত্র নেতা)। এদের সহায়তা নিয়ে সব প্রদেশে আমাদের শাখা সংগঠন খোলা হল।

১৯১২ সালে এএনসির প্রথম যে গঠনতন্ত্র তৈরি হয় আমাদের লীগের মৌলিক নীতির সংগে তার কোন বিরোধ ছিল না। আমরা মূল গঠনতন্ত্রের নীতিগুলোকে সংস্কার করেছিলাম মাত্র। পুরনো নীতিমালাগুলো ছিল অনেক বেশি আপোষকামী। বর্তমান পরিস্থিতির সংগে এ নীতিমালার সাজুয্য ছিল না। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল সমগ্র আফ্রিকান জাতিকে এক জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করে ঐক্যবদ্ধ করা। বিভিন্ন উপজাতিকে একীভূত করে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জনমত গড়ে তোলা।

আমাদের ইশতেহারে বলা হয়েছিল, "আমরা বিশ্বাস করি আফ্রিকানরা নিজেরাই তাদের নিজেদের জাতীয় মুক্তি আদায় করতে সক্ষম। আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কংগ্রেস ইয়ুথ লীগ কাজ করবে।"

আমাদের ইশতেহারে আমরা সর্বপ্রকার ট্রাস্টিশীপ প্রত্যাখ্যান করলাম। প্রত্যাখ্যান করলাম এই কারণে যে এর মাধ্যমে বছরের পর বছর সাদারা কালোদের বঞ্চিত করে যাচ্ছে। ১৯১৩ সালের ভূমি আইন দিয়ে ৪০ বছর ধরে তারা আফ্রিকানদের জমি দখল করে রেখেছে। এই অ্যান্টি-আফ্রিকান কালো আইনের মাধ্যমে আদিবাসীদের ৮৭ শতাংশ জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ১৯২৩ সালে যে আরবান এরিয়াস অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয় তাতেও কালোদের নিস্পেষণের পথ খোলা রাখা হয়েছে। ওই আইন অনুযায়ী শহরের উপকণ্ঠে আফ্রিকানদের বস্তি গড়ে দেওয়া হয়। সাদারা ওই ঝুপড়ি ঘরগুলোর একটা গালভরা নামও দিয়েছিল। তারা সেটাকে মিষ্টি করে বলতো 'ন্যাটিভ লোকেশন'। কিন্তু সাদাদের আসল ধান্দা ছিল অন্যখানে। তারা আফ্রিকানদের শহরের কাছাকাছি রাখতো যাতে কম পারিশ্রমিকে দ্রুত তাদের খাটিয়ে নেওয়া যায়। শ্বেতাঙ্গদের বিভিন্ন কারখানায় এসব বস্তিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ কাজ করতো। ১৯২৬ সালে ব্রিটিশরা তৈরি করে বর্ণবাদী আইন 'কালার বার অ্যাক্ট'। ওই আইন অনুযায়ী কৃষ্ণাঙ্গরা দক্ষতা অর্জন করা যায় এমন কোন শিল্পকাজে যেতে পারতো না। পুরো জাতিকে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে রাখার জন্য এ আইন তৈরি হয়। ১৯২৭ সালে হয় ন্যাটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাক্ট। এই আইনের মাধ্যমে সমগ্র আফ্রিকান উপজাতিদের মূল নেতা বা সুপ্রিম চিফের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। তার বদলে ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে সব উপজাতির প্রধান করা হয়। সর্বশেষে ১৯৩৬ সালে রিপ্রেজেন্টেশন অব ন্যাটিভ অ্যাক্ট প্রণীত হয়। এর মাধ্যমে সর্বস্তরে আফ্রিকানদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। আমরা আমাদের ইয়ুথলীগের ইশতেহারে কড়াভাবে এসব আইনের বিরোধীতা করি।

কম্যুনিজম সম্পর্কে আমরা খুব সতর্ক ছিলাম। কম্যুনিজমের সংগে আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ গুলিয়ে না যায় সেজন্য আমরা যথেষ্ট সজাগ ছিলাম। আমাদের ইশতেহারে বলা হয়েছিল, "আমরা বিদেশী মতাদর্শ থেকে ভালো কিছু গ্রহণ করবো। তবে আফ্রিকায় বিদেশী মতবাদ মতাদর্শ সরাসরি আমদানী করে তা প্রচার করার প্রবণতাকে আমরা তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করি।" লেমবেডে ও আমিসহ অনেকেই কম্যুনিস্ট মতবাদকে আফ্রিকানদের জন্য উপযোগী বলে মনে করেনি। আফ্রিকায় কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গদের নেতৃত্ব মানতে গিয়ে আফ্রিকানরা স্বাভাবিকভাবেই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এ কারণেই আমরা চেয়েছি এমন একটি সংগঠন গড়তে যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে আফ্রিকানরা। তারা এর মাধ্যমে স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশ করবে।

ওইদিনই বেশ কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ইয়ুথ লীগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নির্ধারণই ছিল সে দিনকার বৈঠকের মূল বিষয়। সেখানে ঠিক হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এএনসিকে পুরোদমে সক্রিয় করাই হবে ইয়ূথলীগের মূল কাজ। যদিও এর সংগে আমি একমত ছিলাম; তারপরও এ উদ্দেশ্য কতটা সফল হবে সে সন্দেহ নিয়েই আমি লীগে যোগ দিলাম। ওই সময় আমি ফুলটাইম কাজ করি; পার্টটাইম পড়াশুনা করি। এ সবের বাইরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সময় দেওয়ার মতো সময় খুবই কম ছিল। এছাড়া ওয়াল্টার, লেমবেডে ও এমডার তুলনায় আমার রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাসও ছিল খুব কম। রাজনৈতিক জ্ঞান গরিমায় তারা আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। বক্তৃতা দিতে গেলে নার্ভাস হয়ে পড়তাম। আমার রাজনৈতিক জ্ঞানও ছিল কম। সে কারণে তখনও আমি নিজেকে রাজনীতির সংগে একশ ভাগ মেলাতে পারিনি।

যাই হোক, লেমবেডের আফ্রিকানিজম থিউরি যে দলের সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছিল তা মোটেও নয়। ইয়ূথলীগের অনেকেই লেমবেডের এই বর্ণবাদী মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল আফ্রিকানদের বাইরে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে যারা আফ্রিকানদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। তারা চাইছিলেন আফ্রিকানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ওই সব মানুষকেও এ লীগে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তবে আমি সহ অন্যরা তাদের এ প্রস্তাব মানলাম না। আমাদের যুক্তি ছিল যদি আফ্রিকানদের বাইরের লোক অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে তাদের উপস্থিতির কারণে আফ্রিকান সদস্যরা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে বিব্রত বোধ করবে। এ ছাড়া ওই সব শ্বেতাঙ্গ মিত্ররা স্বাভাবিকভাবেই নেতৃস্থানীয় পদ চাইবে এবং তাদের নেতা হিসেবে মানতে আফ্রিকান সদস্যদেরও অসুবিধা হবে না।

এর ফলে মূল নেতৃত্বের শক্তি থেকে আফ্রিকানরা বঞ্চিত হবে। এজন্য আমরা ইয়ূথলীগে কোন কম্যুনিস্ট অথবা শ্বেতাঙ্গকে ঢুকতে দিতে চাইলাম না।

ওয়াল্টারের বাড়ি আমার বাড়ি হয়ে উঠেছিল। ১৯৪০ সালের প্রথম কয়েক মাস আমার নিজস্ব ঠিকানা ছিল না। থাকার জায়গা ছিল না। এ সময় একটানা কয়েক মাস আমাকে ওয়াল্টারের বাসায় থাকতে হয়েছে। ওর বাসাটা সব সময় সহযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে গম গম করতো। চব্বিশ ঘণ্টা তার ঘরে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা চলতে থাকতো। ওয়াল্টারের স্ত্রী আলবর্তিনা খুব ধৈর্যশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি ওয়াল্টারের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। (তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে অ্যান্থন লেমবেডে রসিকতা করে বলেছিলেন, "আলবার্তিনা, তুমি কিন্তু একজন বিবাহিত লোককে বিয়ে করলে। তোমার আগে রাজনীতিকে ওয়াল্টার বউ বানিয়ে ফেলেছে)।

আমার প্রথম স্ত্রী ইভেলিন মেসির সংগে ওয়াল্টার সিসুলুর বাসার লাউঞ্জে প্রথম দেখা হয়। খুব শান্ত ও সুশ্রী ছিল মেয়েটা। ওয়াল্টারের বাসায় যারা আসা যাওয়া করতো তাদের চেয়ে একটু আলাদা ধরণের মেয়ে ছিল সে। শহরের বাইরে পল্লী এলাকা থেকে এখানে আসতো সে। আলবার্তিনা ও পিটার এমডার স্ত্রী রোজের সংগে জোহান্সবার্গের একটা অ-ইউরোপীয় জেনারেল হাসপাতালে নার্সের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল সে।

উমতাতা থেকে কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত ট্রান্সকেইর এনকোবো গ্রামে ছিল ইভেলিনের বাড়ি। তার বাবা ছিলেন একজন খনি শ্রমিক। শিশুকালেই সে তার বাবাকে হারায়। যখন তার বয়স মাত্র ১২ বছর তখন তার মা মারা যান। প্রাইমারি স্কুল শেষে জোহান্সবার্গের একটি হাইস্কুলে ইভেলিনকে ভর্তি করা হয়।

উত্তর উমতাতায় বড় ভাই স্যাম মেসির সংগে ইভেলিন থাকতো। ওয়াল্টারের মা ইভেলিনের খালা হতেন। সিসুলু তাকে মেয়ের মতো জানতেন। পুরো পরিবার ইভেলিনকে গভীর ভালোবাসার চোখে দেখতো।

প্রথম দেখার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা একে অন্যের প্রেমে পড়ে যাই। প্রেম প্রস্তাবটা অবশ্য আমিই দিয়েছিলাম। মাস কয়েকের মধ্যে আমি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেই। সে রাজি হয়ে যায়। জোহান্সবার্গের ন্যাটিভ কমিশনারের আদালতে একজন সাক্ষীকে নিয়ে আমরা বিয়ে করে ফেলি। সামাজিক বিয়েতে যে খরচাপাতি হয় তার সামর্থ্য না থাকায় এভাবে বিয়ে করতে হয়। কিন্তু বিয়ের পর কোথায় থাকবো তাই নিয়ে দুজনই চিন্তিত হয়ে পড়ি। বিয়ের পর আমরা প্রথমে ইভেলিনের বড় ভাইয়ের বাসায় আশ্রয় নেই। এরপর সেখান থেকে চলে আসি তার বোনের বাড়িতে। ইভেলিনের দুলাভাই একটা খনিতে কেরানীর চাকরি করতেন। সেখানেই অস্থায়ী বাস শুরু হয় আমাদের।

১২

১৯৪৬ সালে বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায় যা আমার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে নতুন মাত্রা যোগ করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাকে আরও বেশি জড়িয়ে ফেলে। ওই বছরই উপত্যকা অঞ্চলের ৭০ হাজার খনি শ্রমিক একযোগে ধর্মঘটের ডাক দেয়। এ ঘটনা আমাকে তুমুলভাবে নাড়া দেয়। ১৯৪০ সালের প্রথমার্ধে জে. বি. মার্কস, ড্যান ট্লুম, গাউর রাদেবে এবং এএনসির বেশ কিছু কর্মীর উদ্যোগে আফ্রিকান মাইন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (এএমডব্লিউইউ) গঠিত হয়েছিল। পাহাড়ে প্রায় ৪০ হাজার আফ্রিকান শ্রমিক তখন কাজ করতো যাদের দৈনিক মজুরি ২ শিলিংয়ের বেশি ছিল না। এএমডব্লিউইউ'র শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের একটি মজুরি কাঠামো তৈরির জন্য খনি মালিক সমিতির ওপর চাপ দিচ্ছিল। তাদের দাবি ছিল একজন শ্রমিককে আবাসন ও বেতনসহ ছুটির পাশাপাশি দৈনিক দশ শিলিং দিতে হবে। কিন্তু মালিক সমিতি তাদের এ দাবি উপেক্ষা করে আসছিল।

তাদের দাবি না মানায় এই প্রথমবারের মতো সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকরা সংহতি প্রকাশ করলো। তারা টানা এক সপ্তাহ কাজ বন্ধ করে ধর্মঘট চালিয়ে যেতে লাগলো। এ সময় সরকারের আচরণ ছিল হিংস্র। পুলিশ এসে শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার করলো। বিক্ষোভরত শ্রমিকদের পুরো কম্পাউন্ড ঘিরে ফেলা হল। এএমডব্লিউইউ'র অফিসে তল্লাশি চালানো হল। শ্রমিকদের একটি মিছিলে পুলিশ গুলি চালালো। তাতে ১২ শ্রমিক নিহত হল। এর প্রতিবাদে ন্যাটিভ রিপ্রেজেন্টেটিভ কাউন্সিল স্থগিত করা হল। বিক্ষোভকারী বহু শ্রমিক আমার পূর্ব পরিচিত ছিল। আমি বিক্ষোভের সময় তাদের জমায়েতে প্রতিদিন হাজির হতাম এবং তাদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করতাম।

কম্যুনিস্ট পার্টি ও এএনসির দীর্ঘদিনের সদস্য জে. বি. মার্কস ছিলেন এএমডব্লিউইউ'র প্রেসিডেন্ট। ট্রান্সভালের মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে জন্ম নেওয়া মার্কসের ছিল অসাধারণ সেন্স অব হিউমার। তিনি দ্রুত সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন। দীর্ঘদেহী ও শ্যামবর্ণের মানুষ ছিলেন মার্কস। ধর্মঘটের সময় আমি বেশ কয়েকবার তার সংগে এক খনি থেকে অন্য খনিতে পরিদর্শনে গিয়েছি। শ্রমিকদের সংগে কথা বলেছি, ধর্মঘটের পরিকল্পনা বিষয়ে মতামত দিয়েছি।

কিন্তু যৌথ আন্দোলনে নামার এ চুক্তি সবার সমস্যা সমাধানে খুব একটা কার্যকরী হল না। আফ্রিকায় একেকটি জাতীয় গ্রুপের সমস্যা একেক রকম। একজনের জন্য যা সমস্যা অন্যজনের ক্ষেত্রে তা তেমন একটা ক্ষতির কারণ নয়। যেমন পাশ সিস্টেম। অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাওয়ার জন্য যে

ছাড়পত্রের পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল তা ইন্ডিয়ান অথবা মিশ্রবর্ণের লোকদের জন্য তেমন কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু আফ্রিকানদের জন্য তা ছিল ভয়ঙ্কর সমস্যার কারণ।

আবার ভূমি বিষয়ক যে ঘেট্টো অ্যাক্ট অনুমোদন করা হয়েছিল তা আফ্রিকানদের জন্য সমস্যা তৈরি করেনি। এ আইনের মাধ্যমে ভারতীয়দের আফ্রিকায় ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা হয়েছিল। আবার মিশ্রবর্ণের লোকজনের প্রধান সমস্যা ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তিকরণ ও কর্মসংস্থানের নিয়ন্ত্রণ। এটি তাদের জন্য যতটা ক্ষতিকর ছিল ভারতীয় ও আফ্রিকানদের জন্য ততটা নেতিবাচক ছিল না। ফলে যৌথ আন্দোলনের এই ধারণা দৃশ্যত খুব একটা কার্যকর ভূমিকা রাখেনি।

তবে একটি কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে এই তিন ডক্টরের যৌথ আন্দোলনের পরিকল্পনা ভবিষ্যতে আফ্রিকান, ভারতীয় ও মিশ্রবর্ণের মানুষকে এক ছাতার তলায় দাঁড়ানোর ভিত্তি রচনা করেছিল। যেহেতু এই তিনটি গ্রুপই একে অন্যের স্বাধীনতা ও মুক্তির বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল ছিল এ কারণেই স্বাধীনতা ইস্যুতে তাদের মনোভাব অভিন্ন ছিল। তারা যৌথভাবে একের পর এক সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করে যা সবাইকে স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করে তোলে। সম্মিলিত প্রথম আন্দোলনটি হয় সবার জন্য ভোটাধিকার দাবি করে। এ দাবির আওতায় কৃষ্ণাঙ্গসহ সমস্ত আফ্রিকাবাসীর ভোটের অধিকার চাওয়া হয়। এএনসি এক সংবাদ সম্মেলনের ডাক দেয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করি আমি এবং ড. জুমা আন্দোলনে এএনসির সমর্থনের ঘোষণা দেন। আমাদের পক্ষ থেকে যখন ওই আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয় তখন আমরা ভেবেছিলাম আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে এএনসি। যখন শুনলাম এতে এএনসি নেতৃত্ব দিতে পারবে না তখন ট্রান্সভাল এক্সিকিউটিভ কমিটির মাধ্যমে আমরা এএনসিকে সমর্থন প্রত্যাহারের আহবান জানালাম। আমার ব্যক্তিগত অভিমত ছিল এএনসি শুধুমাত্র নেতৃত্বে থাকলেই আন্দোলনে অংশ নেবে; অন্যথায় নয়। সরকার বিরোধী প্রচারণা কতটুকু সফল হবে না হবে তার চেয়ে এএনসি কতটুকু অর্জন করতে পারলো কতটুকু পারলো না সেটাই আমার কাছে বড় বিষয় ছিল।

সমর্থন প্রত্যাহার সত্ত্বেও এএনসির ট্রান্সভালের আঞ্চলিক সভাপতি রামোহানোয় একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন। বিজ্ঞপ্তিতে তিনি ট্রান্সভাল এক্সিকিউটিভ কমিটির সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে একক সিদ্ধান্তে আফ্রিকানদের ওই আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তার এ বিবৃতি নির্বাহী কমিটির সবাইকে আহত করে। কমিটির সবাই তার এ সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধীতা করে। তারা রামোহানোয়র এ বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলনের ঘোষণা দেন এবং আমাকে রামোহানোয়র বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার জন্য চাপ দেন। এর ফলে আমি উভয় সংকটে পড়লাম। একদিকে দায়িত্ব অন্যদিকে রামোহানোয়র প্রতি আমার সীমাহীন আনুগত্য। একদিকে সাংগঠনিক আদর্শ অন্যদিকে আপন

মানুষটির প্রতি ভালোবাসার টান। আমি ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম যে মানুষটির বিরুদ্ধে অনাস্থা দেওয়ার জন্য আমার সহযোদ্ধারা আমাকে চাপ দিচ্ছে দলের প্রতি তার কমিটমেন্ট ও আন্তরিকতা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি ভালো করেই জানতাম স্বাধীনতা সংগ্রামে তার যে ত্যাগ রয়েছে তার তুলনায় আমি অত্যন্ত নগণ্য। আমি জানতাম তিনি যা করেছেন তা এক মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আফ্রিকায় বসবাসরত নির্বাসিত ভারতীয় ভাইদের পাশে এসে দাঁড়ানো আফ্রিকানদের কর্তব্য।

কিন্তু রামোহানোয়'র 'অবাধ্যতা' সবাই খুবই গুরুত্বের সংগে নিয়েছিল। এএনসি দলবদ্ধ ব্যক্তির সংগঠন। তাই ব্যক্তির একক সিদ্ধান্তে দল পরিচালিত হতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করতাম দলের চেয়ে ব্যক্তি বড় নয়। ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে দলকে উপেক্ষা করা যাবে না। এ চিন্তা থেকে শেষ পর্যন্ত আমি তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করে তার বিবৃতির বিরোধীতা করতে রাজি হলাম। আমার নিন্দাসূচক বিবৃতির পর দলের মধ্যে তোলপাড় শুরু হল। পার্টি হাউজের মিটিংয়ে নেতাকর্মীরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে তুমুল বাকযুদ্ধে নামলেন। একদল সভাপতি রামোহানোয়র পক্ষে আরেকদল আমার পক্ষে। দু'পক্ষের ঝগড়াঝাটিতে সেদিন পুরো মিটিংটাই পণ্ড হয়ে গেল।

শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক একতা ও সংহতি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। হিংস্র কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে নেতাদের অসামান্য ক্ষমতা দেখে আমি তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম।

কিন্তু এত বিক্ষোভের পরও শ্রমিকরা সফল হতে পারলো না। সরকার জয়ী হলো। ধর্মঘট বানচাল করে শ্রমিক ইউনিয়ন ভেঙে দেওয়া হল। এ ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই মার্কসের সংগে আমার ঘনিষ্ঠতার শুরু। আমি প্রায়ই তার বাসায় যেতাম। কম্যুনিজম সম্পর্কে আমার যে নেতিবাচক ধারণা ছিল তা নিয়ে তার সংগে আলাপ করতাম। মার্কস কম্যুনিস্ট পার্টির একজন কট্টর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমার কম্যুনিস্টবিরোধী কথাবার্তায় রেগে যেতেন না। তিনি আমার অভিযোগগুলোকে আমার ব্যক্তিগত মতামত হিসেবে দেখতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন বেশিরভাগ তরুণই এখন জাতীয়তাবাদকে স্বাগত জানাচ্ছে। তবে বয়স এবং অভিজ্ঞতা বাড়লে আমার দৃষ্টিভঙ্গিও প্রসারিত হবে। মার্কসের মতো আরও দুজন লোকের সংগে আমি কম্যুনিজমের বিরোধীতা করে তর্ক করতাম। এদের একজন হলেন মোসেস কোটানি, আরেকজন ইউসুফ দাদু। মার্কসের মতো এ দুজন বিশ্বাস করতেন আফ্রিকানদের অধিকার আদায়ে প্রত্যেক তরুণকে কম্যুনিজম গ্রহণ করতে হবে। এএনসির দলভুক্ত অন্যান্য কম্যুনিস্ট সদস্য আমাকে এবং ইয়ূথলীগের সদস্যদের ভর্ৎসনা করলেও এই তিনজন লোক কখনো তা করতেন না।

ধর্মঘট বানচালের পর কোটানি এবং মার্কসসহ ৫২ জন কম্যুনিস্ট নেতাকে ওই সময় গ্রেফতার করা হয়। শুধু গ্রেফতার নয় তাদের বিচারের কাঠগড়ায়ও দাঁড়

করানো হয়। তাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক অসন্তোষ উস্‌কে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়। এটা ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচার। এর মাধ্যমে সরকার বোঝাতে চাইছিল যে তারা কম্যুনিস্টদের কোনভাবেই ছাড় দেবে না।

ওই বছরই আরেকটি ঘটনা আমাকে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে বাধ্য করেছিল। ১৯৪৬ সালে স্মুটস সরকার এশিয়াটিক ল্যান্ড টেনিউর অ্যাক্ট নামে একটি ভূমি আইন পাশ করে। ওই আইনে ইন্ডিয়ানদের চলাচলের ওপর ব্যাপক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। আইনে বলা হয় ভারতীয়রা এখানে বসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে কিন্তু ভূ-সম্পত্তি কিনতে পারবে না। এর বিনিময়ে পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধি রাখা হবে। সেসময় ট্রান্সভাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ইউসুফ দাদু। তিনি এ আইনের ঘোর বিরোধীতা করেন এবং পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বদানের সরকারি অফারকে তিনি উৎপীড়ক-শোষক সরকারের অপমানজনক প্রস্তাব বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন। 'ঘেট্টো আইন' বলে পরিচিত এই কালো আইন ভারতীয়দের জন্য সত্যিই অপমানজনক ছিল। এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের বর্ণবাদী মনোভাবের নগ্নপ্রকাশ ঘটেছিল। ভারতীয়রা এ আইনের বিরোধীতা করে প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং দুই বছরের সুদীর্ঘ বিক্ষোভ কর্মসূচী ঘোষণা করে। ড. দাদু এবং নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের (এনআইসি) সভাপতি ড. জি. এম. নাইকারের নেতৃত্বে ভারতীয়রা গণবিক্ষোভের ডাক দেয়। তাদের সাংগঠনিক নিষ্ঠা ও নিবেদিতপ্রাণ মানসিকতা আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। গৃহবধু, পুরুষ, চিকিৎসক, উকিল, ব্যবসায়ী, ছাত্র-মজুর সবাই রাস্তায় মিছিল দিতে বেরিয়ে পড়ে। টানা দুই বছর তারা খেয়ে না খেয়ে আন্দোলন চালিয়েছে। ধর্মঘট করেছে। সাদাদের মালিকানাভুক্ত জমি বিক্ষোভকারীরা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সেখানে তারা অবস্থান নিয়েছে। এ সময় ২ হাজারের বেশি বিক্ষোভকারীকে ধরে জেলে ঢোকানো হয়। ড. দাদু এবং ড. নাইকারকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এ আন্দোলন শুধু ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তারা অন্যান্য গোষ্ঠীকে এ আন্দোলনে যুক্ত করার চেষ্টা করেনি। কিন্তু তারপরও স্বপ্রোণোদিত হয়ে ড. জুমা ও অন্যান্য আফ্রিকান নেতা তাদের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এবং ভারতীয়দের আন্দোলনে নিজেদের নৈতিক সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন। সরকার তাদের বিক্ষোভ দমনের জন্য চরম উৎপীড়ন শুরু করে। কিন্তু এএনসি ও ইয়ুথলীগ অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে যে তারা এতদিন যে আন্দোলন সংগ্রাম করতে পারেনি ভারতীয়রা তাই করে দেখাচ্ছে। তাদের প্রতিরোধ ও নিবেদিতপ্রাণ আন্দোলনে সরকার দিশেহারা হয়ে পড়ছিল। আফ্রিকান নেতারা তাদের সেই আত্মত্যাগ দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন।

ইসমাইল মীর এবং জে. এন. সিং পড়াশুনা বাদ দিয়ে পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বেচ্ছায় জেলে গেলেন। হাই স্কুলের ছাত্র আহমেদ কাদারদাও একই কাজ করলো। আমিনা ফাহাদের বাড়িতে আমি প্রায়ই নাস্তা খাওয়ার

লোভে যেতাম। ভদ্রমহিলা কিছুটা পর্দানশীল ছিলেন। স্বজাতির এই বিপদের দিনে তিনিও বোরখা সরিয়ে বাইরে নেমে এলেন। নিজের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তিনিও স্বেচ্ছায় কারাবরণ করলেন। তারা এত ত্যাগের প্রেরণা কীভাবে অর্জন করলো? এই প্রশ্নটা আমার মাথায় সারাক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু আমি তাদের সে প্রশ্ন করার সাহসও পাইনি।

ভারতীয়দের এই বিক্ষোভ ইয়ুথলীগের জন্য একটা মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা সমগ্র আফ্রিকানদের বিক্ষোভের আসল ভাষা শিখিয়েছিল। জেল জুলুমের ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছিল। এ বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে এনআইসি এবং টিআইসি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ভারতীয়রাই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে শুধুমাত্র বক্তৃতা-বিবৃতি, সমাবেশ, রেজুলেশন পাশ করা আর প্রতিবাদলিপি পাঠানোর নাম স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়। সংগ্রামের প্রয়োজন গণজোয়ার সৃষ্টি করা, জঙ্গি তৎপরতা চালানো এবং সর্বোপরি চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকারের ইচ্ছা থাকতে হবে। ১৯১৩ সালে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের এই মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সে বছর তার নেতৃত্বে ভারতীয়দের একটি বিক্ষোভ মিছিল আইন ভেঙে নাতাল থেকে ট্রান্সভালে গিয়েছিল। এটা ছিল এক মহান ইতিহাস।

১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব অরল্যান্ডোতে আমি আর ইভেলিন দুই রুমের একটা ছোট্ট মিউনিসিপ্যাল হাউস ভাড়া করে বসবাস শুরু করি। অবশ্য কিছু দিন পরে পশ্চিম অরল্যান্ডোতে অপেক্ষাকৃত একটু বড় একটা বাসায় চলে যাই। ওই বাসার নম্বর ছিল ৮১১৫। বাক্সের মতো বিল্ডিং ঘেরা অরল্যান্ডো ছিল ধুলোময় এক শহর। এ এলাকা পরে বৃহত্তর সোয়েটোর অন্তর্ভুক্ত হয়। আমাদের বাসাটা যে মহল্লায় ছিল তার নাম ছিল ওয়েস্টক্লিফ। উত্তরাঞ্চলের উপকণ্ঠের সীমান্ত এলাকা ছিল ওয়েস্টক্লিফ।

পশ্চিম অরল্যান্ডোর বাসায় মাসে ভাড়া দিতে হতো ১৭ শিলিংয়ের কিছু বেশি। নোংরা রাস্তার পাশের এসব ঘর আমার মতো শত শত লোকের মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সব ঘরের চেহারাই প্রায় একরকম। মেঝে পাকা, চারপাশে ইটের দেয়াল, মাথায় টিনের ছাদ। ঘরের মধ্যে ছোট একটা রান্নাঘর। পেছনের দিকটায় আরও অপরিচ্ছন্ন একটা টয়লেট। বাড়ির সামনে রাস্তায় বৈদ্যুতিক বাতি ছিল। কিন্তু ঘরে বিদ্যুত না থাকায় আমরা প্যারাফিনের আলো জ্বালাতাম। শোবার ঘরটা এত ছোট ছিল যে একটা ডাবল বেড পাতলে রুমে আর জায়গা থাকতো না। শহরের কাজকর্ম করতে শ্রমিকদের দরকার হয়। তাদের যাতে সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় সেজন্য সরকার নিজের প্রয়োজনে শ্রমিকদের জন্য এসব ঘর তৈরি করে দিয়েছিল।

চোখের এক ঘেয়েমি কাটাতে কেউ কেউ বাড়ির সামনে শাক সবজীর বাগান করতো; কেউবা দরজায় রং বেরংয়ের ছবি একে রাখতো। জীবনমান ভালো না হলেও এ বাড়ি আমার খুব ভালো লেগেছিল। কারণ এটাই ছিল আমার প্রথম একান্ত নিজের বাড়ি। এজন্য আমি ভেতরে ভেতরে বেশ গর্বও অনুভব করতাম।

নিজের বাড়ি না হওয়া পর্যন্ত একজন পুরুষ মানুষ পূর্ণাঙ্গ পুরুষ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। তবে এ বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় আমি বুঝতে পারিনি এটাই হবে আমার বহু বহু বছরের ব্যক্তিগত আবাসস্থল।

ইভেলিন আর আমাকে সরকার প্রথমে এ বাড়িটার বরাদ্দ দেয়। সাধারণ ভাড়াটের মতো থাকতে হতো আমাদের। আমাদের প্রথম সন্তান মাদিবা থেমবেকাইল জন্ম নেওয়ার পর বাড়িটা সরকার আমাদের লীজ দেয়। আমার গোত্র নাম ছিল মাদিবা। ওই নামটাই তাকে দেওয়া হয়। তবে সে নামে তাকে ডাকা হতো না। ওর ডাক নাম ছিল থেম্বি। ছোটবেলায় ও খুব শান্তশিষ্ট ছিল। সবাই বলতো বাবার চেয়ে মায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বেশি পেয়েছে। ছেলেকে সুন্দরভাবে পরিচর্যার সামর্থ্য না থাকলেও পুত্রলাভে আমি বেশ খুশি হয়েছিলাম।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত আমার একটা ব্যক্তিগত মাথা গোঁজার ঠাই হলো। এতদিন বউকে নিয়ে এর বাড়ি দুদিন, তার বাড়ি চার দিন মেহমান হিসেবে থেকেছি। কিন্তু এখন যাহোক একটা দাঁড়াবার জায়গা হলো। আমাদের সংসারে ছোটবোনকে নিয়ে আসলাম। ওকে অরল্যান্ডো হাই স্কুলে ভর্তি করলাম। আমাদের উপজাতিয় সংস্কৃতি অনুযায়ী যে কেউ তার পরিবারের অন্য সদস্যের বাড়িতে নির্দ্বিধায় বেড়াতে আসতে পারে। যদ্দিন ইচ্ছে থাকতে পারে। এতে কেউ কিছু মনে করে না। আমার বাবার চার বিয়ে এবং সব মায়ের গর্ভেই তিন চারজন করে আমার ভাইবোন ছিল। ফলে নতুন বাসায় ওঠার পর প্রতিদিনই অসংখ্য অতিথি আসতো।

বাড়িতে খুব বেশি সময় দিতে না পারলেও গার্হস্থ্য পরিবেশ আমি খুব উপভোগ করতাম। থেম্বির সাথে খেলা করা, তাকে খাওয়ানো, গোসল করানো এবং গল্প বলতে বলতে ঘুম পাড়ানোর কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগতো। আসলে ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের সংগে খেলা করা এবং তাদের সংগে গল্প করা আমার প্রিয় বিষয় ছিল। হয়তো সে কারণেই আমি শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। বাড়িতে যতক্ষণ থাকতাম ততক্ষণ বাচ্চার সংগে সময় কাটানোর পাশাপাশি নিরিবিলি বই পড়তাম। মাঝে মাঝে অলসভাবে শুয়ে থাকতাম। কখনও কখনও খাবারের গন্ধ পেয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়তাম। কড়াইতে জ্বাল হতে থাকা গরম খাবার তুলে মুখে পুরতাম। কিন্তু এমন প্রশান্ত গার্হস্থ্য বিনোদন উপভোগের সুযোগ পেতাম খুবই কম। জীবিকার ধান্দা আর রাজনীতি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে করতেই দিনের বেশিরভাগ সময় পার হয়ে যেতো।

যে সময়ের কথা বলছি, ওই বছরের শেষ দিকে রেভারেন্ড মাইকেল স্কট কিছুদিন থাকার জন্য আমাদের বাসায় এলেন। স্কট খুব উদারপন্থি অ্যাংলিকান খ্রিস্টান ছিলেন। আফ্রিকানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি দীর্ঘদিন কাজ

করেছেন। শ্বেতাঙ্গ হয়েও তিনি সহজভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের সংগে ওঠাবসা করতেন। কোমো নামে এক স্থানীয় আফ্রিকান নেতা তাকে এ এলাকায় এনেছিলেন। জোহান্সবার্গের বাইরে কোমে উপজাতিয়দের নিয়ে একটা স্কোয়াটার ক্যাম্প গড়ে তুলেছিলেন। সরকার সেখান থেকে লোকজনকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। কোমো সরকারের ওই উচ্ছেদ প্রচেষ্টার বিরোধীতা করার জন্য স্কটের সহযোগিতা চেয়েছিলেন।

স্কট বললেন, 'তোমাদের সাহায্য করতে যদি আমি যাই, তাহলে আমাকে তোমাদের একজন হয়েই যেতে হবে।' অর্থাৎ তিনি এসে ওই ক্যাম্পে বসবাস করতে চাইলেন। কোমো সানন্দে রাজি হলেন। কথামতো স্কট স্কোয়াটার ক্যাম্পে বসবাস শুরু করলেন। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধের পর উদ্বাস্তুরা স্কটের নেতৃত্বে তখন এ এলাকার পাহাড়ি ঢালে বসতি শুরু করে। প্রতি রোববার ছুটির দিন আমি আমার শিশুপুত্র থেম্বিকে নিয়ে ওই পাহাড়ি এলাকায় যেতাম। টিলার ফাঁক ফোকরে লুকিয়ে আমার সংগে লুকোচুরি খেলা তার খুব পছন্দের ছিল। স্কট তার লোকজন নিয়ে সেখানে বসতি গাড়ার পর খেয়াল করলেন উচ্ছেদ বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার নামে কোমো গরিব লোকজনের কাছ থেকে চাঁদা তুলে তা মেরে দিচ্ছেন। স্কট কোমোর এই কাজে বাধা দিলেন। এর ফলে কোমো তাকে ক্যাম্প থেকে বের করে দিলেন এবং মেরে ফেলার হুমকি দিলেন।

বাধ্য হয়ে স্কট আমার বাসায় এসে আশ্রয় নিলেন। সংগে আনলেন দ্লামিনি নামে এক আফ্রিকান পাদ্রীকে। দ্লামিনিও একা এলেন না। তার সংগে বৌ ছেলেপুলে ছিল। এতগুলো মানুষ থাকার মতো বড় ঘর আমার ছিল না। তবু কষ্টেসৃষ্টে ম্যানেজ করতে হল। স্কটকে বসার ঘরে ঘুমাতে দেওয়া হলো। দ্লামিনি এবং তার বৌকে অন্য একটা রুম দেওয়া হল। বাকি রুমটায় ছিলাম আমি আর ইভেলিন। আমাদের এবং দ্লামিনির বাচ্চা-কাচ্চাদের রান্নাঘরে ঘুমানোর ব্যবস্থা হল।

মাইকেল স্কট খুব মার্জিত ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কিন্তু দ্লামিনির কথাবার্তা-আচার আচরণ কিছুটা বিরক্তিকর ছিল। খাওয়ার সময় তিনি প্রায়ই নানা ধরণের অভিযোগ করতেন। রান্নার খুঁত ধরতেন। আমরা সবাই যখন খাচ্ছি, তিনি হয়তো হঠাৎই বলে ফেলতেন, 'এই দ্যাখেন মাংসের অবস্থা! শুকনো আর শক্ত। এসব খাবার খাওয়া যায়? আমি এরকম রান্না কোনদিন খাইনি।' দ্লামিনির এমন আচরণে স্কট লজ্জা পেতেন। তিনি দ্লামিনিকে একটু সভ্য-ভব্য হওয়ার জন্য বলতেন। কিন্তু তিনি মোটেও সেসব কেয়ার করতেন না। ওইদিনের পরের দিনই তিনি খাবার টেবিলে বললেন, 'হ্যা, গতকালের চেয়ে আজকের খাবার কিছুটা খাওয়ার উপযোগী হয়েছে। তবে খুব ভালো হয়নি। ম্যান্ডেলা! যাই বলুন রান্নায় কিন্তু আপনার স্ত্রীর হাত মোটেও ভালো না।'

ধীরে ধীরে দ্রামিনির উৎপাত এমন পর্যায়ে এলো যে আমি মহাবিরক্ত হয়ে উঠলাম। তাকে বিদায় করার জন্য আমাকে স্বপ্রণোদিত হয়ে স্কোয়াটার ক্যাম্পে যেতে হল। আমি সেখানে গিয়ে উদ্বাস্তুদের বোঝালাম যে তাদের প্রকৃত বন্ধু আসলে স্কট, কোমো নয়। কোমো তাদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে আত্মসাত করেছে এবং স্কট তাতে বাধা দিয়েছেন। এখন কাকে নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া ঠিক হবে তা তাদেরই ঠিক করতে হবে। আমার বক্তব্যে কাজ হলো। তারা নিজেদের মধ্যে ভোটাভুটি করে স্কটকেই নেতা নির্বাচিত করলো। স্কট আবার ক্যাম্পে ফিরে গেলেন। সংগে নিয়ে গেলেন দ্রামিনি আর তার পরিবারকে। আমি হাঁফ ছেড়ে বাচলাম।

১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে আমার তিন বছরের শিক্ষানবীশকাল শেষ হয়। আমি উইটকিন, সাইডলস্কি অ্যান্ড ইডলম্যান ফার্ম থেকে বেরিয়ে আসি। এলএলবি পাশ করার জন্য পার্টটাইম স্টুডেন্টশীপ বাতিল করে আমি ফুলটাইম স্টুডেন্ট হিসেবে ভর্তি হই যাতে তাড়াতাড়ি অ্যাটর্নি হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করতে পারি। কিন্তু রুটি রুজির চিন্তা মাথায় ভর করে। ল ফার্মে কাজ করে আমার মাসে আয় হতো ৮ ডলার ১০ শিলিং। এই অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মহাবিপদে পড়লাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি, পাঠ্যবই কেনা এবং মাসিক হাতখরচ বাবদ আমি জোহান্সবার্গের সাউথ আফ্রিকান ইন্সটিটিউট অব রেস রিলেশন্সের বান্টু ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কাছে আড়াইশ পাউন্ড স্টার্লিং ধার চেয়ে আবেদন করলাম। ট্রাস্ট আমাকে এত অর্থ দিল না। আমাকে দেওয়া হল মাত্র দেড়শ পাউন্ড স্টার্লিং।

তিন মাস বাদে আবার আমাকে সেখানে ধার চেয়ে আবেদন করতে হল। ইভেলিন নার্সের চাকরি করে যা আয় করতো বিনা বেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি নেওয়ায় তাও বন্ধ হয়ে গেল। সে মাসে প্রায় ১৭ পাউন্ড বেতন পেতো। যাইহোক অতিরিক্ত লোনের আবেদন মঞ্জুর হল। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। স্বস্তি পেলাম না।

ওই সময় ইভেলিনের কোলে আমাদের দ্বিতীয় সন্তান এবং প্রথম কন্যা মাকাজিউ'র জন্ম হয়। জন্মের সময় কোনরকম জটিলতা হয়নি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার শরীর শুকিয়ে আসতে লাগলো। রাতদিন সে চিৎকার করে কান্নাকাটি করতো। আমি-ইভেলিন কেউ রাতে ঘুমাতে পারতাম না। ডাক্তার দেখানো হল। কেউ তার রোগ ধরতে পারছিল না। ক্রমেই তার শরীর কুকড়ে আসছিল। ইভেলিন পরম ধৈর্য নিয়ে রাতদিন পাশে থেকে তার সেবা করছিল। মায়ের মমতা আর পেশাদার নার্সের যত্নও শেষ পর্যন্ত কাজে আসলো না। নয়

মাস বয়সে মাকাজিউ আমাদের ছেড়ে চলে গেল। ইভেলিন তার মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছিল। তাকে তখন সান্ত্বনা দেবার ভাষাও আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

রাজনীতিতে সবকিছু পূর্ব পরিকল্পনামাফিক চলে না। পরিবেশ পরিস্থিতিই বলে দেয় কখন কী করতে হবে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ইয়ূথলীগ নিয়ে লেমবেডের সংগে একদিন আনুষ্ঠানিক আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ তিনি আমাকে বললেন যে তার পেটে খুব ব্যথা করছে। ব্যথা আরও বাড়লে আমরা তাকে দ্রুত কোরোনেশন হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। কিন্তু তিনি টিকলেন না। ওই রাতেই মাত্র ৩৩ বছর বয়সে লেমবেডে মারা গেলেন। তার মৃত্যুতে বহু মানুষ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। তার মৃত্যুতে ওয়াল্টার সিসুলু শোকে পাথর হয়ে গেলেন। তার হঠাৎ চলে যাওয়ায় আন্দোলনও পিছিয়ে পড়েছিল। লেমবেডের অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল। তিনি দ্রুত মানুষকে আপন করে নিতে পারতেন।

লেমবেডের মৃত্যুর পর পিটার এমডাকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এমডাও একজন বিচক্ষণ নেতা ছিলেন। তার সহজ ও সাবলীল জীবনাচরণ এবং অসাধারণ প্রজ্ঞার কারণে তিনি পরবর্তীতে ইয়ূথলীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা হয়ে উঠেছিলেন। এমডার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তার বিনয়। তিনি কখনই নিজেকে জাহির করতেন না। অতিরিক্ত কথা বলতেন না। বিভিন্ন বিষয়ে তার উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিগত বিচক্ষণতা তাকে লেমবেডের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় করে তুলেছিল। লেমবেডে যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করতেন এমডা সাবলীলভাবে সেগুলোকে পরিচালনা করতে পারতেন।

এমডা বিশ্বাস করতেন দলের অভ্যন্তরিণ চাপ প্রয়োগকারী গ্রুপ হিসেবে ইয়ূথলীগের কাজ করা উচিত। তিনি এ লীগকে এএনসির সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী শাখা হিসেবে বিবেচনা করতেন। দল যখন নিস্পৃহ হয়ে পড়বে তখন ইয়ূথলীগ প্রপেলারের মতো পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে সামনে এগিয়ে নেবে। ওই সময় এএনসির সাংগঠনিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। দলীয় অফিসে একজনও বেতনভুক্ত সার্বক্ষণিক কর্মচারি ছিল না। পার্টি অফিসে লোকজন নিয়মিত আসতো না। সব মিলিয়ে দলের মধ্যে একটা জগাখিচুড়ি অবস্থা চলছিল তখন (পরবর্তীতে এএনসির প্রথম ফুলটাইম মেম্বার হিসেবে ওয়াল্টারকে নিয়োগ করা হয়। তাকে মোটা বেতনের বিনিময়ে সার্বক্ষণিক দলীয় কর্মচারি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।)

এমডা দায়িত্ব নেওয়ার পর জে. কে. ম্যাথিউস এবং গডফ্রে পিৎজের তত্ত্বাবধানে ফোর্ট হেয়ারে ইয়ূথলীগের একটি শাখা গঠন করেন। এরা ছিলেন নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক। এই দুজন সেখানে অসংখ্য ছাত্রকে দলে আনতে সক্ষম হন। এদের সবাই ছিল বয়সে একেবারে তরুণ এবং নতুন আইডিয়াসম্পন্ন শিক্ষার্থী। সংগঠনে যোগ দেওয়া নতুন সদস্যদের মধ্যে দুজন তরুণ ছিলেন খুব সম্ভাবনাময় নেতা। এদের একজন হলেন প্রফেসর ম্যাথিউসের ছেলে জো., আরেকজন হলেন তারই বন্ধু রবার্ট সোবুকবি। সোবুকবি ছিলেন অসাধারণ বক্তা। বক্তৃতা দিয়ে তিনি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলতেন।

জাতীয়তাবাদ ইস্যুতেও এমডা লেমবেডের চেয়ে উদারপন্থি ও আধুনিক ছিলেন। ইয়ূথলীগের সাংগঠনিক বলয়ে আফ্রিকানদের বাইরে অন্য কাউকেই লেমবেডে আসতে দিতেন না। কিন্তু এমডা তার মত কট্টর ছিলেন না। সংগঠনের অন্য সবার মতো তিনিও শ্বেতাঙ্গদের দৌরাত্ম ও নির্যাতনকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু একচেটিয়াভাবে শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণার চোখে দেখতেন না। লেমবেডে ও আমার মতো এমডা তীব্র কম্যুনিস্ট বিরোধীও ছিলেন না। ইয়ূথলীগারদের মধ্যে যারা শ্বেতাঙ্গ বামপন্থিদের সব সময় সন্দেহের চোখে দেখতো আমি ছিলাম তাদের মধ্যে অন্যতম। এমনকি আমার নিজের অনেক শ্বেতাঙ্গ বামপন্থি বন্ধু থাকা সত্ত্বেও এএনসিতে শ্বেতাঙ্গদের প্রাধান্য বিস্তৃত হোক তা আমি কখনও চাইনি। একারণে কম্যুনিস্ট পার্টির সংগে এএনসির যৌথভাবে আন্দোলনে যাওয়ার প্রস্তাবে আমি তীব্র বিরোধীতা করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল কম্যুনিস্টরা যৌথ আন্দোলনের কথা বলে আমাদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করবে। আমি বিশ্বাস করতাম একমাত্র নির্জলা আফ্রিকান জাতীয়তাবাদই আমাদের মুক্ত করতে সক্ষম; মার্কসবাদ অথবা মাল্টি-রেসিয়ালিজম নয়। কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে আমার বীতশ্রদ্ধা এতটাই প্রবল ছিল যে বহুবার আমি ইয়ূথলীগের অন্য সদস্যদের নিয়ে তাদের পথসভা জনসভা বানচাল করে দিয়েছি। তাদের মঞ্চ ভেঙেছি, মাইক্রোফোন ভেঙে ফেলেছি এমনকি তাদের অনেক কর্মীকে পিটিয়েছি। ডিসেম্বরে এএনসির বার্ষিক সম্মেলনে ইয়ূথলীগের পক্ষ থেকে কম্যুনিস্ট বিরোধী একটি দাবি তোলা হয়। দাবিতে বলা হয়, এএনসিতে কম্যুনিস্ট পার্টির যেসব সদস্য আছে তাদের সবাইকে বহিস্কার করতে হবে। কিন্তু অধিবেশনের ভোটে আমরা হেরে যাই। ১৯৪৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা ভূমি আইনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছিল তাতে যোগ দিয়েছিল কম্যুনিস্টরা। শেষে দেখা গেল মূল আন্দোলনকারীদের ওপর তারাই প্রভাব বিস্তার করে বসে আছে। তারাই ইন্ডিয়ানদের আদেশ নির্দেশ করছে। কম্যুনিস্টরা যেহেতু উচ্চশিক্ষিত ও

রাজনীতিতে অভিজ্ঞ সে কারণে তারা সহজেই প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলতো। ঠিক এই কারণে আমরা এএনসি থেকে কম্যুনিস্টদের বের করে দিতে চাইছিলাম।

১৯৭৪ সালে এএনসির ট্রান্সভাল শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য হই। গোটা ট্রান্সভালের আঞ্চলিক কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সি.এস. রামোহানোয়। তার অধীনেই আমি দায়িত্ব পালন শুরু করি। এই প্রথমবার আমাকে এএনসির কোন সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হল এবং এর মাধ্যমেই সংগঠনের প্রতি আমার কমিটমেন্টের একটি মাইল সূচিত হয়। এর আগে দলের প্রতি আমার আনুগত্য ও ত্যাগ আমাকে ছুটির দিনে পরিবারকে সময় দেওয়া ও সন্ধ্যার আগে বাসায় ফেরা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। আগে আমি দলের মিটিং সমাবেশে উপস্থিত থাকলেও বড় ধরণের দলীয় প্রচার প্রোপাগান্ডায় নিজেকে নিবিড়ভাবে জড়াইনি। এমন কি স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযোদ্ধা হয়ে সারাজীবনের জন্য অনিশ্চয়তা ডেকে আনার কী মাহাত্ম্য তাও তখন আমার বোধগম্য ছিল না। কিন্তু ট্রান্সভালের নির্বাহী কমিটির সদস্য হওয়ার পর দৃশ্যপট দ্রুত বদলে গেল। কমিটিতে ঢোকার পর সমগ্র কংগ্রেসের কাছে, দলের সাফল্য-ব্যর্থতার কাছে দায়বদ্ধ হয়ে পড়লাম। আমি যেন রাজনীতির প্রতি মনপ্রাণ উজাড় করে দিতে বাধ্য হলাম।

যাদের কাছ থেকে জীবনে অনেক কিছু শিখেছি তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামোহানোয়। তিনি ছিলেন একজন নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী এবং দক্ষ সংগঠক। তিনি খুব সুন্দরভাবে ভিন্ন মতাবলম্বী ও নিজেদের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারতেন। রামোহানোয় যদিও ব্যক্তিগতভাবে কম্যুনিস্টদের পছন্দ করতেন না, তথাপি তাদের সংগে তিনি খুব ভালোভাবে মিলেমিশে কাজ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যেহেতু এএনসি একটি জাতীয় সংগঠন সেহেতু তাকে সমর্থন করে এমন সব দল ও ব্যক্তিকেই তার স্বাগত জানানো উচিত।

১৯৪৭ সালে এএনসির নেতা ড. জুমা, ড. দাদু ও ড. নাইকার একটি উদ্যোগ নেন। তাদের উদ্যোগে ট্রান্সভাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস এবং নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষই তাদের সাধারণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যৌথভাবে তৎপর হতে রাজি হয়। আফ্রিকান ও ইন্ডিয়ানদের যৌথ আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি মাইলফলক। সব ধরণের আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করা হয়। উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আফ্রিকান ও ইন্ডিয়ানরা একযোগ কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। পরে অবশ্য তাদের সংগে আফ্রিকান পিপলস অর্গানাইজেশন বা এপিও নামের একটি বহুবর্ণবাদী সংগঠন যোগ দেয়।

১৩

আফ্রিকানরা ভোট দিতে পারতো না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে নির্বাচনে কে জিতবে কে হারবে তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল না। ১৯৪৮ সালের নির্বাচনে জেনারেল স্মুটসের নেতৃত্বাধীন ও ক্ষমতাসীন দল ইউনাইটেড পার্টি হেরে যায়। নির্বাচনে জয়লাভ করে ন্যাশনাল পার্টি। ইউনাইটেড পার্টির নেতা স্মুটস সে সময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহুল পরিচিত একটি মুখ হয়ে উঠেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, স্মুটস দক্ষিণ আফ্রিকাকে মিত্রবাহিনীর সমর্থক বলে ঘোষণা দেন। ন্যাশনাল পার্টি এ ঘোষণার তীব্র বিরোধীতা করে প্রকাশ্যে নাৎসী জার্মানির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে।

তারা একটি ইস্যুকে ভিত্তি করে প্রচারণা চালায়। সেটি হলো *'সাওয়ার্ট গেভার'* (কালোরা ভয়ঙ্কর)। নির্বাচনে তারা দুটি স্লোগান ব্যবহার করেছিল। এর একটি হলো *'দাই কাফের ওপ সাই প্লেক'* (কালোরা তাদের জায়গাতেই থাকবে), আরেকটি হলো, *'দাই কোয়েলিস উইট দাই ল্যান্ড'* (কুলিদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হোক)। আফ্রিকানাররা (এই আফ্রিকানার মানে স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান নয়। এরা বহু আগে আফ্রিকায় আসা ইউরোপীয়দের উত্তরসূরী। এরা ইংরেজী অথবা স্থানীয় আফ্রিকান ভাষায় কথা বলে না। তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে) বিদ্রুপ করে ভারতীয়দের 'কুলি' বলতো।

আফ্রিকানাররা ছিল মূলত ডাচদের বংশধর এই নাৎসীবাদীদের ভাষায় ডাচ শব্দের প্রভাব ছিল।

ডাচ রিফর্মড চার্চের সাবেক মন্ত্রী ও একটা দৈনিকের সম্পাদক ড. মালানের নেতৃত্বে এইসব শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানার জাতীয়তাবাদী ন্যাশনাল পার্টির ব্যানারে তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতো। তারা ইংরেজ ও আফ্রিকান উভয় জাতির প্রতি চরম ক্ষিপ্ত ছিল। ইংরেজদের তারা ঘৃণা করতো এজন্য যে তাদের ধারণা ছিল ইংরেজরা তাদের নিচু শ্রেণীর বলে গণ্য করতো। আর কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের ঘৃণা করতো এই বলে যে তারা নাকি এই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানদের উন্নয়ন ও সংস্কৃতির ধারা ব্যাহত করছিল। ইউনাইটেড পার্টির প্রধান জেনারেল স্মুটসের প্রতি সাধারণ আফ্রিকানদের ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু ন্যাশনাল পার্টির চেয়ে স্মুটসের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভালো ছিল। ড. মালান যে রাজনৈতিক প্লাটফর্ম থেকে তৎপরতা চালাতেন সেটাকে বলা হতো অ্যাপারথেইড। রাজনীতিতে 'অ্যাপারথেইড' একটি নতুন টার্ম হলেও এ আইডিয়াটি ছিল প্রচলিত ও পুরনো। আক্ষরিকভাবে এর মানে 'বিচ্ছিন্ন হওয়া'। এই আইডিয়ার মাধ্যমে সমস্ত আইন কানুনের মাধ্যমে সাধারণ আফ্রিকানদেরকে সারাজীবনের

জন্য শ্বেতাঙ্গদের পায়ের তলায় নিষ্পেষিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ এতদিন যা অলিখিতভাবে বর্তমান ছিল সেটাকেই আইনের মাধ্যমে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা হল।

এতদিন এই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানাররা বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক হয়ে ছিল। ন্যাশনাল পার্টি ক্ষমতা পাওয়ায় সেই পৃথক পৃথক গ্রুপগুলো একীভূত হয়ে এক পৈশাচিক উন্মাদনায় মেতে উঠতে চাইল। একচেটিয়া ক্ষমতা পেয়ে যাওয়ায় তারা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে লাগলো। অ্যাপারথেইডের মূল বক্তব্য ছিল– শ্বেতাঙ্গরা আজীবন আফ্রিকান, মিশ্রবর্ণের লোক ও ভারতীয়দের চেয়ে উন্নত মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। অ্যাপারথেইডের মূল কাজ হবে চিরকালের জন্য আফ্রিকাস্থ শ্বেতাঙ্গদের কর্তৃত্ব ধরে রাখা। এই জাতীয়তাবাদীদের শ্লোগান ছিল *'ডাই উইট ম্যান মোয়েট অ্যালটাইড বাআস ঈস'* (সাদারা চিরকালই বস্ থাকবে)। 'বাসকাপ' যার অর্থ 'বসশীপ' বা 'দাদাগিরি'– এই টার্মটির ওপর তাদের আদর্শগত প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। ডাচ রিফর্মড চার্চ এই ভয়ানক জাতীয়তাবাদকে সমর্থন দিয়েছিল। ওই গীর্জা থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানাররা ঈশ্বরের বাছাই করা আদম সন্তান। তাদের বাধ্য থাকা ও সেবা যত্ন করা কালোদের ধর্মীয় দায়িত্ব। আফ্রিকানাররা নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য গির্জা আর পবিত্র মন্ত্রকেও কিনে নিয়েছিল।

নির্বাচনে আফ্রিকানারদের জয়ের ফলে তাদের ওপর ইংরেজদের প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। ইতিপূর্বে প্রথম অফিশিয়াল ভাষা ছিল ইংরেজী। শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানাররা ক্ষমতায় আসার পর তারা ইংরেজীর স্থলে তাদের ভাষা আফ্রিকানস (Afrikaans; African নয়) ভাষা চালু করলো। ইংরেজী হয়ে গেল দ্বিতীয় স্থানের অফিশিয়াল ভাষা। এ সময় তারা যে শ্লোগানটি ব্যবহার করে সেটি হল, *'ঈই ভোক তাল, ঈই ল্যান্ড'* (আমাদের নিজের লোক, নিজের ভাষা, নিজের জমি)। নির্বাচনে তাদের এ জয়কে প্রতিশ্রুত ভূমির দিকে ইসরাইলিদের যাত্রা হিসেবে তুলনা করা যেতে পারে। ইহুদীরা যেভাবে ইসরাইলকে খোদাপ্রদত্ত পবিত্র ভূমি বলে মনে করে; তেমনি এইসব শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানাররা দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদের প্রতিশ্রুত ভূমি মনে করা শুরু করেছিল।

এসব কারণে ন্যাশনাল পার্টির জয় সব পক্ষের জন্যই একটা বড় ধাক্কা ছিল। ইউনাইটেড পার্টি ও জেনারেল স্মুটস নাৎসী সমর্থকদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিলেন। এ কারণে তারা যেভাবেই হোক ন্যাশনাল পার্টিকে পরাজিত করতে চেয়েছিল। নির্বাচনের দিন অলিভার ট্যাম্বো ও অন্যান্যদের সংগে আমি জোহান্সবার্গের একটি সভায় মিলিত হয়েছিলাম। কোন দল জিতবে এবং কারা জিতলে আমাদের করণীয় কী হবে তা নির্ধারণ করাই ছিল আমাদের সভার মূল

লক্ষ্য। জাতীয়তাবাদীরা যে ক্ষমতায় আসতে পারে তা আমরা ভাবতেই পারিনি। রাতভর আমাদের মিটিং চললো। সকাল বেলা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে দেখি দৈনিক *'র‍্যান্ড ডেইলি মেইল'* জানিয়েছে ন্যাশনাল পার্টি জিতেছে। এ খবর দেখে আমি হতাশা ও বেদনায় মুষড়ে পড়লাম। কিন্তু অলিভারকে খুব একটা চিন্তিত মনে হল না। সে বললো, 'ভালো হয়েছে। ভালোই হয়েছে।' আমি বুঝলাম না জাতীয়তাবাদীরা সরকার গঠন করলে সেটা কীভাবে ভালো হয়। অলিভার আমাকে এবার ব্যাখ্যা করে বোঝালো। ও বললো, 'এবার আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো কারা আমাদের আসল শত্রু আর কোথায়ই বা আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

ন্যাশনালিস্টদের জয়ে জেনারেল স্মুটস পর্যন্ত গভীর চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন এমন একটি চরমপন্থি ও হিংসাত্মক দল ক্ষমতায় গেলে তাদের ওপর কী ভয়াবহ বিপদ নেমে আসতে পারে। যে মুহূর্তে ন্যাশনালিস্টরা ভোটে জিতলো সেই মুহূর্তেই আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভয়ঙ্কর এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই প্রথমবারের মতো উগ্রপন্থি আফ্রিকানাররা সরকারের নেতৃত্বে আসছে। বিজয় ভাষণে ন্যাশনাল পার্টির প্রধান মালান বললেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা আরও একবার আমাদের দখলভুক্ত হল।'

ওই বছরই ইয়ুথলীগ তার কর্ম পরিকল্পনা ডকুমেন্ট আকারে প্রকাশ করে। এমডা ওই ডকুমেন্ট প্রণয়ন করেছিলেন এবং নির্বাহী কমিটি তা অনুমোদন করে। ওই ডকুমেন্টে সমস্ত আফ্রিকান যুবকদের শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়। এ ইশতেহারে আমরা সমস্ত কম্যুনিস্ট মতাদর্শকে প্রত্যাখ্যান করলাম। কারণ আমরা কতটুকু বর্ণবৈষম্যের শিকার হচ্ছি তা না বলে শুধু শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব কপচাচ্ছিলাম। আমরা বললাম মুক্তির জন্য আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ গড়তে হবে। এই পরিষদ গঠন করবে আফ্রিকানরা। এই পরিষদ পরিচালিত হবে আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের ব্যানারে।

আমরা সোচ্চারভাবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুললাম। আমরা বললাম সমতার ভিত্তিতে আফ্রিকানদের মধ্যে ভূমি অধিকার পুনর্বন্টন করতে হবে; কালোদের দক্ষতা অর্জনে সহায়ক কাজ করতে না দেওয়ার যে কালো আইন ছিল তা বাতিল করতে হবে এবং বিনা বেতনে এবং বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। আমাদের ইশতেহারে দুই প্রতিদ্বন্দি আফ্রিকান

জাতীয়তাবাদের পার্থক্যও পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করা হল। আফ্রিকান ন্যাশনালিজম দুইভাগে বিভক্ত ছিল। এর একটি হলো কট্টর জাতীয়তাবাদ। এর প্রবক্তা হলেন মার্কাস গার্ভি। তার থিউরি হলো 'আফ্রিকা ফর আফ্রিকানস।' তার মতে আফ্রিকায় আফ্রিকানরা ছাড়া অন্য কারও থাকার অধিকার নেই। কিন্তু ইয়ূথলীগ যে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতো তা দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্য জাতির উপস্থিতিকে স্বীকৃতি দিত।

আমি ইয়ূথলীগের নেতা হলেও মনে মনে অপরপক্ষ অর্থাৎ আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের কট্টর-বিপ্লবী চেতনাকেই সমর্থন করতাম। বর্ণবাদকে না হলেও সাদা মানুষদের আমি ঘৃণা করতাম। কট্টর জাতীয়তাবাদীদের মতো আমি সাদাদের সাগরে ছুঁড়ে মারার পক্ষে ছিলাম না বটে; তবে আমি চাইতাম তাদের সাগরে ছুঁড়ে ফেলার পর তারা যেন কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ডাঙ্গায় উঠে বাঁচতে পারে। কিন্তু ভুলেও তারা যেন আফ্রিকার দিকে আর পা না বাড়ায়।

এএনসির চেয়ে ইয়ূথলীগ ভারতীয় এবং নিগ্রোদের প্রতি বেশি বন্ধু ভাবাপন্ন ছিল। ইয়ূথলীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল আফ্রিকানদের মতো ভারতীয় এবং নিগ্রোরাও এখানে নিগৃহীত। ভারতীয় ও নিগ্রোদের মধ্যে তফাৎটা হলো ভারতীয়দের তাড়িয়ে দিলে তাদের যাবার জায়গা আছে। তারা তাদের পিতৃপুরুষের ভিটে ভারতে চলে যেতে পারবে। কিন্তু নিগ্রোদের সে আশ্রয়ও নেই। আফ্রিকাই তাদের মাতৃভূমি। নীতিগতভাবে আমি এই দুই সম্প্রদায়কে আমাদের পলিসির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তবে যেহেতু তাদের এবং আমাদের স্বার্থের বিষয়টি এক ছিল না; সে কারণে তারা আমাদের পাশে ঠিক সময়ে ঠিকভাবে এসে দাঁড়াবে কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ ছিল।

যাইহোক কিছুদিনের মধ্যেই মালান তার প্রতিশ্রুত নির্যাতন শুরু করে দিল। ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্ট ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যুদ্ধবাজ নেতা রোবে লিব্রান্থকে সাধারণ ক্ষমা দিয়ে কারাগার থেকে মুক্ত করলো। এই রোবে নাৎসী জার্মানির পক্ষে দীর্ঘদিন কাজ করেছিল, নাৎসীদের দালালি করেছিল।

ন্যাশনাল পার্টি সরকার গঠন করেই শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলন দমন করার ঘোষণা দিয়ে ফেললো। আফ্রিকান, ভারতীয় ও নিগ্রোদের মধ্যে হাতেগোনা যে কয়েকজনের ভোটাধিকার ছিল তাও তারা বাতিল করার ঘোষণা দেয়। তারা সেপারেট রিপ্রেজেন্টেশন অব ভোটারস্ বিল নামে একটি বিল পাশ করে যা পার্লামেন্টে নিগ্রোদের প্রতিনিধিত্ব ছিনিয়ে নেয়। ১৯৪৯ সালে তারা প্রোহিবিশন

অব মিক্সড ম্যারিজ অ্যাক্ট নামে একটি আইন পাশ করে। এর ফলে এক জাতি অথবা বর্ণের মানুষ অন্য জাতি অথবা বর্ণের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না বলে আদেশ জারি হয়।

এর পরপরই পাশ হয় ইমমোরালিটি অ্যাক্ট নামে আরেকটি আইন। এর মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সব ধরণের যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পপুলেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট নামে তারা আরও একটি কালো আইন তৈরি করে। এর মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যেকটি মানুষের গায়ে বর্ণবাদের ছাপ মেরে দেওয়া হয়। অর্থাৎ কে কোন জাতি ও গোত্রের মানুষ তা সরকারি রেকর্ডপত্রে নিবন্ধন করা হয়। ন্যাশনালিস্টদের নেতা মালান তার প্রস্তাবিত গ্রুপ এরিয়াস অ্যাক্ট নামের কালো আইনকে তিনি 'অ্যাপারথেইডের মূল নির্জাস' বলে অভিহিত করেন। এ আইনের আওতায় প্রত্যেকটি জাতিগত গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদা পৌর এলাকা গড়ে তোলার কথা বলা হয়। অর্থাৎ সামর্থ্য থাকলেও নিগ্রো, আফ্রিকান অথবা ভারতীয়রা যে কোন এলাকায় বসবাস করতে পারবে না। ইতিপূর্বে শ্বেতাঙ্গরা গায়ের জোরে আফ্রিকানদের জমি কেড়ে নিয়েছিল। এবার আইনের মাধ্যমে তাদের সেই অবৈধ কীর্তিকলাপের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হল।

সরকারের এই ভয়ানক হুমকিসূচক তৎপরতার জবাবে এএনসি এক কঠিন ও ঐতিহাসিক পন্থা অবলম্বন করে। ১৯৪৯ সালে দল সত্যিকার অর্থেই এক গণআন্দোলনের ডাক দেয়। সমস্ত আফ্রিকানের মনোযোগ আকর্ষণ করে ইয়ূথলীগ গণপ্রচারণায় নেমে পড়ে। মানুষকে সরকারের এই বিধ্বংসী তৎপরতা সম্পর্কে সজাগ করার প্রচারণা শুরু হয়। ইয়ূথলীগ এক বিক্ষোভ কর্মসূচীর ঘোষণা দেয়।

ব্লোয়েমফোন্টেইনে অনুষ্ঠিত এএনসির বার্ষিক সম্মেলনে তারা ইয়ূথলীগের কর্মসূচীকে একবাক্যে সমর্থন করে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল বয়কট, ধর্মঘট, গৃহাবস্থান, পরোক্ষ প্রতিরোধ, মিছিল, সমাবেশ ও অন্যান্য বিক্ষোভ। এসব কর্মসূচী পুরো পরিস্থিতিই বদলে দেয়। এতদিন এএনসি আফ্রিকানদের পক্ষে যত কর্মসূচী হাতে নিয়েছিল তার সবই ছিল আইনের অধীনস্ত। ইয়ূথলীগে আমরা যারা নেতাকর্মী ছিলাম তারা ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলাম শুধুমাত্র আইনি মোকাবেলার মাধ্যমে এই বর্ণবাদী বৈষম্য ঠেকানো সম্ভব হবে না। আমরা এ বিষয়টিকেই এএনসির নেতৃবৃন্দকে বোঝাতে পেরেছিলাম। অবশেষে তারাও আমাদের সমর্থন করে আরও জোরালো প্রতিরোধ কার্যক্রমে নিজেদের শামিল করে।

তবে আমাদের প্রস্তাব শুনেই যে এএনসি নেতারা তা মেনে নেবেন তা আমরা বিশ্বাস করিনি। এ কারণে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেওয়ার আগে, অর্থাৎ সম্মেলনের কয়েক সপ্তাহ আগে ওয়াল্টার সিসুলু, অলিভার ট্যাম্বো এবং আমি এএনসি নেতা ড. জুমার সংগে তার সোফিয়াটাউনের বাসায় একান্তে বৈঠক করি। আমরা তাকে সেদিন বললাম ভারতবর্ষে গান্ধীর নেতৃত্বে যেভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে আমাদেরও সেভাবে গণআন্দোলন করার সময় এসেছে। ১৯৪৬ সালে গান্ধী যেভাবে পরোক্ষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন আমাদেরও সেভাবে নেমে পড়ার সময় এসে গেছে। আমরা তাকে বললাম, অত্যাচার নির্যাতনের মুখে এএনসির যে ভূমিকা তা কর্মী সমর্থকদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে। আমরা বললাম, এএনসির নেতাকর্মীদের এখন আইন ভেঙে রাস্তায় নামতে হবে। প্রয়োজন হলে গান্ধীর মতো সংগ্রামে নেমে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করতে হবে।

আমাদের প্রস্তাব শুনেই ড. জুমা বেঁকে বসলেন। বললেন, এ জাতীয় আন্দোলনে নামার সময় এখনও আসেনি। তার বক্তব্য হলো এ ধরণের কঠোর বিক্ষোভ করার আগে আন্দোলনের একটা ন্যূনতম পরিপক্কতা থাকা দরকার। এএনসির সেটা নেই। এখনই এসব তৎপরতা চালালে সরকার দলকে নিষিদ্ধ ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলার অজুহাত পেয়ে যাবে। তিনি বললেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন ধরণের আন্দোলন অবশ্যই আসবে। তবে সেটা পর্যায়ক্রমে। এখনই তা করতে যাওয়ার পরিণাম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। সর্বোপরি তিনি আমাদের কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার করলেন যে তিনি একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। এ মুহূর্তে জেলে গিয়ে তিনি তার আঁকাশচুম্বি চিকিৎসাখ্যাতি ও পসার নষ্ট করার কোন মানে খুঁজে পাচ্ছেন না।

ড. জুমার শেষ বক্তব্য শুনে আমরা তাকে সরাসরি আল্টিমেটাম দিয়ে বললাম তিনি যদি আমাদের প্রস্তাবিত অ্যাকশন কার্যক্রম সমর্থন করেন তাহলে আমরা তাকে পুনরায় এএনসির প্রেসিডেন্ট হওয়ার পক্ষে সমর্থন দেব। অন্যথায় বিরোধীতা করব। তাকে সরাসরি বললাম আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে কিছুতেই আমরা তাকে সমর্থন দেব না। আমাদের কথা শুনে ড. জুমা দারুণভাবে অপমানবোধ করলেন। আমরা তাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছি বলেও তিনি অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন, আমরা তার সংগে সাংঘাতিক বেয়াদবি করেছি; তাকে অপমান করেছি। একারণে তিনি কিছুতেই আমাদের প্রস্তাবে রাজি হবেন না।

রাত ১১টায় ড. জুমা উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে আমাদের তার বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। তারপর মুখের ওপর দড়াম করে দরোজা বন্ধ করে দিলেন। সে রাতে ছিল অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার। সোফিয়াটাউনের রাস্তায় কোন

আলো ছিল না। অরল্যান্ডোতে ফেরার সমস্ত যানবাহন বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। অলিভার বললো, জুমার অন্তত আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দেওয়া উচিত ছিল। যাইহোক, উপায় না পেয়ে সেখানে ওয়াল্টারের এক আত্মীয় বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। মধ্যরাতের অশ্বারোহীর মতো তাদের ঘাড়ে চেপেই রাতটা পার করতে হল।

ডিসেম্বরের সম্মেলনে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের ইয়ূথলীগের হাতে যে কয়টা ভোট আছে তা দিয়েই ড. জুমাকে দলীয় প্রধানের পদ থেকে সরানো সম্ভব। আমরা জুমার বিকল্প প্রার্থী হিসেবে ড. জে. এস. মোরোকাকে সমর্থন দিলাম। অবশ্য তিনি আমাদের প্রথম পছন্দের লোক ছিলেন না। প্রথমে আমরা প্রফেসর জেড. কে. ম্যাথিউসকে নেতা হিসেবে চেয়েছিলাম। কিন্তু জেড. কে. আমাদের বিক্ষোভ পরিকল্পনার কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমাদের বয়স কম, তাই এ রকম হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটা নাকি একেবারেই অবাস্তব পরিকল্পনা। এসব কারণে তাকে আমাদের পরিকল্পনা থেকে বাদ দিতে হল।

পছন্দ না হলেও ড. মোরোকাকে বাধ্য হয়েই আমরা সমর্থন করলাম। তিনি তখন অল আফ্রিকান কনভেনশনের (এ এ সি) সদস্য ছিলেন। তিনি ড. জুমার বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে রাজি হওয়ায় আমরা ইয়ূথলীগের পক্ষ থেকে তাকে এএনসির সদস্য বানিয়ে দিলাম।

এএনসির এই নবীনতম সদস্যকে দলীয় প্রধান করতে আমাদের মনেও একটু খচখচানি ছিল। সংগঠন সম্পর্কে তার ধারণা ছিল খুবই কম। প্রথম মিটিংয়ে তিনি এএনসিকে বারবার আফ্রিকান ন্যাশনাল 'কাউন্সিল' (তিনি 'কংগ্রেসে'র পরিবর্তে 'কাউন্সিল' বলছিলেন) বলছিলেন। এএনসির ব্যাপারে তার না ছিল স্বচ্ছ ধারণা, না অভিজ্ঞতা। তথাপি যেহেতু তিনি আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচীর প্রতি শতভাগ শ্রদ্ধা দেখিয়ে প্রয়োজনে জেলে যেতে রাজি হয়েছিলেন সে কারণেই তাকে আমরা নেতা হিসেবে মেনে নিলাম। ড. জুমার মতো ড. মোরোকাও একজন চিকিৎসক ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে ধনী কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। এডিনবার্গ ও ভিয়েনায় পড়াশুনা করা মোরোকার দাদার বাবা ছিলেন অরেঞ্জ ফ্রি এস্টেটের একজন রাজ্যপ্রধান। শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানারদের তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি তাদের *'ভুরুগুরেকার'* বা 'প্রতারক' বলতেন। যাহোক আমাদের মদদপুষ্ট ড. মোরোকা শেষ পর্যন্ত ড. জুমাকে হারিয়ে এএনসির প্রেসিডেন্ট জেনারেল নির্বাচিত হলেন। নতুন মহাসচিব নির্বাচিত হলেন ওয়াল্টার সিসুলু। অন্যদিকে অলিভার ট্যাম্বো হলেন ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ।

অনেক চেষ্টার পর বার্ষিক সম্মেলনে অসহযোগ, ধর্মঘট, হরতাল, অবরোধের মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাশ হল। শুধু তাই নয়, ওই সম্মেলনেই সরকারের বর্ণবৈষম্যমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতির প্রতিবাদে জাতীয়ভাবে একদিনের কর্মবিরতি ঘোষণা করা হল। সরকার বিরোধী এত বড় ঘোষণায় এএনসির এতদিনকার আপোষকামী নেতৃত্বের উজ্জ্বলতা নতুন কমিটির সামনে ম্লান হয়ে গেল। অধিকতর সংগ্রামী ও মারমুখী ভূমিকা নিয়ে এএনসি জাতির সামনে উপস্থাপিত হলো।

এ সময় এএনসির সর্বোচ্চ সংগঠন ইয়ূথলীগ মেম্বারদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। আমরা এখন এএনসিকে আরও বিদ্রোহ ও বিপ্লবী পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হলাম।

দুঃখের বিষয় আমাকে ইয়ূথলীগের এই মহাবিজয় দূর থেকেই স্বাগত জানাতে হল। চাকরিজনিত কারণে আমি সম্মেলনে যোগ দিতে পারিনি। ওই সময় আমি সবেমাত্র একটা ল' ফার্মে যোগ দিয়েছি। ল' ফার্মটি আমাকে ব্লোয়েমফন্টেইনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য দুদিনের ছুটি মঞ্জুর করলো না।

নীতির দিক থেকে ফার্মটি যথেষ্ট উদারপন্থি ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাকে মাথা থেকে রাজনীতি ঝেড়ে ফেলে নিজের কাজে মন দেওয়ার পরামর্শ দিল। এরপরও যদি দু'দিন অফিসে না এসে সম্মেলনে যেতাম তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমি চাকরিটা হারাতাম। কিন্তু চাকরি হারানোর ঝুঁকি নিয়ে সম্মেলনে যোগ দেবার মতো আর্থিক অবস্থা তখন আমার ছিল না।

বিক্ষোভ কর্মসূচী ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যে গণ আন্দোলন উত্তাল তরঙ্গের মতো ফুলে উঠলো। কিন্তু আমি তখনও কম্যুনিস্ট ও ভারতীয়দের সংগে যৌথভাবে আন্দোলন করাটাকে মেনে নিতে পারছিলাম না। ১৯৫০ সালের মার্চে ট্রান্সভাল এএনসি, ট্রান্সভাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস, আফ্রিকান পিপলস অর্গানাইজেশন ও কম্যুনিস্ট পার্টির ট্রান্সভাল জেলা কমিটি যৌথভাবে 'ডিফেন্ড ফ্রি স্পীচ কনভেনশন' নামে একটি যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে দলগুলোর প্রায় এক লাখ কর্মী সমর্থক জোহান্সবার্গের মার্কেট স্কোয়ারে মিলিত হয়। এক্সিকিউটিভের সংগে আলোচনা ছাড়াই ড. মোরোকা কনভেনশনে সভাপতিত্ব করতে রাজি হন। কনভেনশন খুবই সাফল্যজনকভাবে শেষ হল। পুরো বিক্ষোভ সমাবেশে এএনসির প্রাধান্য বজায় থাকার পরও আমি বামপন্থি ও ভারতীয়দের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলাম।

কম্যুনিস্ট পার্টি ও ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের প্ররোচণায় ওই কনভেনশনে একদিনের একটি সাধারণ ধর্মঘট পালনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী ১ মে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হল। একই সংগে ওই দিন দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হল।

এ কর্মসূচীতে আমার নৈতিক সমর্থন ছিল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল কম্যুনিস্টরা এর মাধ্যমে এএনসির জাতীয় প্রতিরোধ দিবসের কৃতিত্ব চুরি করতে চাচ্ছে। এ চিন্তা থেকেই আমি মে দিবসের প্রতিরোধ কার্যক্রমের বিরোধীতা করলাম। আমি বললাম, এএনসি জাতীয় প্রতিরোধ দিবস হিসেবে একটা তারিখ আগেই ঘোষণা করেছে। স্বাধীনতা দিবস হিসেবে নতুন যে তারিখের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তার ধারণাটি এএনসির নয়। সেটি আসলে কম্যুনিস্ট পার্টিরই আইডিয়া। এতে সমর্থন করে তাদের সংগে বিক্ষোভে শরীক হলে জনগণের মনোযোগ কম্যুনিস্টদের দিকে ঘুরে যাবে। আমাদের ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে যাবে। আমি বললাম তাদের স্বাধীনতা দিবসের বিক্ষোভ ক্যাম্পেইনে সাহায্য না করে আমাদের নিজেদের ক্যাম্পেইনে মন দেওয়া উচিত।

আহমেদ কাদরাদা নামে এক তরুণ ভারতীয়র সাথে আমার এ নিয়ে তুমুল বচসা হয়। অন্য তরুণদের মতই রক্তগরম হওয়ায় কাদরাদা কিছুটা বেপরোয়া গোছের ছেলে ছিল। ট্রান্সভাল ইন্ডিয়ান ইয়ুথ কংগ্রেসের সে অন্যতম সদস্য ছিল। আমি যে এই বিক্ষোভ কর্মসূচীতে এএনসির অংশগ্রহণে বিরোধীতা করছি তা তার কানেও গিয়েছিল। একদিন কমিশনার স্ট্রীট দিয়ে আসার সময় কাদরাদার সংগে আমার দেখা হল। আমাকে সামনে পেয়েই সে রাগে ফেটে পড়ল। ইন্ডিয়ান ও নিগ্রোদের বিরুদ্ধে আমি ইয়ূথলীগকে খেপিয়ে তুলছি বলেও সে অভিযোগ করলো। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে কাদরাদা আমাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'নেলসন, তুমি একজন স্থানীয় আফ্রিকান নেতা এবং আমি একজন সাধারণ ভারতীয় তরুণ। আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি তোমাদের লোকজনের ওপর তোমার যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আমার তার চেয়ে বেশি আছে। তোমার বিরোধীতা করে তোমাদের যে কোন শহরে সভা ডাকার ক্ষমতা আমার আছে। শুধু তাই নয় তুমি ইচ্ছে করলে আফ্রিকানদের সেই মিটিংয়ে যেতে নিষেধ করতে পার। কিন্তু আমি নিশ্চিত ওরা তোমার কথা শুনবে না। আমার কথা শুনবে। তুমি আমি পাশাপাশি দুই জায়গায় মিটিং ডাকলে ওরা তোমার মিটিং ছেড়ে আমার মিটিংয়ে চলে আসবে। আমার এ কথাকে যদি তোমার বাকোয়াজ মনে হয় তাহলে আমাদের কার জনপ্রিয়তা বেশি এসো তা দেখে নেওয়া যাক।'

তার এসব কথাবার্তাকে অন্তঃসারশূন্য নিছক আস্ফালন হিসেবে ধরে নিলেও আমি ভয়ানক খেপে গেলাম। বিশেষ করে আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট একটা ছেলের এমন হম্বি তম্বি আমি মেনে নিতে পারলাম না। এএনসি, সাউথ আফ্রিকান ইন্ডিয়ান কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্ট পার্টির এক্সিকিউটিভদের যৌথ সম্মেলনে কাদরাদার বিরুদ্ধে নালিশ জানালাম। ইসমাইল মীর আমাকে শান্ত করলেন। তিনি বললেন, 'নেলসন, বাদ দাও। ও মাথা গরম ছেলে মানুষ। তোমার ওর মতো উত্তেজিত হওয়াটা ঠিক হবে না।' তাদের কথায় আমি শান্ত হলাম। আমি কাদরাদার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলাম। কাদরাদার সংগে ভিন্নমত থাকলেও ওর সাহস আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পরবর্তীতে কাদরাদাকে আমি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতাম।

স্বাধীনতা দিবস ধর্মঘটের কার্যক্রম এএনসির আনুষ্ঠানিক সমর্থন ছাড়াই শুরু হল। সরকার ওইদিন অর্থাৎ ১ মে সব ধরণের মিটিং সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষনা করলো। একদিনের স্ট্রাইক হিসেবে দুই তৃতীয়াংশ আফ্রিকান শ্রমিক সেদিন ঘর থেকে বের হল না। ওইদিন রাতে বিক্ষোভকারীদের সমাবেশ দেখার জন্য আমি আর ওয়াল্টার পশ্চিম অরল্যান্ডো গেলাম। সে রাতে খা খা জোসনা ছিল। সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

সমাবেশ স্থলের পাঁচশ গজ দূরেই পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছিল। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ওই সমাবেশ ডাকা হল। সমাবেশ শেষে মিছিল শুরু হল। আমি আর ওয়াল্টার মিছিলের সংগে মিশে গেলাম। মিছিলটি কিছুদূর এগুতেই গুলির আওয়াজ শুনলাম। তারপর হুড়মুড় করে ছোটাছুটি শুরু হল। আমি এবং পাশের অনেক সাথী গুলি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য মাটিতে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ার পরই দেখলাম একঝাঁক পুলিশ কোথেকে উড়ে এসে বিক্ষোভকারীদের ওপর ব্যাপক লাঠি চার্জ শুরু করেছে। শুয়ে পড়া মানুষগুলোর ওপর তারা বুট দিয়ে লাথি গুতো মারছিল। আমি আর ওয়াল্টার কোন রকমে জীবন নিয়ে কাছেই অবস্থিত নার্সদের একটা ডরমেটরিতে গিয়ে ঢুকলাম। ডরমেটরিতে অবস্থানের সময় আমাদের ঘরের দেয়ালে বেশ কয়েকটি গুলি লাগার শব্দ শুনতে পেলাম। অনেক রাতে সেখান থেকে বের হওয়ার পরে জানলাম বিনা উস্কানিতে মিছিলে গুলি বর্ষনের ওই ঘটনায় ১৮ আফ্রিকান নেতাকর্মী মারা গেছেন। আহত হয়েছেন বহু।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠলেও কয়েক সপ্তাহ বাদে উগ্রপন্থি জাতীয়তাবাদী সরকার কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এক কালা কানুন পাশ করে। এর পরপরই এএনসি জোহান্সবার্গে এক জরুরি

সম্মেলনের ডাক দেয়। নতুন আইনে দক্ষিণ আফ্রিকার কম্যুনিস্ট পার্টিকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এর সংগে কোন রকম সম্পর্ক রাখাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষনা দেওয়া হয়। আইনে বলা হয়, নিষিদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টির সংগে জড়িত বলে কারও বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

তবে এ আইনের খসড়া নীতিমালায় সরকার বিরোধীতার যে সজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল তার গণ্ডি ছিল ব্যাপক। এতে বলা ছিল, 'অস্থিরতা ও আইনভঙ্গের মাধ্যমে রাজনৈতিক, শিল্প বাণিজ্যিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যে কোন চেষ্টা রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে বিবেচিত হবে।' তার মানে দাঁড়ালো এই যে, সরকারের কোন নীতিমালার বিরুদ্ধাচরণ করলেই তাকে আইনের আওতায় এনে ফাঁসিয়ে দেওয়া যাবে। এর মাধ্যমে সরকার যাকে ইচ্ছা তাকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করার এখতিয়ার পায়।

জরুরি সম্মেলনে এই বিষয় নিয়ে এএনসি, এসএআইসি এবং এপিও নেতৃবৃন্দ ব্যাপক আলোচনা করেন। অন্যান্যদের মতো ড. দাদু বললেন, সরকারের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ার সময় নিজেদের ভেদাভেদ বজায় রাখা হবে চরম বোকামি। আমিও তাকে সমর্থন করে বললাম, যে কোন একটি লিবারেশন গ্রুপের ওপর নির্যাতন চালানো হলে সেটাকে সমগ্রের ওপর নির্যাতন বলে বিবেচনা করতে হবে। ওই সম্মেলনে অলিভার এক স্লোগানমুখর বক্তৃতায় বললেন, 'আজ কম্যুনিস্ট পার্টি শিকার হয়েছে; কাল হবে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন, পরশু হবে ইন্ডিয়ান কংগ্রেস, তার পরের দিন হবে এপিও, তার পরের দিন হবে এএনসি। সুতরাং এ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে এক যোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।'

কম্যুনিস্টদের দমন করার লক্ষ্যে কালো আইন পাশ করা এবং ১ মে'র মিছিলে গুলি চালিয়ে ১৮ আফ্রিকানকে হত্যা করার প্রতিবাদে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এসএআইসি ও এপিওর সমর্থন নিয়ে ১৯৫০ সালের ২৬ জুন জাতীয় প্রতিরোধ দিবসের ডাক দেয়। যৌথ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিরোধ দিবসকে সফল করার জন্য এএনসি, এসএআইসি, এপিও এবং কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব পদমর্যাদা ভুলে এককাতারে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আসলে ওই উগ্রজাতীয়তাবাদী সরকার তখন আমাদের সামনে এতটাই ভয়ঙ্কর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তখন পরস্পরের হাতে হাত রেখে ঐক্যবদ্ধ হতে আমরা বাধ্য হই। ভারতীয় ও কম্যুনিস্টদের প্রতি আমার বীতশ্রদ্ধ মনোভাব থাকলেও সে মুহূর্তে তাদের আপন ভাবতে আমার একটুও কষ্ট হয়নি।

ওই বছরের গোড়ার দিকে ড. জুমা প্রেসিডেন্ট জেনারেল নির্বাচনে হেরে যান। আগেই বলেছি তার হেরে যাওয়ার পেছনে আমরা অর্থাৎ ন্যাশনাল ইয়ুথ লীগের

নেতাকর্মীরা প্রধান ভূমিকা রেখেছিলাম। হেরে গিয়ে তিনি এএনসির ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন এবং আমাকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। নির্বাহী কমিটির সদস্য হয়ে আমি ভুলে যাইনি যে ১০ বছর আগে আমি যখন প্রথম জোহান্সবার্গে এসেছিলাম, একটা চাকরির জন্য যখন আমি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন এই ড. জুমাই আমাকে আমার প্রথম চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। সে সময় রাজনীতি কাকে বলে তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু আজ নির্বাহী কমিটির সদস্য হওয়ার সুবাদে আমি এএনসির নীতি নির্ধারক বহু জ্যেষ্ঠ নেতার সংগে এক টেবিলে বসে আলোচনার সুযোগ পেলাম।

এতদিন দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের আদেশ নিষেধ কমিটির বাইরে থেকে মেনে এসেছি। তার মধ্যে এক ধরণের অপরিণত নেতৃত্বের একটা আবহ ছিল। কিন্তু এবার নিজেকে একজন সত্যিকারের দায়িত্বশীল রাজনীতিক বলে মনে হল। যে দলীয় ক্ষমতার জন্য আমি এতদিন বহু সংগ্রাম করেছি তাই আমার হাতে ধরা দিল। তবে নির্বাহী কমিটির সদস্য হওয়ার পর আমার মাথায় যেন অনেক ভারী একটা বোঝা এসে চাপলো। দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকায় এতদিন যে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছিলাম এখন আর সেটা সম্ভব হলো না। নির্বাহী কমিটির সদস্য হওয়ায় আমাকে এখন থেকে বিভিন্ন যুক্তিতর্ক বিচার বিবেচনা করতে ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করতে হবে। পাশাপাশি দলে আমার মতো যারা বিদ্রোহী মানসিকতার লোক ছিল এখন থেকে তাদের কঠোর সমালোচনার মোকাবেলা করতে হবে ভেবে কিছুটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম।

যে সময়কার কথা বলছি সে সময় আফ্রিকানদের যে কোন ধরণের বিক্ষোভকে মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। নির্দয় নিষ্ঠুরভাবে তাদের কথা বলা ও স্বাধীনভাবে চলাচল করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কোন আফ্রিকান যদি ধর্মঘটে শামিল হতো তাহলে একথা ধরে নেওয়া হতো যে সে শুধু তার চাকরি খোয়াতেই প্রস্তুত নয় পাশাপাশি ভিটেমাটি ছাড়তেও সে রাজি আছে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, অর্থনৈতিক ধর্মঘটের চাইতে রাজনৈতিক ধর্মঘটে যোগদান করা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। বেতনবৃদ্ধি অথবা কাজের সময় কমানোর মতো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ইস্যুর ধর্মঘটের চেয়ে রাজনৈতিক অধিকারের ধর্মঘট সব দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। সরকার রাজনৈতিক বিক্ষোভে বেশি গুরুত্ব দিয়ে তার ওপর কড়া নজর রাখে। এ কারণে রাজনৈতিক বিক্ষোভ-সমাবেশ সফল করতে হলে অত্যন্ত সুশৃংখল সাংগঠনিক তৎপরতার প্রয়োজন হয়।

২৬ জুনের ধর্মঘট সফল করার প্রস্তুতি হিসেবে ওয়াল্টার স্থানীয় নেতাকর্মীদের সংগে পরামর্শ করতে সারা দেশ চষে বেড়ালেন। তার অনুপস্থিতিতে আমি এএনসি অফিস সামলানোর দায়িত্ব নিলাম। জাতীয় প্রতিরোধ কার্যক্রম কতদূর

এগিয়েছে, দল কতখানি সক্রিয় রয়েছে তার খোঁজ খবর নিতে তখন প্রায় প্রতিদিনই পার্টি অফিস লোকজনে গিজগিজ করতো। পরিকল্পনা মাফিক সব কিছু এগুচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মোসেস কোটানি, ড. দাদু, ডিলিজা এমজি, ট্রান্সভাল এএনসির প্রেসিডেন্ট জে.বি. মার্কস, ইউসুফ কাচালিয়া ও তার ভাই মাউলভি, কাউন্সিল অব অ্যাকশনের সেক্রেটারি গাউর রাদেবে, মাইকেল হার্মেল, পিটার রাবোরোকো এবং এনথাবো মোতলানার মতো নেতারা অফিসে আসতেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব বিক্ষোভ কর্মসূচী চলছিল আমি সেগুলোর সমন্বয় করছিলাম। আঞ্চলিক নেতাদের টেলিফোনে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলাম। মূল কার্যক্রম শুরু করার জন্য আমাদের হাতে খুবই কম সময় ছিল। তারপরও প্রাণপণে সব প্রস্তুতিমূলক কাজ গোছানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

'জাতীয় প্রতিরোধ দিবস' ছিল আমাদের এমন এক বিক্ষোভ প্রস্তুতি যার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো আমরা পুরো আফ্রিকাকে একটা বড় ধরণের ঝাঁকুনি দিতে চেয়েছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমরা তাতে অনেকটাই সফল হতে পেরেছিলাম। নির্ধারিত দিনে দেশের বড় বড় শহরে বেশিরভাগ শ্রমিক কাজে গেল না। কৃষ্ণাঙ্গ ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানপাট খুললো না। বেথাল শহরে গার্ট সিবান্দে (ইনি পরবর্তীতে ট্রান্সভাল এএনসির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন) পাঁচ হাজার বিক্ষোভকারীর একটি বিশাল দল নিয়ে মিছিল করলেন। পরদিন প্রায় প্রত্যেকটি দৈনিকে তার ছবিসহ খবর বেরিয়েছিল। এই বিক্ষোভ কর্মসূচীতে দুটো লাভ হয়েছিল। প্রথমত, আমাদের সমস্ত নেতাকর্মী এ বিক্ষোভের মাধ্যমে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। তাদের নৈতিক মনোবল বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সালান সরকারের কাছে আমরা এই বার্তা পৌঁছে দিতে পারলাম যে তাদের হুমকি ধামকির জবাব দেওয়ার ক্ষমতা আফ্রিকানদের রয়েছে।

ওই বিক্ষোভের ব্যাপকতা এতটাই ছিল যে তা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে একটা ল্যান্ডমার্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন ২৬ জুনকে ফ্রিডম ডে হিসেবে পালন করা হতো।

এই প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্যায়ের বিক্ষোভে আমি বড় ধরণের একটি ভূমিকা রাখলাম। দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের বিক্ষোভে আন্দোলনে নানা দিকনির্দেশনা দিলাম। প্রতিরোধ দিবস পরিকল্পনামতো সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আমার মধ্যে নেতৃত্বের অনুভূতি সর্বাত্মকভাবে জাগ্রত হল। তবে আমি যে সংগ্রাম মন্ত্রে দীক্ষিত হলাম তা এক সর্বগ্রাসী চেতনা। ধীরে ধীরে আমি এমন এক সংগ্রামী মানুষ হিসেবে নিজেকে আবিস্কার করলাম যে পারিবারিক জীবন থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। প্রতিরোধ দিবসে দুপুর বেলা আমার

দ্বিতীয় পুত্র সন্তান মাকগাথো লিবানিকার জন্ম হয়। ও যখন প্রথম পৃথিবীর আলো দ্যাখে তখন হাসপাতালে আমি ইভেলিনের পাশে ছিলাম। কিন্তু নবজাতকের পাশে খানিকক্ষণ সময় দেওয়া ছাড়া ওর প্রতি অন্যসব দায়িত্ব আমি পালন করতে পারিনি। ১৯১৭ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত এএনসির দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন জাম্বিয়ার নেতা সেফাকো মাপোগো মাকাগাথো।

প্রোতোরিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনভাবে চলাচলের ওপর সরকার যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল মাকাগাথো তার তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন। সে সময় মাকাগাথোকে দুর্দমনীয় সাহসের প্রতীক হিসেবে ভাবা হতো। এজন্য তার নামানুসারে আমি আমার দ্বিতীয় ছেলের নাম রাখি মাকাগাথো লিবানিকা।

আন্দোলনের ওই উত্তাল সময় একদিন আমার স্ত্রী জানালো আমাদের পাঁচ বছর বয়সি বড় ছেলে থেম্বি নাকি তার মাকে বলেছে, 'মা বাবা কোথায় থাকে?' একই ঘরে বসবাস করেও অনেকদিন বাচ্চাটা আমাকে দেখতে পারেনি। সারাদিন মিটিং-মিছিল করে আমি যখন বাসায় ফিরতাম তার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়তো আবার সে জেগে ওঠার আগেই আমাকে বাসা থেকে বেরিয়ে আসতে হতো বাচ্চাদের সাহচর্যে থাকার ইচ্ছে হতো না তা নয়। আমি নিবিড়ভাবে তাদের অভাব অনুভব করতাম। প্রতিটি মুহূর্তে তাদের মিস করতাম। কিন্তু ভাগ্যের এমনই খেলা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাকে যুগ যুগ সময় কাটাতে হয়েছে।

দিন বদলের সাথে সাথে আমার রাজনৈতিক চিন্তা চেতনায়ও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছিল। এক সময় আমি কম্যুনিস্টদের সহ্য করতে পারতাম না। এএনসিতে তাদের উপস্থিতি মেনে নিতে পারতাম না। কিন্তু ধীরে ধীরে কম্যুনিস্টদের প্রতি আমার অপছন্দের মাত্রা কমে এলো। সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকার কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মোসেস কোটানি। তিনি এএনসির নির্বাহী কমিটিরও সদস্য ছিলেন। কোটানি মাঝে মাঝে আমার বাসায় আসতেন। আমরা সারারাত তর্ক বিতর্ক করতাম। ট্রান্সভালের খামার চাষীর ছেলে কোটানি খুবই উদার মানসিকতাসম্পন্ন ও স্বশিক্ষিত লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বলতেন, 'নেলসন, তুমি কেন আমাদের সহ্য করতে পার না? আমরা সবাই একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছি। আমরা তো এএনসিকে দাবিয়ে রাখতে চাইছি না। আদি আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের স্বার্থেই তো আমরা সংগ্রাম করছি।' তার অসাধারণ যুক্তির কাছে আমাকে হার স্বীকার করতে হতো। প্রায়ই আমি তার কথার জবাব দিতে পারতাম না।

কোটানি, ইসমাইল মীর এবং রুথ ফার্স্টের সংগে আমার ঘনিষ্ঠতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা আমাকে কম্যুনিস্ট বিরোধী অবস্থান থেকে ক্রমশ সরিয়ে আনছিল।

এএনসির মধ্যে জে.বি. মার্কস, এডুইন মোফুৎসানিয়া, ড্যান ট্লুম এবং ডেভিড বোপাপের মতো বহু ত্যাগী নেতা ছিলেন যারা বামপন্থি ছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাদের ভূমিকা নিয়ে কারও কোন প্রশ্ন ছিল না। ১৯৪৬ সালের প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম মহান নেতা ড. দাদু সর্বজন বিদিত মার্কসবাদী ছিলেন। '৪৬ সালের বিক্ষোভে ভূমিকা রাখার জন্য সরকারবিরোধী প্রত্যেক গ্রুপের কাছেই তিনি শ্রদ্ধাভাজন হিসেবে বিবেচিত হতেন। এ সমস্ত নেতার দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার বিষয়ে আমি কখনও প্রশ্ন তুলিনি। তুলতে পারিনি।

তাদের দেশপ্রেম নিয়ে আমার যেহেতু কোন সন্দেহ ছিল না; তাই আমি মার্কসবাদের দর্শন ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে তর্ক তুলতাম। কিন্তু মার্কসবাদ সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল খুবই কম। অন্যদিকে আমার বামপন্থি বন্ধুরা মার্কসবাদ গুলিয়ে খেয়েছে। তারা যখন মুখ খুলতো তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি অজ্ঞ ও মুর্খ হিসেবে প্রতিপন্ন হতাম। ফলে কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে আমার সেই কট্টর মনোভাব ধীরে ধীরে সহজ হতে শুরু করে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমাকে কম্যুনিজম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে।

আমি শিগগিরই মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্টালিন, মাও সে তুং এবং অন্যান্য বাম নায়কদের বইপত্র যোগাড় করে পড়াশুনা শুরু করলাম। ডায়ালেক্টিক্যাল ও হিস্টোরিক্যাল বস্তুবাদের দর্শন সম্পর্কে জানার জন্য গভীর মনোযোগ দিয়ে সেগুলো পড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভালভাবে পড়ার মতো আমি সময় পেতাম খুব কম। একদিকে কম্যুনিস্ট ইশতেহার পড়ে আমি যেমন উজ্জীবিত হয়েছি অন্যদিকে দাস ক্যাপিটাল আমাকে হতাশ করেছে। তবে শ্রেণী সমাজের আইডিয়া সম্পর্কে কম্যুনিজমের ধারণা আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছে। আমার মনে হয়েছে কম্যুনিজমে যে ক্লাসেস সোসাইটির কথা বলা হয়েছে তার সংগে আমাদের আফ্রিকার ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির মিল রয়েছে। ক্লাসেস সোসাইটির ধারণার মতোই আফ্রিকানরা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক পারস্পরিক নির্ভরতা নিয়ে সমাজে বাস করে। আমি খুব শিগগিরই মার্কসের 'যতটুকু যোগ্যতা ততটুকু অনুযায়ী নাও। যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ভোগ করো'— এই নীতির প্রতি ঝুঁকে পড়লাম।

ডায়ালেক্টিক্যাল বস্তুবাদ আমার কাছে একদিকে বর্ণবাদী নির্যাতনের ঘোর অন্ধকার চেনার পথ হিসেবে আবির্ভূত হলো। অন্যদিকে এ দর্শনকে নির্যাতন থেকে মুক্তির অস্ত্র হিসেবেও মনে হলো আমার। সাদা ও কালোদের সম্পর্ক কী; তারা একজন আরেকজন সম্পর্কে কী ধারণা করে সেটা বুঝতে ডায়ালেক্টিক্যাল বস্তুবাদ আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। আমরা যদি সরকারের উৎপীড়ন বন্ধের সংগ্রামে সফল হই, তারপরও যে সাদা-কালোর বিভেদ একটা সমস্যা হিসেবে থেকে যাবে তা বুঝতে পারি। আমি বুঝতে পারি আগ্রাসীদের প্রতিরোধের পর

আমাদের সাদা-কালোর বিভেদ বৈষম্যকে জয় করতে হবে। আমি বরাবরই বাস্তববাদী মানুষ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কিছু বিশ্বাস করতে পছন্দ করি না। হয়তো সে মানসিকতার কারণে ডায়ালেক্টিক্যাল বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমাকে আকর্ষণ করেছিল। শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী দ্রব্যের মূল্য নির্ধারনের আইডিয়া দেয় এই বস্তুবাদ। দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার জন্য এ আইডিয়াকে আমার খুবই কার্যকর মনে হয়েছিল।

মার্কসবাদের অন্য যে দিকটি আমাকে আকর্ষণ করেছিল সেটি হলো বিপ্লবের আহ্বান। একজন মুক্তিযোদ্ধার কানে মার্কসবাদের বিপ্লবমন্ত্র মধুর সংগীতের মতো কাজ করে।

মার্কসবাদে বলা হয়েছে বিপ্লব ও সংগ্রামের পথেই পরিবর্তন আসে। পরিবর্তন ইতিহাসকে অগ্রগামী হতে সাহায্য করে। মার্কসবাদী লেখায় আমি দেখলাম শুধুমাত্র প্রমিত রাজনীতি ও কূটনীতির স্থান নেই। সেখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এসে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে। আমি খেয়াল করলাম মার্কসবাদীরা সব সময়ই ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্টের কথা বলে এবং উপনিবেশিক এলাকায় নিষ্পেষিত মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন দিয়ে থাকে। এসব বিষয়ও আমাকে কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সহায়তা করে। ক্রমে ক্রমে আমি এএনসিতে কম্যুনিস্টদের অন্তর্ভুক্তিকে স্বাগত জানাতে শুরু করি।

একবার আমার এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কীভাবে আমি একইসংগে আফ্রিকান ন্যাশনালিজম ও ডায়ালেক্টিক্যাল ম্যাটারিয়ালিজমে বিশ্বাসী হলাম। আমি তাকে বলেছিলাম যে এক্ষেত্রে আমার মধ্যে কোন মতদ্বৈততা নেই। প্রথমত, আমি একজন আফ্রিকান এবং আমি আমার জাতীয় অধিকার আদায়ের আন্দোলনের একজন সৈনিক। একইসাথে আমার দেশ আফ্রিকা, আফ্রিকান উপমহাদেশ এই বিশ্বেরই অংশ। আমি আমার দেশকে মুক্ত করার চেষ্টা করছি। অন্যদিকে, এই পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে আমার দেশ বিশ্বমানচিত্রে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করছে। সেই চেষ্টায় আমার সমর্থন রয়েছে। এএনসির দর্শন অনুযায়ী আমি দেশের সৈনিক। আর ডায়ালেক্টিক্যাল বস্তুবাদী দর্শনের দৃষ্টিকোন থেকে আমি সমগ্র নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীর সৈনিক। যেখানেই মানবাধিকার নিগৃহীত হোক সেখানেই আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে আমি বিশ্বাস করতাম বামপন্থিদের সংগে কাজ করতে হলে আমাকে কম্যুনিস্ট হতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমি বুঝতে পেরেছিলাম আফ্রিকান ন্যাশনালিস্ট এবং আফ্রিকান কম্যুনিস্টদের গুলিয়ে ফেলা যেমন অসম্ভব তেমনি তাদের আলাদা করে ফেলাও সম্ভব নয়। কট্টরপন্থিরা বলতো, কম্যুনিস্টরা আমাদের ব্যবহার করছে। কিন্তু কেউ কি এ কথা বলতে পারতো না যে শুধু তারা নয় আমরাও তাদের ব্যবহার করছি।

ন্যাশনাল পার্টির নীতি সম্পর্কে প্রথম দিকে আমাদের সামান্য আশাবাদ ও আগ্রহ থাকলেও তারা ক্ষমতায় বসার কিছু আগেই তা উবে যায়। আমরা এ পার্টির ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্ক হয়ে উঠি। 'কাফিরদের' তাদের জায়গায়ই রাখা হবে– ন্যাশনাল পার্টির এমন ঘোষণা মোটেও গুরুত্বহীন ছিল না। কম্যুনিজম দমন আইন ছাড়াও ১৯৫০ সালে পাশ হওয়া দুটি কালো আইন অ্যাপারথেইডের ভিত্তি মজবুত করে দিয়েছিল। এর একটি হলো পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট এবং অন্যটি হলো গ্রুপ এরিয়াস অ্যাক্ট। আগেই বলেছি পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবেই বর্ণ ও গোত্র অনুসারে সমগ্র আফ্রিকান জাতিকে বিভাজন করার ক্ষমতা দিয়েছিল। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজে জাতিভেদ প্রথা অপরিহার্য সংস্কার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। এ আইনের জন্য মিশ্র বর্ণের দম্পতি ও তাদের ছেলে মেয়েদেরও ভয়ানক জাতি বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। একজন কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানের সংগে একজন নিগ্রো অথবা একজন শ্বেতাঙ্গের সংগে একজন নিগ্রোর বিয়ে হওয়ার পর তারা মহাসমস্যায় পড়েছিল। স্বামী-স্ত্রী দুইজনের জন্য সরকারের দুই রকমের নীতি। শুধু তাই নয়; তাদের সন্তান সন্ততিরাও সমস্যায় পড়তো। যে সন্তানটির গায়ের রং সাদা তার জন্য একরকম আর যে সন্তানের গায়ের রং কালো তার জন্য অন্য রকম ব্যবস্থা। অর্থাৎ সরকারের এই জাতিবৈষম্য নীতির বিরুপ প্রভাব পারিবারিক জীবনেও মহা অশান্তি ডেকে এনেছিল।

গ্রুপ এরিয়াস অ্যাক্ট ছিল আবাসন বিষয়ক জাতি বৈষম্যের ভিত্তি। এ আইনের বিধি অনুযায়ী আলাদা আলাদা জাতিগোষ্ঠীকে তাদের জন্য নির্ধারিত আলাদা আলাদা এলাকায় জমি কেনা, ব্যবসা করা, শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ একজন ভারতীয় শুধুমাত্র ভারতীয়দের জন্য নির্ধারিত এলাকাতেই বসবাস করতে পারতো। একইভাবে আফ্রিকানরা আফ্রিকান এরিয়ায় এবং নিগ্রোরা নিগ্রোদের নির্ধারিত এলাকায় থাকতে পারতো। কিন্তু সাদারা যদি অন্য কোন জাতির নির্ধারিত জায়গা দখল করতে চায় তাহলে সহজেই তা সম্ভব হতো। তারা শুধুমাত্র ওই এলাকাটাকে 'হোয়াইট এরিয়া' বলে ঘোষণা দিতো। ব্যাস্, সেখান থেকে জমির মালিকদের উঠে যেতে হতো। সেখানে উড়ে এসে জুড়ে বসতো সাদারা। এই গ্রুপ এরিয়াস অ্যাক্ট জোরপূর্বক উচ্ছেদ করার সরকারি প্রবণতার সূচনা করেছিল। শহরগুলোর আশেপাশে বহু আফ্রিকান, নিগ্রো ও ভারতীয় শহুরে পল্লী গড়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন বসবাসের মাধ্যমে তারা তাদের বসতবাড়ি ও রাস্তাঘাট বেশ উন্নত করে তুলেছিল। এ

আইন পাশ হওয়ার পর শ্বেতাঙ্গরা সেদিকে হাত বাড়ালো। তারা এসব এলাকাকে হোয়াইট এরিয়া ঘোষণা দিয়ে সেখান থেকে বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করলো।

বসতি উচ্ছেদের তালিকার শীর্ষে ছিল সোফিয়াটাউন। জোহান্সবার্গের উপকণ্ঠে যে কয়টি প্রাচীন কৃষ্ণাঙ্গ বসতি ছিল তার মধ্যে সোফিয়াটাউন অন্যতম। এখানে ৫০ হাজারের বেশি আফ্রিকান বাস করতো। এখানকার লোকজনের হাতে তেমন একটা অর্থকড়ি না থাকলেও তারা অন্যান্য আফ্রিকানদের তুলনায় অনেক বেশি কেতাদূরস্ত ও শহুরে জীবনযাপন করতো। আফ্রিকান জীবন ও সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ করার ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট অবদান ছিল। এই বসতিটি শ্বেতাঙ্গ সরকার জোর করে উপড়ে ফেলে দিল।

এর পরের বছর সরকার আরও দুটো কালো আইন পাশ করে যা সরাসরি নিগ্রো এবং আফ্রিকানদের অধিকারের ওপর আঘাত হানে। এর একটি হলো দি সেপারেট রিপ্রেজেন্টেশন অব ভোটার অ্যাক্ট। এর মাধ্যমে নিগ্রোদের শুধুমাত্র কেপ এলাকার স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকার দেওয়া হলো। এতদিন তারা সবখানেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতো। কিন্তু এ আইনের মাধ্যমে সে অধিকার হরণ করা হয়। আরেকটি আইন হলো দি বান্টু অথোরিটিস অ্যাক্ট। এর মাধ্যমে আদিবাসী প্রতিনিধি পরিষদ বিলুপ্ত করা হলো। এ পরিষদ ছিল আফ্রিকানদের জাতীয় প্রতিনিধিত্বের পরোক্ষ ফোরাম। সরকার এটিকে বিলুপ্ত করে তার জায়গায় তাদের পছন্দমতো উপজাতিয় দলনেতা নিয়োগ করলো। এর মাধ্যমে সরকার চাইছিল তাদের পছন্দমতো রক্ষণশীল গোত্র নেতাদের বসাতে যাতে বিভিন্ন জাতি বর্ণের মধ্যে কলহ বিবাদ লেগেই থাকে। এই দুটি আইন ন্যাশনালিস্ট সরকারের দমনমূলক চরিত্রকে আরও প্রকাশিত করেছিল। তারা কার্যতঃ যে সব জিনিস ধ্বংস করতে চাচ্ছিল একই সংগে সেসব জিনিস রক্ষার ভানও করে যাচ্ছিল। তারা মানবাধিকারকে পায়ে পিষে মুখে তা সমুন্নত রাখার বুলি আওড়াচ্ছিল।

নিগ্রো সম্প্রদায় সরকারের জারিকৃত নতুন সেপারেট রিপ্রেজেন্টেশন অব ভোটার অ্যাক্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করলো। ১৯৫১ সালের মার্চে কেপটাউনে তারা বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করলো। এপ্রিলে তারা ধর্মঘটের ডাক দিয়ে দোকান-পাট, স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিল। তাদের বিক্ষোভে সমর্থন দিল ভারতীয় ও আফ্রিকানরা। ওয়াল্টার সিসুলু ভারতের মহাত্মা গান্ধীর মতো জাতীয়ভাবে সরকারি আইন লংঘন প্রচারণার প্রস্তাব দিলেন। তিনি ঠিক করলেন নিগ্রো, আফ্রিকান ও ভারতীয়দের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কিছু স্বেচ্ছাসেবক আইন লংঘন করে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করবে।

সিসুলু আমিসহ অন্যদের কাছে তার পরিকল্পনার কথা জানালেন। কিন্তু আমি তার প্রস্তাবের সংগে আংশিক একমত হলাম। আমার প্রশ্ন ছিল আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে কারা? ওই সময় আমি ইয়ূথলীগের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট। আমি বললাম এই বিদ্রোহ প্রচারণা আফ্রিকানরা আলাদাভাবে করবে। আমি বললাম, বেশিরভাগ আফ্রিকান ভারতীয় ও নিগ্রোদের সংগে এক হয়ে আন্দোলন করার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ। কম্যুনিস্টদের ব্যাপারে ওই সময় আমার কিছুটা নমনীয় মনোভাব থাকলেও ভারতীয়দের প্রভাব বিস্তারের প্রবণতাকে তখনও আমি ঘোর সন্দেহের চোখে দেখতাম।

এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের বহু সমর্থক ভারতীয়দের কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের শ্রম বাজার ধ্বংসকারী হিসেবে দেখতো। ভারতীয়রা ব্যবসা বাণিজ্য করায় আফ্রিকানরা তাদের রুটি রুজিতে ভাগ বসানোর জন্য ভারতীয়দের ভালো চোখে দেখতো না।

কিন্তু ওয়াল্টার আমার বক্তব্যের তীব্র বিরোধীতা করলেন। তিনি বললেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয়, নিগ্রো ও আফ্রিকানরা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে পড়েছে। তারা সবাই একজোট হয়ে আন্দোলন করবে। তবে সিসুলুর একার কথায় সিদ্ধান্তে পৌছানো গেল না। এ প্রস্তাব এএনসির জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে উত্থাপন করা হলো। প্রস্তাবের বিষয়ে ভোট হলো। ভোটে আমি হেরে গেলাম। এমনকি যারা কট্টর আফ্রিকান ন্যাশনালিজমে বিশ্বাসী তারাও আমার প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিল। কিন্তু আমি তাতেও দমে যাইনি। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে ন্যাশনাল কনফারেন্সে আমি যৌথ আন্দোলনের বিরোধীতা করে তা বাতিলের আবেদন জানালাম। কিন্তু যেহেতু নির্বাহী কমিটিতে ভোটাভুটি শেষে সিসুলুর প্রস্তাব পাশ হয়েছে তাই ডেলিগেটরা আমার বক্তব্যকে আমলে নিলেন না। এএনসির সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় আমি অনুমোদিত যৌথ আন্দোলন প্রস্তাবে সমর্থন দিলাম। ইতিপূর্বে সব সময় আমি 'একলা চলো' নীতি অনুসরণ করতাম। কিন্তু এখন যেহেতু আমি ইয়ূথলীগের প্রেসিডেন্ট, সেহেতু আমাকে আনুষ্ঠানিক সমর্থন দিতেই হলো।

যৌথ আন্দোলনের কার্যসূচী নির্ধারণে ড. মোরোকা, ওয়াল্টার, জে. বি. মার্কস, ইউসুফ দাদু এবং ইউসুফ কাচালিয়া মিলিত হয়ে একটি জয়েন্ট প্ল্যানিং কাউন্সিল গঠন করেন। তাদের উদ্যোগে এএনসি কনফারেন্সে একটি আল্টিমেটাম প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ওই প্রস্তাবে ১৯৫২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সরকারকে সাপ্রেশন অব কম্যুনিজম অ্যাক্ট, গ্রুপ এরিয়াস অ্যাক্ট, সেপারেট রিপ্রেজেন্টেশন অব ভোটারস অ্যাক্ট, বান্টু অথোরিটিস অ্যাক্ট, পাশ ল' এবং স্টক লিমিটেশন ল' বাতিল করার আহ্বান জানানো হয়।

কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত হয় সরকার আমাদের দাবি না মানলে কালো আইনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিক্ষোভের ভূমিকা হিসেবে ১৯৫২ সালের ৬ এপ্রিল এএনসি প্রাথমিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। ৬ এপ্রিলকে বিক্ষোভের দিন হিসেবে ধার্য করার একটি বিশেষ কারণ ছিল। ১৬৫২ সালের এই দিনে শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানদের পূর্বপুরুষ জ্যঁ ভ্যান রিবিক তার লোকজন নিয়ে এদেশে আসে। ওই দিনটি শ্বেতাঙ্গরা বিশেষ মর্যাদায় পালন করে থাকে। ওই দিনকে শ্বেতাঙ্গরা দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের জাতি প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে এবং কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানরা তাদের ক্রীতদাস হওয়ার জন্য কালো দিবস পালন করেন। সে বারের ৬ এপ্রিল ছিল জ্যঁ ভ্যান রিভিকের ৩শ'তম বার্ষিকী। সিদ্ধান্ত হলো ওই তিনশ' তম বার্ষিকীতেই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হবে।

এএনসির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে আল্টিমেটাম দিয়ে একটি খসড়া চিঠি লেখা হলো। চিঠিটার খসড়া তৈরির সময় ড. মোরোকা সেখানে ছিলেন না। তিনি তখন অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে ব্লোয়েমফন্টেইনের পাশের শহর থাবাঞ্চুতে তার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। যেহেতু তিনি দলের প্রেসিডেন্ট সেহেতু প্রেরক হিসেবে তার নাম বসানো হলো। এখন চিঠিটা তাকে দেখিয়ে তার স্বাক্ষর নিয়ে সেটি প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে পাঠাতে হবে। শীর্ষ নেতারা আমাকে চিঠিটা তার কাছে নিয়ে সই করিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে আমি ড্রাইভিংয়ের পরীক্ষা দিয়েছি। তখনকার দিনে একজন আফ্রিকানের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা অনেকটা বিরল ঘটনা ছিল। কারণ তখন আফ্রিকানদের খুব কম লোকই গাড়ির মালিক ছিলেন। আমার নিজের গাড়ি না থাকলেও অনেকটা সখ করেই ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করলাম। ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে হলে পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা দেওয়ার জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করেছিলাম। পরীক্ষার দিন নিজেই গাড়ি চালিয়ে পরীক্ষাস্থলের দিকে রওনা হয়েছিলাম। অতিআত্মবিশ্বাসী হয়ে বেশ জোরেই চালাতে লাগলাম। কিন্তু যাওয়ার পথেই সেদিন বিপত্তি ঘটলো। অপরদিক থেকে আসা আরেকটা গাড়ির সংগে আমার গাড়ির সংঘর্ষ হলো। ক্ষয়ক্ষতি খুব কমই হলো। যাহোক অন্যগাড়ির ড্রাইভার ক্ষতি স্বীকার করে আমাকে মাফ করে দিয়ে চলে গেলেন। দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তারপর পরীক্ষাকেন্দ্রে আসলাম। তবে এখানে কোন অঘটন ঘটলো না। আমি ভালভাবেই পাশ করলাম।

নতুন লাইসেন্স পাওয়ায় মোটরগাড়ি চালানোয় বেশ মজা পাচ্ছিলাম। এ কারণে ধার করা গাড়িটাকে আরও কিছুদিনের জন্য নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলাম। সবাই যখন এএনসির চিঠিটা ড. মোরোকার কাছ থেকে সই করিয়ে আনার জন্য অনুরোধ করলো, আমি তাতে সানন্দে রাজি হলাম। আমার মূল আনন্দের কারণ

ড. মোরোকার সংগে একান্তে সাক্ষাৎ করা নয় বরং ড্রাইভিং সিটে বসে রাস্তার দুপাশের পাহাড়ি দৃশ্য উপভোগ করার চিন্তা থেকেই আমি চিঠিটা পৌছে দিতে রাজি হলাম।

জোহান্সবার্গ থেকে ১২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত কনজারভেটিভ ফ্রি স্টেট টাউন নামে খ্যাত ক্রুসটাড শহরের মধ্য দিয়ে আমি ড. মোরোকার এলাকা থাবাঞ্চুর দিকে যাচ্ছিলাম। পুরো এলাকাটা পাহাড়ি। পথঘাট উঁচুনিচু। আমি গাড়ি চালিয়ে ঢালু রাস্তা ধরে ওপরের দিকে উঠছিলাম। হঠাৎ দেখলাম দুটো শ্বেতাঙ্গ ছেলে বাইসাইকেলে চড়ে আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভিংয়ের সময় তখনও আমার কিছুটা হাত কাঁপে। আমি যখন তাদের খুব কাছে এসে গেছি তখন হঠাৎ একটা ছেলে সিগন্যাল না দিয়েই ইউটার্ন নিল। যা হবার তাই হলো। ছেলেটার সাইকেল আর আমার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো।

ছেলেটা সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে আমি তাকে টেনে তুলতে গেলাম। দেখলাম সে ব্যথায় কাতরাচ্ছে। সে আমার দিকে হাত বাড়ালো। আমি তাকে যখন ধরতে গেলাম, পেছন থেকে একজন শ্বেতাঙ্গ ট্রাক ড্রাইভার চেঁচিয়ে উঠে তাকে না ছোঁয়ার জন্য আমাকে ইঙ্গিত দিলো। ট্রাক ড্রাইভার ছেলেটাকে এমনভাবে ভয় দেখালো যে সে তৎক্ষণাত আমার দিকে তার বাড়িয়ে দেওয়া হাত নামিয়ে ফেললো। সে যেন বোঝাতে চাইল যে সে আমার হাত ধরতে চায়নি। ছেলেটা খুব বেশি আঘাত পায়নি। তারপরও ট্রাক ড্রাইভারটি তাকে নিয়ে সোজা নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে চলে গেল।

আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ চলে এল। শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট খানিকক্ষণ আমার আপাদমস্তক দেখে বললেন, '*কাফির, জেই সাল কাক ড্যানডগ!*' (কাফির, আজকে তোমাকে পায়খানা করিয়ে ছাড়বো)। দুর্ঘটনা ঘটার জন্য এমনিতেই আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তারওপরে সার্জেন্টের এমন কথায় ঘাবড়ে গেলাম। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললাম, পায়খানা এলে আর আমার ইচ্ছে হলেই আমি বাথরুমে যাই। কোন পুলিশের কথায় ভয়ে পায়খানা করে দেওয়ার মতো বদঅভ্যাস আমার নেই। লোকটা আমার কথা শুনে কটমট করে তাকিয়ে পকেট থেকে নোটবুক বের করলো। আমি কে, কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছি এসব নোট করার জন্য ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানার ওই পুলিশ আমার সহজ ও দ্রুত উচ্চারণের ইংরেজী শুনে থতমত খেয়ে গেল। আফ্রিকানদের মধ্যে খুব কম লোকই ইংরেজী বলতে পারতো। আমার উচ্চারণ শুনে সে কারণেই সে সন্দিগ্ধ হয়ে আমার দিকে তাকালো।

আমার পরিচয়ের খুঁটিনাটি সব নোট করার পর সার্জেন্ট এবার আমার গাড়ির দিকে ঘুরলো। তারপর দরোজা খুলে গাড়ির মধ্যে তল্লাশি চালানো শুরু করলো। গাড়ির ভেতরের ফ্লোর ম্যাট উঁচু করে তার নিচ থেকে বের করে আনলো বামপন্থিদের সাপ্তাহিক 'দি গার্ডিয়ান'। দুর্ঘটনার পরপরই আমি ম্যাগাজিনটি

সেখানে লুকিয়ে ফেলেছিলাম। (ড. মোরোকার কাছে যে চিঠি নিয়ে যাচ্ছিলাম সেটা আগেই জামার ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলাম।) লোকটা ম্যাগাজিনটা বের করে এমনভাবে সেটাকে শূন্যে তুলে ধরলো যেন সে বামাল সমেত কোন জলদস্যুকে আটক করে ফেলেছে। সে চিৎকার করে বললো, *'র‍্যাগাটিগ ওনস হেট এন কোমুনিস গেভাং!* (ইয়া খোদা! আমরা তো কুখ্যাত এক কম্যুনিস্টকে ধরেছি!) ম্যাগাজিনটা উঁচিয়ে ধরে তার হম্বিতম্বি করা দেখেই বুঝলাম লোকটা আমাকে জটিল প্যাঁচে ফেলতে চাচ্ছে। লোকটা আমাকে থানায় নিয়ে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল।

চারঘন্টা বাদে সার্জেন্ট আরেকজন শ্বেতাঙ্গ অফিসারকে সংগে নিয়ে ফিরলো। তখন রাত হয়ে গেছে। নতুন অফিসারটিকে দেখে তাকে দায়িত্বশীল বলেই মনে হলো।

তিনি বললেন, পুলিশ রেকর্ডের স্বার্থে দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে চান। আমি তাকে বললাম, ঘটনাটা যেহেতু দিনের বেলায় ঘটেছে সেহেতু রাতে ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করে আসল চিত্র বোঝা যাবে না। আমি তাকে এটাও বললাম যে আমাকে থাবাঞ্চু গিয়ে রাত কাটাতে হবে। কারণ ক্রুসটাডে আমার কোন আত্মীয় নেই। এখানে হোটেলে থাকার মতো টাকা পয়সাও আমার হাতে নেই।

নতুন অফিসারটি আমার দিকে অসহিষ্ণুভাবে দৃষ্টি ছুঁড়ে বললেন, 'তোমার নাম কি?'

–'ম্যান্ডেলা'– আমি বললাম।

–'না-না- আমি তোমার ফার্স্ট নেম জানতে চাচ্ছি।' অফিসার আমাকে তাড়া দিয়ে বললেন। আমি নাম বললাম।

নাম শুনে বললেন, 'ও আচ্ছা ম্যান্ডেলা!' তারপর আমি যেন একটা বাচ্চা ছেলে সেভাবে আমার দিকে দৃষ্টি রেখে বললেন, 'দ্যাখো ম্যান্ডেলা, তুমি আজ রাতেই যাতে তোমার গন্তব্যে যেতে পারো সেজন্য আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু তুমি যদি আমার সংগে কোন চালাকি করো তাহলে কিন্তু আমার পক্ষেও তোমার সংগে ভালো ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। এমনকি তোমাকে সারারাত থানায় আটকে না রেখে পারা যাবে না।' তার এ কথায় আমি দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণে সহায়তা করতে রাজি হলাম।

থানা পুলিশের ঝামেলা মিটিয়ে ভোর রাতে আমি থাবাঞ্চুর দিকে ফের যাত্রা শুরু করতে পারলাম। রাত শেষে যখন ভোর হচ্ছিল তখন আমি এক্সেলসিওর শহর অতিক্রম করছিলাম। হঠাৎ গাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। দেখলাম গাড়ির পেট্রল শেষ। তাড়াতাড়ি কাছের একটা ফার্ম হাউসে গেলাম। আমার ডাকাডাকি শুনে একজন বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ মহিলা বেরিয়ে এলেন। আমি তাকে বিনীতভাবে বললাম আমার

পেট্রোল দরকার। আমি তার কাছ থেকে একটু পেট্রোল কিনতে চাই। সাদা ওই বৃদ্ধা আমার কথা পুরোপুরি না শুনেই দরোজা বন্ধ করে দিলেন। দরোজার খিল লাগাতে লাগাতে বললেন 'তোমার কাছে বিক্রি করার মতো কোন পেট্রোল এখানে নেই। তুমি অন্য কোন চুলোয় যাও!' অগত্যা আমাকে প্রায় দুই মাইল পথ গাড়ি ঠেলে পেট্রোলের সন্ধানে পরবর্তী ফার্ম হাউসে আসতে হলো। মনে মনে ঠিক করলাম এবার অন্যভাবে পেট্রোল চাইতে হবে। তা নাহলে এরাও আমাকে ওই বুড়ির মতো ফিরিয়ে দিতে পারে।

খামারের সামনে গিয়ে খামার মালিককে খুঁজতেই তিনি বেরিয়ে এলেন। তিনি কাছে আসতে গাড়িটাকে দেখিয়ে তাকে বললাম, 'আমার বাসের (Bass) পেট্রোল শেষ হয়ে গেছে। (শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানাররা Boss বা উর্ধতনকে তাদের ভাষায় Bass বলে।) আফ্রিকানার ভাষার শব্দ ব্যবহারে কাজ হলো। লোকটা খুব আন্তরিকভাবে সাহায্য করলেন। তার সাথে আলাপ হওয়ার পর জানতে পারলাম তিনি ন্যাশনালিস্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ আমাদের প্রধান শত্রু স্ট্রাইডোমের আত্মীয়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝলাম লোকটা আসলেই সজ্জন ব্যক্তি। তাকে যদি আমি আমার সত্যিকার পরিচয় দিতাম এবং বাস্ (Bass) শব্দটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার নাও করতাম তাহলেও তিনি আমাকে সাহায্য করতেন বলে আমার বিশ্বাস।

যাত্রাপথে এত বাধা বিপত্তির মুখে পড়ে ধারণা করেছিলাম ড. মোরোকার ওখানে না জানি আবার কী সমস্যায় পড়তে হয়। কিন্তু গিয়ে দেখলাম যাত্রাপথে আমার যত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তার তুলনায় ড. মোরোকার সংগে সাক্ষাৎ হওয়ার ব্যাপারটা কিছুই না! যাওয়ামাত্রই তিনি চিঠিতে সই করে দিলেন। চিঠি নিয়ে তখনই আবার জোহান্সবার্গের পথে রওনা হলাম। প্রধানমন্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে জানানো হলো সরকারের সংবিধান সংশোধন ও কালো আইন পাশের ব্যাপারে এএনসি ক্ষুব্ধ। ১৯৫২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৬টি কালো অধ্যাদেশ বাতিল করতে হবে অন্যথায় আমরা সংবিধান বহির্ভূত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবো। চিঠি দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে মালানের উত্তর এলো। তার প্রাইভেট সেক্রেটারির সই করা চিঠিতে তিনি আমাদের জানিয়ে দিলেন আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করার এবং আলাদা জাতি হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার শ্বেতাঙ্গদের রয়েছে। এ কারণেই আইনগুলো তৈরি করা হয়েছে। চিঠির শেষে আমাদের হুমকি দিয়ে বলা হলো, আমরা যদি কোন ধরণের রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা চালাই তাহলে তা দমন করার জন্য সরকার যে কোন ধরণের পদক্ষেপ নেবে। কাউকে ছাড় অথবা রেহাই দেওয়া হবে না।

আমাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে পাঠানো মালানের এই জবাবকে আমরা যুদ্ধঘোষণা হিসেবেই ধরে নিলাম। আমাদের সামনে এখন সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স বা গণহারে আইন লংঘনের ঘটনা ঘটানো ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকলো না। আমরা স্বাভাবিকভাবেই গণবিদ্রোহ চালানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়াটাই

আমাদের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে হাজির হলো। আমরা জানতাম এর ওপরেই আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করছে। পূর্বপরিকল্পনামাফিক ৬ এপ্রিল জোহান্সবার্গ, প্রেটোরিয়া, পোর্ট এলিজাবেথ, ডারবান ও কেপটাউনে আমরা প্রাথমিক বিক্ষোভ পালন করলাম। জোহান্সবার্গের ফ্রিডম স্কোয়ারের জনসভায় যখন ড. মোরোকা বক্তব্য দিচ্ছিলেন আমি তখন ওই শহরেই গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের একদল স্বেচ্ছাসেবীর সংগে কথা বলছিলাম। সেখানে কয়েকশ ভারতীয়, আফ্রিকান ও নিগ্রো স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব একদিকে যেমন ঝুঁকিপূর্ণ অন্যদিকে তা অত্যন্ত কঠিন। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জেল-জুলুমের মুখে পড়তে হবে। সরকারের নির্যাতন মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের মনে রাখতে হবে যত নির্যাতন উৎপীড়নই চালানো হোক না কেন, কোন কিছুর পরোয়া করা যাবে না। দমন পীড়নে পিছু হঠলে সরকার আমাদের গুরুত্বহীন মনে করবে এবং অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেবে। তাদের বললাম স্বেচ্ছাসেবীদের সহিংস আচরণের মোকাবেলায় অহিংস মনোভাব দেখাতে হবে। ভায়োলেন্সকে নন-ভায়োলেন্স দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো সর্বশক্তি দিয়ে ডিসিপ্লিন বা শৃংখলা ধরে রাখতে হবে।

৩১শে মে এএনসি এবং এসআইসির এক্সিকিউটিভরা পোর্ট এলিজাবেথে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। ওই বৈঠক শেষে ঘোষণা করা হলো প্রথম জাতীয় প্রতিরোধ দিবসের বর্ষপূর্তির দিন অর্থাৎ ২৬ জুন থেকে সর্বাত্মক বিক্ষোভ প্রচারণা শুরু করা হবে। ওই বৈঠকেই ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য ন্যাশনাল অ্যাকশন কমিটি এবং স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার বোর্ড গঠন করা হলো। আমাকে বিক্ষোভ পরিচালনার জন্য ন্যাশনাল-ভলান্টিয়ার-ইন-চিফ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হল। একইসংগে অ্যাকশন কমিটি ও ভলান্টিয়ার বোর্ডেরও চেয়ারম্যান করা হল আমাকে। ক্যাম্পেইন সংগঠিত করা, আঞ্চলিক শাখা সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা এবং তহবিল সংগ্রহ করা ছিল আমার মূল কাজ।

ভারতে মহাত্মা গান্ধী সত্যগ্রহ নামে যে ব্রিটিশবিরোধী অহিংস আন্দোলন শুরু করেছিলেন আমরা সেই আদর্শ অনুসরণ করে প্রচারণা চালানো যায় কিনা তা নিয়ে আলোচনায় বসলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এ আন্দোলনকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে বললেন অন্য কোন পন্থার চেয়ে এটিই নৈতিকতার দিক থেকে সর্বোত্তম পথ। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রকাশিত ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রিকার সম্পাদক ও মহাত্মা গান্ধীর ছেলে মনিলাল গান্ধী এই মতের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। এছাড়াও তিনি সাউথ আফ্রিকান ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। মনিলাল তার পিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই হয়তো তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায়ও একইভাবে অহিংস আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব করেছিলেন।

কিন্তু অন্যরা পাল্টা যুক্তি দিয়ে বললেন, আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং কৌশলগত দিক বিবেচনা করেই আন্দোলনের ধরণ ঠিক করতে হবে। আন্দোলনের ধরণ কোনটি বেশি নৈতিক তা দেখার সময় এখন নয়। এখন দেখতে হবে কোন প্রক্রিয়ায় এগুলে আন্দোলন সফল হবে। পরিস্থিতি আমাদের যে কৌশল অবলম্বন করতে নির্দেশনা দেবে আমাদের ঠিক সেভাবেই কাজ করতে হবে।

এই যুক্তিকে সামনে ধরেই আমি বললাম আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। এখন আমরা যদি সহিংস বিক্ষোভের দিকে যাই তাহলে নিশ্চিতভাবেই তারা আমাদের গুড়িয়ে দেবে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে নন-ভায়োলেন্স আন্দোলন করাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। অর্থাৎ আদর্শিক বিবেচনায় নয় বরং কৌশলগত দিক বিবেচনা করলেও আমাদের অহিংস আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া উচিত। গান্ধী নিজেও বিশ্বাস করতেন নিজেদের ভরাডুবি থেকে এড়ানোর জন্য তারা অহিংস আন্দোলন করেছিলেন।

আমি বললাম, যতদিন পর্যন্ত অহিংস আন্দোলন আমাদের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখবে ততদিন পর্যন্ত আমরা তা চালিয়ে যাবো। আমার এ প্রস্তাবের পক্ষে অধিকাংশ নেতাকর্মী সমর্থন দিলেন।

বিক্ষোভের যৌথ পরিকল্পনা পরিষদ অসহযোগ (নন-কোঅপারেশন) ও অহিংস (নন-ভায়োলেন্স) উভয় আন্দোলনই চালিয়ে যেতে রাজি হল। দুই পর্যায়ের প্রতিরোধ গড়ার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন কৌশল হিসেবে অল্প কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবীকে হাতেগোনা নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় গিয়ে আইন ভঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয়, শহরের গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গায় গিয়ে তারা সুনির্দিষ্ট কিছু সরকারি আইন লংঘন করবে। যেমন পারমিট ছাড়াই সংরক্ষিত এলাকায়, শ্বেতাঙ্গদের টয়লেটে, অথবা শ্বেতাঙ্গদের নির্ধারিত ট্রেন কম্পার্টমেন্টে, ওয়েটিং রুম, পোস্ট অফিস এনট্রেন্স ইত্যাদিতে ঢুকে পড়বে। কারফিউ ঘোষিত হলে তারা বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নেবে। প্রত্যেক গ্রুপে একজন করে নেতা থাকবেন। তারা আইন লংঘনের আগেই পুলিশকে ইনফর্ম করবে যাতে বড় ধরণের বিশৃংখলা সৃষ্টির আগেই পুলিশ সেখানে পৌঁছে তাদের অক্ষত অবস্থায় গ্রেফতার করতে পারে।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়টি হবে ব্যাপক আকারে। এ পর্যায়ে হাজার হাজার লোক রাস্তায় নেমে পড়বে, ধর্মঘট করবে এবং শিল্প কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চালাবে। এ পর্যায়টিতে বিক্ষোভের ধরণ হবে কিছুটা মারমুখী।

প্রকাশ্য গণবিক্ষোভের উদ্বোধন করতে ডারবানে ২২ জুন স্বেচ্ছাসেবীরা এক বিক্ষোভ র‍্যালীর ডাক দেয়। নাটাল এএনসির প্রেসিডেন্ট চিফ লুথুলি এবং নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ড. নাইকার এ র‍্যালীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালেন এবং র‍্যালী সফল করার জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি

দিলেন। র‍্যালীর আগের দিনই আমি গাড়ি চালিয়ে ডারবান পৌঁছে গেলাম। সেখানে সমাবেশে আমাকে প্রধান বক্তা হিসেবে আগেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পরের দিন সমাবেশ স্থলে গিয়ে দেখলাম সেখানে প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি লোক হাজির হয়েছে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমি বললাম, দক্ষিণ আফ্রিকার নির্যাতিত মানুষ মুক্তির জন্য যে কতটা উদগ্রীব হয়ে আছে তা এই জনসমুদ্র দেখলে বোঝা যায়। এর আগে আমি এত মানুষের সামনে কোনদিন ভাষণ দেইনি। এটা আমার জন্য এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল।

যে লোক সব সময় কয়েক ডজন লোকের মধ্যে বক্তব্য দেয়। তার পক্ষে হঠাৎ করে হাজার হাজার মানুষের সামনে কথা বলা খুবই কঠিন। তারপরও আমি নিজেকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রেখে বক্তব্য দিলাম। বললাম, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বর্ণবাদী নিষ্পেষণের অবসান ঘটিয়ে এই সাধারণ মানুষরাই ইতিহাস গড়বে। আমি আরও বললাম, দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত আফ্রিকান, সমস্ত ভারতীয় ও সমস্ত মিশ্রতকের মানুষের আজ জোটবদ্ধ হয়ে উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে। বাস্তবতা এখন আমাদের একত্রিত অবস্থায় দেখতে চায়।

২২ জুনের র‍্যালীর মতো ২৬ জুনের বিক্ষোভে দেশজুড়ে মানুষ অদম্য সাহস নিয়ে রাজপথে নেমে এসেছিল। ওইদিন ভোর বেলা পোর্ট এলিজাবেথ থেকে ক্যাম্পেইন শুরু হয়। সেখানে রেমন্ড মহ্লেবার নেতৃত্বে ৩৩ জন কর্মী শ্বেতাঙ্গদের নির্ধারিত গেট দিয়ে একটি স্টেশনে ঢুকে পড়ে এবং সেখান থেকে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। তাদের যখন পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা সমস্বরে মুক্তির গান গাইছিলেন। তাদের আত্মীয়-স্বজন তাদের আটকাবস্থা দেখে মোটেও কষ্ট পাননি। তারাও 'মাইয়িবুয়ে! আফ্রিকা!' (আফ্রিকাকে ঘুরে দাঁড়াতে দাও!) বলে স্লোগান দিতে লাগলো।

২৬ জুন সকালে আমি এএনসি অফিসেই ছিলাম। সারা দেশের কোথায় কেমন বিক্ষোভ হচ্ছে না হচ্ছে সেসব খবর সেখানে আসছিল। আমি সেগুলোর ওপর নজর রাখছিলাম। ওইদিন দুপুরবেলা ট্রান্সভালের স্বেচ্ছাসেবকদলের পূর্ব জোহান্সবার্গের বক্সবার্গে অ্যাকশনে নামার কথা ছিল। রেভারেন্ড এন.বি. টান্টসির নেতৃত্বে নগরভবনে বিনা অনুমতিতে ঢুকে তাদের কোর্ট অ্যারেস্ট হবার কথা ছিল। টান্টলি আমাদের মধ্যে প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি ট্রান্সভাল এএনসির ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট এবং আফ্রিকান মেথোডিস্ট এপিসকোপাল চার্চের একজন অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন।

সকাল গড়িয়ে যখন দুপুরের দিকে তখনও রেভারেন্ট টান্টসি না আসায় চিন্তিত হয়ে পড়ছিলাম। তার নেতৃত্বে অ্যাকশনে নামার জন্য কর্মীরা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আমি পার্টি অফিসে বসে তার আসার জন্য অপেক্ষা করছি; এমন সময় তিনি টেলিফোন করলেন। আমাকে জানালেন তিনি অসুস্থ বোধ করছেন। এ

অবস্থায় কারাগারে না যাওয়ার জন্য ডাক্তার তাকে পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, আমরা আপনার সংগে গরম কাপড় চোপড় ও ওষুধ-পত্র দিয়ে দেবো; তাছাড়া আপনাকে এক রাতের বেশি জেলখানায় কাটাতে হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাকে রাজি করানো গেল না। রেভারেন্ড টান্টসি একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান নেতা। অ্যাকশনে তাকে নেতৃত্বে রাখার মূল উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে আমরা সরকার ও দেশবাসীকে বোঝাতে চাইছিলাম যে এ আন্দোলন শুধু কম বয়সী ডানপিটে ছেলেপেলেদের অংশগ্রহণে হচ্ছে তা নয়; এর সংগে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গেরও সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

যাইহোক রেভারেন্ড টান্টসির বিকল্প হিসেবে আমরা দ্রুত আরেকজন নেতাকে খুঁজে পেলাম। তিনিও টান্টসির মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। এই ভদ্রলোকটি হলেন ট্রান্সভাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নানা সিতা। ১৯৪৬ সালের বিক্ষোভ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখে সে সময় তিনি এক মাস জেল খেটেছিলেন। বয়সে প্রবীন এবং আর্থাইটিস রোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের এ অ্যাকশনে নেতৃত্ব দিতে রাজি হলেন।

মধ্য দুপুরের দিকে আমরা যখন বক্সবার্গে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি তখন খেয়াল হলো এএনসির ট্রান্সভাল শাখার সেক্রেটারি নেই। তাকে অনেক খোঁজাখুজি করেও ধারেকাছে পাওয়া গেল না। বক্সবার্গে অ্যাকশনে নামার সময় তার নানা সিতার সংগে থাকার কথা ছিল। তাকে খুঁজে না পেয়ে আবার সমস্যা হলো। আমি ওয়াল্টার সিসুলুর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললাম, 'আপনাকেই যেতে হবে।' ট্রান্সভালে এটা আমাদের প্রথম আইন লংঘন বিক্ষোভ কার্যক্রম। তাকে কোনভাবে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। এজন্য এতে শীর্ষনেতাদের উপস্থিতি থাকতেই হবে না হলে পুলিশ নেতাকর্মীদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেবে। বিক্ষোভকারীদের গুরুত্ব দেবে না। ওয়াল্টার নিজে বিক্ষোভ কর্মসূচীর আয়োজক ছিলেন। কর্মসূচী ঠিকঠাক পালনের জন্য তাকে সব কিছু তদারক করতে হচ্ছিল। সে কারণে তার অ্যাকশনে নামার কথা না। কিন্তু আমার কথা শুনে ওয়াল্টার একবাক্যে রাজি হয়ে গেলেন। তবে তার পোশাকের দিকে লক্ষ্য করে আমি বেশ চিন্তিত হলাম। তার গায়ে ছিল স্যুট। এ পোশাক পরে জেলখানায় ঘুমানো তার জন্য আরামদায়ক হবে না। আমি ঝটপট তাকে কয়েকটা পুরনো কাপড় যোগাড় করে দিলাম।

সব প্রস্তুতি সেরে আমরা বক্সবার্গে রওনা হলাম। ঠিক করলাম আমি আর ইউসুফ কাচালিয়া বক্সবার্গের ম্যাজিস্ট্রেটকে এই মর্মে চিঠি দেবো যে আমাদের মধ্য থেকে জনা পঞ্চাশেক স্বেচ্ছাসেবক বিনা অনুমতিতে তার এলাকার বিভিন্ন সরকারি ভবনে ঢুকবে। আমরা যখন দলবেঁধে ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের সামনে

এলাম তখন দেখলাম সেখানে একঝাঁক সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফার অবস্থান নিয়ে আছে।

আমাদের উপস্থিতি দেখে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই বেরিয়ে এলেন। আমি যখন তার হাতে চিঠি দিতে যাচ্ছি তখন ফটোসাংবাদিকরা ছবি তোলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোক ঝট করে সরে গিয়ে নিজেকে আড়াল করলেন এবং আমাকে আর ইউসুফকে তার চেম্বারে এসে একান্তে কথা বলতে বললেন। কথামতো আমরা তার কক্ষে গেলাম। তাকে খুবই সজ্জন মানুষ মনে হল। তিনি বললেন, আমাদের জন্য তার অফিস সব সময়ের জন্য খোলা থাকবে কিন্তু আমাদের সংগে তার যোগাযোগের বিষয়টি অতিমাত্রায় প্রচারিত হলে তা উভয় পক্ষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকে বের হয়ে আমরা সোজা শহরের প্রাণকেন্দ্রে চলে গেলাম। সেখানে মূল বিক্ষোভ সমাবেশ হচ্ছিল। সেখানে যাওয়ার সময় আধমাইল দূর থেকেই আমাদের কর্মী সমর্থকদের মুক্তির গান ভেসে আসছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান আর গণসংগীতে পুরো এলাকা কাঁপিয়ে ফেলছিল। এসে দেখলাম বিক্ষোভকারীরা পৌরভবনের সামনে। ভবনের সামনের লোহার গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মধ্য থেকে ৫২ জন আফ্রিকান ও ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক পৌরসভায় ঢোকার চেষ্টা করলাম। অসংখ্য সাংবাদিক ও কৌতুহলী মানুষ আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছিল। আমরা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে পৌরআইন লংঘন করতে যাচ্ছি তার প্রমাণ হিসেবে আমাদের সামনে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকলেন ওয়াল্টার সিসুলু। আর বর্ষীয়ান নেতা নানা সিতা বিক্ষোভকারীদের ভেতরে থেকে তাদের পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিচ্ছিলেন।

প্রথম এক ঘণ্টা এক ধরণের অচলাবস্থার মধ্য দিয়ে গেল। পুলিশ যেন তার চরিত্র ভুলে একেবারে ভদ্র মানুষ হয়ে রইল। আমরা পুলিশের অস্বাভাবিক আচরণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। বিক্ষোভকারীদের নিস্পৃহ করতে এটা কি তাদের কোন চতুর ফন্দি? তারা কি সাংবাদিকদের স্থানত্যাগের জন্য অপেক্ষা করছে যাতে সাংবাদিকরা চলে গেলেই সবাইকে বিনা বাধায় কচু কাটা করতে পারবে? না কি তারা আমাদের ওপর অ্যাকশন চালানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে? তবে হঠাৎই পরিস্থিতি বদলে গেল। আমাদের হতবুদ্ধি করে দিয়ে পৌরভবনের গেট খুলে দেওয়া হল। বিক্ষুব্ধ কর্মীরাও বন্যার পানির মতো গেট দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। এর মাধ্যমে পৌর আইন লংঘিত হল। সবাই ভেতরে ঢোকার পর একজন পুলিশ লেফটেন্যান্ট হুইসেল বাজিয়ে দিলেন। একদল পুলিশ সবাইকে ঘিরে ফেললো। তারপর এক এক করে সবাইকে তারা গ্রেফতার করতে লাগলো। তারা সবাইকে গ্রেফতার করে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের মামলা দায়ের করলো।

ওইদিন সন্ধ্যায় অলিভার ট্যাম্বো, ইউসুফ কাচালিয়া এবং আমিসহ এএনসির নেতৃবৃন্দ সারাদিনের তৎপরতা পর্যালোচনা ও আগামী সপ্তাহের কার্যসূচী নির্ধারণের জন্য মিটিংয়ে বসলাম। আমরা যেখানে বসে মিটিং করছিলাম তার কাছেই আমাদের কর্মীদের দ্বিতীয় ব্যাচের আইনভঙ্গের ক্যাম্পেইন করার কথা ছিল। সরকারের পক্ষ থেকে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল রাত এগারোটা থেকে কারফিউ জারি থাকবে। দ্বিতীয় ব্যাচের ওই কারফিউ ভেঙে রাস্তায় নামার কথা ছিল। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ তারা রাজপথে নেমে পড়ল।

মধ্যরাতে আমাদের মিটিং শেষ হল। মিটিং শেষ হতেই আমি অস্থিরতা বোধ করছিলাম। না, বিক্ষোভ বিষয়ক চিন্তায় নয়; সারাদিন দৌড়ঝাঁপের পর কিছু গরম খাবার আর ঘুমের জন্য শরীরটা অবশ হয়ে আসছিল। খাবার-দাবার কিছু পাওয়া যায় কিনা সে আশায় অফিস থেকে বের হলাম। আমার সংগে ছিলেন ইউসুফ। অফিস থেকে বেরুনোর সংগে সংগে দেখলাম একজন পুলিশ অফিসার আমার দিকে এগিয়ে এলেন। সত্যি সত্যি আমাদের তখন ২য় ব্যাচের বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু অফিসারটি আমার সামনে এসেই বললেন, 'ম্যান্ডেলা, আজ আর তুমি পালাতে পারবে না। ভ্যানে ওঠো!'– তিনি হাতের লাঠি দিয়ে পুলিশ ভ্যানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আমি তার কথায় কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম। আমি তাকে বিনয়ের সংগে রসিকতা করে বললাম, 'দেখুন আপনাদের সংগে থানায় যেতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কথা হলো আমাকে কয়েকটা দিন পরে আটকালে ভালো হতো। আমাকে প্রতিদিনকার বিক্ষোভগুলোকে পরিচালনা করতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন এ মুহূর্তে আমাকে আটকালে আমাদের ক্যাম্পেইনের কত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে!'

আমার কথা শুনে ইউসুফ হো হো করে হেসে ফেললো। হাসতে হাসতেই সে পুলিশভ্যানে উঠলো। পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার সময় মানুষ যে ওইরকম অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। তার বিকট হাসিতে পুলিশরাও হতভম্ব হয়ে পড়েছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্শাল স্কোয়ার নামে পরিচিত জেলখানায় আমাদের নিয়ে আসা হলো। এসে দেখি ফ্লাগ বোশিলোর নেতৃত্বে অ্যাকশনে নামা জনা পঞ্চাশেক কর্মীও ভেতরে। আমি আর ইউসুফ দুজনই অ্যাকশন কমিটির নেতা ছিলাম। আমাদের চিন্তা ছিল আগামীকাল কর্মীরা আমাদের অনুপস্থিতি দেখে ঘাবড়ে যেতে পারে। তাছাড়া আমাদের অনুপস্থিতিতে ক্যাম্পেইন পরিচালনা কে করবে সেটাও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। জেলখানার ভেতরে ঢোকার সময়ই দেখলাম আমাদের সাথীরা '*এনকোসি সিকেলেল আইআফ্রিকা!* (আফ্রিকা জিন্দাবাদ!) গানটি সমস্বরে গাইছে। তাদের স্পৃহা দেখে মনটা গর্বে ভরে গেল।

ওই রাতে আমাদের এক কর্মীকে একজন শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডার এত জোরে ধাক্কা দিয়ে ওয়ার্ডের মধ্যে ঠেলা দিয়েছিল যে ঠাস করে মাটিতে পড়ে যায়। তার পায়ের গোড়ালি ভেঙে যায়। ওয়ার্ডারের এই ব্যবহারে আমি তীব্র প্রতিবাদ করলাম। লোকটা ছুটে এসে আমাকেও লাথি মেরে সরিয়ে দিলো। আমি আহত কর্মীকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য হাজত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালাম। কিন্তু হাজতখানা থেকে আমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো আহত কর্মীটি চাইলে পরের দিন সকাল বেলায় ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে। তারপর তারা তাকে চিকিৎসা দেওয়া যাবে কিনা তা ভেবে দেখবে। আহতকর্মীর চিৎকারে সবাই নির্ঘুম উদ্বেগে রাতটা পার করলো।

ইতিপূর্বে আধাবেলা একবেলা হাজত খানায় কাটানোর অভিজ্ঞতা আমার ছিল। কিন্তু মার্শাল স্কোয়ারে এরকম কয়েকদিনের মতো থাকার অভিজ্ঞতা আগে ছিল না। তারপরও আমাদের সহযোদ্ধাদের স্পৃহা দেখে আমি যে বন্দী অবস্থায় আছি তা মনেই হল না।

প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম দিনেই অন্যায় আইনের বিরোধীতা করে সারাদেশে আমাদের প্রায় আড়াইশ' নেতাকর্মী স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে। ফলে আন্দোলনের শুরুটা একটা চমৎকার অপ্রতিরোধ্য গতি পায়। আনন্দের বিষয় হলো আমাদের সাথীদের সবাই ছিল খুবই সাহসী, সুশৃংখল এবং আত্মবিশ্বাসী।

পরবর্তী পাঁচ মাসের মধ্যে সাড়ে ৮ হাজারের বেশি লোক এ ধরণের প্রতিরোধ বিক্ষোভে অংশ নিয়ে স্বেচ্ছায় জেলে যায়। চিকিৎসক, কারখানার শ্রমিক, উকিল, শিক্ষক, ছাত্র; অর্থাৎ সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ এই বিক্ষোভে শামিল হয় এবং স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে। আগুনের মতো আন্দোলনের শিখা উইটওয়াটারল্যান্ড থেকে ডারবান, ডারবান থেকে পোর্ট এলিজাবেথ, সেখান থেকে ইস্ট লন্ডন, কেপটাউন এবং পূর্ব ও পশ্চিম কেপের ছোট ছোট গ্রামে গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে। তারা রাজপথে নেমে গাইতে থাকে, '*হেই মালান! ওপেন দ্য জেল ডোরস্! উই ওয়ান্ট টু এন্টার!*' সবচেয়ে বড় আশার কথা হলো এ আন্দোলন শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। হাই কমান্ডের নির্দেশ অনুযায়ী কর্মীদের কেউ এ সময় বড় ধরণের অন্যায় করেনি। ছোট ছোট আইন ভঙ্গ করায় তাদের কয়েক রাত জেলে থাকার মতো লঘুদণ্ড দেওয়া হয়। এর ফলে আন্দোলনের প্রচারণা তুঙ্গে ওঠে। এক মাসের মধ্যে এএনসির সদস্য সংখ্যা ২০ হাজার থেকে এক লাখে পৌঁছে যায়। বিশেষ করে দক্ষিণ কেপের সদস্য অন্তর্ভূক্তি ছিল অভুতপূর্ব। এ সময় সারাদেশে যত নতুন সদস্য যোগ দেয় তার অর্ধেকই দক্ষিণ কেপের।

ছয়মাস ধরে চলা বিক্ষোভ ক্যাম্পেইনের সময় আমি পুরো দেশ চষে বেড়িয়েছি। সাধারণত আমি দূরে কোথাও যেতে হলে রাতে অথবা খুব ভোরে নিজেই নিজের গাড়ি চালিয়ে রওনা হতাম। কেপ, নাটাল এবং ট্রান্সভালে আন্দোলন কর্মীদের ছোট ছোট গ্রুপকে ক্যাম্পেইন নির্দেশনা দিতাম। মাঝে মাঝে সাধারণ মানুষকে আমাদের আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝানোর জন্য পৌর এলাকার বাড়ি বাড়ি যেতাম। সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকার গণযোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়। গণমানুষের সংগে যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম ছিলই না। ফলে তাদের দলে টানতে আমাদেরকে তাদের বাড়ি পর্যন্ত যেতে হতো।

আন্দোলনের সময় অ্যালকোট গোয়েনেৎসে নামে আমাদের এক তৃণমূল নেতাকে নিয়ে সৃষ্ট বিবাদ মেটাতে আমাকে পূর্ব কেঁপে যেতে হয়েছিল। গোয়েনেৎসে ইস্ট লন্ডনে শ্রমিক আন্দোলনকারীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আগে মুদি মালের ব্যবসা করতো। তাতে ভালোই পয়সা আসতো। বছর দুয়েক আগে ২৬ জুনের ধর্মঘটে ইস্ট লন্ডনে শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিয়ে জেলে গিয়েছিল। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ায় সরকার তার ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল করে দেয়।

অত্যন্ত সাহসী লোক ছিল সে। কিন্তু তার প্রধান সমস্যা ছিল গোয়ার্তুমি। প্রধানত শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধিদের দ্বারা গর্বিত এক্সিকিউটিভ কমিটির উপদেশ-পরামর্শ সে মানতো না। সে নিজের মত মতো তার লোকদের পরিচালনা করতো। এক্সিকিউটিভের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে আমার কাছে নালিশ জানানো হয়। বিষয়টির সুরাহা করতেই আমাকে এখানে আসতে হয়।

প্রতিপক্ষকে কীভাবে ঘায়েল করতে হয় সে বিদ্যে গোয়েনেৎসের ষোল আনাই জানা ছিল। সে স্থানীয়দের ডেকে মিটিং করতো। স্থানীয় এসব সদস্যের বেশিরভাগই কলকারখানার শ্রমিক। তারা লেখাপড়া জানতো না। গোয়েনেৎসে সব সময় ঝোসা ভাষায় বক্তব্য দিতো। ইংরেজী জানলেও ইংরেজীতে পারতপক্ষে কথা বলতো না। স্থানীয় সদস্যদের ডেকে সে বলতো, "সংগ্রামী ভাইয়েরা, আপনারা জানেন আমি সংগ্রাম করতে গিয়ে জীবনে বহু অত্যাচার সহ্য করেছি। আমি একটা ভালো ব্যবসা করতাম। আন্দোলনের কারণেই তা হারিয়েছি। জেলে গিয়েছি। এখন এইসব বুদ্ধিজীবীরা আমাকে বলছে, 'গোয়েনেৎসে তোমার চাইতে আমরা বেশি শিক্ষিত। আমরা তোমার চেয়ে বেশি যোগ্য। আন্দোলন পরিচালনার ভার তুমি আমাদের ওপর ছেড়ে দাও।"

আমি এসে তদন্ত করে দেখলাম গোয়েনেৎসে সত্যিই এক্সিকিউটিভের পরামর্শ কানে নেয়নি। সে নিজের মত মতো লোকজন সংগঠিত করছে। পাশাপাশি এটাও সত্য যে বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ ছাড়াই সে ভালোভাবে কর্মীদের সংগঠিত করেছিল। লোকজন তাকেই সমর্থন করছিল। সে যখন জেলে ছিল তখনও তার লোকজন অত্যন্ত শৃংখলাপূর্ণভাবে ক্যাম্পেইন চালিয়ে গিয়েছিল। এর ফলে গোয়েনেৎসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সর্বাংশে সত্য প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও

তাকে আমি কিছু বলতে পারলাম না। আমি এক্সিকিউটিভের সদস্যদের বললাম, জনসমর্থন গোয়েনেৎসের পক্ষে থাকায় এ মুহূর্তে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়াটা বাস্তবসম্মত হবে না। আমি প্রথমবারের মতো হাতে-কলমে প্রমাণ পেলাম, জনগণ যে পক্ষে যাবে সে পক্ষের বিজয় নিশ্চিত। আইন, আদালত, কোন কিছুই তার সামনে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না।

আমাদের এ আন্দোলনকে সরকার তার বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি ও নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করলো। সরকার আমাদের সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্সকে বিক্ষোভ কার্যক্রম হিসেবে নয়; বরং রাষ্ট্রবিরোধী অপকর্ম হিসেবে বিবেচনা করলো। আফ্রিকান ও ইন্ডিয়ানদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠায় সরকার রীতিমতো তটস্থ হয়ে উঠলো। অ্যাপারথেইডের ধারণাটাই গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন গ্রুপকে আলাদা করে রাখার জন্য কিন্তু আমরা সরকারকে দেখিয়ে দিলাম যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ একছাতার তলায় এসে কাজ করার ক্ষমতা রাখে। আফ্রিকান ও ভারতীয়; কট্টরপন্থি ও উদারপন্থিদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দেখে সরকার ভয়ানক চিন্তায় পড়ে গেল।

ন্যাশনালিস্ট সরকার অভিযোগ তুললো দেশের এই অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য কম্যুনিস্টরাই দায়ি। আইনমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, আমাদের এই আইনভঙ্গের আন্দোলন দমন করতে তিনি আইনি পথেই এগুবেন এবং পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট (জননিরাপত্তা আইন) ও ক্রিমিনাল লস অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (অপরাধ বিধি সংশোধন আইন) বাস্তবায়নের হুমকি দিলেন। জননিরাপত্তা আইন সরকারকে মার্শাল ল ঘোষণা ও জনগণকে বিনাবিচারে আটক রাখার ক্ষমতা দেয়। অন্যদিকে ক্রিমিনাল লস অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আমাদের আইন লংঘনের লঘু শাস্তি কে গুরুদণ্ডতে পরিণত করার অনুমোদন দেয়।

আমাদের ক্যাম্পেইন বানচাল করার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরণের ফন্দি আঁটলো। সরকারের প্রোপাগান্ডিস্টরা বারবার এই বলে অপপ্রচার চালাতে লাগলো যে আন্দোলনের নেতারা কর্মীদের জেলে পাঠিয়ে নিজেরা আরামে দিন কাটাচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে এ অভিযোগ ডাহা মিথ্যা ছিল; কিন্তু এ অপপ্রচারণায় কাজ হল। আমাদের কিছু কর্মী সমর্থক এতে বিভ্রান্ত হল। এ ছাড়া সরকার আমাদের সংগঠনের মধ্যে কিছু গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। এএনসি সব সময়ই নতুন সমর্থকদের সাদরে আমন্ত্রণ জানাতো। যদিও অ্যাকশনে কর্মীদের পাঠানোর আগে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা ভালোভাবে তাদের পরীক্ষা করে নিত তা সত্ত্বেও আমাদের আন্দোলন কর্মীদের মধ্যে কিছু পুলিশ সাদা পোশাকে মিশে গিয়েছিল। গ্রেফতার করে আমাকে মার্শাল স্কোয়ার জেলে পাঠানোর পর আমি অন্যান্য আটককৃতের মধ্যে দুজনকে সন্দেহ করলাম। ওই দুজনের একজনকে আমি আগে কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়লো না। ওই লোকটার পোশাক দেখে আমার সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হল। তার গায়ে ছিল স্যুট, ওভারকোট, টাই আর সিল্কের স্কার্ফ। এই পোশাক পরে কারও ক্যাম্পেইনে আসার কথা না। আমি তার

নাম জিজ্ঞেস করতেই সে বললো তার নাম রামাইলা। জেলে তৃতীয় দিন, যখন আমাদের ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে তখন খেয়াল করলাম সে উধাও হয়ে গেছে।

আমার সন্দেহের আরেকজনের নাম ছিল মাখান্দা। শুধু আমি নই তার সামরিক কায়দার চালচলন দেখে আমাদের সবাই তাকে সরকারের চর বলে ধারণা করেছিল। আমরা সবাই যখন জেলখানার উঠোনে সমবেত হতাম তখন আমাদের কর্মীরা আমার ও ইউসুফের সামনে দিয়ে লাইন দিয়ে হেঁটে যেতো এবং আমাদের স্যালুট করতো। মাখান্দাও কর্মীদের সংগে মিশে গিয়েছিল। সাধারণ কর্মীরা স্যালুট করার সময় স্বাভাবিকভাবেই সামরিক কায়দা কানুন মানতো না। কারণ এ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু মাখান্দা যখন স্যালুট করতো তখন তার ভাবভঙ্গিতে পুরোপুরি সামরিক কায়দা কানুনের লক্ষণ ফুটে উঠতো। তার নির্ভুল অঙ্গভঙ্গিতে সবাই তাকে চর বলে সন্দেহ করে।

ইতিপূর্বে মাখান্দা এএনসির হেডকোয়ার্টারগুলোতে দ্বাররক্ষীর কাজ করেছিল। তার করিৎকর্মা স্পৃহার কারণে সবার কাছেই সে খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। কেউ ক্ষুধার্ত হয়েছে শুনলে সে দৌড়ে তার জন্য মাছ ভাজা বা আলুর চপ টাইপের কোন খাবার এনে তার সামনে ধরতো। কিন্তু একসময় আমরা মাখান্দার কারসাজি ধরে ফেলি। তাকে আটক করে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে স্বীকার করে সে আর রামাইলা দুজনই পুলিশের টিকটিকি। তার স্বীকারোক্তি থেকেই আমরা জানতে পারি মাখান্দার আসল নাম মোটলৌং। সে ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চের একজন সার্জেন্ট।

যে সব আফ্রিকান তাদের নিজেদের জ্ঞাতি ভাইদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করতো, তারা চেতনাগতভাবে ছিল খুবই দূর্বল। শুধুমাত্র দু'পয়সা কামানোর ধান্দায় তারা এ জঘন্য পথ বেছে নিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু কৃষ্ণাঙ্গ ছিল যারা বিশ্বাস করতো শ্বেতাঙ্গদের সংগে পাল্লা দিতে যাওয়াটা নেহাৎ বোকামী ছাড়া কিছু নয়। তারা মনে করতো শ্বেতাঙ্গরা তাদের চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট ও শক্তিশালী। তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে তারা কৃষ্ণাঙ্গদের ঝাড়েবংশে শেষ করে দেবে। এই কৃষ্ণাঙ্গ গুপ্তচররা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় আমাদের অনেক নিঁচু শ্রেণীর ও দূর্বল মানুষ বলে ভাবতো।

তবে এমন অনেক কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশও ছিলেন যারা আমাদের গোপনে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তারা আফ্রিকানদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে পরিবারের রুটি রুজির জন্য; নিজেদের চাকরি বাঁচানোর জন্য পুলিশের হাইকমান্ডের নির্দেশ তাদের পালন করতে হতো। আমাদের সংগে এমন অনেক পুলিশ কর্মকর্তার যোগাযোগ ছিল যারা সংগ্রামীদের জন্য বহু ত্যাগের স্বাক্ষর রেখেছেন। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তারা কোন কোন এলাকায় কবে কখন তল্লাশি চালানো হবে তা তারা আগেই আমাদের জানিয়ে দিতেন।

আমাদের মুক্তি সংগ্রামের পথে জাতীয়তাবাদী সরকারই যে একমাত্র বাধা ছিল তা নয়। আগেই বলেছি আফ্রিকায় দুই ধরণের শ্বেতাঙ্গ জাতি রয়েছে। এদের এক গ্রুপ ইংল্যান্ড থেকে আসা, অপর গ্রুপ ইউরোপের অন্যদেশ, বিশেষ করে নেদারল্যান্ড থেকে আসা মানুষ। নেদারল্যান্ড থেকে তিনশ্ বছর আগে আসা ডাচ বংশোদ্ভুত এই শ্বেতাঙ্গরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশাল বসতি গড়ে তুলেছে। এদের বলা হয় আফ্রিকানার। এরা ডাচ মিশ্রিত একটি নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। অন্যদিকে ইংরেজ শ্বেতাঙ্গরা সম্পূর্ণভাবে ইংলিশ কালচারে বিশ্বাসী। তারা আফ্রিকানারদের চেয়ে অনেকটা উদারপন্থি। আমাদের বর্তমান সংগ্রাম চলছিল আফ্রিকানার শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে। তাদের ন্যাশনালিস্ট পার্টির সংগে ইংরেজ বংশোদ্ভুতদের ইউনাইটেড পার্টির সাপে-নেউলে সম্পর্ক ছিল। সে হিসেবে ইউনাইটেড পার্টির আমাদেরকে সাহায্য করার কথা ছিল। কিন্তু তা না করে তারা উল্টো বিরোধিতা শুরু করলো। আমাদের ডেফিয়্যান্স ক্যাম্পেইন যখন তুঙ্গে তখন বিরোধীদল ইউনাইটেড পার্টি আমাদের কাছে আলোচনা করার জন্য দুজন এমপি পাঠালো।

এমপিরা এসে আমাদের আইন অমান্য কর্মসূচী ও ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে বললেন। তারা বললেন ইউনাইটেড পার্টির প্রধান জে. জি. এন. স্ট্রাউজের পক্ষ থেকে তারা আমাদের ধর্মঘট কর্মসূচী প্রত্যাহারের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। আমরা যদি তাদের প্রস্তাবে রাজি হই তাহলে তারা আগামী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ন্যাশনালিস্টদের হারানোর জন্য তারা এএনসিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে। আমরা বিনয়ের সংগে তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। এ কারণে ন্যাশনালিস্টদের মতো স্ট্রাউচও আমাদের চরম বিরোধীতা শুরু করলেন।

এএনসির অন্তর্কলহ ও ভাঙনও এ আন্দোলনের সামনে এক বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল। ন্যাশনাল মাইন্ডেড ব্লক নামে এএনসি একটি বিদ্রোহী গ্রুপও এ সময় অসহযোগিতা শুরু করেছিল। এএনসির ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভের সাবেক সদস্য সেলোপে থেমা এ গ্রুপটির নেতৃত্বে ছিলেন। ট্রান্সভাল এএনসির প্রেসিডেন্ট হিসেবে জে. বি. মার্কস নির্বাচিত হওয়ার পর সেলোপে থেমা দল থেকে সরে গিয়ে এই নতুন গ্রুপ তৈরি করেন। থেমা 'বান্টু ওয়ার্ল্ড' নামে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ওই কাগজের সম্পাদকীয়তে তিনি এ ক্যাম্পেইনের তীব্র সমালোচনা করে একের পর এক লেখা প্রকাশ করতে লাগলেন। লেখাগুলোতে তিনি অভিযোগ করলেন, কম্যুনিস্টরা এএনসির ওপর চেপে বসেছে এবং ভারতীয়দের আফ্রিকানদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে। যদিও তিনি এএনসির একটি অতি ক্ষুদ্র অংশকে নিয়ে বিদ্রোহী গ্রুপ তৈরি করেছিলেন। লোকে তার পক্ষ নেয়নি। তারপরও ইয়ূথলীগারদের মধ্যে যারা কট্টরপন্থি ছিল তারা তার কথায় অনেকটা বিভ্রান্ত হয়েছিল।

মে মাসে ডেফিয়্যান্স ক্যাম্পেইনের মধ্যবর্তী সময়ে জে. বি. মার্কসকে সরকার রাজনীতিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তার বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ জে. বি.

মার্কস দক্ষিণ আফ্রিকায় আবার কম্যুনিজমের উত্থান ঘটাচ্ছেন। এ কারণে ১৯৫০ সালের সাপ্রেশন অব কম্যুনিজম অ্যাক্ট অনুযায়ী তাকে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করা হয়। কাউকে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করাটা সরকারের আইনি নির্দেশ। এ আইন অনুযায়ী সরকার প্রয়োজন মনে করলে যে কোন নেতাকে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের সভা সমাবেশে যাওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে পারে। রাজনীতিতে কোন ব্যক্তিকে নিষিদ্ধ করতে সরকারের কোন প্রমাণ দরকার হয় না বা কোন অভিযোগপত্র দাখিল করতে হয় না। কাউকে নিষিদ্ধ করতে আইনমন্ত্রীর একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণাই যথেষ্ট। আন্দোলনকে দূর্বল করে দেওয়ার জন্য এটা ছিল সরকারের একটি চাল মাত্র। সরকার শীর্ষ নেতাদের রাজনীতি থেকে দূরে রেখে আন্দোলনের কোমর ভেঙে দিতে চাইছিল। এ সময় সরকারের এই নির্দেশ অমান্য করার অর্থ হলো দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসকে আমন্ত্রণ জানানো। তবে একজন রাজনীতিকের জন্য এটাও এক ধরণের কারা যন্ত্রণা। অর্থাৎ সে সবকিছু করতে পারবে কিন্তু রাজনীতির সংস্পর্শে যেতে পারবে না– এই যন্ত্রণা তাকে কারাযন্ত্রণার মতো কষ্ট দিতে থাকবে।

জে. বি. মার্কসের অনুপস্থিতিতে ট্রান্সভাল এএনসির প্রেসিডেন্টপদ শূন্য হল। অক্টোবরের ট্রান্সভাল কনফারেন্সে মার্কসের স্থলাভিষিক্ত করতে আমার নাম প্রস্তাব করা হল। নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর মার্কস নিজেই তার উত্তরসূরী হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। ওই সময় আমি ইয়ূথলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম এবং অধিকাংশ লোক আমাকে জে. বি. মার্কসের স্থলাভিষিক্ত করার পক্ষে ছিল। কিন্তু তারপরও ট্রান্সভাল এএনসির মধ্যকার একটি গ্রুপ আমার প্রেসিডেন্ট হওয়ার বিরোধীতা করেছিল। ওই গ্রুপটি নিজেদের *'বাফাবেগিয়া'* (যারা নাচতে নাচতে মৃত্যুকে বরণ করে) বলে পরিচয় দিত। মূলত যেসব সাবেক কম্যুনিস্ট কট্টর আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তারাই ওই কট্টরপন্থি গ্রুপটি গঠন করেছিল। এরা ভারতীয় প্রতিরোধ কর্মীদের সংগে সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করে এএনসিকে একটি কনফ্রন্টেনশনাল স্ট্র্যাটেজিতে পরিচালিত করতে চেয়েছিল। সাবেক কম্যুনিস্ট নেতা ম্যাকডোনাল্ড ম্যাসেকো ও সেপেরেপেরে মারুপেং ছিলেন এদের নেতা। ডেফিয়্যান্স ক্যাম্পেইন চলাকালীন মাসেকো এএনসির অরল্যান্ডো শাখার সভাপতি ছিলেন। অন্যদিকে মারুপেং ছিলেন উইটওয়াটারসর‌্যান্ড ক্যাম্পেইনের স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রধান। মাসেকো এবং মারুপেং দুজনই ট্রান্সভালের প্রেসিডেন্ট হতে চেয়েছিলেন।

মারুপেং একজন অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। তিনি সব সময় বিখ্যাত ফিল্ডমার্শাল মন্টগোমারির মতো মিলিটারি স্টাইলের সোনার বোতাম লাগানো খাকি স্যুট পরতেন। তিনি যখন জনসভায় ভাষণ দিতে দাঁড়াতেন তখন তার হাতে সামরিক অফিসারদের ভার্নিশ করা তেলতেলে লাঠি থাকতো। তিনি বজ্রকণ্ঠে বলতেন, 'আমি স্বাধীনতার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না; আমি চাই এক্ষুণি দেশে স্বাধীকার প্রতিষ্ঠিত হোক। আমি এই মুহূর্তেই মালামের সাথে দেখা করে

তাকে বলতে চাই আমরা আফ্রিকানরা যা চাই তা এক্ষুনি দিতে হবে। আমি তাকে বলতে চাই আমরা এক্ষুনি মুক্তি চাই; স্বাধীনতা চাই। *আই ওয়ান্ট ফ্রিডম নাউ!'*– বলেই তিনি হাতের লাঠি দিয়ে ঠাস ঠাস করে ডায়াসের ওপর আঘাত করতেন।

ক্যাম্পেইনের সময় মারুপেং এ জাতীয় মারমুখী ভাষণ দিয়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের জন্য জনপ্রিয়তাই একমাত্র বিষয় নয়। হঠাৎ করে বেশ কিছু জনসমর্থন পেয়ে মারুপেং ট্রান্সভাল এএনসির প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে শীর্ষ নেতারা মৌখিকভাবে আমাকে মনোনীত করলে আমি মারুপেংকে ডেকে বললাম, 'আমি চাই আপনি এক্সিকিউটিভ হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন যাতে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর আমি আর আপনি এক সাথে কাজ করতে পারি।' কিন্তু মারুপেং আমার কথায় অনেকটা রেগে গেলেন। তার ধারণা হল আমি তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইছি। তিনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু তার অংকে ভুল ছিল। তিনি বিপুল ভোটের ব্যবধানে আমার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন।

১৯৫২ সালের ৩০ জুলাই। আমাদের আইন অমান্যের বিক্ষোভ তখন চরমে। ওইদিন আমি এইচ. এম. বাসনারের ল' ফার্মে বসে অফিস করছিলাম। হঠাৎ অফিসে একদল পুলিশ এসে হাজির। তারা জানালো আদালতের ওয়ারেন্ট নিয়ে তারা আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি নাকি *সাপ্রেশন অব দ্য কম্যুনিজম অ্যাক্ট লংঘন* করেছি। আসলে ওই সময় জোহান্সবার্গ, পোর্ট এলিজাবেথ এবং কিম্বার্লির সমস্ত শীর্ষ নেতাকে একই অজুহাতে আটকানো হচ্ছিল। ওইমাসের গোড়ার দিকে সারা দেশের এএনসি ও এসএআইসির সব কর্মকর্তার অফিস ও বাড়িঘর তল্লাশি চালানো হয়েছিল। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ও ডকুমেন্টস জব্দ করা হয়েছিল। এ ধরণের তল্লাশি অভিযান পুরোপুরি বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তাকর্মীরা প্রতিদিন তা করে যাচ্ছিল।

আমিসহ অন্য নেতাদের আটক করে সেপ্টেম্বরে আমাদের সবাইকে কোর্টে তোলা হল। মোট ২১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হলো। এদের মধ্যে এএনসি, এসএ আইসি, এএনসি ইয়ুথলীগ এবং ট্রান্সভাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা ছিলেন। জোহান্সবার্গে শুরু হওয়া এই বিচারের আসামী ছিলেন ড. মোরোকা, ওয়াল্টার সিসুলু, জে. বি. মার্কস। ভারতীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন ড. দাদু, ইউসুফ কাচালিয়া এবং আহমেদ কাদরাদা।

আমাদের যেদিন বিচারের জন্য আদালতে আনা হল সেদিন আদালত চত্বরে দেখার মতো এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। হাজার হাজার মানুষ আমাদের মুক্তি দাবি করে জোহান্সবার্গের রাজপথে নেমে এলো। তারা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঘিরে

ফেললো। মুহূর্মুহু শ্লোগানে আদালত চত্ত্বর কাঁপিয়ে ফেললো। এমনকি বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অনেক শ্বেতাঙ্গকেও সেদিন দেখা গিয়েছিল। সে বিক্ষোভে উইটওয়াটারসর‍্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ভারতীয় স্কুল শিক্ষার্থীরা এসেছিল। সব বর্ণের; সব জাতির মানুষকে সেদিন বিক্ষোভ র‍্যালীতে যোগ দিতে দেখা গিয়েছিল। আদালত কক্ষ সেদিন লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছিল। '*মায়েইবুয়ে আফ্রিকা!* (আফ্রিকা জিন্দাবাদ) ধ্বনিতে কেঁপে উঠছিল আদালত কক্ষ। ওইদিন আমাদের সবাইকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হল।

যেহেতু আমরা একটি লক্ষ্য অর্জনে সবাই বিক্ষোভে শামিল হয়েছি সেহেতু আমাদের মামলার কার্যক্রমও সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করবো বলেই সবাই ধারণা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের সে ভাবনায় বাধ সাধলেন স্বয়ং আমাদের দলের সভাপতি ড. মোরোকা। তিনি দলের প্রেসিডেন্ট জেনারেল এবং ক্যাম্পেইনের প্রধান। তিনি আলাদাভাবে নিজের জন্য আলাদা অ্যাটর্নি নিয়োগের ঘোষণা দিলেন। তার কথায় সবাই হতাশ হয়ে পড়লো। আমার এক সহযোদ্ধা আমাকে আলাদাভাবে ড. মোরোকার সংগে আলাপ করে তাকে মত বদলানোর অনুরোধ করতে বললেন। আমি রাজি হলাম। বিচারের আগের দিন আমি তার বাসায় গেলাম।

আমি মোরোকাকে বোঝালাম যে তিনি দলের প্রেসিডেন্ট হয়ে যদি একাজ করেন তাহলে নেতাকর্মীরা ভেঙে পড়বে; শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু তিনি আমার কথায় কান দিলেন না। তিনি বললেন, প্রতিরোধ আন্দোলনে তার সমর্থন ছিল না।

তিনি সরকারের কম্যুনিজম বিলোপ কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জানালেন। আমি তার কথার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম বর্ণবাদী নিষ্পেষণের শিকার হওয়া যেকোন লোকের সাহায্যে এগিয়ে আসা এএনসির মৌলিক নীতি। এ কারণেই আমরা কম্যুনিস্টদের পাশে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু ড. মোরোকা তার সিদ্ধান্ত থেকে নড়লেন না।

ড. মোরোকার কাছ থেকে আমরা সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেলাম আদালতে। তিনি অত্যন্ত অপমানজনকভাবে জজের প্রতি অযথা আনুগত্য দেখালেন। এমন কি এএনসি যে মূল নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। সরকারি উকিল যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা

এবং কালোর সম অধিকারে তিনি বিশ্বাস করেন কিনা; তার জবাবে তিনি বললেন, এটা কখনো সম্ভব নয়। তার কথা শুনে আমরা বজ্রাহতের মতো চেয়ারে বসে পড়লাম। অন্য আসামীদের মধ্যে কোন কম্যুনিস্ট আছে কিনা তা জানতে চাইলে মোরোকা ড. দাদু ও ওয়াল্টার সিসুলুসহ অন্যদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা শুরু করলেন। কিন্তু জজ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন এটা জরুরি নয়।

আদালতে ড. মোরোকার এই জবানবন্দী দলের ওপর প্রচণ্ড আঘাত করলো এবং আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে নিলাম এএনসির প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দিন ফুরিয়ে আসছে। দল ও জনগণের কথা না ভেবে নিজে ছাড়া পাওয়ার জন্য মোরোকা যা করলেন তা ক্ষমার অযোগ্য। রাজনৈতিক আদর্শের কারণে তিনি তার চিকিৎসা ব্যবসার প্রসার নষ্ট করতে চাননি। ফলে এএনসির প্রেসিডেন্ট ও ডেফিয়্যান্স ক্যাম্পেইনের প্রধান হিসেবে গত তিন বছর ধরে তিনি যে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছিলেন তা নিজের হাতেই ধ্বংস করে ফেললেন। আমি ড. মোরোকার জন্য করুণা বোধ করছিলাম। ভাবছিলাম, যে লোকটি দিনের পর দিন অজস্র মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের আন্দোলনে উদ্দীপ্ত করার জন্য বক্তৃতা করেছে সে লোকটা কীভাবে রাতারাতি সব কথা ভুলে গেলেন।

২ ডিসেম্বর জজ রাম্ফের আদালতে আমরা দোষী সাব্যস্ত হলাম। আদালত আমাদের 'কম্যুনিজমের পান্ডা' বলে আখ্যায়িত করলেন। তখন সরকারের কাজে যেই বাধা দিতো তাকেই সাপ্রেশন অব কম্যুনিজম অ্যাক্টের আওতায় এনে ফাঁসিয়ে দেওয়া হতো। এমন কি যে লোকটা কম্যুনিস্ট পার্টির একজন সাধারণ সদস্যও নয় তাকেও 'কম্যুনিজমের পান্ডা' বল আখ্যা দেওয়া হতো।

আমাদের সবাইকে আদালত কম্যুনিজম পুনরুত্থানের ষড়যন্ত্রকারী বিবেচনা করে ৯ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। তবে দুই বছরের জন্য ওই রায়কে স্থগিত করা হল।

প্রতিরোধ আন্দোলনে আমাদের যথেষ্ট ভুল ত্রুটি ছিল। কিন্তু তারপরও স্বাধীনতা সংগ্রামে এ আন্দোলন একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। আমরা আমাদের ৬ দফা দাবি থেকে সরে আসিনি। যদিও সরকার এ দাবিগুলো মেনে নেবে বলে আমাদের সামান্যতম আশাও ছিল না। তারপরও আমরা আমাদের দাবি অব্যাহত রেখেছিলাম। এর মাধ্যমে আমরা জনগণকে তাদের মাথায় চেপে বসা

বোঝাগুলোকে দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলাম যার ফলে গণহারে লোকজন এএনসিতে অংশ নেয়।

ক্যাম্পেইনকে প্রাধান্য দিয়ে এএনসি এবার নতুন কৌশল অবলম্বন করল। অ্যাকশন কর্মসূচীর চেয়ে বক্তৃতা-বিবৃতির গতি বাড়িয়ে দিলো। এএনসিতে ভাতাভুক্ত কোন সংগঠন ছিল না। বেতনভুক্ত কোন কর্মচারি বা সদস্য ছিল না যারা ২৪ ঘণ্টা দলের পক্ষে কাজ করতে পারবে। কিন্তু তারপরও ব্যাপক প্রচারণার ফলে আমাদের সদস্যসংখ্যা ১ লাখে উন্নীত হল। জনগণভিত্তিক একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো এএনসি। ডেফিয়্যান্স ক্যাম্পেইন চলাকালীন শত শত লোক স্বেচ্ছায় কারাবরণ করতে প্রচারণা চালাতে লাগলো। তারা রাজবন্দী হিসেবে জেলে যাওয়া এক বিরল সম্মান হিসেবে দেখতে লাগল।

আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় হলো ক্যাম্পেইনের প্রথম ছয় মাসে আমাদের পক্ষ থেকে একটি সহিংস ঘটনাও ঘটেনি। আমাদের কর্মীদের শৃংখলাবোধ দৃষ্টান্ত যোগ্য ছিল। ক্যাম্পেইনের শেষ দিকে পোর্ট এলিজাবেথ ও ইস্ট লন্ডনে দাঙ্গা হয়েছিল এবং দাঙ্গায় ৪০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়। ওই দাঙ্গার সংগে আমাদের ক্যাম্পেইনের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সরকার এর সংগে আমাদের জড়ানোর পায়তারা শুরু করলো। এতে সরকার সফলও হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যারা আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল সরকার আমাদের সম্পর্কে তাদের মন বিষিয়ে দিলো।

আমাদের কিছু কর্মীর মধ্যে এই অবাস্তব বোধের উদয় হলো যে আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব। আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে বিক্ষোভের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানোর মতো সামর্থ্য এখনও আমাদের হয়নি। এ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

আমি বললাম, আমাদের তুলনায় সরকারের শক্তি অনেক বেশি। গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে এর পতন ঘটাতে গেলে দল চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। আমাদের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না।

আমি দীর্ঘ মেয়াদে ডেফিয়্যান্স ক্যাম্পেইন চালিয়ে যাবার পক্ষে ছিলাম। আন্দোলনের বিষয়ে আমরা ড. জুমার কাছে পরামর্শের জন্য গেলাম। ড. জুমা বললেন, এ জাতীয় আন্দোলন একটানা চালিয়ে গেলে সরকারের অত্যাচার নির্যাতনের কৌশল বদলে যাবে। তারা নানাভাবে উৎপীড়ন চালাবে। অন্যদিকে কর্মীদের মধ্যে একঘেয়েমি তৈরি হবে। এ কারণে তিনি ক্যাম্পেইন কিছু দিনের জন্য মুলতবি করার পরামর্শ দিলেন। তার কথায় যুক্তি থাকলেও আমি তা

মানতে পারছিলাম না। আমার হৃদয় বলছিল আন্দোলন চালিয়ে যেতে কিন্তু মগজ বলছিল তা মুলতবি করা হোক। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পেইন স্থগিত করা হল।

পরে আমরা নিজেদের মধ্যে ক্যাম্পেইনের সফলতা ব্যর্থতা নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। আমরা দেখেছি শহর এলাকায় আমরা যতটা মানুষকে সংগঠিত করেছি গ্রামাঞ্চলে ততখানি করতে পারিনি।

এটাই ছিল এএনসির বড় দূর্বলতা। শেষের দিকে আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ার আরেকটি কারণ হলো আমাদের ফুল টাইম কোনও সংগঠক ছিল না। জীবিকার জন্য আমাকে ওকালতি করতে হতো; তারপর রাজনীতি করতাম। ফলে ক্যাম্পেইনে আমি চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিতে পারিনি।

তবে এ ক্যাম্পেইনে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল যেটি তা হলো আত্মসম্মানবোধ অর্জন। এ ক্যাম্পেইনে আফ্রিকানরা নিজেদের সম্মানিত ভাবতে শুরু করে। কর্মস্থলে শ্বেতাঙ্গদের সামনে বুক টান করে দাঁড়ানোর সাহস অর্জন করে। এ ক্যাম্পেইনের পর শ্বেতাঙ্গরা আমাকে নতুন চোখে দেখতে শুরু করে। আমার ঘুসিতে কত জোর থাকতে পারে তা তারা আন্দাজ করা শুরু করে। আমি বুঝতে পারি তারা আগে আমাকে যে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো সে দৃষ্টি এখন সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে পরিণত হওয়া শুরু করেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংগ্রামই আমার জীবন

১৫

১৯৫১ সালের শেষে বার্ষিক সম্মেলনে এএনসিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হল। নতুনভাবে এর সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানো হল। নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। সূচনা হল এক নতুন যুগের। প্রেসিডেন্ট হলেন গোত্রপতি বা চিফ অ্যালবার্ট লুথুলি। এএনসির সংবিধান অনুসারে ট্রান্সভালের আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি চার ডেপুটি প্রেসিডেন্টের একজন হলাম। এছাড়া ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি আমাকে ফার্স্ট ডেপুটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করলো। যে সব নেতা স্থানীয়ভাবে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সরকারি নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন লুথুলি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

লুথুলির বাবা ছিলেন একজন সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট মিশনারি। দক্ষিণ রোডেশিয়ায় জন্ম হয় লুথুলির। পড়াশুনা করেছেন নাটালে। এছাড়া ডারবানের কাছে অ্যাডামস্ কলেজে শিক্ষক হিসেবেও তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। হাল্কা পাতলা গড়নের লম্বাদেহী লুথুলি সব সময় হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। তার কুচকুচে কালো মুখে আত্মবিশ্বাসের আলো যেন ঠিকড়ে পড়তো। তিনি খুবই বুজুর্গ লোক ছিলেন। কথা বলতেন আস্তে আস্তে এবং টেনে টেনে যেন তার প্রতিটি বাক্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪০ সালের শেষ দিকে তার সংগে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় তিনি ন্যাটিভ'স রিপ্রেজেন্টেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে; অর্থাৎ বার্ষিক সম্মেলনের কিছুদিন আগেই সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে প্রেটোরিয়া থেকে জোহান্সবার্গে তলব করে আনেন। তাকে আল্টিমেটাম দিয়ে বলা হয় তিনি যদি এএনসির সদস্যপদ ছেড়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন থেকে সরে না আসেন তাহলে সরকারি বেতন সুবিধা

বন্ধ করে তার নির্বাচিত আদিবাসী সর্দার বা ট্রাইবাল চিফের দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হবে। লুথুলি একাধারে ছিলেন একজন শিক্ষক, একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান ও গর্বিত জুলু সর্দার। তিনি তার পদমর্যাদাকে সম্মান করতেন। কিন্তু বর্ণবাদের বিরুদ্ধে চলমান সংগ্রামকে তিনি তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। লুথুলি এএনসি থেকে বেরিয়ে যেতে অস্বীকার করলেন এবং ঘোষণা অনুযায়ী তাকে বরখাস্ত করা হলো। এর জবাবে লুথুলি একটি লিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। ওই-বিবৃতি পত্রের শিরোনাম ছিল, *'দি রোড টু ফ্রিডম ইজ ভায়া দি ক্রস'*। ওই বিবৃতিতে তিনি এএনসির হিংসাবর্জিত পরোক্ষ প্রতিরোধ কর্মসূচীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। তার বিবৃতির একটি অংশ আজও অনেক জায়গায় উদ্ধৃত হয় ঃ 'একটা বন্ধ আর নিষিদ্ধ দরোজায় ভদ্রভাবে, সভ্যভাবে, ধৈর্যের সাথে নিষ্ফল করাঘাত করে আমি যে আমার জীবনের মহামূল্যবান ৩২টি বছর নষ্ট করে ফেললাম সে কথা অস্বীকার করার মতো একটি লোকও কি আছে?'

আমি চিফ লুথুলিকে সমর্থন করেছিলাম। তবে জাতীয় সম্মেলনে হাজির থাকতে পারিনি। সম্মেলন শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে সারা দেশের মোট ৫২ জন নেতাকে ৬ মাসের জন্য যে কোন ধরণের মিটিং-মিছিলে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। ওই সময় জোহান্সবার্গ যাওয়ার ব্যাপারে আমার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

আমার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ছিল অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি কড়া। ওই সময় শুধু রাজনৈতিক নয়; সব ধরণের লোক সমাগম থেকে দূরে থাকার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, ওই সময় আমি আমার নিজের ছেলের বার্থ-ডে পার্টিতে পর্যন্ত যোগ দিতে পারিনি। শুধু তাই নয়; একই সময় আমাকে এক জনের বেশি লোকের সংগে কথা না বলার জন্যও আদেশ করা হয়। এর মাধ্যমে সরকার নিরবে শীর্ষ নেতাদের কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংগ্রামকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও কথা বলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে মানুষ শারীরিকভাবেই শুধু আটকা পড়ে তা নয়; তার মনোবল ও স্পৃহাও বন্দী হয়ে পড়ে। এর মাধ্যমে একজন মানুষকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে ফেলা হয়। নিষেধাজ্ঞা এক ভয়ঙ্কর খেলা। এর মাধ্যমে একজনকে আক্ষরিক অর্থে শেকল দিয়ে বাঁধা হয় না বটে; তবে আইন-কানুনের শেকল পরিয়ে তাকে চরম মানসিক নির্যাতন করা হয়।

১৯৫২ সালের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেওয়া থেকে আমাকে বিরত রাখা হলেও সেখানে কী কী সিদ্ধান্ত হয়েছে তা আমাকে শিগগিরই জানানো হল। ওই

সম্মেলনে কঠোর গোপনীয়তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয় যা সে সময় সবার সামনে প্রকাশ করা হয়নি।

আমার মতো দলের অনেকেরই সন্দেহ ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির মতো এএনসি ও এমএআইসির রাজনৈতিক তৎপরতাও সরকার নিষিদ্ধ করার চক্রান্ত করছে। আমরা বুঝতে পারছিলাম সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের দলকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করবে। আমরা যাতে আর বৈধ রাজনীতি করতে না পারি সে ব্যবস্থা করবে। এটা মাথায় রেখে আমি গোপনে নির্বাহী কমিটির সংগে বৈঠক করলাম। তাদের বললাম সরকার যদি তেমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তাহলে তা মোকাবেলার জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনের কথা ভাবতে হবে। আমরা এখনই যদি তা না করি তাহলে পরে দলের সমস্ত ব্যর্থতার দায় আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে। আমার কথা শুনে নির্বাহী কমিটি আমাকে একটি প্ল্যান দাঁড় করাতে বললো। তারা আমার কাছে এমন একটি রোড ম্যাপ চাইলেন যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকেও দল চালানো যাবে। তাদের কথায় আমি একটি পরিকল্পনাপত্র তৈরি করলাম যেটি পরবর্তীতে 'ম্যান্ডেলা প্ল্যান' বা 'এম-প্ল্যান' নামে পরিচিতি লাভ করে।

আমার পরিকল্পনায় এমন একটি সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানোর প্রস্তাব ছিল যা এএনসির শীর্ষ নেতৃত্বকে প্রয়োজনবোধে যে কোন মুহূর্তে বড় ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেবে। পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, জরুরি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা কোন সভা আহ্বান ছাড়াই সংগঠনের সব শাখায় তা দ্রুত জানিয়ে দিতে হবে।

অন্য কথায় এ পরিকল্পনায় অবৈধ ঘোষিত একটি সংগঠনকে তার কার্যক্রম চালু রাখার এবং নিষিদ্ধ নেতাদের নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টিকে অনুমোদন দেওয়া হল। এম-প্ল্যানে নতুন সদস্য সংগ্রহ করা, স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যা মোকাবেলা করা, দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক যোগাযোগ সব সময় অব্যাহত রাখা, আন্ডারগ্রাউন্ড নেতাদের সংগে তাদের যোগাযোগ ঠিক রাখা ইত্যাদির বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এম-প্ল্যানের নানা দিক নিয়ে বিশ্লেষণের জন্য আমি এএনসি ও এসএ আইসি'র সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ না হওয়া নেতাদের সংগে গোপনে একাধিকবার বৈঠক করলাম। আমি বেশ কয়েক মাস গবেষণা করে পরিকল্পনার একটি খসড়া দাঁড় করালাম। এটি সর্ব অবস্থায় দলকে সক্রিয় রাখার একটা রোডম্যাপ। এম-প্ল্যান অনুযায়ী দলকে শত শত ইউনিটে ভাগ করার কথা বললাম। সবচেয়ে ছোট ইউনিট হল সেল। শহর এলাকার জন্য সেলের ধারণাটা বেশি প্রযোজ্য। যেমন একটা রাস্তার দু'পাশের দশ-বারোটা বাড়ি নিয়ে একটা সেল। একজন সেল স্টুয়ার্ড ওই দশটা দলীয় সমর্থক পরিবারের দায়িত্বে থাকবেন। রাস্তা বা স্ট্রিটের দুপাশে সমর্থকদের বাড়ির সংখ্যা যদি ১০'র বেশি হয় তাহলে সেল স্টুয়ার্ড সবগুলো পরিবারের দায়িত্ব স্ট্রিট স্টুয়ার্ডের হাতে তুলে

দেবে। প্রত্যেক সেল স্টুয়ার্ড স্ব স্ব এলাকার স্ট্রিট স্টুয়ার্ডদের কাছে জবাবদিহি করবে। যে কোন সমস্যা হলে তার কাছে রিপোর্ট করবে। অনেকগুলো স্ট্রিট স্টুয়ার্ডের এলাকা মিলে একটি জোন তৈরি হবে। পুরো জোনটি পরিচালিত হবে একজন চিফ স্টুয়ার্ডের নির্দেশে। জোন স্টুয়ার্ড এএনসির স্থানীয় শাখার সেক্রেটারিয়েটের কাছে সব কাজের রিপোর্ট পেশ করবে। সেক্রেটারিয়েট হবে শাখা নির্বাহী কমিটির একটি সাব কমিটি। শাখা নির্বাহী কমিটি আঞ্চলিক সেক্রেটারির কাছে জবাবদিহি করবে।

আমার পরিকল্পনা ছিল প্রত্যেক সেলের সব পরিবার ও স্ট্রিট স্টুয়ার্ড একে অপরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবে যাতে লোকজন তাদের স্ট্রিট স্টুয়ার্ড দলনেতাকে বিশ্বাস করতে পারে। সেল স্টুয়ার্ডদের প্রধান কাজ হবে সভার আয়োজন করা, রাজনৈতিক ক্লাশের ব্যবস্থা করা এবং সদস্যদের বকেয়া চাঁদা তোলা। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে এ পরিকল্পনাটি শহরভিত্তিক তবে শিগগিরই তা পাড়াগাঁ পর্যন্ত বিস্তৃত করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস হল।

আমার এ পরিকল্পনা নীতি নির্ধারকদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হলো এবং দ্রুত তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সবগুলো শাখাকে প্রস্তুত হতে বলা হল। অধিকাংশ শাখা এ পরিকল্পনাকে একবাক্যে মেনে নিলেও কিছু কিছু শাখা এতে দ্বিমত পোষণ করল। তাদের ধারণা হল সবগুলো অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে জোহান্সবার্গ কেন্দ্রীয় কার্যালয় এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

এম-প্ল্যানের অংশ হিসেবে সারাদেশে এএনসি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে পলিটিক্যাল লেকচার চালু করা হয়। কর্মী সমর্থকদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলাই শুধু এর উদ্দেশ্য ছিল না, এর মাধ্যমে আমরা সংগঠনকে আরও সংহত করতে চেয়েছিলাম। আমাদের ব্রাঞ্চ লিডাররা গোপনে দলীয় সদস্যদের মধ্যে এসব লেকচার দিতেন।

তাদের বক্তব্য শুনে কর্মী ও সদস্যরা বাড়ি গিয়ে ওই কথাগুলো তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের কাছে বলতো। প্রথমদিকে এ লেকচার নিয়মতান্ত্রিক ছিল না। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে আমরা এ বিষয়ে একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করে ফেললাম।

পাঠ্যক্রমে মোট তিনটি কোর্স ছিল। তিনটি কোর্সের আলাদা আলাদা শিরোনাম ছিল। সেগুলো হলো : 'দি ওয়ার্ল্ড উই লিভ ইন (যে বিশ্বে আমরা বাস করি)', '*হাউ উই আর গভার্নড* (আমরা কীভাবে শাসিত হচ্ছি)' এবং '*দি নিড ফর চেঞ্জ*' (পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা)।

প্রথম কোর্সে বিশ্বে যেসব বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিস্টেম চালু রয়েছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় চলছে তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করতাম। মূলত

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ওপর এতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমরা বিভিন্ন তুলনামূলক চিত্রও তুলে ধরতাম। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় কীভাবে কৃষ্ণাঙ্গরা বর্ণবৈষম্য ও আর্থিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করতাম। যারা লেকচার দিতেন তাদের বেশিরভাগ নেতাকেই সরকার রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করেছিল। নিজে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যায় আমি বিভিন্ন গোপন জায়গায় কর্মীদের মধ্যে লেকচার দিতাম। এই রাজনৈতিক পাঠ প্রক্রিয়া চালু রাখার ফলে নিষিদ্ধ রাজনীতিকরা একদিকে যেমন সক্রিয় থাকতে পারলেন অন্যদিকে তারা গোপনে হলেও কর্মীদের সংস্পর্শে থাকার সুযোগ পেলেন।

ওই সময় আমরা নিষিদ্ধ নেতারা প্রায়ই গোপন বৈঠকে মিলিত হতাম। সেখানে নতুন নেতারাও থাকতেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হলে সবাই একসংগে আলাপ করে নিতাম। মাঝে মাঝে মনে হতো, গোপনে মিলিত হওয়া ছাড়া আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমে সরকার অন্য কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি।

বড় ও ব্যাপক উদ্দেশ্যে এম-প্ল্যান করা হয়েছিল। কিন্তু কার্যত এ প্ল্যান খুব একটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ব্যাপক ও বিস্তৃত পর্যায়ে এ প্ল্যান কাজে খাটানো যায়নি। তবে ডেফিয়্যান্স ক্যাম্পেইনের মতো এম-প্ল্যানের কার্যকারিতায়ও যেখানে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা গেছে সে জায়গা দুটো হল পূর্ব কেপ এবং পোর্ট এলিজাবেথ। অন্য সব এলাকায় ডেফিয়্যান্স ক্যাম্পেইন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত পূর্ব কেপে তা চলমান ছিল। সেখানকার এএনসি নেতারা এম-প্ল্যানকে সরকারের পতন ঘটানোর এক চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

এম-প্ল্যান অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। যেমন ঃ দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে এ পরিকল্পনা সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি; এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বেতনভাতাভুক্ত কোন সংগঠক ছিলেন না যারা পেশাদার প্রশিক্ষকদের মতো তা সবাইকে বোঝাতে পারবেন; এছাড়া অনেক শাখার নেতারা এ পরিকল্পনাকে তাদের ক্ষমতা খর্ব করার অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেছিল। তাদের ধারণা ছিল সরকার তখন পর্যন্ত এমন কোন পদক্ষেপ নেয়নি যাতে মনে হতে পারে এএনসিকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। সে কারণে পূর্ব সতর্কতা হিসেবে এ প্ল্যানকে তারা কার্যকর করতে চাননি। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার যখন সেই দিকেই এগুলো তখন দেখা গেল তা মোকাবেলায় তাদের কোন প্রস্তুতিই নেই।

১৬

প্রতিরোধ বিক্ষোভ চলাকালীন আমাকে দুই ধরণের জীবন যাত্রায় ব্যস্ত থাকতে হতো। প্রথমত আন্দোলন সংগ্রামে কাজ করা এবং দ্বিতীয়ত জীবিকার তাগিদে অ্যাটর্নি হিসেবে আইন ব্যবসায় ব্যস্ত থাকা। এএনসিতে আমি কখনোই সার্বক্ষণিক সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করিনি। অবশ্য ফুলটাইম অর্গানাইজার হিসেবে কাউকে ভাতা দেওয়া দলের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তারপরও দল মাত্র একজনকেই ফুলটাইম অর্গানাইজার নিয়োগ করেছিল। তিনি হলেন থমাস তিতাস এনকোবি। অ্যাটর্নি হিসেবে আমাকে যেসব কাজ করতে হতো তার ফাঁকে ফাঁকে আমি সংগঠনে সময় দিতাম। ১৯৫১ সালে উইটকিন, সাইডলস্কি অ্যান্ড আইডলম্যান ল ফার্মের শিক্ষানবীশী পর্ব সেরে আমি টারব্রাঞ্চ অ্যান্ড ব্রিগিশ ল ফার্মে যোগ দেই। শিক্ষানবীশীকাল শেষ হলেও আমি তখনও পূর্ণাঙ্গ অ্যাটর্নি হতে পারিনি। তবে অ্যাটর্নির সব কাজ যেমন কোর্ট প্লিডিং তৈরি করা, তলব করা, সাক্ষীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া ইত্যাদি আমি তখন নিয়মিত করছিলাম।

সাইডলস্কি ফার্ম ছেড়ে আমি একের পর এক বেশ কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ ল'ফার্মে চাকরি করি কারণ তখন সেখানে কোন আফ্রিকান ল ফার্ম ছিল না। আমি ব্যক্তিগত কৌতুহল থেকে লক্ষ্য করেছি এই সব শ্বেতাঙ্গ ফার্মে অনেক বেশি ফি নেওয়া হতো।

এদের একটি আচরণ আমাকে সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ করত। সেটা হলো বেশির ভাগ শ্বেতাঙ্গ ল ফার্ম খুব ধনী শ্বেতাঙ্গ মক্কেলদের কাছ থেকে যে ফি আদায় করত তার চেয়ে অনেক বেশি নিত কৃষ্ণাঙ্গ ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে; তা সে ধনীই হোক আর গরীবই হোক।

টারব্রাঞ্চ অ্যান্ড ব্রিগিশ ফার্মে বছরখানেক কাজ করার পর আমি *হেলম্যান অ্যান্ড মাইকেল* নামের একটি ল ফার্মে যোগ দেই। এটা অন্যদের তুলনায় অনেক উদারপন্থি প্রতিষ্ঠান ছিল এবং তারা আফ্রিকান মক্কেলদের কাছ থেকে যৌক্তিক পরিমাণ ফি নিত। শুধু তাই নয়, আফ্রিকানদের পড়াশুনার উন্নতির জন্য তারা প্রতি বছর একটা মোটা পরিমাণের অর্থও বিভিন্ন আফ্রিকান সংস্থাকে সাহায্য করত। ফার্মের অন্যতম প্রধান পার্টনার মিস্টার হেলম্যান তাদের এই ফার্ম সুপরিচিত হওয়ার বহু আগে থেকেই আফ্রিকানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত থাকতেন। প্রতিষ্ঠানটির অন্য পার্টনারের নাম রোডনি মাইকেল। এই ভদ্রলোক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনিও খুব উদারপন্থি ছিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন তিনি একজন পাইলট হিসেবে কাজ করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধচলাকালীন যখন এএনসি কর্মীদের ওপর চরম নির্যাতন শুরু হল তখন তিনি এএনসি কর্মীদের বিমানে করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়েছিলেন। মাইকেলের

একমাত্র বাজে দিক ছিল অতিরিক্ত ধূমপান। অফিসে বসে তিনি যত সময় কাজ করতেন তত সময় একের পর এক সিগারেট ফুঁকতেন। ম্যাচ ব্যবহার করতেন না। একটার আগুন দিয়ে আরেকটা জ্বালাতেন।

হেলম্যান অ্যান্ড মাইকেল ফার্মে আমি বেশ কয়েকমাস চাকরি করেছি। ওই সময় আমি পূর্ণাঙ্গ অ্যাটর্নি হওয়ার জন্য কোয়ালিফিকেশন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। চাকরির পাশাপাশি ওই পরীক্ষার পড়াশুনা চালাচ্ছিলাম। উইটওয়াটারসর্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আমি বারবার পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে না পেরে এল এল বি পাশের স্বপ্ন বাদ দিয়েছিলাম। কিন্তু ওই সময় বুঝতে পারলাম এল এল বি ছাড়া পূর্ণাঙ্গ অ্যাটর্নি হওয়া যাবেনা। আমি এই আশায় আবার পড়াশুনা শুরু করলাম যাতে পাশ করার পর পূর্ণাঙ্গ অ্যাটর্নি হয়ে বেশি অর্থ রোজগার করতে পারি। আমার পরিবারের সংগে তখন আমার বোন বসবাস শুরু করে। তাছাড়া আমার মা মাঝে মাঝেই আমার বাসায় এসে দু'দশ দিন নাতিদের সংগে কাটিয়ে যেতেন। ফলে খরচ বেড়ে গিয়েছিল। প্রশিক্ষনরত নার্স হিসেবে ইভেলিন যা পেত তা আর আমার অল্প উপার্জন দিয়ে সংসার চালানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল।

এল এল বি পাশ করেই আমি পূর্ণাঙ্গ অ্যাটর্নি হিসেবে এইচ এম বাসনারের ফার্মে যোগ দিলাম। বাসনার তখন সিনেটে আফ্রিকানস্ রিপ্রেজেন্টিটিভ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এর আগে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি তিনি আফ্রিকানদের অধিকারের সমর্থক ছিলেন। আইনজীবী হিসেবে তিনি বহুবার আফ্রিকান নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিক ইউনিয়ন নেতাদের পক্ষে আদালতে লড়েছেন। আমি যতদিন তার ফার্মে চাকরি করেছি ততদিন ওই ফার্মের আফ্রিকান মক্কেলদের পক্ষে আদালতে আইনী লড়াই করেছি।

১৯৫২ সালের আগস্টে আমি নিজেই একটা ল' অফিস খুললাম। অফিসে বসার পর যে সাফল্যটা আমি খুব উপভোগ করছিলাম সেটি হল আমার ব্যক্তিগত সেক্রেটারি। একজন সেক্রেটারি রাখার সামর্থ্য অর্জনে স্বাভাবিকভাবেই আমি খুব উচ্ছসিত ছিলাম। মেয়েটার নাম জুবেইদা প্যাটেল। এইচ. এম. বাসনারের ফার্মে আমি যখন অ্যাটর্নি হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম তখন সেখানে আফ্রিকানারভাষী এক শ্বেতাঙ্গ মেয়ে কাজ করতো। আমি কৃষ্ণাঙ্গ বলে সে আমার ডিক্টেশন অনুযায়ী কাজ করতে রাজি হল না এবং চাকরি ছেড়ে চলে গেল। তার স্থলে জুবেইদা প্যাটেলকে নিয়োগ দেওয়া হল। সেখানেই জুবেইদার সংগে আমার প্রথম দেখা হয়।

আমার বন্ধু ও ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের সদস্য কাসিম প্যাটেলের স্ত্রী ছিল জুবেইদা। বর্ণ বিভেদ কী জিনিস সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না মেয়েটার। অসংখ্য

বন্ধুবান্ধব ছিল তার। আমার সংগে ওর খুব ভালো বন্ধুত্ব তৈরি হয়। আমি যখন চাকরি ছেড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম এবং নিজে প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত নিলাম, জুবেইদা তখন আমার সংগে কাজ করতে রাজি হল। সে আমার সেক্রেটারী হলেও জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ তাকেই করতে হত।

ওই সময় অলিভার ট্যাম্বো 'কোভালস্কি অ্যান্ড টুচ' নামে একটা ফার্মে কাজ করতো। লাঞ্চ আওয়ারে আমি প্রায়ই তার অফিসে যেতাম। ওদের অফিসে একটা বিশেষ ওয়েটিং রুম ছিল যেখানে শুধুমাত্র সাদাদেরই ঢোকার অনুমতি ছিল। কিন্তু আমরা সে নিয়ম মানতাম না সেখানে দুই বন্ধু মিলে কথাবার্তা বলতাম। বেশিরভাগ সময়ই আমাদের মধ্যে এএনসির কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হতো।

ফোর্ট হেয়ারে গিয়ে প্রথম যখন অলিভারের সংগে দেখা হয় তখনই তার অসাধারণ মেধা ও বিতার্কিক দক্ষতা আমাকে মুগ্ধ করে। খুব ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে সে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে পারতো। তার সেই গুণটি আইন ব্যবসায় খুব কাজে দিয়েছিল। ফোর্ট হেয়ারে পড়তে আসার আগে অলিভার জোহান্সবার্গের সেন্ট পিটার স্কুলের একজন উজ্জ্বলতম মেধাবী ছাত্র ছিল। দর্শনগত ধ্যান-ধারণা থেকে অলিভার খুবই ধর্মানুরাগী ছিল। ট্রান্সকেই'র অন্যতম অংশ পোন্ডোল্যান্ডের বাইজানা থেকে এসেছিল অলিভার। তার চোখেমুখে আদিবাসীদের লক্ষণ ফুটে থাকতো। অলিভারের সংগে আমার চিন্তা চেতনায় অনেক মিল ছিল। এ কারণে আমি তাকে এখানকার চাকরি ছেড়ে আমার সংগে যোগ দিতে বললাম। কয়েক মাসের মধ্যে অলিভার চাকরি ছেড়ে দিলো। আমি আর সে জোহান্সবার্গের প্রাণকেন্দ্রে শুরু করলাম এক নতুন ল ফার্ম।

সেন্ট্রাল জোহান্সবার্গে অবস্থিত ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সামনে মার্বেল পাথরে তৈরি বিচারকের যে ভাস্কর্যটি দাঁড়িয়েছিল; তার অদূরেই চ্যান্সেলর হাউস নামে একটি বিল্ডিংয়ে আমাদের অফিস খুললাম। অফিসের দরোজায় পালিশ করা তামা দিয়ে ফার্মের সাইনবোর্ড লেখা হল, '*ম্যান্ডেলা অ্যান্ড ট্যাম্বো*'। আমাদের ওই অফিস বিল্ডিংয়ের মালিক ছিলেন ভারতীয় এক ভদ্রলোক। জোহান্সবার্গের নির্দিষ্ট যে অল্প সংখ্যক জায়গায় আফ্রিকানরা ঘর ভাড়া নিতে পারতো এটা ছিল সে ধরণের এলাকা। '*ম্যান্ডেলা অ্যান্ড ট্যাম্বো*' তার যাত্রা শুরু করার সংগে সংগে সেখানে উপচে পড়া মক্কেলের ভিড় দেখা দিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরাই একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ আইনজীবী ছিলাম তা নয়। কিন্তু পুরো দক্ষিণ আফ্রিকায় '*ম্যান্ডেলা অ্যান্ড ট্যাম্বো*' ছিল একমাত্র ল'ফার্ম যেটা আফ্রিকানদের দ্বারা পরিচালিত ছিল। আফ্রিকানদের কাছে আমরাই ছিলাম প্রথম পছন্দের এবং তাদের শেষ ভরসাস্থল। সকালবেলা আমাদের দরজার সামনে, করিডোরে, ওয়েটিং রুমে ও সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য অপেক্ষমান লোকের ভীড় ঠেলে তারপর অফিসে ঢুকতে হতো।

ওই সময় দেখেছি কীভাবে আফ্রিকানরা সরকারের নির্মম অত্যাচারের শিকার হতো। তারা প্রতিনিয়ত কীভাবে আইনি সহায়তার জন্য সরকারি ভবনে তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতো। 'হোয়াইটস্ ওনলি' লেখা দরোজা দিয়ে ঢোকা তাদের জন্য অপরাধ ছিল; 'হোয়াইটস্ ওনলি' বাসে উঠলে তাদের গ্রেফতার করা হতো; 'হোয়াইটস্ ওনলি' পানির কল ছেড়ে সেখান থেকে পানি খাওয়া তাদের জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল; 'হোয়াইটস্ ওনলি' বীচে হাঁটতে গেলে তাদের জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো; রাত এগারোটার পর রাস্তায় বের হওয়া তাদের জন্য অপরাধ ছিল; পাশ বই সংগে না অথবা ওই বইয়ে ভুল জায়গায় সই করা তাদের জন্য অপরাধ ছিল; প্রাপ্তবয়স্কদের বেকার থাকা এবং অননুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করা দুটোই অপরাধ ছিল; একদিকে মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকায় রাস্তায় ঘুমালে তাদের আইনের মারপ্যাচে জেলে ঢোকানো হতো অন্যদিকে নির্দিষ্ট এলাকাগুলো তাদের বসবাসের জন্য হারাম ছিল।

তাদের জন্য আইন কানুন এত জটিলভাবে বানানো হয়েছিল যে প্রায় প্রত্যেক আফ্রিকানেরই কোন না কোন কারণে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো। আইনি সহায়তা চাইতে যেতে হতো সেই শ্বেতাঙ্গদের কাছে। আফ্রিকান ল ফার্ম পেয়ে তারা দলে দলে '*ম্যান্ডেলা অ্যান্ড ট্যাম্বো*'তে আসতে থাকে।

প্রত্যেক সপ্তাহেই অজপাড়া গ্রাম থেকে আসা এমন কোন না কোন প্রবীন ক্লায়েন্ট পেতাম যাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের যখন জিজ্ঞাসাবাদ করতাম তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে বলতো কীভাবে বংশ পরম্পরায় দখলে থাকা জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহেই এমন অনেক বৃদ্ধাকে পেতাম সংসারের একটু আয় বাড়ানোর জন্য যারা ছোটখাটো শুয়োরের খামার করেছিল। অথচ সরকার এ কাজকে তাদের জন্য বেআইনি ঘোষণা করে তার সব শুয়োর খামার থেকে নিয়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহেই এমন অনেক লোকের সাক্ষাৎকার নিতে হতো যারা কয়েক পুরুষ ধরে তাদের ভিটেয় আছে অথচ সরকার সেটাকে শ্বেতাঙ্গ এরিয়া ঘোষণা করায় বিনা ক্ষতি পূরণে তা ছেড়ে তাদের চলে যেতে হচ্ছে। প্রতিদিন আমাকে শত শত আফ্রিকানের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হতো।

অলিভারের একটানা কাজ করে যাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। প্রত্যেক মক্কেলের জন্য সে অনেক সময় ব্যয় করতো। এটা যে শুধু পেশাগত সততা বজায় রাখার জন্য তাই নয়; সীমাহীন ধৈর্য থাকার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল। সে ক্লায়েন্টের মামলার সংগে সংগে তাদের ব্যক্তিজীবনেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলতো। প্রত্যেক মক্কেলের জীবনবৃত্তান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতো এবং সহজভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করতো। এর ফলে ক্লায়েন্টদের সংগে পেশাগত সম্পর্কের বাইরে তার একটি ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্ক তৈরি হতো।

'*ম্যান্ডেলা অ্যান্ড ট্যাম্বো*' সম্পর্কে সাধারণ আফ্রিকানদের মধ্যে কী ধারণার জন্ম নিচ্ছে আমি দ্রুত তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। তারা বুঝতে পেরেছিল এখানে এলে তারা মন খুলে তাদের সমস্যার কথা বলতে পারবে; এখান থেকে বিমুখ অথবা প্রতারিত হয়ে ফিরতে হবে না তাদের এ উচ্চ ধারণার কারণে আমি দ্রুতই শীর্ষস্থানীয় উকিল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলাম। মনে হচ্ছে পেশা হিসেবে আইন ব্যবসাকে বেছে নেয়াটাই আমার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল।

প্রতিদিন সকালে আমরা অন্তত অর্ধডজন মামলার ডিল করতাম এবং সারাদিন কোর্টে ঢুকতে আর বেরুতেই কেটে যেতো। কিছু কিছু আদালতে আমাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখানো হতো। আর কিছু আদালতে আমাদের সংগে অশোভন আচরণ করা হতো। কিন্তু সফলভাবে ওকালতি করে এবং একের পর এক মামলায় জেতা সত্ত্বেও আমরা বুঝতে পারছিলাম, আমরা শুধুমাত্র আফ্রিকান হওয়ার অপরাধে কোনদিনও একজন প্রসিকিউটর, একজন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা একজন জজ হতে পারবো না।

যারা এসব পদে আসীন ছিলেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আমাদের চেয়ে বেশি ছিল না। আমাদের চেয়ে তাদের যে বড় যোগ্যতা ছিল তা হল তাদের গায়ের রং। অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ হওয়ার কারণেই তারা আমাদের চেয়ে অতিরিক্ত সুবিধা নিশ্চিত করতে পারছিল।

বর্ণবৈষম্য এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে খোদ আদালত কক্ষেও আমাদের নানা ধরণের অপমানজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হতো। যেমন শ্বেতাঙ্গ সাক্ষীরা প্রায়ই কৃষ্ণাঙ্গ আইনজীবীর প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানাতো।

আমার ক্ষেত্রে এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। এ অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষীকে সরাসরি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে নির্দেশ না দিয়ে আমার প্রশ্নটাই তিনি সাক্ষীকে করতেন; সাক্ষী সে প্রশ্নের জবাব দিতো। অর্থাৎ আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যস্থতার সাহায্যে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হত।

আদালতের নিয়মিত কাজ হিসেবে আমাকে পুলিশের তদন্ত কর্মকর্তাদের জেরা করতে হতো। অনেক সময় জেরা করতে গিয়ে তাদের বড় বড় ফাঁকি ধরে ফেলতাম। মিথ্যে রিপোর্ট দিলে তা ধরা পড়ে যেতো। কিন্তু তারপরেও সেই দুর্নীতিবাজ পুলিশরা আমাকে 'কাফ্রির উকিল' ছাড়া আর কিছুই মনে করতো না।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। একবার আমি আসামীর পক্ষে কোর্টে 'মুভ' করছিলাম। আমি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বললাম, 'ধর্মাবতার! আমি নেলসন ম্যান্ডেলা, আমি আসামীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে এসেছি। আমি আপনার সদয় অনুমতি প্রার্থনা করছি।'

ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে বললেন, 'আমি তো আপনাকে চিনি না। আপনি যে উকিল তার প্রমাণ কী? আপনার সার্টিফিকেট কোথায়?' তার কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। আইনজীবীরা সার্টিফিকেট সংগে নিয়ে আদালতে আসে এমন কথা বাপের জন্মেও শুনিনি। এটা এক অর্থে কোন পথচারীর কাছে ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট চাওয়ার শামিল। তারপরও আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলার কার্যক্রম শুরু করার অনুরোধ জানিয়ে বললাম যথাসময়ে আমি তাকে আমার সার্টিফিকেট দেখাবো। কিন্তু তিনি মামলার শুনানি শুরু করতে অস্বীকৃতি জানালেন এমন কি আমাকে কক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য তিনি পুলিশ পর্যন্ত ডাকতে যাচ্ছিলেন।

এ বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। ম্যাজিস্ট্রেট আমার সংগে যে আচরণ করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণরূপে কোর্ট প্র্যাকটিসের লংঘন। আমার আইনজীবী বন্ধু জর্জ বাইজোস আমার পক্ষ থেকে কোর্টে দাঁড়ালেন। শুনানির দিন, প্রধান বিচারপতি ম্যাজিস্ট্রেটকে ওই আচরণের জন্য অনেক ভর্ৎসনা করলেন এবং আমার মক্কেলের যে মামলাটি তার আদালতে ছিল, সে মামলার বিচার তার পরিবর্তে অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে করার নির্দেশ দিলেন।

ওকালতি পেশা আদালতের বাইরে যে আমার ইজ্জত সম্মান নিশ্চিত করতে পেরেছিল মোটেও তা নয়। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন আমাদের অফিসের সামনের ব্যস্ত রাস্তায় দেখলাম আগে-পিছে দুটো গাড়ির মাঝখানে একটা মোটরগাড়ি আটকে গেছে। ভেতরে এক শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধা। গাড়ির অবস্থা দেখে মনে হল গাড়িটাকে ঠেলা দিলে সেটা আটকে পড়া অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে। আমি এগিয়ে গিয়ে ঠেলা দিয়ে গাড়িটাকে জটমুক্ত করলাম। ইংরেজীভাষী ওই সাদা বৃদ্ধা আমার দিকে চেয়ে বললেন, "থ্যাংক ইউ, 'জন'।" অপরিচিত কোন আফ্রিকানকে সম্বোধনের সময় শ্বেতাঙ্গরা সাধারণত 'জন' বলে ডাকতো।

বৃদ্ধা আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে একটা আধা শিলিংয়ের রৌপ্য মুদ্রা এগিয়ে দিলেন। আমি বিনীতভাবে বললাম, ধন্যবাদ, ওটার প্রয়োজন নেই। মহিলা আবারও আমার দিকে সেটা বাড়িয়ে নিতে বললেন। আমি আবারও বললাম, 'নো, থ্যাংক ইউ।' মহিলা আমাকে অবাক করে প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'আধ শিলিং নেবে না? পুরো একটা শিলিং চাও তাই না? কিন্তু ওর বেশি এককানাকড়ি আমি তোমাকে দেব না।' এই বলে মহিলা আধুলিটি আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

এক বছরের মধ্যেই আমি এবং অলিভার আবিস্কার করলাম আরবান এরিয়াস অ্যাক্ট বা নগর আইনের বিধি অনুযায়ী নগর মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া এ শহরে আমাদের যে কোন ধরণের প্রতিষ্ঠান চালানোর অনুমতি নেই। আমরা অনুমোদনপত্রের জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলাম কিন্তু সে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলো। এর বদলে গ্রুপ এরিয়াস অ্যাক্ট অনুযায়ী আমাদের অল্প কিছুদিনের জন্য

একটি অস্থায়ী অনুমতিপত্র দেওয়া হল। তার মেয়াদও শিগগিরই শেষ হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষের কাছে তা নবায়নের আবেদন করলে তারা সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা আমাদের মূল শহর থেকে দূরে কোন আফ্রিকান এরিয়ায় অফিস নিতে বললেন। কিন্তু তারা এটা বুঝতে চাইলেন না যে শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে ফার্ম সরিয়ে নিলে সেখানে ক্লায়েন্টরা আসতে পারবে না। তাদের আচরণে আমরা দ্রুত বুঝে ফেললাম তারা আমাদের আইন পেশা থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। তারা আমাদের একের পর এক বিভিন্ন ধরণের সমস্যায় ফেলে আইন ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য করতে চাইছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সে সময় আইনজীবী হিসেবে কাজ করার মানে ছিল ভিত্তিহীন বিচারপদ্ধতি ও বৈষম্যমূলক আইন-কানুন নিয়ে নাড়াচাড়া করা। সেখানে একেক জনের জন্য একেক ধরণের আইন ছিল। এর মধ্যে চরম বৈষম্যমূলক আইনটির নাম *পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট*। এ আইন নাগরিকদের অসমতা নির্দেশ করতো। একবার আমি একটি মামলা হাতে নিয়েছিলাম যাতে একজন নিগ্রোকে অন্যায়ভাবে আফ্রিকান জাতির লোক হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছিল। নিগ্রো লোকটা; অর্থাৎ আমার মক্কেল ভদ্রলোক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উত্তর আফ্রিকা ও ইতালিতে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেশে ফেরার পর এক শ্বেতাঙ্গ সচিব তাকে অন্যায়ভাবে আফ্রিকান শ্রেণীভুক্ত হিসেবে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। এরকম ঘটনা আফ্রিকায় হরহামেশাই ঘটতো। আমি *পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের* আদর্শে শ্রদ্ধাশীল ছিলাম না। তবে এক শ্রেণীর নাগরিককে অন্য শ্রেণীতে অন্যায়ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়াটাকেও আমি সমর্থন করতে পারলাম না। আফ্রিকানদের চেয়ে নিগ্রোরা অনেক বেশি নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে পারতো।

যেমন আফ্রিকানদের সব সময় পাশ বই সংগে রাখতে হতো কিন্তু নিগ্রোদের বেলায় সেটার দরকার হতো না।

যাই হোক, আমি ওই নিগ্রো ভদ্রলোকের মামলাটি নিয়ে ক্ল্যাসিফিকেশন বোর্ডের আদালতে আপীল করলাম। একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্য দুজন কর্মকর্তা নিয়ে ওই বোর্ড গঠিত হয়েছিল। এদের তিনজনই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। আমার মক্কেল যে একজন আফ্রিকান নন বরং একজন নির্ভেজাল নিগ্রো তার যথেষ্ট প্রমাণপত্র বোর্ডে হাজির করলাম। সরকারি কৌসুলিও আমাদের আপীলের বিরোধীতা করবেন না বলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন। কিন্তু আমার প্রমাণপত্র বা কৌসুলির বিরোধিতা না করার ঘোষণা কোনটির প্রতি ম্যাজিস্ট্রেটের আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল না। তিনি আমার মক্কেলকে তার কাছাকাছি গিয়ে তার সামনে পেছনে ফিরে দাঁড়াতে বললেন। অনেকক্ষণ ধরে তার কাঁধের দিকে চেয়ে দেখলেন। তার কাঁধ ঢালুভাবে নিচের দিকে নেমে গেছে। তিনি কিছুক্ষণ দেখে তারপর অন্য দুই কর্মকর্তার দিকে চেয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। আমাদের আপীল গৃহিত হল। তখনকার দিনে শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তারা ঢালু কাঁধ বিশিষ্ট কালোদের নিগ্রো বলে ধরে নিত।

অর্থাৎ লোকটা কোন শ্রেণীর মানুষ তা তার শারীরিক কাঠামো দেখে ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক করতেন। সাক্ষ্য-প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে দায়ের করা বহু মামলাও আমরা হাতে নিতাম। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যের হার ছিল খুবই কম। পুলিশি নির্যাতনের বিষয়টি প্রমাণ করা খুবই দুঃসাধ্য ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশ আসামিকে নির্যাতন করার পর তার শরীর থেকে নির্যাতনের চিহ্ন মোটামুটি দূর হওয়ার পর মুক্তি দিতো। কেটে ফেটে গেলে ঘা না শুকানো পর্যন্ত কাস্টডিতে আটকে রাখতো। অন্যদিকে স্বাভাবিকভাবেই ম্যাজিস্ট্রেটরা পুলিশের পক্ষ নিতেন। পুলিশ হেফাজতে কয়েদীর মৃত্যু হলে ময়নাতদন্তকারী ডাক্তাররা মৃত্যুর কারণ হিসেবে প্রায়ই গৎবাধা নিয়মের মতো রিপোর্টে লিখে দিতেন, '*ডেথ ডিউ টু মাল্টিপল কজেস*' (নানাবিধ কারণে মৃত্যু)। অথবা তারা মৃত্যুর এমন সব অস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতেন যার কারণে পুলিশ আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেত।

জোহান্সবার্গের বাইরে যখন আমার কোন মামলায় লড়তে যাওয়ার দরকার হতো তখন আমি কিছু সময়ের জন্য জোহান্সবার্গের বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইতাম। এ অনুমতি প্রায়ই মঞ্জুর হতো। (ওই সময় রাজনৈতিক কারণে আমার গতিবিধির ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। জোহান্সবার্গের বাইরে যেতে চাইলে আমাকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হতো।) মনে পড়ছে একবার পূর্ব ট্রান্সভালে একটা মামলার কাজে গিয়েছিলাম। ক্যারোলাইনার এক লোকের পক্ষে মামলা লড়তে গিয়েছিলাম আমি। সেখানকার আদালতে আমি যখন দাঁড়ালাম তখন এক মজার দৃশ্যের সৃষ্টি হল। আমাকে লোকজন গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগলো। কারণ এর আগে তারা কোনদিন কোন আফ্রিকান উকিল চোখে দেখেনি। সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রসিকিউটর আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় স্বাগত জানালেন এবং বিচারকাজ শুরু করার আগে আমি কীভাবে আইনজীবী হলাম, কোথায় পড়াশুনা করেছি, বাড়ি কোথায় সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর মামলার কাজ শুরু করলেন।

মামলায় আমার মক্কেল ছিলেন আসামী। তিনি ছিলেন একজন স্থানীয় কবিরাজ। তার বিরুদ্ধে যাদুটোনা প্র্যাকটিসের অভিযোগ আনা হয়েছিল। পুলিশের অভিযোগ ছিল তিনি নাকি '*উইচ ক্র্যাফট*' বা ডাইনিতন্ত্রের সাধনা করেন। শুনানি চলাকালে আদালত কক্ষ লোকে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমার ওই মক্কেলের বহু অনুসারী ছিলেন যারা তাকে অলৌকিক ক্ষমতাধর বলে বিশ্বাস করত; তাকে ভয় করতো। শুনানি চলাকালে কবিরাজ লোকটা হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে কেমন যেন বিড় বিড় করা শুরু করলেন। আশে পাশের মানুষ ভয়ে চারদিকে ছিটকে সরে গেল। তাদের সবার ধারণা ছিল ওই কবিরাজ কোন বিশেষ মন্ত্র পাঠ করছে। যে কোন

সময় অস্বাভাবিক কিছু ঘটে যেতে পারে। তবে কিছুই ঘটলো না। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় আদালত তাকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিল। জনগণ এর জন্য আইনজীবী অর্থাৎ আমার কোন কৃতিত্ব আছে বলে স্বীকার করলো না। তাদের বদ্ধমূল ধারণা, মন্ত্রের জোরেই কবিরাজ ভদ্রলোক ছাড়া পেয়েছেন।

অ্যাটর্নি হিসেবে আমি সব সময় কেতাদূরস্ত হয়ে আদালতে যেতাম। শ্বেতাঙ্গদের কোর্টে ঢোকার সময় আমি কখনও নিজেকে কৃষ্ণাঙ্গ ও কম মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ মনে করতাম না। কোর্টে যারা আসতো সবাইকে আমি সম্মানিত গেস্ট মনে করতাম। সাদা বলে কাউকে অতিরিক্ত খাতির করতাম না।

এজলাসের সামনে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের সময় আমি হাত নেড়ে উচ্চকিত কণ্ঠে কথা বলতাম। এমনিতে সব সময় আদালতের নিয়ম-কানুন মেনে চলতাম। তবে সত্য উদ্ঘাটন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার খাতিরে অনেক সময় সাক্ষীদের সংগে উল্টোপাল্টা আচরণ করে তাদের মানসিকভাবে হকচকিয়ে দিতাম। প্রয়োজনে তাদের ধোঁকা দেওয়াকেও কৌশল হিসেবে বেছে নিতাম। তখনকার দিনে আদালতকক্ষ পল্লী এলাকা থেকে আসা মানুষে গিজ গিজ করতো। এদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই বিচারকাজকে বিনোদন হিসেবে উপভোগ করতো।

এ মুহূর্তে একটা মজার মামলার কথা মনে পড়ছে। খুবই মামুলি ধরণের মামলা। এক আফ্রিকান গৃহ পরিচারিকার বিরুদ্ধে গৃহকর্ত্রীর মামলা ছিল সেটি। আমি আসামী পক্ষের হয়ে লড়ছিলাম। আফ্রিকান ওই মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে সে তার 'ম্যাডামের' জামা কাপড় চুরি করে পালিয়েছিল। বাদী জানালেন তারা ওই মেয়েকে খুঁজে বের করেছেন এবং চুরি যাওয়া জামাকাপড় উদ্ধার করা হয়েছে। এজলাসের সামনে দেখলাম মহিলাদের কাপড়ের একটা ছোট স্তূপ গৃহকর্ত্রী জানালেন, এই কাপড়গুলিই মেয়েটা চুরি করে পালিয়েছিল। আমি সবার সামনে রাখা কাপড়গুলো ভালোভাবে কিছুক্ষণ দেখলাম। তারপর ওর ভেতর থেকে ময়লা একটা অন্তর্বাস কলমের ডগা দিয়ে বের করে আনলাম। ওটা ছিল একটা প্যান্টি। সেটা কলমের ডগায় ঝুলিয়ে নাকটাকে যথাসম্ভব কুচকিয়ে তার সামনে ধরে বললাম, এটা আপনার জিনিস?' আমি যেভাবে ঘেন্না ঘেন্না ভাব নিয়ে তার সামনে প্যান্টিটা তুলে ধরেছিলাম তাতে তিনি বিব্রত হয়ে ঝটপট বলে ফেললেন, 'না, ও জিনিস আমার হতে যাবে কেন?' ভদ্রমহিলা এই উত্তর দেওয়ায় এবং তার উপস্থাপিত তথ্য প্রমাণ দূর্বল হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি খারিজ করে দিলেন।

১৭

জোহান্সবার্গের প্রাণকেন্দ্র থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে পাহাড় ঘেরা এক অসম্ভব সুন্দর উপ-শহর সোফিয়া টাউন। পাহাড়ের ওপর থেকে দেখলে একে আঁকা ছবির মতো মনে হতো। এ শহরের ভালোমন্দ দেখতেন এমন যে কয়জন শুভাকাঙ্ক্ষি ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফাদার ট্রেভর হাড্লস্টোন। তিনি একবার সোফিয়া টাউনকে ইতালীর একটি পাহাড়ি শহরের সংগে তুলনা করেছিলেন। দূর থেকে দেখলে এর সৌন্দর্য মনে রেখাপাত না করে পারতো না। লাল লাল ছাদের বাড়িগুলো একটার সংগে আরেকটা গায়ে গায়ে মিশে ছিল। বাড়িগুলোর চিমনি দিয়ে ধোঁয়া কুণ্ডলি পাঁকিয়ে সন্ধ্যায় গোলাপী আকাশে মিশে যেতো। লম্বা লম্বা গাম ট্রি পুরো শহরটাকে আলিঙ্গনের মতো বেষ্টন করেছিল। তবে শহরের ভেতরে ঢুকলে বোঝা যেত এখানকার বেশিরভাগ মানুষই গরিব। শহরের ভেতরের রাস্তাগুলো ছিল সরু আর কাঁচা। এককেটা প্লটে ঘিঞ্জির মতো ডজন ডজন কুড়ে তুলে থাকতো এখানকার দরিদ্র মানুষ।

মার্টিনডেল ও নিউক্লারিসহ ছোট ছোট আরও কয়েকটা উপশহর নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরে পল্লী নামে যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল সোফিয়া টাউন ছিল তার একটা অন্যতম অংশ। সোফিয়া টাউনটা আসলে সাদাদের বসতির কথা মাথায় রেখে গড়ে উঠেছিল। একজন প্রপার্টি ডেভেলপার শ্বেতাঙ্গ খদ্দেরদের উপযোগী করে এখানে প্রথম কিছু বাড়ি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এ বসতির কাছেই মিউনিসিপ্যালের ময়লা আবর্জনা ফেলা হতো বলে শ্বেতাঙ্গরা জায়গাটা পছন্দ করেনি। তখন বাধ্য হয়ে ডেভেলপারকে আফ্রিকানদের কাছে তার বাড়িগুলো বিক্রি করতে হয়েছে। ট্রান্সভালের যে অল্প সংখ্যক এরিয়ায় আফ্রিকানদের জন্য দোকানপাট বা প্লট কেনার অনুমতি ছিল সোফিয়া টাউন তার একটি। ১৯২৩ সালের নগর আইন অনুযায়ী তাদের এ এলাকায় জমি কেনার অনুমতি দেওয়া হয়। সোফিয়া টাউনে এখনও বহু প্রাচীন ইটের দালান ও পাথুরে দেয়াল বিশিষ্ট টিনের ঘর দেখা যায় যা এখানকার এক সময়ের ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দেয়। জোহান্সবার্গে শিল্পকারখানার প্রসার ঘটা শুরু করলে সোফিয়া টাউনও আফ্রিকান শ্রমশক্তির কেন্দ্রবিন্দু হতে থাকে। জোহান্সবার্গের অনেক কাছে হওয়ায় আফ্রিকান শ্রমিক-কর্মচারিরা এখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে চলে আসে। শ্রমিকরা এখানকার ছোট ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো যাতে জোহান্সবার্গে তাড়াতাড়ি গিয়ে কাজ করে আবার তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরা যায়। এক পর্যায়ে এখানকার জনবসতি এত বেড়ে গিয়েছিল যে এককেটি বাড়িতে কয়েকটি পরিবার এক সংগে বাস করা শুরু করে।

অন্তত ৪০ জনকে একটা পানির ট্যাপ শেয়ার করতে হতো। দারিদ্র্য থাকলেও সোফিয়া টাউনের একটা বিশেষ ভালো দিক ছিল। আফ্রিকানরা এ শহরেই তাদের স্বপ্নের জগৎ যেন খুঁজে পেতো। এ শহর তাদের কারও কাছে ছিল প্যারিসের লেফট ব্যাংক, কারও কাছে নিউ ইয়র্কের গ্রিনিচ ভিলেজ। আফ্রিকার

তৎকালীন বিখ্যাত লেখক, শিল্পী, চিকিৎসক, আইনজীবী– সবার আবাসস্থল ছিল সোফিয়া টাউন। বোহেমিয়ান অথবা আটপৌড়ে গার্হস্থ্য জীবন; উভয় জীবনের স্বাদ পাওয়া যেতো এখানে। এখানে একদিকে যেমন ড. জুমার মতো হৃদয়বান মানুষ থাকতেন অন্যদিকে ভয়ঙ্কর তোতসিরাও (গ্যাংস্টার) বাস করতো এখানে। জন ওয়াইনি অথবা হামফ্রে বোগার্টের মতো আমেরিকান মুভিস্টারদের নামানুসারে নিজেদের নাম রেখে; তাদের মতো হালফ্যাশনের জামা কাপড় পরে এখানকার তরুণরা ঘুরে বেড়াতো। সমগ্র জোহান্সবার্গে আফ্রিকান শিশুদের জন্য একটি মাত্র সুইমিং পুল ছিল এই সোফিয়া টাউনেই।

কিন্তু ন্যাশনালিস্ট সরকার আফ্রিকানদের হৃদয় চুরমার করে দিয়ে পশ্চিম জোহান্সবার্গে উচ্ছেদ অভিযানের পরিকল্পনা করল। এই উচ্ছেদ কার্যক্রমের নাম দেওয়া হল ওয়েস্টার্ন এরিয়াস রিমোভাল স্কীম। এর আওতায় সোফিয়া টাউন, মার্টিনডেল ও নিউক্লারির আফ্রিকান বসতি উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত হলো।

এসব উপশহরের একেকটিতে ৬০ হাজার থেকে এক লাখ আফ্রিকানের বাস ছিল। ১৯৫৩ সালে ন্যাশনালিস্ট সরকার শহর থেকে ১৩ মাইল দূরে মিডোল্যান্ড নামের একটি উপত্যকা ভূমি উচ্ছেদকৃতদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিয়ে অধিগ্রহণ করে। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হয় উপ-শহরগুলি থেকে আফ্রিকানদের সরিয়ে তাদের ৭টি সম্প্রদায়ের মধ্যে মিডোল্যান্ডের ৭টি ভাগ বন্টন করে দেওয়া হবে। উচ্ছেদের অজুহাত হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় এসব উপশহর বস্তি হয়ে গেছে। তা একদিকে যেমন সেখানে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্যহানী করছে অন্যদিকে তা জোহান্সবার্গের পরিবেশ নষ্ট করছে। তাই তারা উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত এসব উপশহরে বসবাসকারীদেরকে শ্বেতাঙ্গ এরিয়ার অস্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে ঘোষণা করে।

উপ-শহরগুলি উচ্ছেদে সরকার যে অজুহাত খাড়া করেছিল তার পুরোটাই ছিল বুজরুকি। আসল ব্যাপার ছিল অন্যখানে। জোহান্সবার্গের পাশে আফ্রিকান উপশহরের মতো শ্বেতাঙ্গদেরও ওয়েস্টডেন এবং নিউল্যান্ডস নামে দুটো উপশহর ছিল। সেখানে অপেক্ষাকৃত গরিব শ্বেতাঙ্গরা বাস করতো। এসব শ্বেতাঙ্গরা অনেকটা শ্রমিক শ্রেণীর ছিল। এরা যখন দেখলো সোফিয়া টাউনে তাদের চেয়ে ভালো ভালো বেশ কয়েকটি বাড়িতে আফ্রিকানরা থাকে; তখন তারা ঈর্ষায় জ্বলে যেতে লাগল।

এরাই সরকারকে ওই জায়গা জব্দ করে তাদের নামে বরাদ্দ দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। আরও একটি কারণে এসব বসতি উচ্ছেদে সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সেটা হল রাজনৈতিক কারণ। সরকার যে কোন মূল্যে আফ্রিকানদের যে কোন আন্দোলন সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। আর সে পথে বাঁধা হয়ে

দাঁড়িয়েছিল জোহান্সবার্গের নিকটবর্তী এই উপশহরগুলো। এখানকার মানুষদের নিজস্ব জমি ছিল। ইচ্ছেমতো এ উপশহরে তারা ঢুকতে-বেরুতে পারতো। ফলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। আফ্রিকানদের জন্য যদিও পাশ সিস্টেম তখনও বলবৎ ছিল কিন্তু যেহেতু সোফিয়া টাউন মিউনিসিপ্যাল লোকেশনের আওতাভুক্ত ছিল সেহেতু এটা ফ্রি হোল্ড আরবান টাউনশীপ হিসেবে গণ্য হতো। সে সুবাদে এখানে যাওয়া আসার জন্য আফ্রিকানদের পাশ লাগতো না।

এই সোফিয়া টাউনে জায়গা জমি কিনে আফ্রিকানরা ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে বসবাস করে আসছিল। সেই বসতভিটে থেকে সরকার গোঁয়ার্তুমি করে তাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে অন্য এক নতুন কৃষ্ণাঙ্গ পল্লীতে পুনর্বাসন করার ফন্দি করছিল। সরকার এত খামখেয়ালিভাবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আফ্রিকানদের পুনর্বাসনের জন্য নতুন পল্লীতে বাড়িঘর না তুলেই তাদের সোফিয়া টাউন থেকে সরানোর উদ্যোগ নিয়েছিল।

প্রতিরোধ আন্দোলনের পর প্রথমবারের মতো এএনসি ও তার মিত্রদের শক্তি পরীক্ষার জন্যই হয়তো সরকার সোফিয়া টাউন উচ্ছেদ প্রকল্প হাতে নিয়েছিল।

সরকার যদিও সোফিয়া টাউন উচ্ছেদের উদ্যোগ নিয়েছিল ১৯৫০ সালে, তথাপি এএনসির প্রবল প্রতিরোধের কারণে ১৯৫৩ সালের আগে তা শুরু করতে পারেনি। ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝিতে এএনসি এবং টিআইসির স্থানীয় শাখার সংগে রেটপেয়ার্স এসোসিয়েশন জোটবদ্ধ হয়ে এ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনগণকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়।

ওই বছরের জুন মাসে এএনসি এবং টিআইসির আঞ্চলিক এক্সিকিউটিভ সোফিয়া টাউনের ওডিন সিনেমা হলে এ বিষয়ে একটি জনসভার আয়োজন করে। জনসভায় লোকজন যাতে হাজির হতে না পারে সেজন্য হলের বাইরে ডজন ডজন পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কিন্তু তাদের রক্ত-চক্ষুকে উপক্ষো করে সেখানে ১২ শ'র বেশি লোক জমায়েত হয়।

ওই মিটিংয়ের মাত্র কয়েক দিন আগে আমার এবং ওয়াল্টারের রাজনীতিতে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হয়েছিল। তারমানে ওই মিটিংয়ে আমাদের হাজির হওয়া, সেখানে বক্তব্য রাখায় আর কোন আইনগত বাধা ছিল না। আয়োজকরা সেখানে দ্রুত আমাকে বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

মিটিং শুরু হওয়ার খানিকক্ষণ আগে সিনেমাহলের বাইরে এক পুলিশ অফিসার আমাকে এবং ওয়াল্টারকে স্থানীয় সরকারবিরোধী নেতা ফাদার হাডেলস্টোনের

সংগে আলাপরত অবস্থায় দেখলেন। অফিসারটি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আপনাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও আপনারা এখানে এসে আইন ভঙ্গ করেছেন। এ কারণে আপনাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে।'

তার নির্দেশ পেয়ে কয়েকজন সেপাই আমাদের অ্যারেস্ট করতে উদ্যত হল। ফাদার হ্যাডেলস্টোন তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমরা এদের বদলে আমাকে ধরে নিয়ে যাও।' পুলিশ অফিসার ফাদারকে সরে যেতে বললেন। কিন্তু ফাদার তাদের সামনে থেকে নড়লেন না। পুলিশগুলো ফাদারকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে উদ্যত হলে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। আমি অফিসারটিকে চিৎকার দিয়ে বললাম, 'আমাকে গ্রেফতারের আগে আপনার নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে আমার নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ আছে কি নেই। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর গ্রেফতার করলে বে আইনি গ্রেফতারের দায়ে আপনার বিরুদ্ধে মামলা হয়ে যেতে পারে। আর আপনার কি মনে হয় নিষেধাজ্ঞা মাথায় নিয়ে এই রাতে এখানে আপনার সংগে আমার বাৎচিত করার শখ হয়েছে?

রেকর্ডপত্র ঠিকঠাকভাবে সংরক্ষণ না করা এবং কোন রাজনীতিকের রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা কতদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে তার হিসাব না রাখার ব্যাপারে বরাবরই পুলিশের কুখ্যাতি ছিল। আমার কথায় অফিসারটি থমকে গেলেন এবং সেপাইদের আমাদের কাছ থেকে সরে আসতে বললেন। আমরা যখন হলের মধ্যে ঢুকছিলাম পুলিশগুলো আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

মিটিং শুরু হওয়ার কিছুমাত্র আগে থেকেই হলের মধ্যে অবস্থানরত পুলিশ বিভিন্ন ধরণের উস্কানিমূলক আচরণ করা শুরু করলো। রাইফেল ও পিস্তল সজ্জিত হয়ে তারা আমাদের কর্মী সমর্থকদের ঘিরে রেখেছিল। তারা লোকজনকে অকারণে ধাক্কা দিচ্ছিল; অপমানজনক মন্তব্য করছিল। পুলিশ যে কোন অজুহাতে মিটিংটাকে ভণ্ডুল করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। অন্যান্য বেশ কয়েকজন নেতার সংগে আমি মঞ্চের ওপর বসে ছিলাম।

মিটিং যখন শুরু হবে; ঠিক সেই মুহূর্তে দেখলাম একদল সশস্ত্র অফিসার নিয়ে মেজর প্রিন্সলু মঞ্চের দিকে আসছেন। আমি তার আক্রমণাত্মক অভিব্যক্তি দেখেই বুঝতে পারলাম আমাদের কাউকে তিনি গ্রেফতার করতে আসছেন। স্টেজের কাছাকাছি আসতেই তার সংগে আমার চোখাচুখি হল। আমি ভুরু কাঁপিয়ে তাকে ইশারা দিলাম। যেন তাকে প্রশ্ন করছি, 'আমি?' মেজর প্রিন্সলু আমার ইঙ্গিত বুঝলেন এবং না সূচক মাথা নাড়লেন।

তিনি তার দলবল নিয়ে সোজা স্টেজের ওপর উঠে এলেন। ডায়াসে দাঁড়িয়ে তখন ইউসুফ কাচালিয়া বক্তৃতা করছিলেন। মেজর অন্য অফিসারদের ইউসুফকে

গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন। তারা ইউসুফকে চোর ধরার মতো অঙ্গভঙ্গি করে ঝাপটে ধরলেন এবং টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেলেন। হলের বাইরে ততক্ষণে রবার্ট রেশা এবং আহমেদ কাদরাদাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

জনতা ইতিমধ্যে খেপে গিয়ে তীব্র চিৎকার শুরু করেছে। পুলিশ ও সরকারকে উদ্দেশ্য করে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেছে। আমি ভাবলাম জনতা যদি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তাহলে ভয়ানক বাজে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আমি বুদ্ধি করে দৌড়ে গিয়ে আমাদের সবার পরিচিত একটা গণসংগীত গাওয়া শুরু করলাম। আমি গাওয়া শুরু করতেই দেখলাম সবাই আমার সংগে সুর মেলালো। আমি ভয় পাচ্ছিলাম পাবলিক যদি পুলিশের ওপর চড়াও হয়ে বসে তাহলে পুলিশ নির্ঘাৎ নির্বিচারে গুলি করে মানুষ মারবে। একারণে আমি অনেক কষ্টে তাদের সে জাতীয় পরিস্থিতিতে জড়ানো থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম।

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনমত বাড়ানোর জন্য ওই সময় এএনসি সোফিয়া টাউনের প্রাণকেন্দ্র ফ্রিডম স্কোয়ারে প্রতি রোববার সন্ধ্যায় মিটিং করতো। ওই মিটিংগুলোতে যথেষ্ট লোকের উপস্থিতি থাকতো। বিক্ষুব্ধ জনতা 'আসি হাম্ব!' (আমরা সরে যাবো না।) বলে সমস্বরে স্লোগান দিতো। এ ছাড়া 'সোফিয়া টাউন লিখাইয়া ল্যাম আসিহাম্বি!' (সোফিয়া টাউন আমার বাড়ি; আমরা সরে যাবো না!)– এক সাথে এই গানটি গাইতো। মিটিংয়ে এএনসির শীর্ষ নেতাদের পাশাপাশি, সেখানকার জমির মালিক, ভাড়াটিয়া, সিটি কাউন্সিলর– সবাই বক্তব্য দিতো। প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই এখানে যাকে সবচেয়ে বেশি তৎপর দেখা যেতো, তিনি হলো ফাদার হাডেলস্টোন। পুলিশ তাকে শুধুমাত্র গীর্জা কার্যক্রম নিয়ে থাকার জন্য বারবার সতর্ক করলেও তিনি তা কানে তুলতেন না।

ওডিন সিনেমা হলের ওই গ্রেফতার ঘটনার মাত্র কিছুদিন পরে এক রোববার সন্ধ্যায় ফ্রিডম স্কোয়ারে আমার বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। সভাস্থলে গিয়ে দেখলাম বহু মানুষ উপস্থিত হয়েছে। বিশেষ করে বহু তরুণ সেখানে এসেছিল যারা সরকারি বাহিনীর ওপর চরমভাবে খেপেছিল এবং সরকার বিরোধী অ্যাকশনে নামার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তাদের চোখমুখ দেখে আমি নিজেও সে সন্ধ্যায় কেমন যেন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লাম।

অন্য সব সময়ের মতো পুলিশ বন্দুক এবং পেন্সিল উভয় অস্ত্র সংগে নিয়ে সেদিনও আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সভায় কারা কারা বক্তব্য রাখছে এবং কে কী বলছে পুলিশগুলো পেন্সিল দিয়ে তা নোট করতো। আমরাও তাদের সামনে এমনভাবে স্লোগান দিতাম, বক্তব্য রাখতাম যাতে তারা ধরে নেয় যে আমরা তাদের থোড়াই কেয়ার করি।

যাই হোক, ওই সন্ধ্যায় আমার মন মেজাজ ভালো ছিল না। প্রতিবাদী বিক্ষোভ শুরুর পর থেকেই সরকার আমাদের ওপর যে ক্রমবর্ধমান উৎপীড়ন শুরু করেছে তার বর্ণনা দিয়ে আমি আমার ভাষণ শুরু করলাম। বললাম, সরকার এখন জনজোয়ারের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তারা এখন আমাদের দমন করতে চাইছে। ওই সময় আমি অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে খ্যাত ছিলাম। জনগণ যাতে মুহূর্তে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে আমি সে ধরণের বক্তব্যই দিতাম। সেদিন সন্ধ্যায়ও একই ভঙ্গিমায় ভাষণ দেওয়া শুরু করলাম।

সরকারের বেআইনি কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করতে করতে আমার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। আমি আবেগেই হোক আর উত্তেজনাতেই হোক ঘোষণা করলাম :

'সংগ্রামী ভাইয়েরা পরোক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনের দিন শেষ হয়েছে। অহিংস বা ননভায়োলেন্স আন্দোলন করার পর এটা এখন আমাদের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে শান্তির বাণী দিয়ে এ সরকারের বোধোদয় ঘটানো যাবে না। সাদারা এদেশে সংখ্যালঘু হয়েও আমাদের ওপর ছড়ি ঘোড়াচ্ছে। আমরা শান্তির কথা বলছি আর তারা একের পর এক আমাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এখন আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে; যেহেতু অহিংস আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে সেহেতু আমাদের সহিংস আন্দোলনের পথে যেতেই হবে। আফ্রিকার এ বর্ণবৈষম্য দূর করার একমাত্র অস্ত্র হলো ভায়োলেন্স। আমাদের এখন সেই অস্ত্র ব্যবহারের সময় এসে গেছে।'

জনতা আমার বক্তব্যে চিৎকার করে হর্ষোধ্বনি করে উঠলো। তরুণরা হাত তালি দিয়ে স্লোগান দিতে লাগলো। তাদের মনোভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম ঠিক ওই মুহূর্তে আমি তাদের যে নির্দেশ দেবো তারা তা পালন করতে জীবন বাজি রাখতেও প্রস্তুত। আমি তখন আমাদের সেই সময়ের একটি জনপ্রিয় গণসংগীত গাওয়া শুরু করলাম। গানের কথাগুলো অনেকটা এরকম, 'সামনে আমাদের অগণিত শত্রু। অস্ত্র ধরো, এসো যুদ্ধে নামি।' বিক্ষুব্ধ জনতা আমার সংগে এ গান গাইতে গাইতে পাশে দাঁড়ানো পুলিশদের ভেংচি দিতে লাগলো। তাদের মারমুখি মনোভাব দেখে পুলিশ নার্ভাস হয়ে গেল এবং তারা সবাই আমার দিকে কটমট করে চেয়ে যেন বলতে লাগলো, 'ম্যান্ডেলা তোকে কিন্তু আমরা পরে দেখে নেবো।' কিন্তু আমি তাদের ওই চোখ রাঙানিকে কোন পাত্তাই দিলাম না। ওই মুহূর্তে বিপ্লবের জোশ আমার ধমনীতে যেন এক বাধভাঙা ঢেউয়ের সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু অতি আবেগি হয়ে আমি সরাসরি সহিংস বিক্ষোভের কথা বললেও 'এখনই আমরা এটা শুরু করতে চাই'– এমন উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি ভবিষ্যতে আমরা এ পথ বেছে নেব– এমনটাই বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু ভরা সমাবেশে আমি এমন ঘোষণা দিয়েই ফেলেছি; সে কারণে সরকার যে কোন সহিংস বিক্ষোভ মোকাবেলা করার জন্য নিরাপত্তা কর্মীদের জরুরীভাবে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়ে দিল। আমার মনে হল যে কোন সময় সরকার জরুরি অবস্থার ঘোষণা দিয়ে সব ধরণের রাজনীতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফেলতে পারে।

আমার আশংকা হলো শিগগিরই সরকার সাংবিধানিক ও অসাংবিধানিক উভয় প্রকার রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করতে পারে। ভারতে মহাত্মা গান্ধী যে অহিংস আন্দোলন করেছিলেন সেটা ছিল বিদেশীদের বিরুদ্ধে। আর আমাদের শত্রুরা বিদেশী নয়। তারা এদেশেরই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানার।

সে পরিস্থিতির সংগে আমাদের আফ্রিকার অবস্থা গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। সেখানে অহিংস নীতি কার্যকর হলেও এখানে তা অসম্ভব। আমার মতে আমাদের অবস্থায় ননভায়োলেন্স একটি নৈতিক আদর্শ হতে পারে তা কিন্তু তা দাবি আদায়ের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল হতে পারে না। আমাদের ওই অবস্থায় নৈতিক বাণী কোন কাজে আসছিল না। কিন্তু পাশাপাশি এটাও স্বীকার্য যে হিংসাত্মক বিক্ষোভ করতে শক্তি ও সামর্থ্য দরকার আমরা তখনও তা অর্জন করে উঠতে পারিনি। আমি বুঝতে পারছিলাম আমি সহিংস বিক্ষোভের যে ঘোষণা দিয়েছিলাম তার সময় তখনও আসেনি।

আমার বক্তব্যের কথা ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ খুবই গুরুত্বের সংগে নিল। নির্বাহী সদস্যরা সবাই আমার খামখেয়ালি ঘোষণায় বিরক্ত হলেন এবং বললেন দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে আমি যে ঘোষণা দিয়েছি তা দলকে ভয়াবহ হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। দু'একজন আমার বক্তব্যের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করলেও সে সমর্থনের কথা তারা আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে পারেননি। শীর্ষ নেতারা বললেন, এর ফলে যে কোন মুহূর্তে দেশজুড়ে দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। সে পরিস্থিতি সামলানোর সামর্থ্য যেহেতু আমাদের এখনও হয়নি সেহেতু আমরা সহিংস বিক্ষোভের ডাক দিতে পারি না। তারা সবাই আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে ওই বক্তব্য প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি তাদের অনুরোধ বিবেচনা করে আমার বক্তব্য প্রত্যাহার করলাম। কিন্তু আমার মন তাতে সাড়া দিল না। আমার মগজ বলছিল অহিংস বিক্ষোভ ছাড়া এখন কোন পথ খোলা নেই; কিন্তু মন বলছিল অহিংস নীতি আফ্রিকানদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।

১৮

জোহান্সবার্গে থাকাকালীন আমি পুরোদস্তুর 'শহুরে ভদ্রলোক' হয়ে উঠেছিলাম। এখানে থাকাকালীন সব সময় স্মার্ট হয়ে স্যুটেড বুটেড অবস্থায় থাকতাম। আমার নিজের একটা কলোসাল ওল্ডসমোবাইল গাড়ি ছিল। নিজেই ড্রাইভ করতাম। শহরের উপকণ্ঠ থেকে রোজ গাড়ি চালিয়ে জোহান্সবার্গের প্রাণ কেন্দ্রের কর্মস্থলে আসতাম। বহিরাঙ্গে শহুরে হাওয়া লাগলেও আমার পুরো মনটা জুড়ে ছিল আমার শৈশবের গ্রাম। আমার সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে ছিল নীল আকাশ, সবুজ মাঠ আর ঘাসের ওপর বাতাসের বিক্ষিপ্ত ওড়াউড়ি। সেপ্টেম্বর মাসে আমার নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হলে আমি আমার অবাধ যাতায়াত সুবিধাকে কাজে লাগাতে চাইলাম। শহরের কাঠখোট্টা জীবন ছেড়ে একটু প্রকৃতির নিকটবর্তী হওয়ার জন্য মনটা কেমন করতে লাগলো। অনেকটা সে কারণেই অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের একটা মামলা হাতে নিলাম।

জোহান্সবার্গ থেকে গাড়ি চালিয়ে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে যেতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। আমি রাত ৩টায় উঠে গাড়ি চালিয়ে অরল্যান্ডো থেকে জোহান্সবার্গের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যেতাম। দূরে কোথাও যাওয়ার জন্য এটাই আমার সবচেয়ে প্রিয় সময় ছিল। অবশ্য এমনিতেই খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা আমার অনেক দিনের পুরনো অভ্যাস ছিল। রাত তিনটায় রওনা হওয়ার আরও কারণ ছিল। প্রথমত ওই সময় পুরো রাস্তা শুনশান জনমানবহীন থাকতো। আরামে গাড়ি চালানো যেত। এ সময়টা নিজেকে আবিস্কার করার এক দারুন মুহূর্ত। রাত আর দিনের সন্ধিক্ষণে প্রকৃতিকে নতুন করে দেখা যায়। আরও একটি কারণ হলো এ সময় রাস্তায় পুলিশের অহেতুক উপদ্রব মোকাবেলা করতে হতো না।

অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট সব সময়ই আমার কাছে এক স্বপ্নময় জাদুবাস্তবতার জগৎ ছিল। যদিও এখানকার শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত এলাকার কিছু বিষয় বর্ণবৈষম্যের কথা মনে করিয়ে দিতো; তারপরও এ অঞ্চলটাকে আমি খুবই ভালোবাসতাম। এখানকার ধুলোময় বিস্তৃত প্রান্তর, মাঝে মাঝে অরণ্য ঘেরা পাহাড়, মাথার ওপরের নীল আকাশ আমাকে যেন আবার শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে যেতো। এখানে এসে মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়ালে আমার মনে হতো পৃথিবীর কারুর পক্ষে আমাকে দমন করে রাখা সম্ভব হবে না। আমি দিগন্ত বিস্তারি এক সত্তা। আমাকে দমন করে রাখার ক্ষমতা কারুর নেই।

অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে আমার বোয়ের উপজাতিয় নেতা জেনারেল খ্রিস্টিয়ান আর. ডে ওয়েটের কথা মনে পড়তো। এখানকার প্রকৃতির মতোই জেনারেল ওয়েট ছিলেন এক দুর্দমনীয় নেতা। অ্যাংলো-বোয়ের যুদ্ধের শেষ দিকে তিনি ব্রিটিশদের এ এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। শুধু আফ্রিকানার নয় সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি

তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ছোটবেলা থেকে তার বহু নায়কোচিত অবদানের কথা শুনে শুনে তাকে আমি মনে মনে রোল মডেল হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম। এখানকার জংলী পথে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় প্রত্যেকটি ঝোপ জঙ্গল দেখে মনে হতো, হয়তো এখানেই জেনারেল ওয়েট তার দলবল নিয়ে শত্রুর প্রতীক্ষায় লুকিয়ে ছিলেন।

অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের ভিল্লিয়ার্স গ্রামে আসার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ভাবলাম যাক, বাঁচা গেল। কিছুদিন শহরের হাউকাউ আর পুলিশের হয়রানি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল। কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি আমি যে পুলিশি ঝামেলা থেকে পরিত্রাণের আশা করছি তারা আমার পিছু লেগেই ছিল। ভিল্লিয়ার্স গ্রামের একটা ছোট আদালতে মামলা চালানোর জন্য ৩ সেপ্টেম্বর হাজির হয়ে দেখি সেখানে কয়েকজন পুলিশ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা কাছে এসে কোন কথা না বলে আমার দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল। দেখলাম সেটা আদালতের একটা নির্দেশনামা। ওই কোর্ট অর্ডারে সাপ্রেশন অব কম্যুনিজম আইনের বিধি অনুযায়ী আমাকে এএনসি থেকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় আমাকে দুই বছরের জন্য যে কোন ধরণের মিটিং মিছিল থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। এ ধরণের একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে তা আমি আগেই আঁচ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু এই প্রত্যন্ত ভিল্লিয়ার্স গ্রামে এসে যে নিষেধাজ্ঞা পত্র পাব তা আশা করতে পারিনি।

অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে আমার হাতে পুলিশ যখন নিষেধাজ্ঞার কোর্ট অর্ডার ধরিয়ে দেয় তখন আমার বয়স ৩৫ বছর। প্রায় এক দশক এএনসির সংগে যুক্ত থাকার পর আমি যখন শীর্ষ নেতৃত্বের দিকে এগুচ্ছি; যখন আমার রাজনৈতিক সচেতনতা পরিণত হচ্ছে; যখন স্বাধীনতার সংগ্রাম আমার সমস্ত সত্ত্বায় মিশে একাকার হয়ে গেছে ঠিক এমন সময়ে আমার ওপর এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল। এর মাধ্যমে আমার সমস্ত প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আইনত দণ্ডনীয় হয়ে গেল। অথচ এই সময়টাতেই আমার জোহান্সবার্গে থাকা ছিল সবচেয়ে জরুরী।

আমার প্রতি আদালতের নিষেধাজ্ঞা আমাকে আন্দোলন সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রান্তে ছুঁড়ে ফেলে দিল। যদিও এএনসির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গোপনে আমার মতামত নেওয়া হতো এবং রাজনীতিতে আমার পরোক্ষ প্রভাব তখনও বর্তমান ছিল তারপরও ওই সময়টাতে আমার নিজেকে খুব অসহায় মনে হতো। নিজেকে তখন একটি দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেমন হার্ট, ফুসফুস অথবা মেরুদণ্ড মনে হতো না। মনে হতো দলের কাছে আমি যেন একটি দেহের ভেঙে যাওয়া কোন অতি অপ্রয়োজনীয় একটা পাঁজরের হাড়।

তখন এমনই এক অবস্থা যে আইন ভঙ্গ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে গ্রেফতার হয়েও আমার বা দলের জন্য কোন লাভ হতো না। আমরা তখনও সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণার শক্তি অর্জন করিনি। আমাদের তখন বড়জোর শাস্তি

পূর্ণ আন্দোলন করার ক্ষমতা ছিল। তখন আমাদের বিশ্বাস ছিল ধরা পড়ে জেল হাজতে যাওয়ার চেয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে সংগঠনকে শক্তিশালী করাই অধিক লাভজনক। এ সমস্ত বিবেচনা করে আমি তখন আইনভঙ্গের দায় মাথায় নিয়ে জেলেও যেতে পারছিলাম না।

আমাকে জোরপূর্বক এএনসি থেকে পদত্যাগ করানোর পর স্বাভাবিকভাবেই দল আমার পদে অন্য কোন নেতাকে বসাবে। এ ক্ষেত্রে আমার কিছুই বলার নেই। যেহেতু আমি জোহান্সবার্গেই ঢুকতে পারছিনা সেহেতু দলীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনেক সময় কিছু জানতেও পারবো না; তা বেশ বুঝতে পারছিলাম।

১৯

আমার ওপর যখন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল; ঠিক তার পরের মাসেই এএনসির ট্রান্সভাল কনফারেন্স হওয়ার কথা ছিল। আমি তখন রীতিমতো প্রেসিডেন্সিয়াল ভাষণের খসড়া তৈরি করে ফেলেছিলাম। কিন্তু তার আগেই আমাকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হল। তারপরও ট্রান্সভাল কনফারেন্সে আমার ভাষণটি পড়ে শোনানো হয়েছিল। সেটি পড়েছিলেন নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য অ্যান্ড্রু কুনেনে। আমার ওই ভাষণটি পরবর্তীতে 'দি নো ইজি ওয়াক টু ফ্রিডম' নামে খ্যাতি পায়। অবশ্য এ শিরোনামটি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর লেখা একটি লাইন থেকে নেওয়া। ওই ভাষণে আমি বলেছিলাম, জনগণকে এখন নতুন প্রক্রিয়ায় আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে। সরকার যেসব নতুন আইন ও বিধি তৈরি করেছে তা জনসভা, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অবস্থান ধর্মঘট ইত্যাদি সাধারণ বিক্ষোভ কৌশলকে ভয়ানক অপরাধের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। এসব পুরনো বিক্ষোভ কৌশল আর কাজে আসছে না। সাপ্রেশন অব কম্যুনিজম অ্যাক্টের আওতায় ফেঁসে যাওয়ার ভয়ে পত্রিকাগুলো আমাদের বিবৃতি ছাপতে রাজি হবে না। কোন প্রিন্টিং প্রেস আমাদের লিফলেট ছেপে দিতে চাইবে না। আমি এসব প্রচলিত বিক্ষোভ কৌশলকে 'আত্মঘাতি' বলে আখ্যায়িত করলাম। আমি বললাম, 'নিস্পেষণকারি ও নিস্পেষিত জনগণ উভয়েই মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই উভয়পক্ষ শিগগিরই চরম সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে। সেই সংঘাত শেষে সত্য ও ন্যায়ই যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যেসব সন্ত্রাসী সরকারী ক্ষমতায় বসে আমাদের উৎপীড়ন করছে তাদের পতন ঘটাতে নিস্পেষিত মানুষ জীবন দিয়ে লড়াই করবে। উৎপীড়ক শ্রেণীকে ক্ষমতার মসনদ থেকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষ তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।'

১৯৫৪ সালে ট্রান্সভালের ল' সোসাইটি নিবন্ধিত অ্যাটর্নিদের তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। তাদের অভিযোগ

নিষিদ্ধ ও সরকার বিরোধী রাজনৈতিক তৎপরতায় আমি জড়িত থাকায় সরকার যেহেতু আমাকে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করেছে সেহেতু আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালনের নৈতিক অধিকার আমার নেই। তারা এমন এক সময় আমার বিরুদ্ধে এ আবেদন করলেন যখন 'ম্যান্ডেলা অ্যান্ড ট্যাম্বো ফার্মটি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হতে যাচ্ছে এবং সপ্তাহে কয়েক ডজনবার আমি মক্কেলদের মামলা নিয়ে আদালতে মুভ করছি।

আমার বিরুদ্ধে আবেদনের কপিটি আমার অফিসে পৌঁছে দেওয়া হল। আমার বিরুদ্ধে ল'সোসাইটির এই আবেদনের কথা ছড়িয়ে পড়ার পর অসংখ্য লোক আমার সমর্থনে চলে আসলেন। এমন কি যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাকে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করা হল সেই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানারদের মধ্যকার কয়েকজন বিখ্যাত আইনজীবীও আমার সমর্থনে এগিয়ে এলেন। এরা সবাই আমার শত্রুপক্ষের অর্থাৎ ক্ষমতাসীন ন্যাশনালিস্ট পার্টির সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা বললেন, অন্যায়ভাবে ম্যান্ডেলাকে আদালত থেকে সরানোর এ চেষ্টা অন্যায় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাদের এই অকুণ্ঠ সমর্থনে এটা বুঝতে পারলাম যে বর্ণবৈষম্যের দেশ এই দক্ষিণ আফ্রিকাতেও পেশাগত সংহতি কখনও কখনও বর্ণবাদকে ছাপিয়ে যেতে পারে। আমার ভেতরে এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে দক্ষিণ আফ্রিকায় এখনও কিছু অ্যাটর্নি ও বিচারক আছেন যারা এই অনৈতিক সরকারের রাবার স্ট্যাম্প নির্দেশ মেনে নেবেন না।

আমার এ মামলা পরিচালনার ভার নিলেন জোহান্সবার্গ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ওয়াল্টার পোলাক। পোলাক আমাকে আরও একজন আইনজীবী নিয়োগ করতে বললেন যে আন্দোলন সংগ্রামের সংগে মোটেও জড়িত নন। এটা করতে পারলে তা ট্রান্সভাল বার এসোসিয়েশনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে। তার পরামর্শ মতে জোহান্সবার্গের সর্ব প্রাচীন একটি ল'ফার্মের প্রধান ও প্রবীণ আইনজীবী উইলিয়াম আরোনসোনকে আমরা নিয়োগ করলাম। এই দুজন প্রখ্যাত আইনজীবীই আমার মামলা পরিচালনা বাবদ পারিশ্রমিক নিতে রাজি হলেন না। আদালতে আমাদের পক্ষ থেকে এই যুক্তি তুলে ধরা হল যে প্রত্যেক নাগরিকের তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দর্শনমতো চলার এবং ওই রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে। একজন আইনজীবী হিসেবে আমারও রাজনীতি করার অধিকার আছে। আর যেখানে আইনের শাসন বর্তমান রয়েছে সেখানে এভাবে একজন আইনজীবীর অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া কোনভাবেই ন্যায় বিচারের উদাহরণ হতে পারে না।

আমাদের পক্ষ থেকে যেসব যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে ওয়াল্টার পোলাকের একটি যুক্তি বিচারকদের সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করেছিল। শুনানির সময় তিনি স্ট্রাইজডোন নামক এক আফ্রিকানার আইনজীবীর উদাহরণ টানলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ন্যাশনালিস্ট নেতা বি. জে ভোরস্টারের (যিনি পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন) সংগে কারারুদ্ধ ছিলেন। নাৎসী পন্থিদের সমর্থন করায় তাদের গ্রেফতার করা হয়। স্ট্রাইজডোন জেল

থেকে পালানোর সময় ধরা পড়েন। তাকে আবার ধরে এনে গাড়ি চুরি করে পালানোর অভিযোগে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় তার আইনজীবী হিসেবে কাজ করার বৈধতাও রহিত করা হয়। কিন্তু মুক্তি পাবার পর তিনি সে বৈধতা ফিরে পাওয়ার আবেদন করেন এবং তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ওয়াল্টার পোলাক সেই স্ট্রাইজডোনের উদাহরণ টেনে বলেন, 'এ ক্ষেত্রে ম্যান্ডেলা ও স্ট্রাইজডোনের মধ্যে পার্থক্য হলো স্ট্রাইজডোনের মতো ম্যান্ডেলা ন্যাশনালিস্ট নয়; শ্বেতাঙ্গও নয়।'

ওই সময় নিরপেক্ষ বিচারপতি হিসেবে যার বিশাল সুখ্যাতি ছিল তিনি হলেন বিচারপতি র‍্যামস্‌বোটম। তিনি ন্যাশনালিস্টদের হুমকি ধামকির পরোয়া করতেন না এবং বিচার বিভাগকে স্বাধীন রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তিনি আমার মামলাটির বিচারক ছিলেন। যুক্তিতর্ক শেষে তিনি ল'সোসাইটির আবেদন সরাসরি খারিজ করে দিলেন এবং আইনজীবী হিসেবে আমার বৈধতা অব্যাহত থাকবে বলে নির্দেশ দিলেন। পাশাপাশি আমার মামলা পরিচালনায় যে খরচপাতি হয়েছে তাও ল'সোসাইটিকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

২০

সোফিয়া টাউনের উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন ছিল এক দীর্ঘমেয়াদী গণযুদ্ধ। উচ্ছেদ ইস্যুতে সরকার যেমন তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিল, তেমনি আমরাও। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সপ্তাহের দুদিন; প্রতি রোববার ও বুধবার সন্ধ্যায় এর বিরুদ্ধে আমরা বিক্ষোভ র‍্যালী করতাম। সরকারের এ অমানবিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেখানে বক্তার পর বক্তা ভাষণ দিতেন। ড. জুমার নির্দেশ মতো এএনসি এবং রেটপেয়ার্স এসোসিয়েশন সরকারের কাছে নিয়মিত আবেদন করে ও চিঠি দিয়ে এর বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতো। উচ্ছেদ বিরোধী মিছিলে আমরা 'আমাদের লাশের ওপর দিয়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে' বলে স্লোগান দিতাম। মঞ্চ থেকে এক জন স্লোগান দিতো আর উপস্থিত বিক্ষোভ কারীরা তা প্রতিধ্বনিত করতো। এই স্লোগানটিই এতদিন ব্যবহৃত হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সন্ধ্যায় ড. জুমা সবাইকে বিদ্যুৎ স্পৃশ্য করার মতো চমকে দিয়ে একটা নতুন স্লোগান উচ্চারণ করলেন। বিগত শতাব্দীতে আমাদের পূর্বপুরুষরা এ স্লোগানটি ব্যাবহার করতেন। সেই বিখ্যাত স্লোগানটি হলো, 'জেম্‌ক ইনকোমো মাগবালানদিনি!' (শত্রুরা সব গরু ছাগল নিয়ে যাচ্ছে আর এখন তোমরা কাপুরুষের মতো হাতগুটিয়ে বসে আছো?')

শেষ পর্যন্ত সরকার ১৯৫৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সোফিয়া টাউন থেকে আফ্রিকানদের উচ্ছেদ করা হবে বলে ঘোষণা করলো। উচ্ছেদের নির্ধারিত দিন যতো ঘনিয়ে আসতে লাগলো আমি আর অলিভার ট্যাম্বো সেখানে গিয়ে স্থানীয়

নেতাদের সংগে মিটিং করা বাড়িয়ে দিলাম। আমরা প্রতিদিনই সেখানে গিয়ে তাদের সংগে বৈঠক করে একটা সমাধানসূত্র বের করার চেষ্টা করছিলাম। আমি আর অলিভার চাচ্ছিলাম এ বিষয়ে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করব। উচ্ছেদ করতে হলে সরকারকে যেসব বৈধ পূর্বশর্ত পালন করতে হবে তা সরকার করেনি– এটাই আমরা আদালতের সামনে প্রমাণ করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু এটা ছিল একটা অস্থায়ী সমাধান। অর্থাৎ আমরা নির্ধারিত সময়ে সরকারের উচ্ছেদ কাজকে বন্ধ করতে চাইছিলাম। তবে এটাও আমরা জানতাম যে সরকার তার পথে কোন আইনী প্রতিবন্ধকতা রাখতে চাইবে না।

উচ্ছেদ অভিযানের কয়েকদিন আগে ফ্রিডম স্কোয়ারে একটি বিশেষ বিক্ষোভ জনসমাবেশের আয়োজন করা হল। সর্দার লুথুলির ভাষণ শোনার জন্য অন্তত দশ হাজার লোক ওই জনসভায় হাজির হল। কিন্তু জোহান্সবার্গ আসার পথেই সরকার তাকে এক নিষেধাজ্ঞা পত্র ধরিয়ে দিল। তাকে নিরাপত্তা কর্মীরা জোর করে নাটালে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

উচ্ছেদ অভিযানের আগের রাতে স্থানীয় এএনসি নেতাদের মধ্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা জো মোডাইজ পাঁচ শতাধিক তরুণ প্রতিবাদীর মধ্যে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। ওই সব টগবগে সূর্যতরুণ পুলিশ ও আর্মির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এএনসির নির্দেশ চাচ্ছিল। তারা সারারাত ধরে ব্যারিকেড ভেঙে ফেলার এবং অস্ত্রধারী পুলিশের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিকল্পনা করছিল। আমরা স্লোগানে যেভাবে বলেছি যে আমাদের লাশের ওপর দিয়ে উচ্ছেদ করতে হবে; এরা সেই স্লোগানকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেছিল। তারা রাতেই জো'র নেতৃত্বে আমিসহ এএনসির অন্যান্য নেতার সংগে বৈঠক করতে হাজির হলো।

আমাদের সংগে দীর্ঘ বৈঠকের পর জো তাদের ঠাণ্ডা হতে বললেন। কিন্তু মাথা গরম থাকা তরুণরা একথা শুনেই আমাদের সবাইকে বিশ্বাসঘাতক ও ভীরু কাপুরুষ বলে গালি দিতে শুরু করলো। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছিলাম সহিংস প্রতিরোধে নামলেই ব্যাপক আকারে হত্যাযজ্ঞ শুরু করবে সরকার। সরকারের সেই অ্যাকশন ঠেকানোর মতো সামর্থ্য আমাদের হাতে নেই। এ অবস্থায় সহিংস প্রতিরোধ মানেই আত্মহত্যার শামিল। এসব বিবেচনা করে সবাইকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিলাম।

৯ ফেব্রুয়ারি ভোরে চার হাজার সশস্ত্র পুলিশ ও আর্মি পুরো সোফিয়া টাউন ঘিরে ফেললো। তারা ঘর থেকে এক এক করে সবাইকে সরকারি ট্রাকে উঠানো শুরু করলো। তাদের সবাইকে সেখান থেকে মিডোল্যান্ডে বানানো পুনর্বাসনকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হল। আর্মি ও পুলিশ এত বিধ্বংসী ভাবমূর্তি নিয়ে উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছিল যে তার সামনে দাঁড়ানোর শক্তি আমাদের ছিল না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম স্তিমিত হয়ে গেল। আমাদের বেশিরভাগ নেতাকে অ্যারেস্ট করা হল। যারা বাইরে ছিলেন তাদের রাজনীতিতে

সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করল সরকার। এভাবেই বন্দুকের গর্জনের শব্দে নয় সরকারি ট্রাক আর স্লেজহ্যামারের শব্দের মধ্য দিয়ে সোফিয়া টাউনের মৃত্যু হল।

যে লোকটা রাজনীতির বাইরে থেকে প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ে রাজনীতির খোঁজ খবর রাখে তার পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত ঠিক আর কোনটা ভুল তা নির্ধারণ করা সহজ। কিন্তু যে লোকটাকে উত্তপ্ত রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে যুদ্ধ করতে হচ্ছে তার হাতে ঘটনা বিশ্লেষণের এত সময় থাকে না। এ কারণে অনেক সময়ই সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

আমাদের বেলাতেও ঠিক এমনটি ঘটেছিল। পশ্চিম এরিয়ার উচ্ছেদ বিরোধী প্রচারণায় আমরা অনেকগুলো ভুল করেছিলাম যা থেকে আমরা অনেকগুলো মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছিলাম। 'লাশের ওপর দিয়ে উচ্ছেদ করতে হবে!'–এটা নিঃসন্দেহে একটা জ্বালাময়ী স্লোগান। কিন্তু এই স্লোগান দিনের পর দিন আওড়ানোর পর আমরা যখন সহিংস প্রতিরোধ থেকে সরে এসেছি তখনই আমাদের সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কোন সংগঠন যখন জনগণকে কোন ইস্যুতে একত্রিত করতে চাইবে তখন তার জন্য একটি ভালো স্লোগান খুবই জরুরি। কিন্তু সেই স্লোগান নির্ধারণের আগে আক্ষরিক অর্থে তা বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব কিনা তা বিবেচনায় রাখতে হবে। 'লাশের ওপর দিয়ে উচ্ছেদ করতে হবে'লে আমরা যে স্লোগান দিয়েছিলাম তা জনগণের আবেগকে আকর্ষণ করেছিল। তারা এ স্লোগান শুনে ধরে নিয়েছিল এএনসি উচ্ছেদ অভিযানকে জীবন দিয়ে হলেও প্রতিরোধ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এএনসি সে অবস্থায় ছিল না। ফলে তারা আমাদের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল।

সোফিয়া টাউন থেকে উচ্ছেদ করে সরকার মিডোল্যান্ডের পুনর্বাসন প্রকল্পে যাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল আমরা এএনসির পক্ষ থেকে তাদের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি।

জনতা যখন বুঝতে পেরেছে আমরা সরকারের উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করতে অথবা তাদের জন্য বিকল্প আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারবো না তখন তাদের মনোবল ভেঙে যায় এবং মিডোল্যান্ডে বন্যার পানির মতো তারা এসে মাথা গোঁজার ঠাই খুঁজে নেয়।

সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ও অহিংস আন্দোলন শেষে আমি যে শিক্ষাটি পেয়েছিলাম সেটি হল আমাদের সামনে এখন আর সহিংস ও সশস্ত্র আন্দোলন ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। আমরা একের পর এক সহিংসতাবর্জিত আন্দোলন করেছি। ভাষণ, বক্তৃতা, বিবৃতি, মিছিল সমাবেশ, গৃহ অবস্থান, কর্মবিরতি, স্বেচ্ছায় কারাবরণ;– এমন কোন সহিংসতাবিহীন কৌশল নেই যা আমরা অবলম্বন করিনি। কিন্তু প্রতিবারই আমাদের স্বপ্নময় আন্দোলন বুটে ও

বুলেটে, আপোষে ও ষড়যন্ত্রে বিফল হয়ে গেছে। একজন স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা এক সময় ঠিকই বুঝতে পারে আলোচনা-বৈঠক যেখানে অকার্যকর সেখানে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়। এমন একটা সময় চলে আসে যখন আগুনের বিরুদ্ধে আগুন নিয়েই লড়তে হয়।

ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হল শিক্ষা। শিক্ষা এমন এক শক্তি যার মাধ্যমে গোমূর্খ চাষার মেয়ে একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার হতে পারে। এ এমন এক শক্তি যার মাধ্যমে একজন খনি শ্রমিকের ছেলে খনি প্রধান অথবা একজন ফার্মওয়ার্কারের ছেলে বিশাল দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার ক্ষমতা রাখে। শিক্ষা এমন এক শক্তি যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের আবিস্কার করতে পারি। কারা কোন উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে দিতে চায় তা সহজেই ধরে ফেলতে পারি।

বিংশ শতকের শুরুতেই বিদেশী চার্চ ও মিশনারীতে আফ্রিকান শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতো। বিনা বেতনে তারা তাদের শিক্ষা দিতেন। ইউনাইটেড পার্টি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন আফ্রিকান মাধ্যমিক স্কুল ও শ্বেতাঙ্গ মাধ্যমিক স্কুলের সিলেবাস অভিন্ন ছিল। তখন মিশন স্কুলগুলো আফ্রিকান শিক্ষার্থীদের পশ্চিমা ঘরানার ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা দিতো। এই মিশন স্কুলে আমিও পড়াশুনা করেছি। অর্থাভাবে আমাদের অনেক কিছু না থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের মেধা, চিন্তাভাবনা অথবা স্বপ্নের ঘাটতি ছিল না।

ন্যাশনালিস্টরা ক্ষমতায় আসার আগে পূর্ববর্তী ইউনাইটেড পার্টির সরকারও যে বর্ণবৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা জারি করেছিল তা তখনকার শিক্ষা বরাদ্দ দেখলেই বোঝা যায়। সে সময় একজন আফ্রিকান ছাত্রের শিক্ষাব্যয় হিসেবে সরকার যে বরাদ্দ করেছিল তার বিপরীতে একজন শ্বেতাঙ্গ শিক্ষার্থীর বরাদ্দ ধরা হয়েছিল তার ৬ গুণ বেশি। আফ্রিকানদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না এবং কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরে তাদের জন্য বিনা খরচে পড়াশুনার সুযোগ ছিল। মোট আফ্রিকান শিশুদের অর্ধেকের সামান্য কিছু বেশি শিশু স্কুলে ভর্তি হত। আর যেসব আফ্রিকান শিশু মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারতো তাদের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য।

আফ্রিকানদের এই করুণ শিক্ষা ব্যবস্থাকেও মেনে নিতে পারেনি উগ্রবর্ণবাদী ন্যাশনালিস্ট সরকার। তারা এমন একটি ব্যবস্থা চালু করতে চাইল যার মাধ্যমে আফ্রিকানদের পুরোপুরি অশিক্ষিত করে রাখা যায়। এই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানাররা আফ্রিকানদের জন্মগতভাবে তাদের দাস মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল আফ্রিকানরা একটি অসভ্য জংলী জাতি। এদের শিক্ষিত করার চেষ্টা আর অহেতুক পণ্ডশ্রম একই কথা। আফ্রিকানদের ইংরেজী ভাষা শিক্ষার চেষ্টাকেও তারা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো। ইংরেজী তাদের কাছেও বিদেশী ভাষা ছিল। ইংরেজী শিখলে আফ্রিকানরা অনেকদূর এগিয়ে যাবে এমন ধারণা থেকে তারা তাদের যে কোন মূল্যে ইংরেজী শিক্ষা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করত।

আফ্রিকানদের শিক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ১৯৫৩ সালে ন্যাশনালিস্ট প্রধান পার্লামেন্টে বান্টু এডুকেশন অ্যাক্ট নামে একটি কালো আইন পাশ হয়। এই আইনের মাধ্যমে আফ্রিকান শিক্ষাক্রমেও বর্ণবাদের সিলমোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়। এ আইনের মাধ্যমে আফ্রিকানদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতা থেকে ন্যাটিভ অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টে স্থানান্তর করা হয়।

এই ডিপার্টমেন্ট সরকারের সবচেয়ে অবহেলিত মন্ত্রণালয় বলে স্বীকৃত ছিল। বান্টু এডুকেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী সরকার চার্চ ও মিশন বডির দ্বারা পরিচালিত আফ্রিকান প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসতে চাইল। সরকারের পক্ষ থেকে চার্চ ও মিশনকে জানানো হলো, তারা যদি স্কুলগুলোকে সরকারের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে না দেয় তাহলে আফ্রিকানদের পড়াশুনার জন্য সরকার যে ভর্তুকি দিচ্ছিল তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন দাঁড়ালো যে সরকারের অনুন্নত ও বাজে ধরণের স্কুলে পড়তে না চাইলে আফ্রিকানদের পড়াশুনাই করার কোন সুযোগ থাকবে না। সরকার মিশন স্কুলগুলো বন্ধ করতে চাইছিল যাতে আফ্রিকানরা ভালোমানের শিক্ষা না পায়। তাছাড়া মিশনস্কুলে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হতো। আফ্রিকানরা ইংরেজী শিখুক ন্যাশনালিস্ট সরকার সেটা চাইতো না। সরকার অথবা কোন স্কুল কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করার অধিকার আফ্রিকান শিক্ষকদের ছিল না। সব মিলিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে আফ্রিকানদের ছোট করে রাখার প্রবণতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল।

বান্টু এডুকেশনের মন্ত্রী ড. হেনড্রিক ভারওয়ার্ড শিক্ষা বিষয়ক এই কালা কানুন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'কে কতটা জীবনমান সুবিধা পাচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে তাকে সে অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া উচিত।' তার বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ালো এই যে, 'আফ্রিকানরা যেহেতু জীবনমান সুবিধার বাইরে সেহেতু তাদের পড়ালেখা শেখার দরকারটা কী?' তিনি রাখঢাক না করেই বললেন, নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণীর লোক ছাড়া সাধারণ আফ্রিকানদের ছেলে মেয়ের লেখাপড়া শেখার দরকার নেই। তার বদলে তাদের খনি শ্রমিক হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়াই ভালো। অর্থাৎ আফ্রিকানরা যাতে যুগ যুগ ধরে তাদের দাসানুদাস হয়ে থাকে তারা সেই ব্যবস্থা করতে চাইলেন।

এএনসি এ অন্যায় উদ্যোগকে আফ্রিকানদের প্রতি চরম অবিচার এবং আফ্রিকান সংস্কৃতির ওপর ভয়াবহ হুমকি হিসেবে বিবেচনা করল। একই সংগে একে আফ্রিকানদের আন্দোলন সংগ্রামের সামনে এক বিশাল বাধা হিসেবে ধরে নিল। আফ্রিকার ভবিষ্যত প্রজন্মকে পঙ্গু করে দেওয়ার এক গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে এ বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হল।

সাদা ও কালো উভয় শ্রেণীর লোকই এই কালো আইনের কঠোর সমালোচনা করেছিল। ডাচ রিফর্মড চার্চ (এই চার্চটি বর্ণবাদ সমর্থক ছিল) ও লুথেরান মিশন ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত খ্রিস্টিয়ান মিশন এই নতুন শিক্ষানীতির বিরোধীতা করেছিল। তবে এ কালো নীতির বিরুদ্ধে যেসব প্রতিষ্ঠান তাদের মত প্রকাশ করেছিল তারা তাদের বিরোধীতাকে সরকারের সমালোচনা পর্যায়েই রেখেছিল। এ শিক্ষানীতির বিরোধীতা করে তারা সম্মিলিত কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভিক সমালোচক ছিল অ্যাংলিকানরা। কিন্তু তারাও সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধীতা প্রশ্নে ভাগ হয়ে গেল। জোহান্সবার্গের বিশপ অ্যামব্রোজ রীভস্ তার আওতাধীন স্কুলগুলো বন্ধ করে দেওয়ার চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিলেন। তার স্কুলগুলোতে সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী ছিল। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চ বিশপ স্কুলগুলোকে সরকারের হাতে তুলে দিয়ে এতগুলো শিশুর ভবিষ্যতকে ধুলোয় ছুঁড়ে দিতে চাইলেন না। সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করলেও শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাকে তা মেনে নিতে হল। শুধুমাত্র রোমান ক্যাথলিকস্, সেভেন্থ্ ডে অ্যাডভেন্টিস্টস্ এবং ইউনাইটেড জুইশ রিফর্মড্ কংগ্রেশন ছাড়া বাকি সব মিশন স্কুল বন্ধ করা হল। আমি যে চার্চে পড়েছি, সেই ওয়েসলেইয়ান চার্চও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা অন্য চার্চে পাঠরত দুই লাখ শিশুকে সরকারের হাতে তুলে দিল। রোমান ক্যাথলিকস্, সেভেন্থ্ ডে অ্যাডভেন্টিস্টস্ এবং ইউনাইটেড জুইশ রিফর্মড্ কংগ্রেশন সরকারকে জানিয়ে দিল যে তারা সরকারের সাহায্য ছাড়াই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে পারবে। এদের মতো যদি অন্য সব মিশন ও চার্চ এ শিক্ষানীতির বিরোধীতা করে স্কুল বন্ধ না করত তাহলে সরকার হয়তো আপোষ করতে বাধ্য হতো। কিন্তু অধিকাংশ চার্চ ও মিশন সরকারের আনুগত্য মেনে নেওয়ায় সরকার নির্বিঘ্নে আমাদের ওপর দিয়ে স্টিম রোলার চালিয়ে যেতে পারল।

সরকার ঘোষণা দিয়েছিল আফ্রিকান শিক্ষা বোর্ডকে ১৯৫৫ সালের ১ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ন্যাটিভ অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টে স্থানান্তর করা হবে। এর প্রতিবাদে এএনসির পক্ষ থেকে ওই দিন থেকেই স্কুল বয়কট করা যায় কিনা তা নিয়ে কয়েকদিন আগেই বৈঠকে বসলাম।

এএনসি এক্সিকিউটিভের গোপন বৈঠকে এ নিয়ে তুমুল মতবিরোধ দেখা দিল। এক পক্ষ বললো একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমরা লোকদের নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করতে পারি। অন্য পক্ষ তার ঘোর বিরোধীতা করে স্থায়ীভাবে স্কুল বয়কটের ডাক দেওয়ার দাবি জানালো। তারা বললো স্থায়ীভাবে স্কুল বয়কট করলে বান্টু এডুকেশন অ্যাক্টকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা সম্ভব হবে। নয়তো এ বিষবৃক্ষকে কিছুতেই পরে উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে না। বৈঠক দুই পক্ষের

চিৎকার চেঁচামেচিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। উভয় পক্ষই তাদের মতের পক্ষে মোক্ষম সব যুক্তি উপস্থাপন করছিল। যারা স্থায়ী বয়কটের পক্ষে ছিলেন তাদের যুক্তি হল, পানির তৃষ্ণায় যদি কেউ মরণাপন্ন হয়; তাকে যদি পানির বদলে বিষ দেয়া হয়, সেও পানির বিকল্প হিসেবে তা খায় না। বিষ খেয়ে মরার চেয়ে তৃষ্ণায় বুক ফেটে মরাকেই সে শ্রেয় মনে করে। ঠিক একইভাবে বয়কটপন্থিরা যুক্তি দিয়ে বললেন, বান্টু এডুকেশন হচ্ছে নির্জলা বিষ। যে কোন প্রক্রিয়াতেই হোক এ বিষ একবার দেহে ঢুকলে তা দেহকে ধ্বংস করে ফেলবে। তারা বললেন, পুরো জাতি ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে। তারা এখন ভদ্রগোছের পুতুপুতু সমালোচনা আর বিক্ষোভে আস্থা পাচ্ছে না। তারা এখন সহিংস ও সশস্ত্র প্রতিবাদে নামার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

দলের মধ্যে যদিও অনলবর্ষী বক্তা ও অত্যন্ত দাপুটে নেতা হিসেবে আমার খ্যাতি ছিল; তথাপি আমি এ বিষয়টাতে পুরোপুরি সজাগ ছিলাম যে সামর্থ্যের বাইরে জনগণকে আশ্বাস দেওয়া আমাদের কোন রকম ঠিক হবে না। যা করা আদৌ আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না তা করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিলে জনগণ আমাদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে। বৈঠকে আমি বললাম আমাদের তৎপরতা নৈতিক বা আবেগজনিত ভিত্তিতে পরিচালিত হলে চলবে না। বাস্তব অবস্থা বুঝে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। অনির্দিষ্টকালীন বয়কটের ডাক দেওয়ার জন্য আমাদের যে বিপুল আয়োজন ও সামর্থ্য থাকার দরকার তা আমাদের হাতে নেই। সোফিয়া টাউন উচ্ছেদের সময় আমরা হাড়ে হাড়ে তা বুঝতে পেরেছি। অনির্দিষ্টকাল স্কুল বয়কটের ডাক দিলে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা বন্ধ হবে। এসব লাখ লাখ শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার জন্য অসংখ্য স্কুল ও অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তাদের বইপত্রের যোগান দেওয়া দরকার। এর জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন তা আমাদের হাতে নেই। আমরা যদি তাদের বিকল্প কোন অবলম্বন না দিতে পারি তাহলে তারা আমাদের এ ঘোষণাকে মোটেও ভালো চোখে দেখবে না। এসব বিবেচনা করে আমি অনির্দিষ্টকাল নয় লাগাতার এক সপ্তাহের বয়কট পালনের পক্ষে মত দিলাম।

শেষ পর্যন্ত এক সপ্তাহের স্কুল বয়কটের সিদ্ধান্তই ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভে অনুমোদিত হল। ঠিক হল ১ এপ্রিল থেকে এ বয়কট শুরু হবে। তবে এটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। ১৯৫৪ সালে ডারবানে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে সেখানে অনেক প্রতিনিধি এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তারা সেখানে অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটের সুপারিশ করে বসলেন এবং সে সুপারিশের ওপর ভোটাভুটি হল এবং ভোটে তারা জয়যুক্ত হলেন। জাতীয় সম্মেলন ছিল এএনসির সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। এক্সিকিউটিভ কমিটিতে যদি কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্তও হয়ে থাকে ন্যাশনাল কনফারেন্স বা জাতীয়

সম্মেলনের কাউন্সিল তা বাতিল করে দিতে পারে। সেভাবেই আমাদের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গেল এবং অনির্দিষ্টকাল বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শিক্ষামন্ত্রী ড. ভারওয়ার্ড ঘোষণা করলেন যে সব স্কুল অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘটের সমর্থন করেছে সেগুলোকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং যেসব শিক্ষার্থী বয়কটকে সমর্থন করে বাড়িতে অবস্থান করবে তাদের আর পুনরায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকবে না।

এই বয়কটকে কার্যকর করতে অভিভাবক ও গোত্র নেতাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি হয়ে পড়লো। স্কুলের অভাব পূরণ করাই আমাদের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল। আমি অভিভাবক ও এএনসি সদস্যদের প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি সংগঠন, ও প্রতিটি কম্যুনিটিকে শিশুদের শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাগাদা দিতে লাগলাম।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১ এপ্রিল থেকেই বয়কট শুরু হল। এতে মিশ্র ফলাফল দেখা গেল। পুরো কার্যক্রম তখন অসংগঠিত ও অকার্যকর অবস্থায় চলছিল। পূর্ব র‍্যান্ড এলাকায় এর ফলে প্রায় ৭ হাজার স্কুল শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বয়কটের উদ্বোধনী দিনে ভোররাতেই আমরা র‍্যালি করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। সেখানেই আমরা অভিভাবকদেরকে তাদের ছেলে মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে না দেওয়ার আহ্বান জানালাম। আমাদের সংগে মহিলারাও বিভিন্ন স্কুলে পিকেটিং করার জন্য যোগ দিলেন। তাদের সংগে ছেলে-মেয়েরা আসতে চাইলেও তারা তাদের বাড়ির বাইরে আনলেন না।

জোহান্সবার্গ থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত জার্মিস্টোন টাউনশিপে সেখানকার স্থানীয় এএনসি চেয়ারম্যান জোসুয়া মাকউই আফ্রিকান শিশুদের লেখাপড়ার জন্য একটি স্কুল খোলেন। সেখানে প্রায় ৮শ ছাত্রছাত্রী ছিল। তবে স্কুলটি ৩ বছরের বেশি চালানো সম্ভব হয়নি। পোর্ট এলিজাবেথে সরকারি স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে ব্যারেট তাইয়েসি বয়কট করা শিশুদের জন্য একটি স্কুল চালু করেন। ১৯৫৬ সালে স্ট্যান্ডার্ড সিক্সের পরীক্ষায় তার স্কুলে ৭০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। কিন্তু এদের মধ্য থেকে মাত্র ৩জন পাশ করেছিল।

বহু জায়গায় ইম্প্রোভাইজ্ড স্কুলগুলোও (এগুলোকে তখনকার দিনে বলা হত 'কালচারাল ক্লাব') বয়কট করা শিক্ষার্থীদের পড়াতো। এসব প্রতিষ্ঠানের কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল না। এদের শিক্ষা তৎপরতা বন্ধের জন্য আরেকটি আইন পাশ করল। এ আইন অনুযায়ী সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নয় এমন কোন প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দিলে তাদের জেল জরিমানা করা হবে বলেও ঘোষণা করা হল। এ আইনের পরই ক্লাবগুলোর ওপর পুলিশি হয়রানি শুরু হয়। তবে এরপরও

ক্লাবগুলো ছাত্র পড়ানো অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু শেষ মেষ দেখা গেল এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কোন কাজে আসছে না। তখন অভিবাবকদের বাধ্য হয়েই 'হয় নিম্নমানের শিক্ষা গ্রহণ নয়তো অশিক্ষিত থাকা'– এ দুটোর একটাকেই বেছে নিতে হল। তারা অবশ্য প্রথমোক্ত বিষয়টিকেই বেছে নিয়েছিল। আমার ছেলে মেয়েরা সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট স্কুলে পড়তো। মিশনারীদের পরিচালিত এ স্কুল সরকারি অনুদানের তোয়াক্কা করতো না।

আমাদের এ স্কুল বয়কট আন্দোলনকে দু'দিক থেকে বিচার করা যায়। একদিক থেকে এ আন্দোলন সফল, অন্য দিকে তা ব্যর্থ হয়েছিল। প্রথম বিচারে এ ক্যাম্পেইন স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছিল। আমরা একদিকে যেমন সমগ্র আফ্রিকার সব স্কুলকে বয়কট আন্দোলনে রাজি করাতে পারিনি তেমনি বান্টু এডুকেশনের হাত থেকেও সহসা মুক্তি পাইনি। তবে অন্য বিচারে এ ক্ষেত্রে সফলতাও অর্জিত হয়েছে। এই বয়কটের কারণে সরকার তার আইন সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। শিক্ষামন্ত্রী এক পর্যায়ে এসে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের শিক্ষাক্রম অভিন্ন হবে। ১৯৫৪ সালে অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী একই ধরণের সিলেবাস দেওয়া হল। বান্টু এডুকেশন আইন চালু করে সরকার যে কত বড় ভুল করেছিল তা বোঝা গেছে অনেক পরে। এই শিক্ষানীতির কারণে যেসব আফ্রিকান শিক্ষার্থীরা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল তারাই একটু বড় হয়ে অর্থাৎ ১৯৭০'র দশকে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল।

চিফ লুথুলি এএনসি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার কয়েক মাস বাদে প্রফেসর জে. কে. ম্যাথিউস আমেরিকা থেকে দেশে ফেরেন। গত এক বছর ধরে তিনি আমেরিকায় ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করার পর দেশে ফিরলেন। দেশে ফিরে প্রফেসর ম্যাথিউস স্বাধীনতা সংগ্রামকে নতুনভাবে সাজানোর আইডিয়া দিলেন। কেপে অনুষ্ঠিত একটি বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় তিনি বললেন, "আমি এই ভেবে বিস্মিত হচ্ছি যে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এখনও এমন একটি কনভেনশন করতে পারেনি যেখানে সব শ্রেণীর মানুষ অংশ গ্রহণ করতে পারে। আমি বিস্মিত হচ্ছি এ জন্য যে এএনসি এখন পর্যন্ত ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য একটি ফ্রিডম চার্টার বা স্বাধীনতা সনদ তৈরি করতে পারেনি।'

তার ওই বক্তব্যের কয়েক মাসের মধ্যেই কংগ্রেসে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। ওই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন দলের প্রেসিডেন্ট চিফ লুথুলি। ওয়াল্টার সিসুলু এবং ইউসুফ কাচালিয়া ওই কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি নিয়োজিত হন। জনগণের এই কংগ্রেস এবার নতুন এক

দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য একগুচ্ছ মূলনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিল। এএনসির নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য সমস্ত আফ্রিকানের মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত হল। এএনসি এমন একটি সংবিধান রচনার সিদ্ধান্ত নিল যা সম্পূর্ণ জনমতের ওপর ভিত্তি করে জন্মলাভ করবে।

আমরা এমন একটি কংগ্রেসের স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম যা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আমরা সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবর্তনকামী সব শ্রেণীর নিষ্পেষিত মানুষকে এক কাতারে আনতে চাইলাম। একটি কনভেনশনের মাধ্যমে আমরা সমগ্র জাতিকে সংহত করার স্বপ্ন দেখলাম।

স্বপ্ন পূরণ করতে আমরা শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, ভারতীয় এবং নিগ্রোদের প্রায় ২শ' সংগঠনকে তাদের প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। ১৯৫৪ সালের মার্চে ডারবানের কাছে অবস্থিত টোঙ্গাটে আমরা যে প্ল্যানিং কনফারেন্সের আয়োজন করেছিলাম সেখানেই তাদের প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য দাওয়াত দিলাম। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, ভারতীয় ও নিগ্রো– এই চার সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের মধ্যে ২ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি ৮ সদস্যবিশিষ্ট দি ন্যাশনাল অ্যাকশন কমিটি গঠন করা হল। কমিটির চেয়ারম্যান করা হল চিফ লুথুলিকে। ওয়াল্টার সিসুলু (অবশ্য পরে তাকে সরকার রাজনীতিতে সাময়িক নিষিদ্ধ করায় তার স্থলে অলিভার ট্যাম্বোকে বসানো হয়), এসএআইসির ইউসুফ কাচালিয়া, নিগ্রোদের সংগঠন এসএসিপিও'র স্ট্যানলি লোল্লান এবং শ্বেতাঙ্গদের সংগঠন কংগ্রেস অব ডেমোক্র্যাটস'র লিওনেল বার্ণস্টেইনকে নিয়ে সেক্রেটারিয়েট গঠন করা হল।

নবগঠিত এই ন্যাশনাল অ্যাকশন কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠন এবং তাদের সমর্থকদের সবাইকে একটি স্বাধীনতা সনদ প্রণয়নে স্ব স্ব পরামর্শ পাঠানোর আমন্ত্রণ জানায়। তাদের সবার পরামর্শ আহ্বান করে আমরা সমগ্র গ্রাম ও শহুরে পল্লীতে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেই। বিজ্ঞপ্তির ভাষা ছিল অনেকটা এরকম 'আপনি নিজে যদি দেশের জন্য একটি আইন বানাতেন, তাহলে কেমন হতো সেটা? দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী সমস্ত মানুষের সুখ শান্তির জন্য কী ধরণের আইন থাকা বলে আপনি মনে করছেন? আপনার আইডিয়া আমাদের জানান।'

কোন কোন লিফলেটে আমরা কিছুটা কাব্যিক ভাষায় আমাদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছিলাম। যেমন :

"আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার কালো-ধলো সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আসুন সবাই এক টেবিলে বসে স্বাধীনতার কথা বলি। আসুন আমরা সবাইকে মুক্তির গান শুনতে দেই। আসুন সবার অভাব অভিযোগের কথা শুনি। আসুন মহান এই মুক্তির সনদে যার যার দাবি দাওয়ার কথা তুলে ধরি।"

আমাদের এ আহ্বান মানুষের চিন্তাকে ছুঁয়ে গেল। প্রতিদিন অজস্র পরামর্শ আসতে লাগল।

২১

১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে আমার নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হল। জোহান্সবার্গের বাইরে স্বাধীনভাবে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার জন্মস্থান ট্রান্সকেইতে যাব। এ ক্ষেত্রে আমার দুটো উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত বহুদিন আমি আমার স্বজনদের থেকে আলাদা হয়েছিলাম। তাদের সংগে দেখা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সেখানে কিছু রাজনৈতিক কাজও ছিল। সেখানকার বেশ কিছু দলীয় শাখায় গিয়ে স্থানীয় নেতাদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

পূর্ব পরিকল্পনা মতো আমি রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। রওনা হওয়ার আগের রাতে সহযোদ্ধারা আমাকে বিদায় জানাতে এলেন। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভোররাতেই আমি রওনা হয়ে গেলাম। বিকেল নাগাদ ট্রান্সকেইতে পৌছে গেলাম। দেখলাম আমার শৈশবের আবাসভূমি ট্রান্সকেই অনেক বদলে গেছে। আমি অনেকটা স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছিলাম। আমি ট্রান্সকেইর পথ ঘাট ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম।

মায়ের কাছে পৌছানোর পর এক অসম্ভব আবেগপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা হল। দেখলাম মা একেবারে বুড়িয়ে গেছেন। ভূতের মতো চেহারা হয়েছে তার।

তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন না। চুমুও খেলেন না। তার চোখ বেয়ে শুধু জলধারা নেমে এল। বহুদিন পর আমাকে কাছে পেয়ে মা কত রকমের ফল আর মাংস এনে সামনে ধরলেন মনে নেই। আধাবেলা সেখানে কাটিয়ে মাকে যখন বললাম, 'মা আসি!' তিনি একবারও বললেন না, 'আর একটু বসে যা'। তিনি হয়তো জানতেন তার ছেলেকে ধরে রাখার ক্ষমতা তার নেই। আমি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম।

মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার পালক মায়ের সংগে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন ঘুমাচ্ছিলেন। জেগে উঠে আমাকে দেখে তিনি এত

উচ্ছসিত হলেন যে আবেগে তার শরীর কাঁপছিল। তিনি অনেকক্ষণ আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলেন। পরে আমাকে নিয়ে লং ড্রাইভে বেরুলেন। পালক মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি ছুটলাম আমার কুনু গ্রামের সাথীদের সংগে দেখা করতে।

সেখানে পুরো একদিন তাদের সংগে ঘুরতে ঘুরতে আমার মনে হচ্ছিল; আমি যেন আবার শৈশবে ফিরে গেছি।

২২

ট্রান্সকেই থেকে ফিরে আসার পর ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ দলের পুনর্মূল্যায়ন ও ভবিষ্যত করণীয় নিয়ে বৈঠক শুরু হল। আমি ট্রান্সকেইর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও এএনসির অবস্থান তুলে ধরলাম। আমি তাদের সুসংবাদ দিতে পারলাম না। তাদের বললাম, ট্রান্সকেই শাখা এখনও সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ করার অবস্থায় আসেনি। বিশেষ করে বান্টু এডুকেশন অ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি যে প্রস্তাব করেছিল সে অনুযায়ী কাজ করার মতো সাংগঠনিক অবস্থা সেখানে ছিল না।

১৯৫৬ সালে আমি আবার ট্রান্সকেইতে যাই। এবার সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। আমি উমতাতায় বাড়ি করার জন্য এক খন্ড জমি কিনতে চেয়েছিলাম। আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী একটু স্বচ্ছলতা হলে সবাই তার নিজের এলাকায় বাড়ি করে। আমার মাও তাই চেয়েছিলেন। ওয়াল্টারকে সংগে নিয়ে উমতাতা গেলাম। সেখানে আমাদের স্থানীয় নেতা সি. কে সাকবি তার নিজের এক খণ্ড জমি বিক্রি করতে চেয়েছিল। আমি তার জমিটাই কিনতে চেয়েছিলাম।

আমার ইচ্ছার কথা শুনে সে সানন্দে জমিটা ছেড়ে দিতে রাজি হল।

১৯৫৬ সালে তৃতীয়বারের মতো আমার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল। এই দফায় আমাকে পাঁচ বছরের জন্য জোহান্সবার্গের বাইরে না যাওয়ার এবং কোন রাজনৈতিক মিটিংয়ে যোগ না দেবার নির্দেশ দেওয়া হল। তার মানে আগামী ৬০ মাস আমাকে একই শহরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

তবে এবারের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে আমি আগের মতো নিস্পৃহ থাকব না বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। রাজনীতিতে প্রকাশ্য হতে না পারার কারণে মনে যে অস্থিরতা ছিল তা দূর করতে বক্সিং ক্লাবে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। অরল্যান্ডোতে ডোনাল্ডসন অরল্যান্ডো কম্যুনিটি সেন্টার নামে একটা বক্সিং ক্লাব ছিল। সেখানে ভর্তি হলাম। ১৯৫০ সালে আমি ওই ক্লাবে যোগ দেই। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে প্র্যাকটিস করতে যেতাম। পরবর্তীতে আমি ট্রান্সভালের শ্রেষ্ঠ লাইটওয়েট বক্সার হয়েছিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেশদ্রোহ

২৩

১৯৫৬ সালের ৫ ডিসেম্বর ভোররাতে হঠাৎ কড়া নাড়ার খট খট শব্দে ঘুম ভাঙলো। আমার কোন বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশী ওরকম বিটকেল শব্দ করে কখনও দরজায় নক করে না। শব্দের ধরণ শুনে দু'এক মিনিটের মধ্যেই বুঝলাম, বাড়িতে পুলিশ এসেছে। দরজা খুললাম। দেখলাম আমার সামনেই হেড কনস্টেবল রাউসেউ কয়েকজন সেপাই নিয়ে দাঁড়িয়ে। তিনি কোন কথা না বলে আমার সামনে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট মেলে ধরলেন আর হাতের ইশারায় অন্যদের ঘরে তল্লাশি করতে বললেন। এ সময় ছেলে মেয়েরা উঠে গিয়েছিল। তারা যাতে ভয় না পায় সেজন্য আমি পুলিশদের জোরে জোরে শব্দ না করতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত করল না। টানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে পুরো ঘরে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালালো।

পরে রাউসেউ বললেন, 'ম্যান্ডেলা আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য আমরা ওয়ারেন্ট অর্ডার সংগে নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের সংগে চলুন।' আমি ওয়ারেন্টের দিকে চেয়ে দেখলাম তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'ভয়ানক রাষ্ট্রদ্রোহী, গ্রেফতার করা হোক।'

আমি কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। ছোট ছোট বাচ্চাদের সামনে গ্রেফতার করায় আমার বাচ্চাদের জন্য খারাপ লাগছিল। গাড়ি ছেড়ে দিল। তখন রাত প্রায় সাড়ে ৪টা। গাড়ি চালাচ্ছিলেন রাউসেউ নিজেই। আমি বসেছিলাম তার পাশের সিটে। আমরা কেউ কথা বলছিলাম না। আমার হাতে কোন হ্যান্ডকাফ দেওয়া হয়নি। আমি পালানোর কোনরকম চেষ্টা করব না এ বিষয়ে সম্ভবত পুলিশ কর্মকর্তার শতভাগ বিশ্বাস ছিল। আমাকে নিয়ে তাদের প্রথম গন্তব্য ছিল আমার অফিস। সেখানেও তল্লাশি চালানো হবে। গাড়িটা অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় আসতেই আমি রাউসেউকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আচ্ছা অফিসার এখন যদি আমি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে পালিয়ে যাই?'

তিনি বললেন, 'ম্যান্ডেলা, আপনি কিন্তু আগুন নিয়ে খেলছেন।'

–'আগুন নিয়েই তো আমার খেলতে ভালো লাগে।'

'ম্যান্ডেলা, অযথা বকবক করলে আমি কিন্তু আপনাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেবো।'

–'আমি যদি পরতে না চাই।'

লোকটা আমার কথায় মনে হল কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ল। আমাকে বললো, 'ম্যান্ডেলা, আমি আপনার সংগে ভালো ব্যবহার করছি। আপনার কাছ থেকেও সে আচরণ আশা করছি। কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকুন। তার একথায় চুপ হয়ে গেলাম। ভাবলাম লোকটা যেহেতু খারাপ কোন আচরণ করছে না; সেহেতু এর সংগে ফাজলামো করার দরকার নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আমাকে নিয়ে আমার অফিসে চলে এল। সেখানে আমাকে বসিয়ে রেখে টানা পয়তাল্লিশ মিনিট ধরে আমার অফিস তল্লাসি করা হল। মার্শাল স্কোয়ার কারাগারে আমাকে বেশ কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল। আমাকে সেই জেলেই নিয়ে যাওয়া হল। গিয়ে দেখি আমার আগেই সেখানে আমার অনেক রাজনৈতিক সহযোদ্ধাকে ধরে আনা হয়েছে। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেখলাম পুরো জেলখানা আমাদের নেতাকর্মীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল। এখানে সবাই সবাইকে পেয়ে দুশ্চিন্তা তো দূরের কথা রীতিমতো আনন্দ উল্লাস শুরু করে দিল। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন চিফ লুথুলি, মন্টি নাইকার, রেগি সেপ্টেম্বার, লিলিয়ান এনগোয়িসহ আরও বহু নেতৃবৃন্দ। দিন শেষে সব মিলিয়ে গ্রেফতার হলাম মোট ১৪৪ জন। পরদিনই আদালতে হাজির করে আমাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ আনা হল। আমাদের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ ছিল আমরা নাকি বাইরের দেশের (সোভিয়েত ইউনিয়ন) মদদপুষ্ট হয়ে গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে সরকারের পতন ঘটাতে চাচ্ছি এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি। আমাদের গ্রেফতার হওয়ার এক সপ্তাহ পরে আটক হলেন ওয়াল্টার সিসুলু সহ আরও ১২ জন। সব মিলিয়ে বন্দী সংখ্যা হল ১৫৬ জন। এদের মধ্যে ১০৫ জন আফ্রিকান, ২১জন ভারতীয়, ২৩ জন শ্বেতাঙ্গ এবং ৭ জন নিগ্রো। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন ধর্মযাজক, প্রফেসর, ডাক্তার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশার লোক। সেখানে ১৮ বছরের তরুণ থেকে শুরু করে ৭০ বছরের বৃদ্ধও ছিলেন। নোংরা সেলে আমাদের ৩ খানা করে কম্বল দেওয়া হল। কিন্তু আমরা খুবই আনন্দে ছিলাম। বাইরে আমরা অনেকেই নিষিদ্ধের সংগে কথা বলতে পারছিলাম না। কিন্তু এখানে সবাই একাকার হয়ে গেলাম।

দুই সপ্তাহ জেলে রাখার পর আমাদের প্রিপারেটরি এক্সামিনেশনের জন্য ১৯ ডিসেম্বর জোহান্সবার্গের ড্রিল হল আদালতে হাজির করা হল। আমাদের বিশাল বিশাল পুলিশ ভ্যানে করে যখন আনা হচ্ছিল তখন রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ আমাদের মুক্তির জন্য বিক্ষোভ করছিল। তাদের সামলাতে কয়েক শ' পুলিশ ও

সেনা সদস্য নিয়োগ করতে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল দেশে গৃহযুদ্ধ জাতীয় কিছু একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

আদালত কক্ষে যখন আমরা ঢুকলাম, দেখলাম সেখানেও আমাদের অভিবাদন জানানোর জন্য সমর্থকরা গিজগিজ করছিল। আমিসহ অন্যরা আদালত কক্ষেই বৃদ্ধাঙ্গুল উঁচিয়ে সবাইকে বিপ্লবী অভিবাদন জানালাম। আমাদের ১৫৬ জনকেই রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করা হল। সরকারি কৌসুলি অভিযোগ করলেন, আমরা এ সরকারের পতন ঘটিয়ে সেখানে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি। দক্ষিণ আফ্রিকার আইন অনুযায়ী এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে।

আমাদের যে আদালতে তোলা হয়েছিল সেটা ছিল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। আমাদের বিচার প্রক্রিয়া বেশ সময়সাপেক্ষ ছিল। এ বিচারের দুটি ধাপ ছিল। প্রথম ধাপে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা-নীরিক্ষা হবে। অর্থাৎ আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ ও আলামত আছে কিনা তা ম্যাজিস্ট্রেট খতিয়ে দেখবেন। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রায়ে যদি বলা হয় এ অভিযোগের স্বপক্ষে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তাহলে তিনি মূল বিচারকাজ শুরু করার সুপারিশ করে মামলাটিকে সুপ্রিম কোর্টে পাঠাবেন। সুপ্রিম কোর্ট তখন বিচারকাজ শুরু করবে। আর যদি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট মনে করে যে স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নেই তাহলে এ আদালত মামলাটি খারিজ করে দেবে।

মামলায় লড়ার জন্য আমাদের পক্ষে আইনজীবীদের এক বিশাল ডিফেন্স টিম দাঁড়িয়ে গেল। আমাদের পক্ষে ছিলেন ব্রাম ফিসচার, নরমান রোজেনবার্গ, ইসরাইল মাইকেলস, মাউরিস ফ্রাঙ্কস্ এবং ভার্নোল বেরাঞ্জে। এক মামলায় এতজন বাঘা বাঘা উকিলের ডিফেন্স টিম এর আগে আর হয়নি।

অন্যদিকে সরকার পক্ষের প্রধান কৌসূলি ছিলেন ভ্যান নিকার্ক। তিনদিন ধরে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে আনীত ১৮ হাজার শব্দের একটি অভিযোগপত্র পাঠ করলেন। তিনি আমাদের বিরুদ্ধে চরম দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনলেন। তবে শুনানির চতুর্থ দিনে আর্থিক মুচলেকার বিনিময়ে আমাদের জামিনে ছাড়া হল।

আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত আদালত মুলতবি হল। তবে আমরা এই সময় কোন ধরণের রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত হতে পারবো না বলেও নির্দেশ দেওয়া হল।

ছাড়া পাওয়ার পরের দিনই আমি আর অলিভার অফিসে এলাম। অফিসে আমাকে অনেকেই দেখতে এল। তাদের মধ্যে আমার পুরনো বন্ধু জাবাভুও ছিল। জেলে থাকার কারণে আমি বেশ রোগা হয়ে গিয়েছিলাম। জাবাভু আমাকে দেখে বললো, 'মাদিবা, তোকে এমন শুটনো লাগছে কেন? জেলে গিয়ে নিশ্চয়ই তুই ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলি। তা না হলে কেউ এত রোগা হয়? তুই তো আমাদের, বিশেষ করে ঝোসাদের মানসম্মান শেষ করে দিলি রে...'

২৪

আমার বিচার শুরু হওয়ার আগেই ইভেলিনের সংগে ছাড়াছাড়ি হওয়ার মতো পরিস্থিতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৩ সালে ইভেলিন তার ৪ বছর মেয়াদী জেনারেল নার্সিং কোর্সের শেষ পর্ব সম্পন্ন করার জন্য আবার পড়াশুনা শুরু করে। এজন্য তাকে ডারবানের কিং অ্যাডওয়ার্ড সেভেন হাসপাতালে ধাত্রী বিদ্যার ওপর বেশ কয়েক মাস প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। এ সময় তাকে অরল্যান্ডো ছেড়ে ডারবানে থাকতে হয়েছিল। আমার মা এবং বোন এ সময় আমার বাড়িতে ছিলেন। বাচ্চাদের তারাই দেখাশুনা করতেন। ইভেলিন যখন ডারবানে তখন মাত্র একবার আমি সেখানে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

বেশ কয়েকমাস বাদেই পরীক্ষায় পাশ করে ইভেলিন ডারবান থেকে বাসায় ফিরে এল। অরল্যান্ডোতে ফেরার পরপর সে অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়লো এবং ওই বছরের শেষ দিকে সে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। ৬ বছর আগে আমরা মাকাজিউ নামের একটি কন্যাকে হারিয়েছিলাম। মাত্র ৯ মাস বয়সে সে মারা গিয়েছিল। তার নামানুসারেই এ সন্তানের নাম রাখা হলো মাকাজিউ।

মাকাজিউর জন্মের পরের বছর ইভেলিন খ্রিস্টানদের ধর্মীয় সংগঠন ওয়াচ টাওয়ারের সংগে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। জেহোভার্স উইটনেস চার্চের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াচ টাওয়ার ধর্মীয় প্রচারণা চালাতো। দাম্পত্য জীবনের কোন অতৃপ্তিই ইভেলিনকে ধর্মীয় দিকে ঝুঁকতে প্ররোচিত করেছিল কিনা জানি না, তবে ওয়াচ টাওয়ার নিয়ে সে হঠাৎই বেশ খেপে উঠেছিল। জেহোভার্স উইটনেসের অনুসারীরা বিশ্বাস করতো বাইবেলই হচ্ছে বিশ্বাসের ভিত্তি এবং এ ভিত্তিতেই সত্য ও মিথ্যার সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। ইভেলিন এ ধর্ম প্রচারণা নিয়ে এতটাই মেতে উঠেছিল যে সে সংগঠনের মুখপাত্র 'দি ওয়াচ টাওয়ার' বিলি করা শুরু করলো। এমনকি সে আমাকেও রাজনীতি ছেড়ে ঈশ্বরের পতাকাতলে শামিল হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল। আমি তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরোপুরি ডুবে গেছি। আন্দোলন সংগ্রাম তখন আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ওই মুহূর্তে ধর্মচিন্তা করার সময় আমার একেবারেই ছিল না। আমার পুরো চিন্তাভাবনা তখন এএনসি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঘিরে।

এই বিষয়টি ইভেলিন আর মেনে নিতে পারলো না। সে বললো, শুধুমাত্র রাজনীতির কারণে সে স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবনের আস্বাদ পায়নি। সে আমাকে জোহান্সবার্গ ছেড়ে উমতাতায় ফিরে গিয়ে সেখানে সাবাতার কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করার জন্য বললো। আমি তাকে বোঝাতে চাইলাম যে রাজনীতি হল আমার জীবন। এটা ছাড়া আমি বেঁচে থাকতে পারবো না। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি আমার কর্তব্য রয়েছে। কিন্তু ইভেলিন বুঝতে চাইলো না। সে বললো, জাতির প্রতি কর্তব্য পালনের চেয়ে ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য পালন করা বেশি জরুরি। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে আমার রাজনৈতিক তৎপরতা ইভেলিন

আর মেনে নিতে চাইছে না। কিন্তু আমার কিছুই করার ছিল না। রাজনীতি থেকে পুরোপুরি গৃহস্থ্ জীবনে ফিরে আসা আমার পক্ষে তখন কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

আমার আর ইভেলিনের দ্বন্দ্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল বাচ্চারা। আমাদের দর্শন তাদের মধ্যে ঢোকানোর জন্য আমরা উভয়ই যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করলাম। ইভেলিন আমাদের বড় ছেলে যেম্বি আর মেজো ছেলে মাকাগাথোকে দিয়ে ওয়াচ টাওয়ারের লিফলেট বিতরণ করাতো। অন্যদিকে আমি তাদের সংগে রাজনীতি নিয়ে কথা বলতাম। এএনসির শিশু সংগঠনের অন্যতম প্রধান ছিল আমাদের ছেলে যেম্বি। সাদারা কীভাবে কালোদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে আমি তা তাকে বোঝাতাম।

ঘরের দেওয়ালে আমি রুজভেল্ট, চার্চিল, স্টালিন এবং গান্ধীর মতো নেতাদের ছবি টানিয়ে রাখতাম। কে কোন দেশের নেতা, কে কেমন নেতা তা তাদের বোঝাতাম। আমি মনে-প্রাণে চাইতাম আমার ছেলেরা মহান মহান নেতা হয়ে উঠুক। কিন্তু ইভেলিন আমার এ কাজেরও ঘোর বিরোধীতা শুরু করে।

ওই সময়টাতে আমার একটুখানি অবসর ছিল না। ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতাম; ফিরতাম মধ্যরাতে। দিনে অফিসের কাজ সেরে প্রতিদিন রাতেই কোন না কোন মিটিংয়ে আমাকে হাজির থাকতে হত। সন্ধ্যার পরে যে মিটিং থাকতো ইভেলিন কিছুতেই তা বুঝতে চাইতো না। তার সন্দেহ ছিল আমি হয়তো অন্য নারীর সংগে রাত কাটাচ্ছি। প্রায় প্রতি রাতেই আমাকে কোথায় ছিলাম, কীভাবে ছিলাম তা তার কাছে ব্যাখ্যা করতে হত। কিন্তু সে কিছুতেই এসব কথা মেনে নিতে পারছিল না। ১৯৫৫ সালে ইভেলিন আমাকে আল্টিমেটাম দিয়ে বললো, আমাকে হয় এএনসি নয়তো তাকে বেছে নিতে হবে।

ওয়াল্টার সিসুলু এবং তার স্ত্রী আলবার্তিনা সিসুলু দুজনই ইভেলিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তারা দুজনই আমাদের মঙ্গল চাইতেন। ইভেলিন আলবার্তিনার কাছে আমার সম্বন্ধে অভিযোগ করলে এ বিষয়ে কথা বলতে তারা আমাদের বাড়িতে আসেন। উত্তেজিত হয়ে সেদিন আমি ওয়াল্টারের সংগে খুব খারাপ আচরণ করে ফেলি। অবশ্য পরে তার কাছে মাফ চেয়েছিলাম।

ডিসেম্বরে অন্যান্য নেতার সংগে আমাকেও গ্রেফতার করা হয়। দু'সপ্তাহের জন্য তখন আমাকে জেলখানায় থাকতে হয়েছিল। ওই সময় ইভেলিন আমাকে জেলখানায় দেখতে এল। হাসিমুখে ভালোমন্দ কথা বলল। কিন্তু জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরে দেখি সে বাচ্চাদের সংগে নিয়ে চলে গেছে। সে বাড়ি থেকে তার ভাইয়ের বাসায় গিয়ে উঠেছিল। তার ভাই আমাকে এসে বলে গেলেন। রাগের মাথায় চলে এসেছে রাগ পড়ে গেলে আবার ঠিক ফিরে যাবে। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো ইভেলিন আর ফিরে আসেনি।

ইভেলিন ফিরে না এলেও আমি তার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা হারাইনি। সে একজন চমৎকার প্রেমিকা, আদর্শ মা ও একশভাগ সংসারী মেয়ে ছিল। দিনের পর দিন আমার অনুপস্থিতি তাকে অসহ্য করে তুলতেই পারে। কিন্তু আমিও তার দুঃখ বুঝেও কিছু করতে পারিনি। আদর্শের কাছে আমি তখন বন্দী হয়ে গেছি।

আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়াতে সবচেয়ে ক্ষতির শিকার হয়েছিল বাচ্চারা। মাকাগাথে আমার সংগে ঘুমাতো। সে খুবই শান্ত ধরণের ছেলে ছিল। সে তার বাবা-মাকে আবার এক সাথে করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। আমাদের মেয়ে মাকাজিউই তখন একেবারেই শিশু। তেমন কিছুই বোঝে না। অনেকদিন পর আমি যখন একদিন তাদের দেখতে গেলাম; তখন দেখলাম মাকাজিউই আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। আমার কোলে আসবে কি আসবে না তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেছে। পিতাকে অনেকদিন দেখতে না পেয়ে সে এক ধরণের দূরত্ব অনুভব করছিল। তার ওই অভিব্যক্তি দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

বড় ছেলে থেম্বি পড়ুয়া ধরণের ছেলে ছিল। ইংরেজী ও শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে তার খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু এ ঘটনায় সেও মুষড়ে পড়লো। স্কুলে ভালো ছাত্র হিসেবে তার নাম ছিল। একদিন তার স্কুলের শিক্ষক আমাকে বললেন, থেম্বি অমনোযোগী হয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে আমার সহযোগিতা দরকার। কিন্তু অসহায় পিতা হিসেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমার তখন আর কিছুই করার ছিল না।

২৫

১৯৫৭ সালের ৯ জানুয়ারি আবার আমরা ড্রিল হিল আদালতে হাজির হলাম। প্রথম দফা শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল। এ দফায় আমাদের সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক তুলে ধরার কথা। সরকারের অভিযোগের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে আমাদের প্রধান আইনজীবী ভারনোন বেরাঞ্জে যুক্তি-তর্ক শুরু করলেন। তিনি বললেন, স্বাধীনতার সনদে উল্লেখিত কোন দফাই রাষ্ট্রদ্রোহী নয়। দেশের মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষা, তাদের যে চাওয়া পাওয়া তা ওই সনদে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বললেন, সরকার বিরোধী দলগুলো সরকারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংবিধানসম্মতভাবে বিক্ষোভ করেছে। এটা কিছুতেই রাষ্ট্রদ্রোহীতা হতে পারে না।

সরকারপক্ষ আমাদের অভিযোগের স্বপক্ষে যে প্রমাণপত্র হাজির করতে সময় নিয়েছে টানা একমাস। তারা প্রমাণ হিসেবে পেপার কাটিং, বই, নোটবুক, চিঠি, প্যামপ্লেট, ম্যাগাজিন ইত্যাদি সব মিলিয়ে প্রায় ১২ হাজার ডকুমেন্ট আদালতে

পেশ করে। ওই সব প্রমাণপত্রের মধ্যে জাতিসংঘের মানবাধিকার ডিক্লারেশন থেকে শুরু করে রুশ রান্নার বই পর্যন্ত রেফারেন্স হিসেবে ছিল। সরকারপক্ষের এই বাড়াবাড়িতে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেও বিরক্ত হয়েছিলেন।

প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুক্তিতর্ক চলেছিল কয়েকমাস ধরে। সরকারপক্ষ কয়েকদিন ধরে অভিযোগ উত্থাপন করেছে আমরা তাদের সে অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছি। সরকারপক্ষের আফ্রিকান ও আফ্রিকানার গোয়েন্দারা দিনের পর দিন আমাদের এএনসি মিটিং সম্পর্কে তাদের নোট উল্লেখ করেছে। আমরা প্রথমে ধৈর্য ধরে শুনেছি। তারপর জবাব দিয়েছি।

আমরা যে সরকার উৎখাত করে সেখানে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি তা প্রমাণের জন্য কেপটাউন ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান প্রফেসর অ্যান্ড্রু ম্যুরকে সরকার সাক্ষী হিসেবে হাজির করে। ম্যুর তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের স্বাধীনতার সনদটাই নাকি কম্যুনিজমের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, ওই সনদে বলা হয়েছে সাধারণ শ্রমিকরা একজন আরেকজনকে সাহায্য করবে এবং একজন আরেকজনকে ব্যবহার করবে না। এটা নাকি কম্যুনিস্ট প্রভাবিত বক্তব্য।

আমাদের প্রধান আইনজীবী বেরাঞ্জে তার ওই যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, এটা খোদ ক্ষমতাসীন দলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মালানের বক্তব্য। তিনিই এ বক্তব্য বারবার দিয়েছেন। প্রমাণ হিসেবে তিনি বেশ কিছু পেপারকাটিং হাজির করেন। এরকমভাবে বেরাঞ্জে একের পর এক প্রফেসর ম্যুরের যুক্তি খণ্ডন করেন।

বিচারের সপ্তম মাসে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় তারা আমাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা উস্কে দেওয়ার অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করবে। এজন্য তারা সোলোমন এনগুবাসে নামে একজন রাজসাক্ষীকে হাজির করে। ত্রিশোর্ধ সলোমন ছিলেন ক্ষীণভাষী। ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পারতেন। যখন তিনি মামলায় আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এসেছেন তার কিছুদিন আগেই নিম্ন আদালতে প্রতারণার দায়ে তার সাজা হয়েছিল। জবানবন্দীর প্রথম দিনে সলোমন বললেন, তিনি ফোর্ট হেয়ার থেকে বিএ পাস করে উকিল হিসেবে কাজ করছেন। তিনি দাবি করলেন এএনসির পোর্ট এলিজাবেথ শাখার তিনি সেক্রেটারি এবং ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভের সদস্য হয়েছিলেন।

তিনি দাবি করলেন, তিনি ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভের একটি মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। সেই মিটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় অভ্যুত্থানের জন্য রাশিয়া থেকে অস্ত্র আনার জন্য নাকি ওয়াল্টার সিসুলু ও ডেভিড বোপাপেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তিনি আরও বললেন ১৯৫২ সালে পোর্ট এলিজাবেথের দাঙ্গার সময় তিনি সেখানে হাজির ছিলেন এবং সেখানে এএনসি কর্মীদের শ্বেতাঙ্গদের নিধন করতে দেখেছেন। তার পুরো বক্তব্যই যে ডাহা মিথ্যা তা সরকার পক্ষ যেমন জানতো আমরাও তেমন জানতাম।

আমাদের আইনজীবী ভারনোন বেরাঞ্জে যখন তাকে জেরা করা শুরু করলেন তখন তিনি সবার সামনেই মিথ্যুক প্রমাণিত হলেন। আমাদের আইনজীবী প্রমাণ করলেন এনগুবাসে নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন তা পুরোপুরি মিথ্যা। প্রথমত, তিনি বিএ পাশ নন। তিনি যে সার্টিফিকেট হাজির করেছিলেন তা জাল। ওই জাল সার্টিফিকেট দিয়ে অ্যাটর্নি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি ধরা পড়েন এবং প্রতারণার জন্য তার জেল জরিমানা হয়।

পোর্ট এলিজাবেথে দাঙ্গার সময় তিনি হাজির ছিলেন বলে যে দাবি করেন তা মিথ্যে প্রমাণ করেন আমাদের আইনজীবী। আদালতের সামনে এই প্রমাণপত্র হাজির করে তিনি দেখিয়ে দেন ওই দাঙ্গার সময় তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না, ছিলেন জেলে। তাকে জেরা করায় এক পর্যায়ে আমাদের উকিল তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি জানেন ভণ্ড কাকে বলে?' তিনি বললেন, 'না।'

আমাদের আইনজীবী বললেন, 'আপনিই হচ্ছেন আদর্শ ভণ্ড।'

ঠিক এইভাবে টানা দশ মাস ধরে সরকার আমাদের বিরুদ্ধে মোট ৮ হাজার পৃষ্ঠার অভিযোগ ও প্রমাণপত্র দাখিল করে। ১৯৫৭ সালের পুরোটা সময়ই যুক্তি তর্কে কেটে যায়। সেপ্টেম্বর মাসে আদালত স্থগিত হয়। এর তিন মাস পরে হঠাৎ করে সরকার ঘোষণা দেয় তারা এ মামলা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। আমরা সরকারের এ সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন খুশি হয়েছিলাম, অন্যদিকে তেমনি অবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি।

কিন্তু জানুয়ারি মাসে আবার সরকারের ভোল পাল্টে যায়। সরকার নতুন প্রসিকিউটর নিয়োগ করে। নতুন কৌসুলির নাম ওসওয়াল্ড পিরো কিউ. সি.। তিনি কট্টর নাৎসীবাদী ছিলেন। একবার তিনি হিটলারকে তার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। পিরো মামলাটির দায়িত্ব নেওয়ার পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। তিনি আদালতকে বললেন, দেশ ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন সময় এর উদ্গীরণ হতে পারে। তিনি আমাদের ভয়ঙ্কর দেশদ্রোহী বলে 'জোরালো যুক্তি' উপস্থাপন করতে থাকলেন।

তের মাস ধরে চলা প্রিপারেটরি এক্সামিনেশন শেষ হওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিলেন আমাদের দেশদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করার জন্য 'যথেষ্ট কারণ' রয়েছে। সে কারণে তিনি মামলাটির নিষ্পত্তির জন্য তা ট্রান্সভাল সুপ্রিম কোর্টে হস্তান্তর করলেন। জানুয়ারিতে ৯৫ জনকে দেশদ্রোহী হিসেবে বিচার করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে কোর্ট স্থগিত হয়ে গেল। আমাদের আসল বিচারপ্রক্রিয়া কখন শুরু হবে আমরা তখন সে সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

প্রিপারেটরি এক্সামিনেশনের অবকাশকালীন সময় একদিন বিকেলে আমার এক বন্ধুকে উইটওয়াটারসর‍্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলে গাড়িতে করে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম। তাকে নামিয়ে দিয়ে জোহান্সবার্গের বারাগওয়ানাথ হাসপাতালের সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন বাসস্টপে অদ্ভুত সুন্দরী একটা মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। গাড়ি চালাতে চালাতে একঝলক দেখেই আমার চোখ আটকে গেল। দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানোর জন্য দ্রুত মেয়েটাকে পেছনে ফেলে চলে এলাম। একবার মনে হল গাড়ি ঘুরিয়ে আবার মেয়েটাকে দেখে আসি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালিয়ে সামনে চলে এলাম। কিন্তু মেয়েটার মুখ আমার মনে কেমন যেন আটকে রইল।

এর কয়েক সপ্তাহ বাদে একটা কাকতালীয় ঘটনা ঘটল। আমাদের অফিসে অলিভারের রুমে ঢুঁ মারতেই দেখি সেই মেয়েটা আর তার ভাই অলিভারের টেবিলের সামনে বসে আছে। আমি আশ্চর্য হলাম। কিন্তু অবাক হওয়ার ব্যাপারটা প্রকাশ করলাম না। অলিভার তাদের সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। জানালো একটা আইনি সমস্যা সমাধানের জন্য তারা এসেছে।

পরিচিত হয়ে জানলাম মেয়েটার নাম নোমজামো উইনিফ্রেড মাদিকিজেলা। তার ডাকনাম উইনি। সে জোহান্সবার্গের জ্যান হফমেয়ার স্কুল থেকে সমাজকর্মের ওপর পড়াশুনা শেষ করে এখন বারাগওয়ানথ হাসপাতালে চাকরি করছে। খানিকক্ষণ আলাপ করেই তাকে ভীষণ ভালো লাগল।

তার কাছ থেকেই জানলাম তার বাবা সি. কে. মাদিকিজেলা একজন সাবেক প্রধান শিক্ষক। সাত ভাই বোনের মধ্যে উইনি ৬ষ্ঠ সন্তান। তারা আগে ট্রান্সকেইর পোডোল্যান্ডে থাকতো। প্রথম দিনেই তার সংগে অনেকক্ষণ আলাপ হল।

পরিচয়ের পরদিনই আমি উইনিকে তার হাসপাতালের নাম্বারে ফোন করলাম। বললাম আমরা রাষ্ট্রদোহ মামলার জন্য তহবিল সংগ্রহ করছি। এ ব্যাপারে তার সহযোগিতা চাই। সে একথায় রাজি হয়ে গেল। আমি তাকে একটা রেস্তোঁরায় নিমন্ত্রণ করলাম। পরে তাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে বেরিয়েছি। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম উইনিকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেব। এর আগে আমার ছেলে-মেয়েদের সংগে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। আমাকে অবাক করে দিয়ে উইনি বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

আমার বিরুদ্ধে তখন রাষ্ট্রদোহের মামলা চলছিল। যে কোন কাজ করতে হলে তার আগে আমাকে পুলিশকে ইনফর্ম করতে হতো। ১৯৫৮ সালের ১৪ জুন

আমাদের আনুষ্ঠানিক বিয়ের দিন ঠিক হল। আমি বিয়ে উপলক্ষে প্রশাসনের কাছে ৬ দিনের রিলাক্সেশন অর্ডার চাইলাম। আমার আবেদন মঞ্জুর হল।

কিন্তু বিয়ের আগে উইনিকে আমার বর্তমান অবস্থা খুলে বললাম। পরপর কয়েকবার জেলে যাওয়ায় আমার আইন ব্যবসা ভালো যাচ্ছিল না। ফার্মটা প্রায় ভেঙে গিয়েছিল। আমি উইনিকে বললাম, বিয়ের পর তাকে প্রাথমিকভাবে তার নিজের রোজগারের ওপরই ভরসা করতে হবে। সে আমার কথায় কোনরকম ঘাবড়ে গেল না। সে বললো, যাবতীয় ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই সে আমাকে বিয়ে করছে।

১৪ জুন আত্মীয়-স্বজন ও কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের অনুষ্ঠানে উইনির বাবা তার মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি কিন্তু মূর্তিমান এক জেলখানাকে বিয়ে করলে। দুদিন পরপরই সে জেলে যাবে। এ বিষয়টি মেনে নিয়েই সংসার শুরু কর।' বিয়ের পর আমরা অরল্যান্ডোতে ৮১১৫ নম্বর বাড়িতে উঠে এলাম। সেখানেও বড় পার্টি হয়েছিল। বিরাট খাওয়া-দাওয়ার উৎসব হয়েছিল সেখানে। এসবের মধ্য দিয়েই আমার আর উইনির সংগ্রামী দাম্পত্য জীবন শুরু হল।

২৭

১৯৫৮ সালে দেশ সবচেয়ে যে বড় ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল সেটি হল ওই বছরের জেনারেল ইলেকশন বা সাধারণ নির্বাচন। 'জেনারেল' বা 'সাধারণ' এই অর্থে যে সে নির্বাচনে ৩০ লাখ শ্বেতাঙ্গ ভোট দিতে পারবে, কিন্তু ১ কোটি ৩০ লাখ আফ্রিকান দিতে পারবে না। এ নির্বাচন ভণ্ডুল করা যায় কিনা তা নিয়ে আমরা শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক ডাকলাম। আলোচনায় স্থির হল যেহেতু নির্বাচন বানচাল করা সম্ভব হবে না; সেহেতু আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে ন্যাশনাল পার্টি যাতে জিততে না পারে সে ব্যবস্থা করা। ইউনাইটেড পার্টি শ্বেতাঙ্গ হলেও তারা আফ্রিকানদের ওপর ন্যাশনালিস্টদের মতো অত্যাচার করত না। এ কারণে আমরা ন্যাশনালিস্টদের হারিয়ে দেবার জন্য নির্বাচনের দিন থেকে লাগাতার তিন দিনের ধর্মঘটের ডাক দিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ন্যাশনালিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তার ভিত্তি ভেঙে দেওয়া।

ধর্মঘটের আগে আমরা কলকারখানা, দোকানপাট, বাসস্টপেজ, রেলস্টেশনসহ বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে লিফলেট বিলি করলাম। 'ন্যাটস্ মাস্ট গো'– এটাই ছিল আমাদের প্রধান স্লোগান। নির্বাচনের আগ মুহূর্তে আমাদের এ তৎপরতা সরকারকে ভাবিয়ে তুললো। সরকারের পক্ষ থেকে জরুরি ঘোষণা দিয়ে বলা হল

নির্বাচনের একদিন পর পর্যন্ত শহর এলাকায় দশ জনের বেশি আফ্রিকান এক জায়গায় জড়ো হতে পারবে না।

ধর্মঘট শুরু হওয়ার একদিন আগে আমাদের শীর্ষ নেতারা সবাই গ্রেফতার এড়াতে সাময়িকভাবে গা ঢাকা দিল। ধর্মঘটের আগের রাতে ওয়াল্টার, অলিভার, মোসেজ কোটানি, জে. বি. মার্কস, ড্যান ট্লুম, দ্যুমা নোকবি এবং আমি অরল্যান্ডোতে আমার পরিচিত ডাক্তার বন্ধু এনথাটো মোটলানার বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। ভোরবেলা তার বাড়ি ছেড়ে পাশের একটি বাড়িতে অবস্থান নিলাম। সে বাসায় টেলিফোন ছিল। ধর্মঘট ঠিকমতো পালন হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে ফোনে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্যই আমরা ওই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ধর্মঘটের কর্মসূচী হিসেবে আমরা হরতাল ডেকেছিলাম। শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মস্থলে যোগ না দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুপুর নাগাদ খবর পেলাম হরতাল অবরোধ ব্যর্থ হয়েছে। বাস ট্রেনে স্বাভাবিক যাত্রী চলাচল করছে। জনগণ আমাদের ডাকে সাড়া দেয়নি। এমনকি আমরা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম সে বাড়ির মালিকও ভোরে কর্মস্থলের উদ্দেশে রওনা হলেন।

বিকেল নাগাদ সিদ্ধান্ত নিলাম ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হবে। জনগণ প্রথম দিনেই আমাদের আহ্বান যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে তাতে এ কর্মসূচী তিন দিন অব্যাহত রাখার কোন মানে হয় না। এতে আমাদের ব্যর্থতা আরও নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়ে যাবে। আমরা দ্রুত একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি লিখে সংবাদ মাধ্যমকে দিয়ে দিলাম। সরকারি টেলিভিশনে আমাদের পুরো বিজ্ঞপ্তি পড়ে জাতিকে শোনানো হল। অবশ্য এ সিদ্ধান্তে আমাদের মধ্যে অনেক নেতাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থার কারণে আমাদের এ ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। দিন শেষে দেখা গেল ন্যাশনালিস্টরা গতবারের চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে পুনরায় জয়লাভ করেছে।

তবে পরের দিন বেশ মজার কাণ্ড ঘটলো। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধর্মঘট প্রত্যাহার হলেও জোহান্সবার্গের বাইরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও ধর্মঘট চললো এবং তা ভালোভাবেই চললো। শহর এলাকার বাইরে খুব একটা টেলিভিশন ছিল না। মানুষ এত দ্রুত আমাদের প্রত্যাহারের ঘোষণাও জানতে পারেনি। সে কারণে তারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে তুমুল উৎসাহে হরতালে পিকেটিং করে যাচ্ছিল। বিশেষ করে পোর্ট এলিজাবেথে আমাদের শক্ত জনসমর্থন ছিল। সেখানে সবচেয়ে সফলভাবে হরতাল হয়। তাদের ধর্মঘট বন্ধের আহ্বান জানানোর জন্য বেশ কিছু নেতা অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমরা সেটা করিনি। আসলে আমরা তাদের স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন স্পৃহাকে নষ্ট করতে চাইনি।

সবচেয়ে মজার কাণ্ড হয়েছিল খোদ আমার বাড়িতেই। নির্বাচনের পরের দিন আমি বাসায় ফিরে আসি। সকাল বেলা আমার গৃহপরিচারিকাকে আমার জামা ইস্ত্রি করে দিতে বলতেই সে বললো এখন কোন কাজ করতে পারব না। আমি

বললাম, 'কেন?' সে বললো, 'কেন আপনি জানেন না; সারাদেশে হরতাল হচ্ছে; কেউ কাজে যাচ্ছে না; আমি কাজ করব কেন?' প্রথমে ভেবেছিলাম সে রসিকতা করছে। কিন্তু পরে দেখলাম সত্যি সত্যি সে কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধু তাই নয় সে তার কিশোর ছেলেকে বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার জন্য ঘর থেকে বের করে দিল। এরপর আর কথা চলে না। সেদিন আমাকে ইস্ত্রি না করা জামা পরেই বেরুতে হল।

২৮

ইতিপূর্বে যতগুলো ইস্যুতে আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে তার কোনটিই 'নারীদের পাশ' ব্যবস্থার ইস্যুর মতো সবার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারেনি। ন্যাশনালিস্ট সরকারের একটি অন্যতম উৎপীড়নমূলক আইন ছিল নারীদের পাশ ব্যবস্থা। অর্থাৎ সরকার এক ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে প্রত্যেক অশ্বেতাঙ্গ নারীকেই সরকারি পাশ বহন করতে হবে। যে কোন পাবলিক প্লেসে গেলেই তার দরকার হবে। পুলিশ যে কোন সময় তাদের কাছে পাশ দেখতে চাইতে পারবে। পাশ দেখাতে ব্যর্থ হলে হয় তাকে ১০ পাউন্ড জরিমানা দিতে হবে; নয়তো এক মাস জেল খাটতে হবে। সরকার অবশ্য সেটি 'পাশ' বলতে রাজি ছিল না। সরকার সেই পরিচয়পত্রকে 'রেফারেন্স বুক' নামে অভিহিত করেছিল।

সরকারের এই ঘোষণার ফলে সারা দক্ষিণ আফ্রিকার নারীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। ১৯৫৭ সালে এএনসির মহিলা সংগঠন উইমেন্স লীগ কঠোর বিক্ষোভের ডাক দেয়। গ্রামের-শহরের, ধনী থেকে দরিদ্র সব শ্রেণীর নারী এ পাশ সিস্টেমের বিরোধীতা করে রাস্তায় নেমে আসে। নারীদের আপাতদৃশ্যে অবলা মনে হলেও তারা প্রকৃতপক্ষে খুবই পরিশ্রমী এবং সাহসী। তারা যদি একবার রাজপথে নেমে আসে তাহলে তাদের ঠেকানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। পুরুষদের চেয়ে নারীরা আন্দোলনে সব সময়ই বেশি স্বতঃস্ফূর্ত থাকে। নারীদের পাশ বা 'রেফারেন্স বুক' বাতিলের দাবিতে তারা যখন বিক্ষোভ শুরু করলো তখন এএনসির শীর্ষ নেতারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন।

আমার মনে পড়ছে ওই সময় চিফ লুথুলি আনন্দে বলে ফেলেছিলেন, 'আমাদের মা-বোনেরা যখন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে তখন পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের মুক্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।' দক্ষিণ পূর্ব ট্রান্সভাল জুড়ে অর্থাৎ স্ট্যান্ডারটোন, হিডেলবার্গ, ব্যালফোর ও অন্যান্য এলাকায় হাজার হাজার নারী রাস্তায় নেমে এল। দেশদ্রোহ মামলার বিরোধী বিক্ষোভের সময় পোর্ট এলিজাবেথে ফান্সিস বার্ড এবং ফ্লোরেন্স মাতোমেলা অনেক নারীদের সংগঠিত করেছিলেন।

তারা এই নারী পাশ বিরোধী বিক্ষোভে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। অক্টোবরে পাশ অফিসে নারী পিকেটাররা ঘেরাও করে সেখানে আগত পাশ প্রার্থী নারীদের সরিয়ে দেয়। তাদের রোষানল থেকে বাঁচতে পাশ কর্মকর্তারাও অফিস থেকে পালিয়ে যায়। ওইদিন পাশ অফিসের সামনে থেকে পুলিশ কয়েক শ' নারী বিক্ষোভকারীকে আটক করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনার পরের দিন সকাল বেলায় নাস্তা করার সময় উইনি আমাকে জানালো যে সে বিক্ষোভে অংশ নিতে চায়। আমি তার কথায় অবাক হলাম। একই সংগে খুশিও হলাম। আমাদের বিয়ে হওয়ার পরপরই উইনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল। সে এএনসির অরল্যান্ডো পশ্চিম মহিলা লীগের সদস্য হয়েছিল। রাজপথে তার পিকেটিং করার মতো ইচ্ছা দেখে খুব ভাল লাগলো। তবে কয়েকটি কারণে আমি উইনিকে বিক্ষোভে যেতে নিরুৎসাহিত করলাম।

উইনি স্বচ্ছল বাবার মেয়ে ছিল। দারিদ্র কী জিনিস আমার সংগে বিয়ে হওয়ার আগে পর্যন্ত বুঝতে পারেনি। পুলিশের মুখোমুখি হওয়া তার জন্য খুবই দূরুহ ছিল। দ্বিতীয়ত, আমার তখন আইন ব্যবসা বলতে গেলে বন্ধ হয়ে গেছে। উইনির বেতন দিয়েই আমরা চলতাম। সে যদি বিক্ষোভে অংশ নেয় তাহলে তার চাকরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা হলে আমরা দুজনই ভয়াবহ বিপদে পড়ব।

সর্বোপরি উইনি তখন ছিল অন্তসত্তা। এ অবস্থায় তার বিক্ষোভে অংশ না নেওয়াটাই আমার কাছে ভালো বলে মনে হল। এসব কারণ দেখিয়ে আমি তাকে বিক্ষোভে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু সে বললো, সে মনস্থির করে ফেলেছে। আন্দোলনে সে যাবেই।

পরদিন ভোরে নাস্তা সেরে উইনিকে নিয়ে অলিভারের বাসায় গেলাম। অলিভারের স্ত্রী আলবার্তিনা মহিলা লীগের অন্যতম নেত্রী ছিলেন। আমি উইনিকে তার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসলাম। ওইদিন জোহান্সবার্গে তাদের বিক্ষোভ করার কথা ছিল। আলবার্তিনার সংগে উইনি ওই বিক্ষোভে যোগ দিতে রওনা হয়ে গেল।

জোহান্সবার্গের কেন্দ্রীয় পাশ অফিস সেদিন শত শত নারী বিক্ষোভকারী ঘেরাও করল। তরুণী থেকে বৃদ্ধা সব শ্রেণীর মহিলা এসে বিক্ষোভে অংশ নিল। এরপর যা হওয়ার তাই হল। পুলিশ এসে গণগ্রেফতার শুরু করল। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল এসময় কেউ পালানোর চেষ্টা করেনি। বরং তারা স্বেচ্ছায় সবাই হুড়মুড় করে পুলিশভ্যানে গিয়ে উঠেছে। সবাইকে এরপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে জোহান্সবার্গ কারাগারে। আমি এ খবর পেয়েই জোহান্সবার্গ ছুটে আসি। এসে দেখলাম

বন্দীদের মধ্যে উইনিও রয়েছে। অনেক কষ্ট হলেও উইনি আমার কাছে তা স্বীকার করল না। তবে নারী বন্দীদের সবাইকেই বেশ হাসিখুশি দেখলাম।

এএনসির নেতা হিসেবে আমার এ মুহূর্তে প্রধান দায়িত্ব হল সবাইকে জামিনে ছাড়িয়ে আনা। সবাইকে জামিনে মুক্ত করতে আমার টানা এক সপ্তাহ লেগে গেল।

বাসায় ফেরার পর উইনিকে বেশ আনন্দিতই মনে হল। জেলখানায় ঘুমানো ও বাথরুমের সমস্যা থাকলেও তার সেখানে খুব বেশি কষ্ট হয়নি। কারাগারের মহিলা ওয়ার্ডে দুজন শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানার মহিলা সুপারভাইজার তার সংগে নাকি খুবই ভালো ব্যবহার করেছে। তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে উইনি তাদের নিমন্ত্রণ করেছিল। আশ্চর্য ব্যাপার হলো ওই দুই শ্বেতাঙ্গ মহিলা সত্যি সত্যি আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। আমরা তাদের সম্মানে বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। বিকেলে উইনি তার এই নতুন দুই বান্ধবীকে নিয়ে বেড়াতে বের হল। তাদের আশে পাশের এলাকা ঘুরিয়ে দেখাল। তবে এই ঘটনা দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

অরল্যান্ডোতে কখনও কোন শ্বেতাঙ্গ আসতো না। এদের দুজনকে দেখে স্বাভাবিকভাবেই সবাই কৌতুহলী হয়েছিল। ব্যাপারটা জেল কর্তৃপক্ষের কান অব্দি পৌঁছেছিল। আমি একে তো সরকার বিরোধী লোক; তার ওপর আফ্রিকান। আমার বাড়িত তারা বেড়াতে গিয়েছিল শুনে কর্তৃপক্ষ ভীষণ খেপে গেল। তাতে আমার এবং উইনির কিছু না হলেও মেয়ে দুটি চাকরি হারালো। আমার মতো 'আফ্রিকান রাজদ্রোহী'র বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে তারা যে 'অন্ন পাপ' করেছিল, নিজেদের চাকরি খুইয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। মেয়ে দুটো কোথায় গিয়েছিল জানি না। এরপর তাদের সংগে আমাদের আর দেখা হয়নি।

২৯

প্রাথমিক পরীক্ষা ভিত্তিক শুনানি শেষ হওয়ার পর আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হওয়ার জন্য আমাদের ৬ মাস অপেক্ষা করতে হল। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের শুনানি শেষ হয়েছিল ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে আর আমাদের আনুষ্ঠানিক বিচার হওয়ার সময়সূচী পড়ল আগস্ট মাসে। সরকার তিন বিচারপতিকে নিয়োগ দিয়ে একটি বিশেষ উচ্চ আদালত গঠন করল। বিচারপতি তিনজন হলেন জাস্টিস এফ. এল. রাম্ফ, জাস্টিস কেনেডি এবং জাস্টিস লুডর্ফ। এদের মধ্যে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন জাস্টিস রাম্ফ। এই প্যানেলটি মোটেও গ্রহণযোগ্য ছিল

না। এই তিনজনই শ্বেতাঙ্গ ছিলেন। এদের মধ্যে জাস্টিস রাম্ফ আফ্রিকানারদের গুপ্ত সংগঠন ব্রোয়েডারবন্ডের সদস্য ছিলেন বলে জনশ্রুতি ছিল। অপর দুই বিচারপতি সরাসরি ন্যাশনাল পার্টির সদস্য ছিলেন। জাস্টিস কেনেডির 'হ্যাংগিং জাজ' নামে 'সুখ্যাতি' ছিল। একবার দুজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ হত্যার দায়ে তিনি ২৩ জন আফ্রিকানকে ফাঁসির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই রকম তিন বিচারকের কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার আশা করা যায় না।

মামলার শুনানির মাত্র কয়েকদিন আগে সরকার আরেকটি কূটচালের আশ্রয় নিল। জোহান্সবার্গ থেকে ৩৬ মাইল দূরে প্রেটোরিয়ায় আমাদের বিচারিক আদালত বসানো হল। আসামীদের সবাই থাকতো জোহান্সবার্গের আশেপাশে। প্রতিদিন প্রেটোরিয়া হাজিরা দিতে যাওয়া এবং সেখান থেকে আসা একদিকে যেমন ব্যয়বহুল ব্যাপার; অন্যদিকে তা আমাদের শারীরিক পরিশ্রমেরও কারণ ছিল। আমাদের মুশকিলে ফেলতেই সরকার এই শয়তানির আশ্রয় নিয়েছিল। প্রেটোরিয়া ছিল ন্যাশনাল পার্টির সমর্থকদের আখড়া। অন্যদিকে সেখানে এএনসির কোন প্রভাবই ছিল না।

যাই হোক, আমরা নির্ধারিত দিনেই প্রেটোরিয়ার আদালতে হাজির হলাম। আগেরবারের মতো এবারও আমাদের পক্ষে ঝানু ঝানু উকিল দাঁড়িয়ে গেলেন। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইসরাইল মাইসেলস্। তার সহকারী হিসেবে ছিলেন ব্রাম ফিসচার, রেক্স ওয়েলস্, ভার্নোন বেরেঞ্জ, সিডনি কেন্টরিজ, টনি দাউদ এবং জি. নিকোলাস।

শুনানির প্রথম দিনেই আমরা বিচারকদের নিরপেক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ করে বসলাম। আমরা বললাম তিন বিচারকই সরকারি দলের সমর্থক। বিশেষ করে প্রধান বিচারপতি ছাড়া বাকি দুজনই সরকারি দলের সমর্থক। সুতরাং আমরা এ প্যানেলে ভরসা করতে পারি না।

তিন বিচারক উঠে গেলেন। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এসে জানালেন, লুডর্ফ এ মামলায় থাকবেন না। তবে রাম্ফ জানালেন তিনি মামলা পরিচালনায় থাকতে চান। তিনি শপথ করে বললেন আইনের বাইরে তিনি কোন রায় দেবেন না। লুডর্ফের জায়গায় আনা হল বিচারপতি বেক্কারকে। বেক্কার খুবই সৎ বিচারক ছিলেন এবং কোন দলের সংগে জড়িত ছিলেন না। আর আমরা ভালো করেই জানতাম রাম্ফ সরকার সমর্থক হলেও বিচারের সময় তিনি কখনও আইনের বাইরে যেতেন না। তবু চাপ সৃষ্টির জন্য আমরা সবাইকে বদলানোর দাবি তুলেছিলাম।

প্রথম পদক্ষেপে সাফল্য অর্জনের পর আমরা দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে আদালতের কাছে যুক্তি তুলে ধরলাম যে আমাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুনির্দিষ্ট নয়।

অর্থাৎ আমাদের বিচার করতে হলে আগে আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে অভিযুক্ত করতে হবে। বাদীপক্ষের অভিযোগ ছিল আমরা দেশদ্রোহী কাজ করেছি। এটা কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নয়। তাদের দেখতে হবে আমরা কী কী দেশদ্রোহী কাজ করেছি। তারা বলেছেন আমরা নাকি সহিংসতা ছড়ানোর চেষ্টা করছি। এক্ষেত্রে তাদেরকে এ জাতীয় ঘটনার সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দেখাতে হবে। বিচারকরা আমাদের যুক্তি মেনে নিলেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে আনীত দুটি অভিযোগের একটিকে খারিজ করে দিলেন। এর দু'মাস পরে ১৩ অক্টোবর হঠাৎ করেই সরকার পক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করে ফেললো। সরকার পক্ষ একের পর এক এত শয়তানি চাল চালছিল যে অভিযোগ প্রত্যাহারের খবরেও আমরা আশ্বস্ত হতে পারলাম না। বুঝলাম তাদের নতুন কোন ফন্দি আছে। আমাদের আন্দাজ ভুল ছিল না। এর একমাস পরই অন্যদের বাদ দিয়ে আমাদের মধ্য থেকে মাত্র ৩০ জনের বিরুদ্ধে আরও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে বিচার শুরু করা হল।

১৯৫৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মাঝরাতে একটা মিটিং থেকে বাড়ি ফিরে দেখি উইনি প্রসব বেদনায় ছটফট করছে। ওকে নিয়ে ঝটপট বারাগওয়ানাথ হাসপাতালে ছুটলাম। কিন্তু ডাক্তাররা বললেন, বাচ্চা হতে আরও কয়েক ঘণ্টা দেরি হবে। ওদিকে সকাল হতেই আমাকে হাজিরা দেওয়ার জন্য প্রেটোরিয়া ছুটতে হল। দিন শেষে ফিরে এসে দেখি একটা ফুটফুটে কন্যা সন্তান হয়েছে। মা-মেয়ে দুজনই ভালো আছে। চিফ এমডিঞ্জি নামে আমার এক আত্মীয় ছিলেন। তিনি আমার মেয়ের নাম রাখলেন, 'জেনানী'।

৩০

কেপ শহরে শ্বেতাঙ্গ নেতা জ্যান ভান রিবিকস্'র অবতরণ দিবসের কথা মাথায় নিয়েই ১৯৫৯ সালের ৬ এপ্রিল এএনসির প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে নতুন একটি আফ্রিকান সংগঠনের জন্ম হয়। দলের নাম হয় প্যান আফ্রিকানিস্ট কংগ্রেস (পিএসি)। সারাদেশ থেকে মাত্র কয়েক'শ লোক অরল্যান্ডো কম্যুনাল হলে জড়ো হয়ে এ রাজনৈতিক দলের যাত্রা শুরুর ঘোষণা দেয়। ১৫ বছর আগে সংগ্রামী ভাবাদর্শ নিয়ে আমরা যে ইয়ূথলীগের জন্ম দিয়েছিলাম পিএসি সেই আদলে প্রতিষ্ঠিত হল। তাদের ইসতেহারে বলা হল, 'আফ্রিকা শুধুই আফ্রিকানদের। এখানে আগত শ্বেতাঙ্গ, ভারতীয় অথবা নিগ্রো কারুরই এদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তারা বললেন, তারা এমন একটি সরকার গড়তে চান যেটি আফ্রিকানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, আফ্রিকানদের

পরিচালিত এক আফ্রিকানদের সরকার। এ দলের প্রেসিডেন্ট হলেন রবার্ট সোবুকবি এবং সেক্রেটারি হলেন পোটল্যাকো লেবালো।

এরা দুজনই সাবেক ইয়ুথলীগ নেতা। মারমুখী মনোভাবের জন্য এরা বরাবরই পরিচিত ছিলেন। দলীয় আইন ভঙ্গ করার জন্য সোবুকবিকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

উদ্বোধনী ভাষণেই তারা এএনসির তীব্র সমালোচনা করলেন। এএনসি আফ্রিকানদের চেয়ে কম্যুনিস্টদের স্বার্থ-রক্ষার জন্যই বেশি তৎপর থাকে বলে তারা অভিযোগ করলেন।

এএনসির মূলনীতিতে ভারতীয়, নিগ্রো অথবা কম্যুনিস্ট শ্বেতাঙ্গদের সংগে ওঠা বসা বা তাদের সংগে জোটবদ্ধ আন্দোলনে কোন বাধা ছিল না। এএনসি মনে করত ন্যাশনালিস্ট ও বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গদের উৎখাতে সবাই এক ছাতার তলে আসতে পারে। কিন্তু নতুন এ সংগঠনটি ঘোষণা দিল আফ্রিকান বাদে এখানে যারা আছে তারা সবাই এলিয়েন, তুচ্ছ। এখানকার রাজনীতিতে তাদের কোন অধিকার নেই। এ সংগঠনটি বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিল। সমাজতন্ত্র বিরোধী হওয়ায় পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম ও আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে উঠেছিল পিএসি। এমনকি ক্ষমতাসীন ন্যাশনালিস্ট পার্টিও এএনসি এবং কম্যুনিজম বিরোধীতার জন্য দলটিকে মৌন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল।

সমর্থন দেবার মূল কারণ হলো আমরা যখনই কোন কর্মসূচী দিতাম তখনই পিএসি আফ্রিকানদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করতো। আমরা যখন আফ্রিকানদের অন্যদের সংগে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে বলতাম তখন তারা তাদের মধ্যে দ্বিধা ঢুকিয়ে দিত। তবে আমি একটা ব্যাপারে খুবই আশাবাদী ছিলাম আমি বিশ্বাস করতাম পিএসি যারা গঠন করেছে তারা এএনসির সাবেক নেতা। এখন আমাদের সংগে যতই বিরোধ থাকুক; একদিন ঠিকই তারা আমাদের সংগে মিশে যাবে।

পিএসির উদ্বোধনী সম্মেলনের পরদিন আমি সোবুকবির বাসায় গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানালাম। তার কাছে তাদের দলের সংবিধান এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেওয়া তার ভাষণের একটা কপি চাইলাম। কিন্তু সে দিতে রাজি হল না। বললো এসব কাগজপত্র তার কাছে নেই। এরপরই আমি পোটল্যাকো লেবালোর সংগে দেখা করে ওগুলো চাইলাম। সেও একইভাবে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে বললো, 'ম্যান্ডেলা, ওগুলো তোমার হাতে দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ এসব দিয়েই তুমি আমাদের আক্রমণ করবে।' আমার সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করার জন্য আমি তাকে ভৎর্সনা করতেই তার মন নরম হয়ে গেল। আমি যা যা চেয়েছিলাম সব সে আমার হাতে তুলে দিল।

৩১

১৯৫৯ সালে পার্লামেন্টে আলাদা আলাদা সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আলাদা বাসভূমি নির্ধারণ করার জন্য প্রোমোশন অব বান্টু সেলফ্ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট নামে নতুন একটি কালো আইন পাশ করে। সরকার জাতিভেদের যে বৃহত্তর পরিকল্পনা করেছিল এ আইন ছিল সেটির অন্যতম ভিত্তি। প্রায় একই সময় সরকার শিক্ষা বিষয়ক আরেকটি আইন পাশ করে। সেটি হল ইউনিভার্সিটি এডুকেশন অ্যাক্ট। এ আইনের মাধ্যমে বর্ণবাদমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। অর্থাৎ অশ্বেতাঙ্গরা আর যাতে শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে না পারে সে ব্যবস্থা করা হয়। বান্টু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের মন্ত্রী ওয়েট নেল ঘোষণা করেন এখন থেকে যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ভুক্ত তাকে সেই সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত এলাকার নাগরিকত্ব নিতে হবে। অর্থাৎ আফ্রিকানদের কেউ কখনও হোয়াইট কম্যুনিটির ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না। সেলফ গভর্ণমেন্ট পলিসি অনুযায়ী আফ্রিকানদের জন্য অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ লোকের জন্য জমি বরাদ্দ হল মোট জমির মাত্র ১৩ শতাংশ।

আফ্রিকানদের দুই তৃতীয়াংশ লোক তথাকথিত শ্বেতাঙ্গ এরিয়ার কাছে বাস করত। তাদেরকেও স্ব স্ব উপজাতিয় এলাকার নাগরিক বলে গণ্য করা হল। এতে একদিকে তাদের নাগরিক সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হল। অন্যদিকে বহু দিন আগে এলাকা ছেড়ে চলে আসার কারণে সেখানে ফিরে যাওয়াও সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু সেখানে বাস না করেও সেখানকার ট্যাক্স দিতে হবে বলে সরকারি আদেশ হল। এই আইনের প্রয়োগ করতে গিয়ে সরকার চরম উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড চালানো শুরু করল। বহু জায়গায় এর বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। জিরুস্ট এবং সেখুখুনেল্যান্ড তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। থেম্বুল্যান্ড, জুলুল্যান্ড, পূর্ব পোডেল্যান্ড; সবখানেই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। যে সমস্ত স্থানীয় গোত্রপতি, নেতা, ও সরকারি কর্মচারী এ কালো আইনকে সমর্থন করেছিল তাদের বিরুদ্ধে জনগণ বিক্ষোভ করছিল। এএনসির তাতে পূর্ণ সমর্থন ছিল।

ট্রান্সকেই এবং অরল্যান্ডো থেকে অসংখ্য লোক আমার কাছে এসে অভিযোগ করল যে সেখানকার গোত্র সর্দাররা অর্থের লোভে সরকারের সংগে আঁতাত করছে। এতে সবচেয়ে সমস্যায় পড়ল উইনি। তার বাবা তখন মাতানজিমার কাউন্সিলে চাকরি করতেন। স্বাভাবিকভাবেই তাকে সরকার পক্ষকে সমর্থন করতে হল।

উইনি তার বাবাকে খুব ভালবাসতো। কিন্তু সে বাবার মতকে সমর্থন করতে পারছিল না। অন্যদিকে আমার কাছেও সে বিব্রত বোধ করছিল। কিন্তু সর্বোপরি তার মধ্যে আদর্শিক স্পৃহা ছিল অনড়। তার সে দৃঢ় মানসিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

৩২

আমরা প্রথমবার গ্রেফতার হওয়ার ২ বছর ৮ মাস পরে প্রেটোরিয়ার বিশেষ আদালতে মামলা স্থানান্তর করা হল। ১৯৫৯ সালের ৩ আগস্ট প্রথমবারের মতো প্রেটোরিয়ার আদালতে বিচার শুরু হল। আমরা আগের মতোই নিজেদের নির্দোষ দাবি করে আত্মপক্ষ সমর্থন করলাম। আমাদের প্রধান কৌসূলি ছিলেন ইসরাইল মাইসেলস্। তার সহযোগী ছিলেন সিডনি কেনট্রিজ, ব্রাম ফিশার এবং ভার্নোন বেরেঞ্জে। ১১ অক্টোবর সকালবেলা আমরা যখন আদালতে হাজির হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন হঠাৎ রেডিওর খবরে শুনলাম সরকারি কৌসূলি ওসওয়াল্ড পিরো হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তার মৃত্যুতে আমাদের দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছিল। কিন্তু তার মৃত্যুতে আমাদের উপকার হয়েছিল একথা স্বীকার করতেই হবে। পিরো ছিলেন কট্টর ন্যাশনালিস্ট। আইনজীবী হিসেবেও তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন। তিনি সরকারি কৌসূলি হিসেবে কাজ শুরু করার পরই আমাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগুলো জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছিল। এ কারণে পিরোর মৃত্যু আমাদের জন্য আশার আলো হয়ে দেখা দিয়েছিল।

৩৩

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে ডারবানে এএনসি বার্ষিক সম্মেলন হয়েছিল। ওই সময় সেখানে পাশ বিরোধী বিক্ষোভ চলছিল। ওই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল পরবর্তী ৩১ মার্চ দেশব্যাপী অ্যান্টি-পাশ আন্দোলন শুরু করা হবে এবং ২৬ জুন গণহারে জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাশ আগুনে পোড়ানো হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুত সমস্ত কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল। ৩১ মার্চের আগেই আমাদের সকল আঞ্চলিক শাখায় আন্দোলন কর্মসূচীর কথা জানিয়ে দেওয়া হল। কলকারখানা, রাস্তাঘাট সর্বত্র এএনসি কর্মীরা পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার ছড়িয়ে দিল। দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগলো দেশের অবস্থা ততই থমথমে হতে লাগলো। সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো আইন ভঙ্গের ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। কঠোরভাবে দমন করা হবে। আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য জায়গায় আগেই বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঘানায় এনকুরমা সরাসরি স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৬০ সালের শুরুতেই আফ্রিকার সাবেক ঔপনিবেশিক এলাকাগুলো স্বাধীন হওয়ার প্রক্রিয়ায় চলে এলো।

১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্টে দেওয়া ভাষণে তিনি বললেন, 'আফ্রিকায় এখন পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে।'

ওই সময় পিএসি'র অবস্থা খুব খারাপ। তাদের সমর্থকরা যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিল। এএনসি পাশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করার পর, তাদেরও কিছু করা দরকার বলে তাদের মনে হল। আমরা এএনসির পক্ষ থেকে তাদের আমাদের আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। কিন্তু তারা আমাদের সংগে আন্দোলন না করে আলাদা কর্মসূচী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা ২১ মার্চ, অর্থাৎ আমাদের ঘোষিত কর্মসূচীর ১০ দিন আগে আলাদাভাবে পাশবিরোধী কর্মসূচীর ঘোষণা দিলেন। এ সিদ্ধান্তের জন্য তারা কোন সম্মেলন করলেন না। নিতান্ত সাদামাটাভাবে তারা এ কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল শত্রুকে পরাজিত করা নয় বরং আমাদের কর্মসূচীকে ম্লান করে দেওয়া।

২১ মার্চ সকাল বেলা পিএসি নেতা সোবুকবি কয়েকজন নেতাকে সংগে নিয়ে অরল্যান্ডো পুলিশ স্টেশনে ঢুকে স্বেচ্ছায় গ্রেফতার হলেন। তবে ওইদিন তাদের ধর্মঘটের ডাকে তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। জনগণ স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে গেল। সোবুকবিকে আদালতে হাজির করা হলে তিনি কোন আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। তার ধারণা ছিল তাকে দুতিন সপ্তাহের কারাদণ্ড দেওয়া হবে। কিন্তু আইন ভঙ্গের দায়ে তার ৩ বছরের কারাদণ্ড দিল আদালত।

৩১ মার্চ জোহান্সবার্গে এএনসির কর্মসূচী খুব একটা সফল হয়নি। ডারবান, পোর্ট এলিজাবেথ ও ইস্ট লন্ডনে বিক্ষোভ প্রায় হলই না। কিন্তু ইভাটন ও কেপটাউনে তুমুল বিক্ষোভ হল। কেপটাউনের লাঙ্গায় বিক্ষোভের সময় দুজন বিক্ষোভকারী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

জোহান্সবার্গের ৩৫ মাইল দক্ষিণের ছোট্ট শহুরে পল্লী শার্পেভিলেতে পিএসির সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ছিল। সেখানে পিএসির কয়েক হাজার সমর্থক তাদের নেতার মুক্তির দাবিতে পুলিশ স্টেশনের বাইরে বিক্ষোভ করে। কিন্তু ওই দিন পুলিশ বিনা উস্কানিতে তাদের ওপর বৃষ্টির মতো গুলি চালায়। এতে ৬৯ জন আফ্রিকান মারা যায়। আহত হয় কয়েকশ লোক। এটি ছিল প্রকাশ্য গণহত্যা। নিহতদের মধ্যে বহু নারী ও শিশু ছিল। এই ঘটনার পরদিন সারা পৃথিবীর সমস্ত নিউজপেপারের প্রথম পৃষ্ঠায় নিহতদের ছবি ছাপা হয়েছিল।

শার্পভিলের এই ঘটনা পিএসির জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। পিএসি কর্মীদের ওপর এই হত্যাযজ্ঞে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। আমেরিকা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। পুরো দক্ষিণ আফ্রিকা

বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় কম্যুনিস্টদের চক্রান্তে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

পিএসি কর্মীদের ওপর গুলি চালানোর ঘটনায় আমাদের অর্থাৎ এএনসির পক্ষ থেকে তাদের সমর্থনে কিছু একটা করা উচিত বলে মনে করলাম। ২৬ মার্চ আমাদের নেতা চিফ লুথুলি পুলিশ ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে তার পাশ আগুনে পোড়ালেন আমাদেরও তা পুড়িয়ে ফেলতে বললেন। তিনি ওই ঘটনার প্রতিবাদে ২৮ মার্চ জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করলেন এবং ওইদিন সবাইকে কাজে না যাওয়ার আহ্বান জানালেন। অরল্যান্ডোতে গিয়ে আমি আর দ্যুমা নোকবি সাংবাদিকদের সামনে আমাদের পাশ পুড়িয়ে ফেললাম।

দু'দিন পর; অর্থাৎ ২৮ মার্চ চিফ লুথুলির আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার লোক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। কেপটাউনে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি লোক বিক্ষোভে জড়ো হল। বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। আফ্রিকানদের রোষানলে পড়ার ভয়ে অনেক শ্বেতাঙ্গ ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় সরে পড়তে বাধ্য হল। সরকার তাৎক্ষণিকভাবে সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করল। দেশে সব ধরণের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হল। দক্ষিণ আফ্রিকা সামরিক শাসনের আওতায় চলে গেল।

৩৪

৩০ মার্চ রাত দেড়টায় ঘরের দরজায় দড়াম দড়াম করে করাঘাতের আওয়াজ হল। বুঝলাম সময় হয়ে গেছে। পুলিশ এসেছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দরজা খুলে দেখলাম হাফডজন পুলিশ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তারা কোন কথা না বলে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল। আতিপাতি করে ঘরে তল্লাশি চালালো। ঘরে থাকা সব ধরণের কাগজপত্র গুছিয়ে নিল। তারা আমাকে কোন ওয়ারেন্ট অর্ডার দেখালো না। আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাও আমার স্ত্রীকে তারা জানালো না। আমি উইনির দিকে চেয়ে শুধু একবার মাথা ঝোকালাম। তারপর তাদের সংগে বেরিয়ে গেলাম।

৩০ মিনিটের মধ্যে নিউল্যান্ডস পুলিশ স্টেশনে আমাকে নিয়ে আসা হল। সোফিয়া টাউনের মধ্যে পড়েছে এ এলাকাটি। থানার মধ্যে চারদিকে দেয়াল ঘেরা ছাদশূন্য একটা ফাঁকা জায়গায় আমাকে নিয়ে আসা হল। সেখানে এসে দেখলাম আমার অনেক সহযোদ্ধা সেখানে রয়েছে। আরও এক একজন করে ধরে আনা হচ্ছে। সকাল হতে হতে জনা চল্লিশেক নেতাকর্মীকে সেখানে নিয়ে আসা হল। সেখানে আমাদের কোন খাবার, কম্বল, আলো কিছুই দেওয়া হয়নি।

জায়গাটা এত ছোট ছিল যে বসা তো দূরের কথা দাঁড়িয়ে থাকাও আমাদের জন্য কষ্টকর মনে হচ্ছিল।

সকাল সোয়া সাতটার সময় আমাদের ছোট একটা সেলের মধ্যে ঢোকানো হল। সেখানে একটা দূর্গন্ধযুক্ত ড্রেন ছিল। সেখানেই বাথরুম সারতে হল। সেলের মধ্যে আমাদের খাবার না দিয়ে আটকে রাখা হল। সকাল ১১টা নাগাদ কোন খাবার দেওয়া হল না। আমরা খাবারের জন্য চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলাম। কোন কাজ হল না। সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম দরজা খোলার পর আমরা খাবার না দেওয়া পর্যন্ত আর সেলের মধ্যে ঢুকবো না।

বারটার দিকে সেলের দরজা খোলার সংগে সংগে সবাই হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলাম। আমাদের মারমুখী চেহারা দেখে কর্তব্যরত পুলিশ ভয় পেয়ে গেল। তারা গিয়ে অফিসারকে জানাতেই একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার এসে বললেন, 'সবাই ভেতরে ঢোকো। না ঢুকলে এক্ষুণি পঞ্চাশজন পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে তোমাদের সবার মাথা ফাটিয়ে দেবো।' বুঝলাম শার্পভিলেতে যারা ওইভাবে গণহত্যা চালাতে পেরেছে তাদের পক্ষে এটা করা অসম্ভব কিছু হবে না।

বিকেল ৩টার দিকে খাবার এলো। খাবার বলতে শুকনো রুটি জাতীয় খাবার। সাথে কিছু নেই। আমরা নোংরা হাতেই সেগুলো অমৃত মনে করে খেয়ে নিলাম। খাবার শেষ করে সেলের ভেতরেই একটা কমিটি গঠন করলাম। এই কমিটি বন্দীদের প্রতিনিধিত্ব করবে। তিনসদস্য বিশিষ্ট ওই কমিটিতে আমাকে মুখপাত্র করা হল। আমরা কারাকর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের মুক্তির আবেদন জানিয়ে বললাম, 'যেহেতু আমাদের বিরুদ্ধে কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা নেই সেহেতু আমাদের ছেড়ে দেওয়া হোক।'

আমাদের সে আবেদনে কোন কাজ হল বলে মনে হল না। সন্ধ্যা ৬ টায় আমাদের শোয়ার জন্য মাদুর এবং গায়ে দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড দূর্গন্ধ ও ছারপোকায় ভরা কম্বল পাঠানো হল। মাঝরাতে সবাইকে জানানো হল কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ডাকা হবে। কেউ কেউ শুনে খুশি হল। তাদের ধারণা ছিল আমাদের বোধহয় ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল ভুল।

প্রথমেই আমাকে ডাকা হল। সেল থেকে বেরিয়ে একদল পুলিশের সামনে যাওয়ার পর একজন অফিসার চিৎকার করে বললো, 'নাম?'

আমি বললাম, 'ম্যান্ডেলা।'

অফিসারটি বললো, 'নেলসন ম্যান্ডেলা, জরুরি আইনের বিধি অনুযায়ী আমি আপনাকে গ্রেফতার করছি।' এতক্ষণে আমাদের ডাকার মাহাত্ম্য বুঝতে পারলাম। তারা আমাদের এখানে বেআইনিভাবে ধরে এনে এখন আইনের আওতায় পুনরায় গ্রেফতার করছে।

আমাদের আবার গ্রেফতার করে সোজা প্রেটোরিয়া জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হল। বলা হল প্রেটোরিয়ার আদালতে চলমান রাষ্ট্রদোহীতার মামলার আসামী হিসেবেই আমাদের সেখানে রাখা হবে।

৩৫

ইতিমধ্যে ৩১ মার্চ আমরা যখন কারাগারে আটক তখন আমাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেদিন সাক্ষীদের কাঠগড়া ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা। ওইদিন চিফ লুথুলির জবানবন্দী নেওয়ার কথা ছিল। তিনি অনুপস্থিত থাকায় বিচারপতি রাম্ফ খুবই বিরক্ত হলেন এবং বললেন সরকারের কারণে বিচারকাজ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে না। তিনি আদালত মুলতবি করে ওইদিনই লুথুলিকে পরবর্তী সেশনে হাজির করার নির্দেশ দিলেন।

পরে আমরা জেনেছিলাম চিফ লুথুলির ওপর তারা নির্যাতন চালিয়েছিল। এটা কেউ মেনে নিতে পারছিলাম না। তার মতো একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীন ও একনিষ্ঠ ধার্মিক মানুষের গায়ে যারা হাত তুলেছে তারা তার জুতোর ফিতে বাঁধারও যোগ্য ছিল না।

পরবর্তী সেশনে আমাদেরও হাজির করা হল। কিন্তু লুথুলিকে আনা হল না। আদালতকে বলা হল তিনি অসুস্থ। তাকে আনা সম্ভব হবে না। বিচারক সেদিনের মতো আদালত মুলতবি করলেন। আমরা ভেবেছিলাম সেদিন আমরা জামিনে বাড়ি ফিরতে পারব। কিন্তু আমরা আদালত থেকে বেরুনোর পর আবার আমাদের গ্রেফতার করা হল। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে উইলটন এমকাওয়ি এবার আর পুলিশের হাতে ধরা দিল না। সে সেখান থেকে পালিয়ে চলে গেল। পরে এমকাওয়ি দেশ ছেড়ে গোপনে চীন চলে যায় এবং সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়।

ওই রাতে ট্রান্সভালের অন্য প্রান্ত থেকে গ্রেফতার করে আনা অন্য নেতাদের সংগে আমাদের দেখা হল। ওই সময় বিনা পরোয়ানায় দেশব্যাপী নেতাকর্মীদের ধরপাকড় শুরু হয়েছিল। ৮ এপ্রিল এএনসি এবং পিএসিকে সরকারের পক্ষ

থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। অর্থাৎ এখন থেকে আমরা সবাই আউট ল' হিসেবে ঘোষিত হলাম। এই সময়টাতে অলিভার জেলের বাইরে ছিল। সে দ্রুত দেশ ছাড়লো যাতে জরুরি অবস্থা চলাকালীন সে দেশের বাইরে থেকে তৎপরতা চালাতে পারে। অলিভার যাওয়ার আগে হাইমি ডেভিডফ নামে একজন অ্যাটর্নিকে ঠিক করে দিয়ে গেল। আমরা যে অফিসারের তত্ত্বাবধানে ছিলাম সেই কর্নেল ডেভিডফ একটি বিশেষ আবেদন জানিয়ে আমাকে একদিনের জন্য জোহান্সবার্গ যেতে দেওয়ার অনুমতি চাইলেন। আমাদের ফার্মের হিসাবপত্র বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এই আবেদন জানানো হয়েছিল। সার্জেন্ট ক্রুজার আমাকে জোহান্সবার্গ নিয়ে আসলেন। ওই অফিসারটি বরাবরই আমার সংগে ভালো ব্যবহার করেছিলেন।

৩৬

২৫ এপ্রিল, আমাদের শুনানি পুনরায় শুরু হওয়ার একদিন আগে ইসরাইল মাইসেলস্ আমাদের সবাইকে ডেকে বললেন জরুরি অবস্থার মধ্যে আমাদের মামলায় খুবই খারাপ প্রভাব পড়বে। খারাপ প্রভাব যে পড়বে তা আমরাও জানতাম। জরুরি অবস্থা জারির পর আমাদের উকিলদের আমাদের সংগে ঠিক মতো দেখা করতে দেওয়া হচ্ছিল না। কথা বলতে দেওয়া হচ্ছিল না। এ অবস্থায় ঠিক করলাম, আমরা আমাদের আইনজীবী প্রত্যাহার করে নেব। আত্মপক্ষ সমর্থনে আমরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন অ্যাডভোকেট হিসেবে আদালতে যুক্তিতর্ক তুলে ধরবো। কথামতো ২৬ এপ্রিল অ্যাডভোকেট হিসেবে আমাদের মধ্য থেকে দ্যুমা আদালতে কথা বলতে দাঁড়ালেন। বিচারকরা অবশ্য আমাদের আগেই বলেছিলেন যে এ ধরণের কাজ করা আমাদের জন্য বড় ধরণের ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা তাদের কথা না শুনে নিজেরাই মামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিজেরা মামলা চালাবো। মামলার যে গতি তাতে তা শেষ হতে অনেক সময় লাগবে ভেবে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমাদের মোট ২৮ জনের জবানবন্দী নেওয়ার কথা ছিল। জবানবন্দী নেওয়া শেষ হতেই কয়েক মাস লেগে যাবে বলে আন্দাজ করেছিলাম।

৩ আগস্ট আমার জবানবন্দী নেওয়া শুরু হল। আমি আমার জবানবন্দীতে সরকারের তীব্র সমালোচনা করলাম। আমি বললাম কম্যুনিস্ট পার্টির সংগে কোন সংশ্লিষ্টতা না থাকা সত্ত্বেও সরকারি অভিযোগ আমাকে কম্যুনিস্ট হিসেবে

দেখানো হয়েছে। বহুদিন পর আদালতে কথা বলতে পারার সুযোগ পেয়ে আমি একটানা প্রায় ১ ঘণ্টা বক্তব্য রাখলাম।

আগস্ট মাসের শেষ দিনে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হল। টানা পাঁচ মাস পর জেল থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে প্রেটোরিয়া থেকে বাড়ি ফিরে এলাম। বিচার শেষ হতে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর আরও নয় মাস সময় লেগেছিল।

৩৭

জরুরি অবস্থা উঠে যাওয়ার পর সেপ্টেম্বরের ভবিষ্যত করণীয় ঠিক করতে গোপন বৈঠক করি। বিচার চলাকালীন জেলখানায় বসে আমরা বেশ কয়েকবার আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু সেগুলো ছিল অনানুষ্ঠানিক বৈঠক। নিষিদ্ধ হওয়ার পর গোপনে মিলিত হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আমাদের পেছনে সরকারের সার্বক্ষণিক নজর ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা মাঝে মাঝে জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গোপন বৈঠক করতাম। এক বৈঠকে আমাদের ইয়ূথলীগ এবং উইমেন লীগ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

অবশ্য দলের অনেকেই এতে আপত্তি জানিয়েছিল কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রয়োজনে আমরা এ সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম।

এ সময়টাতে আমি রাজনীতিতে নিষিদ্ধ থাকলেও আমার ওকালতি করার অনুমতি ছিল। জামিনে থাকা অবস্থায় আমি সময় সুযোগ মতো প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের ল' ফার্ম 'ম্যান্ডেলা অ্যান্ড ট্যাম্বো' অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার অনেক সহকর্মীই তাদের অফিস ব্যবহারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু আমি বেশিরভাগ সময়ই থাকতাম আহমেদ কাদরাদার খোলভাদ হাউসের ১৩ নম্বর ফ্ল্যাটে। কোর্টে নিয়মিত যেতে না পারলেও আইনজীবী হিসেবে তখনও আমার খ্যাতি ম্লান হয়নি। আমার খোঁজে দলে দলে মক্কেলরা কাদরাদার ঘরে এসে উঠতো। ক্যাথি (কাদরাদা) প্রায়ই অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখতো তার ঘরভর্তি লোকজন। একমাত্র রান্নাঘর ছাড়া তার একা নিঃশ্বাস ফেলার কোন জায়গা নেই।

এই সময়টাতে আমি পরিবারকে সময় দেওয়া তো দূরের কথা ঠিকমতো নাওয়া-খাওয়ারও সময় পেতাম না। আমাদের প্রেটোরিয়ার মামলার কাগজপত্র ঠিকঠাক করা এবং অন্য মক্কেলদের মামলার কাজ করার পেছনে রাত দিন কেটে যেতো। ঠিক এমন একটি সময়ে উইনি ছিল গর্ভবতী এবং একই সংগে নানা রোগে

আক্রান্ত। সন্তান প্রসবের সময় সে আমাকে হাসপাতালে তার শয্যাপাশে চেয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটাও হয়নি।

১৯৬০ সালে বড়দিনের ছুটির সময় আদালত কিছুদিন মুলতবি ছিল। হঠাৎ শুনলাম ট্রান্সকেইতে আবাসিক স্কুলে অধ্যয়নরত আমার ছেলে মাকাগাথো প্রচণ্ড অসুস্থ। আমার তখন সরকারি অনুমতি ছাড়া জোহান্সবার্গের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু আমি সে নিষেধাজ্ঞা না মেনে সারারাত গাড়ি চালিয়ে ট্রান্সকেইতে পৌঁছলাম। তার দ্রুত অপারেশন করার দরকার ছিল। এজন্য তাকে নিয়ে ওই রাতেই আবার জোহান্সবার্গ রওনা দিলাম। জোহান্সবার্গ পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। আমি মাকাগাথোকে তার মায়ের (ইভেলিন) কাছে রেখে উইনিকে দেখতে হাসপাতালে ছুটলাম।

হাসপাতালে এসে শুনি উইনি একটা কন্যা সন্তান প্রসব করেছে। বাচ্চা নিয়ে সে ইতিমধ্যেই বাসায় চলে গেছে। বাচ্চা ভালো আছে। তবে উইনি খুবই দূর্বল হয়ে পড়েছে।

আমরা আমাদের এই নতুন কন্যাটির নাম রাখলাম জিনদিশওয়া। বিখ্যাত ঝোসা সম্প্রদায়ের কবি স্যামুয়েল এমখাওয়ির মেয়ের নামানুসারে এ নাম রেখেছিলাম। হিল্ডটাউনে থাকতে ছোটবেলায় এই কবির কবিতা শুনে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম। একটি মজার ঘটনা থেকে তিনি তার মেয়ের নামকরণ করেছিলেন।

শোনা যায় কবি স্যামুয়েল এমখাওয়ি প্রায় বছরখানেক সংসার ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলেন। যখন বাড়িতে ফিরলেন তখন শুনলেন তার স্ত্রীর একটি কন্যা সন্তান হয়েছে। তিনি যখন বাড়ি ছাড়েন তখন তার স্ত্রী যে গর্ভবতী ছিলেন তা তিনি জানতেন না। এ কারণে তার ধারণা হল এ সন্তানের জন্মদাতা অন্য কেউ; তিনি নন। আফ্রিকান ঐতিহ্য অনুযায়ী কোন মহিলার বাচ্চা হলে তার স্বামী ১০ দিন আতুঁড় ঘরে ঢোকে না। কিন্তু কবি এতই ক্রুদ্ধ ছিলেন যে তিনি একটা হাঁসুয়া নিয়ে স্ত্রী ও নবজাতককে হত্যা করার জন্য ঘরে ঢুকলেন।

কিন্তু তিনি যখন নবজাতকের দিকে তাকালেন তখন তিনি থমকে গেলেন। দেখলেন শিশুটির মুখে অবিকল তার নিজের চেহারা ভাসছে। তিনি তখন অস্ফুটে বললেন, *'উ জিনজিলে!'* (তুমি ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে)। এর স্ত্রী বাচক শব্দ হিসেবে তিনি কন্যার নাম রাখলেন *জিনজিশওয়া*।

৩৮

চূড়ান্ত যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে সরকার এক মাসের বেশি সময় লাগিয়ে দিল। মার্চ মাসে আমাদের পালা শুরু হল। মামলায় আমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ আনা হয়েছিল। আমাদের কৌসুলি ইসরাইল মাইসেলস বললেন, 'আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি আমরা অসহযোগ ও পরোক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন করেছিলাম। সরকার আমাদের এ কাজকেই সহিংসতা ছড়ানোর তৎপরতা বলতে চাইছে। কিন্তু আমরা বলতে চাই আমাদের এ কার্যক্রম মোটেও অসাংবিধানিক নয়। খোদ সংবিধানেই এর বৈধতা দেওয়া হয়েছে। আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি আদালত যদি অসহযোগ আন্দোলনকে রাষ্ট্রদ্রোহীতা হিসেবে সাব্যস্ত করেন তাহলে আমরা আমাদের দোষ স্বীকার করে নেব।

২৩ মার্চ আবার আদালত মুলতবি হল। বলা হল ৬ দিন পর আবার কোর্ট খুলবে।

আদালত যেদিন মুলতবি হল তার দুদিন পরই আমার ওপর সরকারের চলাচল সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার কথা। আমি ভালো করেই জানতাম আমার নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ার ব্যাপারে পুলিশ ভালোভাবেই জ্ঞাত রয়েছে।

ওই সপ্তাহের শেষ দিকে আমার পিটারমারিৎসবার্গে এক গোপন সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার কথা ছিল। সম্মেলন শুরু হওয়ার আগের রাতে আমি ৩ শ' মাইল গাড়ি চালিয়ে সেখানে পৌঁছলাম। আমি জানতাম পুলিশ আমার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রেখেছে। তাই রাতেই সেখানে পৌঁছতে হল। পিটারমারিৎসবার্গ যাওয়ার আগের দিন এক্সিকিউটিভ মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হল রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলায় যদি আমাদের সাজা হয় তাহলে আমরা কারাবরণ করব আর যদি মুক্তি পাই সেক্ষেত্রে আমিসহ কিছু নেতা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাবো। গোপনে তৎপরতা বৃদ্ধি করব। দ্বিতীয়বার আর ধরা পড়ব না। উইনি আমার সিদ্ধান্ত বুঝতে পেরেছিল। সে নিজে খুব শক্ত মনের মেয়ে হলেও শিগগিরই আমাদের একজনের সংগে অন্যজনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে আঁচ করতে পেরে সে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল।

৩৯

১৯৬১ সালের ২০ মার্চ। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রায় ঘোষণা হবে আজ। প্রেটোরিয়ার আদালত খোলার আগেই ভোর থেকে সেখানে হাজার হাজার কর্মী সমর্থক, সাংবাদিক এসে জড়ো হয়েছিল। বিচারকরা যখন এজলাসে আসলেন তখন আদালত কক্ষে মানুষের দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। বিচারপতি রাম্ফ সবাইকে থামতে বললেন। তিনি বললেন, মামলার রায় এক্ষুণি ঘোষণা করা হবে। এতক্ষণ আদালত কক্ষে হইচই হচ্ছিল। তার কথায় সবাই চুপ করে গেল। রাম্ফ চল্লিশ মিনিট ধরে তার ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন। উপসংহারে বললেন, 'এএনসি চলমান সরকারের পতন চায় একথা সত্য; এএনসি ডেফিয়্যান্স ক্যাম্পেইনের সময় অনেক অবৈধ পন্থায় বিক্ষোভ করেছে একথা সত্য; এএনসির মূলনীতির মধ্যে বামপন্থি মতবাদের নির্যাস রয়েছে এটাও সত্য। তবে সরকারের অভিযোগ মতে এএনসি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ কারণে আদালত আসামীদের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিচ্ছে এবং মামলাটিকে খারিজ করে দিচ্ছে।'

এ ঘোষণা হওয়ার পর আদালত চত্বর নেতাকর্মীদের উল্লাসধ্বনিতে যেন ফেটে পড়েছিল। আমরা আনন্দ প্রকাশের ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম। উইনি সেদিন আমার পাশে ছিল। আমি তাকে আনন্দে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরেছিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কালো পিম্পারনেল ফুল

৪০

মুক্তি পাওয়ার পর আমি বাড়িতে ফিরে আসিনি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আমার সঙ্গীরা খুশিতে গদগদ হলেও আমি ছিলাম বেশ সতর্ক। আমি জানতাম কর্তৃপক্ষ যে কোন মুহূর্তে আমার ওপর আঘাত হানতে পারে। আমাকে ফের গ্রেফতার বা নিষিদ্ধ করতে পারে। তাদের আমি সে সুযোগ দিতে চাইনি। এ জন্য জোহান্সবার্গের একটি নিরাপদ বাড়িতে রাতটা পার করি। সারারাত ঘুম আসেনি। বিছানায় ছটফট করি। গাড়ির শব্দ শুনলেই পুলিশের গাড়ি ভেবে ভেতরটা কেঁপে উঠত।

ওয়াল্টার ও ডুমা এ যাত্রায় ছিলেন আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তারা আমাকে পোর্ট এলিজাবেথে নিয়ে যান। সেখানে গোভান এমবেকি ও রেমন্ড এমহলবার সঙ্গে দেখা হয়। আন্ডারগ্রাউন্ডে সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আলাপ করি। আমরা এ বৈঠকটি করেছিলাম ড. মাশলা প্যাথারের বাসায়। এজন্য ভদ্রলোককে পরবর্তীতে বেশ খেসারত দিতে হয়। বাড়িতে গোপন বৈঠক করতে দেয়ার কথিত অপরাধে তাকে দু'বছর জেল খাটতে হয়। স্বাধীনচেতা সংবাদপত্র পোর্ট এলিজাবেথ মর্নিং এর সম্পাদকের সঙ্গেও আমি দেখা করি।

আমাদের পক্ষে অন্যান্য পত্রিকার সমর্থন আদায়ের ব্যাপারে কিছু করার জন্য তাকে অনুরোধ জানাই। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে সম্মেলন করার জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছিলাম সেটি সার্থক করার জন্য ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন ছিল। সে ব্যাপারেও সম্পাদক সাহেবের সহায়তা চাই। পরে প্যাট্রিক ড্যানকানের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হই। তিনি স্বাধীনচেতা সাপ্তাহিক কনটাক্টের প্রকাশক ও সম্পাদক। লিবারেল পার্টির প্রতিষ্ঠিত সদস্য। তার পত্রিকায় প্রায়ই এএনসির নীতি-আদর্শের প্রচণ্ড সমালোচনা করা হত। আমাকে দেখার পর ড্যানকান বলেন, সরকারের রাজনৈতিক প্রতারণা ও সাজানো বিচারে তাকে ব্যথিত

করেছে। তিনি পত্রিকার নীতি পরিবর্তন করবেন। এএনসির সমালোচনা করা থেকে ভবিষ্যতে দূরে থাকবেন।

ওই রাতে আফ্রিকার খনি শহর কেপ টাউনে একটি প্রার্থনা সভায় আমি বক্তৃতা করি। সেখানে সরকারের একজন মন্ত্রীও ছিলেন। তিনি আমাদের গোপনে সহযোগিতা করতেন। দুঃসময়ে আমাদের সাহস ও শক্তির উৎস ছিলেন তিনি। প্রার্থনার চেয়ে ওই মন্ত্রীর মনোযোগ আমার দিকেই ছিল বেশি।

সকালে কেপটাউন ত্যাগ করলাম। এ সময় আমার সঙ্গী ছিলেন জর্জ পিক। তিনি সাউথ আফ্রিকান কালারড পিপলস অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এটি মিশ্রবর্ণের লোকদের একটি সংগঠন। হোটেল ছাড়ার আগে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলাম। ভালো সেবা যত্ন করার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি আমার ব্যাপারে বেশ কৌতুহলী ছিলেন। আমার গোপন পরিচয়ও উদ্ঘাটন করেছিলেন। তিনি বর্ণবাদ ও বর্তমান সরকার সম্পর্কে বেশ উদ্বেগের কথা জানালেন। বললেন, বর্তমান শ্বেতাঙ্গ সরকার যেভাবে তাদের শোষণ নির্যাতন করছেন ভবিষ্যতে আফ্রিকান সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তারাও তাদের সেভাবেই শোষণ করবে। তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ী। আফ্রিকানদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কম। এজন্য তার মধ্যে আফ্রিকানদের ব্যাপারে বেশ ভয় ছিল। এ ভয়টা কেপসহ অন্যান্য গোত্রের মধ্যেও ছিল। আমি তা দূর করে দিলাম।

আমাদের দলের স্বাধীনতা সনদটি সংক্ষেপে তার কাছে ব্যাখ্যা করলাম। বললাম, আমরা ক্ষমতায় গেলে বর্ণবাদের ধারেকাছেও ভীড়ব না। সবাইকে সমান সুযোগ দিব। সব বর্ণের গোত্র সমান সুযোগ পাবে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি কখনই বর্ণবাদকে সমর্থন করতে পারি না। সবার জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই আমরা লড়াই করেছি।

পরের দিন ডারবানে এএনসির জাতীয় নির্বাহী কমিটির গোপন বৈঠকে যোগ দেই। এ বৈঠকে দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। আন্দোলনের ব্যাপারে নানা ধরণের মতামত আসে। বাড়িতে অবস্থান করে গোপনে আন্দোলন করা হবে না কি সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেয়া হবে সে ব্যাপারে কথাবার্তা হয়। বাড়িতে অবস্থান-নীতি তথা গোপন আন্দোলনকারীদের নেতারা বলেন, ১৯৫০ সাল থেকে তারা এ পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছেন। এ পদ্ধতি আন্দোলনকে একটা স্থায়ী রূপ দিয়েছে।

এর মাধ্যমে অনেক সশস্ত্র স্বাধীনতা কর্মীও তৈরি হয়েছে। গোপনে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকলে এ ধরণের কর্মী সংখ্যা আরো বাড়বে। ভবিষ্যতে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রয়োজন হলে এদের কাজে লাগানো যাবে। এছাড়া প্রকাশ্যে ধর্মঘটের ডাক দিলে বা বিক্ষোভের আয়োজন করা হলে শাসকগোষ্ঠী গুলিবর্ষণ করতে পারে। এতে সংগঠনের সার্বিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা দিতে পারে। তাই গোপনেই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া উচিত।

আমি এ যুক্তির বিরোধীতা করলাম। বললাম, চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকার সময় এখন আর নেই। আমাদের শত্রুরা সক্রিয়। আমরা নীরব থাকলেও পেছন দিক থেকে তারা ঠিকই আমাদের আঘাত করবে। এছাড়া জনগণ এখন জীবনের তোয়াক্কা করে না। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত। রাজপথে আন্দোলন করার জন্য তারা অধৈর্য হয়ে পড়েছে। তাই সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দিয়ে প্রকাশ্যেই আন্দোলন শুরু করা উচিত।

কিন্তু নির্বাহী কমিটির সভায় আমার এ যুক্তি টিকল না। শেষে গোপনে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নেয়া হল।

আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করা অনেকটা ভূমিকম্পের সঙ্গে বসবাস করার মত। এর জন্য প্রয়োজন হয় প্রচণ্ড মানসিক শক্তির। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা আর কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাও থাকতে হয়। প্রতি মুহূর্তে কর্মকৌশল বদলাতে হয়। এ জগতে কোন কিছুকে সহজভাবে নেয়া যায় না। সবকিছুকে জটিলভাবে নিতে হয়।

নির্দেশিত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করতে হয় পদে পদে। এজন্য আন্ডারগ্রাউন্ডের জগত খুবই কষ্টের। সব সময় খাপ খাইয়ে চলাটা সম্ভবপর হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন কালো মানুষদের জন্য স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা ছিল খুবই কষ্টের। আইনের খড়্গ তাদের মাথার ওপর ঝুলে থাকত। ন্যায়-অন্যায়ের মারপ্যাচে পড়তে হত সব সময়। এজন্য অনেক কৃষ্ণাঙ্গকে সারা জীবন আন্ডারগ্রাউন্ডে কাটিয়ে দিতে হত।

আমি নিশাচর প্রাণীতে পরিণত হলাম। আমার বসবাস ছিল রাতের সঙ্গে। দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতাম। রাত হলে দলের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আমি মূলত জোহান্সবার্গেই কাজ করতাম। দলের প্রয়োজনে অন্যান্য জায়গায়ও যেতে হত। আমি নির্জন ফ্লাটে থাকতাম। যেসব বাড়িতে একা থাকা যায় এবং যেখানে আমাকে সন্দেহ করা হত না সেখানেও থাকতাম। এমনিতে আমি দলবদ্ধ থাকতে পছন্দ করি। নির্জনতাও খারাপ লাগে সেটা বলবো না। নির্জন পরিবেশে একাকি সময় কাটাতেও আমার বেশ ভাল লাগে।

দলের প্রয়োজনে একাকি থাকার এই সুযোগকে আমি মনে মনে স্বাগত জানালাম। ঘরে নির্জনে বসে নানা পরিকল্পনা করতাম। নানা ষড়যন্ত্রও মাথায় ঘুরপাক খেত। তবে সব কাজেই একঘেয়েমি থাকে। মাত্রাতিরিক্ত নির্জনতা আমার কাছে মাঝে মধ্যে অসহনীয় হয়ে উঠত। বিশেষ করে স্ত্রী ও পরিবারের লোকজনের জন্য মন কাঁদত। তাদেরকে কাছে পেতে মনে চাইত।

আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করা মানেই অদৃশ্য হয়ে থাকা। এখন এ পথে হাঁটলে একটু পরে অন্য পথে হাঁটা। আজ এ রুমে থাকলে কাল আরেক রুমে সময় কাটানো।

জীবনধারাতেও পরিবর্তন আনতে হয়। নিজেকে গুটিয়ে রাখতে হয়। আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করতে গিয়ে আমি কখনও বুক ফুলিয়ে হাঁটতাম না। কথা

বলতাম খুব নমনীয়ভাবে। রাগ কি জিনিস ভুলে গিয়েছিলাম। আচার-আচরণ ছিল খুবই গঠনমূলক। উগ্রতা তখন ধারেকাছেও ভীড়তে পারেনি। বিভিন্ন বিষয়ে লোকজনের কাছে তেমন একটা জিজ্ঞাসাবাদ করতাম না। তবে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতাম যে, তারাই আমাকে সবকিছু বলে দিত।

এ সময় শেভ করতাম না। চুলও কাটা হত না। বলতে গেলে মালি, বাবুর্চির বেশ-ভূষা নিয়ে বিচরণ করতাম। মাঠকর্মীদের মত অনেক সময় সবুজ পোশাক পরতাম। তবে ঢিলাঢালা পোশাক বেশি ব্যবহার করতাম। সাদামাটা সানগ্লাসও মাঝে মধ্যে চোখে দিতাম। আমার একটি গাড়ি ছিল। ড্রাইভারের ছদ্মবেশে এ গাড়ি নিয়ে অনেক যায়গায় যেতাম।

এ কয়মাস বেশ ধকল যায় আমার ওপর। এ সময় আমার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা বের হয়। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। ইমিগ্রেন্ট অফিস, চেক পয়েন্ট সব জায়গায় আমার নাম-ধাম চলে যায়। ধরিয়ে দিতে ছবিসহ পত্রিকার প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে গোপনে অন্য জায়গায় চলে যাই। কেপ শহরে কিছুদিন মুসলমানদের সঙ্গে কাটাই।

নাটালে কিছুদিন চিনি শ্রমিকদের সঙ্গে অবস্থান করি। *পোর্ট এলিজাবেথে* কারখানা শ্রমিকদের সাথে কিছুদিন সময় কাটাই। এ সময় বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াতাম আর গোপনে মিটিং করতাম।

আমার আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনের অভিজ্ঞতা বড়ই বিচিত্র। কিছু সুখকর অভিজ্ঞতা থাকলেও তিক্ত অভিজ্ঞতাই বেশি। বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যাই। এ সম্পর্কে অবশ্য খুব কম লোকই জানে।

একদিন শহরে গাড়ি নিয়ে ঘুরছিলাম। লালবাতি জ্বলে ওঠায় ট্রাফিক মোড়ে থামতে হল। হঠাৎ দেখি একটি গাড়ি। তাতে বসা ছিলেন উইটওয়াটারব্যান্ড নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান *(কর্নেল স্পেঙ্গলার)*। তাকে দেখে আমার পিলে চমকে ওঠে। সে সময় আমার পরনে ছিল শ্রমিকের ঢিলেঢালা পোশাক। চোখের সানগ্লাস এবং মাথার ক্যাপও ছিল। কর্নেল সাহেব আমার দিকে খুব একটা খেয়াল করেননি বলে সে যাত্রায় বেঁচে যাই।

আরেকদিন বিকেলে জোহান্সবার্গের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছিলাম। পরনে ছিল জীর্ণশীর্ণ লম্বা কোট। মাথায় ছিল টুপি। গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় দেখি একজন পুলিশ আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। পালাব কিনা ভাবছিলাম। পুলিশটি কাছে এসে মুচকি হেসে আমাকে স্যালিউট করলেন। তিনি ছিলেন এএনসির সমর্থক। এ ধরণের ঘটনা আমার জীবনে বেশ কয়েকবার ঘটেছে। অনেক কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশ অফিসার অভিযানের আগে আমাকে সতর্ক করে দিতেন। আমি নিরাপদ জায়গায় চলে যেতাম।

আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনে যতটা সম্ভব অপরিপাটি থাকার চেষ্টা করতাম। সাজসজ্জা ভুলে সব সময় নিজেকে উসখুস্কো রাখতাম। তখন আমাকে দেখে মনে হত আমি কোন কারখানায় কঠোর পরিশ্রমে ব্যস্ত থাকি।

পুলিশের কাছে আমার একটিমাত্র ছবি ছিল। ওই ছবিতে আমার দাড়ি ছিল। বেশভুষাও ছিল বেশ পরিপাটি। ওই ছবিটিই শহরের সব পুলিশের কাছে সরবরাহ করা হয়। এ জন্য আমার সহকর্মীরা আমাকে দাড়ি ফেলে দেয়ার অনুরোধ করে, আমি তাদের অনুরোধে সাড়া না দিয়ে দাড়ি সহই চলাফেরা করতে থাকি।

৪১

২৯ মে থেকে এএনসি সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেয়। আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে আমি মূলত এ ধর্মঘটকে সফল করতে নানাবিধ পরিকল্পনায় নিয়োজিত ছিলাম। এটা ছিল দৃশ্যত স্বাধীন সংগ্রামেরই একটা অংশ। ধর্মঘট নস্যাৎ করতে মে মাসের শেষের দিকে সরকার দেশ জুড়ে ব্যাপক ধড়পাকড় অভিযান শুরু করে। বিরোধীদলের নেতারা ছিল সরকারের মূল টার্গেট। এ সময় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। প্রিন্টিং প্রেস সরকারের কব্জায় নিয়ে আসা হয়। ধড়পাকড় অভিযানকে জোরদার করার জন্য পার্লামেন্টে আইন পাশ করা হয়। নতুন এ আইনের আওতায় যে কাউকে পুলিশ ১২দিন আটক রাখতে পারত। এ সময় জামিনের আবেদন করা যেত না।

বিরোধীদের আন্দোলনকে দমানোর জন্য সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ নেয়। সংবাদপত্র ও ধর্মঘটের প্রতি সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেয়া হয়। কাজ শেষে শ্রমিকরা যাতে কারখানায়ই ঘুমাতে পারে সে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের প্রতি নির্দেশ জারি করা হয়। ধর্মঘটের সময় যাতে শ্রমিকদের বাড়ি যেতে না হয় সে জন্য এ পদক্ষেপ নেয়া হয়। ধর্মঘট শুরু হবার দু'দিন আগে থেকেই সেনাবাহিনী রাস্তায় মহড়া দিতে শুরু করে। দেখে মনে হয়েছে দেশে যুদ্ধাবস্থা চলছে। পুলিশের ছুটিছাটা বাতিল করা হয়। শহরের বিভিন্ন প্রবেশ দ্বারে সেনাবাহিনী অবস্থান নেয়। ট্যাংকের নল উঁচিয়ে সেনারা টহল দিতে শুরু করে। অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আকাশে চক্কর দিতে থাকে হেলিকপ্টার। রাতে হেলিকপ্টারের সার্চলাইটের আলোতে অনেক বাড়িঘরের আঙ্গিনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

২৯ মে এএনসি যে ধর্মঘটের ডাক দেয় সেটা ছিল এক ধরণের অসহিংস আন্দোলন। এ ধর্মঘটের কর্মসূচিতে বিক্ষোভ-মিছিল-মিটিং ছিল না। কাজে যোগ না দিয়ে বাড়িতে অবস্থান করাটাই ছিল ধর্মঘটের মুল প্রতিপাদ্য বিষয়। সরকার সমর্থক ইংরেজী পত্র-পত্রিকাগুলো এ ধর্মঘটের প্রচণ্ড সমালোচনায় মেতে ওঠে।

তারা শ্রমিকদের বাড়িতে অবস্থান না করে কাজে যোগ দেয়ার আহ্বান জানায়। এ ধরণের ধর্মঘটের ডাক দেয়ায় এএনসি নেতাদের কাপুরুষ হিসেবে আখ্যায়িত করে।

ধর্মঘট শুরুর আগের রাতে এএনসি নেতাদের বৈঠক ডাকা হয়। সোয়েটর একটি নিরাপদ বাড়িতে ওই বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। এতে এএনসির জোহান্সবার্গ শাখার নেতাদের যোগ দেয়ার কথা ছিল। আমি বৈঠকে যোগ দিতে কেপটাউন দিয়ে সোয়েটর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এ পথে পুলিশের টহল ছিল না বললেই চলে। গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সামনে একটি চেক পয়েন্ট পড়ে যায়। পুলিশ কর্মকর্তারা আমাকে গাড়ি থামাতে বলেন। এ সময় আমার পরনে ছিল শ্রমিকের পোশাক। বেশ-ভূষা দেখে আমাকে তাদের সন্দেহ হয়নি। শ্বেতাঙ্গ কয়েকজন পুলিশ গাড়ি আগাগোড়া তল্লাশি করেন। গাড়িতে তারা কিছুই পাননি। একজন পুলিশ কর্মকর্তা এসে আমার পাশ দেখতে চান। ভুলে সেটি বাড়িতে রেখে আসার কথা বলি। আমি পাসের নাম্বার ও অন্যান্য তথ্য গড় গড় করে বলে যেতে থাকি। কথাবার্তায় খুশি হয়ে তারা আমাকে ছেড়ে দেন।

২৯ মে সোমবার। ধর্মঘটের প্রথম দিন। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল চাকরি। কিন্তু এরপরও ধর্মঘটে সাড়া দিয়ে লাখ লাখ লোক কাজে যাওয়া থেকে বিরত থাকে। তারা কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বাড়িতে অবস্থান করে। ডারবানে হাজার হাজার ভারতীয় শ্রমিক কারখানা ও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে বাইরে বের হয়ে আসে। কেপ শহরে হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক কাজে না গিয়ে বাড়িতে অবস্থান করে। জোহান্সবার্গের প্রায় অর্ধেক শ্রমিক কাজে যাওয়া থেকে বিরত থাকে। পোর্ট এলিজাবেথে এ সংখ্যা ছিল আরো বেশি।

ধর্মঘটের প্রথম দিনটা বেশ ভালোভাবে কাটে। যতটা আশা করেছিলাম সাড়া ছিল তার চেয়েও বেশি। ধর্মঘটের সাড়া দেখে শ্বেতাঙ্গ সরকার দৃশ্যত ভড়কে যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকলেও দেশের সব প্রান্ত থেকে ধর্মঘট পালনের খবরা-খবর আমাদের কাছে চলে আসে। বিকেলে আমার সঙ্গে *র‍্যান্ড ডেইলি মেইল* পত্রিকার সম্পাদক বেনজামিন পোগরান্ডের আলোচনা হয়। এ সময় তাকে আমি জানিয়ে দেই, অসহিংস আন্দোলনের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সামনে হয়ত আমাদের ভিন্ন পথে এগুতে হবে।

ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন। সকালে দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আমি ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেই। শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত এলাকায় আমাদের একটি নিরাপদ আস্তানা ছিল। ওই ফ্লাটে স্থানীয় ও বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে আমি ধর্মঘট প্রত্যাহারের ওই ঘোষণা দেই। সংবাদ সম্মেলনে জানাই আমাদের ডাকা সর্বাত্মক ধর্মঘট অত্যন্ত সফল হয়েছে।

সশস্ত্র আন্দোলন সংক্রান্ত কোন তথ্য উপাত্ত পেলেই আমি সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। মনোযোগ দিয়ে সেগুলো পড়তাম। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্লাস রোকার একটি রিপোর্ট আমি পড়ি। বাতিস্তার শাসনামলে কিউবায় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। গোপনে চলত দলটির তৎপরতা। ব্লাস রোকার রিপোর্টে গেরিলাযুদ্ধ সংক্রান্ত অনেক কথা ছিল। এ ছাড়া যুদ্ধের সময় গেরিলাদের তৎপরতা সম্পর্কিত ডেনি রেইটজের লেখাও আমি পড়ে ফেলি। মাও সেতুং, চেগুয়েভারা ও ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সংগ্রামী জীবনও ভালো করে পড়তে থাকি। এসব বই পড়ে আমি অনেক কিছু শিখি। মাও সেতুংয়ের জীবনী পড়ে আমার ধারণা জন্মে, তিনি ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী। তার কথা, কাজ ও চিন্তাভাবনা ছিল আর দশজনের চেয়ে ভিন্ন। তার এই ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাধারণাই তাকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

ইসরাইলিদের গেরিলা তৎপরতা ও যুদ্ধ কৌশলও আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। মুসোলিনির বিরুদ্ধে ইথিওপিয়ানদের সশস্ত্র আন্দোলন, কেনিয় গেরিলাদের যুদ্ধ, আলজেরিয়া ও ক্যামরুনের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কেও আমি প্রচুর পড়াশুনা করি।

আমি দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কেও পড়াশুনা করতে থাকি। এ দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা নিতে থাকি। বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গরা দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার আগের ও পরের অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। এদেশের শিল্পাঞ্চল, রাস্তাঘাটসহ সব ব্যাপারে সম্যক ধারণা অর্জন করি।

১৯৬১ সালের ২৬ জুন ছিল আমাদের স্বাধীনতা দিবস। দিবসটি উপলক্ষে আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে একটি চিঠি পাঠাই। এতে সাম্প্রতিক ধর্মঘটে অভূতপূর্ব সাড়া দেয়ার জন্য জনগণকে ধন্যবাদ জানাই। সরকার দমন পীড়ন না কমালে আমি সামনে আরও অসহযোগ আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেই।

এরই মধ্যে আমি জেনে যাই, সরকার আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। গ্রেফতারের জন্য পুলিশ আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। *ন্যাশনাল এ্যাকশান কাউন্সিল* এ ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করে দেয়। সাবধানে থাকার পরামর্শ দেয়। কোনভাবেই আমি যেন আত্মসমর্পণ না করি সে ব্যাপারে অনুরোধ জানায়। আমি এসব উপদেশ গ্রহণ করি। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে আরো সচেষ্ট হই। এ কাজ করতে গিয়ে আমাকে প্রিয়তমা স্ত্রী, সন্তান ও মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়। নিজ দেশে নিষিদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। এ সময় আমার ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। আইন পেশা ছেড়ে দিতে হয়। নিতান্ত হতদরিদ্র মানুষে পরিণত হতে হয় আমাকে।

মনে মনে আমি সংকল্প করি যে রোজ আমি সরকারের সঙ্গে লড়ে যাব। বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমার এ লড়াই চলবে। কোনভাবেই আমি দক্ষিণ

আফ্রিকা ছাড়বো না। সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করবো না। কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনব। দেশের মানুষের মুক্তি না আসা পর্যন্ত আমার এ সংগ্রাম চলবে।

৪৩

আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে কিছুদিন আমি মার্কেট স্ট্রীটে কাটাই। জায়গাটি সাদা অধ্যুষিত বিরিয়া এলাকার কিছুটা দূরে অবস্থিত। এখানে নিচ তলার একটি ফ্লাটে মাত্র একটি রুমে আমি থাকতাম। আমার সঙ্গে থাকতেন *উলফি কোদেশ*। তিনি ছিলেন কংগ্রেস অব ডেমোক্র্যাটসের সদস্য। পেশায় সাংবাদিক। নিউ এজ পত্রিকায় রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতেন।

উলফিকে পুরোদস্তুর একজন সৈনিকও বলা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি উত্তর আফ্রিকা ও ইতালিতে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। তার এই অভিজ্ঞতা আমার বেশ কাজে আসে। তার পরামর্শ অনুসারে আমি পার্সিয়ান জেনারেল কার্ল ভন ক্লুজউইটজের লেখা *ওন ওয়ার* বইটি পড়ে ফেলি। এটা ছিল ভনের একটি গবেষণামূলক বই।

ওই ফ্লাটে প্রায় দু'মাস অবস্থান করি। সারাদিন ফ্লাটে ঘাপটি মেরে থাকতাম। পড়াশুনা করতাম। বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা করতাম। মাঝে মধ্যে রাতে সাংগঠনিক কাজে বের হতাম। আমি বরাবরই ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠতাম। এ জন্য উলফির অনেক সময় অসুবিধা হত। ঘুম থেকে উঠে কাপড় বদলিয়ে বাইরে যেতাম। ঘন্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করে রুমে ফিরতাম। আমার নিয়মানুবর্তিতার কাছে উলফি বরাবরই হার মানতে বাধ্য হতেন।

এম কে সদস্যদের বিস্ফোরক স্থাপন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ শুরু হয়। একদিন রাতে উলফিকে সঙ্গে নিয়ে শহরের অদূরে একটি পুরনো ইটখোলায় যাই। নিরাপত্তার ঝামেলা থাকলেও এম কের প্রথম বিস্ফোরক পরিক্ষায় উপস্থিত না থেকে পারলাম না। তখন ইটখোলায় বিস্ফোরণ ঘটানো ছিল নিতান্ত সাধারণ বিষয়। মাটি নরম করার জন্য সেখানে প্রায়ই ডিনামাইট ব্যবহার করা হত। কেউ যেন সন্দেহ করতে না পারে সে জন্যই বিস্ফোরক পরীক্ষার স্থান হিসেবে ইট খোলাকে বেছে নেই। জ্যাক হগসন বিস্ফোরক ভর্তি একটি কৌটা ও অন্যান্য উপকরণসহ আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি বিস্ফোরকসহ অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটি বড় আকারের বোমা তৈরি করে ফেললেন। আমাবস্যা থাকায় রাত ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমাদের সঙ্গে আলোও ছিল খুব কম। আমরা জ্যাকের পাশে দাঁড়িয়ে বোমা তৈরি ও স্থাপনের পুরো বিষয়টি গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করি। বোমা পাতা হয়ে গেলে নিরাপদ দূরে চলে যাই এবং সময় দেখতে থাকি। ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে সেটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়। প্রথমত বিস্ফোরণ সফল

হওয়ায় সবাই পুলকিত হই। গাড়িতে করে দ্রুত ওই স্থান ছেড়ে চলে আসি। পরে যে যার জায়গায় চলে যাই।

বিরিয়াতে বেশ নিরাপদ অনুভব করলাম। কিন্তু এর পরও বাইরে বের হতাম না। কারণ এটি ছিল শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত এলাকা। আমি এখানে থাকতে পারি সেটা ছিল পুলিশের ধারণার বাইরে। দিনের বেলায় ফ্লাটে পড়াশুনার সময় চারদিকে পর্দা টেনে দিতাম।

টক দই আমার খুব প্রিয়। বিরিয়াতে এ জিনিসটি পাওয়া যেত। ফ্লাটে বসেই আমি তা সংগ্রহ করতে পারতাম।

জোহান্সবার্গে এক ডাক্তারের বাড়িতে কিছুদিন কাটাই। রাতে চাকর-বাকরদের সঙ্গে ঘুমাতাম। দিনে ডাক্তারের স্টাডিরুমে পড়াশুনা করতাম। দিনের বেলায় বাড়িতে কেউ এলে আমি পেছনের দরজা দিয়ে বাগানে চলে যেতাম। সেখানে মালির কাজ করতাম। আগন্তুকরা চলে গেলে ফের রুমে ফিরতাম। এর পর চলে যাই নাটালে। সেখানে কোজা নামে একটি সম্প্রদায় আছে। ওই সম্প্রদায়ের কিছু শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন কাটাই।

আমি থাকতাম একটি হোটেলে। সেখানে নিজেকে কৃষিকর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দেই। কৃষি জমির উর্বরতা পরীক্ষা করতে এসেছি বলে সবাইকে জানাই।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাকে কিছু যন্ত্রপাতি দেয়া হয়েছিল। প্রতিদিন সেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে মাটি পরীক্ষা করতাম। এ কাজটা ছিল নিতান্ত লোক দেখানো। আসলে কি করছি সেটা আমি নিজেও জানতাম না। মাঝে মধ্যে মনে হত কোজা সম্প্রদায়কে আমি বোকা বানাচ্ছি।

এখানকার অধিকাংশ নারী পুরুষ ছিলেন কৃষক। কৃষিজীবী হলেও ওদের বিচার-বুদ্ধি ছিল বেশ ভাল। তারা কখনও আমার পরিচয় জানতে চাননি। অথচ তাদের চোখের সামনেই রাতে প্রায়ই গাড়িতে করে অনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। তাদের মধ্যে স্থানীয়ভাবে খুব পরিচিত অনেক রাজনীতিকও ছিলেন। এখানে প্রায়ই আমি সারারাত বৈঠক করতাম। সারাদিন ঘুমাতাম। স্বাভাবিকভাবে একজন কৃষিকর্মকর্তা যা করেন এটা ছিল তার ব্যতিক্রম।

কিছুদিনের মধ্যে ওই এলাকা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। যাওয়ার আগে কোজা সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে দেখা করলাম। আদর যত্ন করার ও খোঁজ খবর নেয়ার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানালাম। এ সময় একজন বললেন, ইয়াংম্যান, দয়া করে আমাকে বল চিফ লুথুলু আসলে কি চাচ্ছেন? বললাম, সেটা তাকেই জিজ্ঞেস করুন। তবে যতদূর মনে হচ্ছে তিনি আপনাদের জমিজমা ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আপনাদের রাজাকে আবার আগের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন। আপনারা যে স্বপ্ন দেখছেন, যে সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় আছেন সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে চাচ্ছেন লুথুলি। ওই বৃদ্ধ লোকটি বললেন, আমাদের

কাছে যদি অস্ত্র না থাকে তাহলে তিনি এসব করবেন কিভাবে? তাকে বললাম, আমি সেনাবাহিনী গঠনের কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু এখনও সফল হইনি। বৃদ্ধ আমাকে ভালভাবে উৎসাহিত করলেন। বললেন, নিশ্চয়ই তুমি সফল হবে। আমরা আছি তোমার পাশে। কথোপকথন শেষে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি। আমি চুপিসারে ওই এলাকায় গিয়ে ছিলাম চলেও আসি বেশ গোপনে।

৪৪

আত্মগোপনের পরবর্তী স্থান হিসেবে বেছে নিলাম লিলিসলিফ খামারকে। এটা একটা পুরনো জীর্নশীর্ণ বাড়ি। মাঝে মধ্যে প্রার্থনাসভাও হত এখানে। জোহান্সবার্গের পাশ্ববর্তী রাইভোনিয়া এলাকায় বাড়িটি অবস্থিত। অক্টোবরে সেখানে যাই। এখানকার বাড়িগুলো ছিল ছোট। কৃষি খামারের অভাব ছিল না। এখানে দলের কেনা কিছু বাড়ি ও সম্পত্তি ছিল। দলীয় সদস্যরা যাতে আত্মগোপন করতে পারে সেজন্য এগুলো কেনা হয়। আমি যে বাড়িটিতে আশ্রয় নেই সেখানে কোন লোক বাস করত না। ওই জীর্ণশীর্ণ বাড়িটির কেয়ারটেকার সেজে সেখানে আশ্রয় নেই। স্থানীয় লোকজনদের বলি, বাড়িওয়ালা আমাকে বাড়ি দেখাশোনার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি না আসা পর্যন্ত আমিই বাড়ি দেখাশুনা করব। এখানে এসে নাম পাল্টিয়ে ফেলি। স্থানীয়রা আমাকে ডেভিড মটসামায়ি বলে জানত। এ নামটা ছিল আমার এক সাহেব কর্মীর। খামারে আমি কাজ করতাম। কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকরা যে ধরণের পোশাক পরত আমিও সে ধরণের পোশাক পড়তাম। এখানকার সবাই নীল রংয়ের ঢিলেঢালা জামা পড়ত। এটা ছিল ফার্মের নির্ধারিত পোশাক দিনের বেলায় আমি শ্রমিকদের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত থাকতাম। শ্রমিকরা ফার্মের ওই বাড়িটির সৌন্দর্যবর্ধনের কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা বাড়ির খসে যাওয়া আস্তর ফেলে দিয়ে নতুন আস্তর ও রং করার কাজে নিয়োজিত ছিল। অন্য শ্রমিকরা আমাকে ওয়েটার হিসেবে গণ্য করত। আমি তাদের জন্য সকালের নাস্তা তৈরি করতাম। চা তৈরি ও পরিবেশনের দায়িত্বটাও ছিল আমার। তাছাড়া মাঝে মধ্যে ফার্মের আশপাশের দিকে খেয়াল রাখতে বলত। আমাকে দিয়ে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করাত।

একদিন বিকেলে তাদেরকে বললাম আমি চা তৈরি করছি। এ কথা শুনে সবাই রান্নাঘরে ছুটে এল। ট্রেতে কাপ, চা, চিনি, দুধ সাজালাম। সবাই যার যার মত করে চা নিতে লাগল। চায়ের ট্রেটা আমিই সবার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম। সবার মাঝে বসে একজন গল্প বলছিলেন। ট্রে তার কাছেও নিয়ে গেলাম। ওই লোক গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে তীব্রভাবে দেখছিলেন। মনে হচ্ছিল গল্প বলার চেয়ে তার মনোযোগটা আমার দিকে বেশি। চা পান শেষে সবার মত আমিও রান্নাঘর ছাড়তে উদ্যত হলাম। কিন্তু ওই লোকটি আমাকে বললেন, ওয়েটার এদিকে এস। তোমাকে যেতে বলিনি। আমি অনুগত চাকরের মত তার হুকুম

সরকার ধড়-পাকড় ও দমন-পীড়ন অব্যাহত রাখলে অসিংহ আন্দোলন অন্যদিকে মোড় নিবে। সরকার আমাদেরকে নির্মূলের নীতি থেকে সরে না আসলে আমরাও অসিংহ নীতি থেকে সড়ে দাঁড়াব। আমি অসহিংস নীতির পাঠ চুকিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে মত প্রকাশ করি। আমি জানতাম এ ঘোষণাটা হবে ভূমিকম্পের মত। দলের অন্য নেতারা এটাকে সহজভাবে নিবেন না। অনেকেই আমাকে তিরস্কার করবেন। আর শেষ পর্যন্ত হলও তাই। সবার সঙ্গে পরামর্শ না করে এ ধরণের ঘোষণা দেয়ায় দলের অনেকেই আমাকে তিরস্কার করেন।

আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এগুনো উচিত কিনা এ নিয়ে দলের ভিতরে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বিতর্ক চলে। ১৯৫২ সালে আমিই প্রথম সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে মত প্রকাশ করি। সে সময় এএনসির আরেক নেতা ওয়াল্টার সিসুলুর সঙ্গে বৈঠককালে তাকে আমি এ ব্যবস্থায় প্রভাবিত করার চেষ্টা করি।

সে যাত্রায় আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর ৮ বছর পর ১৯৬০ সালে ওয়াল্টার সিসুলুকে ফের একই কথা বলি। তাকে জানাই, কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যেই আন্ডারগ্রাউন্ডে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা দলকে বেশ ভালোভাবে গুছিয়ে নিয়েছে। এখন দলের সামরিক শাখা খোলার চিন্তাভাবনা করছে। আমার এবারের যুক্তিতর্কে ওয়াল্টার প্রভাবিত হন। আমরা সশস্ত্র আন্দোলনের বিষয়টি দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেই। ওই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ১৯৬১ সালের জুন মাসে।

মোসে কোটানি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও এএনসির প্রভাবশালী নেতা। তার সঙ্গে আমার বৈঠক হয়। আমি সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে মতামত প্রকাশ করি। কিন্তু তিনি এতে সায় না দিয়ে বরং আমার বিরোধিতা করেন। মোসে দলের অন্য নেতাদের বলেন ম্যান্ডেলার কথা মেনে নিলে গণহত্যা শুরু হবে। শত্রুরা দলের সদস্যদের নির্বিচার হত্যায় মেতে উঠবে।

মোসের কথায় দলের অনেকেই প্রভাবিত হন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল আমার প্রস্তাব মাঠে মারা যাচ্ছে। এমনকি ওয়াল্টার পর্যন্ত আমার পেছন থেকে সরে যায়। আগে সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে মত দিলেও এ যাত্রায় সে এ ব্যাপারে আমাকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকেন। পরে ওয়াল্টারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমি তাকে আমার হতাশার কথা বলি। আমার পক্ষে কথা না বলায় তাকে রীতিমত তিরস্কার করি। তিনি একগাল হেসে আমার পিঠে হাত রাখেন। নরম সুরে বলেন, বোকার মত কথা বলনা। এখন ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জন করলে কাজ হবে না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে এগুতে হবে। ওয়াল্টার ছিলেন অনেকটা কুটনৈতিক ধাচের। মেধা ছিল অসাধারণ।

ওয়াল্টার আরো বললেন, মোসের সঙ্গে তোমার একটা গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করব। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। কথামত ওয়াল্টার ঠিকই বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন। শহরের একটি গোপন বাড়িতে আমাদের দু'জনের বসার ব্যবস্থা করা হল।

মোসের সঙ্গে বৈঠকে আমি সহিংস তথা সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে নানা যুক্তি তুলে ধরি। এ প্রসঙ্গে আফ্রিকায় বহুল প্রচলিত এক বচন তার সামনে উপস্থাপন করি। যার মূল কথা হচ্ছে খালি হাতে হিংস্র হায়েনার আক্রমণ মোকাবেলা করা যায় না। এর জন্য হাতিয়ার থাকতে হয়। মোসে বহু পুরনো কমিউনিস্ট। তাকে আমি বললাম, তুমি যে ধরণের কথাবার্তা বলছ সেটা খোদ কমিউনিস্ট পার্টির নীতি আদর্শের পরিপন্থী। রক্ত ছাড়া বিশ্বে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাশিয়া, চীন, কিউবা সব জায়গায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করেছে। তাদেরও ক্ষমতায় যেতে হলে একই পন্থা অনুসরণ করতে হবে। মোসে আমাকে বললেন, স্টালিন, লেনিন, ক্যাস্ট্রো যে পরিস্থিতিতে বিপ্লব করেছেন দ. আফ্রিকায় সে পরিস্থিতি এখনো সৃষ্টি হয়নি। সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য আরো অপেক্ষা করতে হবে। অধৈর্য হলে চলবে না। আমি মোসের এ যুক্তির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বললাম, লোকজন অধৈর্য হয়ে পড়েছে। তারা স্বেচ্ছায় ইতিমধ্যেই সামরিক শাখা গঠন করে ফেলেছে। এখন এএনসিকেই তাদের নেতৃত্ব দেয়ার গুরুদায়িত্ব নিতে হবে।

সারাদিন আমাদের আলাপ চলে। দীর্ঘ এই আলোচনা শেষে মোসে আমাকে বলেন, নেলসন আমি তোমাকে কোন ব্যাপারে কথা দিতে পারলাম না। তবে সশস্ত্র আন্দোলনের বিষয়টি কেন্দ্রিয় কমিটির বৈঠকে উত্থাপন কর। তখন দেখা যাবে কি করা যায়। আমি মোসেকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেই, কয়েক সপ্তাহ পর ডারবানে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাহী কমিটির বৈঠকে আমি বিষয়টি ফের উত্থাপন করবো। এ সময় ওয়াল্টারের মুখে ছিল মুচকি হাসি।

এএনসির অন্যান্য বৈঠকের মত নির্বাহী কমিটির বৈঠকটিও ডারবানে বেশ গোপনে আয়োজন করা হয়। পুলিশের চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্য রাতে ওই বৈঠক শুরু হয়। এএনসি প্রধান লুথুলি বরাবরই সহিংস আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এ জন্য নির্বাহী কমিটির বৈঠকে আমাকে তোপের মুখে পড়তে হবে এমন একটা ধারণা আমার ছিল।

বৈঠকে আমি বললাম রাষ্ট্রই আমাদের সহিংসতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জনগণ এমনিতেই সহিংস হয়ে উঠছে এমন ধারণা ভুল। বরং রাষ্ট্র যেভাবে জুলুম অত্যাচার শুরু করেছে তাতে সাধারণ মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। সহিংসতার পথ অবলম্বন ছাড়া তাদের সামনে বিকল্প নেই। জনগণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। এখন আমরা চাইলেও সহিংস আন্দোলন হবে, না চাইলেও হবে। তাই আমাদের উচিত অনতিবিলম্বে এই আন্দোলনের

নেতৃত্ব গ্রহণ করা। তা না হলে এএনসি অনেক পেছনে পড়ে যাবে। তখন আফসোস করতে হবে। অনেক কিছু হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

এএনসি প্রধান প্রথমে আমার কথায় আপত্তি করলেন। আমার যুক্তি মেনে নিতে গড়িমসি করলেন। কিন্তু আমি ছিলাম নাছোড়বান্দা। এ ব্যাপারে সারারাত সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তাদের ভয় উদ্বেগ শঙ্কা দূর করার চেষ্টা করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তারা শেষাবধি আমার কথা মেনে নেবে। সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে মত প্রকাশ করবে। শেষ পর্যন্ত আমার ধারণাই ঠিক হল। দলের প্রধান সশস্ত্র আন্দোলন শুরুর পক্ষে সায় দিলেন।

জাতীয় নির্বাহী কমিটি প্রাথমিকভাবে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করল। এএনসির সশস্ত্র বিভাগটি কেমন হবে সে সম্পর্কে দলের প্রধান মোটামুটি একটা ধারণা দিলেন। তিনি বললেন, সশস্ত্র শাখাটি হবে দলের একটি পৃথক অংশ। এটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করবে। এর ওপর এএনসির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। তবে সশস্ত্র বিভাগটি সাংবিধানিক হবে স্বায়ত্ত্বশাসন ভোগ করবে। সশস্ত্র আন্দোলনের কারণে দলের অন্যান্য কর্মকাণ্ড যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে তিনি সবাইকে সতর্ক করে দিলেন।

পরের দিন আবার নির্বাহী কমিটির বৈঠক ডাকা হল। বরাবরের মত এ বৈঠকটি ডারবানে অনুষ্ঠিত হয়। রাতে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকের ইন্ডিয়ান কংগ্রেস, কালারড পিপলস কংগ্রেস, সাউথ আফ্রিকান কংগ্রেস, ট্রেড ইউনিয়ন ও ডেমোক্র্যাটস কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যোগ দেন।

বৈঠকের শুরুটা ছিল আমার জন্য অনেকটা অশুভ। দলের প্রধান লুথুলি সবার উদ্দেশ্যে বললেন, এএনসির সশস্ত্র আন্দোলনের বিষয়টি তিনি অনুমোদন করেছেন। এখন এ বিষয়টি অনুমোদন করার জন্য তিনি সবার প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছেন। লুথুলির ভাবসাব আমার কাছে গাছাড়া মনে হল। এএনসির অঙ্গসংগঠনগুলোর এ বৈঠক শুরু হয় রাত ৮টায়।

আমি সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে আগের মত নানা যুক্তি পেশ করে এ ব্যাপারে সাধারণ জনগণের অবস্থান ব্যাখ্যা করি। কিন্তু ইউসুফ কাচালি ও ড. নায়েকার সশস্ত্র আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধীতা শুরু করেন। তারা বলেন, এ ধরণের সংগ্রাম শুরু হলে রাষ্ট্র সব আন্দোলনকারীকে জবাই করবে। জে. এন সিং সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, সশস্ত্র আন্দোলন না করার কারণেই আমরা পিছিয়ে পড়েছি।

এভাবে সারারাত আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলে। সকালের দিকে আমার মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। আমরা যে সফলতার দিকে এগুচ্ছি সেটা বুঝতে পারি। এ বৈঠকে ভারতীয় নেতারা সারারাত চুপচাপ ছিলেন। তারা বরাবরই

অসহিংস আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সকালের দিকে হঠাৎই ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের নেতা এম.ডি. নাইডু মুখ খোলেন। তিনি চিৎকার করে কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, তোমরা জেলে যেতে ভয় পাচ্ছ কেন? এরপরই সব বিতর্ক এক দিকে মোড় নেয়। সবাই সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নেন। কংগ্রেস এএনসির একটি স্বতন্ত্র সামরিক শাখা খোলার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়। এ ব্যাপারে আমাকে যাবতীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাও প্রদান করা হয়।

৪২

আমি কখনও সেনাবাহিনীতে কাজ করিনি। যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই। শত্রুর উদ্দেশ্যে জীবনে কখনও একটি গুলিও ছুঁড়িনি। অথচ আমার ওপরই এএনসির সামরিক শাখার সব দায়িত্ব বর্তালো। নতুন সংগঠনের নাম দেয়া হল *উমখনতু উই সিজি* (জাতির বল্লম)। সংক্ষেপে একে বলা হত এম কে। এ রকম নাম করণের একটা তাৎপর্য ছিল। আমরা বুঝাতে চাচ্ছিলাম, আফ্রিকার প্রচলিত অস্ত্র দিয়েই জাতির মুক্তি আনব। শ্বেতাঙ্গদের প্রতিহত করব।

এ শাখাতে শ্বেতাঙ্গদের নেয়া বারণ ছিল। এএনসির নির্বাহী কমিটি ওই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিন্তু এরপরও ক্ষেত্রবিশেষ আমি ওই নিয়ম এড়িয়ে যাই। সামরিক শাখার দায়িত্ব পাবার পরপরই আমি এখানে লোক নিয়োগ শুরু করি। জো স্লোভো ও ওয়াল্টার সিসুলুকে নিয়ে সামরিক শাখার হাইকমান্ড গঠনের কাজটি সেরে ফেলি। আমি হই এর চেয়ারম্যান। জো কমিউনিস্ট পার্টির কিছু কর্মীকে আমাদের দলে ভেড়ানোর জন্য তাদের নাম তালিকাভুক্ত করেন। এরা সবাই ছিলেন মোটামুটি প্রশিক্ষিত। সরকারের টেলিফোন লাইন কর্তন, বাস-রেলসহ সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটানোসহ নানারকম কাজে অভিজ্ঞতা ছিল এদের। আমরা জ্যাক হগসনকেও দলে ভীড়াই। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক। এছাড়া স্প্রিংবুক লিজিওন ও রাস্টি ব্রেন্সটেইন নামে দুটি দলের সদস্যও ছিলেন তিনি।

জ্যাক আমাদের সামরিক শাখার প্রথম বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ক্ষতি কম করে রাষ্ট্রের বড় রকমের ক্ষতি করাই ছিল আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কাজ শুরুর আগে আমি আমার চিন্তাভাবনা ঝালাই করে নিলাম। এ ব্যাপারে পড়াশুনা করতে লাগলাম। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। স্বাধীনতা ও গেরিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত বই উপন্যাস পড়তে লাগলাম। এ সংক্রান্ত অন্যান্য উপকরণও ঘাটতে লাগলাম। কোন পরিস্থিতিতে গেরিলা যুদ্ধ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়, গেরিলা যুদ্ধ কিভাবে করতে হয়, কিভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হয়, অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ ও জায়গামত পৌছাতে হয় কিভাবে এসব বিষয়ে ব্যাপক ধারণা অর্জন শুরু করলাম।

লুথুলির নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘোষণাটি এসেছিল একটা নাজুক সময়ে। আমরা তখন কিছু একটা করার চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম। ওই কাণ্ডটি করার পর তার নোবেল পুরস্কার নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হবে সেটাও আমরা জানতাম। নোবেল পুরস্কার নিয়ে দেশে ফেরার পরদিনই এমকে নাটকীয়ভাবে তার আত্মপ্রকাশের খবর দেশবাসীকে জানিয়ে দেয়।

১৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার লোকজন একটি বিশেষ উৎসব পালন করত যা ডিঙ্গানি ডে হিসেবে পরিচিত। হাইকমান্ডের নির্দেশে এমকে সদস্যরা ওইদিন জোহান্সবার্গ, পোর্ট এলিজাবেথ ও ডারবানে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও সরকারি অফিসে বোমা হামলা চালায়। এগুলো ছিল ঘরে তৈরি হাত বোমা। এ হামলা চালাতে গিয়ে আমাদের একজন সদস্য নিহত হন। তার নাম পেট্রোস মলিফ।

এম কে সৈনিকদের মধ্যে তিনি প্রথম শহীদ হন। তার মৃত্যুটা ছিল দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু সেটা এড়ানোরও উপায় ছিল না। তার এই আত্মত্যাগের কথা পরবর্তীতে সব এমকে সৈনিক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করত। তাকে নিয়ে আলোচনা করত। বিস্ফোরণের সময় এমকে সদস্যরা হাজার হাজার লিফলেট বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে দেয়। এসব লিফলেটে এমকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লেখা ছিল। ওই দিন দেশবাসী প্রথম জানতে পারে এমকে নামে একটি সশস্ত্র সংগঠনের আত্মপ্রকাশের কথা।

আমরা যে লিফলেট ছড়িয়ে ছিলাম তাতে লেখা ছিল– আজ থেকে এমকের যাত্রা শুরু হল। সরকারের যেসব প্রতিষ্ঠান বর্ণবাদ ও বৈষম্যমূলক নীতি নিয়ে কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হল। তারা উৎপীড়নমূলক নীতি থেকে সরে না এলে তাদের ওপর হামলা করা হবে। এমকে একটি নতুন ও সম্পূর্ণ স্বাধীন সংগঠন। আফ্রিকানরাই এটি গঠন করেছে। তারাই এটি পরিচালনা করছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সব বর্ণের, ধর্মের ও গোত্রের লোকজনের সমন্বয়ে এ সংগঠন গঠন করা হয়েছে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে আমরা এগুচ্ছি।

লিফলেটে আরও লেখা ছিল– যে কোন পরাধীন, নির্যাতিত ও নিপীড়িত জাতির সামনে দুটি পথ খোলা থাকে। একটি হচ্ছে বশ্যতা স্বীকার বা আত্মসমর্পন করে শাসক শ্রেণীর সব অন্যায় মাথা পেতে নেয়া। অন্যটি হচ্ছে জীবনের মায়া ত্যাগ করে সশস্ত্র সংগ্রাম করা। আমরা দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছি। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনগণের অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাবো। তাদের মুক্তির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করব। দক্ষিণ আফ্রিকার নিরীহ লোকজনকে শোষক গোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

লিফলেটে আমরা আরো অনেক কথা লিখেছিলাম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– আমরা এমকে সদস্যরা সব সময় স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়ে যাব। তা

আমরা রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধ চাই না। রক্তপাত ছাড়া অধিকার আদায়কে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। সরকার যে বৈষম্যমূলক নীতি দিয়ে দেশ চালাচ্ছে আজকের হামলা তার ফসল। আশা করছি দেশের প্রতিটি জনগণ এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে। আমরা আশা করছি দেরীতে হলেও এখন সরকারের ঘুম ভাঙ্গবে। ভুল বুঝতে পারবে। সরে আসবে বৈষম্য ও নীপিড়নমূলক নীতি থেকে।

বিশেষ একটি কারণে ১৬ ডিসেম্বরকে হামলার দিন হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম। ওই দিনটি পালন করত দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা। মহান জুলু নেতা ডিঙ্গানির সঙ্গে ১৮৩৮ সালের ওই দিন শ্বেতাঙ্গদের ঘোরতর যুদ্ধ হয় যা ব্যাটল অব ব্লাড রিভার নামে পরিচিত। অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র থাকায় ওই যুদ্ধে শ্বেতাঙ্গরা বিজয়ী হন। জুলু নেতা ডিঙ্গানি নিহত হন। তার অনুসারীদের রক্তে *লিমপোপো* নদীর পানি লাল হয়ে যায়। সেদিন থেকে কৃষ্ণাঙ্গরা দিনটিকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করে। ওই দিন তারা শোকতাপে মুহ্যমান হয়ে পড়ত। অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গরা মেতে উঠত আনন্দ ফুর্তিতে।

বিস্ফোরণের পর সরকার আঁতকে ওঠে। বিস্ময়ে বড় কর্তাদের চোখ কপালে গিয়ে ওঠে। তারা ওই হামলার নিন্দা করেন এবং একে কাপুরুষোচিত কাজ হিসেবে গণ্য করেন। অনেকে হামলাকে বোকামি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ওই বোমা হামলা দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। তারা যে জ্যান্ত আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন সেটা বুঝতে পারেন।

এ হামলার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গদেরও ঘুম ভাঙ্গে। অবসান হয় ভুল ধারণার। এতদিন তারা মনে করত এএনসি একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। এটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে অধিকার আদায় করতে চায়। সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করে না। বোমা হামলার পর কৃষ্ণাঙ্গদের ওই ভুল ভেঙ্গে যায়। এএনসি যে অধিকার আদায়ের জন্য যে কোন আন্দোলন করতে পারে সেটা তারা বুঝতে পারে।

সাদাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা এএনসির আছে সেটা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা অনেক দিন পর অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। আমরা বসে থাকিনি। দু'মাস পর নববর্ষের দিন আরেক দফা বোমা হামলার পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে থাকলাম।

ডিঙ্গানি ডেতে হামলার পর প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। পুলিশের বিশেষ বাহিনী এমকে সদস্যদের ধরতে নানা ফন্দি-ফিকির শুরু করে। আমরাও সে জন্য দমে যাইনি। নতুন উদ্যমে পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে থাকি। আমাদেরকে যে দমানো সম্ভব নয় সেটা সরকারকে বুঝিয়ে দিতে মনস্থ করি।

উইনি আমার কাছে আসলেই মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়তাম। তাকে ছাড়তে মনে চাইত না। অবশ্য মনের এ অবস্থা ক্ষণিকের জন্য স্থায়ী হত। কিছুক্ষণ পর ঠিক হয়ে যেত। এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও আমার পরিবার টিকে আছে– এটা ভেবে মনে শান্তি পেতাম। রাস্তাঘাটে পুলিশ যখন কম থাকত উইনি কেবল তখনই আমার কাছে আসত। মাঝে মধ্যে জিন্দিজি ও জেনানিকেও রাইজোনিয়া থেকে আমার সঙ্গে দেখা করানোর জন্য নিয়ে আসত। আমার বাচ্চারা ছোট হলেও বাবার আত্ম গোপনের বিষয়টি ঠিকই বুঝত। আমার আরেক সন্তানের নাম মাকাথো। ওর বয়স তখন ছিল মাত্র ১১ বছর। সে প্রায়ই আমাকে উপদেশ দিত। বলত, বাবা কখনও নিজের আসল নাম কারো কাছে প্রকাশ করবে না। আমি ওর মাকে বলতাম, তোমরা যে যাই কর ও কিন্তু ঠিকই আমার পরিচয় গোপন রাখতে পারবে।

ছোট বাচ্চারা যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন ওদের মধ্যে ছেলেমানুষি থেকেই যায়। মাকানোর ক্ষেত্রেও তাই হল। ডিসেম্বর মাস শেষের দিকে। একদিন খামারের আঙ্গিনায় আর্থারের ১১ বছর বয়সী ছেলে নিকোলাস গোল্ডরিচের সঙ্গে মাকাথা খেলা করছিল। উইনি আমার জন্য ড্রুন ম্যাগাজিনের একটি কপি নিয়ে এসেছিল। ম্যাগাজিন ওদের খেলার জায়গার পাশেই রাখা ছিল। খেলাধুলার এক পর্যায়ে ম্যাগাজিনটির ওপর ওদের দুজনের চোখ পড়ে। পাতা ওল্টাতে শুরু করে। হঠাৎ আমার ছবি দেখে মাকাথা চেচিয়ে ওঠে। বলে, এটা আমার বাবার ছবি। কিন্তু নিকোলাস সেটা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। বলে, ওটা নেলসন ম্যান্ডেলার ছবি। মাকাথা নিকোলাসকে বোঝাতে চেষ্টা করে তার বাবার আসল নাম হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা। কিন্তু নিকোলাস বারবার বলতে থাকে, তোমার বাবার নাম ডেভিড। কাজেই ওই ছবি তোমার বাবার নয়।

এ নিয়ে দুজনের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু হয়। এক পর্যায়ে নিকোলাস তার মায়ের কাছে গিয়ে জানতে চান মাকাথোর বাবার আসল নাম নেলসন ম্যান্ডেলা কিনা। এ ঘটনার পর থেকে আমি আরও সতর্ক হয়ে যাই। বাচ্চাদের আমার কাছে আনা কমিয়ে দিতে বলি। অল্প সময়ের জন্য স্থান ত্যাগের চিন্তা ভাবনা করতে থাকি। দেশের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা জাগে। আন্ডার গ্রাউন্ড জীবন শুরুর পর এই প্রথম দেশের বাইরে যাওয়ার চিন্তা মাথায় চেপে বসে।

ডিসেম্বরে প্যান আফ্রিকান ফ্রিডম মুভমেন্টের পক্ষ থেকে এএনসির কাছে একটা আমন্ত্রণপত্র আসে। আফ্রিকার পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশগুলোকে নিয়ে

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আদ্দিস আবাবায় একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ওই সম্মেলনে এএনসি প্রতিনিধিদলকে যোগ দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে ওই আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়।

আফ্রিকার বিভিন্ন স্বাধীন দেশের মধ্যে ঐক্য-সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব জোরদার এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের চলমান স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানানোর উদ্দেশ্যেই ওই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এখনকার আফ্রিকান ইউনিটি ওই সম্মেলনেরই ফসল। এএনসির জন্য সম্মেলনটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমকের প্রতি সমর্থন আদায়ের এটা ছিল মোক্ষম সুযোগ। এছাড়া এমকের জন্য অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার একটা বিরাট সুযোগ নিয়ে আসে ওই সম্মেলন।

সম্মেলনে এএনসি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য দলের পক্ষ থেকে আমাকে অনুরোধ করা হয়। এ ব্যাপারে আমারও প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। আফ্রিকার অন্যান্য দেশ দেখার স্বপ্ন দেখতাম সব সময়ই। আমার সবচেয়ে বড় আগ্রহ ছিল আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করা। যারা যুদ্ধ করে তাদের দেশকে স্বাধীন করেছেন।

তবে এরপরও কেন যেন মনে হল আমি প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। যে কোন মূল্যে দেশ না ছেড়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাওয়ার যে অঙ্গীকার করেছিলাম সেটাতে অটুট থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। দলীয় নেতাদের শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত জানালাম। চিফ লুথুলিসহ সবাই আমাকে বোঝালেন। বললেন, দলের প্রয়োজনেই আমার এ সফর করা প্রয়োজন। তারা আমাকে দ্রুত দেশে ফিরে আসতে বললেন। অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম। আদ্দিস আবাবায় যেতে রাজি হলাম।

সম্মেলনে যোগদানই আমার আফ্রিকা মিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল আরো ব্যাপক। আমাদের নতুন সামরিক শাখা এমকের প্রতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন আদায় ছিল সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। এছাড়া আফ্রিকা মহাদেশের অনেক স্থানে আমাদের সামরিক শাখার সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভবপর ছিল। সে সম্ভাবনাকেও আমি কাজে লাগাতে চাচ্ছিলাম। আমাদের খ্যাতি আফ্রিকার সব জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়াটাও ছিল আমার সফরের অন্যতম লক্ষ্য। ওই সম্মেলনে এএনসিকে ফুটিয়ে তোলার সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেই যাতে যারা এতদিন আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানতেন না তারাও আমাদের সংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

আদ্দিস আবাবা যাওয়ার আগে চিফ লুথুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গ্রোটভিলে যাই। ওই শহরের একটি নিরাপদ জায়গায় আমরা বৈঠকে মিলিত হই। তার স্মরণশক্তি বরাবরই খারাপ ছিল। তাকে না জানিয়ে এমকে গঠনের জন্য তিনি

তামিল করলাম। কাউকে কিছু বুঝতে দিলাম না। আমার আচার-আচরণে কারও মধ্যে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়নি।

প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর শ্রমিকরা খামার ছেড়ে বাড়িতে চলে যেত। থেকে যেতাম শুধু আমি। সকাল পর্যন্ত খামারের ওই নির্জন বাড়িতে আমাকে একা থাকতে হত। অনেক সময় বিকেল বেলা বৈঠকে চলে যেতাম। ফিরতাম গভীর রাতে। ওই সময় ফিরতে অস্বস্তি লাগত। ভয় শঙ্কাও মনে উঁকি দিত। তার অনেক কারণ ছিল। ওই এলাকাটা ভালোমত চিনতাম না। পথঘাট চিনতে প্রায়ই সমস্যা হত। খামারের ওই বাড়িতে আমার বসবাসটাও ছিল অবৈধ। যে নামে আমাকে সবাই চিনত সেটাও ছিল ভুয়া। সব মিলিয়ে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে আমাকে থাকতে হত। রাতে ভাল ঘুম হত না। এছাড়া একজন মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে বেশিক্ষণ ঘুমাবারও অবকাশ নেই।

কয়েক সপ্তাহ পর আরেকটি খামারে চলে গেলাম। এখানে আমার সঙ্গে রেমন্ড এমলাবা ছিলেন। তিনি পোর্ট এলিজাবেথ থেকে এখানে আসেন। রেমন্ড ছিলেন ট্রেডইউনিয়ন নেতা। কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। এএনসির যে কয়জন নেতা প্রথম দিকে গ্রেফতার হন তাদের একজন। এএনসির নবগঠিত সামরিক শাখা এম কের সদস্য হিসেবে তাকে আমরা বেছে নেই। তিনি তখন সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য চিন যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সে কারণেই তার এখানে আসা।

রেমন্ড রাতে আমার সঙ্গে থাকলেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। এএনসির সামনে কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে আমাকে একটা ধারণা দিলেন। রেমন্ড চলে যাওয়ার পর ক্ষণিকের জন্য মাইকেল হারমেলের কাছে চলে যাই। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির আন্ডারগ্রাউন্ডের একজন নেতা। কংগ্রেস অব *ডেমোক্র্যাটসের* প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। এছাড়া *লিবারেশন ম্যাগাজিনের* সম্পাদক হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করতেন। আন্ডারগ্রাউন্ডে কমিউনিস্ট পার্টির যেসব সদস্য কাজ করতেন তাদের নিরাপদে থাকার, কাজ দেয়ার গুরু দায়িত্বটি তিনি পালন করতেন।

একই ছাদের নিচে থাকলেও মাইকেলের সঙ্গে আমি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতাম। কাজের সময় তার কাছেও ভিড়তাম না। কথা বলতাম না। আফ্রিকান ভৃত্য হিসেবে আমার কাজ আমি করে যেতাম। মাইকেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে শ্বেতাঙ্গদের সেটা ঘুণাক্ষরেও কখনও বুঝতে দেইনি।

কাজ-কর্ম সেরে রাতের বেলা মাইকেলের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতাম। কমিউনিস্ট পার্টি ও এএনসির সম্পর্ক নিয়েই আমরা বেশি আলোচনা করতাম। মিটিং থাকায় একদিন রাতে খামারে ফিরতে দেরি হল। আমার ধারণা ছিল খামারের সব বাতি নেভানো। সেখানে কেউ নেই। কিন্তু এসে

দেখি বাসার সব বাতি জ্বলছে। দরজা খোলা। রেডিও চলছে। পাশেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন মাইকেল। দেখে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ যেখানে আমরা চোর-পুলিশ লুকোচুরি খেলছি সেখানে এমন খোলামেলা পরিবেশ আসা করিনি। মাইকেলকে জাগালাম। রেডিও ছেড়ে রাখা ও বাতি জ্বালিয়ে রাখার জন্য রীতিমত ভৎসনা করলাম। তিনি কিছুটা রাগ করলেন। বললেন, নেল বড্ড ঘুম পাচ্ছে। এখন বিরক্ত করো না।

কিছুদিনের মধ্যেই আর্থার গোল্ডরিচ স্বপরিবারে এখানে চলে আসেন। স্থানীয় একটি কুটির ভাড়া নেন। আমিও তাদের সঙ্গে ওই বাড়িতে আশ্রয় নেই। বাড়িতে কাজের লোক সেজে তাদের সঙ্গে অবস্থান করতে থাকি। আর্থারের উপস্থিতিতে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। নিরাপত্তার চিন্তাটা আপাতত দূর হয়। তিনি পেশায় ছিলেন শিল্পী ও ডিজাইনার। কংগ্রেস অব ডেমোক্র্যাটসের সদস্য এবং এমকের একেবারে প্রথমদিকের সদস্য।

তিনি যে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সেটা পুলিশ ঘুণাক্ষরেও জানত না। এজন্য পুলিশ কখনও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি বা তার বাসায় তল্লাশি চালায়নি। ১৯৪০ এর দশকে আর্থার ফিলিস্তিনে ইহুদিদের একটি সশস্ত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গেরিলা যুদ্ধের ব্যাপারে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। ছিল যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। এগুলো আমার বেশ কাজে আসে।

এখানে মিস্টার জেলিম্যানের একটি খামার ছিল। তিনি এএনসির সদস্য না হলেও বর্ণবৈষম্য, জুলুম নির্যাতনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। একদিন তার সম্মানে আমি নাস্তা ও দুপুরের খাবারের আয়োজন করি। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে তাকে নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করি। আমার চেষ্টা সফল হয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

আমার এই কঠিন জীবন সংগ্রামের মাঝে হঠাৎ একদিন আনন্দের ঢেউ ওঠে। একদিন গোল্ডারিচের বাসায় আমার স্ত্রী উইনি ও পরিবারের লোকজন এসে হাজির হন। তাদের দেখে খুবই পুলকিত হই। এরপর থেকে উইনি মাঝে মধ্যেই এ বাসায় আসতেন। তার গতিবিধির ব্যাপারে আমরা খুবই সতর্ক থাকতাম। উইনি দুটি ড্রাইভার নিয়ে রওয়ানা হতো। প্রথম ড্রাইভারকে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত এসে তাকে নামিয়ে দিত। এরপর দ্বিতীয় ড্রাইভার নিয়ে খামার এলাকা পর্যন্ত আসত।

এখানে এসে তাকেও নামিয়ে দেয়া হত। উইনি নিজে গাড়ি চালিয়ে গোল্ডরিচের বাড়িতে আসতেন। পুলিশ কখনই তার গতিবিধি অনুসরণ করেনি। এ বাড়িতে গোপনীয়তা বজায় রেখেই আমরা থাকতে থাকি। উইনি আসলে বাড়ির আঙিনায় আমার ছেলে মেয়েরা খেলাধুলা করত, হৈচৈ-এ মেতে থাকত। আমার খুব ভাল লাগত।

উইনি আমাকে একটি পুরনো রাইফেল এনে দিয়েছিল। এটি অরল্যান্ডোতে ছিল। আর্থার ও আমি এ রাইফেল দিয়ে নিশানা ঠিক করতাম।

একদিন বাড়ির পাশেই নিশানা ঠিক করার জন্য রাইফেল দিয়ে প্র্যাকটিস করছিলাম। গাছে অনেক চড়ুই পাখি ছিল। সেগুলোকে গুলি করে মারার চেষ্টা করছিলাম। আর দূরে দাঁড়িয়ে আর্থারের বউ হাজেল মজা করছিলেন। তিনি বার বার বলছিলেন, আমি কখনই নিশানামত গুলি লাগাতে পারব না। তার এ কথা শেষ হতে না হতেই আমি একটি চড়ুই পাখিকে ধরাশায়ী করে নিচে ফেলে দেই। পাখিটি তার সামনে নিয়ে যাই। নিজের বীরত্বের বর্ণনা দিতে থাকি। এমন সময় আর্থারের ৫ বছরের ছেলে পল হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। তার এই কান্না ছিল ছোট্ট ওই পাখিটির জন্য। তার মমত্ববোধ আমাকেও নাড়া দেয়।

৪৫

এমকে কি কি কাজ করবে, কিভাবে করবে সে ব্যাপারে একটা কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করি। আমরা সিদ্ধান্ত নেই এমকে চার ধরণের কাজ করবে। সেগুলো হচ্ছে নাশকতা, গেরিলা যুদ্ধ, সন্ত্রাস ও সরাসরি বিদ্রোহ। আমাদের সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল কম। সাংগঠনিক ভিত্তিও খুব একটা মজবুত হয়নি। অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদও ছিল খুব অল্প। তাই এ ধরণের ক্ষুদ্র আয়োজনে বিপ্লব করাটা ছিল প্রায় অসম্ভব। সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর মত শক্তি-সামর্থ তখনও আমাদের হয়ে ওঠেনি। কাজেই এটিও আপাতত মাথা থেকে বাদ দিতে হল। গেরিলা যুদ্ধ করার সামর্থ থাকলেও দলের নীতি আদর্শের কারণে সেটি থেকেও সরে দাঁড়াতে হল। কারণ এমকে গঠনের সময় সহিংসতা ও সাধারণ মানুষের ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার অঙ্গীকার করেছিলাম। গেরিলা যুদ্ধ করলে সাধারণ লোকজন কোন না কোনভাবে হতাহত হবে। তাই এ পথে পা বাড়ানোও ওই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আমাদের সামনে পথ খোলা থাকে একটি। সেটি হচ্ছে স্যাবোটাজ বা নাশকতামূলক তৎপরতা। এখানে প্রাণহানীর সম্ভাবনা ছিল কম। এ কাজে লোকজনের প্রয়োজন ছিল কম। শ্বেতাঙ্গদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলার ইচ্ছা আমাদের কখনও ছিল না। কারণ এতে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ গৃহযুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনা ছিল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে ভয় পাইয়ে দেয়া যাতে আমরা আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারি।

নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর জন্য আমরা সামরিক স্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, টেলিফোন লাইন, সড়ক ও রেলপথ ইত্যাদি স্থানকে বেছে নিলাম। নাশকতা চালানোর আগে এম কে সদস্যদের কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয় যাতে প্রাণহানী না হয়। নাশকতায় কাজ না হলে আমরা পরবর্তী ধাপ গেরিলা যুদ্ধ ও সন্ত্রাসী তৎপরতা নিয়ে এগুনোর চিন্তা ভাবনা মাথায় রাখি।

কাজ শুরুর আগে আমরা এমকের সাংগঠনিক কাঠামোটা ঠিক করে নেই। এ সংগঠনের সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করা হয় *ন্যাশনাল হাই কমান্ডের* ওপর। প্রতিটি প্রদেশের দায়িত্ব দেয়া হয় রিজিওনাল বা আঞ্চলিক কমান্ডের হাতে। এর পরের স্তরগুলো ছিল লোকাল কমান্ড ও সেল। দেশজুড়ে রিজিওনাল কমান্ড গঠন করা হয়। এর অধীনে রাখা হয় অনেকগুলো সেল।

কেপ শহরেই এ ধরণের ৫০টি সেল ছিল। হাই কমান্ডের কাজ ছিল কর্মকৌশল ঠিক করা ও টার্গেট নির্ধারণ করে দেয়া। এছাড়া প্রশিক্ষণ ও অর্থ যোগানের দায়িত্বও ছিল এ কমান্ডের অধীনে। মানুষের জানমালের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সে ব্যাপারে এমকে হাই কমান্ড ছিল খুবই সজাগ। এ ব্যাপারে সংগঠনের সদস্যদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়।

এমকের সদস্যরা এএনসির প্রতি অনুগত থাকবে না এমকের প্রতি অনুগত থাকবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। কারণ এমকের অধিকাংশ সদস্যকে নিয়োগ দেয়া হয় এএনসি থেকে। এজন্য এএনসি নেতারা ভাবতেন এমকের সদস্যরা তাদের কথা মতই চলবে। এ নিয়ে কিছু বিরোধ সৃষ্টি হবার পর এ প্রশ্নটি বড় হয়ে ওঠে। একবার স্থানীয় এক এএনসি নেতা দেখলেন দলের বৈঠকে কিছু সদস্য অনেক দিন ধরে অনুপস্থিত। একদিন তিনি এদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি গত রাতে দলের বৈঠকে উপস্থিত ছিলে না কেন? ওই সদস্য জবাব দেন, তিনি গত রাতে আরেকটি বৈঠকে ছিলেন। নেতা ওই বৈঠক সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানাতে অস্বীকার করেন। পরে তিনি জানতে পারেন, ওই সদস্য এমকের বৈঠকে নিয়মিত যোগ দেন। এজন্য এএনসির বৈঠকে থাকতে পারেন না। এ নিয়ে দলের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। পরে সিদ্ধান্ত হয়, এএনসির যেসব সদস্য এমকেতে যোগ দিয়েছে তারা তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্থানীয় এএনসি নেতাকে অবশ্যই অবহিত করবে।

ডিসেম্বর মাস। লিলিসলিফের খামারে দুপুর বেলায় রান্না-বান্নার কাজ করছিলাম। রেডিও খোলা ছিল। এমন সময় ঘোষককে বলতে শুনি, চিফ লুথুলি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। অসলো থেকে পুরস্কার আনার জন্য সরকার তাকে ১০ দিনের ভিসা দিয়েছে। আমি ও দলের অন্যরা এ খবর শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। মনে হল আমাদের মহান আন্দোলনের প্রথম স্বীকৃতি এটি। দলের প্রধান হিসেবে তিনি যে লড়াই করে যাচ্ছেন এটি তার প্রতিদান। পশ্চিমারা যে আমাদের ন্যায্য আন্দোলনকে নৈতিকভাবে মেনে নিয়েছে তার প্রমাণ এই নোবেল পুরস্কার। লুথুলি একজন ভয়ংকর নেতা– এমন অপবাদ তার বিরুদ্ধবাদীরা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় তার সে কলংক ঘুচে গেল। অধিকন্তু বিরাট মর্যাদার তিলক বসল তার কপালে। যখন পুরস্কার ঘোষণা করা হয় তখন লুথুলি ছিলেন নাটালে। সরকার তাকে রাজনীতিতে ৫ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল। সে নিষেধাজ্ঞার তিন বছর অতিক্রম হয়েছিল সে সময়।

আমাকে রীতিমত ভৎর্সনা করেন। এমকে গঠনের ব্যাপারে বিভিন্ন বৈঠকে যেসব আলোচনা হয় সেগুলো তাকে স্মরণ করিয়ে দেই। এতে তার ভুল ভাঙ্গে।

যাওয়ার আগের রাতটা স্ত্রী উইনির সঙ্গে কাটাই। এক শ্বেতাঙ্গ বন্ধুর বাড়িতে বেশ ভালোভাবেই আমার রাত কাটে। উইনি একটি নতুন স্যুটকেস নিয়ে এসেছিল। সব মালপত্র সেই গুছিয়ে দেয়। আমার দেশ ছাড়া নিয়ে সে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকে। আবার পরক্ষণেই আমাকে উৎসাহ দেয়। ওই দিন উইনির আচরণ ছিল ঠিক একজন দক্ষ সৈনিকের মত।

দলের তত্ত্বাবধানে প্রথমে আমাদের তাঞ্জানিয়ার দারুসসালামে যাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে বিমানে করে আদ্দিস আবাবা যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরে এ পরিকল্পনা তছনছ হয়ে যায়। সফরে ওয়াল্টার সিমুলু আহমেদ কাদরাদা ও ডুমা নায়েক আমার সঙ্গী ছিলেন। তাদের নামেই বিমানের টিকিট করা হয়। আমি কিভাবে যাব সেটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঠিক করতে পারিনি। আহমেদ নির্ধারিত সময়ে বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু কাদরাদা ও ডুমা আসেন অনেক দেরিতে। আমি শেষ পর্যন্ত ভিন্ন পথে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। নিরাপত্তার কথা ভেবে কেথি আমাকে বিচুয়ানাল্যান্ড দিয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে যেতে বলেন। সেখানে অনেক হাল্কা বিমান ছিল। এ বিমানে করে গন্তব্য স্থান আদ্দিস আবাবায় যাওয়া সম্ভব ছিল। এমন সময় খবর পেলাম আসার পথে ডুমা ও ওয়াল্টার গ্রেফতার হয়েছেন।

ভয় আর শঙ্কা নিয়ে বিচুয়ানাল্যান্ডের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। এ সময় পুলিশের কথা চিন্তা করে খুব নার্ভাস হয়ে পড়ি। এ ছাড়া ওই জায়গাটি ছিল আমার কাছে অপরিচিত। সবমিলিয়ে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল লোবাসতি। এটা দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। কোন সমস্যা ছাড়াই সীমান্ত পার হয়ে লোবাসতিতে পৌঁছি। সেখানে যেতে বিকেল হয়ে যায়। যাওয়ার পরপরই একটি টেলিগ্রাম পাই। এটি আমার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। সেখানে লেখা ছিল দারুসসালাম কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের জন্য আমার সফর স্থগিত করেছে। এ সময় আমার সঙ্গে ছিল আমার একান্ত ভক্ত ট্রিসন ট্রিয়ানিস ফিস কেটসি।

বিকেলে প্রফেসর কে. টি মটসেটির সঙ্গে দেখা করি। তিনি ছিলেন বিচুয়ানাল্যান্ড পিপলস পার্টির সভাপতি। সাবেক এএনসি সদস্যদের নিয়েই মূলত এ দল গঠন করা হয়। সফর স্থগিত করায় অপ্রত্যাশিতভাবে কিছুটা সময় পেয়ে যাই। এ সময় পড়াশুনা করতাম। সম্মেলনের বক্তৃতায় কি বলবো তা গুছাতে থাকি। বিকেলে পাহাড়ে, বনে ঘুরে বেড়াতাম। জায়গাটি ছিল সীমান্ত এলাকা। তাই সব সময় সাবধান থাকতে হত। ঘোরাঘুরির সময় সঙ্গে থাকত ম্যাক্স এমলন ইয়েন। সে আমার বন্ধু ট্রান্সফির ছেলে।

শিগগিরই জো ম্যাথিউসের সঙ্গে যোগ দিলাম। তিনি বাসুতোল্যান্ড থেকে এসেছিলেন। তাকে তাড়াতাড়ি দারুসসালামের দিকে যাত্রা করতে বললাম। কারণ লোবাসতি আমার কাছে নিরাপদ জায়গা বলে মনে হল না। কিছু দিন আগে এখান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ এএনসির এক কর্মীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। সে জন্য আমার মনে হল তাড়াতাড়ি লোবাসতি ত্যাগ করাটাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। একটি বিমান প্রস্তুত করা হল। আমাদের এবারের গন্তব্যস্থান ছিল কানসান। এটা বিচুয়ানাল্যান্ডের উত্তরে অবস্থিত একটি শহর। ভৌগলিকভাবে জায়গাটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ।

চারটি দেশের সঙ্গে ওই শহরের সীমানা ছিল। বিচুয়ানাল্যান্ড, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেসিয়া, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকাসহ আরো কয়েকটি আফ্রিকান কলোনীর সীমান্ত ছিল সানসানের সঙ্গে। বিমান যেখানে অবতরণ করল সেটা ছিল পানিতে ঘেরা একটি জায়গা। চারদিকে ছিল ঝোপঝাড়। ছোট গাড়িতে করে সেখান থেকে হোটেলের দিকে যেতে হয়। বিমান থেকে নেমে দেখি রাইফেল হাতে হোটেলের ম্যানেজার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি জানালেন বন্য হাতির পালের খপ্পরে পড়েছিলেন। তাই যথাসময়ে আসতে পারেননি। আমরা খোলা জিপে করে রওয়ানা দিলাম। ম্যানেজার ছিলেন সামনে। জো আর আমি বসলাম পেছনে। দেখলাম একটি সিংহী ঝোপের ভিতরে ঝিমুচ্ছে।

খুব সকালে এমবিয়ার উদ্দেশ্যে হোটেল ত্যাগ করলাম। এটা তাঞ্জানিয়ার একটা শহর। রোডেসিয়া সীমান্তের কাছে অবস্থিত। আমরা ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের ওপর দিয়ে উড়ে গেলাম। বন-পাহাড় অতিক্রম করে সামনের দিকে যেতে থাকলাম। পার্বত্য এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় পাইলট এমবিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেখান থেকে কোন উত্তর এল না। আবহাওয়া ছিল খুব খারাপ। পর্বতের ওপর দিয়ে বাতাস বইছিল খুব জোরে। বিমান দুলতে লাগল। উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গের মত আমাদের বিমান একবার ওপরে ওঠে আবার নিচে নামে। বিমান এবার মেঘের ভিতর দিয়ে চলতে শুরু করল। সবচেয়ে বড় সমস্যায় ফেলল কুয়াশা। ঘন কুয়াশার কারণে পাইলট গন্তব্যস্থান ঠাওর করতে পারলেন না। বিপদ সংকেত বাজালেন। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, জীবনের হয়ত এখানেই শেষ। প্রাণ রক্ষা করা আর সম্ভব হবে না। বিমান দুর্ঘটনায়ই আমাদের মরতে হবে।

যাই হোক বিপদ শেষ পর্যন্ত কেটে গেল। পাইলট নির্ধারিত জায়গায় আমাদের হাল্কা বিমান অবতরণ করাতে সক্ষম হলেন।

স্থানীয় একটি হোটেলে উঠলাম। হোটেলের বারান্দায় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গরা জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। আফ্রিকা মহাদেশের কোন জায়গায় এই প্রথম এ ধরণের দৃশ্য দেখলাম। আমরা মি. মাওয়াকাঙ্গালের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তিনি ছিলেন সেখানকার একজন পার্লামেন্ট সদস্য। তিনি আমাদের আগমনের কথা শুনে আমাদের খোঁজাখুঁজিও শুরু করে দিয়েছিলেন। রিসিপসনিস্টের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন আফ্রিকার কোন অতিথি হোটেলে এসেছেন কিনা। শ্বেতাঙ্গ রিসিপসনিস্ট রমণী বেশ বিনয়ের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ স্যার দু'জন লোক আপনার খোজে এখানে এসেছেন। কিন্তু আমি তাদেরকে আপনার কথা জানাতে ভুলে গেছি। এ কথা শুনে মাওয়াকাঙ্গালা কিছুটা খেপে গেলেন। রাগ সামলে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ম্যাডাম সাবধান। ভবিষ্যতে খুব সতর্ক থাকবেন। আর যেন এমনটা না হয়। এরা আমাদের সম্মানিত অতিথি। তাদেরকে যথাযথভাবে সম্মান জানানো আমাদের কর্তব্য। আমি বুঝতে পারলাম আমরা এমন এক দেশে এসেছি যেখানকার শাসনকার্য চালায় কৃষ্ণাঙ্গরা। এখানে এসে নিজেকে বেশ স্বাধীন মনে করলাম।

পরের দিন দারুসসালামে গিয়ে পৌঁছলাম। জুলিয়াস নায়ারের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ছিলেন স্বাধীন হওয়া নতুন দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট। আমরা তার বাড়িতে গেলাম, বাড়িটা ছিল ছোটখাট। সাদামাটা গাড়ি ব্যবহার করতেন প্রেসিডেন্ট। এগুলো আমাকে মুগ্ধ করল। নারায়ে আমাকে বললেন, তিনি দেশের সব বর্ণের সব গোত্রের লোকের প্রেসিডেন্ট। তার কাছে সবাই সমান। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তিনি ছিলেন দূর্বল।

নায়ারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়। আমাদের সব বিষয় তাকে খুলে বলি এবং তার কাছে সাহায্য চাই। কিন্তু তার কথাবার্তায় হতাশ হই। সাবুকি জেল থেকে ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে সশস্ত্র আন্দোলন স্থগিত রাখতে বলেন। আমি তাকে বলি, এখন সশস্ত্র আন্দোলন থেকে সরে আসাটা হবে আত্মহত্যার শামিল। তিনি আমাকে সম্রাট হাইলি সিলাসির শরণাপন্ন হতে বলেন। তার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবারও প্রতিশ্রুতি দেন।

আমি দারে অলিভার টামবুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে যেতে পারিনি। আমার দেরি দেখে তার অধীনস্ত একজন কর্মচারীর কাছে একটি চিরকুট দিয়ে তিনি চলে যান। সেখানে লেখা ছিল লাগোসে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর একটি সম্মেলন হবে। সেখানে যেন আমি তার সঙ্গে দেখা করি। আমি আক্রার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বিমানে হাইমি বাসনার ও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বাসনারের অধীনে এক সময় আমি কর্মচারী হিসেবে কাজ করতাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি বাম ধারার রাজনীতি করতেন। কট্টর ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য তাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। তিনি ঘানা যাচ্ছিলেন রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার জন্য।

বিমান খার্তুমে থামল। কাস্টমসে চেকিংয়ের জন্য আমরা লাইন ধরে দাঁড়ালাম। জো ম্যাথিউস ছিলেন সবার সামনে। তারপর আমি। আমার পেছনে ছিলেন বাসনার ও তার স্ত্রী। আমার কোন পাসপোর্ট ছিল না। তাঞ্জিনিয়া কর্তৃপক্ষ আমাকে একটি চিঠি লিখে দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল– ইনি নেলসন ম্যান্ডেলা। গণপ্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক। তাকে তাঞ্জানিয়া ছাড়ার আবার ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আমি ইমিগ্রেশন কাউন্টারে বসা একজন বয়স্ক সুদানিকে চিঠিটি দেখালাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন। একটু হাসলেন। বললেন, বৎস তোমাকে সুদানে স্বাগতম। এরপর তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। চিঠির ওপর একটি সিল মেরে দিলেন। বাসনার আমার পেছনে ছিলেন। তিনি ওই বৃদ্ধ লোকটিকে অনুরূপ চিঠি দেখালেন। এবার তিনি ক্ষেপে গেলেন। বললেন, এটা কি। এটা তো কোন অফিসিয়াল কাগজ নয়।

বাসনার লোকটির কানে কানে বললেন, তার পাসপোর্ট নেই। তাঞ্জানিয়া কর্তৃপক্ষ তাকে এই চিঠিটি দিয়েছে। ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা ওই বৃদ্ধ বললেন, তোমার পাসপোর্ট থাকবে না কেন? তুমি তো শ্বেতাঙ্গ। তোমার অবশ্যই পাসপোর্ট থাকা উচিত। বাসনার বললেন, তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আদায়ের জন্য দেশের মাটিতে লড়াই করে যাচ্ছেন। এজন্য সরকার তাকে সাজা দিয়েছে। তাই পাসপোর্ট করতে পারেননি। সুদানি ভদ্রলোক বাসনারের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি শ্বেতাঙ্গ। তুমি এসব করবে কেন। জো আমার দিকে তাকালেন। তিনি বুঝেছিলেন আমি কি ভাবছি। আমাকে ফিস ফিস করে বললেন, এখানে হস্তক্ষেপ করো না। কারণ আমরা মেহমান। বাসনার আমার নিয়োগকর্তাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেসব শ্বেতাঙ্গদের একজন যিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। তাই তাকে ছেড়ে আমি চলে আসতে পারলাম না। জো এর সঙ্গে বিমানবন্দর ছাড়ার বদলে আমি ইমিগ্রেশন অফিসের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। ওই বৃদ্ধ কর্মকর্তা বুঝতে পারলেন বাসনারকে ছাড়া আমি যাব না। শেষমেষ তিনি বাসনারের চিঠিতে সিল দিয়ে বললেন, সুদানে তোমাকে স্বাগতম।

অলিভারকে সর্বশেষ দেখেছিলাম বছর দু'য়েক আগে। এজন্য তার চেহারাটা ঠিক খেয়াল ছিল না। আক্রা বিমানবন্দরে তিনি যখন আমাকে স্বাগত জানাতে

আসলেন তখন প্রথম দর্শনে তাকে চিনতে পারিনি। আর চিনবো কেমন করে। আগে অলিভার থাকতেন ক্লিন সেভ করে। পোশাক ছিল বেশ পরিপাটি। কিন্তু এখন তার মুখে লম্বা দাঁড়ি। মাথায় বড় বড় চুল। বেশভুষাও ফকিরের মত।

একজন মুক্তিযোদ্ধার যে ধরণের বেশভুষা থাকা দরকার তার পোশাক ছিল ঠিক তেমনি। তাকে দেখে প্রচণ্ড খুশি হলাম। আমাদের সংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত করলাম। অলিভার ঘানা, ইংল্যান্ড, মিশর ও তাঞ্জানিয়ায় এএনসির শাখা খুলেছেন, অন্যান্য দেশের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল।

অলিভারের সঙ্গে যেখানেই গেলাম সেখানেই দেখলাম তার সম্পর্কে সবার একটা ভালো ধারণা আছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, রাষ্ট্রদূত ও উচ্চ পদস্থ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল।

লাগোস সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐক্যবাদ আফ্রিকা। কোন রাষ্ট্র এখানে থাকবে, কোন রাষ্ট্র থাকবে না তা নিয়ে একটা মতভেদ ছিল।

আমি এ কনফারেন্সে যোগ দেই নি। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যাতে আমার দেশের বাইরে থাকার খবর জানতে না পারে সে জন্য আমি এ সিদ্ধান্ত নেই। আমার মূল লক্ষ্য ছিল আদ্দিস আবাবা সম্মেলনে যোগ দেয়া।

বিমানের পরিবেশ ছিল খুবই আনন্দঘন। ফুরফুরে মেজাজে সবাই খোশগল্প করতে লাগলাম।

বিমান খার্তমে যাত্রাবিরতী করলো। আমরা বিমান পাল্টিয়ে ইথিওপিয়ান এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে ওঠলাম। এখানে আমার নতুন অভিজ্ঞতা হল। দেখলাম বিমানের পাইলট একজন কৃষ্ণাঙ্গ। এর আগে কখনও আমি কৃষ্ণাঙ্গ পাইলট দেখিনি।

আক্রা থেকে আদ্দিস আবাবা যাওয়ার পথে বিমানে অনেকের সঙ্গে দেখা হল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, গাউর রাদেবি, পিটার মলটসি। প্যাকের অন্যান্য সদস্যরাও বিমানে ছিলেন। সবাই যাচ্ছিলেন আদ্দিস আবাবা সম্মেলনে যোগ দিতে। আমাকে দেখে তারা সবাই বিস্মিত হন। সবার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম।

আমি বিমানের সিটে বসলাম। একটু পরই বিমান ছুটে চলল ইথিওপিয়ার দিকে। দেশটির ইতিহাস মনে পড়ে গেল। ইথিওপিয়ার গেরিলা যুদ্ধের কথা। তারা লড়েছে ইতালির মত বিশাল শক্তির সঙ্গে।

ইথিওপিয়ার পূর্ব নাম আবিসিনিয়া। সুলায়মান নবী, রানী শাবা, যিশুখ্রিস্ট, মুসলমানদের প্রথম হিজরত হয় এই আবিসিনিয়ায় এবং তারা রাজার কাছ থেকে সমর্থন পেয়ে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাই মুসলমানসহ অনেকের স্মৃতি জড়িয়ে আছে দেশটির সঙ্গে। ইথিওপিয়া বহুবার বিদেশীদের দখলে গেছে। আবার স্বাধীন হয়েছে। আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের উত্থান হয় এখান থেকে। আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মত ইথিওপিয়াকেও ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। হাইলি সিলাসি ১৯৩০ ইথিওপিয়ার সম্রাট হন। দেশকে ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

ঠিক এ সময় ইতালির এক নায়ক মুসোলিনি দেশটিকে আক্রমণ করেন। এক ধাক্কায় দখল করে নেন ইথিওপিয়া। তখন আমি ১৭ বছরের টগবগে যুবক। ১৯৩৬ সালে ইতালিয়ান সৈন্যরা বেপরোয়া হয়ে উঠলে সম্রাট সিলাসি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। ১৯৪১ সালে যৌথবাহিনী ইতালিয়ান সৈন্যদের ইথিওপিয়া থেকে বিতাড়িত করে।

ইথিওপিয়ার ব্যাপারে বরাবরই আমার কৌতুহলটা বেশি ছিল। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকার চেয়েও ইথিওপিয়া সফরের প্রতি বেশি আগ্রহ ছিল। ইথিওপিয়া যাওয়ার সময় কেবলই মনে হল আমি নিজ বাড়িতে যাচ্ছি। যেখানে গ্রথিত আছে আমার শেকড়। কেননা ইথিওপিয়া থেকে উত্থিত আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের ধারণাই আমাকে প্রকৃতপক্ষে একজন আফ্রিকান করেছে। ইথিওপিয়ান সম্রাটের সঙ্গে করমর্দন করাকে আমার জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে ভাবতে থাকি।

আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল আদ্দিস আবাব। সম্রাটের রাজপ্রাসাদ এখানেই অবস্থিত। অভিজাত এলাকা মনে হলেও এখানকার অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। রাস্তায় ছাগল, ভেড়া ও গাড়ির ছড়াছড়ি ছিল। রাজপ্রাসাদ ছাড়াও আদ্দিস আবাবায় বিশ্ববিদ্যালয়, হোটেলসহ নানা ধরণের ছোটখাট স্থাপনা ছিল। এখানকার অভিজাত রাস হোটেলটিকে জোহান্সবার্গের সাদামাটা দালান কোঠার মতই মনে হল।

তখনকার ইথিওপিয়া সব দিক থেকেই পিছিয়ে ছিল। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তখন কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। সামাজিক বা জনকল্যাণমূলক বড় ধরণের

কোন প্রতিষ্ঠানও ছিল না। সরকারের মন্ত্রণালয় ছিল না। সবকিছু আবর্তিত হত রাজ প্রাসাদকে ঘিরে। সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সম্রাট। তার ইশারাতেই দেশ চলত।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর আগে প্রতিনিধিরা ছোট্ট শহর ডেবরা জাইদে জড়ো হলেন। এখানে বিশাল স্টেজ তৈরি করা হয়েছিল। মঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় ওলিভার ও আমি পাশাপাশি বসলাম। হঠাৎ শব্দ শুনতে পেলাম। আফ্রিকান ড্রাম পেটানোর শব্দ। অন্যান্য যন্ত্রসঙ্গীত ও গানেরও শব্দ। মনে হল কিছু একটা হচ্ছে। বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত সৈন্যরা পায়ে পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলেন। তারা একজনকে গার্ড অব অনার দিয়ে নিয়ে আসছিলেন। তিনি আর কেউ নন, ইথিওপিয়ার মহামান্য সম্রাট হাইলি সিলেসি। তাকে বলা হত আফ্রিকার সিংহ।

এই প্রথম আমি কৃষ্ণাঙ্গদের বড় কোন অনুষ্ঠান দেখলাম। এখানে সৈন্যরা ছিল কৃষ্ণবর্ণের। তাদেরকে যারা দিক নির্দেশনা দিচ্ছিলেন সেই জেনারেলরাও ছিলেন কালো। মঞ্চের অতিথিদেরও অবস্থা একই রকম। যে সব রাষ্ট্র প্রধান অনুষ্ঠানে এসেছেন তাদের সবাই কৃষ্ণাঙ্গ।

মনে হল কালোদের রাজত্বে এসে পড়েছি। কেন যেন মনে হতে থাকল আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে। আমার দেশের কালোদের জন্য কিছু একটা করতে পারব। এ সম্মেলন থেকে দেশের জন্য কিছু একটা আদায় করে নিতে পারব।

প্যারেডের পর ওলিভার ও আমি নিজেদের স্বীকৃতিপত্র তথা সনদপত্র আনতে যাই। মঞ্চের পাশেই আলাদা একটি স্থান থেকে এই সনদপত্র দেয়া হচ্ছিল। আগত সব প্রতিনিধির জন্য এটা সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি আমাদের সনদপত্র আটকে রাখা হয়েছে। উগান্ডার একজন প্রতিনিধির আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ এই কাজ করে। উগান্ডার ওই প্রতিনিধি অভিযোগ করে যে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ছোট গোত্রের নেতা মাত্র। পুরো দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতিনিধিত্ব করছি না। আমরা ওই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলি আমাদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আফ্রিকানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। সব গোত্রের জন্য এই সংগঠন উন্মুক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের সবচেয়ে বড় সংগঠন হচ্ছে এএনসি। আমাদের নেতা চিফ লুথুলি একজন জুলু। কর্তৃপক্ষ আমাদের বক্তব্য গ্রহণ করে এবং সনদপত্র দিয়ে দেয়। তখন বুঝতে পারলাম এএনসি সম্পর্কে আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশের নেতারাই কিছু জানে না। অনেকে এটিকে একটি ছোট্ট দল মনে করে।

সম্রাট সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন। তার পরনে ছিল সামরিক পোশাক। তাকে বেশ আত্মপ্রত্যয়ী মনে হচ্ছিল। এই প্রথম কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সরাসরি প্রত্যক্ষ করলাম।

ঠিক হল সম্রাটের পরে আমি বক্তৃতা করব। সকালের অধিবেশন আমাদের দু'জনের বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। বিগত কয়েক মাস ধরে সবাই আমাকে ডেভিড মটসামায়ি হিসেবে চিনত। এই প্রথম নেলসন ম্যান্ডেলা হিসেবে আবির্ভূত হলাম। বক্তৃতায় দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের আগাগোড়া বিবরণ তুলে ধরলাম। এ পর্যন্ত সরকার যেসব গণহত্যা চালিয়েছে সেগুলো উল্লেখ করলাম। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বুলহকের গণহত্যা।

১৯২১ সালে সেনাবাহিনীর চালানো ওই গণহত্যায় ১৮৪ জন বেসামরিক কৃষ্ণাঙ্গ নিহত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য ঘানা, নাইজেরিয়া, তাঞ্জানিয়াসহ বিভিন্ন দেশকে ধন্যবাদ জানালাম। তাদের চাপের কারণেই কমনওয়েলথ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এএনসির সশস্ত্র সংগঠন এমকের কথাও সম্মেলনে উল্লেখ করলাম। বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সব দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই তাদেরকে এই সশস্ত্র সংগঠন দাঁড় করাতে হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর রাতে এমকের বিস্ফোরণে গোটা দক্ষিণ আফ্রিকা প্রকম্পিত হয়েছে। আমার এ কথা শেষ হতে না হতেই ঘানার প্রধানমন্ত্রী কথাগুলো প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে আবার বলার অনুরোধ করলেন। এর পর আমার অভিজ্ঞতা তুলে ধরা শুরু করলাম। বললাম– আমার দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখানে ১০ মাস ধরে আমি নিষিদ্ধ। পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এখানে আসার আগে দেশবাসীকে আমি কথা দিয়ে এসেছি, কোন অবস্থাতেই চিরতরে দেশ ত্যাগ করব না। আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে দেশের জন্য কাজ করে যাব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি এ প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারব। দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরার আমার এ ঘোষণাকে সবাই তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানাল।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা যাতে আমার কথায় প্রভাবিত হয়ে আমাদের ন্যায্য আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে সেজন্যই আমাকে প্রথমে বক্তৃতা করতে দেয়া হয়। এছাড়া সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রকাশের ব্যাপারে আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে মতভেদ ছিল। কিন্তু আমার বক্তৃতা শুনে তাদের মতভেদ ঘুচে যায়। তারা বুঝতে পারেন, অস্ত্র হাতে তুলে নেয়া ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে বিকল্প কোন পথ নেই।

কেনেথ কাউন্ডার সঙ্গে ওলিভার ও আমি একান্ত বৈঠকে মিলিত হই। তিনি ছিলেন জাম্বিয়ার ভাবী প্রেসিডেন্ট ও ইউনাইটেড ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি অব

নদার্ন রোডেশিয়ার (ইউনিপ) শীর্ষ নেতা। জুলিয়াস নায়ারের মত কাউন্ডাও দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্য ও সংহতি নিয়ে শংকিত ছিলেন। প্যাক নেতা সাবুকি জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরামর্শ দিলেন তিনি। তার সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারলাম স্বাধীনতাকামী আরেক সংগঠন প্যাককে তিনি বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন। কাউন্ডা এক সময় এএনসির সদস্য ছিলেন। কমিউনিস্টদের সঙ্গে এএনসির জোটের ব্যাপারেও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

কাউন্ডাকে আমি বললাম, প্যাককে সমর্থন দেয়া ঠিক হচ্ছে না। এএনসিই দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় সংগঠন। কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতার জন্য এএনসিই লড়ছে। তাই ইউনিপের উচিত এএনসিকে সমর্থন দেয়া। কাউন্ডা আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, নেলসন আমি তোমার সমর্থক। চিফ লুথুলির শিষ্য। কিন্তু এরপরও আমার কিছু করার নেই। কারণ সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি বরং সিমন কাপউইপির সঙ্গে আলাপ কর। তাকে ম্যানেজ করতে পারলে আমার কাজটা সহজ হয়ে যাবে। কাপউইপি ছিলেন ইউনিপের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা। পরদিনই তার সেঙ্গ দেখা করার মনস্থ করলাম। বোঝাতে পারলাম না। তিনি বললেন, দলের বৈঠক ডেকে এএনসিকে সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

সারাদিন কাপউইপির সঙ্গে কাটালাম। অনেক কথাবার্তা বললাম। তার কথাও শোনলাম। তার কাছ থেকে গালগল্পই বেশি শোনা গেল। যেখানে সত্যের লেশমাত্র ছিল না। বুঝলাম প্যাক নেতারা তাকে ভালোমতই বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তার ভুল ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু কাজ হল না। কাপউইপি বললেন, কমিউনিস্ট পার্টি ও লিবারেল পার্টি মিলে এমকে গঠন করেছে।

আমি তাকে বললাম, এটা গাঁজাখোরি গল্পের মত। এখানে সত্যের লেশমাত্র নেই। কমিউনিস্ট ও লিবারেল পার্টির সম্পর্ক হচ্ছে সাপ বেজির মত। এরা মিলে এমকে গঠন করবে তা কোনদিন হতে পারে না। এমকে সম্পূর্ণভাবে এএনসির সংগঠন। শ্বেতাঙ্গদের অধিকার আদায়ের জন্য এটি কাজ করে যাচ্ছে। আমি প্যাকের মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করলাম।

তাদের কর্মকাণ্ডে খুব হতাশ হলাম।

আদ্দিস আবাবা সম্মেলন শেষ হলে মনে হল অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়েছি। তবে সেখানে যে অনেক কাজ পড়ে আছে সেটা বুঝতেও কষ্ট হল না।

ছাত্রজীবন থেকেই মিসরের প্রতি আমার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। আফ্রিকান সভ্যতার এই তীর্থভূমি স্বচক্ষে দেখার স্বপ্ন দেখতাম সবসময়। জাঁকজমকপূর্ণ শহর

কায়রো, এর পাশ দিয়ে বয়ে চলছে বিশাল নীল নদ। বিশ্বের বিস্ময় পিরামিড– এসব কিছুই আমাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত আকর্ষণ করত। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণের জন্য আদ্দিস আবাবা থেকে কায়রোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। এ সফরে আমাদের সঙ্গী ছিলেন অলিভার ও রবার্ট রেশা। কায়রো পৌঁছে প্রথম দিনেই গেলাম যাদুঘরে। সারাটা সকাল সেখানেই কাটালাম। যাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো ভালো করে দেখলাম। সেখান থেকে নোট নিলাম। নীল নদের উপত্যকায় মিশরীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন কিভাবে হল সে ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করলাম। আফ্রিকান জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আমার জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ করার জন্য এ কাজ করলাম। শ্বেতাঙ্গ তথা পশ্চিমাদের স্পর্শ ছাড়াই হাজার হাজার বছর আগেও আফ্রিকান সভ্যতা যে কতটা উন্নত ছিল এগুলো না দেখলে তা বোঝার উপায় নেই। একদিন সকালে আমি আবিস্কার করলাম মিসরীয়রা যখন শিক্ষা সংস্কৃতি আর স্থাপত্য বিদ্যায় সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে অবস্থান করছিল তখন শ্বেতাঙ্গরা ছিল বলতে গেলে মূর্খ। সমুদ্রের তুলনায় তাদের অবস্থান ছিল কুয়োর মধ্যে।

মিসর থেকে আমরা অনেক কিছু শিখলাম। আমাদের জন্য দেশটি ছিল একটি মডেল। প্রেসিডেন্ট নাসেরের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংস্কার ব্যবস্থার সুফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলাম। তিনি ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার পরিধি ব্যাপকভাবে হ্রাস করেন। অর্থনীতির অনেক সেক্টর সরকারীকরণ করেন। শিল্পের প্রসার ঘটান। যুগোপযোগি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। সেনাবাহিনীকে আধুনিক ও শক্তিশালী করেন।

প্রেসিডেন্ট নাসেরের এসব সংস্কার আমাদের চোখ খুলে দেয়। এএনসি ক্ষমতায় গেলে আমরাও এ ধরণের সংস্কার করবো বলে মনস্থির করি। তখন দক্ষিণ আফ্রিকার মত মিসরেরও শক্তিশালী সেনা নৌ ও বিমান বাহিনী ছিল। এ জিনিসটি আমাকে দারুণভাবে পুলকিত করে।

পরদিন অলিভার লন্ডন চলে গেলেন। যাবার আগে রবি ও আমার সঙ্গে ফের ঘানায় দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। আমরা আফ্রিকা সফর অব্যাহত রাখি। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল তিউনিসিয়া। সেখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি দেখতে অনেকটা চিফ লুথুলির মত ছিলেন। তার কথাবার্তা আমাদের কাছে সন্তোষজনক মনে হল না। আমি তার কাছে দেশের পরিস্থিতি, প্যাক নেতা সুবুকির জেলে অবস্থানসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দেন। বলেন, সুবুকি জেল থেকে বের হলে তোমরা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। এএনসির বা এমকের অস্তিত্ব থাকবে না। অলিভার ভদ্রলোকের কথায় বেশ অসন্তুষ্ট হন। রাগে ক্ষোভে ফুলে ওঠেন। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে চেপে যান। পরের দিন প্রেসিডেন্ট হাবিব বারগুইবার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হই। তিনি আমাদের কথায় বেশ সন্তুষ্ট হন। এমকে সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ৫ হাজার পাউন্ড আমাদের হাতে তুলে দেন।

তিউনিস থেকে আমরা যাই মরক্কোর রাবাতে। এ শহরের দৃষ্টিনন্দন ভবন, জাঁকজমকপূর্ণ দোকান-পাট, চোখ ধাঁধানো মসজিদ আমাদের মুগ্ধ করে। আফ্রিকা, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের মিশ্র সংস্কৃতি ছিল এখানে। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও মরক্কোর একটা বড় ধরণের ভূমিকা ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা মরক্কোয় নিরাপদ আশ্রয় পেতেন। মরক্কো সীমান্ত দিয়ে নিজ নিজ দেশে অবাধে যাতায়াত করতে পারতেন। মোজাম্বিক, এঙ্গোলা, আলজেরিয়া, কেপভারফেসহ বিভিন্ন দেশের মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে রাবাতে আমাদের দেখা করার সৌভাগ্য হয়। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করি। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু জানতে পারি।

রাবাত ছিল আলজেরিয়ান রেভুলিশনারি আর্মির (এফ এল এন) সদর দপ্তর। এটা ছিল আলজেরিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সবচেয়ে বড় সংগঠন। আমরা এই সদর দপ্তরে কয়েকদিন অবস্থান করি। এ সময় মরক্কোয় নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করি। রাষ্ট্রদূত ড. মোস্তফা ফরাসিদের বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদেরকে শোনান।

তখন আলজেরিয়ার অবস্থাও ছিল প্রায় আমাদের মত। শ্বেতাঙ্গরা সেখানকার আদিবাসীদের শাসন করত। আর তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করত স্বাধীনতাকামী বীর সৈনিকরা। ড. মোস্তফা জানান, এ এল এন, মুষ্টিমেয় মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৫৪ সালে এক যুদ্ধে তারা ফ্রান্সের বিশাল এক বাহিনীকে ধরাশায়ী করে। এর পর থেকে তাদের মনোবল বেড়ে যায়। তারা বুঝতে পারেন, একদিন না একদিন তাদের লক্ষ্য পূরণ হবে।

তবে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের মাধ্যমে ফ্রান্সের মত বিশাল শক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব নয় এটাও তারা বুঝত। তাই সরাসরি যুদ্ধের পরিবর্তে তারা গেরিলা যুদ্ধকে বেছে নেয়। ড. মোস্তফা আমাদের বলেন, গেরিলাযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য শত্রু বাহিনীকে সরাসরি যুদ্ধে পরাজিত করা নয়। এর মূল উদ্দেশ্য শত্রুদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করা। এতে তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তিনি আমাদেরকে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি রাজনীতির মাঠ গরম রাখারও পরামর্শ দেন। বিশ্ব জনমত নিজেদের অনুকুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে বলেন। ড. মোস্তফার মতে, এক বহর জঙ্গি বিমানের চাইতে কোন দেশের সমর্থন বেশি শক্তিশালী।

এখানে ৩ দিন অবস্থানের পর আমরা ওজুদার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। এটা ছিল আলজেরিয়ার সীমান্তবর্তী মরক্কোর একটি মরু শহর। মরক্কোয় আলজেরিয় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরও ছিল এখানে। আমরা আলজেরিয় সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট পরিদর্শন করি। এসময় সীমান্তের ওপারে ফরাসি সৈন্যদের যাতায়াত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

দুদিন পর আহমেদ বিন বেলার সম্মানে এখানে একটি সামরিক প্যারেডের আয়োজন করা হয়। তিনি ছিলেন স্বাধীন আলজেরিয়ার ভাবী প্রথম প্রধানমন্ত্রী। আমাকে এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি করা হয়।

আদ্দিস আবাবায় আমি সেনাবাহিনীর প্যারেড দেখেছি। গেরিলাদের প্যারেড দেখলাম এই প্রথম। প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সৈন্যরা ছিল সুশৃংখল। সুসজ্জিত পোশাক ছিল সবার পরণে। যেসব রাইফেল তারা ব্যবহার করতেন সেগুলি নিয়েই প্যারেডে অংশ নেন। প্যারেডে সৈন্যরা অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রও প্রদর্শন করে। এগুলোর মধ্যে ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে ইথিওপিয়ান সেনাবাহিনীর মত এদেরকে ততটা স্মার্ট মনে হল না। এ প্যারেড দেখে মনে হল আমরা যে সেনাবাহিনী গড়ে তুলছি সেটা হবে এরও চেয়ে অনেক সুশৃংখল, অনেক উন্নত।

প্যারেডের শেষ পর্যায়ে এল ব্যান্ড দল। এ দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন একজন সুদানী। তিনি রাতের অন্ধকারের মত কালো। তাকে দেখে আমার মন ভরে উঠল। আমার মধ্যে জাতীয়তার জোয়ার বইতে শুরু করল। তিনি বাদ্যের তালে সংগীত পরিবেশন করছিলেন। আরেকটু এগিয়ে আসতেই আমরা দুজন উঠে দাঁড়িয়ে যাই তার সঙ্গে গান গাওয়া শুরু করি। আশপাশে তাকিয়ে দেখি সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ মরক্কোয় কৃষ্ণাঙ্গ লোক ছিল খুব কম। কিন্তু এরপরও আমরা গান গাইতে থাকি।

মরক্কো থেকে সাহারা পার হয়ে আমি যাই বামাকোতে। এটা মালির রাজধানী। সেখান থেকে যাই গায়ানা। প্লেনের পরিবর্তে লোকাল বাসে করে সেখানে যাই। যাওয়ার নানা দৃশ্য চোখে পড়ে। রাস্তায় হাঁস মুরগী গরু ছাগল ছোটাছুটি করছে। মহিলারা ছুটছে বাজারের দিকে। কারো হাতে ব্যাগ, কারো মাথায় শাক-সব্জীর বোঝা।

আমার পরবর্তী গন্তব্য ছিল সিয়েরালিয়েন। যখন সেখানে পৌঁছি তখন পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরু হয়েছে মাত্র। আমি অধিবেশনে যোগ দেয়ার মনস্থ করলাম। অন্যান্য পর্যটকের মত আমাকেও পার্লামেন্টে ঢুকতে দেয়া হল। আমার আসনটি ছিল স্পীকারের খুব কাছাকাছি। স্পীকার আমার পরিচয় তুলে ধরতে বললেন। তার কানে কানে বললাম, আমি দক্ষিণ আফ্রিকার চিফ লুথুলির প্রতিনিধি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে হাত মেলালেন। অন্যান্য পর্যটকদের আসন থেকে উঠিয়ে আমাকে বিশেষ একটি আসনে নিয়ে বসালেন। এক ঘন্টার মধ্যে অধিবেশন শেষ হল। আমার সামনে চা-পানীয় দেওয়া হল। এরপর দেখলাম পার্লামেন্ট সদস্যরা লাইন ধরে আমার সঙ্গে করমর্দন করার জন্য এগিয়ে আসছেন। নোবেল বিজয়ী চিফ লুথুলির প্রতিনিধি হিসেবে তারা আমার প্রতি অত্যন্ত সম্মান দেখালেন। তাদের আচরণে আমি অভিভূত হলাম। নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করলাম। প্রধানমন্ত্রী মিলটন মারগেই আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এগিয়ে এলেন। তার সঙ্গে কথাবার্তা শেষে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলাম।

লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট টুবম্যানের ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে। দীর্ঘক্ষণ আলাপের পর টুবম্যান আমার হাতে ৫ হাজার ডলারের একটি চেক তুলে দেন। এ টাকা দিয়ে এমকের জন্য অস্ত্রশস্ত্র কিনতে বলেন। এখানেই শেষ নয়। এক পর্যায়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করেন, আমার পকেটে টাকা পয়সা আছে কিনা।

অকপটে বলে ফেলি, আমার পকেট একেবারে খালি। তিনি আমার হাতে একটি খাম তুলে দেন। তাতে নগদ ৪০০ ডলার ছিল। লাইবেরিয়া থেকে যাই ঘানা। সেখানে অলিভারের সঙ্গে দেখা হয়। তার সঙ্গে ঘানার আবাসন মন্ত্রী আব্দুল্লাহ দিয়ালও ছিলেন। এ সময় তাকে জানাই আমার সঙ্গে সিকো টুরির দেখা হয়নি। অমনি মন্ত্রী মহোদয় সিকোর সঙ্গে আমাদের দেখা করার ব্যবস্থা করে দেন। অলিভার ও আমি এতে বেশ আনন্দিত হই।

সিকো স্থানীয় একটি বাংলোয় থাকতেন। আমরা সেখানে গেলাম। সিকো আসলেন। তার পরণে ছিল সুসজ্জিত পোশাক। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আমাদের নানা সমস্যা তার কাছে তুলে ধরি। এএনসি ও এমকের আগাগোড়া ইতিহাস তাকে বলি। দলের জন্য ৫ হাজার ডলার সাহায্য চাই এবং এমকেকে সমর্থন দেয়ার অনুরোধ জানাই। তিনি মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শোনেন। এরপর বলেন, ভাতৃপ্রতীম দক্ষিণ আফ্রিকার ভাইদের সংগ্রামের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘকেও তারা অবহিত করেছেন। এই বলে তিনি চলে গেলেন। তার ব্যবহারে আমরা বেশ মনক্ষুণ্ন হই।

চলে আসার সময় সিকোর লেখা দুটি বই আমাদের উপহার হিসেবে দেয়া হয়। এতে আমাদের রাগ আরো বেড়ে যায়। আমরা হোটেলে চলে আসি। অন্য দেশে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করতে থাকি। এ সময় দরজায় টোকা পড়ে। খুলে দেখি পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা দাঁড়ানো। তার হাতে বিশাল একটি স্যুটকেস। তিনি ওটা দিয়ে দ্রুত চলে যান। খুলে দেখি টাকা আর টাকা। অলিভার বললেন, এটা হল সিকোর উপহার। কিন্তু ওই টাকা অন্যদেশে ছিল অচল। তাই অলিভার স্যুটকেস ভর্তি টাকা চেক দূতাবাসে নিয়ে গেলেন। সেখানে তার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি ওই টাকাগুলোর বদলে অন্য মুদ্রা দিয়ে দিলেন যেগুলো আফ্রিকার অন্য দেশেও চলত।

ডাকার আমাকে রীতিমত মুগ্ধ করে। এখানকার নদী, নদীর ওপর দিয়ে বয়ে চলা পালতোলা নৌকা, সুন্দর রাস্তাঘাট সবকিছুই ছিল দেখার মত। সেনেগালি মহিলারা নৌকায় করে দল বেঁধে শহরে আসত। কেনাকাটা করত। আবার যে যার গন্তব্যে চলে যেত। মার্কেটে ছিল নানা পণ্যের ছড়াছড়ি। তবে এখানে বিড়ি-সিগারেট ও ভালো সুগন্ধি পাওয়া যেত। অলিভার ও আমি অল্প সময়ের জন্য মার্কেটটা ঘুরে দেখি। সেনেগালের সংস্কৃতি ছিল মিশ্র। ফরাসি, মুসলিম ও আফ্রিকান সংস্কৃতির প্রতিফলন ছিল সেনেগালিদের মধ্যে।

আমরা প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সিঙ্গোর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। যাওয়ার পথেই অলিভারের হাঁপানির টান উঠল। শ্বাসকষ্ট দেখে অলিভারকে হোটেলে চলে যেতে

বললাম। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। প্রেসিডেন্ট ভবনে গিয়েই অলিভারের জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে বললাম। তার অবস্থা দেখে খোদ প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সিঙ্গো ঘাবড়ে গেলেন। ব্যক্তিগত ডাক্তারের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে অলিভারের চিকিৎসা দেখভাল করলেন। তখন সেনেগালের সৈন্যরা ফরাসি সৈন্যদের সঙ্গে আলজেরিয়ায় একটি অপারেশনে নিয়োজিত ছিল। তার জন্য লিওপোল্ডের চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ ছিল। তার ওপর অলিভারের এই অবস্থা তার উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সিঙ্গো ছিলেন অত্যন্ত গুণী ব্যক্তি। তিনি কবিতা লিখতেন, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পড়াশুনা করতেন। আলোচনার সময় লিওপোল্ড দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক সাকা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। অনেক কিছু জানতে চাইলেন। বললেন, সাকাকে নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন।

আলোচনা কালে দক্ষিণ আফ্রিকার সার্বিক পরিস্থিতি সংক্ষেপে তার কাছে তুলে ধরি। তাকে এমকের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাই। এছাড়া অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য নগদ সহায়তা চাই। প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেন, তার হাত পা এখন বাঁধা। পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

এমন সময় সেখানে আইনমন্ত্রী এম ডাবুসি আসলেন। তার উপস্থিতিতে সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আলোচনা করতে বললেন। প্রেসিডেন্ট একজন সুন্দরী ফরাসী রমনীর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন দোভাষী। এ রমণীর উপস্থিতিতে তাদের সঙ্গে সামরিক বিষয়াদি নিয়ে কথা বলতে ইতস্তত করছিলাম। প্রেসিডেন্ট বিষয়টি বুঝতে পারলেন। প্রেসিডেন্ট আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, ম্যান্ডেলা কোন ভয় নেই। ফরাসীরা আমাদের সঙ্গে আছে। তারা সহযোগিতা ছাড়া ক্ষতিকর কিছু করবে না।

আমাদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য প্রেসিডেন্ট আমাদেরকে সেখানে পাঠালেন। সঙ্গে দিয়ে দিলেন সেই ফরাসী রমণীকে যিনি দোভাষী হিসেবে প্রেসিডেন্ট ভবনে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মন্ত্রণালয় ভবনে অনেক কৃষ্ণাঙ্গ কর্মকর্তা দেখতে পেলাম। একজন কৃষ্ণাঙ্গ সচিব সেখানে ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, স্যার আপনি কি ইংরেজি জানেন। বললাম হ্যাঁ। বললেন, তাহলে মন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি ইংরেজিতে আলাপ করুন। কোন দোভাষীর প্রয়োজন হবে না। এরপর ওই দোভাষী রমণীকে সঙ্গে নিয়েই আমরা মন্ত্রীর রুমে গেলাম। আমাদের দাবি-দাওয়াগুলো বললাম। তিনি সেগুলো লিখে রাখলেন। তিনি সেগুলো বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরে অবশ্য কিছুই হয়নি। আমরা সেনেগালের কাছে যা চেয়েছিলাম তার কিছুই পাইনি। তবে মন্ত্রী মহোদয় আমাদের পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। লন্ডনে যাওয়ার টিকিট কিনে দিয়েছিলেন।

আমরা ডাকার থেকে পরবর্তী গন্তব্যস্থান লন্ডনের পথে রওয়ানা দেই।

৪৮

লন্ডনে গিয়ে আমি যেন ক্ষণিকের জন্য ইংরেজপ্রেমী হয়ে গেলাম। পশ্চিমা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার কথা ভাবলে আমার তখন ব্রিটেনের সংসদীয় পদ্ধতির কথা মনে হত। ইংরেজদের মনে হত অতিশয় ভদ্র জাতি। কিন্তু তাদের সাম্রাজ্যবাদের কথা মনে হলে মনে অনেক ঘৃণার উদ্রেক হত।

একাধিক কারণে ইংল্যান্ড গিয়েছিলাম। দেশটি দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। বই পুস্তকে ব্রিটেন সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছি। লোকজনের কাছে দেশটির ব্যাপারে অনেক গাল-গল্প শুনেছি। এছাড়া অলিভারের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো ছিল না। উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডন ছিল উপযুক্ত স্থান। এএনসির অনেক নেতা কর্মী লন্ডন থাকতেন। সব মিলিয়ে আমার লন্ডন সফরের উদ্দেশ্য ছিল একাধিক।

আব্দেলেইদ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে লন্ডনে থাকতেন। ইউসুফ দাদুও সেখানে ছিলেন। এএনসির এমন আরও অনেক নেতা তখন লন্ডন থাকতেন। লন্ডনে বই-পুস্তকের অভাব ছিল না। গেরিলা যুদ্ধের ওপর অনেক দুর্লভ বইপত্র সেখানে ছিল যা দুনিয়ার আর কোন জায়গায় পাওয়া যেত না।

লন্ডনে আবার পুরনো রূপ ধারণ করলাম। আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনে যেভাবে চলতাম এখানে ঠিক সেভাবে চলা শুরু করলাম। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসার কথা কাউকে বলতাম না। কারণ গোটা লন্ডনে দক্ষিণ আফ্রিকার নিরাপত্তা কর্মকর্তা ছিল। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গুপ্তচরের অভাব ছিল না। ১০ দিন লন্ডন ছিলাম। এ সময়টা খুব সতর্কতার সঙ্গে কাটাই। কিছু সময় এএনসির কাজে, কিছু সময় পুরনো বন্ধুবান্ধব ও দলীয় নেতা কর্মীদের দেখা করার আর বাকি সময় দর্শনীয় স্থান ঘুরে কাটাই। প্রেটরিয়ায় জন্ম নেয়া পুরনো বন্ধু মেরি বেনসনের সঙ্গে সেখানে দেখা করি। তিনি আমাদের আন্দোলন-সংগ্রামের কথা জানতেন। বহুবার তাকে চিঠি লিখে এসব ব্যাপার জানিয়েছি। অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবি, বিগবেন, পার্লামেন্ট ভবনসহ কয়েকটি দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করলাম। এসব ভবনের কারুকাজ, চাকচিক্য ও সৌন্দর্য আমাদের সত্যিই মুগ্ধ করে।

লোক মারফত জানতে পারলাম অবজারভার পত্রিকা প্যাক নিয়ে কাভারস্টোরি করতে যাচ্ছে। ওই রিপোর্টের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল প্যাক হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় দল। স্বাধীনতার জন্য তারাই সংগ্রাম করছে। আর এএনসি হচ্ছে একটি শেকেলে দল। দেশের জন্য তারা কিছুই করছে না।

পত্রিকাটি চালাতেন ডেভিড এসটর। অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে এসটারের সঙ্গে দেখা করি। এএনসির আদ্যোপান্ত তার কাছে তুলে ধরি। আমার কথায় কাজ হলো কিনা তখন বুঝতে পারিনি। কিন্তু পরে দেখি কাভারস্টোরির (মূল বা প্রচ্ছদ সংবাদ) চেহারাটাই বদলে গেছে। সব কথা গেছে এএনসির পক্ষে। এসটর আমাকে লেবারপার্টির এমপি ডেনিস হিলিকে সঙ্গে নিয়ে দেশের রাজনীতিবিদ, আমলা ও এমপিদের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। পরামর্শ মোতাবেক আমি লেবার পার্টির নেতা হ্যাগ গেইটসকিল ও লিবারেল পার্টি নেতা জো গ্রিমন্ডের সঙ্গে দেখা করি।

ব্রিটেন সফরের সময় শেষ হয়ে আসছিল। ইউসুফের সঙ্গে দেখা হল। অলিভার ও আমাকে আফ্রিকার নেতা, ইন্ডিয়ান ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের লোকজনের পক্ষ থেকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং এএনসির সঙ্গে প্যাকের পার্থক্য সম্পর্কে তারা জানতে চান। তাদেরকে বলি, আমরা শ্বেতাঙ্গ বিরোধী নই। শ্বেতাঙ্গদের নিয়েই আমরা চলতে চাই। আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে কালোদের প্রাপ্য অধিকার আদায় নিয়ে। তাদের ওপর যে শোষণ নির্যাতন করা হচ্ছে তার অবসান ঘটানো। অন্যদিকে প্যাক হচ্ছে কট্টর শ্বেতাঙ্গ বিরোধী একটি সংগঠন। ইউসুফের সঙ্গেও আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। তাকে জানাই, এএনসি সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি সংগঠন। সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই এটি এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

লন্ডনে শেষ রাতটা ইউসুফের সঙ্গে আলোচনা করেই কাটাই। কি জন্য আমরা সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে ধাবিত হলাম সেটা তাকে বুঝিয়ে বলি। তাকে জানাই, এখন আমাদের অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দরকার। এজন্য চাই আফ্রিকার দেশগুলোর সর্বাত্মক সহযোগিতা। এটা পেতে হলে এএনসির প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাতে পরিবর্তিত হয় সে উদ্যোগ নিতে হবে। এ কাজে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

ইউসুফ ভাবল অলিভার ও আমি এএনসির নীতি পরিবর্তনের মিশনে নেমেছি। আমরা বর্ণবাদ বিরোধী নীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরে সরে আসছি। আমি তাকে বললাম, ইউসুফ, তোমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা আমাদের মৌলিক নীতিতে অটল আছি। আমরা শুধু এটা বোঝাতে চাচ্ছি যে, এএনসি কংগ্রেস জোট বা এলায়েন্সের কোন অংশ নয়। যদিও এএনসি প্রায়ই সাউথ আফ্রিকান, ইন্ডিয়ান কংগ্রেস এবং কালারড পিপলস কংগ্রেসের সঙ্গে মাঝে মধ্যে যৌথ বিবৃতি দিয়ে থাকে, এক সঙ্গে কাজ করে থাকে। এর পরও এএনসি সম্পূর্ণ স্বাধীন সংগঠন। এরা স্বাধীনভাবে কাজ করে থাকে। ইউসুফ আমাদের কথায় খুশি হতে পারলেন না। ঘুরে ফিরে তিনি দলের নীতি আদর্শ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন।

আমি বললাম, এখন বিষয়টা নীতি নিয়ে নয়, এখন আমাদের ভাবমূর্তির প্রশ্ন। আমরা বিশেষ দরকারে এএনসির ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তুলতে চাই। আমরা সবার সঙ্গে কাজ করবো। কিন্তু লোকে চিনবে শুধু এএনসিকে। আপাতত এটাই আমাদের লক্ষ্য।

বন্ধুদের মায়া ত্যাগ করে আমাকে লন্ডন ছাড়তে হল। এখন আমার এ সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। সেটি হল সামরিক প্রশিক্ষণ। আমার জন্য আদ্দিস আবাবায় ৬ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। আদ্দিস আবাবায় ইথিওপিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইফুর সঙ্গে আমার একান্ত বৈঠক হয়। তিনি আমাকে কুলফিতে নিয়ে যান। ইথিওপিয়ান রায়ট ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর ছিল সেখানে। এখানেই আমি প্রশিক্ষণ নেই। আমাকে সামরিক বিজ্ঞান, সামরিক কলাসহ একজন সৈন্যের জন্য যা প্রয়োজন তার সবই শেখানো হয়। আমি ছিলাম একজন সৌখিন বক্সার। মাঝে মধ্যে বক্সিং করতাম। সামরিক বিষয়াদিতে জ্ঞান ছিল না বললেই চলে। এজন্য এখানকার প্রশিক্ষণ খুব কাজে লাগে। আমার প্রশিক্ষক ছিলেন লেফটেন্যান্ট উনডনি বিফিকাদু। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ সৈনিক। নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ। ইতালিয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে লড়াই করেছেন তিনি। আমাকে নিয়মমাফিক প্রশিক্ষণ দেয়া হত। সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলত। এর পর গোসল, খাওয়া ও বিশ্রাম। দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ফের প্রশিক্ষণ শুরু হত। বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কর্ণেল তাদিসি আমাকে সামরিক বিজ্ঞান সম্পর্কে লেকচার দিতেন।

কিভাবে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও পিস্তল চালাতে হবে তা আমাকে হাতে-কলমে শেখানো হয়। লক্ষ্য বস্তু ঠিক করতে প্রতিদিনই গুলি ছোঁড়ার প্রশিক্ষণ চলত। ৫০ মাইল দূরের লক্ষ্যবস্তুতেও ঠিক মত গুলি লাগাতে পারি সে ব্যাপারে আমাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া মর্টারের গোলা নিক্ষেপ ও বোমা তৈরির কৌশলও আমাকে শেখানো হয়। ছোটখাট বোমা ও মাইন নিষ্ক্রিয় করাও আমার প্রশিক্ষণ থেকে বাদ যায়নি। এভাবে ছয় মাসে আমাকে পুরোদস্তুর সৈনিকে পরিণত করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে রাজনীতিবিদের পরিবর্তে নিজেকে মনে হল একজন সৈনিক। রাজনীতি ছেড়ে সৈনিক হিসেবেই কাজ করার ইচ্ছে জাগ্রত হল। যদিও এ ইচ্ছে ছিল ক্ষণিকের।

সৈন্যদের সঙ্গে আমি প্যারেড ও মহড়ায়ও অংশ নিতাম। এ সময় আমাদের সঙ্গে থাকত একটি রাইফেল, কিছু বুলেট ও সামান্য পানি। মহড়ার সময় একটি স্থানে আমাদের কিছুদিন থাকতে হত। ওই জায়গাটি ছিল খুবই মনোরম। ঘন বন। উঁচু টিলা। সমতল ভূমি। সব কিছুই ছিল ওখানে। আশ পাশের লোকজন ছিল খুবই দরিদ্র। তারা হালচাষ করত ও খুব সাদাসিদা জীবন যাপন করত। তাদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বেশ মিল ছিল।

কর্ণেল তাদিসি আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে তালিম দিতেন। গেরিলাবাহিনী কিভাবে গঠন করতে হবে, পরিচালনা করতে হবে, শৃংখলা বজায় রাখতে– এসব বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞান দিতেন। একদিন বিকেলে নাস্তা খাওয়ার সময় কর্ণেল তাদিসি বললেন, ম্যান্ডেলা এখন আপনি একটি মুক্তিবাহিনী গঠন করুন। তবে প্রথাগত সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজন নেই। কারণ মুক্তিবাহিনী হচ্ছে সমতাবাদী সেনাবাহিনী। আর প্রথাগত সেনাবাহিনী হচ্ছে পুজিবাদী বাহিনী।

তিনি আরও বললেন, যখন কর্মক্ষেত্র বা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবেন তখন কঠোরভাবে বাহিনী পরিচালনা করবেন। দিকনির্দেশনার বেলায় পুঁজিবাদী ধাঁচের সেনা বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু যখন কাজের বাইরে থাকবেন তখন এই পার্থক্যটা ফুটে উঠবে। মুক্তিবাহিনীতে কর্মক্ষেত্রের বাইরে সব সৈন্যদেরকে একভাবে দেখতে হয়। এমনকি সর্বনিম্নস্তরের সৈন্যটির সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করতে হয়। সবাইকে পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করতে হয়। পুঁজিবাদী সেনাবাহিনীতে সব সময় উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ সৈন্যদের মধ্যে একটা দূরত্ব বজায় থাকে। মুক্তিবাহিনীতে এটা থাকে না। এখানে অপারেশনের সময় কমান্ডারের নির্দেশ পালন করতে হয়। কিন্তু অপারেশন শেষে দেখা যায় ওই কমান্ডারই তার অধীনস্থের কোন কাজ করে দিচ্ছেন। অপারেশন শেষে মুক্তিবাহিনীতে সবাই ভাই-ভাইয়ে পরিণত হয়। তিনি আরও বললেন, মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার বিশেষ কোন সুবিধা ভোগ করতে পারে না। সাধারণ যোদ্ধারা যা খাবে আপনাকে তাই খেতে হবে। তারা যা পান করবে আপনাকেও তাই পান করতে হবে। সাধারণ সৈন্যদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না।

আমাদের কথা চলার সময় একজন সার্জেন্ট অনুমতি নিয়ে রুমে ঢুকলেন। একজন লেফটেন্যান্টের নাম উল্লেখ করে বললেন, স্যার তাকে আমি খুজছি। দয়া করে বলবেন কি, তাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে। একথা শুনে কর্ণেল সাহেব রেগে গেলেন। বললেন, তুমি কি দেখছ না আমি ব্যক্তিগত বিষয়ে আলাপ করছি। তুমি কি জান না, খাওয়ার সময় বা ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলাপের সময় আমাকে বিরক্ত করা নিষেধ। এই বলে তিনি ওই সার্জেন্টকে বেশ জোরে ধমক দিয়ে রুম থেকে বের করে দিলেন।

আমার প্রশিক্ষণ কোর্সটি ছিল ৬ মাসের। কিন্তু দুই মাস পরই এএনসি থেকে আমার কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। জরুরি ভিত্তিতে আমাকে দেশে ফেরার অনুরোধ করা হয়। দেশে তখন সশস্ত্র আন্দোলন তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই এমকের কমান্ডার হিসেবে আমার দেশে থাকাটা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে।

টেলিগ্রাম পাওয়ার পর কর্নেল তাদিসি দ্রুত আমার দেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন। ইথিওপিয়ার একটি ফ্লাইটে তুলে দেন। ওই ফ্লাইটের গন্তব্যস্থান ছিল খার্তুম। বিদায় বেলায় তিনি আমাকে একটি স্বয়ংক্রিয় পিস্তল, ২শ রাউন্ড গুলি উপহার দেন। পিস্তলটি দেয়ায় তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তবে গুলিগুলো বহন করা আমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কারণ সেগুলোর ওজন ছিল অনেক।

খার্তুমে পৌঁছেই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা জানান, দারুসসালামের ফ্লাইটটি সেদিন নয়, পরদিন যাবে। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে খার্তুমে থেকে যেতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর একটি হোটেলের রুম ভাড়া করে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করি।

হোটেলে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখি বারান্দায় অনেক শ্বেতাঙ্গ আড্ডা দিচ্ছে। কেউ সিগারেট খাচ্ছে। কেউবা মদ পান করছে।

হোটেলের প্রবেশ দ্বারে চেকের ব্যবস্থা ছিল। ছিল মেটাল ডিটেক্টর। আমার জ্যাকেটের পকেটে ছিল সেই পিস্তলটি। ট্রাউজারে ছিল কর্নেল সাহেবের দেয়া ২শ রাউন্ড গুলি। এছাড়া সাথে কয়েক হাজার পাউন্ড নগদ অর্থও ছিল। আমার মনে হল যে কোন মুহূর্তে গ্রেফতার হয়ে যেতে পারি। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রশন্ন। এ সবের কিছুই হয়নি। অনেক সাদার মাঝে আমি ছিলাম একমাত্র কালো। হোটেলের বয় ও নিরাপত্তা কর্মীরা আমাকে নিরাপদে কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে দিল। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

খার্তুম থেকে সরাসরি গেলাম দারুস সালাম। সেখানে এমকের ২১ জনের একটি গ্রুপ আমাকে অভিবাদন জানাল। এরা সবাই ইথিওপিয়া থেকে সৈনিকের প্রশিক্ষণ শেষ করেছে। তারাও দেশে ফেরার জন্য রওনা হয়েছিল। তাদের পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হলাম। তাদের জন্য মনে মনে গর্বও অনুভব করলাম। কারণ তারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশের জন্য কাজ করতে যাচ্ছে। আদ্দিস আবাবায় দুপুরের খাবার শারলাম। এমকের সদস্যরা আমার সম্মানে খাসি জবাই করে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে। তাদের সুন্দর আচরণ ও সুশৃংখল কাজ আমাকে মুগ্ধ করল।

এ সময় আমার সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে ছোটখাটো বক্তৃতাও দিলাম। বললাম, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিয় মুক্তিযোদ্ধারা, বিপ্লবের জন্য শুধু গুলি ছুঁড়তে জানলেই চলবে না রাজনীতিও জানতে হবে। হাতে হাত রেখে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ সময় সেনারা সেলুট দেয়। এমকে সেনাদের পক্ষ থেকে এটা ছিল আমাকে দেয়া প্রথম সেলুট।

এমবিয়া যাওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট নায়ারে আমাকে তার একটি ব্যক্তিগত বিমান দিলেন। সেখান থেকে উড়ে চললাম লোবাসতির দিকে। পাইলট জানালেন, আমাদের কেনিতে অবতরণ করতে হবে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কেনিতে স্থানীয় একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তার কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। তারা দুজনেই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। ম্যাজিস্ট্রেট নাম জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, আমার নাম ডেভিড মুটসামায়ি। উনি বললেন, না। এটা আপনার নাম নয়। দয়া করে প্রকৃত নাম বলুন। আবার বললাম, আমি ডেভিড মুটসামায়ি। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, ভনিতা না করে আপনার আসল নাম বলুন। কারণ আমাকে মিস্টার ম্যান্ডেলার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাকে সব রকমের সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। নেলসন ম্যান্ডেলা না হলে আপনাকে আমার গ্রেফতার করতে হবে।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। কি করব বুঝতে পারছিলাম না। মনে হল উভয় অবস্থাতেই আমাকে গ্রেফতার হতে হবে। বললাম, আমাকে নেলসন ম্যান্ডেলা বা ডেভিড মুটসামায়ি দুটোই ভাবতে পারেন। চ্যালেঞ্জ করব না। ম্যাজিস্ট্রেট সামান্য হাসলেন। বললেন, গতকালই আমরা আপনাকে আশা করেছিলাম। কিন্তু আপনি আসেননি। এরপর তিনি আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন। আমার সহযোগিরা যেখানে অপেক্ষা করছিলেন ঠিক সেই লোবাসতিতে নিয়ে গেলেন। সেখানে জো মডিস ও এএনসি সমর্থক জোনাস মেটলুর সঙ্গে দেখা হল। তারা দুজনেই লোবাসতিতে বসবাস করতেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাকে জানালেন, আমার দেশে ফেরার খবরটি দক্ষিণ আফ্রিকা পুলিশ ইতিমধ্যেই জেনে গেছে। তিনি আমাকে একদিন পর দেশের উদ্দ্যেশ্যে রওয়ানা হবার পরামর্শ দিলেন। তার সর্বাত্মক সহযোগিতা ও মূল্যবান উপদেশের জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

মেটলুর সঙ্গে তার বাসায় গেলাম। বললাম, আজ রাতেই তাকে দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে হবে। শ্বেতাঙ্গ চলচ্চিত্র পরিচালক ও এমকের সদস্য সিসিলি উইলিয়ামসকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমি ছিলাম গাড়ির পেছনের সিটে। গন্তব্য ছিল জোহান্সবার্গ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাইভোনিয়া

৪৯

সীমান্ত অতিক্রম করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বিদেশ থেকে নিজের দেশে ফিরলে সচরাচর এমনটিই হয়। তখন ছিল শীতের রাত। আকাশে তারাগুলো জ্বল জ্বল করছিল। মনে হচ্ছিল তারারা যেন আমাকে দেশের মাটিতে স্বাগত জানাচ্ছে। দেশের মাটিতে আমি একজন ফেরারি। নিষিদ্ধ ব্যক্তি। পুলিশ আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। অথচ এতদিন যেসব দেশে অবস্থান করেছি সেখানে ছিলাম সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু এখন দেশের মাটিতে ফেরার পর অসম্ভব স্বস্তিতে মনটা ভরে উঠল।

বিচুয়ানাল্যান্ড ও ট্রান্সভালের মধ্যে দিয়ে সড়ক গিয়েছিল প্রায় এক ডজন। এসব সড়কের সবগুলিই সীমান্তের সাথে সংযুক্ত ছিল। কোন সড়ক দিয়ে গেলে আমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পারব সিসিল সেটা জানত। সে অনুযায়ীই তিনি গাড়ি চালাতে লাগলেন। সারারাত গাড়ি চলল। মধ্যরাতে অবশ্য আমরা সীমান্ত এলাকায় গাড়ির ভিতরে অল্প সময়ের জন্য ঘুমিয়ে নিলাম। ভোরের দিকে লিলিসলিফ খামারে পৌঁছলাম। তখন আমার পরণে ছিল সৈনিকের সেই পোশাক। যেটা পরে আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম।

খামারে ফিরলেও বিশ্রাম নেয়ার সময় পাইনি। কারণ পরদিন রাতেই আমাদের একটি গোপন মিটিং ছিল। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং। আমার সফর সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার জন্যই ওই মিটিং এর আয়োজন করা হয়। ওয়াল্টার মোসে কোটনি, গোভান এম বেকি, ড্যান টুলমি, জেবি মার্কস এবং ডুমা নায়েক সবাই লিলিসলিফ আসলেন বৈঠকে যোগ দিতে। পুরো খামার মিলন মেলায় পরিণত হল। বৈঠক শুরু হল। আফ্রিকা ও লন্ডন সফর সম্পর্কে সবই সংক্ষিপ্তভাবে অবহিত করলাম। এমকের জন্য পাওয়া অর্থের হিসাব দিলাম। কোথায় কোথায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হল তা বললাম। এএনসির ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গ

ও ভারতীয়দের সমর্থন আদায়ের জন্য আমাকে যে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল তা সবিস্তারিত তুলে ধরলাম।

জিম্বাবুয়ের নেতাদের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয় তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করি। এএনসি যে প্যাকের চেয়েও শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দল সেটা আমি সে সময় জিম্বাবুয়ের নেতাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম। তবে এএনসির অসাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে তারা যে ঘোর অন্ধকারে ছিলেন সেটাও বৈঠকে উল্লেখ করি।

বৈঠকে উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে বলি, এএনসিকে বহির্বিশ্বের কাছে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন সংগঠন হিসেবে পরিচিত করেছি। এখন সে অনুসারেই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। এএনসির একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখে আমাদের নতুন করে জোট গড়তে হবে। জোটের অন্যান্য দলের কাজ হবে এমকেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। দলটিকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের যোগান দেয়া। এ লক্ষ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে এএনসির সম্পর্কের বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রস্তাব দেই। এ প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল জোটে এএনসি নেতাদের কর্তৃত্ব সুসংহত করা। বিশেষ করে আফ্রিকানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এএনসি যাতে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে ব্যবস্থা করা।

এটা ছিল একটা স্পর্শকাতর প্রস্তাব। এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য সব নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করার, তাদের মতামত নেয়ার প্রয়োজন ছিল। চিফ লুথুলির সঙ্গে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে আমাকে অনুরোধ জানানো হয়। সবাই আমাকে একা তার কাছে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু বাধ সাধেন গোভান এমবেকি। তিনি ছিলেন এমকের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা। তিনি আমাকে একা না গিয়ে সঙ্গে আরেকজনকে নিয়ে যেতে বলেন। কারণ আমি সবেমাত্র দেশে ফিরেছি। এমকেকে গড়ে তোলার কাজটিও করে যাচ্ছি। তাই আমার নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবাই এমবেকির মতামত মেনে নিলেন।

সিসিলকে সঙ্গে নিয়ে পরের রাতে আমরা চিফ লুথুলির সঙ্গে দেখা করার জন্য যাত্রা শুরু করলাম। সিসিলের একটি মোটরগাড়ি ছিল। সেটাতে চড়েই দুজনে ডারবানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম।

ডারবানে একাধিক গোপন বৈঠক করার একটা পরিকল্পনা আমার ছিল। মন্টি নায়েকার ও ইসমাইল মীরকে প্রথমে নতুন প্রস্তাব সম্পর্কে অবগত করবো বলে মনস্থ করলাম। এরা দুজনেই ছিলেন চিফ লুথুলির খুব কাছের মানুষ। কংগ্রেস জোটের নেতৃত্ব এএনসির দেয়া উচিত বলে আমি যে প্রস্তাব পেশ করলাম তাতে মন্টি ও ইসমাইল দু'জনেই বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তারা জোট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি পছন্দ করলেন না।

আমাকে গ্রুট ভিলে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে চিফ লুথুলি বসবাস করতেন। একজন ভারতীয়ের বাড়িতে আমরা বৈঠকে বসলাম। আমি পুরো পরিস্থিতি লুথুলির কাছে তুলে ধরলাম। তিনি চুপ করে আমার কথা শুনলেন। কথার মাঝখানে একটি শব্দও করলেন না। আমার কথা শেষ হওয়ার পর লুথুলি মুখ খুললেন। বললেন, এএনসির ব্যাপারে বিদেশী রাজনীতিকরা নাক গলাক সেটা তিনি চান না।

তারা বেশ কয়েকটি ভালো অসাম্প্রদায়িক বর্ণবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে। কিছু বিদেশী নেতা এটা পছন্দ না করলেও তারা তাতে পরিবর্তন আনবেন না। কারণ বর্ণবিরোধী নীতি দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য মঙ্গলজনক।

লুথুলিকে বললাম, বিদেশীরা আমাদের নীতি ঠিক করে দিচ্ছে না। আমাদের দলের ব্যাপারেও নাক গলাচ্ছে না। তারা শুধু বলেছেন যে, এএনসির নীতি-আদর্শ তারা পুরোপুরি বুঝতে পারছেন না। এটাকে বোধগম্য করা উচিত।

এএনসিকে মিত্রদের কাছে, প্রতিবেশীদের কাছে, বহির্বিশ্বের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য, বোধগম্য করার ব্যাপারে আমার পরিকল্পনা তার কাছে পেশ করলাম। ছোট ও দূর্বল দল হওয়া সত্ত্বেও প্যাক হঠাৎ করে আফ্রিকার অনেক দেশের রাষ্ট্রনেতাদের কাছে বড় দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য আমি দলের নীতিতে পরিবর্তন আনতে চিফ লুথুলির প্রতি অনুরোধ জানাই।

আমার প্রস্তাবের ব্যাপারে চিফ লুথুলি তাৎক্ষণিকভাবে কোন মন্তব্য করলেন না। কোন সিদ্ধান্তও দিলেন না। আমার মনে হল তিনি আমার প্রস্তাব নিয়ে আরও চিন্তা করতে চাইলেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলতে মনস্থ করলেন। বিকেলে দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীর সঙ্গে আরও কয়েকটি গোপন বৈঠক করলাম। আমার শেষ মিটিংটি ছিল ডারবানে, সন্ধ্যায় এমকের আঞ্চলিক কমান্ডারদের সঙ্গে ওই মিটিং করি।

ডারবানে এমকের কমান্ডার ছিলেন ব্রনো এম টোলো। তিনি একটি নাশকতামূলক অপারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আগে আমি কখনো তাকে দেখিনি। এ মিটিংয়েই তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। মিটিংয়ে উপস্থিত সবাইকে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আমার সাম্প্রতিক সফর সম্পর্কে অবগত করি। এমকের প্রতি যারা সমর্থন প্রকাশ করেছে, এমকেকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করতে রাজি হয়েছে তাদের ব্যাপারে খুলে বলি। আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেই, এমকে আপাতত নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তার কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখবে। এতে কাজ না হলে সামনে পুরোদমে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করবে। মিটিংয়ের পর ফটো সাংবাদিক জি. আর নাইডুর বাসায় যাই। এখানে ইসমাইল

মীর, ফাতেমা মীর, মন্টি নায়েকের ও জে. এ সিং আমার জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। এখানে সবাই বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করি। পরদিন সকালে জোহান্সবার্গের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

অনেকদিন পর বন্ধু-বান্ধব ও দলের লোকজনের সাথে একসঙ্গে বেশ কিছুসময় কাটাতে পারায় এ সময় আমার মেজাজ ছিল বেশ ফুরফুরে। রাতে ভালো ঘুম হয়। ৫ আগস্ট রোববার বিকেলে দীর্ঘপথ পেরিয়ে জোহান্সবার্গ পৌঁছি। এখানে অস্টিনের বাসায় সিসিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

সিসিলকে সঙ্গে নিয়ে পরবর্তী গন্তব্যের পথে রওয়ানা দেই। জীর্ণশীর্ণ পোশাক পরে তার পাশে বসি। সিসিল গাড়ি চালানো শুরু করে। চারদিকে রোদ। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। পুরো পরিবেশটা আমার কাছে কেমন যেন পরিচিত মনে হল। এমন পরিবেশ আমি নাটালে দেখেছিলাম। শীতকালেও নাটাল ছিল সবুজ। প্রকৃতি ছিল ঝরঝরা।

আমরা ডারবানের শিল্পাঞ্চল পেরিয়ে ছুটতে লাগলাম। পাহাড়ের ওপর দিয়ে সরু পথে গাড়ি চলতে লাগল। গাড়ি থেকে ভারত মহাসাগরের নীল-কালো পানি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। ডারবান ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম সমুদ্রবন্দর। শিল্পশহর হওয়ায় এখানকার রাস্তাঘাট, রেলপথগুলো ছিল অনেকটা জোহান্সবার্গের মত।

চলতে চলতে আমরা হাউইকে চলে আসি। এ জায়গাটি পিটারম্যারিটজবার্গের ২০ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। চলার পথে সিসিলের সঙ্গে একটি নাশকতামূলক হামলা চালানোর বিষয়ে আলাপ করি। কিভাবে ওই হামলা চালানো যায় সে ব্যাপারে পরিকল্পনা করতে থাকি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সিদারায় চলে আসি। এটি হাউইকের ছোট একটি শহর। এমন সময় লক্ষ্য করি একটি ফোর্ড ভি-৮ গাড়ি আমাদেরকে অনুসরণ করছে। গাড়িতে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ বসা। এর অল্পক্ষণের মধ্যে আরও দুটি গাড়ি আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে থাকে। ওই দুটি গাড়ির সবাই ছিল শ্বেতাঙ্গ। হঠাৎ আরেকটি ফোর্ড গাড়ি আমাদের গাড়ির একেবার সামনে চলে আসে। আমাদেরকে থামতে বলে। আমি আঁতকে উঠি। ভাবতে থাকি আমার জীবনলীলা হয়ত এখানেই শেষ হবে। স্বাধীনতার জন্য ১৭ মাস ধরে যে নিরলস চেষ্টা করে আসছি তার অবসান বোধ হয় এক্ষুণি হবে।

সিসিল গাড়ির গতি কমালেন। আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, লোকগুলো কারা? আমি চুপ রইলাম। কারণ দু'জনেই ভালো করে জানতাম তারা কারা। এখানে বন ছাড়া পালানোর তেমন কোন জায়গা ছিল না। বনের পথঘাট সবই তাদের পরিচিত ছিল। তারপরও আমি গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে বনের ভিতর ঢুকে

যেতে চাইলাম। পরক্ষণেই ভাবলাম এ কাজটি করলে তারা আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করবে। তখন মৃত্যু অনিবার্য।

আমাদের গাড়ি থামল। একজন লম্বা চওড়া লোক গাড়ির কাছে আসলেন। তার মুখে ছিল খোঁচাখোঁচা দাঁড়ি। বোধ হয় ব্যস্ততার কারণে সেভ করতে পারেননি। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। বোঝা যাচ্ছিল সারারাত তিনি ঘুমাননি। খুব সহজেই বুঝতে পারলাম কয়েকদিন ধরে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। খুব শান্ত মেজাজে ধীরস্থীর কণ্ঠে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন, তিনি সার্জেন্ট ভরস্টার। পিটারম্যারিট বার্গের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আছেন। তার কাছে একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে।

সার্জেন্ট সাহেব আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, আমার নাম ডেভিড মটসামায়ি। তিনি লিখে নিলেন। এরপরও কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। কোথায় থাকি, কি করি, কোথায় যাচ্ছি– এ জাতীয় প্রশ্ন। সব প্রশ্নের সাদাসিদা উত্তর দেই। সার্জেন্ট সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আপনি নেলসন ম্যান্ডেলা। পাশের জন সিসিল উইলিয়াম। ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট। অর্থাৎ আপনাদের গ্রেফতার করা হল।

সার্জেন্ট আমাকে বললেন, অন্য গাড়িতে করে পুলিশের একজন সার্জেন্ট আমাদের সঙ্গে যাবেন। তিনিই আমাদেরকে পিটারম্যারিটজবার্গে নিয়ে যাবেন। সে সময় পুলিশ আজকের মত এতটা সুরক্ষিত ছিল না, এছাড়া সার্জেন্ট ভরস্টার আমাদের তল্লাশিও করেননি। গুলিভরা পিস্তলটি আমার সঙ্গেই ছিল। আমি আবারও পালানোর কথা চিন্তা করি। কিন্তু সাতপাঁচ ভেবে পিছিয়ে আসি।

আমি সন্তর্পনে পিস্তল ও একটি নোট বুক গাড়িতে রেখে দিলাম। সিসিল ও আমার সিটের মধ্যবর্তী জায়গায় এগুলো রাখলাম। এগুলো এমনভাবে লুকালাম যে পুলিশের পক্ষে সেগুলো বের করা ছিল দুঃসাধ্য।

আমাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হল। সার্জেন্ট ভরস্টারের রুমে বসার ব্যবস্থা করা হল। সেখানে আরো অনেক পুলিশ অফিসার ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ওয়ারেন্ট অফিসার। তার নাম টারনার। ট্রিয়েজন মামলার তদন্ত করছিলেন তিনি। টারনার বরাবরই এএনসি সদস্যদের প্রতি দূর্বল ছিলেন। এএনসি সদস্যরা মিথ্যা বলেন না বা ছল চাতুরি করেন না এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তার। টারনার আমার সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করলেন। আমি তখনও আসল নাম বলিনি। নিজেকে ডেভিড মটসামায়ি হিসেবে পরিচয় দিচ্ছিলাম। এতে একটু মনক্ষুণ্ন হলেন টারনার। বললেন, নেলসন, কেন তুমি নিজেকে আড়াল করতে চাচ্ছ। তুমি ভাল করেই জান, আমি তোমাকে চিনি। আমরা সবাই জানি তুমি কে। আমি হেসে বললাম, দেখ এ নামটা পার্টি থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে। এখন এটিই আমাকে ব্যবহার করতে হচ্ছে।

সিসিল ও আমাকে লকআপে (জেলখানায়) ঢোকানো হল। সেখানে বসে অনেক কিছু ভাবতে লাগলাম। কেন এমন পরিণতি হল তা বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। আমি গ্রেফতারের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। তাই গ্রেফতার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কেও আমার কোন পরিকল্পনা ছিল না। তাই এই গ্রেফতার আমাকে মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত করে তোলে। আমি নিশ্চিত ছিলাম কেউ আমার অবস্থান সম্পর্কে পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে। যার কারণে আমার এই পরিণতি। আমি ডারবানে আছি এবং সেখান থেকে জোহান্সবার্গে ফিরেছি এ খবরটা পুলিশকে জানানোর পরপরই তারা তৎপর হয়ে ওঠে। দেশে ফেরার কয়েক সপ্তাহ আগেই জোহান্সবার্গ পুলিশের ধারণা ছিল আমি দেশে এসেছি।

আদ্দিস আবাবায় থাকাকালে জুন মাসে পত্রিকায় আমার ফেরা নিয়ে বড় বড় হেডলাইন হয়। এরপরই কর্তৃপক্ষ উইনিকে হেনস্তা শুরু করে। তাদের ধারণা ছিল আমি দেশে ফিরেছি কিনা বা ফিরলে কোথায় আছি উইনি সেটা ভালো করে জানে। যতদূর জানি সে সময় নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন উইনির বাসায় একাধিকবার তল্লাশি চালায়। তার গতিবিধির ওপর নজরদারি করে। আমার ধারণা আমার ডারবানে আসার খবরটি তখনই পুলিশ কোন সূত্র থেকে জেনে ফেলে। আমার ডারবানে আসার খবরটি অনেকে জানত। ডারবানে আসার আগের রাতে একটি পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে বন্ধু-বান্ধব, পরিবারের ও দলীয় লোকজন উপস্থিত ছিলেন। পার্টিতে হয়ত সরকারের কোন গোয়েন্দা বা ইনফরমারও উপস্থিত ছিলেন। এসব ভাবতে ভাবতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ওই রাতটা ছিল ১৯৬২ সালের ৫ আগস্ট।

পরদিন সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে আমাকে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হল। জোহান্সবার্গ পাঠানোর জন্য পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি অনুমতি দিলেন। আমাকে জোহান্সবার্গ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পুলিশ তেমন একটা বড় ধরণের আয়োজন করেনি না। আমার নিরাপত্তার ব্যাপারেও তাদেরকে তেমন তৎপর মনে হল না। আমি পালাব কিনা– এ দিকটিও পুলিশ গুরুত্বের সাথে নেয়নি। আমাকে বসানো হয় গাড়ির পেছনের সিটে। এ সময় আমার পরনে হাতকড়া পর্যন্ত ছিল না। সাথে ছিল মাত্র দুজন পুলিশ।

আমার গ্রেফতারের বিষয়টি বন্ধুমহলের অনেকে জেনে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ফাতেমা মীর। তিনি জেলখানায় আমার জন্য খাবার-দাবার নিয়ে আসলেন। গাড়িতে দু'জন পুলিশ অফিসার ও আমি মিলে সে খাবার খেয়ে নেই। জোহান্সবার্গ আসার পথে পুলিশের গাড়ি ভক্সরাস্টে অল্প সময়ের জন্য থামানো হয়।

গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গিয়েছিল। আমাদের নেমে পায়চারির অনুমতি দেয়া হল। এ সময় ইচ্ছে করলে পালাতে পারতাম। পুলিশ

আমার ওপর সদয় হয়েছিল। আমাকে বিশ্বাসও করেছিল। আমি বিশ্বাস ভঙ্গের সুযোগ নিতে চাইলাম না। আমার সম্পর্কে তাদের ভাল ধারণায় কুঠারাঘাত করতে চাইলাম না।

ডারবান থেকে সাদামাটাভাবে আনা হলেও জোহান্সবার্গে আমার জন্য বিশাল প্রস্তুতি ছিল। আমাকে ঘিরে এখানকার পুরো দৃশ্যপট পাল্টে যায়। জোহান্সবার্গের প্রবেশমুখেই রেডিওতে আমার গ্রেফতারের ঘোষণা শুনতে পাই। এখানকার সব রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেয়া হয়। চারদিকে পুলিশের গাড়িতে ছেয়ে যায়।

হাতকড়া পরিয়ে আমাকে গাড়ি থেকে নামানো হয়। তোলা হয় একটি পুলিশ ভ্যানে। সেটা ছিল ছোটখাটো দূর্গের মত। পুলিশ ভ্যানকে কর্ডন দিয়ে মার্শাল স্কয়ার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়।

জোহান্সবার্গে জেলখানার একটি সেলে আমাকে রাখা হল। জেলখানার নির্জন সেলে বসে পরবর্তী কর্মকৌশল ঠিক করছিলাম। এমন সময় পাশের সেল থেকে কাশির শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা খুব চেনা চেনা মনে হল। তাকে দেখার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম তিনি আর কেউ নন। আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ওয়াল্টার। তিনিও আমাকে দেখে চমকে উঠলেন। বললেন, নেলসন, তুমি? আমরা খুশিতে হাসতে শুরু করলাম। আমাদের অট্টহাসিতে সেল দুটো যেন কাঁপতে লাগল। পরে শুনেছি, আমার গ্রেফতারের অল্প সময়ের মধ্যে ওয়াল্টার গ্রেফতার হন। দু'জনের গ্রেফতার এমন পাশাপাশি সময় হবে এমনটা আমরা কখনো কল্পনা করিনি।

পরের দিন আমাকে আদালতে হাজির করা হল। বিচারক ছিলেন একজন সিনিয়র জজ। পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকের কাছে আমার রিমান্ডের আবেদন জানাল। হ্যারল্ড হোল্প ও জো স্লোভাও আদালতে আসলেন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। পেশাগত জীবনে বহুবার এ বিচারকের সামনে আমাকে হাজির হতে হয়েছিল। আমরা দু'জনই একে অপরকে বেশ শ্রদ্ধা করতাম। অনেক আইনজীবীও আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এদের অনেকের সঙ্গেই আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। আগে অনেকবার আমাকে নিয়ে আদালতে অনেক প্রশংসা-কীর্তন হয়েছে। আইনজীবীরা আমার ব্যাপারে অনেক ভালো ভালো কথা বলেছেন। কিন্তু এবার তারা কি বলবেন তা ভেবে মনে মনে অস্থির হয়ে পড়লাম। কারণ এবার আমি ভিন্ন এক মানুষ। নিরাপত্তা বাহিনীর মোস্টওয়ান্টেড তালিকায় এক নম্বর ব্যক্তি। হাতকড়া পরানো এমন এক লোক যিনি দেশে নিষিদ্ধ। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে সরকার বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত।

বিচার শুরু হল। এ সময় এ বিচারককে ভিন্ন মানুষ মনে হল। অনমনীয়, আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হিসেবে বিচার কাজ শুরু করলেন তিনি। বিচার চলাকালে একবারও তিনি আমার দিকে সরাসরি তাকাননি। মনে হল তিনি আমাকে চেনেন

না। কখনও দেখেননি। বিচারক আমার প্রতি সদয় না হলেও অন্যান্য আইনজীবীরা আমার প্রতি বেশ সদয় আচরণ করলেন। আমার সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তাদের এ ধরণের কর্মকাণ্ডে আমি রীতিমত বিস্ময়াভিভূত হলাম।

তবে আমাকে নিয়ে তারা যে একটু বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন সেটা বুঝতেও কষ্ট হয়নি। কারণ সত্য হলেও আমি তাদের কলিগ। আদালতে কি ভূমিকা পালন করতে হবে সেটা আমি মনে মনে ঠিক করে নিলাম। আত্মপক্ষ সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ আমি ছিলাম আদালতের সামনে জুলুম-নির্যাতন ও শোষণের প্রতীক। আর আদালত হচ্ছে ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তি। শত্রুদের খাঁচায় বন্দি হয়েও আমি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

বিচারক আমার আইনজীবীর নাম জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, আমার আইনজীবী জো স্লোভো। তবে আমি নিজেই আইনজীবীর কাজটি করতে চাই। আত্মপক্ষ সমর্থন করলেও জোরালোভাবে করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেই। কারণ জোরালোভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গেলে অনেক গোপন তথ্য বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল। বিচারের জন্য যতটুকু কথা বলা দরকার ততটুকুই বলবো বলে মনস্থির করি। প্রথমদিনে বিচার কাজ বেশি দূর এগোয়নি। বিচারক শুধু আমার নাম ও আমার আইনজীবীর নাম জিজ্ঞেস করেন। এরপর আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ পড়ে শোনান। আমি মনোযোগ দিয়ে অভিযোগ শুনি। উত্থাপিত অভিযোগগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল আফ্রিকার শ্রমিকদের ধর্মঘটে অনুপ্রেরণা যোগানো এবং অনুমতি ছাড়া বিদেশ ভ্রমণ। এগুলো প্রমাণিত হলে আমার দশ বছর পর্যন্ত জেল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অভিযোগ শুনে মনে মনে একটু আশ্বস্ত হলাম। কারণ এমকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কোন অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনা হয়নি। অভিযোগ আনার জন্য যে ধরণের তথ্য-প্রমাণ সরকারের থাকা উচিত ছিল সেগুলো তাদের কাছে ছিল না। তাই এই গুরুতর অভিযোগের হাত থেকে বেঁচে যাই।

আদালত থেকে বের হবার সময় প্রিয়তমা স্ত্রী উইনিকে দেখতে পেলাম। সে ছিল বিষণ্ন-বিমর্ষ। দুঃশ্চিন্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাকে। আমার ভবিষ্যৎ, দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং সামনের কঠিন দিনগুলির কথা চিন্তা করে সে ছিল উদ্বিগ্ন। তাকে দেখে বড় একটা হাসি দিলাম। এ হাসি যে তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করবে না সেটা ভালোভাবে বুঝতে পারলাম।

আদালত থেকে আমাকে জোহান্সবার্গের একটি সুরক্ষিত জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। তোলা হল পুলিশের একটি ভ্যানে। এটির চারদিক ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। বের হওয়ার কোন পথ ছিল না। এ ভ্যানের চারদিকে

শত শত পুলিশ আমাকে কর্ডন দিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল। তবে এএনসির হাজার হাজার সমর্থকের কারণে খুব আস্তে আস্তে তাদের এগুতে হচ্ছিল।

এএনসির সমর্থকরা ম্যান্ডেলা, ম্যান্ডেলা ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে তোলে। আমার গ্রেফতারের খবরটি পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়। তাই আদালত চত্বর লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।

কয়েকদিন পর উইনিকে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়া হল। সে আমার জন্য কিছু দামি পায়জামা ও চমৎকার সিল্কের পোশাক নিয়ে আসল। এগুলো জেলখানায় আমাকে পরতে দেয়া হবে না– এটা আমি ভালো করে জানতাম। কিন্তু কথাটা উইনিকে বলতে পারলাম না। কারণ এগুলো ছিল উইনির ভালোবাসার নিদর্শন। অনেক আশা করে সে জামা কাপড়গুলো এনেছিল। এগুলো আনার জন্য তাকে ধন্যবাদ দিলাম। ইচ্ছে ছিল অনেক কথা বলি। পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ-খবর নেই। কিন্তু পারলাম না। কারণ আমাদেরকে খুব অল্প সময় দেয়া হয়েছিল। সে সময়ের মধ্যেই কথাবার্তা সারতে হল। তাই জরুরি বিষয় নিয়েই আলাপ সেরে নিলাম। উইনিকে সাহায্য করতে পারে এমন কয়েকজন বন্ধুর নাম বললাম। যাদের কাছে আমার টাকা-পয়সা গচ্ছিত আছে তার নাম ঠিকানা দিলাম। আমাকে যে কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে সেটা বাচ্চাদের কাছে খুলে বলতে বললাম। জেল থেকে বের হতে দেরি হতে পারে এমন কথাও তাকে জানালাম। ওয়ারেন্ট অফিসারের অনুমতি নিয়ে জেলগেট পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে আসলাম।

৫০

জেলখানায় আমাকে কর্নেল মিনারের তত্ত্বাবধানে রাখা হল। তিনি ছিলেন বেশ নমনীয়। আমার প্রতি তার একটা সদয় দৃষ্টি ছিল। কর্নেল মিনার আমাকে বললেন, তিনি আমাকে জেলখানার হাসপাতালে রাখতে চান। কারণ গোটা জেলখানার মধ্যে ওই স্থানটিই সবচেয়ে ভাল। সেখানে থাকলে সুযোগ-সুবিধাও বেশি পাওয়া যাবে। কর্নেল সাহেব জানালেন, জেলখানার হাসপাতালে থাকলে আমি একটি চেয়ার ও একটি টেবিল পাব। পড়াশুনার অবকাশ পাব। ফলে মামলার প্রস্তুতি নিতে আমার সুবিধা হবে। এছাড়া সেখানকার বিছানাপত্রও ভালো। ঘুমোনোর সুন্দর পরিবেশ আছে। কথামত কর্নেল সাহেব আমাকে জেলখানার হাসপাতালে স্থানান্তর করলেন। তার কথাই সত্যি হল। এখানে আমি অনেক সুযোগ সুবিধা পেলাম। বন্দী জীবনে এ পর্যন্ত এ ধরণের সুযোগ-সুবিধা আর পাইনি। থাকার জায়গাটাও ছিল বেশ নিরাপদ। চারটি দরজা পার হয়ে আমার কাছে আসতে হত। আমাকে সেখানে নেয়ার পর পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা শুরু হয়। বলা হল, জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। তারা আমাকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে।

পত্র-পত্রিকায় এ সময় অনেক গালগল্প ছাপা হতে লাগল। আমাকে ও এএনসিকে জড়িয়ে নানা লেখালেখি শুরু হল। এগুলোর পেছনে সরকারের ইন্ধন ছিল। এএনসিতে ভাঙ্গন ধরাতে পরিকল্পিতভাবে এগুলো করা হচ্ছিল। আমার সঙ্গে যেন এএনসি নেতাদের দূরত্ব সৃষ্টি হয় সে চেষ্টারও অন্ত ছিল না। পত্র পত্রিকায় লেখা হয়, আমি বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। দলের কয়েকজন নেতার বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই আমাকে ধরা পড়তে হয়েছে। ডারবানে আমি জি. আর নাইডুর অতিথি হিসেবে ছিলাম। অনেকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে তাকেই ইঙ্গিত করছিলেন। আমি এএনসিতে আফ্রিকানদের প্রাধান্য দিতে চাইছি। এ জন্য এএনসির শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় নেতারা আমার সঙ্গে বিদ্রোহ শুরু করেছে বলে পত্র পত্রিকায় লেখা হয়। আমি এগুলোতে কর্ণপাত করিনি। কারণ, ভালো করেই জানতাম নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সরকার পরিকল্পিতভাবে এসব কিচ্ছা-কাহিনী রচনা করছে। পরে আমি বিষয়টি নিয়ে ওয়াল্টার, ডুমা, জো স্লোভো ও আহমেদ কাদরাদার সঙ্গে আলাপ করি। তারাও বিষয়টির ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। তাদের কথাবার্তা শুনে মনটা ভরে ওঠে। ইত্যবসরে ট্রান্সভাল ইন্ডিয়ান ইয়ুথ কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে উইনিকে প্রধান অতিথি করা হয়।

সম্মেলনে বক্তৃতা দেয়ার সময় উইনি বাজারে ভেসে বেড়ানো গুজবের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দেন। সেগুলোতে কান না দেয়ার অনুরোধ করেন। উইনি স্পষ্টভাবে বলেন, কারা ম্যান্ডেলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেটা অনুসন্ধান করা এখন বড় কথা নয়। বড় হল নিজেদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখা। কোনভাবেই যেন বিভেদের সৃষ্টি না হয় সেটা নিশ্চিত করা। উইনি সবাইকে জানিয়ে দেন, ম্যান্ডেলার সঙ্গে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। এটা সরকারের এক অপপ্রচার। আমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। আমার গ্রেফতারের সঙ্গে সি আই এ জড়িত ছিল বলে এ সময় বাজারে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ে। বর্ণবাদী সরকারের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সমর্থন থাকলেও আমার গ্রেফতারে তাদের ভূমিকা ছিল না বলেই আমি মনে করতাম। কারণ এ সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রমাণ আমার কাছে ছিল না। আমার মনে হয়, আমার গ্রেফতারের কারণ ছিলাম আমি নিজে। গোপনীয়তার ব্যাপারে আমি একটু বেশি আস্থাশীল ছিলাম। আমি ধরে নিতাম– আমি কোথায় আছি কি করছি তা কর্তৃপক্ষ জানে না। অথচ তারা যে আমার নাকের ডগায় সেটা ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। তাই গ্রেফতারের ব্যাপারে কাউকে দোষারোপ করিনি।

কিছুদিন পর আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হল প্রেটোরিয়ায়। জোহান্সবার্গের মত সেখানে আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে তেমন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এখানে লোকজন আমার কাছে আসতে পারত। সময় নিয়ে আলাপ করতে পারত। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্যই সরকার আমাকে প্রেটোরিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

হাতকড়া পরিয়ে আমাকে প্রেটোরিয়ায় পাঠানোর জন্য তৈরি করা হয়। যে পুলিশি ভ্যানটিতে ওঠানো হয় সেটা ছিল অত্যন্ত নোংরা। ভিতরে বসার সিট ছিল না। আমাকে টায়ারের ওপর বসতে হয়েছিল। সঙ্গে আরেকজন রাজনৈতিক বন্দি ছিলেন। তাকে কেন যেন পুলিশের ইনফরমার মনে হল। তাই গায়ে পড়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললাম না। প্রেটোরিয়ায় যাওয়ার পর আমি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম, আমার সেলে যেন আর কাউকে রাখা না হয়। তাহলে আমার কাজের অসুবিধা হবে। মামলা মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে পারব না।

এখানে সপ্তাহে দু'দিন আমার সঙ্গে দেখা করা যেত। উইনি নিয়মিত আসত। সঙ্গে করে পরিষ্কার জামা-কাপড় ও মজাদার খাবার নিয়ে আসত। আমার প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত ছিল এটি। অন্য যারা আসতেন তারাও কিছু না কিছু নিয়ে আসতেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মিসেস পিলের নামটিও উচ্চারণ করছি। তিনি প্রতিদিন দুপুরে আমার জন্য খাবার পাঠিয়ে দিতেন।

আমার সঙ্গে প্রচুর লোকজন দেখা করতে আসতেন। এর বদৌলতে প্রচুর খাবার-দাবার পেতাম। আমার সেলে ফল পানীয় থেকে শুরু করে নানারকম খাবার গড়াগড়ি যেত। এগুলো ফ্লোরের অন্য বন্দীদের মাঝে বিলিয়ে দিতে চাইতাম। কিন্তু অন্যবন্দীদের খাবার দেয়া নিষেধ ছিল। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ছিল খুবই কড়াকড়ি। এই নিষেধাজ্ঞা পাশ কাটিয়ে যেতে আমি কারারক্ষীদের ম্যানেজের ব্যবস্থা করলাম। তাদেরকে প্রায়ই খাবার-দাবার দিতাম যাতে অন্য বন্দীদের খাবার দেয়ার ক্ষেত্রে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। শ্বেতাঙ্গ কারারক্ষীদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ কারারক্ষীরা এক্ষেত্রে বেশি নমনীয় ছিল। অন্যদের খাবার দেয়ার বেলায় তারা তেমন একটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত না। পরে কৃষ্ণাঙ্গদের মত শ্বেতাঙ্গ কারারক্ষীদেরও আপেল, আঙ্গুর দিয়ে ম্যানেজ করে ফেলি। তখন থেকে আমার আশপাশের বন্দীদের বলতে গেলে বিনা বাধায় খাবার-দাবার বিলাতে পারতাম।

জেলে বসেই খবর পেলাম ওয়াল্টারকে প্রেটোরিয়ায় আনা হচ্ছে। তার সঙ্গে অনেক দিন ধরে যোগাযোগ নেই। দু জনেই বিচ্ছিন্ন। ওয়াল্টার জামিনের আবেদন করেছিলেন। এর প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন ছিল। এএনসির সদস্যদের যে সহজে জামিন দেয়া হয় না– এমন একটা ধারণা দেশে প্রচলিত ছিল। আমি এর সঙ্গে একমত ছিলাম না। এএনসি সদস্যের জামিন দেয়া হয় কিনা সেটা পরখ করে দেখার পক্ষপাতি ছিলাম। তাই প্রত্যেক মামলায় ওয়াল্টারকে জামিনের আবেদন করার পরামর্শ দিলাম।

ওয়াল্টার তখন ছিলেন এএনসির সাধারণ সম্পাদক। তাই তার জামিনে বের হওয়াটা ছিল দলের জন্য খুবই জরুরি। তাছাড়া আমার আর ওয়াল্টারের জামিনের মধ্যে অনেক ফারাক ছিল। আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করতাম। তিনি তা করতেন না। বিদ্রোহ ও আন্দোলনের প্রতীক ছিলাম আমি। তিনি তা ছিলেন

না। ওয়াল্টার পর্দার আড়ালে কলকাঠি নাড়তেন। তাই আমার জামিনের আবেদন না করার ব্যাপারে আমার সঙ্গে ওয়াল্টারও একমত ছিলেন।

আমি আবার জেলখানার হাসপাতালে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওয়াল্টারও এতে সায় দিলেন। অক্টোবরে আমার শুনানি ছিল। এজন্য পড়াশুনার দরকার হল। বইপত্র সংগ্রহেরও প্রয়োজন পড়ল। আমি এল এল বির ছাত্র ছিলাম। এ সুবাদে একজন এডভোকেটের মত আমার প্র্যাকটিসেরও অনুমতি ছিল। জেলখানা কর্তৃপক্ষের কাছে সিলেবাসের বইপত্র কেনার অনুমতি চাইলাম। এর মধ্যে একটি বইয়ের নাম ছিল 'দ্য ল অব টর্টস।

কয়েকদিন পর কর্নেল আউক্যাম্প আমার সেলে আসলেন। তিনি ছিলেন প্রেটোরিয়া জেলের কমান্ডিং অফিসার। অত্যন্ত বাজে ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। রাগান্বিতভাবে বললেন, ম্যান্ডেলা তোমাকে এক্ষুণি এই সেল থেকে চলে যেতে হবে। কারণ জানতে চাইলে বললেন, মশাল (জ্বালাও পোড়াও) সংক্রান্ত বই তুমি কেন চেয়েছ? তুমি কি এই বই দিয়ে নাশকতার পরিকল্পনা করছ। তার কথা শুনে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না। বই চেয়ে আমি যে চিঠিটি লিখেছিলাম সেটি দেখানোর পর আমি সব কিছু বুঝতে পারলাম। আফ্রিকান ভাষায় ইংরেজি শব্দ টর্চকে টর্ট বলা হয়। এ কারণেই কর্নেল সাহেবের ওই ভুলটি হয়েছে। একগাল হেসে বললাম, ইংরেজিতে টর্ট হচ্ছে আইনের একটি শাখা। এর সঙ্গে জ্বালাও-পোড়াও এর কোন সম্পর্ক নেই। আফ্রিকায় টর্ট বলতে এক ধরণের মশালকে বুঝায় যা বোমা ফাটানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। কর্নেল সাহেব বোকা সেজে চলে গেলেন।

একদিন জেলখানার উন্মুক্ত প্রান্তরে জগিং করছিলাম। এমন সময় মুসা দিনাত নামে এক ভারতীয় কয়েদীর সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি ছিলেন বেশ লম্বা চওড়া। ব্যবসা করতেন। প্রতারণার দায়ে তার দু'বছর জেল হয়। মুসা দিনাত বললেন, আপত্তি না থাকলে তিনি আমার হাসপাতালের সেলে থাকতে চান। বললাম, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু জানতাম কর্তৃপক্ষ তাকে আমার সেলে থাকার অনুমতি দিবে না। আমার এ ধারণা অবশ্য পরে ভুল প্রমাণিত হয়।

দিনাত কায়দা-কানুন করে আমার সাথে থাকার ব্যবস্থা করে নেন। আমার মত একজন রাজনৈতিক বন্দির সাথে তাকে থাকতে দেয়া হবে এটা আমি ভাবতে পারিনি। যাহোক, দিনাত আসাতে আমার খুব সুবিধে হল। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ধনী। টাকার বিনিময়ে তিনি জেলে অনেক সুবিধা আদায় করে নিতেন যা অন্য বন্দীরা কল্পনাও করতে পারত না। তিনি দামি পোশাক পরতেন, ভালো ভালো খাবার খেতেন। জেলে তিনি সামান্য কাজও করতেন না।

একদিন রাতে জেলের প্রধান কর্নেল মিনার আমার সেলে আসলেন। তাকে দেখে চমকে উঠলাম। তিনি দিনাতকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেলেন। সারারাতেও দিনাত আর সেলে ফিরলেন না। নিজের চোখে না দেখলে এ ঘটনা বিশ্বাস করতাম না।

সেলে থাকার সময় দিনাত আমার সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করতেন। তার দেশের মন্ত্রীদের টাকা দিয়ে বশ করার গল্প শোনাতেন। তার মুখ থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে অধঃপতনের কথা শুনে শিউরে উঠতাম। তবে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আমি তার সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলতাম না। বিশেষ করে আমার আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন সম্পর্কে তার সঙ্গে টু শব্দটিও করিনি। কারণ দিনাতকে তখনও আমি পুলিশের ইনফরমার বা সরকারের গুপ্তচর ভাবতাম। একদিন দিনাত আমার আফ্রিকার সফর সম্পর্কে জানতে চান। খুব সাদামাটাভাবে কিছু বলে সে অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানি। মুক্তির জন্য তিনি প্রচুর টাকা ব্যয় করেন। এতে কাজও হয়। মাত্র চার মাস জেল খাটার পর তিনি ছাড়া পান। অথচ তার জেল খাটার কথা ছিল ২ বছর।

জেল থেকে স্বাধীনতাকামীরা পালালে দু'ধরণের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমত সে মুক্ত হয়। দ্বিতীয়ত বাইরে গিয়ে সে আবার স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে পারে।

এ কাজ করলে আবার এক ধরণের মানসিক অস্থিরতাও দেখা দেয়। সব সময় একটা অপরাধ বোধ কাজ করে। বিবেকের দংশনে ছটফট করতে হয়। বাইরে ভাবমূর্তিও খারাপ হয়। শত্রুরা কুৎসা রটানোর সুযোগ পায়। বন্দি হিসেবে সবসময় আমার মধ্যে পালানোর একটা প্রবণতা কাজ করত। আমি সব সময় চারদিক খেয়াল করতাম। কমান্ডিং অফিসারের অফিস, দেয়ালের উচ্চতা, কারা রক্ষীদের গতিবিধি, দরজা-জানালা, তালা, এগুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর থাকত। একবার পুরো জেলখানার একটা মানচিত্র এঁকে ফেলি।

জেল থেকে পালানোর ব্যাপারে দু'ব্যক্তির কাছ থেকে ধারণা নিয়েছিলাম। এদের একজন হচ্ছে মুসা দিনাত অন্যজন জো স্লোভো। মুসা দিনাতের পরিকল্পনা আমার তেমন একটা পছন্দ হয়নি। স্লোভোর পরিকল্পনার মূল কথা ছিল ঘুষ ও ছদ্মবেশ। কারারক্ষীদের মোটা অংকের ঘুষ দিয়ে কারাগার থেকে বেরুনোর পথ করবো কিনা সেটা স্লোভোর পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়। তাছাড়া ঘুষের বিনিময়ে কারারক্ষীর পোশাক সংগ্রহ করে সেটা পরে পালানোর ধারণা দেন স্লোভ। নকল দাঁড়ি-গোঁফ-চুল ব্যবহার করেও কারাগার থেকে পালানোর একটা পথও বাতলে দেন তিনি। প্রথমে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও পরে তা বাদ দেই। কারণ পালাতে গিয়ে কোন রকমে ধরা পড়ে গেলে দলের ভাবমূর্তি ধুলোয় মিশে যাবে।

এক সপ্তাহ পর মামলার শুনানি ফের শুরু হয়। আমাকে মামলা পরিচালনার অনুমতি দেয়া হল। বিচারক ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ। মামলার সাক্ষী ছিলেন কমপক্ষে এক'শ জন। এদের কেউ পুলিশ, কেউ সাংবাদিক, কেউবা সরকারি কর্মকর্তা। তাদের সবার অভিযোগ ছিল আমি দেশে অবৈধভাবে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি। ১৯৬১ সালের মে মাসে ডাকা ৩ দিনব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘটের নেপথ্য নায়ক ছিলাম আমি।

প্রথম সাক্ষী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব মিস্টার বার্নাডকে ডাকা হল। দাবী-দাওয়া না মানলে ধর্মঘটের হুমকি দিয়ে এএনসির পক্ষ থেকে আমি যে চিঠিটি পাঠিয়ে ছিলাম সেটি তাকে বিচারকের সামনে উপস্থাপন করতে বললেন সরকার পক্ষের আইনজীবী। ওই চিঠির ব্যাপারে আমার ভালো করে জানা ছিল। কারণ চিঠিটি আমি বারবার পড়েছি। চিঠিতে আসলে সংকট নিরসনে আফ্রিকার সবদলকে নিয়ে একটি সর্বদলীয় সম্মেলনের আয়োজন করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। চিঠিতে বর্ণবাদ বিরোধী সংবিধান প্রণয়নেরও দাবি জানানো হয়। তাতে ধর্মঘটের কোন কিছু ছিল না। মিস্টার বার্নাড কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। আমি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম,

ম্যান্ডেলা ঃ আপনি কি চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়েছেন?

সাক্ষী হ্যাঁ।

ম্যান্ডেলা ঃ প্রধানমন্ত্রী কি চিঠিটির কোন জবাব দিয়েছিলেন?

সাক্ষী ঃ না, চিঠির লেখককে প্রধানমন্ত্রী কোন জবাব দেন নি।

ম্যান্ডেলা ঃ তিনি চিঠির কোন জবাব দেননি। এখন আপনি কি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এই চিঠিতে আফ্রিকার অধিকাংশ লোকের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার প্রতিফলন ছিল?

সাক্ষী না, আমি এর সঙ্গে একমত নই।

ম্যান্ডেলা ঃ আপনি একমত নন? দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ লোকের মানবাধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ইত্যাদির ব্যাপারেও কি আপনি একমত নন?

সাক্ষী ঃ হ্যাঁ, এগুলো অবশ্যই প্রয়োজন।

ম্যান্ডেলা ঃ এ বিষয়গুলো কি চিঠিতে ছিল?

সাক্ষী মনে হয় ছিল।

ম্যান্ডেলা ঃ আপনি ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছেন যে, মানবাধিকার, স্বাধীনতার মত বিষয়গুলো চিঠিতে উল্লেখ ছিল, তাই নয় কি?

সাক্ষী ঃ হ্যাঁ, চিঠিতে বিষয়গুলো উল্লেখ ছিল।

ম্যান্ডেলা ঃ তাহলে আমার সঙ্গে নিশ্চয় একমত হবেন যে, চিঠিতে যেসব অধিকার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে দেশের মানুষ সেসব অধিকার ভোগ করতে পারছে না বা সেসব অধিকার থেকে বঞ্চিত? আর সরকারই মানুষকে সেসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে?

সাক্ষী ঃ কিছু ঠিক।

ম্যান্ডেলা ঃ আফ্রিকার কেউ পার্লামেন্টের সদস্য নন, বিষয়টি কি সত্য?

সাক্ষী ঃ হ্যাঁ, সত্য।

৫১

শুনানির তারিখ ছিল ১৫ অক্টোবর ১৯৬২ সাল। এরই মধ্যে দলের পক্ষ থেকে গঠন করা হল ফ্রি ম্যান্ডেলা কমিটি। এরা দেশ জুড়ে আমার মুক্তির জন্য প্রচারণা শুরু করল। 'নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দাও' এই স্লোগানে চারদিক মুখরিত করে তুলল। শহরের বড় বড় ভবনের দেয়ালে আমার মুক্তি চেয়ে নানা ধরণের লেখা হল। দেয়াল লিখনে জোহান্সবার্গ ছেয়ে গেল। সরকার আমার মুক্তির দাবিতে সব ধরণের সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করল। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা আমলে না নিয়ে এএনসি আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগল।

সোমবারের শুনানির দিন ফ্রি ম্যান্ডেলা কমিটি আদালত চত্বরে ব্যাপক বিক্ষোভের আয়োজন করল। রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ওই বিক্ষোভ করার পরিকল্পনা করা হল যাতে রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারে।

জেলখানায় বসে কারারক্ষী ও অন্যান্য আগন্তুকদের কাছ থেকে শুনলাম বিশালে ওই বিক্ষোভ ব্যাপক বিশৃংখলা ও হট্টগোল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

শুনানির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় আমাকে বিছানা ও মালপত্র গুছিয়ে নেয়ার নির্দেশ হল। বলা হল, শুনানির জায়গা পাল্টানো হয়েছে। এখন শুনানি হবে প্রেটোরিয়ায়। কর্তৃপক্ষ আগে এ ব্যাপারে কিছুই জানায়নি। ফলে কাউকে প্রেটোরিয়ায় যাওয়ার সংবাদ জানাবার অবকাশ পেলাম না। আমার প্রেটোরিয়া যাবার খবর তাই সে মুহূর্তে অজানাই থেকে গেল।

সোমবার দিন খুব সকালে প্রেটোরিয়ার একটি প্রাচীন সিনাগোগে বিচার কার্যক্রম শুরু হল। সেখানেও আমার অনেক সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। সিনাগোগের চারদিকে দলের অনেক নেতাকর্মী অবস্থান নেন। আমার আইন উপদেষ্টা জো

স্লোভো নিষেধাজ্ঞার কারণে জোহান্সবার্গ থেকে এখানে আসতে পারেননি। তার বদলে এখানে আমাকে সাহায্য করেন বব হ্যাপেল।

স্যুট টাইয়ের বদলে দক্ষিণ আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী পোশাক পড়েই আমি আদালতে প্রবেশ করলাম। এ সময় আদালত চত্বরে ছিল সমর্থকদের উপচে পড়া ভীড়। ম্যান্ডেলা, ম্যান্ডেলা স্লোগানে ছিল চারদিক মুখরিত। দর্শকদের কাতারে আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবকে দেখলাম। উইনিকে দেখতে পেলাম তাদের মাঝে।

আদালতে অনেক শ্বেতাঙ্গের ভীড়ে আমি ছিলাম একজন কৃষ্ণাঙ্গ। তাই আফ্রিকানদের প্রথাগত পোশাক পড়েই সেখানে উপস্থিত হই। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্য এ সময় আমার খুব মনে পড়ছিল। এদিন আমার মধ্যে আফ্রিকান জাতীয়তার চেতনার জোয়ার বইতে শুরু করে। আমার পোশাক দেখে উপস্থিত শ্বেতাঙ্গরা আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের প্রতি আমার দরদ বুঝতে পারে।

বিচারকাজ শুরু হল। সরকার পক্ষের আইনজীবী মিস্টার বুশ ও ম্যাজিস্ট্রেট ভন হার্ডিনকে ভাল করে চিনতাম। আইন পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার বদৌলতে অনেকবার এদের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে। শুরুতেই বিচারককে লক্ষ্য করে বললাম, আমাকে আকস্মিকভাবে প্রেটোরিয়ায় নিয়ে আসা হয়েছে। এজন্য আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারিনি। তাই বিচারকাজ অন্তত পক্ষে দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা হোক। বিচারক আমার অনুরোধ রাখলেন। বিচারকাজ এক সপ্তাহের জন্য মুলতুবি ঘোষণা করলেন।

সেলে ফিরিয়ে আনার সময় একজন শ্বেতাঙ্গ কারারক্ষী আমার কাছে এলেন। বিনয়ের সঙ্গে বললেন, কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জ্যাকবস আমার ক্যারোসটি ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ক্যারোস হচ্ছে আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী একটি পোশাক। এটা পরে আমি আদালতে হাজির হয়েছিলাম।

কারারক্ষী বলেন, পোশাকটি আমার কাছ থেকে নিতে না পারলে তাকে কমান্ডিং অফিসারের গালিগালাজ শুনতে হবে। বললাম, আমি তোমার অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাকে আমার কাছে আসতে বল। একটু পরেই কর্নেল জ্যাকবস এলেন। পোশাকটি দিয়ে দিতে বলেন। কর্নেল সাহেবকে বললাম এ পোশাক নেয়ার কোন আইনগত অধিকার তার নেই। কারণ পোশাকের ব্যাপারে আপত্তি থাকলে বিচারকই তা বলতেন। বাড়াবাড়ি করলে ক্যারোস প্রসঙ্গটি আমি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যাব।

এরপর কখনও জ্যাকবস ওই লম্বা কোর্তাটি আর ফেরত চাননি। তবে জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে সেটি আদালতে পরার অনুমতি দেন। জেলের ভিতরে বা আদালতে যাওয়ার পথে ক্যারোস পরিধান করা থেকে বিরত থাকতে বলেন।

আবার শুনানি শুরু হল। আমাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হল। এজলাসে যাওয়ার আগে আদালতের একটি কক্ষে বব হ্যাপেলের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ সেরে নিলাম। তিনি জানালেন, দু'দিন আগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘটনা এটাই প্রথম।

বব আরো জানালেন, পোর্ট এলিজাবেথ ও ডারবানে কিছু নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালানো হয়েছে। ওই দুটি স্থানেই জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাকে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং ম্যান্ডেলার বিচারের প্রতিবাদ করা হয়েছে। এমন সময় সরকার পক্ষের আইনজীবী মিস্টার বুশ্চ সেখানে প্রবেশ করলেন। অযথা বিরক্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। বব চলে যাওয়ার পর বুশ্চ আমাকে বললেন, ম্যান্ডেলা আজ আমি আদালতে আসতে চাচ্ছি না। আমার পেশাগত জীবনে এই প্রথম আমাকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। আমি যা করছি তার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। আপনাকে শাস্তি দেয়া উচিত বা জেলে পাঠানো দরকার এমন কথা বিচারকের সামনে বলতে আমার খুব কষ্ট হবে। এই বলে তিনি আমার সঙ্গে হাত মেলালেন এবং বললেন, সবকিছুই আমার পক্ষে যাবে। তার এই মহানুভবতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, আপনার এই অবদানের কথা জীবনেও ভুলব না।

এদিন কর্তৃপক্ষ খুব সতর্ক ছিল। আদালত অঙ্গন লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। এজলাসেও প্রচুর আইনজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাগম হয়। অইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত ১৫০টি আসন পূর্ণ হয়ে যায়। আমার অনেক আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে উইনিও এদিন উপস্থিত ছিলেন। আদালতের চারদিকে মানুষের ভীড়ের কারণে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

আমি কাঠগড়ায় দাঁড়ালাম। বিচার শুরু হল। পুরো আদালত থমকে দাঁড়াল। দীর্ঘ এক ঘণ্টা আমি বিচারকের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করলাম। নিজেকে নির্দোষ হিসেবে দাবি করে নানা যুক্তি তুলে ধরলাম। আসলে এ সময় আমি রাজনৈতিক কথাবার্তা বেশি বলি। বিচারককে লক্ষ্য করে বলা আমার কথার সারাংশ ছিল অনেকটা এরকম–

অনেক বছর আগের কথা। আমি তখন নিজ গ্রাম ট্রান্সকেইতে বসবাস করতাম। বাবা-মা আত্মীয় স্বজন ও গোত্রের লোকদের নিয়ে আমার সময় বেশ ভাল কাটছিল, গোত্রের বয়োঃজ্যেষ্ঠরা আমাদের গল্প শোনাতেন। শ্বেতাঙ্গরা এদেশে

আসার আগে আমরা কত ভাল ছিলাম সে গল্প বলতেন। তারা বলতেন, তখন আমাদের লোকজন রাজার গণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে বসবাস করতেন। দেশের আনাচেকানাচে বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াতে পারতেন। সবারই ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল। দেশ ছিল আমাদের। দেশের সব অধিকারও আমরা ভোগ করতাম। আমাদের ভূমি ছিল, বনজঙ্গল ছিল, ছিল নদী। আমরা মাটির নিচ থেকে মূল্যবান খনিজ পদার্থ তুলতাম। বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়ে এ দেশকে সুন্দর করে গড়তাম। আমরা নিজেরাই সরকার গঠন করতাম। নিজেরাই তা পরিচালনা করতাম। নিজেদের অস্ত্র নিজেরাই সংরক্ষণ করতাম। ব্যবসা-বাণিজ্য করতাম। বড়রা আমাদের বলতেন, কিভাবে আমরা যুদ্ধ করে বারবার মাতৃভূমিকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছি।

তৎকালীন আফ্রিকান সমাজ ব্যবস্থা আমাকে নানাভাবে আকৃষ্ট করে। আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মূলত সেটি দ্বারাই। তখন কৃষি জমি ছিল পুরো গোত্রের নিয়ন্ত্রণে। একক মালিকানায় কোন জমি ছিল না। কোন শ্রেণী বৈষম্য ছিল না। ধনী-গরীব সবাই ছিলেন সমান। একজন আরেকজনকে শোষণ করার সুযোগ পেতেন না।

আমাদের গোত্রে তখন সাংবিধানিক পরিষদ ছিল। গোত্রের মূল্যবোধ, নীতি, আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও যাবতীয় করণীয় তারাই ঠিক করতেন। ইমবিজো, পিসতো, কেগোটা নামে বিভিন্ন সাংবিধানিক পরিষদ ছিল। এরা বিভিন্ন গোত্র নিয়ন্ত্রণ করত। ওই পরিষদ ছিল গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত। গোত্রের সবাই তাতে অংশ নিতে পারতেন। আমাদের তখন গোত্রপতি, যোদ্ধা, ডাক্তার সবই ছিল। সবাই নিবেদিত ছিলেন মানুষের কল্যাণে।

আজ আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলি তার বীজটা এসেছে আফ্রিকার এই গোত্র থেকে। আমাদের গোত্রে তখন দাসত্ব প্রথা ছিল না। ছিল গণতন্ত্রের চর্চা। সেখানে দারিদ্রের বালাই ছিল না। নিরাপত্তাহীনতা কি জিনিস সেটা আমরা বুঝতাম না। এই হল আমাদের ইতিহাস যা আজও আমাকে, আমার সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করে। আর এই ইতিহাসই আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করছে।

কি জন্য আমি আফ্রিকা ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দিলাম তার যৌক্তিকতাও এ সময় আদালতে তুলে ধরি। এর গণতান্ত্রিক ও বর্ণবাদ বিরোধী নীতি আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করছে সেটাও আদালতকে বলি।

আমার বিরুদ্ধে সরকার যেসব নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে তা বিচারকের সামনে তুলে ধরলাম। সরকার আমাকে নিষিদ্ধ করে কিভাবে আমার রাজনৈতিক

পারিবারিক ও ব্যবসায়িক জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে তার বর্ণনা দেই। বিচারকের উদ্দেশ্যে বললাম, আইন আমাকে অপরাধী করেছে। আমি যা করছি সেগুলির কারণে আমার অপরাধী হবার কোন অবকাশ নেই। কারণ আমার বিবেচনায় যেগুলো ভালো, দেশ ও জনগণের জন্য মঙ্গলজনক আমি সেগুলোই করছি।

সরকারের মামলা-মোকদ্দমার কারণে আমার জীবনে কি রকম দুর্বিষহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তারও একটা বিবরণ আদালতে তুলে ধরলাম। বললাম সরকার আমাকে নিষিদ্ধ ঘোষণার পর থেকে আমি পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন। স্ত্রী ও প্রিয় সন্তানদের থেকে আলাদা হয়ে থাকতে হচ্ছে আমাকে। কিন্তু আমি এ রকম জীবন চাই না। স্ত্রী বাচ্চাদের সাথে আবার এক টেবিলে খাবার খেতে চাই। তাদের নিয়ে আগের মত ঘুরে বেড়াতে চাই।

আমার বিদেশ সফর প্রসঙ্গে বলি, আমাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সরকার অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় আমাদেরকে ওই পথ অবলম্বন করতে হয়। আমার বিদেশ সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিবেশীরা যেন আমাদের দাবি-দাওয়া মেনে নেয়ার ব্যাপারে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। শেষে বিচারকের উদ্দেশ্যে বললাম, যে শাস্তি ইচ্ছা আপনি আমাকে দিতে পারেন। কিন্তু আমি যা করেছি তা দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ জনগণের জন্যই করেছি। নিজের জন্য কিছু করিনি।

আমার কথা শেষ হলে বিচারক ১০ মিনিটের জন্য আদালত মুলতুবি করেন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি আদালতের বাইরে হাজার হাজার লোকের ভিড়ি। এ দৃশ্য দেখে শাস্তির ভয় মন থেকে উড়ে যায়। ঠিক ১০ মিনিট পর আবার আদালতের কাজ শুরু হল। বিচারক কি রায় ঘোষণা করেন তা নিয়ে এ সময় ছিল টান টান উত্তেজনা।

বিচারক আমাকে ৫ বছরের জেল দিলেন। ৩ বছর জেল দেয়া হল ধর্মঘট ডাকার দায়ে আর দু'বছর সাজা দেয়া হল বিনা পাসপোর্টে বিদেশ সফরের দায়ে। সব মিলিয়ে সাজা হল ৫ বছর। কিছুক্ষণের মধ্যে এজলাসের নীরবতা ভাঙ্গল। বাইরেও গুঞ্জন শুরু হল। এএনসি সমর্থকরা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন। আমাকে আদালত থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় তারা নেচে গেয়ে আমাকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করলেন। চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল ম্যান্ডেলা, ম্যান্ডেলা ধ্বনি। এ দৃশ্য দেখে শাস্তির কথা ভুলে গেলাম।

নিচে নেমে উইনির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মানসিকভাবে সে ছিল চাঙ্গা। চোখে পানি ছিল না। উইনি আমাকে অভয় দিয়ে বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করো না। সে আমাকে একটু ছুঁয়ে দেখল। আমাকে পুলিশের ভ্যানে ওঠানো হল। গাড়ি দ্রুত চলতে লাগল। তখনও আমি সমবেত জনতার কণ্ঠে আফ্রিকার জাতীয় সংগীত 'এনকসি সিকিলি আই আফ্রিকা' শুনতে পেলাম।

৫২

কারাগার একজনের স্বাধীনতাই শুধু কেড়ে নেয় না। তার পরিচয়ও পাল্টে ফেলে। এখানে সবাইকে একই রকম পোশাক পরতে হয়, একই ধরণের খাবার খেতে হয়, একই নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে হয়। জেলখানা হচ্ছে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের মত যেখানে নাগরিকদের কোন স্বাধীনতা থাকে না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অধিকার তারা ভোগ করতে পারে না। সব কিছু চলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কারাগারের এই কর্তৃত্ববাদী নীতি আমি মেনে নিতে পারলাম না। এর বিরুদ্ধে লড়াই করার মনস্থ করলাম।

আদালত থেকে আমাকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হয় প্রেটোরিয়ার একটি জেলখানায়। লাল ইটের তৈরি জীর্ণশীর্ণ এই বন্দিশালার সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। অনেকবার এখানে এসেছি। তবে কয়েদী হিসেবে নয়। এখানে বন্দি কয়েদীদের বিচার নিয়ে আলাপ করতে। কিন্তু এ যাত্রায় আমাকে এখানে আসতে হল সাজাপ্রাপ্ত আসামী হয়ে। জেলখানায় আসার পরপরই কর্নেল জ্যাকবস আমার *ক্যারোসটি* (লম্বা জামাটি) নিয়ে যান। এর বদলে দিয়ে যান জেলখানার নির্ধারিত পোশাক। সাধারণ আফ্রিকানদের যে ধরণের পোশাক দেয়া হয় আমাকে সে ধরণের পোশাকই দেয়া হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে ছিল একজোড়া শর্ট ট্রাউজার, একটি মোটা খাকি শার্ট, একটি জ্যাকেট, একজোড়া স্যান্ডেল, একজোড়া মোজা এবং একটি কাপড়ের টুপি।

কর্তৃপক্ষকে বললাম, আমি শর্ট ট্রাউজার পরি না। লং ট্রাউজার ছাড়া আমার চলবে না। স্বেচ্ছায় লং ট্রাউজার না দিলে আদালতে যাব বলে মনস্থির করলাম। এমন সময় দুপুরের খাবার হিসেবে আমার জন্য রুটি ও আধামুঠো চিনি নিয়ে আসা হল। আমি খেতে অস্বীকৃতি জানালাম। খবর শুনে জ্যাকবস ছুটে এলেন। খাবার না খাওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। বললাম, লং ট্রাউজার (লম্বা ট্রাউজার) না পরা পর্যন্ত আমি খাবার খাব না। অতঃপর তিনি একটি লং ট্রাউজার দিয়ে যান।

পরের কয়েক সপ্তাহ খুব নিঃসঙ্গভাবে কাটাতে হয়। আমাকে এমন এক জায়গায় রাখা হল যেখান থেকে অন্য বন্দিদের চেহারা পর্যন্ত দেখা যেত না। তাদের কথা শোনা যেত না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৩ ঘণ্টাই আমাকে তালা দিয়ে রাখা হত। শুধু সকালে আধ ঘণ্টা আর বিকেলে আধ ঘণ্টার জন্য বাইরে বের হতে দেয়া হত। এমন নিঃসঙ্গ ও একাকী সময় জীবনে কখনও পার করিনি। এক ঘণ্টা এক বছরের মত মনে হতে লাগল। আমার সেলে বাইরে থেকে কোন আলো আসত

না। মাথার ওপর একটি বাতি ২৪ ঘণ্টা জ্বালানো থাকত। আমার কাছে কোন হাতঘড়ি ছিল না। অনেক সময় মনে হত এখন মধ্যরাত। অথচ তখন ভর দুপুর। সেলে পড়ার মত কিছুই ছিল না। লেখার জন্য কাগজ কলম ছিল না। কারও সঙ্গে কথা বলার অবকাশও ছিল না। তবে সেলে পোকা মাকড়ের অবাধ বিচরণ ছিল।

মধ্যবয়সী একজন কারারক্ষী আমার কাছে আসতেন। তিনি ছিলেন আফ্রিকান। তাকে ঘুষ দিয়ে ম্যানেজ করার চিন্তাভাবনা করলাম। একদিন বললাম, বাবা আপনাকে কি আমি একটি আপেল দিতে পারি? তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না। সেলে যে কাজ করা দরকার তা করে যেতে লাগলেন। যাওয়ার সময় বললেন, তুমি লম্বা ট্রাউজার চেয়েছিলে। চেয়েছিলে ভাল খাবার দাবার। এসব কিছুই তোমাকে দেয়া হচ্ছে।

এরপরও কি তুমি খুশি নও। কারারক্ষী ঠিকই বলেছিলেন। এত কিছু পাওয়ার পরও মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না। মানুষ মানুষের সান্নিধ্য ছাড়া চলতে পারে না। অন্যের সান্নিধ্য ছাড়া শান্তি পাওয়া যায় না। এটা তখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম।

নিজের একাকিত্ব ঘোচানোর জন্য কিছু রাজনৈতিক বন্দীকে প্রেটোরিয়ায় নিয়ে আসার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানালাম। আমার অনুরোধ তারা রক্ষা করলেন। তবে কর্নেল জ্যাকবস আমার ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আমার প্রতিবাদী আচরণ তাকে খেপিয়ে তোলে।

আমার দাবি অনুসারে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে প্রেটোরিয়ায় নিয়ে আসা হয়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রবার্ট সাবুকি। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী সংগঠন প্যাকের উর্ধতন নেতা। মনে মনে ভাবলাম, বাইরে যা পারিনি এখন জেলখানায় তা পারব। এতদিন বাইরে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে একসঙ্গে বেশিক্ষণ থাকার সুযোগ পাইনি। এখন জেলে হয়ত সে সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি সে ব্যাপারে জেলখানা কর্তৃপক্ষ ছিল সজাগ। কিভাবে আমাদের বিচ্ছিন্ন রাখা যায় সে ব্যাপারে তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না।

কিছুদিন পর আমাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হল। ওইদিন আরো কিছু রাজনৈতিক বন্দীকে আদালতে তোলা হয়। এদের মধ্যে সুবুকিও ছিলেন। এছাড়া সাউথ আফ্রিকান কংগ্রেস অব ট্রেড ইউনিয়নের নেতা জন গেটসি, এএনসি সদস্য এ্যারন মোলেট, কমিউনিস্ট নেতা স্টিফেন টিফুকেও আদালতে

হাজির করা হয়। তারা আমাকে দেখে খুশিতে গদ গদ হয়ে ওঠেন। বিচারকের সামনে হাজির করার পর আমি সুবুকিকে আমার পাশে রাখার অনুরোধ জানাই। আদালত দাবি মঞ্জুর করে। জেলখানা কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুবুকিকে আমার পাশের একটি সেলে এনে রাখে।

পাশের সেলে থাকলেও সুবুকির সঙ্গে কথা বলার খুব একটা সুযোগ সব সময় হত না। মাঝে মধ্যে জেলখানার বারান্দায় এক সাথে বসে কথা বলার সুযোগ পেতাম। সুবুকি ছিলেন খুবই দায়িত্ববান ও সচেতন মানুষ। তাই তাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। বন্দিদের অবস্থাসহ অনেক ব্যাপারে তার সঙ্গে মতবিরোধ ছিল। আমি মনে করতাম বন্দিদের দুঃখ, দুর্দশা ও মানবেতর অবস্থায় রাখা রাষ্ট্রের উচিত নয়। এটা অন্যায়। অমানবিক। এর বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। সুবুকি মনে করতেন দেশের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত জেলখানার পরিবর্তন আসবে না। আমি তার সাথে একমত পোষণ করে বললাম, এরপরও অবস্থার উন্নয়নে সবার সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করা উচিত। দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটানোর জন্য জেলের সবাই মিলে কমান্ডিং অফিসারকে একটি চিঠি দেয়ার প্রস্তাব করলাম।

সুবুকির সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়েও আলোচনা হত। একবার প্যাকের একটি স্লোগানের ব্যাপারে আপত্তি তুললাম। তাতে বলা হয়েছিল– ১৯৬৩ সালের মধ্যে স্বাধীনতা আসবে। আমি বললাম, স্লোগানটির কার্যকারিতা এখন আর নাই। কারণ এখন ১৯৬৩ সাল চলছে। কিন্তু স্বাধীনতা আসে নাই। তাই স্লোগানটি বদলানো উচিত। তাকে আরো বললাম, এই স্লোগান জনগণের মধ্যে মিথ্যে আশা সঞ্চার করছে। নেতারা যে দাবি আদায় করতে পারবে না সেটা এখানে ফুটে উঠেছে। এমন দাবি নিয়ে খেলা করার চেয়ে বিপজ্জনক কাজ আর নেই।

ইতিমধ্যেই জানতে পারলাম ছয় বছরের সাজা হওয়া সত্ত্বেও ওয়াল্টারকে জামিন দেয়া হয়েছে। তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে আবার কাজ শুরু করেছেন।

একদিন বিকেলে উইনি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য জেলখানায় আসলেন। সাজা হওয়ার পর উইনির সঙ্গে এটা ছিল আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আমাকে দেখে উইনি চমকে গেল। শুকনো চেহারা, উসকো-খুশকো চুল দেখেই আমার অবস্থা বুঝতে পারল। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, বেশ ভাল আছি। চিন্তা করার কোন কারণ নেই। এরই মধ্যে অবশ্য বাইরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গেছে।

৫৩

১৯৬২ সালের অক্টোবরে, আমার বিচারকালে এএনসির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ সালের পর এটা ছিল প্রথম সম্মেলন। কারণ এএনসি তখন ছিল অবৈধ সংগঠন। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় লোবাসতিতে। জায়গাটা বিচুয়ানল্যান্ড সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত। এএনসি ও এমকের জন্য সম্মেলনটি ছিল একটি মাইলফলক।

সম্মেলনে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। এমকেকে এএনসির সামরিক শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। প্যাকের সঙ্গে সংযুক্ত পোকে পোকোর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দমন করার জন্যই এ পদক্ষেপ নেয়া হয়। পোকো পোকো প্রায়ই শ্বেতাঙ্গ ও তাদের দোসর আফ্রিকানদের ওপর হামলা চালাত। তাদের অগুছালো ও অপরিকল্পিত হামলা যাতে বন্ধ হয় সেজন্যই এমকেকে এএনসির সামরিক শাখা হিসেবে সম্মেলনে ঘোষণা দেয়া। এএনসি এমকেকে দায়িত্বপূর্ণ ও সুশৃংখল সামরিক শাখা হিসেবে পরিণত করে তোলার জন্য এই পদক্ষেপ নেয়। এমকের ওপর যে এএনসির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেটা সম্মেলনের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানিয়ে দেয়া হয়।

বিশ্ববাসীর মগজ ধোলাইয়ের জন্য বর্ণবাদী সরকার এ সময় 'সেপারেট ডেভলপমেন্ট' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করল। কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকতর স্বাধীনতা দেয়াই ছিল ওই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয় ট্রান্সকেই কে দিয়ে। ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ট্রান্সকেই বাসিন্দাদের নিজেদের সরকার গঠনের অনুমতি দেয়। ১৯৬৩ সালে ট্রান্সকেই পরিণত হয় শায়ত্ত্ব শাসিত ভূখণ্ডে। ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে ট্রান্সকেই পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এমকে সদস্যদের নির্মূলের জন্য ১৯৬৩ সালের ১ মে সরকার পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ করে। আইনটির নাম দেয়া হয় নাইনটি ডে ডিটেনশন ল। এ আইনে পুলিশকে অনেক ক্ষমতা দেয়া হয়। পুলিশ কোন ওয়ারেন্ট ছাড়া যে কাউকে আটক করতে পারত। গ্রেফতারকৃতদের বিনা বিচারে ৯০ দিন আটক রাখা যেত। ফলে পুলিশ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক কর্মীদের ঢালাওভাবে গ্রেফতার শুরু করে। গ্রেফতার কৃতদের ওপর চালায় অকথ্য নির্যাতন। তাদেরকে দিনে কয়েকবার পেটানো হত, বৈদ্যুতিক শক দেয়া হত। এ আইনে নিষিদ্ধ

ঘোষিত সংগঠনের জন্যও কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়। তাদেরকে ৫ বছরের জেল দেয়া থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া যেত।

নতুন এ আইনটি পাশের ফলে সুবুকির সাজা আরো বেড়ে যায়। তার সাজার মেয়াদ বাকি ছিল তিন বছর। এ মেয়াদ শেষ হলে তার মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকার তাকে মুক্তি না দিয়ে তার বিচার নতুন করে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় কুখ্যাত রোবেন দ্বীপে।

১৯৬২ সালের জুন মাসে নাশকতা দমন সংক্রান্ত আরেকটি আইন পাশ করা হয়। এ আইনের আওতায় যে কাউকে গৃহবন্দী রাখা যেত। এর বিরুদ্ধে আদালতে চ্যালেঞ্জ করারও কোন সুযোগ ছিল না।

এ সময় পার্লামেন্টে আরেকটি কুখ্যাত আইন পাশ করা হয়। এ আইনের আওতায় নিষিদ্ধ ব্যক্তিদের বক্তৃতা-বিবৃতি পত্রিকায় ছাপানো নিষিদ্ধ করা হয়।

৫৪

মে মাসের শেষের দিকে এক রাতের কথা। একজন কারারক্ষী আমার সেলে এসে খুব দ্রুত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বললেন। কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। ১০ মিনিটের মধ্যে আমাকে বের করে অভ্যর্থনা কক্ষে নিয়ে বসালেন। সেখানে আরও তিনজন রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। এরা হলেন টিফু, জন গেটসিউয়ি ও এ্যারন মোলেটে।

কর্নেল ইউক্যাম্প অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আমাদের সবাইকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে। টিফু জায়গার নাম জানতে চাইলেন। কর্নেল সাহেব উত্তর দিলেন, খুব সুন্দর একটা জায়গায় আপনাদের নিয়ে যাওয়া হবে। টিফু আবারও স্থানটির নাম জিজ্ঞেস করলেন। কর্নেল সাহেব বললেন, মৃত্যুর উপত্যকা। এ ধরণের একটি জায়গাই দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে। সেটি হল রোবেন দ্বীপে আর সেখানে পাঠানো হচ্ছে আপনাদের।

আমাদের চারজনকে একসঙ্গে জড়ো করা হল। তোলা হল একটি জানালা বিহীন পুলিশ ভ্যানে। প্রস্রাব-পায়খানা করার মত ছোট একটি নোংরা বাথরুমও ছিল ভ্যানে। গাড়ি সারারাত কেপটাউনের দিকে চলল। পরদিন দুপুরনাগাদ গাড়ি এখনকার একটি জাহাজ ঘাটে এসে থামল। গাড়িতে শিকল ও হাতকড়া অবস্থায় বাথরুম ব্যবহার করা ছিল আমাদের জন্য সবচেয়ে কষ্টের কাজ।

কেপটাউনের জাহাজ ঘাটে অনেক সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। সাদা পোশাকেও অনেক পুলিশ আশপাশে অবস্থান নিয়েছিল। জাহাজ ঘাট বা ছোট ওই বন্দরের এক জায়গায় আমাদের শিকলপরা অবস্থায়ই দাঁড় করিয়ে রাখা হল। একটু পরে ছোট নৌকায় করে বন্দরের অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাঠের জাহাজে আমাদের তোলা হল বিশাল আকৃতির কারণে জাহাজটির তীরে ভেড়া সম্ভব হয়নি।

আমাদের ও অনেক কারারক্ষী নিয়ে জাহাজ চলতে শুরু করে। অন্ধকার নেমে আসার আগেই জাহাজ রোবেন দ্বীপে ভীড়ল। জীবনের এই প্রথম দ্বীপটি দেখলাম। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। এটাকে বন্দিশালার বদলে অবকাশযাপন কেন্দ্র বলে মনে হল।

কোজা সম্প্রদায়ের লোকরা রোবেনদ্বীপকে সংকীর্ণ দ্বীপ হিসেবে বর্ণনা করত। বিভিন্ন শিলার সমন্বয়ে গঠিত দ্বীপটির অবস্থান ছিল কেপটাউনের সমুদ্র উপকূল থেকে ১৮ মাইল দূরে। খুব ছোট বেলায় এই দ্বীপের নাম প্রথম শুনি। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে এ দ্বীপে কোজাদের বড় ধরণের যুদ্ধ হয়েছিল। ১৮১৯ সালের ওই যুদ্ধে কোজাদের ১০ হাজার সৈন্য মারা যায়।

কোজা সম্প্রদায় দল নেতা নেক্রেল শুধু জীবিত ছিলেন। ছোট একটি নৌকার সাহায্যে তিনি রোবেন দ্বীপ থেকে পালাতে সক্ষম হন। কিন্তু বাঁচতে পারেননি। নৌকা তীরে ভীড়ার আগেই তিনি পানিতে ডুবে মারা যান। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হ্যারির মতে এ দ্বীপ থেকে মাত্র একজন পালাতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন জেন ভেন রিবিক। ওই ডাচ নাগরিক ছোট একটি নৌকায় করে রোবেন দ্বীপ থেকে মূল ভূ-খণ্ডে ফিরতে পেরেছিল।

দ্বীপে নামার পর কয়েকজন কারারক্ষীর সঙ্গে দেখা হল। তারা আমাদের দেখেই বলতে লাগলেন। স্বাগতম। তোমাদেরকে মৃত্যু উপত্যকায় স্বাগতম। এটা সেই দ্বীপ যেখানে তোমাদের মরতে হবে। আরেকটু সামনে এগিয়ে গেলে দেখতে পাই একদল সশস্ত্র কারারক্ষী একটি ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের দেখে একজন লম্বাচওড়া লোক এগিয়ে এলেন বললেন, এখানে আমিই তোমাদের বস। তিনি ছিলেন কুখ্যাত ক্রেহ্যান্স। অত্যন্ত নিষ্ঠুর জঘন্য প্রকৃতির মানুষ। এখানকার কারারক্ষীরা আফ্রিকান ভাষায় কথা বলত। ইংরেজীকে তারা ঘৃণা করত। বলত ওটা কাফের ভাষা।

আমরা বন্দিশালার দিকে এগুচ্ছিলাম। একজন কারারক্ষী চিৎকার করে বলতে লাগলেন এভাবে হাঁটা যাবে না। দুজন দুজন করে হাঁটতে হবে। অর্থাৎ হাটার সময় দুজন সামনে থাকবে। তার পিছনে আরও দুজন। আমি টিফুর সাথে চলে এলাম। এরপর দুজনে হাঁটতে লাগলাম।

টিফুকে বললাম আমরা দুজন আগে আগে হাঁটব। সামনের সব কিছুর দিকে খেয়াল রাখবো। আমরা চারদিক দেখতে দেখতে এগুতে লাগলাম। হাঁটার গতি

দিলাম কমিয়ে। ক্রেহ্যান্স সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন। তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, এটা জোহান্সবার্গ বা প্রেটোরিয়া নয়। এটা রবিন দ্বীপ। এখানে অবাধ্যতা সহ্য করা হবে না।

কিন্তু এরপরও আমরা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। ক্রেহ্যান্স রেগে গেলেন। আমাদের থামার নির্দেশ দিলেন। এরপর কড়া ভাষায় আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, বাড়াবাড়ি করো না। তাহলে তোমাদের একেবারে জানে শেষ করে ফেলবো। এখানে কিছু করে ফেললে তোমাদের স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা কেউ কিছু জানতে পারবে না। শেষবারের মত বলছি, ভালো হয়ে যাও।

ক্রেহ্যান্সকে বললাম, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। এবার আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে দাও। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, ঐ দুষ্ট লোকটির কাছে কোনভাবেই মাথা নত করবো না। এরই মধ্যে আমাদেরকে কারাগারের সেলে নিয়ে যাওয়া হল। পাকা দালানের বিশাল একটি কক্ষে আমাদেরকে থাকতে দেয়া হল। কক্ষে প্রবেশ করি। পুরো কক্ষ পানিতে ভেজা। কয়েক ইঞ্চি গভীর পানিতে তলিয়ে আছে কক্ষটি। কারারক্ষী বলল, জামা কাপড় খুলে ফেল। আমরা একে একে সব কিছু খুলতে শুরু করলাম। কারারক্ষী একটা একটা করে জামা কাপড় পরীক্ষা করতে লাগল। পরীক্ষা শেষে সেগুলো পানিতে ফেলতে লাগল। এরপর সেলে কারারক্ষীদের একজন কমান্ডার প্রবেশ করল। সে আমাদেরকে ভেজা জামা কাপড়গুলো পরিধান করার নির্দেশ দিল।

এর পর আরো দুজন অফিসার সেলে প্রবেশ করলেন। এদের একজন ছিলেন ক্যাপ্টেন। নাম গ্যারিকি। প্রথম থেকেই তিনিই আমাদের সঙ্গে বাজে ব্যাবহার করে আসছিলেন। ক্যাপ্টেন এ্যারেনে মোলেটকে লক্ষ্য কলে বললেন, তোমার চুল এত লম্বা কেন? তিনি আবারো চিৎকার করে বললেন, তোমার চুল এত লম্বা কেন? এটা নিয়মের বাইরে। এত বড় চুল রাখার বিধান নেই। এরপর ক্যাপ্টেন আমার দিকে তেড়ে আসতে লাগলেন। আমি বললাম, ভাল করে তাকাও। আমাদের চুল মোটেও বড় নয়। জেলখানার বিধান অনুসারেই এ মাপের চুল আমরা রেখেছি।

আমার কথা শেষ হবার আগেই ক্যাপ্টেন বলতে শুরু করল, খবরদার এভাবে কথা বলবে না। এই বলে কাপ্টেন আমার দিকে আবারও তেড়ে আসতে লাগল। আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম, ভাবলাম, হয়তো সে আমার গায়ে হাত তুলবে।

খুব কাছাকাছি চলে আসার পর আমি শক্ত হলাম। দৃঢ়ভাবে বললাম, গায়ে হাত দিও না। আমার ওপর হাত তুললে দ্বীপের সর্বোচ্চ আদালতে বিষয়টি উপস্থাপন করব। তখন তোমার বারোটা বাজবে। আমার কথায় ক্যাপ্টেন তাজ্জব হয়ে গেলেন। আমার সাহসিকতা তাকে অবাক করল। এরপর ক্যাপ্টেন আমার

টিকিট দেখতে চাইলেন। টিকিট দেখে তিনি যেন কেমন ঘাবড়ে গেলেন। আমার নাম জানতে চাইলেন। বললাম– টিকিটে ওটা লেখা আছে।

জিজ্ঞেস করলেন আমার সাজা হয়েছে কত বছরের। বললাম সেটাও ওখানে লেখা আছে। তিনি টিকিটে তাকিয়ে বললেন– ৫ বছরের। ক্যাপ্টেন বললেন, ৫ বছরের সাজার মানে বোঝ? বললাম এটা আমার কাজ। তোমাকে মাথা না ঘামালেও চলবে। আমি ৫ বছর সাজা ভোগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু তোমার পশুর মত ব্যবহার মেনে নিতে প্রস্তুত নই। তোমাকে সবকিছু আইনানুসারে করতে হবে।

পরে বুঝলাম আমরা কারা সেটা ক্যাপ্টেন জানতেন না। আমরা যে রাজনৈতিক বন্দি বা আমি যে একজন আইনজীবী সেটা তার অজানা ছিল। এমন সময় লম্বাচওড়া আরেকজন অফিসার সেলে প্রবেশ করলেন। তিনি ছিলেন কর্নেল এসটিয়ান। রবিন দ্বীপের কমান্ডিং অফিসার। এসটিয়ান আসার পর ক্যাপ্টেন চোরের মত চুপ করে সেল থেকে চলে যান।

পরে আমাদের সেলে লেফটেন্যান্ট প্রেটোরিয়াসও আসেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করেন। যাবার সময় বলে যান, তিনি আমাদেরকে এমন একটি রুমে রাখবেন যেখানে জানালা আছে। আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, ম্যান্ডেলা আমি চাই না আপনি ওই জানালা দিয়ে অন্য কারো সাথে কথা বলেন।

পরে আমাদেরকে নির্ধারিত সেলে এনে রাখা হয়। জেলখানায় আমি এ পর্যন্ত এত সুন্দর সেল দেখিনি। কক্ষটি ছিল বেশ বড়। যেমন দৈর্ঘ্য তেমন প্রশস্ত। জানালাটা ছিল বিশাল। সেটা দিয়ে বাইরের সব কিছু দেখা যেত। ইচ্ছে করলে কারারক্ষীদের ডাকাও যেত। আমাদের চারজনের চলাফেলার পর্যাপ্ত জায়গা ছিল। সেলের ভিতর আলাদা টয়লেট ও গোসলখানা ছিল। এগুলো ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বেশ পরিপাটি।

একদিন রাতে কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছিলাম। এমন সময় জানালায় কে যেন টোকা দিল। ফিসফিস করে বলল, নেলসন এদিকে এস। জানালার কাছে গেলাম। উঁকি দিলাম। দেখলাম একজন কারারক্ষী। তিনি আমাকে প্রথমেই বললেন, নেলসন আমি একজন কৃষ্ণাঙ্গ কারারক্ষী। আমার বাড়ি ব্লোয়েমফনটেইনে। এরপর তিনি আমার স্ত্রীর একটি সংবাদ দিলেন। বললেন, জোহান্সবার্গের পত্রিকায় সম্প্রতি একটি রিপোর্ট বেরিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, উইনি প্রেটোরিয়ার জেলখানায় আমাকে দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে যে রোবেন দ্বীপে পাঠানো হয়েছে সেটা জেলখানা কর্তৃপক্ষ তাকে জানায়নি। এরপর কারারক্ষী বললেন, আপনি কি ধুমপান করেন? বললাম না। এতে তিনি নিরাশ হলেন। তার অবস্থা বুঝতে পেরে বললাম, দাও সিগারেট দাও। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। টিফু ও জন গেটসউয়ি ধুমপান করত। তাদের জন্য সিগারেটগুলো রেখে দিলাম।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিনই ওই কৃষ্ণাঙ্গ কারারক্ষী আমার কাছে আসতেন। আমাকে সিগারেট ও স্যান্ডউইচ দিয়ে যেতেন। আমি সেগুলো টিফু ও গেটসউয়িকে দিয়ে দিতাম। ওই কারারক্ষী বলতেন, তিনি আমার জন্য সব ধরণের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। কিন্তু তবুও তিনি আমার জন্য সম্ভব সব কিছু করে যাবেন।

রোবেন দ্বীপের অন্য বন্দিদের অবস্থা কেমন সে সম্পর্কে প্রথম দিকে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। দ্বীপে আসার কয়েকদিনের মধ্যে জানলাম এখানে কম পক্ষে এক হাজার বন্দি আছে। এদের সবাই আফ্রিকান। সবাইকে সম্প্রতি পাঠানো হয়েছে। পুরুষ বন্দিদের সিংহভাগই ছিল সাধারণ অপরাধে দণ্ডিত। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এদের অনেকেই ছিলেন রাজনৈতিক বন্দি। আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার মনস্থ করলাম। কিন্তু আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

প্রথম কয়েকদিন আমাদেরকে সেলের মধ্যে তালা দিয়ে রাখা হল। বাইরে যেতে দেয়া হল না। অন্য বন্দিদের মত আমরাও বাইরে কাজ করতে চাইলাম। কর্তৃপক্ষ আমাদের আর্জি মেনে নিলেন। আমাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। নজরদারির দায়িত্ব বর্তালো ক্লেহ্যান্সের ওপর। আমাদের প্রথম কাজ ছিল মাটির নিচে বসানো কিছু পাইপ মাটি দিয়ে ভরাট করা। একটি ছোট পাহাড়ের ওপর আমাদের কাজ করতে হত। সেখান থেকে আরো কয়েকটি দ্বীপ দেখা যেত।

প্রথমদিন খুব পরিশ্রম করলাম। প্রতিদিনই ক্লেহ্যান্স আমাদের কষ্ট বাড়িয়ে দিতে থাকেন। কঠিন থেকে কঠিনতর কাজ দিতে থাকেন। আমাদের মধ্যে স্টিভ ছিলেন সবচেয়ে বয়স্ক। এজন্য কোদাল রেখে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিশ্রাম নিতেন। ক্লেহ্যান্স সেটা সহ্য করতে পারতেন না। বকাবকি করতেন। এতে একদিন স্টিভ দারুণ খেপে যান। মুখের ওপর ক্লেহ্যান্সকে কড়া কথা শুনিয়ে দেন।

একদিন স্টিভ উত্তেজিত হয়ে বলেই ফেললেন, তুমি একটা মূর্খ। আমাদের কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে সেটাও বলতে পার না। অথচ মুখে মুখে রাজা উজির ঠিকই মারতে পার। এখন থেকে আমি আমার ইচ্ছে মত কাজ করব। এজন্য যদি কিছু হয় তা মেনে নিতে প্রস্তুত আছি আমি। স্টিভেন ছিলেন শিক্ষক। তিনি আফ্রিকান্স ভাষা খুব শুদ্ধ করে বলতে পারতেন। আফ্রিকান্স হচ্ছে আফ্রিকায় প্রচলিত ওলন্দাজ ভাষা থেকে উদ্ভূত একটি ভাষা। আফ্রিকার ইউরোপীয় সম্প্রদায় এ ভাষায় কথা বলে থাকে। এখানকার অনেকেই আফ্রিকান্স ভাষায় কথা বললেও স্টিভের মত শুদ্ধ করে কেউ বলতে পারত না।

দ্বীপে ক্লেহ্যান্সের আরো দুই ভাই ছিলেন, তারা নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। বন্দিদের ওপর জুলুম নির্যাতন করতেন। বড় ভাইয়ের কাজ ছিল সেলে আমাদের তালা দিয়ে রাখা। আমাদের কখনও হুমকি ধামকি দিতেন না। কখনও গায়েও হাত

তোলেননি তিনি। তার ছোট ভাইও আমাদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকেন। একদিন কাজ শেষে সেলে ফিরছিলাম। ছোট রাস্তা ধরে একটু এগুতেই কয়েকশ' বন্দিকে একসাথে দেখলাম। তারাও কাজ শেষে ফিরছিলেন। তারা অবশ্য আমাদের মত রাজনৈতিক বন্দি ছিলেন না। আমাদেরকে থামতে নির্দেশ দেয়া হল। ওই বন্দিদেরও থামানো হল। এরপর দুইভাই মিলে গল্প শুরু করল। ছোট ভাই এক বন্দিকে তার জুতা পরিষ্কার করে দিতে বললেন। ওই বন্দি গায়ের জামা দিয়ে জুতা পরিষ্কার করতে থাকেন। ক্লেহ্যান্সের দুই ভাইয়ের গল্প চলতে থাকে। আমি ওই বন্দিদের ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম। তাদের অনেকে ছিলেন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী। ১৯৫৮ সালের শেকুকুনিল্যান্ড বিদ্রোহের সংগে তারা জড়িত। তাদের ভালো করে দেখতে একটু এগিয়ে গেলাম। ক্লেহ্যান্সের ছোট ভাই চোখ বড় করে আমার দিকে তাকালেন। কড়া ভাষায় পিছিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। তার কথায় কর্ণপাত না করে এগিয়ে যেতে থাকি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আমার দিকে তেড়ে আসেন। মারতে উদ্যত হন। এমন সময় তার বড় ভাই ছুটে আসেন। কানে কানে ফিস ফিস করে যেন কি বলেন। ভদ্রলোক চুপসে যান।

একদিন আমাদেরকে রোবেন দ্বীপের প্রধান কর্মকর্তার অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। তার নির্দেশেই গোটা রোবেন দ্বীপ চলত। আমাদের অভিযোগ অনুযোগের সুরাহাও তিনি করতেন। তিনি সচরাচর বন্দিদের সামনে আসতেন না। পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলতেন। কিন্তু আমরা যাওয়ার পর তিনি আমাদের কাছে আসলেন। আমি বললাম, আমাদের দেখতে আসায় আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা এ কয়েকজন আপনার কাছে কিছু সমস্যা নিয়ে এসেছি। একে একে সমস্যাগুলো বললাম। তিনি মনযোগ দিয়ে শুনলেন। এরপর বললেন, আমি এগুলো দেখব। আমরা বের হয়ে আসছিলাম এমন সময় তিনি আমাদের থামতে বললেন। আমাদের মধ্যে টিফুর ভুঁড়ি ছিল খুব বড়। তাকে লক্ষ্য করে আফ্রিকান্স ভাষায় তিনি বললেন, *তোমার ভুঁড়িটা বেশ বড়। এখানে কিছুদিন থাকলে এটা অদৃশ্য হয়ে যাবে।*

চাকরির ঝুঁকি নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ কারারক্ষীটি প্রতি রাতেই আমার কাছে আসতেন। সিগারেট দিয়ে যেতেন। আমি সেগুলো টিফু ও গেটসউয়িকে ভাগ করে দিতাম। এ কারণে স্টিভ অবশ্য আমার ওপর নাখোশ ছিলেন। টিফু ছিলেন প্রচণ্ড ধূমপায়ী। সিগারেট পাওয়া মাত্র তিনি খাওয়া শুরু করতেন। সারারাত সিগারেট টেনে কাটাতেন। গেটসউয়ি রাতে খেলেও দিনের জন্য কিছু সিগারেট রেখে দিতেন। একদিন টিফু বললেন, নেলসন তুমি আমার সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করছ। গেটসউয়িকে বেশি সিগারেট দিচ্ছ। আমার ভাগে কম দেয়া হচ্ছে।

তার অভিযোগ ঠিক ছিল না। দুজনকেই সমান করে সিগারেট দিতাম। যাহোক সিদ্ধান্ত নিলাম এখন থেকে নতুন খেলা শুরু করব। এরপর থেকে প্রতিরাতে সিগারেট পাওয়ার পর সেগুলো সমান দুই ভাগে ভাগ করতাম। এরপর টিফুকে

জিজ্ঞেস করতাম সে কোন ভাগ নিবে। টিফু দুটি ভাগ ভাল করে দেখতেন। যেটি বড় বলে মনে হত সেটি নিতেন। এভাবে প্রতিরাতে সিগারেট বণ্টন করতাম।

কিন্তু এরপরও টিফু সন্তুষ্ট ছিল না। কৃষ্ণাঙ্গ কারারক্ষী জানালার কাছে আসলে আমার সঙ্গে সেও জানালার কাছে চলে আসত। অনেকটা জোরে জোরে আরও বেশি করে সিগারেট দিতে বলত। এতে কারারক্ষী বেশ বিব্রত বোধ করত। একদিন সে বলেই ফেলল। নেলসন, আমি শুধু আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাই। কারণ এখানে নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। কথাবার্তা বেশি হলে দু'জনেরই সমস্যা হতে পারে। আমি বললাম, বুঝতে পেরেছি। সামনে এমন হবে না। টিফুকে কারারক্ষী আসার পর জানালার কাছে যেতে বারণ করে দিলাম। কিন্তু কে শোনে কার কথা। পরের রাতে কৃষ্ণাঙ্গ কারারক্ষী জানালায় টোকা দিতেই টিফু এগিয়ে যায়। কারারক্ষীকে বলে, এখন থেকে তার ভাগের সিগারেট সরাসরি তার হাতেই দিতে হবে। নেলসনের হাতে দেয়া চলবে না। এতে ওই কারারক্ষী বিরক্ত হয়। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, ম্যান্ডেলা আপনি কথা রাখেননি এখন থেকে আপনাকে আর সিগারেট দেয়া যাবে না। আমি টিফুকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলাম। কারারক্ষীকে বললাম, দেখ ভাই লোকটা বাচাল। মাথায় গণ্ডগোল আছে। ওর কথায় কিছু মনে করো না। আমার কথায় সে গলে গেল। সিগারেট দেয়া চালিয়ে যেতে লাগল।

ওই রাতে ভাবলাম, টিফুকে এমনিতে ছেড়ে দেয়া যাবে না। শাস্তি দিতে হবে। এটা না হলে তার শিক্ষা হবে না। টিফুকে বললাম, তোমার কারণে সিগারেটের সরবরাহ বন্ধ হতে চলেছিল। তাই আজ রাতে তুমি কোন সিগারেট ও স্যান্ডউইচ পাবে না। টিফু চুপ করে রইলেন।

ওই রাতে সেলের এক পাশে রইলাম আমরা। স্যান্ডউইচ খেলাম। কারারক্ষীর দিয়ে যাওয়া পত্রিকা পড়লাম। টিফু অন্যপাশে শুয়ে রইল। আমরাও ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনেক রাতে মনে হল কে যেন আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে। চেয়ে দেখি টিফু। তিনি আমাকে বললেন, নেলসন তুমি আমার দূর্বল জায়গায় আঘাত করেছ। আমাকে সিগারেট থেকে বঞ্চিত করেছ। তুমি জান আমি সিগারেট ছাড়া চলতে পারি না। জেলখানায় তুমিই আমাদের নেতা। আমাকে এভাবে বঞ্চিত করা তোমার ঠিক হয়নি। টিফু আমার দূর্বল জায়গায় আঘাত করলেন।

আমি বুঝতে পারলাম, আমি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছি। আমার চেয়ে তার ভোগান্তিটা বেশি হয়েছে। আমি স্যান্ডউইচটা অর্ধেক খেয়েছিলাম বাকিটা রেখে দিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি বাকি স্যান্ডউইচটা তাকে দিলাম। তড়িঘড়ি করে গেটসডউয়ির কাছে গেলাম। তার কাছে থাকা সবগুলো সিগারেট নিয়ে এলাম। সেগুলো তুলে দিলাম টিফুর হাতে। তাকে অবশ্য সিগারেটগুলো গেটসডউয়ির সঙ্গে ভাগাভাগি করে পান করতে অনুরোধ করলাম। এতে তিনি রাজি হলেন।

দ্বীপের অন্য বন্দিদের অবস্থা জানার খুব ইচ্ছে হল। আমাদের সেলের বিপরীত দিকে অবস্থিত একটি সেলে কয়েকজন বন্দিকে রাখা হয়েছিল। এরাও ছিলেন রাজনৈতিক বন্দি। প্যাকের কর্মী। রাতে আমরা তাদের সেলের কাছে যেতে সক্ষম হলাম। পেছনের দরজা দিয়ে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে আলাপ করলাম। পরিচয় জানতে গিয়ে দেখলাম এদের একজন আমার আপন ভাতিজা। ১৯৪১ সালে সর্বশেষ তাকে আমি দেখি। তখন ও ছিল ছোট্ট শিশু। তার নাম এনকাবেনি মেনিয়ে। তার কাছে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খোঁজ-খবর নিলাম। তাদের শহর ট্রান্সকেইর অবস্থা জানলাম।

একদিন রাতে আবার ওই সেলে গেলাম। এনকাবেনি বন্ধুদের মাঝে বসে গল্প করছিল। আমাকে দেখে সবাই এগিয়ে এল। এনকাবেনি জিজ্ঞেস করল, চাচা আপনি কোন রাজনৈতিক দল করেন। বললাম এএনসি। শোনা মাত্র তার ও তার বন্ধুদের মুখ মলিন হয়ে গেল। তারা একে একে আমার সামনে থেকে চলে গেল। পরে ভাতিজা, আমার কাছে জিজ্ঞেস করে, আমি কখনো প্যাকের সদস্য ছিলাম কিনা। বলি, না আমি কখনোই প্যাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম না। বরাবরই এএনসির সদস্য ছিলাম। এরপর সে জানায়, তার ধারণা ছিল আফ্রিকা সফরের সময় আমি প্যাকে যোগ দিয়েছিলাম। তাকে বললাম, তোমার এ ধারণা ভুল। আমি সব সময় এএনসির সদস্য ছিলাম। ভবিষ্যতেও থাকব।

পরে শুনেছি, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ সফরের সময় নাকি আমি প্যাকে যোগ দিয়েছিলাম। প্যাকে এমন একটা গুজব প্রচলিত আছে। এ খবর শুনে মর্মাহত হলাম। তবে অবাক হলাম না। রাজনীতিতে কি ঘটে তা সব সময় বোঝা যায় না। পরে ভাতিজা আমার কাছে জানতে চায় প্রেটোরিয়ায় সুবুকির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কিনা। জবাবে বললাম, আমরা অনেকদিন একসঙ্গে ছিলাম, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আমার বিস্তর আলোচনা হয়েছে। একথা শুনে ভাতিজা ও তার বন্ধুরা খুব খুশি হয়। আমার প্রতি তাদের মনোভাব পাল্টে যায়।

কিছুক্ষণ পর বিকেলে একজন ক্যাপ্টেন আমাদের সেলে প্রবেশ করেন। তিনি আমাদের চারজনকে মালামাল গোছাতে বলেন। মালামাল গোছানোর পর আমার তিন সঙ্গীকে তিনি নিয়ে যান। সেলে একা পড়ে থাকি আমি।

সেলে বড় একা হয়ে গেলাম। এতে আমার মধ্যে উদ্বেগ বেড়ে যায়। কয়েকজন এক সাথে থাকলে নিরাপদ বোধ হয়। একা থাকলে দেখার কেউ থাকে না। কিছু হয়ে গেলে তার সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শীও থাকে না। মনে হল আমাকে আগের মত খাবার-দাবার দেয়া হবে না। ওই রাতে সেলে একজন কারারক্ষী আসলেন। বললেন, এখন থেকে আমাকে বস বলতে হবে। সে আমার জন্য খাবার না নিয়ে আসায় রাতে আমাকে উপোষ করতে হয়।

পরের দিন খুব সকালে আমাকে আবার প্রেটোরিয়ায় ফিরিয়ে আনা হয়। কারাগারের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্যাক কর্মীরা আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করছিল। এজন্য নিরাপত্তার খাতিরে আমাকে রোবেন দ্বীপ থেকে সরিয়ে আবার প্রেটোরিয়ায় নিয়ে আসা হয়েছে। আসলে বিষয়টি ছিল ডাহা মিথ্যা। তারা আমাকে প্রেটোরিয়ায় নিয়ে আসে তাদের স্বার্থে। পরে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রেটোরিয়ার কারাগারে অনেকেই আমার প্রতি সদয় ছিল। বন্দি হিসেবে আমাকে মর্যাদার সঙ্গে দেখা হত। এখানে এএনসির অনেক লোক ছিল। তাদের মাধ্যমে দলের নানা খবরাখবর পেতাম। দলের ভিতরের অনেক কিছু জানতে পারতাম।

এখানে হেনরি ফেজিয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। তিনি ছিলেন এমকের সদস্য। ইথিওপিয়ায় তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ নেন। দেশে ফেরার পথে গ্রেফতার হন। এখানে এএনসির আরও কিছু সদস্য ছিলেন। যাদেরকে নাশকতামূলক তৎপরতার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

একদিন সেলের বাইরে ব্যায়াম করছিলাম। এমন সময় এন্ড্রু এমলেঙ্গেনিকে দেখতে পেলাম। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে সর্বশেষ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য তিনি তখন দেশ ছাড়ছিলেন। আরো জানতে পারলাম এএনসির আরেক সদস্য হ্যারল্ড উলপিওকেও নাকি গ্রেফতার করা হয়েছে। এ দুজনকে জেলখানায় দেখে ঘাবড়ে গেলাম। ভাবলাম, না জানি দলের আরও কতজন জেলখানায় দিন কাটাচ্ছেন।

১৯৬১ সালের প্রথম দিকে উইনিকে দু'বছরের জন্য সরকার নিষিদ্ধ করে। একজন বন্দীর কাছ থেকে শুনলাম, নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অভিযোগে সরকার নাকি তার বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা করেছে। এটা হলে উইনিকে জেলে যেতে হবে আর না হয় গৃহবন্দী করা হবে। উইনি জেলে যাবে, এমনটি মনে হতেই আমার খারাপ লাগত।

১৯৬৩ সালের জুলাই মাস। একদিন সকালে জেলখানার বারান্দায় হাঁটছিলাম। এমন সময় টমাস ম্যাশিফ্যানকে দেখতে পেলাম। তিনি ছিলেন লিলিসলিফ ফার্মারের শ্রমিকদের প্রধান। তাকে আমি জড়িয়ে ধরলাম। যদিও আমি জানতাম, এ কাজ না করলেও কর্তৃপক্ষ ঠিকই তাকে আমার সেলে পাঠাবে। আমি তাকে চিনি কিনা সেটা তারা পরীক্ষা করে দেখবে।

দু'দিন পর আমাকে জেলখানার অফিসরুমে ডেকে পাঠানো হল। সেখানে গিয়ে দেখি, ওয়াল্টার, গেভান এমবেকি, আহমেদ কাদরাদা, এন্ড্রু এমলেঙ্গেনি, বব হ্যাপল, রেমন্ড এম হলবা সবাই উপস্থিত। রুমে এমকের একজন উর্ধ্বতন কমান্ডারকেও দেখতে পেলাম। তিনি কিছুদিন আগে চীন থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করে দেশে ফিরেন। এমকের সদস্য ইলিয়াস মোতসোয়ালেডিও সেখানে ছিলেন।

আমাদের সবার বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়। পরদিন আমাদের আদালতে তোলা হবে বলে জানানো হয়। আমার ৫ বছরের সাজার মাত্র ৯ মাস শেষ হয়েছে। এরই মধ্যে আরেক মামলায় পড়তে হল আমাকে।

পরে জানতে পারলাম ১ জুলাই পুলিশ লিলিসলিফ খামারে অভিযান চালায়। পুরো খামার তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করে। কোন অস্ত্র না পেলেও শত শত কাগজপত্র ও ডকুমেন্ট তারা ওই খামার থেকে উদ্ধার করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র। এছাড়া *আমখন্ডু উয়ি সিজউয়ির* (এমকে) পুরো হাইকমান্ডের নাম ঠিকানাও পুলিশ ওই খামার থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তাদের অধিকাংশকেই পরে গ্রেফতার করা হয়।

আমাদেরকে আদালতে নেয়া হল। বিচার কাজের ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা বা সহযোগিতা আমরা পেলাম না। আমাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাঁড় করানো হল। আমাদের বিরুদ্ধে আনা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ পড়ে শোনালেন একজন কর্মকর্তা।

এর কয়েকদিন পর আমাদেরকে ব্রাম, ভ্যারন ব্যারেঞ্জ, জোয়েল জোফি, জর্জ বিজোস ও আর্থার ক্যাস ক্যালনের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হল। এরা ছিলেন আমাদের আইনজীবী। আমাকে জেলে আলাদা সেলে রাখা হত। কারণ আমি ছিলাম সাজাপ্রাপ্ত আসামী। আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগও কম পেতাম আমি। ব্রাম ছিলেন খুবই বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী। তিনি জানালেন, আমাদের মামলাটি খুবই সাংঘাতিক। আমাদের সর্বোচ্চ সাজা হবারও সম্ভাবনা আছে বলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয়েছে। সর্বোচ্চ সাজা বলতে মৃত্যুদণ্ডের কথাই তিনি বুঝিয়েছেন। এরপর থেকে আমাদের চোখের সামনে কেবলই ফাঁসির দড়ি ঝুলত। রাতে ঘুমোতে পারতাম না।

৫৫

১৯৬৩ সালের ৯ অক্টোবর। আমাদেরকে খুবই সুরক্ষিত একটি পুলিশের ভ্যানে তোলা হল। এটির মাঝখানে স্টিলের বেড়া ছিল। বেষ্টনির একদিকে রাখা হত শ্বেতাঙ্গ বন্দিদের অন্যদিকে কৃষ্ণাঙ্গদের। আমাদেরকে প্রেটোরিয়ার আদালত পল্লীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এখানে সুপ্রিম কোর্টসহ অন্যান্য আদালত অবস্থিত। এই আদালতেই আমার সঙ্গে রাষ্ট্রের মোকাবেলা হয়। এ বিচারের কথা গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এটি রাইভোনিয়া ট্রায়াল হিসেবে বিশ্ব জুড়ে পরিচিতি লাভ করে। আদালতের সামনে পল ক্রুজারের একটি ভাস্কর্য ছিল।

তিনি ট্রান্সভাল প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ১৯ শতকে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি শুধু একজন বীরই ছিলেন না অসাধারণ বক্তাও ছিলেন।

পল ক্রুজারের বিখ্যাত উক্তি– *আমরা বিজয়ী হই অথবা মারা যাই। আফ্রিকা একদিন স্বাধীন হবেই। দুর্যোগের মেঘ কেটে যাবে।*

আমাদের ভ্যানটি ছিল পুলিশের অনেক গাড়ির মাঝখানে। এর আগে ছিল পুলিশের অনেক মোটর সাইকেল। এরা সবাই আমাদের ভ্যানটিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

পুলিশ বহরের সবার আগে ছিল কয়েকটি লিমুজিন গাড়ি। এতে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন। বিচারকের এজলাস ছিল নিরাপত্তাকর্মীতে ভরপুর। পুরো আদালত অঙ্গন জুড়ে ছিল পুলিশ আর পুলিশ। আদালত চত্বরে যাতে লোকজন ভীড় না করতে পারে সেজন্য সশস্ত্ররক্ষীরা ছিল তৎপর। আদালতের ভবনগুলোতে পুলিশ মেশিনগান বসিয়ে অবস্থান নেয়।

ভ্যান থেকে আদালত চত্বরে নামার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকের শ্লোগান শুনতে পেলাম। বুঝলাম, আদালত চত্বরে আশপাশে অনেক লোক আছে। দেশ বিদেশের পত্র পত্রিকাগুলো এ বিচারকে দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিচার হিসেবে অভিহিত করে। তাই এএনসির নেতাকর্মীরা শত বাধা উপেক্ষা করে আদালত এলাকার আশ পাশে ভীড় জমায়।

সেল থেকে আনার সময় আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে দু'জন করে সশস্ত্র রক্ষী দেয়া হয়। বিচারকের রুমে ভীড় ঠেলে আমাদের ঢোকানো হয়। এ সময় এএনসির সমর্থকরা আমাদেরকে স্যালুট দেন। দর্শক গ্যালারিতে বসা এএনসি সমর্থকরা ম্যান্ডেলা জিন্দাবাদ, বলে শ্লোগান দিতে থাকে। এটা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হলেও ভয়েরও কারণ ছিল। বিচারকের কক্ষ দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, আইনজীবী, সরকারি লোকজনে পরিপূর্ণ ছিল।

বিচারকের কক্ষে প্রবেশ করার পর একদল পুলিশ অফিসার আমাদের কর্ডন দিয়ে রাখে। কক্ষে উপস্থিত কেউ যেন ধারেকাছে ভীড়তে না পারে সে ব্যাপারে তারা ছিল সজাগ। জেলের পোশাক পরা অবস্থাতেই আমাকে বিচারকের সামনে উপস্থিত করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত আসামী হওয়ায় আমাকে অন্য পোশাক পরতে দেয়া হয়নি। এ সময় আমাকে অনেক খারাপ দেখা যাচ্ছিল। জেলে থাকার কারণে আমার ওজন ২৫ পাউন্ড কমে যায়। এজন্য আমাকে দেখে এএনসি সমর্থকদের মন খারাপ হয়ে যায়।

আমাদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির একটি কারণও ছিল। কিছুদিন আগে আর্থার গোল্ডরিচ, হ্যারল্ড হোল্প, মোসে মুলা, আব্দুল্লাহ জাসাত কয়েকজন তরুণ কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে জেল থেকে পালিয়ে যায়। হ্যারল্ড সন্নাসীর বেশ ধরে উড়াল দেয় সোয়াজিল্যান্ড। সেখান থেকে তাঞ্জানিয়া।

তাদের পালিয়ে যাওয়ার খবর পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। এ কয়জনের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা আমাদেরকে দারুণভাবে অনুপ্রাণীত করে। যদিও এটা ছিল সরকারের জন্য খুবই বিব্রতকর।

আমাদের রাইভোনিয়া বিচারের বিচারক ছিলেন মিস্টার কোয়ারটাস ডি ওয়েট। তিনি ছিলেন ট্রান্সভালের বিচারকদের সভাপতি। ডি ওয়েট ছিলেন ইউনাইটেড পার্টি মনোনীত সর্বশেষ বিচারক। পরে ন্যাসনালিস্টরা ক্ষমতায় আসলেও তাকে স্বপদ থেকে অপসারণ করেনি। তিনি ছিলেন ভাবলেশহীন মানুষ। এ বিচারে সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন ড. পার্সি ইউটার। তিনি ছিলেন ট্রান্সভালের ডেপুটি এটর্নি জেনারেল। তার মূল লক্ষ্য ছিল সরকারকে খুশি করে যেকোন মূল্যে দক্ষিণ আফ্রিকার এটর্নি জেনারেল হওয়া। ইউটার ছিলেন ছোট খাটো সাইজের মানুষ। তবে গলাটা ছিল খুব তীক্ষ্ণ। রেগে বা উত্তেজিত হয়ে কথা বললে বহুদূর থেকেও শোনা যেত।

বিচার শুরু হল। ইউটার বিচারককে, মহামান্য আদালত বলে সম্বোধন করলেন। একটি অভিযোপত্র বিচারকের কাছে হস্তান্তর করলেন। তাতে প্রধান আসামী ছিলাম আমি।

আমাদের বিরুদ্ধে নাশকতার অভিযোগ উত্থাপন করলেন। অভিযোগ পত্রের একটি কপি আমাদেরকেও দেয়া হল। এই প্রথম আমরা এ ধরণের কপি পেলাম। অভিযোগপত্রে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণ সম্বলিত র‍্যান্ড ডেইলি মেইলসহ অনেক পত্রিকার কাটিং সংযুক্ত ছিল। অভিযোগপত্রে আমাদের ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। এতে বলা হয়, আমরা এ পর্যন্ত দুই শতাধিক নাশকতামূলক কাজ করেছি। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকে উসকে দিয়েছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে উৎখাত করা। রাষ্ট্রদ্রোহের বদলে আমাদের বিরুদ্ধে মূলত নাশকতা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। নাশকতা ও ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক বিশ্বাস ঘাতকতা তথা রাষ্ট্রদ্রোহের সামিল না হলেও এই দুই অপরাধের শাস্তি ছিল একই রকম। উভয় অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড তথা ফাঁসি।

এটা ছিল খুব বড় ধরণের রাজনৈতিক মামলা। তাই শাস্তি দেয়ার আগে অভিযোগ প্রমাণ করাটা ছিল অপরিহার্য। প্রত্যেক আসামীর বিপক্ষে কম করে দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন ছিল। নাশকতামূলক আইন অনুসারে, অভিযোগের প্রমাণ সরবরাহের দায়িত্ব বর্তায় রাষ্ট্রের ওপর। আসামীদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হয় যাতে তারা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে।

ব্রাম ফিশ্চার ছিলেন আমাদের আইনজীবী। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বিচারককে লক্ষ্য করে বললেন, আসামীরা মামলার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে কোন সময়

পায়নি। আসামীদের অনেকে অন্য মামলায় দীর্ঘদিন ধরে জেল খাটছেন। তারা এ মামলার ব্যাপারে কিছুই জানেন না। সরকার কয়েক মাস ধরে এ মামলার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। অথচ আসামীরা আজকে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শুনতে পেল মাত্র।

বিচারক ফিশ্চারের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমাদেরকে মামলার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তিন সপ্তাহ সময় দিলেন। শুনানি ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করলেন।

এদিন আদালত অঙ্গনে উইনিকে দেখতে না পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। উইনির ওপর পুলিশের নিষেধাজ্ঞা ছিল। এখানে আসার জন্য তার অনুমতির প্রয়োজন ছিল।

আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়ার জন্য উইনি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু সরকার তার সে আবেদনে সাড়া দেয়নি। ফলে উইনির পক্ষে এখানে আসা সম্ভব হয়নি। শুনতে পেলাম, পুলিশ আমাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। উইনির এক আত্মীয়কে ধরে নিয়ে গেছে। আমার স্ত্রী হওয়ার জন্যই উইনির কপালে এত দুর্ভাগ্য নেমে এল। ৯০দিনের আটকাদেশ আইনের আওতায় উইনির আত্মীয়কে আলবার্টিনা সিসুলোকে গ্রেফতার করা হয়। ওয়াল্টারের ছোট ছেলে ম্যাক্সও গ্রেফতারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কারাবন্দি মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য সরকার তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের গ্রেফতারের মত জঘন্য কৌশল বেছে নেয়।

আমার শুনানীর সময় আদালতে উপস্থিত থাকার আবেদন জানিয়ে উইনি পরে বিচার মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। তার আবেদন মঞ্জুর করা হয়। তবে শর্ত দেয়া হয় আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে আদালতে যাওয়া যাবে না।

মামলার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য পরবর্তী তিন সপ্তাহ আমাদেরকে একসঙ্গে থাকার অনুমতি দেয়া হল। এ সময় সপ্তাহে একদিন আড়াই ঘণ্টার জন্য আমাদের সঙ্গে সবাইকে দেখা করার অনুমতি দেয়া হয়। দৈনিক এক বেলার খাবার এ সময় বাইরে থেকে পাঠানো যেত। ফলে ভালো খাবার খেয়ে আমি আবার হারানো ওজন ফিরে পেলাম। আমার স্বাস্থ্য ভাল হয়ে গেল।

আমরা বিচারের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। সরকারপক্ষ এ সময় মামলা নিয়ে ঢালাওভাবে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি চালিয়ে যেতে লাগল। যদি বিচারহীন মামলা হিসেবে এ ব্যাপারে কোনরকম মন্তব্য করা ছিল আইনের পরিপন্থী। তবুও আমাদের কর্মকাণ্ডকে সামরিক ক্যু এর সঙ্গে তুলনা করে পত্র-পত্রিকাগুলো ঢালাওভাবে নানারকম নিবন্ধ, প্রবন্ধ লিখে যেতে লাগল।

২৯ অক্টোবর ফের বিচার শুরু হল। আমাদেরকে আদালতে নেয়া হল। আজও আদালত এলাকা ছিল লোকে লোকারণ্য। চারদিকে ছিল কঠোর নিরাপত্তা। অনেক বিদেশীকেও আদালতে চোখে পড়ল। তিন সপ্তাহ ধরে বিচারের ব্যাপারে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়ায় আজ আদালতে বেশ স্বস্তি অনুভব করলাম। নিজেকে অন্ধকারে মনে হল না। বিচারের শুরুতেই আমাদের আইনজীবী আমাদের পোশাক নিয়ে আপত্তি তুললেন। বললেন, যে কোন পোশাক নিয়ে আমাদের আদালতে উপস্থিত হবার অধিকার আছে।

তিনি জেলখানার পোশাকের পরিবর্তে অন্য পোশাক পরার অনুমতি দেয়ার জন্য বিচারকের প্রতি অনুরোধ জানালেন। কিন্তু সরকার পক্ষের আইনজীবী বললেন, আমাদেরকে আইনানুসারে জেলখানার পোশাক পরেই আদালতে হাজির হতে হবে। স্বেচ্ছায় করা না হলে জোরপূর্বক ওই কাজ করতে বাধ্য করা হবে।

ব্রাম ফিশ্চার আমাদের পক্ষে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। তিনি অভিযোগপত্রের প্রচণ্ড সমালোচনা করে বললেন, অভিযোগপত্রের অনেক অভিযোগের সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই। অভিযোগপত্রে অসংখ্য অসঙ্গতি আছে। যেসব তথ্য প্রমাণ দেয়া হয়েছে সেগুলোও অত্যন্ত দূর্বল। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, অভিযোগপত্রে ম্যান্ডেলার বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া কয়েকটি তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে– সে সময় তিনি প্রেটোরিয়ার জেলখানায় বন্দী ছিলেন।

ফিশ্চারের বক্তব্যের পর বিচারক সরকার পক্ষের আইনজীবী ইউটারের দিকে তাকালেন। ফিশ্চারের অভিযোগপত্রে যথাযথ তথ্য না দেয়ায় তিনি ইউটারকে ভর্ৎসনা করলেন। অভিযোগপত্রকে বিচারক এক ধরণের রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। বিচারক অভিযোগপত্র বাতিল করে দিয়ে আদালত মুলতবি ঘোষণা করলেন।

অভিযোগপত্র (চার্জশিট) বাতিল হয়ে যাওয়ায় আমরা আইনগতভাবে দৃশ্যত মুক্ত হয়ে যাই। যদিও এ মুক্তি ছিল ক্ষণিকের জন্য। এ সময় আদালতে তুমুল হট্টগোল হৈচৈ সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিচারক ডি ওয়েট এজলাস ছাড়ার আগেই আমাদেরকে ফের গ্রেফতার করা হয়। লেফটেন্যান্ট সোয়ানপল আমাদের কাঁধের ওপর দিয়ে ফিস ফিস করে বলেন, নাশকতার একটি অভিযোগে আপনাদেরকে আমি পুনরায় গ্রেফতার করলাম। এরপরই আমাদেরকে জেলখানার সেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ ঘটনা ছিল সরকারের গালে চপেটাঘাতের শামিল।

নতুন অভিযোগপত্র তৈরি করে পুনরায় আমাদেরকে আদালতে পাঠানো হয়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমাদেরকে বিচারক ডি ওয়েটের সামনে হাজির করা হয়।

বিচারক আমাদের দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকান। তার মনোভঙ্গী বেশ কঠোর মনে হল। আমার কেন যেন মনে হতে লাগল আগের চার্জশিট বাতিল করে দেওয়ায় সরকার তাকে বকাঝকা করেছে। তার ওপর চাপ প্রয়োগ করেছে। এ যাত্রায় তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারবেন না।

নতুন অভিযোগপত্র পড়ে শোনানো শুরু হল। এতে নাশকতামূলক তৎপরতা চালানো ও গেরিলা যুদ্ধের জন্য লোক সংগ্রহ করার অভিযোগ আনা হল আমাদের বিরুদ্ধে। অভিযোগপত্রে বলা হয়, আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব করা। বিদেশী সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সহযোগিতা নেয়া ও দেয়ারও অভিযোগ আনা হয় আমাদের বিরুদ্ধে। কমিউনিস্ট বিপ্লবকে সফল করার জন্য আমরা বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়েছি বলেও অভিযোগ উত্থাপন করা হয় আমাদের বিরুদ্ধে। রেজিস্টার এর পর আমাদের কাঠগড়ায় ডাকেন। আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য কিনা তা জানতে চান।

তিনি বলেন, অভিযুক্ত এক নম্বর আসামী নেলসন ম্যান্ডেলা, আপনি কি আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করছেন? আমি বললাম, মহামান্য আদালত, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ঠিক নয়। আমি নির্দোষ। আমি সরকারকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আহ্বান জানাই।

রেজিস্টার এর পর ওয়াল্টার সিসুলুকে জিজ্ঞেস করেন, ২ নম্বর অভিযুক্ত, আপনি কি আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করছেন? সিসুলু পরিষ্কার ভাষায় বলেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। দেশে যা ঘটেছে তার জন্য সরকারই সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

আমাদের কথাবার্তা শুনে বিচারক কিছুটা বিরক্ত হন। তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনাদের কাছ থেকে কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে চাই না। আপনারা নির্দোষ কিনা সেটা বলুন। কিন্তু কেউ বিচারকের কথায় কর্ণপাত করলেন না। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অভিযোগ অস্বীকারের পাশাপাশি সবাই ছোটখাটো রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে ফেলেন। বিচার বেশ জমে ওঠে। বিচারকাজে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য এবং আমাদেরকে ফাঁসানোর অংশ হিসেবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ইউটারের বক্তব্য দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। ইউটার ও বিচারকের সামনে মাইক্রোফোন বসানো হয়। ইউটার কথা বলা শুরু করবেন এমন সময় আমাদের আইনজীবী ব্রাম ফিশ্চার উঠে দাঁড়ান। তিনি মাইক্রোফোন সরানোর অনুরোধ জানান। তিনি সরকারের এই কর্মকাণ্ডকে অবৈধ হিসেবে বর্ণনা করেন। বিচারককে প্রভাবিত করার অপকৌশল হিসেবে এটা করা হচ্ছে বলে বিচারককে জানান। ইউটারের আপত্তির কারণে বিচারক ডি ওয়েট মাইক্রোফোন সরিয়ে নেয়ার আদেশ দেন।

ইউটার তার যুক্তিতর্ক পেশ করেন। তিনি এএনসির আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত চালানো রাজনৈতিক ও সামাজিক তৎপরতার বিবরণ একে একে তুলে ধরেন। ইউটার বলেন, আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে বিভিন্নভাবে সরকার বিরোধী কাজ করেছি। নাশকতায় ইন্ধন যুগিয়েছিল। সশস্ত্র বিপ্লব ঘটানোর জন্য গেরিলা বাহিনী পর্যন্ত গড়ে তুলেছি। গেরিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য অন্য দেশের সাহায্য নিচ্ছি। বিভিন্ন দেশ অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে আমাদের সাহায্য করছে। এ প্রসঙ্গে তিনি এএনসির সামরিক শাখা আমখুনতু উয়ি-সিজউয়ি বা এমকের কথা উল্লেখ করেন। দেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর মহা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এএনসি ও কমিউনিস্ট পার্টি এটি গঠন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, এমকের সদর দপ্তর রাইভোনিয়ায় অবস্থিত।

কিভাবে এমকে সদস্য গ্রহণ করে, তাদের প্রশিক্ষণ দেয় সে কথাও বিচারককে বলেন। বিপ্লবকে উসকে দেয়ার জন্য ১৯৬৩ সালে রাইভোনিয়ায় একটি শক্তিশালী রেডিও স্টেশন চালুর পরিকল্পনাও আমাদের ছিল বলে তিনি জানান। আসলে এ পরিকল্পনাটি ছিল প্যাকের। ইউটার ২২২টি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আনেন আমাদের বিরুদ্ধে। বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ আমাদের বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জামের একটি তালিকা তুলে ধরেন আদালতে।

পরবর্তী তিনমাসে আমাদের বিরুদ্ধে আদালতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ১৭৩ জন সাক্ষী হাজির করা হয়। এদের মধ্যে অনেকে ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। হাজার হাজার কাগজপত্র, নথি, রিপোর্ট, ছবি ও মানচিত্র আদালতে দাখিল করা হয়। এগুলোর মধ্যে গেরিলা যুদ্ধের নকশা, মানচিত্র ও ছদ্ম নাম নিয়ে আমার বিদেশ সফরের পাসপোর্টটিও ছিল। সরকার পক্ষের হাতে এতসব ডকুমেন্ট দেখে আমরা রীতিমত ঘাবড়ে যাই।

রাষ্ট্রপক্ষের রাজসাক্ষী ছিলেন ব্রুনো এমটোলো। তাকে আদালতে পরিচয় করানো হলো মিস্টার এক্স হিসেবে। তিনি এমকের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ফাঁস করে দিয়ে আমাদের মহাবিপদে ফেলে দেন। এমটোলো ছিলেন লম্বা চওড়া। বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন ডারবানের বাসিন্দা। জুলু সম্প্রদায়ের লোক। নাটাল প্রদেশে এমকের আঞ্চলিক কমান্ডার ছিলেন তিনি। অনেকগুলো নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন তিনি। রাইভোনিয়ায় একবার তার সঙ্গে আমার বৈঠকও হয়েছিল।

রাষ্ট্র যেভাবেই হোক তাকে ম্যানেজ করে শেষ পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী বানায়। ব্রুনো এমটোলো কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একে একে এমকের সব নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণ দেন। ব্রুনো বলেন, তিনি নিজে একটি

মিউনিসিপ্যাল অফিস, একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র উড়িয়ে দিয়েছেন। ট্রেন লাইনের অনেক ক্ষতি করেছেন। এরপর তিনি এমকের বোমা তৈরি, ল্যান্ড মাইন পাতা, গ্রেনেড ছোড়াসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের কথা সুন্দরভাবে আদালতের কাছে তুলে ধরেন। এমকে আন্ডারগ্রাউন্ডে কিভাবে কাজ করতো সে বিবরণও তিনি তুলে ধরেন। ব্রুনো অবশ্য বলেন, এএনসির আদর্শের প্রতি সবসময়ই তার শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন, এএনসি কমিউনিস্ট পার্টির কথামত চলছে তখন থেকে এএনসির প্রতি তার আস্থা চলে যায়।

আমার বিশ্বাস ছিলো ব্রুনো এমটোলো এএনসির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। তাকে এ কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। জেলখানায় তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছে। সেজন্যই তিনি এসব বলতে বাধ্য হয়েছেন। এটা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তবে এরপরও তাকে মনে মনে একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ধরে নিলাম।

নথিপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে দেখতে পেলাম এমকেতে যোগ দেয়ার আগে ব্রুনো ছিল একজন দাগী অপরাধী। চুরির জন্য সে তিন বার জেল খেটেছে। কিন্তু এরপরও সে এখন সবচেয়ে বড় সাক্ষী। বিচারক তার কথা বিশ্বাস করেছে বলেও মনে হল। তার এই সাক্ষীই আমাদেরকে ফাঁসিয়ে দিবে বলে আমরা ধরে নিলাম।

সরকারের পক্ষ থেকে গেরিলাযুদ্ধের পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অনেক তথ্য আদালতে পেশ করা হয়। এতে বলা হয়, এমকের সদস্য সংখ্যা ৭ হাজার। এদের মধ্যে ১২০ জন দেশের বাইরে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

৫৬

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মামলা চলল। শেষ হল ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪ সালে। আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আমরা মাত্র ১ মাস সময় পেলাম। এ সময় আমাদের বিরুদ্ধে পেশ করা বিভিন্ন ডকুমেন্ট ঘাঁটাঘাঁটি করি। কাগজপত্রের তথ্য কতটা সঠিক তা যাচাই করি।

আমরা সবাই সমান অপরাধী ছিলাম। রাষ্ট্রপক্ষের উত্থাপিত ডকুমেন্টও তা বলছিল। জেমস কেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কোন প্রমাণ ছিল না। তিনি আমাদের সংগঠনের কোন সদস্য ছিলেন না, তাই এ মামলায় তার বিচার করাটাও অনুচিত বলে মনে হচ্ছিল আমার কাছে। একইভাবে রাস্ট্রি বার্নসটেইন, রেমন্ড এম হলবা, আহমেদ কাদরাদার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত

থাকার তথ্য প্রমাণ ছিল খুব কম। রাস্ট্রির বিরুদ্ধে আণীত প্রমাণ ছিল সবচেয়ে দূর্বল। তাকে অন্যদের সঙ্গে রাইভোনিয়ায় পাওয়া গিয়েছিল মাত্র। এদের ছাড়া বাকি ৬ জনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ডকুমেন্ট ও অন্যান্য তথ্যাদি আদালতে প্রমাণযোগ্য ছিল।

আমাদের অভিযোগের পক্ষে সরকার হাজার হাজার নথিপত্র আদালতে উত্থাপন সত্ত্বেও ব্রাম ছিলেন আশাবাদী। গেরিলা যুদ্ধ দল অনুমোদন করেনি এবং নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য রাষ্ট্রের বড় কোন ক্ষতি করা ছিল না– এটা আদালতে প্রমাণ করা গেলে আমরা মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বেঁচে যাব এ ব্যাপারে তিনি আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন মৃত্যুদণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। আদালতে আমরা অভিযোগ স্বীকার করব কি করব না এনিয়ে আমাদের আইনজীবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। কেউ কেউ বললেন, অভিযোগ স্বীকার করা হলে মামলার ক্ষতি হবে। আমরা দূর্বল হয়ে যাব। জর্জ বিজোস বললেন, গেরিলা যুদ্ধ দলের নীতির পরিপন্থী ছিল– এ ধরণের প্রমাণ বিচারকের কাছে উপস্থাপন করা গেলে মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই ঠেকানো যাবে।

আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম সরাসরি দোষ স্বীকার করব না। আমরা যেসব কাজ করেছি সেগুলোর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরব। সেগুলি যে রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর ছিল না সেটা বিচারককে বোঝানোর চেষ্টা করব। আমাদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মুল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে দাবি আদায় করা। রাষ্ট্রের ক্ষতি বা সাধারণ মানুষের প্রাণহানী করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হলে আমরা গেরিলা যুদ্ধ করবো বলে চিন্তাভাবনা করেছিলাম।

এ বিষয়টি আদালতের কাছে তুলে ধরার ব্যাপারে আমরা মোটামুটি একমত হলাম। রাষ্ট্র যেভাবে আমাদের ওপর খেপেছে তাতে পার পাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। তাই মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তিই আমাদের কাছে শ্রেয় মনে হল।

আমার নিজের কেন যেন মনে হল আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ আদালতের হাতে আছে। আমার নিজ হাতে লেখা একটা চিঠি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আমি অবৈধভাবে দেশ ত্যাগ করেছিলাম এবং গেরিলা যুদ্ধের ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের সহায়তা চেয়েছিলাম। গেরিলাযুদ্ধ ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আমার নিজ হাতে করা অনেক পরিকল্পনার কপি আদালতে ছিল।

কিভাবে একজন ভালো কমিউনিস্ট হওয়া যায় এ সংক্রান্ত আমার লেখা একটা নিবন্ধও আদালতের কাছে ছিল। আমি কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্টদের সাথে জড়িত সেটা প্রমাণ করার জন্য ওই নিবন্ধটিই যথেষ্ট ছিল।

আদালতে দাঁড়িয়ে কি বলবো তার একটা খসড়া করে ফেলি। এ কাজে সময় লাগে ১৫ দিন। খসড়া তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সেটা প্রথমে আমার সঙ্গীদের পড়ে শোনাই। তাদের পরামর্শ অনুসারে এতে কিছু পরিবর্তন আনি। এরপর এটি আমাদের আইনজীবী ব্রাম ফিশ্চারকে দেখাই। এটি পড়ে ব্রাম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

তার সাথে বেশ সখ্য আছে এমন একজন আইনজীবীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেন। ওই আইনজীবীর নাম ছিল হ্যাল হ্যানসন। তিনি আমার বিবৃতি পড়ে ব্রামকে বলেন, ম্যান্ডেলা যদি এটি পড়ে তাহলে সরকার তাকে আদালত থেকে সোজা ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবে। কোনভাবেই ম্যান্ডেলাকে বাঁচতে দিবে না।

ব্রাম পরের দিন আমার কাছে আসেন এবং আমার বক্তৃতায় অনেক পরিবর্তন আনতে বলেন। আমার বিশ্বাস ছিল, আমাদেরকে অবশ্যই ফাঁসি দেয়া হবে। তাই মৃত্যুর আগে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কিছু বলে যাই। যা সত্য তা উদঘাটনের চেষ্টা করি। সে সময় অবস্থা ছিল খুব খারাপ। পরিবেশ ছিল আমাদের প্রতিকুলে।

পত্রিকাগুলো সমানে আমাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করত যাতে আমাদের মৃত্যুদণ্ড হয়। ব্রাম আমাকে শেষের প্যারা অর্থাৎ যেখানে মূল কথা ছিল সেটা না পড়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু আমি তার অনুরোধের ভ্রুক্ষেপ করিনি।

২০ এপ্রিল সোমবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। বিচারকের কক্ষে ঢুকতেই উইনিকে চোখে পড়ে। সে আমার মায়ের সঙ্গে দর্শক গ্যালারিতে বসা ছিল। অন্যান্য দিনের মত আজও আদালত লোকে লোকারণ্য ছিল।

আমাদের আইনজীবী ব্রাম বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, অভিযুক্তরা তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের আনা কিছু অভিযোগ স্বীকার করবেন। এ কথা শুনে পুরো আদালতে গুঞ্জন শুরু হয়। এরপর ব্রাম আরো বলেন, অভিযুক্তরা তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের উত্থাপিত কিছু অভিযোগ অস্বীকার করবেন এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরবেন।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এএনসির কথিত সামরিক শাখা এমকে বা আমখানতু উয়ি সিজউয়ি গঠনের বিষয়টি। তিনি জানান, এএনসি ও এমকে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা সংগঠন। এখানে উপস্থিত এএনসি নেতাদের সঙ্গে এমকের

কোন সম্পর্ক নাই। তিনি আরো বলেন, এএনসি কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে চলত এ কথা ডাহা মিথ্যা। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এএনসির কোন সম্পর্ক নেই।

ব্রাম আদালতকে জানান এমকে কখনই গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়নি। গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনা থাকলেও এমকে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেনি। বরং সব সময় সেটিকে এড়িয়ে গেছে।

এর পর ব্রাম বলেন, মহামান্য আদালত, কাঠগড়ায় দাঁড়ানো এ মামলার প্রধান আসামী নেলসন ম্যান্ডেলা কিছু বলতে চান। আশা করছি তাকে অনুমতি দেয়া হবে। সরকার পক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও বিচারক আমাকে অনুমতি দেন। আমি বলতে শুরু করি।

আমি এ মামলার প্রধান আসামী। মানবিক বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী। আইনজীবী হিসেবে জোহান্সবার্গ আদালতে প্র্যাকটিস করতাম। মিস্টার অলিভার থামবোর অধীনে কয়েক বছর কাজও করেছি। এখন আমি ৫ বছরের সাজা প্রাপ্ত কয়েদী। নতুন মামলায় আরো সাজার অপেক্ষায় আছি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এএনসির সশস্ত্র শাখা এমকে গঠনের পেছনে আমার বড় ধরণের ভূমিকা ছিল। ১৯৬২ সালের আগস্টে গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত এমকের পেছনে অনেক শ্রম দিয়েছি আমি। এ সংগঠন গঠনের পেছনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা আছে বলে যা বলা হচ্ছে তা ডাহা মিথ্যা। বরং যা করার আমিই করেছি। দক্ষিণ আফ্রিকার গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য এ কাজ করতে আমাকে অনুপ্রানীত করেছে।

ছোটবেলায় ট্রান্সকেইতে থাকতাম। বড়রা আমাদের গল্প শুনাতেন। বিদেশীদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা কিভাবে যুদ্ধ করেছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন সে গল্প আমাদের বলতেন।

দিনগানি, বামবাথা, হিনসা, মাকানা, সান্গতি, ডালাসিলি, মোসেসো, সেখুখুনি এরা ছিলেন বীর যোদ্ধা। আমাদের গর্ব। পুরো আফ্রিকার গর্ব। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরা সবাই প্রাণ বিসর্জন দিয়ে গেছেন। তখন থেকেই আমি প্রতিজ্ঞা করি, আমার এ জীবন আমি দেশের মানুষের জন্য উৎসর্গ করব। তাদের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেব। এ চিন্তাধারার বশবর্তী হয়েই আমি নির্যাতিত নিপীড়িত সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামে নিজেকে আত্মনিয়োগ করি।

সহিংসতার ব্যাপারে আমার মন্তব্য হচ্ছে, এ ব্যাপারে আদালতে আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে তার কিছুটা সত্য, কিছুটা মিথ্যা। আমি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছি– এটা সত্য। কিন্তু স্বেচ্ছায় করিনি। দেশের

বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থা আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে। আদালতের উদ্দেশ্যে আরো বলি, এএনসি সব সময়ই বর্ণবাদ বিরোধী সংগঠন ছিল। এখনও আছে। ৫০ বছর ধরে অহিংস আন্দোলন করে এএনসি আফ্রিকার নিপীড়িত মানুষের জন্য কিছুই করতে পারেনি। নিপীড়নমূলক আইন-কানুন ছাড়া জনগণ সরকারের কাছ থেকেও কিছুই পায়নি।

জনগণ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। রাষ্ট্রের কাছ থেকে যা পাওয়ার কথা তার কিছুই তারা পায়নি। এ জন্য তারা ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ। অনেকের মুখেই সহিংসতার কথা শোনা গেছে। তারা দাবী আদায়ের জন্য সহিংস আন্দোলনের পক্ষে কথা বলেছে। কিন্তু আমরা এএনসির নেতারা কখনোই সহিংস আন্দোলকে সমর্থন করিনি। সব সময় বিষয়টি এড়িয়ে গেছি। শান্তিপূর্ণভাবে দাবী আদায়ের চেষ্টা করেছি।

১৯৬১ সালের মে মাসে দলের ভিতরে আত্মসমালোচনা শুরু হয়। অসহিংস আন্দোলন দিয়ে কিছুই হয়নি বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। দাবি আদায়ের জন্য তারা সশস্ত্র আন্দোলন শুরুর জন্য দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রতি আবেদন জানান। নানা আলোচনা যুক্তিতর্ক শেষে সহিংস আন্দোলনের পক্ষের নেতাদের জয় হয়। দল সীমিত পর্যায়ে সহিংস আন্দোলনের বিষয়টি অনুমোদন করে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও জনগণের যাতে বড় রকমের ক্ষতি না হয় সেদিকে সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়।

১৯৬১ সালের নভেম্বরে এমকে গঠন করা হয়। দলের সশস্ত্র এই শাখাটি গঠনের সময় সবাই বর্ণবাদ ও বড় ধরণের সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে নীতিগতভাবে সম্মত হয়। এমকে গঠনের সময় আমাদের ধারণা ছিল, দেশ গৃহযুদ্ধের দিকে এগুচ্ছে। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এ পরিস্থিতিতে কৃষ্ণাঙ্গদের রক্ষার জন্য একটি সশস্ত্র সংগঠন থাকা বাঞ্ছনীয়।

নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আদালতকে বলি, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে ভয় দেখানো। চাপ প্রয়োগ করে দাবি আদায় করা। দেশ বা মানুষের কোন ক্ষতি করার কোন উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না।

বিদেশ সফর প্রসঙ্গে বলি। প্যাফম্যাক সম্মেলনে যোগ দেয়া ও এমকে সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যেই আমি ওই সফরে যাই। গেরিলাযুদ্ধ শুরু হলে আমরা যাতে নির্যাতিত জনগণের পাশে দাঁড়াতে পারি সে জন্যই ওই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এএনসি ও এমকের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টিও আমি আদালতকে বুঝিয়ে বলি।

এএনসির আদর্শ সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলি, এএনসি আফ্রিকান জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী একটি সংগঠন। তাই বলে শ্বেতাঙ্গদের তাড়িয়ে সাগরে নিক্ষেপ এর

উদ্দেশ্য নয়। এএনসি বর্ণবাদ বিশ্বাস করে না। সব বর্ণের লোকদের নিয়ে একসঙ্গে থাকতে চায়। ভূমির ওপর আফ্রিকানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। তারা মানুষের সব রকমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

এএনসি দেশে কোন বিপ্লব বা অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চায় না। বিচারকের উদ্দেশ্যে আরো বলি, অনেকেই এএনসি ও কমিউনিস্ট পার্টিকে এক ভেবে গুলিয়ে ফেলেন। তাদের ধারণা, কমিউনিস্টপার্টির নির্দেশে এএনসি চলে। ধারণাটি ঠিক নয়। কমিউনিস্ট পার্টির নীতি আদর্শের সঙ্গে এএনসির কোন মিল নেই। এটি সম্পূর্ণ আলাদা একটি সংগঠন।

এএনসির মুল উদ্দেশ্য আফ্রিকানদের ঐক্যবদ্ধ করা। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এএনসি কমিউনিস্ট পার্টির মত দেশের ভূমি, পুঁজিকে শ্রমিক নেতার হাতে তুলে দিতে চায় না। তবে এটা ঠিক এএনসির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেও কিছু মিল আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া একসঙ্গে মিলে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এখন কেউ যদি ভাবেন, চার্চিল, বা রুজভেল্ট কমিউনিস্ট ছিলেন তাহলে সেটি হবে নিতান্ত বোকামি। আমাদের বিষয়টিও অনেকটা একই রকম। আমি কমিউনিস্ট নই। একজন দেশ প্রেমিক আফ্রিকান। তবে আমার ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যে মার্ক্সবাদের প্রভাব নেই সেটা বলবো না। আফ্রিকার অনেক নেতাই এ মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা ও কালোর মধ্যে যে ভয়াবহ বৈষম্য চলছে তারও একটা বিবরণ আদালতে তুলে ধরি। বিচারককে লক্ষ্য করে বলি, শিক্ষা, চাকরি, স্বাস্থ্য সেবা, আর সব দিক থেকে কৃষ্ণাঙ্গরা অনেক পিছিয়ে আছে। শ্বেতাঙ্গ নেতারা বলে থাকেন, আফ্রিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানকার কৃষ্ণাঙ্গরা অনেক ভালো আছেন। আমিও বিষয়টি স্বীকার করছি কিন্তু এটাও ঠিক দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থা অনেক খারাপ। সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র-সমাজের সবক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য। পার্লামেন্ট, সুপ্রিম কোর্ট, সেনাবাহিনী সবক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য।

কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিচারককে জানাই, দারিদ্র তাদের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। দারিদ্রের কষাঘাতে কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। ছেলে-মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে পথেঘাটে। স্কুলে যাওয়ার মত সামর্থ তাদের নেই। বাবা-মা দুজনকেই দু'বেলা অন্ন সংস্থানের জন্য কাজ করতে হয়।

ছেলেমেয়েদের তারা দেখাশুনা করতে পারে না। ফলে কৃষ্ণাঙ্গরা দিন দিন তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হচ্ছে। শ্বেতাঙ্গরা পরিণত হচ্ছে এলিট শ্রেণীতে। সব কর্তৃত্ব চলে যাচ্ছে তাদের হাতে। বর্তমান সমাজ পরিকল্পিতভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের মানব সম্পদে পরিণত না করে সমাজের বোঝা হিসেবে তৈরি করছে যাতে তারা রাজনৈতিকভাবে কোন দিনই আগাতে না পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা রাষ্ট্রের কাছে যা ন্যায্য তাই চাচ্ছে। তারা সমান নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চায়। আর এটাও ঠিক তাদেরকে এসব অধিকার দেয়া না পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আফ্রিকার অধিকাংশ লোক কৃষ্ণাঙ্গ। তাদেরকে সমান রাজনৈতিক অধিকার দেয়া হলে ক্ষমতা শ্বেতাঙ্গদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। এ ভয়েই শ্বেতাঙ্গরা দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ভয় পাচ্ছে। এএনসি জনগণের এ অধিকার আদায়ের জন্যই মাঠে নেমেছে। এ সংগ্রাম দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের জন্য। এ সংগ্রাম অধিকার আদায়ের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমার দেয়া দীর্ঘ বক্তৃতা পিনপতন নীরবতার মধ্যে দিয়ে সবাই শুনতে থাকেন। বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে এসে বলি, আমার জীবন আমি দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের জন্য উৎসর্গ করলাম। আমি কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য লড়াই করছি, শ্বেতাঙ্গদের জন্যও লড়াই করছি। আমি দেশে গণতন্ত্র দেখতে চাই। স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাই আমার কাম্য। যেখানে সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ স্বপ্ন একদিন সত্যি হবেই।

আমার বক্তৃতা শেষ হল। আদালতের নীরবতা ভাঙল। কাঠগড়া থেকে আস্তে আস্তে নামলাম। আদালতের গ্যালারির দিকে তাকালাম না। যদিও গ্যালারির সবার চোখ ছিল আমার দিকে। প্রায় ৪ ঘণ্টা আমি বক্তৃতা করি। বক্তৃতা শেষ হতে বিকেল হয়ে যায়। নিয়ম অনুসারে এ সময় আদালত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বিচারক আদালত মুলতবী না করে পরবর্তী আসামীকে কাঠগড়ায় ডাকেন। দুই নম্বর আসামী ছিলেন ওয়াল্টার সিসুলু। তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের বিরুদ্ধে ছিলেন। এত তাড়াতাড়ি এ আন্দোলন করলে সমস্যার সৃষ্টি হবে বলে তিনি মনে করতেন। ওয়াল্টারের পর কাঠগড়ায় আসেন গোভান। তিনি নিজেকে কমিউনিস্ট পার্টির একজন গর্বিত সদস্য হিসেবে দাবি করেন।

গোঁভানের মত আহমেদ কাদরাদা, রাস্ট্রি ব্রেনস্টেইন এএনসির পাশাপাশি নিজেদের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে স্বীকার করেন। কাঠগড়ায় ৮ নম্বর

আসামী জেমস কেন্টরকে দেখে সবচেয়ে অবাক হই। এএনসি বা এমকের সঙ্গে তার কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না। অথচ এ মামলায় তাকে আসামী করা হয়। ওইদিন বিচারক ডি ওয়েট একে একে সব আসামীর বক্তব্য শোনেন। আসামীদের মধ্যে রেমন্ড এম হলবা ছিলেন একাধারে এএনসি ও এমকের সদস্য। কিন্তু তিনি এমকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেন। ইলিয়াস মোতাসোয়ালিদিও ও এন্ড্রু মেলাঙ্গিনি ছিলেন যথাক্রমে ৯ ও ১০ নম্বর আসামী। তারা এমকের ছোট মাপের নেতা ছিলেন।

৫৭

পুরো বিশ্বের দৃষ্টি নিপতিত হল রাইভোনিয়া বিচারের ওপর। আমাদের রায় নিয়ে বিশ্ববাসীর যেন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। লন্ডনের সেন্টপল গীর্জায় সারারাত আমাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়। আমার অনুপস্থিতিতেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমাকে তাদের ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত করে। জাতিসংঘের পক্ষ থেকেও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার আবেদন জানানো হয়। রায় ঘোষণার ঠিক দু'দিন আগে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বসে। এতে বিচারের অবসান ঘটিয়ে আমাদেরকে নিঃশর্তভাবে ছেড়ে দেয়ার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়। ওই অধিবেশনে অবশ্য ব্রিটেন ও আমেরিকা উপস্থিত ছিল না। রায় ঘোষণার কয়েকদিন আগে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে একটি চিঠি লিখি। তাতে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল এল বি পরীক্ষা দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করি। রায় ঘোষণার আগ মুহূর্তে এ ধরণের ইচ্ছা অনেকের কাছেই অদ্ভূত বলে মনে হল। কারারক্ষীরাও আমার এ ইচ্ছায় বিরক্তি প্রকাশ করল। তাদের অনেকেই বলল, আমি যেখানে যেতে চলেছি সেখানে এল এলবি ডিগ্রীর কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু পরীক্ষা দেয়ার খুব ইচ্ছা ছিল আমার। বিচারের মধ্যেও পড়াশুনা চালিয়ে যেতে লাগলাম। আমি জানতাম, কোনদিনই হয়ত আইন পেশায় ফেরা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। সব জেনেশুনেও পরীক্ষা দেয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বিশেষ ব্যাবস্থায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পরীক্ষা দিলাম। পাশও করলাম।

১১ জুন বৃহস্পতিবার আমাদেরকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হল রায় শোনানোর জন্য। আমাদের ৬ জনের যে শাস্তি হবে সে ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত হলাম। তবে শাস্তিটা কেমন হবে সেটা নিয়ে সংশয় ছিল।

বিচারক ডি ওয়েট এজলাশে আসলেন। কোনরকমের ভনিতা না করে দ্রুত রায় পড়তে লাগলেন। বিচারক বললেন, প্রথম অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণিত হয়েছে। সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দ্বিতীয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তৃতীয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধেও অভিযোগের পক্ষে সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের কোন কোন অভিযোগের বিপরীতে কোন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে সেগুলির বিবরণ দিলেন তিনি।

এরপর বিচারক ক্যাথির বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে সেগুলির বিবরণ দিলেন। আমাদের তুলনায় তার অনেক কম অভিযোগ প্রমাণিত হল। বোঝা গেল তার শাস্তি আমাদের তুলনায় কম হবে। রাস্ট্রির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বিচারক তাকে খালাস দিলেন। বিচারক বললেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণের বিবরণ দিলেও তিনি আজ শাস্তি বা দণ্ডের পরিমাণ ঘোষণা করবেন না। আদালতে প্রমাণিত সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্পর্কে দু'পক্ষকেই তিনি বলার সুযোগ দিতে চান। শাস্তির মেয়াদ বা পরিমাণ ঘোষণা না করে সেদিনের মত তিনি আদালত মুলতবী ঘোষণা করেন।

রাতে আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করলাম। ওয়াল্টার, গোভান ও আমি এ মর্মে একমত হলাম যে, রায় যাই আসুক আমরা আপিল করবো না। এমনকি মৃত্যুদণ্ড হলেও। আইনজীবীকে আমরা এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম। বললাম, আমরা যে নৈতিক অবস্থান নিয়েছি আপীল করলে তা ক্ষুণ্ন হবে।

আমাদের মনে হল আমাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে দেশে আন্দোলন জোরদার হবে। আমাদের রক্তের ওপর দিয়ে নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের স্বাধীনতা আসবে। তাই আপীল না করার সিদ্ধান্তের ওপর আমরা তিন জন অটল রইলাম।

আইনজীবীরা আমাদের সিদ্ধান্তে বেশ নাখোশ হলেন। আপিলের ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইলেন। কিন্তু ওয়াল্টার গোভান ও আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলাম না। পরবর্তীতে কি হবে সেটা আইনজীবীদের কাছে জানতে চাইলাম। বিশেষ করে আদালত মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার পর কি হবে সেটা জানতে চাইলাম।

আইনজীবীরা জানালেন, মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণায় আদালত আমাদের কিছু বলার সুযোগ দিবেন। আমি ব্রাম ও জোয়েনকে বললাম, এ সুযোগ দেয়া হলে আমি নিশ্চয়ই কিছু বলবো। ডি ওয়েটকে বলব, আমি মৃত্যুদণ্ডকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। কেননা আমার এ মৃত্যু হবে দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার শামিল। এ

মৃত্যু আফ্রিকানদের অনুপ্রাণিত করবে। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাদের প্রেরণা যোগাবে। আমার ও আমাদের মৃত্যু কোনভাবেই বৃথা যাবে না। আমাদের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যদি দেশের জন্য, মানুষের জন্য কিছু অর্জিত হয় তাহলে বেঁচে থাকার চেয়ে শহীদ হওয়া অনেক ভালো। আইনজীবীরা বললেন, এ ধরণের বক্তৃতা দেয়া হলে আপীল করতে অসুবিধা হবে। আমি বললাম, আমরা তো আপিলই করবো না। তাই সুবিধা-অসুবিধায় কিছু আসে যায় না।

৫৮

১৯৬৪ সালের ১২ জানুয়ারি শুক্রবার। শেষবারের মত আমরা আদালতে প্রবেশ করলাম। নিরাপত্তা ছিল নজিরবিহীন। আমাদেরকে আদালত ভবনে নিয়ে যাওয়ার সময় চারদিকে ছিল শুধু পুলিশ আর পুলিশ। সাইরেন বাজিয়ে অনেক পুলিশের গাড়ি ছুটছিল আমাদের ভ্যানের আগে আগে। রাস্তার দু'দিকে ছিল পুলিশের ব্যারিকেড। কোন যানবাহন ঢুকতে দেয়া হয়নি ওই সড়কে। লোকজন যাতে আদালত ভবনে যেতে না পারে সেজন্য আদালত ভবনের চারপাশে বেশ কয়েকটি চেক পয়েন্ট বসানো হয়। পরিচয় জানার পর সংশ্লিষ্টদের সেখানে ঢুকতে দেয়া হয়। স্থানীয় বাস ও রেলস্টেশনেও চেক পয়েন্ট বসানো হয়। বাইরে থেকে আগত লোকদের কাছে অস্ত্র শস্ত্র আছে কি না তা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হয়। পুলিশের শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ওইদিন আদালত চত্বরে ২ হাজার লোক সমবেত হয়। এদের সিংহভাগই ছিল এএনসির নেতা কর্মী। তারা নানা ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে আদালত এলাকায় অবস্থান নেয়। অনেকের ব্যানারে লেখা ছিল, আমাদের নেতাদের সঙ্গে আছি আমরা। আদালত ভবনেও ছিল লোকে লোকারণ্য। আইনজীবী, স্থানীয় ও বিদেশী সাংবাদিকসহ অন্যান্য লোকের অভাব ছিল না। বিচার কক্ষের দর্শক গ্যালারিতে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। দর্শক গ্যালারিতে মা ও উইনিকে দেখতে পেলাম। হাত নেড়ে ইশারা করলাম। তারাও হাত নেড়ে ইশারার জবাব দিলেন।

আমার মা ট্রান্সকেই থেকে ছেলের বিচার কাজের দৃশ্য দেখতে এসেছেন। কিন্তু আজ যে ছেলের মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনতে হবে সেটা হয়ত তিনি জানতেন না। উইনিকে বেশ আত্মপ্রত্যয়ী দেখাচ্ছিল। তার সাহস দেখে আমিও সাহসী হয়ে উঠলাম।

রেজিস্টার বিচার কাজ শুরুর ঘোষণা দিলেন। জানালেন, আজকের বিচার হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিচার। বিচারক এজলাসে বসলেন। উনি রায় ঘোষণার আগে হ্যারল্ড হ্যানসন ও লিবারটি পার্টির নেতা এ্যালান প্যাটন কিছু বলার অনুমতি চাইলেন। বিচারক অনুমতি দিলেন। হ্যারল্ড হ্যানসন বললেন, ম্যান্ডেলা যা করেছেন তা দেশের জন্য, দেশের নির্যাতিত মানুষের জন্য করেছেন। তিনি কোন অন্যায় করেননি। প্যাটনও একই ধরণের কথা বললেন। কিন্তু বিচারক ডি ওয়েট তাদের কথা ভালো মত শুনলেন বলে মনে হল না। বক্তৃতার সময় বিচারক তাদের দিকে ভালো করে তাকাননি। এমনকি তাদের কথাবার্তা থেকে কোন নোটও নেননি। মনে হল বিচারক যা সিদ্ধান্ত নেয়ার তা নিয়ে ফেলেছেন। সে সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না। বিচারক সবাইকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বললেন। আমরা তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি আমাদের দিকে তাকালেন না। তার দৃষ্টি ছিল এজলাসের মাঝামাঝি জায়গায়। তার চেহারা ছিল খুবই বিষণ্ন। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। আমরা একে অন্যের দিকে তাকালাম। ভাবলাম আমাদের শেষ পর্যন্ত হয়তো মৃত্যুদণ্ডই দেয়া হচ্ছে। তা না হলে বিচারক এতটা নার্ভাস হবেন কেন?

বিচারক রায় দেয়া শুরু করলেন। বললেন, এ মামলার শুনানি চলাকালে তিনি অইউরোপীয়দের (আফ্রিকানদের) অনেক দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনেছেন। অভিযুক্ত ও তাদের আইনজীবীরা আমাকে বলেছেন, তারা অইউরোপীয় সম্প্রদায়ের নেতা। মানুষকে দুঃখ কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য এতকিছু করেছেন। কিন্তু তাদের কথা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। কারণ যারা বিপ্লব ঘটাতে চান তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে সরকারের পতন ঘটানো এবং ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা।

ডি ওয়েট কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। জোরে নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন– এই বিচারটি দেশের যে কোন বিচারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর সঙ্গে রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত। অভিযুক্তরা যে অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন সেগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। অভিযোগগুলো আমার কাছে খুবই সাংঘাতিক মনে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আসামীদের আমি সর্বোচ্চ শাস্তি বা মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলাম।

আমরা একে অপরের দিকে তাকালাম এবং হেসে ফেললাম। আমাদেরকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে বিচারক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন– এমন ঘোষণা প্রচারের পর সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

যারা বিচারকের কথা নিজ কানে শোনেননি এমন অনেকে রায়ের কথা সরাসরি আমাদের কাছে এসে জানতে চাইলেন। এদের একজন ছিলেন ডেনিসের বউ। তিনি আমাদের কাছ থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের কথা শুনে বললেন, মরে যাওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভালো। তোমরা বেঁচে থাক। জীবনকে উপভোগ কর।

আমি সহাস্য বদনে দর্শক গ্যালারির দিকে তাকালাম। উইনি ও মাকে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু লোকজনের চেঁচামেচি, হৈচৈ, হট্টগোল ও পুলিশের আনাগোনার কারণে তাদেরকে দেখতে পেলাম না। আমাদের দিকে এগিয়ে আসা লোকজনকে সামাল দিতে তখন পুলিশ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পুলিশ আমাদেরকে কাঠগড়া থেকে নামালেন। বাঁশি বাজিয়ে লোকজনকে সরিয়ে বাইরে নিয়ে আসতে থাকলেন। এ সময় উইনিকে এক নজর দেখতে পেলাম। আদালতের ভিতরেই আমাদেরকে হাতকড়া পরানো হল। আদালতের বাইরে হাজার হাজার লোকের ভীড় ছিল। এ ভীড় ঠেলে আমাদেরকে জেলখানায় কিভাবে নিয়ে যাওয়া হবে সেটা ভেবে পুলিশ কর্মকর্তারা গলদগর্ম হচ্ছিলেন। আমাদেরকে আদালত ভবনের ঠিক পেছনে নিয়ে গিয়ে একটি কালো ভ্যানে তোলা হল। জনতার ভিড় সামাল দিতে ভ্যানটি ভিন্ন পথে যেতে শুরু করল। আগে পিছে ছিল পুলিশের অনেক মোটর সাইকেল ও গাড়ি। যাওয়ার সময় আমরা জনগণের স্লোগান শুনতে পেলাম। কানে ভেসে এল জনতার সমস্বরে গাওয়া জাতীয় সংগীত।

আমরা এখন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী। আমাদেরকে ডেনিস গোল্ডবের্গের কাছ থেকে আলাদা করা হল। কারণ তিনি ছিলেন শ্বেতাঙ্গ কয়েদী। তাকে আলাদা রকমের সুযোগ সুবিধা দেয়া হত। আমাদের অবশিষ্ট কয়েকজনকে প্রেটোরিয়ার একটি জেলের ভিন্ন সেলে রাখা হল।

ওই রাতে সেলের মেঝেতে ঘুমালাম। ডি ওয়েট কি জন্য এ রায় দিলেন তা বোঝার চেষ্টা করলাম। মনে হল, দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে আমাদের জন্য বিক্ষোভ-মিছিল সমাবেশ হচ্ছে– সেটি তার ওপর রেখাপাত করেছে। আন্তর্জাতিক চাপের বিষয়টিও তার মাথায় ছিল। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বন্দর শ্রমিকদের হুঁশিয়ারি ছিল উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন দেশের বন্দর শ্রমিকরা ঘোষণা দেয়, আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে দক্ষিণ আফ্রিকার মালামাল তারা খালাস করবে না। মার্কিন কংগ্রেস ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরাও আমাদের মৃত্যুদণ্ডের ঘোর বিরোধীতা

করে। জাতিসংঘে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন দূত এডলাই স্টিভেনস আমাদের মৃত্যুদণ্ড রোধ করার জন্য জাতিসংঘকে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানান। এছাড়া আমাদের মৃত্যুদন্ড দেয়া হলে গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী এমকের সদস্যরা পাল্টা হামলা চালাতে পারে এমন একটা আশঙ্কাও ছিল। আমার মনে হল এসব দিক বিবেচনা করে বিচারক আমাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন।

প্রেটোরিয়ার জেলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাতি নিভিয়ে দেয়া হত। তখন আফ্রিকান কয়েদীরা সমস্বরে জাতীয় সংগীত ও স্বাধীনতার গান গাইত। আমরাও তাদের সঙ্গে গান গাইতাম। বাতি নিভিয়ে দেয়ার সাথে সাথে গোটা জেলখানা অল্প সময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে যেত। এর পর কমপক্ষে ১০/১২ জায়গা থেকে একযোগে গান গাওয়া শুরু হত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোবেন দ্বীপ   দুঃস্বপ্নের বছরগুলো

৫৭

গভীর রাত। ঘুম আসছে না। বিচারের নানারকম কথাবার্তা মনে পড়ছে। নানারকম দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মন ছিল আনমনা। এমন সময় পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হচ্ছিল সেলের দিকে কে যেন এগিয়ে আসছেন। আমি তখন আলাদা একটি সেলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দরজায় টোকা পড়ল। দেখলাম কর্নেল আউক্যাম্প। তিনি ফিস ফিস করে বললেন, ম্যান্ডেলা আপনি এখনও ঘুমাননি? বললাম, ঘুম আসছে না। তাই এখনও সজাগ। কর্নেল সাহেব বললেন, ম্যান্ডেলা আপনি ভাগ্যবান। আমরা আপনাকে এমন এক জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছি যেখানে আপনি অনেকটা স্বাধীন মানুষের মতই জীবন যাপন করতে পারবেন। সেখানে খোলা আকাশ, সমুদ্র, বন-বনানী, পাখির ডাক সব কিছুই আছে। আপনি চারদিকে ঘুরে বেড়াতে পারবেন। এখানকার মত চারদেয়ালের মাঝে আবদ্ধ থাকতে হবে না।

তিনি জায়গাটির নাম উল্লেখ করলেন না। কিন্তু আমি ভালো করেই বুঝতে পারলাম আমাকে রোবেন দ্বীপে পাঠানো হচ্ছে। সেখানে যে আমাকে কোন স্বাধীনতা দেয়া হবে না সেটাও ভালো করেই জানতাম। কর্নেল সাহেব বললেন, কোন রকম ঝামেলা না করলে সেখানে আপনি চাহিদা মত সব কিছু পাবেন।

আউক্যাম্প পাশের সেলের অন্যদের জাগালেন। মালপত্র গুছগাছ করার নির্দেশ দিলেন। ১৫ মিনিট পর আমাদেরকে লোহার সেল থেকে বাইরে নিয়ে আসা হল। আমরা ছিলাম সাত জন। ওয়াল্টার, রেমন্ড, গোভান, কেথি, এন্ড্রু, এলিস ও আমি। আমাদের সবার হাতে ছিল হাতকড়া। ভ্যানের পিছনে বসানো হল। তখন মধ্যরাত। কিন্তু আমাদের কারো চোখেই ঘুমের লেশমাত্র ছিল না।

পুলিশ ভ্যানের নোংরা মেঝেতে বসে আমরা গান গাইতে লাগলাম। বিচারের সময় চূড়ান্ত রায়ের পরে আমরা এ গানটিই গেয়ে ছিলাম যার মর্মবাণী ছিল স্বাধীনতা। কারারক্ষীরা আমাদের স্যান্ডউইচ ও ঠাণ্ডা পানীয় দিয়ে গেলেন।

লেফটেন্যান্ট ভ্যান উয়াইক আমাদের সঙ্গে পেছনে বসলেন। তিনি বেশ আমুদে লোক ছিলেন। আমাদের সঙ্গে গান ধরলেন।

গানের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বলেন, তোমাদের হয়ত বেশি দিন জেলে থাকতে হবে না। তোমাদের মুক্তির দাবি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। এক অথবা দুই বছরের মধ্যে জেল থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। তখন তোমরা হবে জাতীয় বীর। হাজার হাজার জনতা তোমাদের অভিনন্দন জানাবে। তোমাদের নিয়ে উল্লাস করবে। চারদিকে থাকবে শত শত বন্ধু-বান্ধব। মেয়েরা তোমাদের পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাবে।

আমি বললাম, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। কথা শুনে বেশ ভাল লাগছে। দুর্ভাগ্যবশত তার সে ভবিষ্যতবাণী ফলতে লেগে গিয়েছিল প্রায় তিন দশক।

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে আমাদের ভ্যান চলতে লাগল। সামনে-পিছনে ছিল বেশ কয়েকটি পুলিশের গাড়ি। আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের গাড়ি বহর শহরের বাইরে সেনাবাহিনীর একটি ছোট বিমানবন্দরে গিয়ে পৌঁছাল।

আমাদের সবাইকে একটি বিশাল সামরিক বিমানে তোলা হল। বিমানের ভেতরটা ছিল ঠাণ্ডা। আমরা এক কোণায় জড়োসড়ো হয়ে বসলাম। আমাদের অনেকেই এর আগে কখনও বিমানে ওঠেনি। এজন্য তাদেরকে বেশ উৎসুক মনে হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান উড়ল। পাহাড়-বন নদী পেরিয়ে ১৫ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে চলতে লাগল।

এক ঘণ্টা চলার পর বিমান অবতরণের প্রস্তুতি নিল। নিচের ফ্লাড লাইট জ্বলে উঠল। সে আলোতে নিচের সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে গেল। জানালার কাছে গিয়ে আমরা নিচের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। কেপ উপত্যকার পাহাড়ী এলাকা আমাদের চোখে পড়ল। জায়গাটি ছিল খুব সুন্দর। আমার কেন যেন মনে হল, গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য জায়গাটি ছিল বেশ উপযুক্ত।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কেপ শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বাড়িগুলো দৃষ্টিগোচর হল। পুরো শহরটি আমরা এক পলকের জন্য দেখতে পেলাম। এরপরই চলে এল সাগরের নীল পানি যার এক প্রান্তে ছিল আমাদের ঠিকানা রোবেন দ্বীপ।

বিমান রোবেন দ্বীপের একেবারে শেষপ্রান্তে অবতরণ করল। দিনটা ছিল অনেকটা মেঘলা ধাচের। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল।

বিমান থেকে নামার সময় বাতাসে আমার পোশাক উড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। এ সময় চারদিকে ছিল নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্য। তাদের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। পরিস্থিতি ছিল শান্ত তবে বেশ উত্তেজনাকর। অনেকটা অজাচিতভাবে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হল। দু'বছর আগে এ দ্বীপে ঠিক একইভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল।

গাড়িতে করে আমাদেরকে রোবেন দ্বীপের একটি পুরনো জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হল। এটা ছিল পাথরের তৈরি খুব পুরনো একটি ভবন। ওই ভবনের বাইরে আমাদের দাঁড় করানো হল। পুরনো পোশাক খুলে নতুন পোশাক পরতে বলা হল। জেলখানার নিয়ম এটাই। কয়েদীরা এক জেল থেকে আরেক জেলখানায় গেলে তাদেরকে পুরনো পোশাক খুলে নতুন জেলখানার পোশাক পরতে হয়।

আমরা আগের হাল্কা-পাতলা পোশাক খুলে রোবেন দ্বীপের খাকি পোশাক পরে নিলাম। কেথি ছাড়া আমাদের সবাইকে শর্ট ট্রাউজার, জামা ও জ্যাকেট দেয়া হল। ক্যাথি ও একজন ভারতীয়কে দেয়া হল লম্বা ট্রাউজার। ক্যাথির একা লং ট্রাউজার পরতে বেশ কষ্ট হল। কারণ আমাদের সবার পরণে ছিল শর্ট ট্রাউজার। আফ্রিকায় সাধারণত বাচ্চারা শর্ট ট্রাউজার পরে থাকে।

আমি সেদিনের মত শর্ট ট্রাউজার পরলাম। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যেভাবেই হোক জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লং ট্রাউজার আদায় করে ছাড়ব। এরপর কারারক্ষীরা বন্দুকের নল তাক করে আমাদেরকে বললেন, উপরে হাত ওঠাও। চুপচাপ সামনে চল। আমরা এগুতে লাগলাম।

পুরনো জেলখানাটি ছিল আমাদের সাময়িক থাকার জায়গা। আমাদের জন্য আলাদা একটি জেলখানা তৈরি করা হচ্ছিল তখন। সেটির নির্মাণ কাজ ছিল একেবারে শেষের দিকে। সেটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বেশ জোরালো। সেখান থেকে আমাদেরকে বাইরে বের হওয়ার বা অন্য কয়েদীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেয়া হত না।

সকালে আমাদের হাতকড়া পরানো হল। অন্য বন্দিদের সঙ্গে একটি ট্রাকে তোলা হল। একটি একতলা ভবনে নিয়ে যাওয়া হল। এটি ছিল ১০০ × ৩০ ফুটের একটি কক্ষ। তিন থেকে ৪টি সেল ছিল এর ভিতরে। চারদিকের দেয়াল ছিল কমপক্ষে ২৪ ফুট উঁচু। নিরাপত্তা রক্ষীরা সব সময় পাহারায় থাকত।

জেলের সেলগুলো ছিল তিন লাইনে। প্রতিটি সেকশনকে এ, বি, সি হিসেবে ভাগ করা হয়েছিল। আমরা ছিলাম বি সেকশনে। আমাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা সেল বা কক্ষ দেয়া হল। প্রত্যেক সেলে দীর্ঘ বারান্দা ছিল। আমাদের বি সেকশনে সবমিলিয়ে সেল ছিল ৩০টি।

এক একটি সেলে বন্দি সংখ্যা ছিল ২৪ জন। প্রত্যেক সেলে ৪ বর্গ ফুটের একটি জানালা ছিল। জানালা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা ছিল। প্রত্যেক সেলে দুটি করে লোহা বা গ্রীলের দরজা ছিল। বড় দরজার নিচের দিকে ছিল ছোট একটি দরজা। এটি ছিল কাঠের। দিনে গ্রীলের দরজাটি বন্ধ থাকলেও কাঠের ছোট দরজাটি খোলা থাকত। রাতে এটিও বন্ধ করে দেয়া হত।

সেলগুলো দ্রুত তৈরি করা হয়। সেজন্য দেয়াল ছিল ভিজা। আমাদের বেশি ঠাণ্ডা লাগত। কমান্ডিং অফিসারকে এটি জানালাম। তিনি বললেন, আমাদের শরীর আস্তে আস্তে দেয়ালের ওই পানি শুষে নেবে। আমাদের প্রত্যেককে তিনটি করে কম্বল দেয়া হল। মেঝেতে বিছানোর জন্য দেয়া হল মাদুর। পরে আরেকটি পশমের মাদুর দেয়া হয়। এটি ছিল বেশ নরম।

রাতে এগুলো দিয়ে শীত নিবারণ হতো না। তাই ড্রেস পরে ঘুমাতাম। আমি যে সেলে ছিলাম সেটির দেয়াল ছিল দু' ফুট পুরু। সেলের বাইরে একটি নেমপ্লেট ছিল। সেখানে পরিচিতি লেখা ছিল। তাতে আমার নাম ছিল এন ম্যান্ডেলা। ৪৬৬/৬৪। বুঝলাম, আমি হচ্ছি এখানকার ৪৬৬ নম্বর কয়েদী। ৬৪ বলতে বোঝানো হয়েছে ১৯৬৪ সাল। নেমপ্লেটে আমার বয়স লেখা ছিল ৪৬। আমি রাজনৈতিক বন্দী এবং আমার যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে সেটাও ওখানে লেখা ছিল।

আমাদেরকে সাধারণ বন্দীদের থেকে আলাদা রাখা হত দুই কারণে। এর মধ্যে নিরাপত্তাজনিত কারণ ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রাজনৈতিক কারণও ছিল। আমরা সাধারণ বন্দীদের প্রভাবিত করে ফেলি কিনা সে ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ ছিল বেশ শঙ্কিত।

কিছুদিনের মধ্যে আরো কিছু রাজনৈতিক বন্দীকে আমাদের সঙ্গে এনে রাখা হল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাউথ আফ্রিকান কালারড পিপলস অর্গানাইজেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জর্জ পিক, এই সংগঠনের আরেক নেতা ডেনিস ব্রুটাস। এছাড়া নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের সদস্য বিলি নায়ারও আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। তাদেরকে বিস্ফোরক দ্রব্য রাখাসহ বিভিন্ন মামলায় কারাদণ্ড দেয়া হয়।

কিছুদিন যেতে না যেতে আমরা আরো সঙ্গী পেলাম। এদের মধ্যে ছিলেন ননইউরোপিয়ান ইউনিটি মুভমেন্টের সদস্য নেভিল আলেকজান্ডার। নেভিল কৃষ্ণাঙ্গদের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কেপটাউন ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছিলেন। জার্মানির একটি বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি পড়াশুনা করেন। প্যাকের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিপানিয়া মথুপেহকেও আমাদের মাঝে পাঠানো হল। তিনিও ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। ট্রান্সকেইর পদস্থ নেতা কে. ডি মাতানজিমাকেও আমাদের সেলে দেয়া হয়। সব মিলিয়ে আমাদের সেলে ঠাঁই হয় ২৪ জনের। এদের কাউকে আমি চিনতাম। কারো নাম শুনেছি। কাউকে একেবারেই চিনতাম না।

জেলখানায় আমাদের কর্ম জীবন শুরু হল। প্রতিদিন সকালে আমাদেরকে মাটি বা পাথর বহন করে অন্য জায়গায় নিয়ে ফেলতে হত। পাথর ভাংতে হত। ছোট পাথর ভাঙ্গার ৪ পাউন্ড ওজনের এবং বড় পাথর ভাঙ্গার জন্য ১৪ পাউন্ড ওজনের হাতুড়ি দেয়া হত। আমরা এগুলো দিয়ে পাথর ভাঙতাম। চার অংশে বিভক্ত হয়ে

পাথর ভাংতাম। এ সময় হাতে রাবারের গ্লোভস পরে নিতাম। ধুলাবালি থেকে চোখকে রক্ষার জন্য এক ধরণের মুখোশ পরতাম।

কারারক্ষীরা আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকত। নীরবে আমাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করত। কাজটি ছিল খুবই পরিশ্রমের। তবে এতে আমাদের ভালো ব্যায়াম হত। হাত পায়ের পেশী শক্তিশালী হত। এই ভেবে মনে মনে সান্ত্বনাও পেতাম।

রোবেন দ্বীপের দুঃসময় ছিল জুন ও জুলাই মাস। এ সময় প্রচণ্ড শীত পড়ত। বৃষ্টিও হত। প্রচণ্ড রোদের সময়ও তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের ওপরে উঠত না। শীত কি জিনিস এ সময় টের পাই। দিনের বেলায়ও কাজ করার সময় খাকি শার্ট পরে নিতাম। এরপরও মনে হত শীতে হাড় কাঁপছে। দুপুরে খাবারের জন্য কাজে বিরতি দেয়া হত। প্রথম সপ্তাহে দুপুরে আমাদের স্যুপ দেয়া হত। খেতে খুব খারাপ লাগত।

বিকেলে আধ ঘণ্টার জন্য ব্যায়াম ও হাঁটাহাঁটির সুযোগ পেতাম। সেলের চারপাশের বারান্দায় সচরাচর হাঁটতাম।

১৯৬২ সালে রোবেন দ্বীপে দুই সপ্তাহ থেকে গেছি। সে সময়ের তুলনায় দ্বীপটি অনেক বদলে গেছে বলে মনে হল। ১৯৬২ সালে বন্দী সংখ্যা ছিল কম। দ্বীপটি ছিল বেশ খোলামেলা। এখন আর সে অবস্থা নেই। চারদিকে দালানকোঠা বেড়েছে। জেলখানার পরিসর বিস্তৃত হয়েছে। বেড়েছে বন্দী সংখ্যা। তবে এখানকার কারারক্ষী ও কারা কর্মর্তারা আগের মত ইউরোপীয় ভাষায়ই কথা বলত। তাদের আচরণও ছিল আগের মত কর্কশ। মনিব-ভৃত্য নীতি অনুসরণ করত তারা। তাদেরকে বস বলতে হত যদিও আমরা তা বলতাম না। বর্ণভেদ প্রথা এখানে প্রচণ্ডমাত্রায় ছিল। রোবেন দ্বীপে কোন কৃষ্ণাঙ্গ কারারক্ষী বা কারা কর্মকর্তা ছিলেন না। সবাই ছিল শ্বেতাঙ্গ। আবার এখানে কোন শ্বেতাঙ্গ বন্দিও ছিল না। সবই ছিল কৃষ্ণাঙ্গ। মনে হল রোবেন দ্বীপ আরেকটি দেশ। দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। এটাই একটা পৃথিবী। প্রেটোরিয়া জেলখানায় দেশের খবর পাওয়া যেত। আত্মীয়-স্বজন ও দলের লোকদের সঙ্গে দেখা হত। জেলখানায়ও আমাদের অনেক সমর্থক ছিল। তারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করতেন। কিন্তু এখানে এসবের কিছুই ছিল না।

প্রথম দিন থেকেই আমি শর্ট ট্রাউজার পরার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে আসছিলাম। এখানকার প্রধান কারাকর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করে দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে চাইলাম। কারারক্ষীরা আমার কথা আমলে নিত না। কিন্তু সপ্তাহখানেক পর সেলের ভিতর একজোড়া পুরনো খাকি ট্রাউজার দেখতে পেলাম। ভাবলাম এগুলো বোধ হয় আমার জন্যই। আমি কারারক্ষীদের ডেকে ট্রাউজার দুটো নিয়ে যেতে বললাম। স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলাম দক্ষিণ আফ্রিকার সব বন্দীকে লং ট্রাউজার না দেয়া পর্যন্ত আমি সেগুলো পরব না। এর একটু পরেই স্বয়ং কমান্ডিং অফিসার আমার সেলে আসলেন। একগাল হেসে বললেন, ম্যান্ডেলা আপনার দাবি মেনে নিলাম। এখন থেকে সব বন্দিকেই লং ট্রাউজার দেয়া হবে।

৬০

রোবেন দ্বীপে দুই সপ্তাহ কেটে গেলে আমাদেরকে জানানো হল, আমাদের আইনজীবী ব্রাম ফিশ্চার ও জোয়েল জোফি রোবেন দ্বীপে আসছেন। তারা দ্বীপে আসার পর আমাদেরকে তাদের কাছে কড়া পাহাড়া দিয়ে নিয়ে আসা হল। তারা দুই কারণে আসেন। আমরা কেমন আছি সেটা দেখার জন্য। এখনও আপিল করতে ইচ্ছুক কিনা সেটা জানার জন্য।

আইনজীবীদের দেখে মনে হল কয়েক যুগ পর তাদের সঙ্গে দেখা হল। অথচ মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই আদালতে তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। মনে হল তারা অন্য জগতের মানুষ। আমাদের এই পৃথিবী পরিদর্শন করতে এসেছেন।

আমরা একটি খোলা রুমে বসলাম। একজন মেজর বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথোপকথনের দিকে দৃষ্টি রাখছিলেন। আমি তাদেরকে জড়িয়ে ধরতে চাইলাম। কিন্তু মেজর সাহেব নিষেধ করলেন। আইনজীবীদের বললাম, আমরা সবাই এখানে ভাল আছি। আপিল না করার সিদ্ধান্তে আমরা এখনও অটল আছি। কথাবার্তার এক পর্যায়ে ব্রামকে তার স্ত্রী মলির কথা জিজ্ঞেস করি। মলির কথা জিজ্ঞেস করাতেই ব্রাম যেন কেমন হয়ে গেলেন। উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। এক পর্যায়ে রুমের বাইরে চলে গেলেন। কয়েক মিনিট বাইরে পায়চারি করার পর আবার রুমে আসলেন। অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন কিন্তু মলির প্রসঙ্গটি তুললেন না। আমার প্রশ্নের উত্তরও দিলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের বৈঠক শেষ হল। আমাদেরকে সেলে ফিরিয়ে নেয়া শুরু হল। যাওয়ার পথে মেজর সাহেব বললেন, ম্যান্ডেলা আপনিকি ব্রামের আচরণে কষ্ট পেয়েছেন? বললাম হ্যাঁ। মেজর সাহেব বললেন, মনে কষ্ট নিয়েন না। ব্রামের স্ত্রী মলি গত সপ্তাহে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। কথাটা ব্রামই আমাকে বলেছে। মেজর আরো বললেন, গত সপ্তাহে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় একটি পশুকে সাইড দিতে গিয়ে তাদের গাড়িটি নদীতে পড়ে যায়। ব্রাম কোনমতে বাঁচলেও মলি পানিতে ডুবে মারা যান।

মলির মৃত্যুর খবর শুনে সবার মন খারাপ হয়ে গেল। মলি ছিলেন চমৎকার একটি মেয়ে। মনে কোন অহংকার দেমাগ ছিল না। সবার সাথে মিশতে পারত। মলি ছিলেন ব্রামের স্ত্রী, সহযোদ্ধা, কলিগ। সব কাজেই ব্রামের উৎসাহ অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন তিনি। মলির চলে যাওয়াটা ব্রামের জন্য নিঃসন্দেহে একটি বড় ধরণের বিপর্যয়। এছাড়া ব্রামের এক ছেলেও কিছুদিন আগে মারা গেছে। সব মিলিয়ে তার অবস্থা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছিল।

মলির নানা কথা মনে পড়ছে। তিনি ছিলেন খুবই আত্মপ্রত্যয়ী। শত বিপদেও ভেঙ্গে পড়তেন না। বাইরে থেকে দেখে তার ভিতরের অবস্থা অনুধাবন করা

যেত না। ব্রামের জীবনের শত দুঃখ কষ্টের ভাগীদার ছিল। আফ্রিকান ইউরোপীয় হয়েও তার মধ্যে অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। আভিজাত্য নিয়ে তাকে কখনও বড়াই করতে দেখিনি।

আফ্রিকানদের দুঃখ কষ্ট তাকে নাড়া দিত। মলি প্রায়ই বলত, আমি শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে লড়ছি না। শ্বেতাঙ্গরা যে অন্যায় করছে তার বিরুদ্ধে লড়ছি।

মেজরকে বললাম, ব্রামকে সান্ত্বনা জানিয়ে একটি চিঠি লিখতে চাই। তিনি অনুমতি দিলেন। তখন চিঠি লেখার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ লোকদের কাছে ৬ মাসে একবার একটি চিঠি লেখার অনুমতি ছিল। সে চিঠি ৫০০ শব্দের মধ্যে শেষ করতে হত। কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মেজর সাহেব চিঠি লেখার অনুমতি দেয়ায় অনেকটা অবাক হলাম। কিন্তু মেজর সাহেবও নিয়মের বাইরে যাননি। আমি তাকে চিঠিটি দিলেও তিনি সেটি পাঠাননি।

কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের জীবন ধারায় একটা শৃংখলা ফিরে এল। সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে উঠতে শুরু করলাম। বন্দী জীবন চলে রুটিন মাফিক। প্রতিটি দিন মনে হয় আগের দিনের মত। প্রতিটি সপ্তাহকে মনে হত একই রকম। একই নিয়মে একইভাবে দিন, মাস, বছর পার হয়। সব সময় একই রকমের কথাবার্তা, একই রকমের নির্দেশ শুনতে হত। কারারক্ষীদের বাঁশির শব্দ চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভাঙত।

কারাগারে সময় কাটতে চায় না। মনে হয় ঘড়ির কাঁটা থেমে থাকে। কিন্তু রোবেন দ্বীপের বিষয়টি ছিল ভিন্ন। এখানে আমরা নানা কাজে ব্যস্ত থাকতাম। পড়াশুনা করতাম। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-বিতর্ক করতাম। কিন্তু এরপরও দিনকে মাসের মত, মাসকে বছরের মত মনে হত। আহমেদ কাদরাদা প্রায়ই বলত, বন্দী জীবনের কয়েক মিনিট বছরের মত।

নিজেদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বেঁচে থাকাটা ছিল আমাদের মত রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ বিশ্বাসে চীর ধরানোর জন্য কারা কর্তৃপক্ষ অনেকসময় মানসিক নির্যাতনের আশ্রয় নেয়। বন্দীদের আলাদা করে নির্জন জায়গায় রাখত। আমার মনে হল রোবেন দ্বীপের কর্তৃপক্ষ যেন বড় রকমের ভুল করছেন। বিশেষ করে আমাদেরকে একসঙ্গে রেখে তারা আমাদেরকে মানসিকভাবে নিস্তেজ করে দেয়ার পরিবর্তে চাঙ্গা করার ব্যবস্থা করছেন।

রোবেন দ্বীপে আমাদেরকে এক সঙ্গে রাখা হত। এতে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। একজন যা জানতাম তা আরেক জনকে জানাতাম। কেউ

ভালো চিন্তাধারা পেশ করলে সেটিকে সমর্থন করতাম। বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের যুক্তিতর্ক তুলে ধরতাম। পারস্পরিক আলোচনা-সমালোচনার সুযোগ থাকার কারণে মনে হল আমাদের মানসিক শক্তি না কমে বরং বেড়ে যাচ্ছে।

সত্যিকারের নেতা হতে হলে জনগণের চিন্তাধারা নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে হয়। তাদের চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হয়। কোন চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে সে ব্যাপারে ধারণা করতে হয়। বন্দি অবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার ফলে আমাদের মধ্যে ওই ধারণাগুলো ব্যাপকভাবে অর্জিত হয়।

আমি এখন বন্দি। আমি জানি জনগণের জন্য লড়াই করতে পারব না। আমি এখন ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। এ জগতটা খুবই ছোট ও সংকীর্ণ। এখানে আমিই নেতা। জনগণ গোটা কয়েক বন্দী। আমার কথা শোনার মত কেউ নেই। তবে এরপরও হাল ছাড়লাম না। বাইরের মত এখানেও সংগ্রাম চালিয়ে যাব বলে মনস্থির করলাম। বন্দীশালায় বর্ণবাদ, নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো বলে ঠিক করলাম।

৬১

আমাদেরকে প্রতিদিন ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়া হত। ভোরে যেসব প্রহরীরা সেলের নিরাপত্তার দায়িত্বে আসত তারাই এ কাজটি করত। রাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কারারক্ষীরা চলে যাওয়ার পরই এরা আসত। প্রহরীরা ভোর হলেই ঘুম থেকে ওঠ, ঘুম থেকে ওঠ বলে চেঁচামেচি শুরু করত।

আমি বরাবরই ভোরে ঘুম থেকে উঠি। তাই এখানেও এত সকালে ঘুম থেকে উঠতে সমস্যা হত না। সাড়ে ৫টায় ঘুম থেকে উঠলেও আমাদেরকে সেলের বাইরে বের হতে হত ৬টা ৪৫ মিনিটে। এ সময়ের মধ্যে আমাদেরকে বিছানা গুছাতে হত। বাথরুমের কাজ সারতে হত। বাথরুমে বাইরে থেকে সরাসরি পানি যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। ভিতরেই ছোট ড্রাম জাতীয় পাত্রে পানি রাখা হত। সচরাচর যে ধরণের টয়লেটে আমরা পায়খানা করি সেলের টয়লেটটি সে ধরণের ছিল না। এটি ছিল লোহার তৈরি এক ধরণের বিশেষ পায়খানা। উপরে ঢাকনা ছিল। ঢাকনাটি পুরো ১০ ইঞ্চি পুরু ছিল। এই পায়খানাকে বলা হত ইটালিক। এর ওপরে পানির পাত্র রাখা হত। এ পানি দিয়েই আমরা হাত-মুখ ধুতাম। শেভ করতাম।

ঠিক ৬ টা ৪৫ মিনিটে আমাদেরকে সেলের বাইরে নিয়ে আসা হত। আমাদের প্রথম কাজ ছিল বালি বা আমাদের পায়খানার পাত্রগুলি বাইরে নিয়ে এসে সেগুলি পরিষ্কার করা। পরিষ্কার করার পর পাত্রগুলি সেলের বারান্দায় রেখে দিতাম। এ কাজটা খুব ভোরে করা হত। তাই কাজ করার সময় সঙ্গীদের সঙ্গে নানা ব্যাপারে আলাপ করতে পারতাম। এ সময়ে আলাপে কেউ ব্যাঘাত ঘটাত না।

প্রথম কয়েক মাস জেনারেল সেকশনে তৈরি করা নাস্তা আমাদেরকে দেয়া হত। দুধ ও আটা মিশিয়ে তৈরি এক ধরণের পায়েস জাতীয় খাবার নাস্তা হিসেবে পেতাম। সেখান থেকেই বাটিতে করে এগুলো নিয়ে আসা হত।

এর কিছুদিন পর আমাদের সেকশন থেকেই নাস্তা সরবরাহ শুরু হয়। টিনের ড্রামে করে এই নাস্তা নিয়ে আসা হত। দেখতে কফির মত কালো রঙের ওই নাস্তা আমরা নিজেরা যার যার মত করে নিয়ে খেতাম।

এখানে কোন ব্যাপারে বৈষম্য করা না হলেও খাবারের ব্যাপারে বৈষম্য করা হত। শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয়রা অপেক্ষাকৃত ভাল খাবার পেত। কৃষ্ণাঙ্গ কয়েদীদের খাবারের মান ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। কারা কর্তৃপক্ষের দাবি ছিল, তারা আমাদেরকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করে থাকে। খাবার নিয়ে আপত্তি করলে কারারক্ষীরা বলত, এখানে তোমাদের যে খাবার দেয়া হয় সেটা বাড়িতেও খাওনি।

নাস্তার পর আমাদেরকে এক সঙ্গে জড়ো করা হত। জেলের খাকি পোশাক, টুপি, জ্যাকেট ঠিকঠাক মত পরা হয়েছে কিনা সেটা ভালো করে দেখা হত। পোশাক পরতে ভুল করা হলে দেয়া হত শাস্তি। ইন্সপেকশন শেষ হলে যে যার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। দুপুর পর্যন্ত আমাদেরকে কাজ করতে হত।

এ সময়ের মধ্যে কোন বিরতি দেয়া হত না। ঠিক দুপুরে ড্রাম দিয়ে খাবার নিয়ে আসা হত। এটি বসানো থাকত চাকাওয়ালা একটি ট্রলির ওপর। আফ্রিকানদের দেয়া হত ভুট্টার রুটি। ভারতীয়রা ভাত পেত। সাথে থাকত সব্জি। দুপুরের খাবারের পর পর অনেক সময় এক জাতীয় পানীয় দেয়া হত। পাউডার মিশিয়ে এটা তৈরি করা হত। খেলে শরীর সতেজ হয়ে উঠত।

স্বাদ ছিল অনেকটা দুধের মত। আমি প্রায়ই এই পাউডার রেখে দেয়ার চেষ্টা করতাম। যাতে সেলে গিয়ে শরবত বানিয়ে খাওয়া যায়। দুপুরের খাবারের পর বাঁশি বাজিয়ে আবার লাইনে দাঁড় করানো হত। শরীর পরীক্ষা করে দেখা হত। কারো পকেটে কিছু আছে কিনা সেটা তল্লাসি করা হত। এরপর গোসলের জন্য আধা ঘণ্টা সময় দেয়া হত।

আবহাওয়া ঠাণ্ডা হলেও গরম পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। তিনটি বিশাল ট্যাংকারে সমুদ্রের লোনা পানি রাখা হত। এছাড়া দুটি ঝরণা ও একটি পানির ট্যাপ ছিল। এখানেও সমুদ্রের লোনা পানি আসত। এ পানি দিয়েই আমাদের গোসল করতে হত।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে আমাদেরকে লক আপে ঢোকানো হত।

এর কিছুক্ষণের মধ্যে রাতের খাবার পরিবেশন করা হত। অন্ধকার নেমে আসার আগেই এ কাজ শেষ করা হত। রাতের খাবারের ধরণ ছিল দুপুরের খাবারের মতই। তবে সাথে গাজর শশা থাকত। একদিন পর একদিন রাতের খাবারের সঙ্গে মাংস থাকত। মাংসের আকার ছিল খুব ছোট। ভারতীয় ও ইউরোপিয়রা রাতের খাবারের সঙ্গে কয়েক টুকরা রুটি পেত যেটা আমরা পেতাম না। সেলে রাত ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত পড়াশুনার সুযোগ পেতাম।

আমাদের সেলের সামনের বারান্দাটি ছিল বেশ বড়সড়। ঘুমোতে যাওয়ার আগে সেখানে বসে গল্প-গুজব করতাম। তবে কথা বলতাম খুব আস্তে আস্তে। রাতে কারারক্ষীরা প্রায়ই সেলের কাছে এসে দেখে যেত আমরা পড়াশুনা করছি না ঘুমাচ্ছি।

৬২

ব্রাম ও জোয়েলের সঙ্গে বৈঠকের কিছুদিন পর আমাদেরকে রোবেনদ্বীপের হেড অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। হেড অফিস বলতে কারা কর্তৃপক্ষের হেড অফিস। আমরা যেখানে থাকতাম সেখান থেকে এর দূরত্ব ছিল সিকি মাইল। ভবনটি ছিল ইট পাথর দিয়ে তৈরি। সাদামাটা ডিজাইনের। সেখানে আমাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হল। এরপর একে একে হাতের ছাপ নেয়া হল।

লাইনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম একজন কারারক্ষী ক্যামেরা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। হাতের ছাপ দেয়া শেষ হবার পর প্রধান কারারক্ষী আমাদেরকে ছবি তোলার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবার নির্দেশ দিলেন। আমি সঙ্গীদের ছবির জন্য দাঁড়াতে বারণ করলাম। প্রধান কারারক্ষীকে জিজ্ঞেস করলাম ছবি তোলার ব্যাপারে সর্বোচ্চ কারাকর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশ আছে কিনা। থাকলে সেটা আমাদের দেখাতে হবে। তবেই তোমাকে ছবি তুলতে দেয়া হবে। কেননা বন্দিদের ছবি তোলার কোন নিয়ম নেই। আমি জানতাম, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কারারক্ষীরা প্রায়ই নানারকম অবৈধ কাজ করত। এটাও ছিল সে রকম। আমার কথার পর কারারক্ষী ছবি না তুলে চলে গেল। আমার প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর পেলাম না। যাওয়ার আগে রক্ষীটি বলে যায়, আমাদেরকে সে

দেখে নিবে। যে কোন মূল্যে ছবি তুলে ছাড়বে। আমি বললাম, কারা কমিশনারের অনুমতি ছাড়া আমরা তোমাকে ছবি তুলতে দিব না।

কয়েক সপ্তাহ পর একদিন সকালে প্রধান কারারক্ষক আমাদের সেলে আসলেন। তিনি হামার সরিয়ে সুই সুতা আর কিছু জামা-কাপড় দিলেন। বললেন, আজ আর কোন কাজ নেই। আজকের কাজ এই জামা-কাপড়গুলো সেলানো। কিন্তু কাপড়গুলো খুলে দেখলাম সেগুলো সম্পূর্ণ নতুন। ছেড়া-ফাড়া নেই। সেলানোরও কিছু নেই। এই কাণ্ড দেখে আমরা বেশ কৌতুহলী হয়ে উঠলাম।

এগারটার দিকে কমান্ডিং অফিসার ও প্রধান কারারক্ষী আবার আসলেন। তাদের সাথে ছিল দুজন লোক। বেশ পরিপাটি পোশাক পরা। প্রধান কারারক্ষী বললেন। এরা লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সাংবাদিক। তাদের একজন ফটোগ্রাফার। অন্যজন রিপোর্টার। তারা আমাদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কর্মীরা নিয়মিত আমাদেরকে দেখতে আসার যে উদ্যোগ নিয়েছে তারই অংশ হিসেবে তারা এসেছেন।

জেলখানায় আমাদেরকে দেখতে এই প্রথম কোন পরিদর্শক আসলেন। তাই আমরা স্বভাবতই কিছুটা উৎফুল্ল ছিলাম। বুঝতে পারলাম আমাদের ব্যাপারে দেশ-বিদেশে বেশ তোলপাড় চলছে। বিশেষ করে আমরা কেমন আছি সেটা জানানোর জন্য সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা চাপ প্রয়োগ করছে। তাই বাধ্য হয়ে সরকার সাংবাদিকদের আমাদের কাছে পাঠিয়েছে।

দুই সাংবাদিক আমাদের চারপাশে পায়চারি শুরু করলেন। তারা মনোযোগ দিয়ে আমাদের অবস্থা দেখতে লাগলেন। আমরা মাথা নিচু করে কাজ করতে লাগলাম। এমন সময় একজন কারারক্ষী আমার কাছে এলেন। হাত ধরে সাংবাদিকদের কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, তোমাকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আগের দিনগুলিতে আমি সবার পক্ষ হয়ে কথা বলেছি। নিজের জন্য কিছু বলিনি। কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল, যার যার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। অন্য কিছু টানা যাবে না। আমরা এই নির্দেশের প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু এরপরও কারাকর্তৃপক্ষ 'আমরা' শব্দটি ব্যবহারের অনুমতি দিলেন না।

রিপোর্টারের সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম। তার নাম ছিল মিস্টার নিউম্যান। বিভিন্ন বিষয়ে ২০মিনিট কথার সুযোগ পাই আমি। কথা বলা শেষে নিউম্যান জানালেন, তিনি আমার একটি ছবি নিতে চান। ছবি তুলতে দিতে প্রথমে রাজি না হলেও পরে রাজি হলাম। ভাবলাম ছবিটি বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হবে। ছবির সাথে যদি আমাদের পক্ষে কিছু লেখা হয় তাহলে সেটি আমাদের জন্য ভালো হবে। তবে শর্ত দিলাম সিসুলুকে আমার পাশে বসিয়ে ছবি তুলতে হবে। আমি আর সিসুলু কাজের ফাঁকে কথা বলছি এমন একটি ছবি তোলা হল। কিন্তু পরে এ ছবি ছাপা হয়েছে বা এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এমনটা

শুনিনি। বোধ হয় যাওয়ার সময় কারাকর্তৃপক্ষ ছবি ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সাংবাদিকদের কাছ থেকে রেখে দিয়েছিল। সাংবাদিকরা চলে যাওয়ার পর সুই সুতা সরিয়ে আমাদের হাতে ফের হাতুড়ি তুলে দেয়া হয়। নতুন জামা-কাপড় খুলে পুরনো জামা-কাপড় পরিয়ে দেয়া হয়।

আমাদের পরিদর্শনকারী টিমের মধ্যে প্রথম ছিল টেলিগ্রাফ পত্রিকার সাংবাদিকরা। পরে আরো অনেক টিম আমাদেরকে পরিদর্শনের জন্য আসে। রাইভোনিয়া বিচার পুরো বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল। আমরা ভালো আছি সেটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরতে সরকার ব্যস্ত ছিল। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তখন আমাদেরকে নিয়ে সমানে লেখা হয়। সেগুলিতে বলা হয়, সরকার আমাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করছে। নানাভাবে কষ্ট দেয়া হচ্ছে আমাদের। অনেক পত্র-পত্রিকায় আমাদের ওপর নির্যাতন চালানোর খবরও ছাপা হয়। তাই বিশ্ববাসীর উদ্বেগ কাটাতে সরকার আমাদের সঙ্গে অনেকের দেখা করার ব্যবস্থা করে।

বিখ্যাত ব্রিটিশ আইনজীবী মিস্টার হাইনিং ও আমেরিকান বার এসোসিয়েশনের নেতা ইয়েট জেনারেল স্টেইন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তারা রোবেন দ্বীপে আসার পর সব বন্দীকে এক সাথে জড়ো করা হয়। কারাকর্তৃপক্ষ বন্দিদের যে কোন একজনকে কিছু বলার সুযোগ দেয়। বন্দীরা আমাকে তাদের পক্ষ থেকে কিছু বলার অনুরোধ জানায়। আমি দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করি। পরিদর্শকদের রোবেন দ্বীপে আসতে দেয়ায় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। পরিদর্শকরা বহুদূর থেকে অনেক কষ্ট করে আমাদের অবস্থা জানার জন্য রোবেন দ্বীপে আসায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এরপর খুব সংক্ষেপে বলি– আমরা অপরাধী নই। রাজনৈতিক বন্দি। তাই আমাদের সঙ্গে অপরাধীর মত আচরণ করা বোধ হয় সমীচীন নয়। এরপর আমাদেরকে দেয়া খাদ্য, পোশাকের বিবরণ দেই। কিভাবে জীবনযাপন করছি সেটা তুলে ধরি। কিন্তু কথার মাঝখানে মিস্টার হাইনিং আমাকে থামিয়ে দেন। বলেন, আমরা যেহেতু কয়েদী তাই আমাদেরকে কষ্ট করেই থাকতে হবে। ভারী কাজও করতে হবে। এরপর আমি সেলে যেসব সমস্যা হচ্ছে সেগুলির বিবরণ দিতে থাকি। এ যাত্রায়ও হাইনিং আমার কথায় বাম হাত দেন। তিনি বলেন, আমেরিকার অনেক কারাগারের অবস্থা এখানকার থেকেও খারাপ। তিনি বলেন কপাল ভালো যে আমাদের মৃত্যুদণ্ড হয়নি। হাইনিং এর আচরণ আমাদের সবাইকে রীতিমত ক্ষুব্ধ করে তোলে। তার কথা থামিয়ে দিয়ে আমি বলি। অনেক বলেছেন স্যার। আপনার কথা আমরা আর শুনতে চাই না। এ সময় অবশ্য স্টেইন ছিলেন চুপচাপ। তিনি কিছু বলেন নি।

হাইনিং এরপর আর কখনও রোবেন দ্বীপে যাননি।. আমরাও তাকে কখনো মিস করিনি।

৬৩

রোবেন দ্বীপের কারাকর্তৃপক্ষ বন্দিদেরকে ৪টি ভাগে ভাগ করেছিল। শ্রেণীবিভাগগুলো ছিল এ, বি, সি এবং ডি।

এ শ্রেণীর বন্দীরা ছিল সর্বোচ্চ মর্যাদার। সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা তারা ভোগ করত। ডি ছিল সর্বনিম্ন শ্রেণীর। এ বিভাগের কারাবন্দীরা ছিল সবচেয়ে অবহেলিত ও সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। সব রাজনৈতিক বন্দীরা ছিল এই ডি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাই পদে পদে ছিল তাদের দুর্ভোগ। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, চিঠি লেখা, পড়াশুনা করা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা– এসব ক্ষেত্রে আমরা অন্যদের তুলনায় খুব কম সুযোগ পেতাম। ডি থেকে সি শ্রেণীর বন্দীর মর্যাদা পেতে আমাদের এক বছর লেগেছিল।

বন্দিদের শ্রেণীবিভাগ ছিল নির্যাতনের একটা হাতিয়ার। বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দিদের নানাভাবে নিপীড়ন করার জন্য কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ওই শ্রেণীবিভাজন করে। আমরা এর সমালোচনা করলেও শ্রেণীবিভাগের উর্ধ্বে উঠতে পারতাম না। কারাকর্তৃপক্ষ আমাদের বলত, আচার-ব্যবহার ভাল কর। তবেই তোমাদের উন্নতি হবে। এক স্তর ছাড়িয়ে অন্য স্তরে যেতে পারবে।

ডি শ্রেণীর বন্দি হওয়ায় আমরা ৬ মাসে একটি চিঠি পেতাম এবং একটি পাঠাতে পারতাম। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা আমাদের কাছে অনেক চিঠি পাঠালেও কর্তৃপক্ষ বেছে ৬ মাস অন্তর অন্তর মাত্র একটি চিঠি দিত পড়ার জন্য। সি শ্রেণীর বন্দিরা ৬ মাসে পেত দুটি চিঠি। খাবার-দাবারের আপত্তি করলে, কারারক্ষীরা বলত তোমরা এ শ্রেণীর বন্দি নও। চাইলেই সব কিছু পাবে। এ শ্রেণীর বন্দি হওয়ার চেষ্টা কর। তাহলে মানি অর্ডার যোগে বাইরে থেকে পাঠানো টাকা পাবে। সে টাকা দিয়ে কারাকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন দোকান থেকে ইচ্ছে মত খাবার-দাবার ও অন্যান্য জিনিসপত্র কিনে ব্যবহার করতে পারবে। এ শ্রেণীর বন্দিরা বইপত্র কিনেও পড়তে পারত। ডি শ্রেণীর বন্দি হওয়ায় আমরা এসব সুযোগ থেকে ছিলাম বঞ্চিত।

শাস্তির মেয়াদের সঙ্গে শ্রেণীবিভাগের একটা সম্পর্ক ছিল। কারো ৮ বছরের সাজা হলে প্রথম দুই বছর তাকে ডি শ্রেণীর বন্দি হয়ে থাকতে হত। এর পরের দুই বছর সি শ্রেণীর। তারও পরের দুই বছর বি শ্রেণীর এবং শেষ দুই বছর এ শ্রেণীর বন্দি হিসেবে সাজা ভোগ করতে হত। এ নিয়ম অবশ্য আমাদের মত রাজনৈতিক বন্দিদের বেলায় প্রযোজ্য ছিল না।

রোবেন দ্বীপে আসার আগে আমি দু'বছর জেল খেটেছি। সে হিসেবে রবিন দ্বীপে আসার পর পর আমাকে সি শ্রেণীর বন্দির মর্যাদা দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু কারাকর্তৃপক্ষ তা করেনি। আমি সব সময় অনিয়মের প্রতিবাদ করতাম। কারা কর্তৃপক্ষ ও কারারক্ষীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতাম। এ জন্য কারারক্ষীরা প্রায়ই বলত, ম্যান্ডেলা তুমি সব সময় সমস্যার সৃষ্টি কর। তাই সারা জীবন তোমাকে ডি শ্রেণীর বন্দী হয়েই থাকতে হবে।

প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর বন্দিদের প্রিসন বোর্ডের সামনে হাজির করা হত। বন্দিদের শ্রেণী বিভাগ বদলের ব্যাপারে এখান থেকে সুপারিশ করা হত। এক্ষেত্রে বন্দিদের আচার-ব্যবহারের বিষয়টিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হত। বোর্ডের সঙ্গে প্রথম বৈঠকের সময় তারা আমাকে এএনসি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আমি তাদেরকে এএনসি সম্পর্কে এবং আমার বিশ্বাস আদর্শ সম্পর্কে বলি। কথা বার্তা দিয়ে তাদের দৃষ্টি ভঙ্গিতে পরিবর্তন আনাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম তথ্য আদায়ের জন্য বোর্ডের সদস্যরা ওই ধরণের প্রশ্ন করত। এরপর থেকে আমরা বোর্ডের সামনে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা না বলার সিদ্ধান্ত নেই।

ডি শ্রেণীর বন্দি হওয়ায় আমার সুযোগ সুবিধা ছিল খুবই সীমিত। প্রতি ৬ মাসে মাত্র একজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে পারত। ৬ মাসে একটি চিঠি লেখার সুযোগ পেতাম। এটাকে আমার কাছে অমানবিক মনে হত। কারণ পরিবারের লোকদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া মানবাধিকারের অংশ। বন্দি জীবনে এই বিষয়টি আমার কাছে সবচেয়ে দুঃখজনক মনে হয়েছে।

বন্দি অবস্থায় পরিবার-পরিজনের কোন খোঁজ পেতাম না। এটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক মনে হত। ৬ মাসে যে একটি চিঠি আমাকে দেয়া হত সেটিও পূর্ণাঙ্গ ছিল না। অনেক লাইন থাকত কাটা। তাই ওই চিঠি পড়ে অনেক সময় পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই বোঝা যেত না।

কারাকর্তৃপক্ষ চিঠিপত্র নিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করত। তাদের বাড়াবাড়িতে মাঝে মধ্যে যন্ত্রণা বেড়ে যেত। অনেক সময় দেখা যেত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি না দিয়ে অন্য চিঠি দেয়া হয়েছে। স্ত্রী-সন্তান, মা, বোনদের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য আকুল হয়ে থাকলেও এদের সম্পর্কিত চিঠিই দেয়া হত না। অনেক সময় নির্মম রসিকতাও করত জেলের কর্মকর্তারা। এসে বলত, ম্যান্ডেলা তোমার একটি চিঠি এসেছে। কিন্তু সেটি তোমাকে দেয়া হবে না। কে পাঠিয়েছে, কেন পাঠিয়েছে জানতে চাইলে টু শব্দটিও করত না। তখন মন বড্ড খারাপ হয়ে যেত। একইভাবে আমি চিঠি লিখলেও তার অনেক অংশ কেটে বাদ দিয়ে তারপর সেটি জায়গামত পাঠানো হত।

রোবেন দ্বীপে পৌঁছার পর উইনির লেখা একটি চিঠি আমাকে দেয়া হয়। এটি ছিল ওই দ্বীপে পৌঁছার পর আমাকে দেয়া উইনির প্রথম চিঠি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এতে এমন নির্মমভাবে কলম চালায় যে চিঠি পড়ে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

আগস্ট মাস বিদায় হতে চলল। রোবেন দ্বীপে পদার্পনের তিন মাস তখনও পূরণ হয়নি। আমাকে বলা হয়, কেউ হয়ত কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কে আসবেন সেটা বলা হল না। ওয়াল্টার বলল, তাকে দেখতেও কে যেন আসছেন। আমি মনে মনে ভাবলাম সম্ভব উইনি ও আলবার্তিনা আসছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। উইনি ছিল সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ব্যক্তি। তাই আমার কাছে আসার জন্য তাকে আইনমন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হয়েছিল। অনুমতি থাকা সত্ত্বেও দূর্গম রোবেন দ্বীপে আসাটা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। কর্তৃপক্ষও এ দ্বীপে আসতে আত্মীয়-স্বজনকে সেভাবে উৎসাহিত করত না। একদিন হয়ত দেখা গেল, কারও স্ত্রীকে বলা হল, কাল আপনি স্বামীর সঙ্গে রোবেন দ্বীপে দেখা করতে পারবেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কেউ আসতে পারলে তার ভাগ্যের কারণেই প্রিয় জনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হত।

যাহোক, উইনি আসছেন সে ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আমাদের ভিসিটিং রুম বা অতিথি কক্ষটি তেমন একটা ভালো ছিল না। সাজগোজের অভাব ছিল। কক্ষের জানালার অনেক কাঁচ ভাঙ্গা ছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বালাইও ছিল না।

চেয়ার ছিল হাতেগোনা কয়েকটি। পরে অবশ্য কর্তৃপক্ষ রুমটির সংস্কার করে। মাইক্রোফোন ও স্পীকার বসানো হয়। চারদিকে ভালো গ্লাস লাগানো হয়।

সকালে ভিজিটর রুমে ওয়াল্টার ও আমার ডাক পড়ল। আমাদেরকে রুমে নিয়ে যাওয়া হল। রুমের শেষ প্রান্তে বসতে দেয়া হল। অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ দরজার কাঁচ দিয়ে উইনির চেহারা দেখতে পেলাম। দীর্ঘদিন পর প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখ দেখে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। উইনি জেলে আসলে সব সময় সুন্দর জামা কাপড় পড়ে আসত। এবারও তার ব্যতয় হল না। কিন্তু উইনিকে আমি একটু ছুঁয়ে দেখতে পারিনি। একান্তে কোন আলাপও করতে পারিনি। কথাবার্তা যা বলার তাদের সামনেই বলতে হয়েছে। দীর্ঘদিন পর স্ত্রীকে কাছে পাওয়ার পর একটু আদর করতে না পারাটা ছিল আমার জন্য অত্যন্ত বেদনার একটি কারণ। আমি এ ঘটনায় খুবই দুঃখ পেলাম। আশাহত হলাম। কিছুটা দূরে দাঁড়ানো থাকা অবস্থায় আমাদের আলাপ সারতে হল।

কর্তৃপক্ষের আচরণে উইনিও কষ্ট পেল। রাগে-ক্ষোভে ফুলে উঠল। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। উইনি জানায়, সরকার তার ওপর দ্বিতীয়বারের মত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তাই শিশু কল্যাণমূলক চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কার্যক্রম তার পক্ষে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসটি তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। ওই অফিসে পুলিশ তল্লাসিও চালিয়েছে বলে সে আমাকে

জানায়। উইনির ওই অফিসে অসহায় বাচ্চাদের লালন পালন করা হত। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করে এমন দম্পতিরা তাদের সন্তান সেখানে রাখার সুযোগ পেতেন।

দু'জন কারারক্ষীর উপস্থিতিতে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করতে পারিনি। তারা শুধু আমাদের দিকে খেয়ালই রাখত না বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিত। এটা বলবেন, একথা সংক্ষেপ করুন, এ প্রসঙ্গ তুলবেন এমনভাবে দিকনির্দেশনা দিত। ইংরেজি অথবা আফ্রিকান ইউরোপীয়দের ব্যবহৃত ওলন্দাজ ধাঁচের আফ্রিকানাস ভাষায় কথা বলার অনুমতি ছিল। আফ্রিকান ভাষায় কিছু বলার চেষ্টা করলেই কারারক্ষীরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠত।

বিশেষ করে দেশের চলমান অবস্থান, রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। পারিবারিক বিষয়াদির মধ্যে আলাপ সীমিত রাখতে হল।

কোন ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে রোবেন দ্বীপে এটাই ছিল আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তাই এই সাক্ষাৎ ছিল আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কথা বলার সময় উইনি আমার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। আমরা শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছি এমন খবর নাকি সে শুনেছে। আমি তাকে বললাম, আমরা ভাল আছি। কোন শারীরিক সমস্যা নেই। চলতে ফিরতে পারি। সব কাজ করতে পারি। কিছুটা শুকিয়ে গেলেও শারীরিকভাবে খুব ভাল আছি।

উইনি কিছুটা শুকিয়ে গিয়েছিল। মুখটা ছিল ফ্যাকাশে। আগের সেই জৌলুসভাব নেই। আমি তাকে স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে বললাম। উইনি ডায়েটিং বা খাবার নিয়ন্ত্রণ করত। আমি তাকে এটা বেশি করতে বারণ করলাম। ওজনটা আরেকটু বাড়াতে বললাম। বাচ্চাদের কথা জিজ্ঞেস করলাম। মার ব্যাপারে জানতে চাইলাম। উইনির পরিবারের লোকজনদের ব্যাপারে খোঁজ নিলাম।

হঠাৎ একজন কারারক্ষী পেছন থেকে বললেন, সময় শেষ। সময় শেষ। কথা শেষ করুন। এ কথা শুনে রেগে গেলাম। হিংস্র ব্যাঘ্রের মূর্তিতে তার দিকে তাকালাম। বললাম, দেড়ঘণ্টা পার হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আসলে কারারক্ষী ঠিক ছিল। সময় ঠিকই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিভাবে দেড়ঘণ্টা পার হল বুঝতে পারিনি। দেড়ঘণ্টা মনে হল দেড় মিনিটের মত। কারারক্ষী আবার বলল, সময় শেষ। উইনি যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। আমিও বিদায়ের প্রস্তুতি নিলাম। হাত নাড়তে নাড়তে উইনি চলে গেল। আমি জানতাম সামনে আরো অনেককে দেখতে পাব। কিন্তু উইনিকে সহজে দেখতে পাব না। আমার ধারণাই ঠিক হল। পরবর্তী ২ বছর উইনিকে আমি আর দেখতে পাইনি।

৬৪

জানুয়ারি মাস। একদিন সকালে জেলখানার খোলা মাঠে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কাজ শুরুর আগে গোনার জন্য প্রতিদিনই এভাবে আমাদের দাঁড় করানো হয়। ওই দিন কাজের পরিবর্তে আমাদেরকে জেলখানার আঙ্গিনার বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। তোলা হল একটি ট্রাকে। ট্রাকের চারদিক ছিল বন্ধ। অনেকটা কাভার্ড ভ্যানের মত। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদেরকে কিছুই বলা হল না।

কিন্তু আমি ঠিকই বুঝতে পারলাম আমাদের গন্তব্য কোথায়। কয়েক মিনিট পর আমাদেরকে ট্রাক থেকে একটি জায়গায় নামানো হল। ১৯৬২ সালে এ দ্বীপে প্রথমবার আসার সময় এ জায়গাটি দেখেছিলাম। জায়গাটি ছিল চুনা পাথরের খনি।

চুনা পাথর দেখতে সাদা মাটির মত। পাহাড়ের গা থেকে কাটতে হয়। সেখানে চারদিকে ছিল চুনাপাথরের পাহাড়। এসব পাহাড়ের ওপরে ছোট ছোট গাছপালা ও সবুজ ঘাসও ছিল। দু'একটা তালগাছও নজরে পড়ল। যন্ত্রপাতি দিয়ে ওই জায়গা তখন পরিষ্কার করা হচ্ছিল।

আমরা ওখানে যাওয়ার পর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল ওয়েসেলকে দেখতে পেলাম। তিনি ছিলেন খুব পাষণ্ড প্রকৃতির লোক। বন্দীদের শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি দেখতেন তিনি। এ ব্যাপারে কাউকে কোন ছাড় দিতেন না। ওয়েসেল আমাদেরকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বললেন। আমরা এ্যাটেনশন নিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, আগামী ছয় মাস আমাদেরকে এখানে কাজ করতে হবে। এরপর আমাদের হাল্কা কাজ দেয়া হবে। কিন্তু কর্নেল সাহেব কথা রাখেনি। টানা তেরটি বছর আমাদেরকে ওখানে কাজ করতে হয়।

কমান্ডিং অফিসারের কথাবার্তার পর আমাদের হাতে যন্ত্রপাতি দেয়া হল। কারো হাতে ছিল শাবল, কারো হাতে কুড়াল, কারো হাতে ছেনি। অনেকের হাতে ছিল কোদাল-টুকরি। কিভাবে চুনা পাথর সংগ্রহ করতে হবে সে ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দেয়া হল। খনি থেকে চুনা পাথর সংগ্রহ করা মোটেই সহজ কাজ নয়। এটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

প্রথমদিকে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে গিয়ে আমাদের নানা সমস্যা হল। চুনাপাথর এমনিতে বেশ নরম হলেও পাথরের নিচে এটা লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে। পাথর, নুড়ি সরিয়ে এটি বের করতে হত। অনেক সময় পাহাড়ের পাথুরে মাটির অনেক নিচে এটা পাওয়া যেত। এজন্য মাটি খোঁড়া খোঁড়ির কাজটা বেশি করতে হত। মাটি খুঁড়লে চুনা পাথরের বিশাল বিশাল খন্ড পাওয়া যেত। সেগুলি শাবল দিয়ে

ভেঙ্গে ঝুড়িতে করে ট্রাকে তুলতে হত। কাজটা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাই সারাদিন কাজ করায় শরীরে ক্লান্তি নেমে আসত। সন্ধ্যানাগাদ খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর পর ঘুমিয়ে পড়তাম। ঘুম ভাঙত পরের দিন সকালে।

আমাদেরকে জেলখানা অঙ্গন থেকে ওই খনি এলাকায় কেন কাজ দেয়া হল সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কিছুই বলেনি। দ্বীপের বিভিন্ন সড়কে ব্যবহারের জন্য তাদের অল্পসল্প চুনাপাথরের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কেন আমাদের একাজে নিয়োজিত করল পরে আমরা আলোচনা করে তা বের করলাম। কর্তৃপক্ষ বোঝাতে চাইছে আমরা তেমন কেউ নই। সাধারণ কয়েদিদের মতই। আমাদের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব দেখিয়ে আমাদের মানসিক শক্তিকে নিস্তেজ করে দিতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু কাজ হয়নি। আমাদের মনের জোর একটুও কমেনি।

কয়েকদিনের মধ্যেই খনির কাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলাম। কাজ করতে গিয়ে হাত দিয়ে রক্ত ঝরার উপক্রম হলেও মনের দিক থেকে বেশ ভাল লাগত। কারণ আমরা এখানে কাজ করতাম উন্মুক্ত পরিবেশে। চারদেয়ালের বালাই এখানে ছিল না। প্রকৃতিকে গভীরভাবে অনুধাবনের সুযোগ ছিল। পাহাড়ে দাঁড়িয়ে গাছ-পালা তরু-লতা দেখতে পেতাম। পাখির কুহু কুহু কলরব, সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেতাম।

প্রচণ্ড বাতাসে সমুদ্রের বিশাল ঢেউ দ্বীপের গায়ে আছড়ে পড়ার দৃশ্য মনকে পুলকিত করত। এসব কিছুই আমাদের আনন্দ দিত। ফেরার সময় চুনাপাথরে ভর্তি ট্রাকের ওপরে আমরা বসতাম। তখন দূরের অনেক দৃশ্য দেখা যেত। সেটাও ছিল নয়নাভিরাম।

কয়েকদিন পর ট্রাকের বদলে পায়ে হাঁটিয়ে আমাদেরকে চুনাপাথর খনি এলাকায় নিয়ে যাওয়া শুরু করল কর্তৃপক্ষ। এটা আমাদের কাছে আরো ভাল মনে হল। জেলখানা থেকে ওই পাহাড়ি এলাকায় যেতে ২০ মিনিট সময় লাগত। এ সময় আমরা দ্বীপের অনেক নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করতাম। বিশাল বিশাল বৃক্ষ চোখে পড়ত। গাছের ছায়া দিয়ে হাঁটার মজাটাই ছিল অন্যরকম। ঝোপ-ঝাড় থেকে পাখি উড়ে যেত। ফুলের গন্ধ পাওয়া যেত অনেক জায়গায়। আমার সঙ্গীদের কারো কারো কাছে পায়ে হেঁটে যাওয়াটা বিরক্তিকর মনে হলেও আমার কাছে তা মনে হয়নি। আমি এ সময়টা প্রচণ্ডভাবে উপভোগ করতাম।

আমরা সকালে খনি এলাকায় আসতাম। পাহাড়ের পাশে ছোট একটি টিনের ঘরে আমাদের যন্ত্রপাতি ও হাতের গ্লাভস সংরক্ষিত থাকত। সেখান থেকে যে যার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে লেগে যেতাম। আমরা গ্রুপ করে কাজ করতাম। প্রতি গ্রুপে তিন থেকে চারজন করে থাকত। চুনা পাথর জড়ো করে এক জায়গায় রাখতাম। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত কারারক্ষী দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিত।

অস্ত্র ছাড়া রক্ষীরা আমাদের আশপাশে থাকত না। তারা কাজের জন্য তাড়া দিত। আরো বেশি কাজ করতে বলতো। কাজে গতি সঞ্চার করতে বলত। হালচাষ করার সময় চাষী বদলিকে যেভাবে তাড়া করে বেড়ায় আমাদের অবস্থা ছিল অনেকটা সেরকম।

দুপুর ১১ টার দিকে সূর্য মাথার উপর চলে আসত। আমরা এ সময় নিস্তেজ হয়ে পড়তাম। আমার শরীর দিয়ে অঝরে ঘাম বের হতে থাকত। কিন্তু কাজে বিরতি দেয়া যেত না। বরং এ সময় রক্ষীরা চেঁচামেচি বেশি করত। দ্রুত কর। দ্রুত। চালিয়ে যাও। চালিয়ে যাও। এসব বলতে থাকত। দুপুরের খাবার সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবে কাজ চলত। আমরা চুনা পাথর এক জায়গায় জড়ো করতাম, সেখান থেকে তুলতাম ট্রাকে।

দুপুরে বাঁশি বাজানো হত। বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ করে পাহাড়ের নিচে নেমে আসতে হত। আচ্ছাদন দেয়া লোহার তৈরি বেঞ্চে এসে বসতাম। কারারক্ষীরা বসত চেয়ারে। তাদের মাথার ওপরও ছায়ার ব্যবস্থা ছিল। ড্রাম থেকে খাবার নামানো হত। একে একে সবাইকে দেয়া হত।

খাবার শেষে আবার কাজ শুরু হত। চলত টানা বিকেল ৪টা পর্যন্ত। চুনাপাথর বোঝাই ট্রাকের ওপর বসে সেলে ফিরতাম। এসময় আমাদের শরীর ও চেহারা সাদা কেকের মত দেখাত। চুনাপাথরে পুরো শরীর আচ্ছাদিত হয়ে থাকত। সেলে এসে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করতাম।

খনির ভারী কাজের চেয়ে দুপুরের প্রচণ্ড রোদ আমাদের বেশি কষ্ট দিত। জামা থাকায় গায়ে রোদ লাগত না। কিন্তু চোখে লাগত। সূর্যরশ্মি এসে পড়ত সাদা চুনাপাথরের ওপর। সে আলো প্রতিফলিত হয়ে পড়ত আমাদের চোখে। এর সঙ্গে ছিল ধুলিবালি। সব মিলিয়ে কাজের সময় ভালো করে তাকানোটা ছিল কষ্টকর। দুপুরের কাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে আমাদের অনেক দিন লেগে গিয়েছিল।

চুনাপাথর সংগ্রহ করতে গিয়ে চোখের ওপর বেশি চাপ পড়ত। রোদ লাগত। ধুলাবালি প্রবেশ করত। তাই কয়েকদিন পর কর্তৃপক্ষের কাছে সানগ্লাস চাইলাম। কর্তৃপক্ষ দিতে অস্বীকার করল। এটা তারা দিবে না সেটা ভালো করেই জানতাম। কারণ পড়াশুনার জন্য চশমা চেয়েও তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। এমনকি চশমা থাকলেও সেটা দিয়ে পড়াশুনা করতে দেয়া হত না।

আমি কমান্ডিং অফিসারকে এ ব্যাপারে আপত্তির কথা জানালাম। বললাম পড়াশুনার সময় চশমা পড়ার অনুমতি না দেয়া বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কাজ হয়নি।

পরের কয়েক মাস আমরা বারবার সানগ্লাসের জন্য অনুরোধ জানালাম। নানা অনুনয়-বিনয় ও প্রতিবাদের পর সানগ্লাস পেতে আমাদের লেগেছিল তিন বছর। শুধু কাজের সময় এটা পরার অনুমতি ছিল সানগ্লাস অবশ্য আমাদের অনুরোধের কারণে দেয়া হয়নি। ডাক্তার আমাদের চোখ পরীক্ষা করে সানগ্লাস দেয়ার সুপারিশের পরই কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করে। সানগ্লাস অবশ্য আমাদেরকেই কিনতে হয়েছে।

আমাদেরকে সংগ্রামের পর সংগ্রাম করতে হয়েছে। সানগ্লাস, লম্বা ট্রাউজার, পড়াশুনার সুযোগ, ভাল খাবার– এসবই ছিল আমাদের সংগ্রামের ফল। প্রতিবাদের ফসল। আমাদের প্রতিবাদের কারণে জেলখানার সার্বিক অবস্থারও কিছুটা উন্নতি হয়েছিল।

কিছুদিন পরের কথা। খনিতে কাজ করছিলাম। বি সেকশনের কিছু খ্যাতনামা রাজনৈতিক বন্দীদেরকে এখানে নিয়ে আসা হল। নামিয়ে দেয়া হল কাজে। তবে আমাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের তেমন সুযোগ ছিল না। এদের মধ্যে এমকের অনেক নেতা ছিলেন। এরা ১৯৬৪ সালের জুলাইয়ে গ্রেফতার হন। তাদেরকেও নাশকতামূলক কর্মকান্ডের দায়ে শাস্তি দেয়া হয়। তাদের বিচারও 'লিটল রাইভোনিয়া ট্রায়াল' হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

তাদের মধ্যে ছিলেন ম্যাক মহারাজা, লালু শিবা, উইলটন এমকাবি। উইলটন এমকাবির সামরিক প্রশিক্ষক ছিলেন। আমাদের বিচারের পর তিনি হন এমকের কমান্ডিং ইন চিফ। তার সঙ্গে আমার একবার বৈঠকও হয়েছিল। লিবার্টি পার্টির নেতা এ্যাডি ড্যানিয়েলের বাসায় ওই বৈঠকটি হয়। ওই বৈঠকে একটি অপারেশন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা।

বি সেকশনের ওই কয়েদীদের সঙ্গে চুনাপাথর সংগ্রহের সময় আমরা যেন না মিশি সে ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দেয়া হল। তাদের প্রতি বিতৃষ্ণাভাব জাগানোর জন্য আমাদেরকে কিছু গালগল্প শোনানো হল। আমাদের সেলে পাঠানো এক আদেশ নামায় বলা হল– নতুন ওই কয়েদীরা জঘন্য অপরাধী। হত্যা, ধর্ষণ ও ডাকাতি মামলার আসামী। তাদের অনেকে বিগ ফাইভ, টুয়েন্টি এইট নামের ভয়ংকর সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সদস্য। তাই তাদের সাথে আমরা যেন না মিশি। কথা বার্তা না বলি। রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকি। কাজের ব্যাপারে সহযোগিতা না করি। খাবার ও পানি ভাগাভাগি না করি।

জেল কর্তৃপক্ষ যাদের গ্যাং লিডার, গ্যাং মেম্বার হিসেবে আমাদের কাছে তুলে ধরেছিল তাঁরা ছিলেন আসলে দেশপ্রেমিক। নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর। বি সেকশনের এই কথিত গ্যাং লিডাররা আলাদা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে চুনাপাথর আহরণ করত। একদিন কাজের ফাকে তারা গান গাওয়া শুরু করল। গান শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এ গানটি দেশাত্মবোধক গান।

আমাদের উদ্দেশ্যেই এটি লেখা হয়েছিল। বিচার চলাকালে এএনসি সদস্যরা এই গানটি রচনা করেছিল। গানের প্রথম কলি ছিল– রাইভোনিয়ায় তোমরা যা চেয়েছিলে...। পরের লাইনটি ছিল– তোমরা কি ভেবেছিলে দেশের ক্ষমতা তোমাদের হাতে যাচ্ছে...। অত্যন্ত সুন্দরভাবে আফ্রিকান ভাষায় তারা ওই গান গাচ্ছিল। গান শুনে প্রহরীরাও মজা পাচ্ছিল। তাদের ধারণা ছিল জেল কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করে গান গাওয়া হচ্ছে। আফ্রিকান ভাষা না বোঝায় তারা গানের মর্মার্থ বুঝতে পারেনি। তাই বারণও করেনি।

আমাদের অনেকে আগ বাড়িয়ে তাদের গান শুনতে চাইলেন। প্রহরীরা বাধা দিল। আমাদের গ্রুপের অনেকেই ভাল গান করতে পারত। তাই আমরাও দেশাত্মবোধক গান শুরু করলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে দুই গ্রুপের গান এক হয়ে গেল। সম্মিলিত কণ্ঠে ওই গান চলতে লাগল। এসব গান আমরা গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের সময় গাইতাম।

এরপর থেকে কাজ করার সময় আমাদের দুই গ্রুপ প্রায়ই গান গাইত। সব গানই ছিল দেশাত্মক ও রণসঙ্গীত জাতীয়। এসব গানের মর্মার্থ ছিল স্বাধীনতা, মুক্তি, গণমানুষের অধিকার।

গান আমাদের কাজকে খানিকটা হাল্কা করে দিল। কাজের সময় গান গাইলে সময় সহজে পার হয়ে যেত। আমাদের কয়েকজনের গলা এত ভাল ছিল যে, তাদের গান শুনতেই মনে চাইত। গ্যাং লিডাররা শেষে গানে আর পেরে উঠল না। আমরা গান ধরলে তারা চুপ হয়ে যেত। আমাদের গানই শুনত।

কিন্তু কারারক্ষীদের একজন কোজা ভাষা পুরোপুরি বুঝত। একদিন আমাদের গান শুনে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করলেন। এরপর থেকে গান গাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল। নীরবে কাজ করতে হত।

আমাদের মধ্যে একজন অরাজনৈতিক বন্দি ছিলেন। তার ডাক নাম ছিল জো মাই বেবি। তিনি অবশ্য পরবর্তীতে এএনসিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি জেলখানায় বিভিন্ন জিনিসপত্র পাচারে সাহায্য করতেন। তার ভূমিকা আমাদের অনেক কাজে এসেছিল।

বোগারত নামের বন্দিকে একদিন কারারক্ষীরা নির্মমভাবে পেটাল। প্রহারে তার মুখ কেটে গেল। মাথা ফেটে গেল। তিনি বারান্দায় অত্যাচারের পুরো বিবরণ দিলেন। আমাকে সাহায্যের অনুরোধ জানালেন। আমি তৎক্ষণাৎ বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে মনস্থ করলাম।

আমি পুরো ঘটনার রিপোর্ট হেড অফিসে জানাবার উদ্যোগ নিলাম। এমন সময় শুনতে পেলাম প্রহরীরা প্যাকের এক সদস্যকেও নির্মমভাবে পিটিয়েছে। তার

নাম গান ইয়া। আমি আইনজীবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম। বন্দি নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে কমিশনারকে চিঠি লিখলাম। এরপর আমাকে হেড অফিসে ডেকে পাঠানো হল। অফিসের কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হলাম। কয়েকজন কর্মকর্তা নির্যাতনের বিষয়টি অস্বীকার করলেন। আমি জোর দিয়ে বললাম গানইয়াসহ আরেকজন বন্দিকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে।

যে কারারক্ষী এ কাজ করে তাকে অবশ্যই এ দ্বীপ থেকে বহিষ্কার করতে হবে। কর্মকর্তারা বললেন, তোমার অভিযোগের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। একথা বলে আমাকে সেলে ফেরত পাঠানো হল। কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যেই নির্যাতনকারী ওই কারারক্ষীকে রোবেন দ্বীপ থেকে অন্যত্র বদলি করা হয়।

৬৫

১৯৬৫ সালের গ্রীষ্মের এক সকালে নাস্তা খেতে গিয়ে অবাক হলাম। নাস্তার ধরণ ছিল অন্য দিনের তুলনায় বেশ উন্নত। সেদিন রুটির সাথে মাংস ছিল। দুপুরের খাবারেও একই অবস্থা। ভাতের সঙ্গে ছিল মাংস মাছ। রান্নাও ছিল বেশ মজাদার। পরের দিন সবাই নতুন জামা-কাপড় পেলাম। কারারক্ষীদের আচার ব্যবহার নমনীয় মনে হল। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছিল কিছু একটা হতে যাচ্ছে। কোন কারণ ছাড়া কর্তৃপক্ষ এসব করছে না। একদিন পর জানতে পারলাম আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সদস্যরা রোবেন দ্বীপে আসছেন। আমাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখাই তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য।

অন্য পরিদর্শনের চেয়ে রেডক্রসের পরিদর্শনটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হল। আন্তর্জাতিক রেডক্রস একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংস্থা। এর প্রভাব খুব বেশি। জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্ব রেডক্রসের রিপোর্টকে খুবই গুরুত্ব দেয়।

জেল কর্তৃপক্ষও রেডক্রসকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মনে মনে আশঙ্কা হল, রেডক্রসের সর্বব্যাপী গুরুত্বই হয়ত আমাদের ভোগাবে। কর্তৃপক্ষ তাদেরকে দ্বীপটি হয়তো ভালো করে দেখার সুযোগ দিবে না। ছলচাতুরীর আশ্রয় নেবে। আমাদের প্রকৃত অবস্থা তাদের কাছে যেন পৌঁছতে না পারে সে উদ্যোগ নিবে। রেডক্রসের তদন্ত কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিন্দার ভয়ে কর্তৃপক্ষ ছল চাতুরি থেকে সরে আসে।

ওই সময় আমাদের অভিযোগ শোনা এবং এর প্রতি সাড়া দেয়ার মত একমাত্র আন্তর্জাতিক সংগঠন ছিল এই রেডক্রস। তাই আমাদের কাছে এর গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কথা বরাবরই অগ্রাহ্য করত। শুনেও না শোনার ভান করত। প্রতি শনিবার সকালে প্রধান কারারক্ষী আমাদের সেকশনে

আসতেন। সবাইকে একসঙ্গে জড়ো করে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড় করাতেন। পর পর একে একে সবার কাছ থেকে তাদের অভিযোগ ও অনুরোধ শুনতেন।

আমরা একজনের পর একজন তার কাছে যেতাম। খাবার, কাপড়-চোপড়, আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সংক্রান্ত নানা অভিযোগ করতাম। প্রধান কারারক্ষী তা শুনতেন। যাও, বলে পরের জনকে ডাকতেন। আমাদের অভিযোগগুলি তিনি শুনতেন। আর অন্য কান দিয়ে বের করে দিতেন। কোন অভিযোগ খাতায় লিপিবদ্ধ করতেন না। আমাদের সংগঠন সম্পর্কে বলতে চাইলে তিনি খেপে যেতেন। বলতেন এএনসি বা প্যাকের কথা বলা যাবে না।

আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সদস্যরা রোবেন দ্বীপে আসার আগে আমরা বিভিন্ন দাবি দাওয়ার একটি তালিকা কারা কমিশনার বরাবর লিখি। সে সময় আমাদেরকে শুধু চিঠি লেখার জন্য কাগজ ও কলম দেয়া হত। এটি লিখতে সেই কাগজ কলম ব্যবহার করা হল। খনিতে কাজ করার সময় একত্রে শলা পরামর্শ করে আমরা এ তালিকা তৈরি করি। প্রধান কারারক্ষীর বরাবর তালিকাটি পেশ করি। তিনি এটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তালিকা প্রস্তুত করে আমরা জেলের নিয়ম ভঙ্গ করেছি বলে উল্লেখ করেন।

রেডক্রস প্রতিনিধি দল দ্বীপে আসার পর তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে ডাকা হয়। ওই দলের নেতা ছিলেন মিস্টার সেন। তিনি ছিলেন সুইডেন কারাগারের সাবেক প্রধান। মধ্যবয়সী সেন স্বল্পভাষী শান্ত ও ধীরস্থির প্রকৃতি গোছের লোক ছিলেন। কথার সময় আশপাশে লোক থাকলে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। তাই আমরা মোটামুটি একান্তেই কথা বলি। এই প্রথম কোন পরিদর্শকের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নজরদারি ছাড়া আলাপের সুযোগ হল। মিস্টার সেন আমার সব অভিযোগের কথা শুনলেন। গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখে নিলেন। জেলের সার্বিক অবস্থা সুন্দরভাবে তুলে ধরার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানালেন।

রেডক্রস প্রতিনিধি দলের নেতার কাছে আমি অনেক ব্যাপারে অভিযোগ করি। এর মধ্যে অন্যতম ছিল পোশাক। তাকে জানাই, আমরা শর্ট ট্রাউজার পরে অভ্যস্ত নই। আমাদের আন্ডারওয়্যারসহ সবধরণের জামাকাপড় প্রয়োজন। পরে আমাদেরকে চাহিদা অনুসারে জামা কাপড় দেয়া হয়। খাবার-দাবার, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, পড়াশুনা, চিঠি, ব্যায়াম, ভারী কাজ ও কারারক্ষীদের রূঢ় আচরণ সম্পর্কে মিস্টার সেনের কাছে অভিযোগ পেশ করি। এগুলো সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাই। আমি জানতাম কর্তৃপক্ষ কখনই আমাদের এ দাবিগুলো মেনে নেবে না। কারাগারকে তারা বাড়িতে পরিণত করবে না।

আমার সঙ্গে বৈঠকের পর মিস্টার সেন কারা কমিশনার ও কারাগারের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। আমি অন্যত্র বসা ছিলাম। ওই বৈঠকের ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। বৈঠক শেষে মিস্টার সেন আমাকে জানান, আমাদের দাবিগুলো তিনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছেন। তবে মিস্টার সেনকে কেন যেন বর্ণবাদী ধাঁচের মনে হল।

তার কথাবার্তায় সে ধরণের ভাব ফুটে উঠেছিল। আমি মিস্টার সেনকে বলেছিলাম, আফ্রিকান বন্দীদের নাস্তার সময় রুটি দেয়া হয় না। এর বদলে দেয়া হয় তরল পায়েস। জবাবে সেন বলেছিলেন, মিস্টার ম্যান্ডেলা, রুটি তোমাদের দাঁতের জন্য ক্ষতিকর। তাই আগে দাঁত শক্ত কর। এরপর রুটির বিষয়টি দেখা যাবে। আপাতত পায়েসই চলুক।

রেডক্রস পরে আরো অনেক প্রতিনিধি দল পাঠায়। তারা ছিলেন মিস্টার সেনের চেয়ে উদার ও নমনীয়। বন্দিদের হয়ে তারা লড়েছেন। রেডক্রস সব সময় আমাদের পক্ষে লড়াই করেছে। এতে তেমন কাজ না হলেও রেডক্রসের এই ভূমিকা ছিল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আসতে অসমর্থ বন্দিদের স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনদের রেডক্রস টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করত।

রোবেন দ্বীপে পাঠানোর পর আমাদের সমর্থকদের মধ্যে এমন ধারণা জন্মে যে আমাদেরকে এখানে পড়াশুনা করতে দেয়া হবে না। বিষয়টি নিয়ে তারা খুব উদ্বিগ্ন ছিল। দ্বীপে পৌছার কয়েক মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে আমরা যারা পড়াশুনা করতে চাই তাদেরকে দরখাস্ত করতে হবে। অনুমতি মিললে তবেই বই পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা যাবে।

অধিকাংশ বন্দিই এ ব্যাপারে দরখাস্ত করে। ডি গ্রুপের বন্দিসহ সবাইকে পড়াশুনার অনুমতি দেয়া হয়। রাইভোনিয়া বিচারের পর কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছিল আমাদেরকে পড়াশুনার অনুমতি দিলে তাদের তেমন ক্ষতি হবে না। পরে তারা এর জন্য অনুতপ্ত হয়। কারণ জেলখানায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশুনার অনুমতি না থাকলেও বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমি ওই শ্রেণীতে পড়াশুনা করেছিলাম।

আমাদের বিভাগে বেশ কয়েকজন বন্দি ছিলেন বি এ ডিগ্রীধারী। তাদের অনেকের ইউনিভার্সিটিতে রেজিস্ট্রেশন করা ছিল। খুব অল্প কয়েকজন ছিল যাদের স্কুল পর্যায়েরও কোন সার্টিফিকেট ছিল না। গোভান এমবেকি, নেভিল আলেকজান্ডারসহ আরো কয়েকজন ছিলেন বেশ উচ্চশিক্ষিত। রাতে আমরা একযোগে পড়াশুনা করতাম। তখন সেলটিকে মনে হত ক্লাস রুমের মত।

জেলখানায় কিছু কিছু বিষয়ে পড়াশুনার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। রাজনীতি, বিজ্ঞান ও সামরিক ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়গুলি ছিল নিষিদ্ধ। বইপত্র কেনার

জন্য আমাদেরকে বাড়ি থেকে টাকা নিতে দেয়া হত না। অন্য কয়েদির কাছ থেকে বই পত্র ধার নেয়াও ছিল নিষিদ্ধ। তাই পড়াশুনার বিষয়টি নানাভাবে হোঁচট খায়।

আমরা পড়াশুনা করব কিনা এ নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। আমাদের দলের কেউ কেউ মনে করতেন, পড়াশুনা করে কোন লাভ নেই। তাই এটি না করাই উচিত। আমি মনে করতাম, রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। তাই পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই।

বন্দিদের দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও র‍্যাপিড রেজাল্ট কলেজে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এখানে যারা রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন স্কুল-কলেজ পর্যায়ের ডিগ্রিধারী। আমি অবশ্য পড়াশুনা করতাম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। বইপত্র তারাই পাঠাত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সব বই পড়ার অনুমতি দিত না।

পড়াশুনার জন্য প্রয়োজনীয় বই পত্র পাওয়া ছিল আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। বইয়ের জন্য বিশেষ করে আইনের বইপত্রের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার সুযোগ ছিল। তারা আবেদন পরীক্ষা করে ডাকযোগে বইপত্র পাঠাতো। কিন্তু ডাক বিভাগের গড়িমসি এবং জেল কর্তৃপক্ষের টালবাহানার কারনে সে বই পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যেত। অনেক সময় প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর বই হাতে পৌঁছাত। দেরিতে বই নিলে বন্দিদের জরিমানা দিতে হত।

বইপত্র ছাড়া বিভিন্ন প্রকাশনার জন্যও আমরা ফরমায়েশ দিতে পারতাম। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত কঠোর। ত্রৈমাসিক ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী পড়তে দেয়া হত। আমাদের সেলের বন্দি ম্যাক মহারাজা অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনা করতেন। তিনি একবার সাপ্তাহিক ইকনোমিস্ট পত্রিকার জন্য ফরমায়েস দিলেন। এটা শুনে আমি বললাম, তাহলে আমরা টাইম ম্যাগাজিনের জন্য ফরমায়েশ দিব। কারণ ইকনোমিস্টের মত টাইমও সাপ্তাহিক পত্রিকা। ম্যাক হেসে বললেন, কর্তৃপক্ষ জানে না ইকনোমিস্ট একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। তাদের ধারণা এটি অর্থবিষয়ক সাময়িকী অথবা বই। ম্যাকের ধারণাই সত্যি হল। এক মাসের মধ্যে ইকনোমিস্টের কপি পেলাম। দীর্ঘ দিন পর বিভিন্ন খবর পড়তে সক্ষম হলাম। আমরা তখন বহির্বিশ্বের খবরাখবর জানার জন্য তৃষ্ণার্ত ছিলাম। কিন্তু অচিরেই কর্তৃপক্ষের ভুল ভাঙল। তারা এটি দেয়া বন্ধ করে দিল।

মেঝেতে পড়াশুনা করতে গিয়ে আমাদের অনেক অসুবিধা হত। পড়াশুনার জন্য ন্যূনতম যে সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন সেগুলো দেয়ার জন্য দাবি জানালাম। আমি কর্তৃপক্ষের কাছে চেয়ার টেবিল চাইলাম। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কাছেও এ

দাবি পুনর্ব্যক্ত করলাম। পরে কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক সেলে দাঁড়িয়ে পড়া যায় এমন ডেস্ক তৈরি করে দেয়। এটা ছিল কাঠের তৈরি।

ডেস্কে দাঁড়িয়ে পড়াশুনা করা ছিল কষ্টকর। তাই এ ব্যাপারে অভিযোগ উঠতে শুরু করল। ক্যাথিতো ডেস্কের ব্যাপারে ছিলেন ভয়াবহ ক্ষুব্ধ। তিনি কমান্ডিং অফিসারকে ব্যাপারটি অবহিত করলেন। বললেন, ডেস্কে পড়তে তাদের কষ্ট হয়। ৬ মাস পর তিন পাওয়ালা এক ধরণের বিশেষ ডেস্ক দেয়া হল যেটির ওপর বই রেখে বসে পড়া যেত।

কারারক্ষীদের স্বৈরাচারী আচরণে আমরা ছিলাম অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। নিয়মভঙ্গের অভিযোগ এনে তারা প্রায়ই কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করত। আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হত। সেল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্জনে রাখা হত বা খাবার কম দেয়া হত। নিয়ম অনুযায়ী বন্দিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তাকে জেলে কর্মরত ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হয়। আমাদের ছোটখাট বিচার করার জন্য কেপটাউন থেকে একজন ম্যাজিস্ট্রেটও আনা হত। আমাদেরকে মাঝে মধ্যে তার সামনে হাজির করা হলেও কিছু বলতে দেয়া হত না। কারারক্ষীদের কথাই শোনা হত। ফলে বিচার হত এক পেশে। বিষয়টি আমি আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কাছে তুলে ধরলে এ অবিচারের কিছুটা প্রশমন হয়।

রোবেন দ্বীপে আমাদের এক বছর পূর্ণ হল। আধ ঘণ্টার ব্যায়াম ছাড়া সারাদিন আমাদের সেলে রাখা হল। ব্যায়াম শেষে সেলে ফিরে এসে দেখি সেলের শেষ প্রান্তে একটি পত্রিকা। মনে হল আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল কোন কারারক্ষী পত্রিকাটি রেখে গেছে। মনের ভুলে নয়, ইচ্ছা করে সে এ কাজ করেছে।

রাজনৈতিক বন্দীদের কাছে জেলখানায় স্বর্ণ বা ডায়মন্ডের চেয়েও একটি পত্রিকা ছিল বেশি মূল্যবান। রোবেন দ্বীপে সুস্বাদু খাবার, সিগারেট বা দামী পোশাকের চেয়েও আমাদের কাছে প্রিয় ছিল পত্রিকা।

পত্রিকা হচ্ছে ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্রের দর্পণ। এতে সব কিছু প্রতিফলিত হয়। তা সত্ত্বেও আমাদেরকে কোন পত্রিকা পড়তে দেয়া হত না। শুধু তাই নয়, আমরা যাতে কিছু পড়তে না পারি সে জন্য কর্তৃপক্ষ রাতে সেলের সব আলো নিভিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করল। বহির্বিশ্ব আমাদের নিয়ে চিন্তিত, আমাদের জন্য বাইরে অনেক আন্দোলন হচ্ছে– এমন খবর পড়লে আমাদের মনোবল বেড়ে যাবে। কর্তৃপক্ষ এটা চাইত না।

সংবাদপত্র পড়ার অধিকার আদায়ের জন্য আমরা সংগ্রাম করতে মনস্থ করলাম। বিগত বছরে সংগ্রাম করে অনেক দাবি দাওয়া আদায় করেছি। তাই এ দাবিটিও আদায় করতে পারব বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আমরা সংবাদপত্র পাওয়ার দাবি আদায়ে শেষ পর্যন্ত সক্ষম হলাম না। তাই বিকল্প পথ অনুসরণের

সিদ্ধান্ত নিলাম। সেটা হল ঘুষ। কারারক্ষীরা বেতন কম পেত। অর্থের টানাটানি তাদের ছিল। তাদের এই দারিদ্র ছিল আমাদের জন্য মস্ত বড় সুযোগ।

কারারক্ষীদের ঘুষ দিয়ে পত্রিকা সংগ্রহ শুরু করলাম। আমাদের হাতে বা চারপাশে পত্রিকা পাওয়াটা ছিল বিপজ্জনক। কারো হাতে পত্রিকা পাওয়া গেলে গুরুতর অভিযোগ আনা হত। এজন্য আমরা সবাই পত্রিকা না পড়ে যে কোন একজন পড়তাম। এরপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সবাইকে জানিয়ে দিতাম। অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ খবর কেটে রাখতাম। সেটা হাতবদল করতাম। বিভিন্ন তথ্য টুকে রাখতাম। সেগুলো অন্যদের জানিয়ে দিতাম। পত্রিকা কখনই এক সঙ্গে জড়ো করে পড়তাম না। ক্যাথি পড়ে আমাকে দিত, আমি দিতাম মহারাজকে– এভাবে হাত বদল হত। জেলে কর্তৃপক্ষের আনাগোনা যখন কম থাকত তখন ম্যাক অথবা ক্যাথি পত্রিকা থেকে নানা তথ্য নোট করে রাখতেন। এরপর সুযোগ বুঝে পত্রিকাটি দুমড়ে মুচড়ে আমাদের পায়খানার বাক্সে ফেলে দিতাম। এখানে কেউ চেক করতে আসত না।

পত্রিকা দেখলে আমার হুঁশ থাকত না। সেলের বারান্দার বেঞ্চের নিচে পত্রিকা দেখামাত্র আমি সেল থেকে বের হয়ে বারান্দায় চলে আসতাম। পায়চারি শুরু করতাম। কাউকে না দেখলে ছোঁ মেরে পত্রিকাটি নিয়ে সেলে চলে যেতাম। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে পত্রিকা পড়া শুরু করতাম। কতক্ষণ পত্রিকা পড়তাম তা আমি নিজেও জানতাম না। এ সময় কারো পায়ের শব্দও আমি শুনতাম না।

একদিন উর্ধ্বশ্বাসে পত্রিকা পড়ছিলাম। কারো পায়ের শব্দ কানে আসল না। হঠাৎ একজন অফিসার আমার হাত ধরে ফেললেন। বললেন, ম্যান্ডেলা তুমি জেলের নিয়ম ভঙ্গ করেছ। এজন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। দুজন কারারক্ষী আমার সেলে তন্ন তন্ন করে তল্লাসি শুরু করল। আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা সেটা দেখল।

দু'দিনের মধ্যে কেপটাউন থেকে একজন ম্যাজিস্ট্রেট আনা হল। আমাকে জেলখানার হেড অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। ম্যাজিস্ট্রেট আসলেন। কর্তৃপক্ষ তাদের অভিযোগ পেশ করল। আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ দেয়া হল না। ম্যাজিস্ট্রেট রায় ঘোষণা করলেন। আমাকে তিনদিন সম্পূর্ণ একাকি একটি রুমে রাখার আদেশ দিলেন। এ সময় কোন খাবার দাবার না দেয়ারও নির্দেশ দিলেন। কিভাবে আমি পত্রিকা পেলাম সেটা কর্তৃপক্ষ জানতে চাইল। কোন উত্তর দিলাম না।

বিচ্ছিন্ন করে রাখার সেলটি একই কমপ্লেক্সে ছিল। তবে অন্য সেকশনে। জেলখানার খোলা মাঠের শেষ প্রান্তে ছিল রুমটি। এখানে এক রুমে একজনকে আটক রাখা হত। বিচ্ছিন্ন রাখা অবস্থায় কারো সাথে কোন যোগাযোগ করা যেত না। বাইরে এসে ব্যায়াম করতে দেয়া হত না। এমনকি খাবার পর্যন্ত দেয়া হত না। তিন দিনে তিনবার চালের গুড়ি মেশানো পানি দেয়া হত যেটা ছিল অনেকটা ভাতের মারের মত।

নির্জনে একাকি থাকার প্রথম দিনটি ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। খুবই অস্বস্থিতে ছিলাম। প্রথম দিন ক্ষুধায় কষ্ট পেলাম। দ্বিতীয় দিনটা কোনমতে কেটে গেল। তেমন একটা কষ্ট লাগল না। কষ্ট হলেও তৃতীয় দিনেও তেমন একটা অসুবিধা হল না। তাছাড়া না খেয়ে থাকার একটা অভ্যাস আমার ছিল। আফ্রিকানদের অনেকেরই এ অভ্যাস আছে। ছোট বেলায় জোহান্সবার্গে অনেক দিন না খেয়ে থেকেছি।

না খেয়ে থাকার কষ্টের চেয়ে একাকি থাকার কষ্টটা অনেক বেশি। এর কোন শেষ বা শুরু নেই। এখানে নিজের ভুবনে নিজেকে বিচরণ করতে হয়। নিজের সাথে নিজের যোগাযোগ করতে হয়। নিজের কথা নিজেকেই শুনতে হয়। প্রশ্ন নিজের কাছ থেকে উত্থাপিত হয়। উত্তরও নিজেকেই দিতে হয়। তাই নির্জন তিন দিন থাকাটা আমার জন্য ছিল বলতে গেলে দুঃসহ।

মানুষের শরীর খুব অদ্ভুত। বড়ই বিচিত্র। যে কোন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা তার আছে। যে বোঝা স্বাভাবিকভাবে বহন করা যায় না ঠেকায় পড়লে সেটা অনায়াসে ঠিকই বহন করা যায়। প্রতিকূল পরিবেশে অনেক সময় ক্ষুধাকে ক্ষুধাই মনে হয় না। তৃষ্ণাকে তৃষ্ণা মনে হয় না। এটাকেও তখন স্বাভাবিক মনে হয়।

আস্তে আস্তে জেলখানায় নির্জনে থাকাটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। কারণ পান থেকে চুন খসলেই শাস্তি হিসেবে আমাদের নির্জন কারাবাস দেয়া হত। অর্থাৎ একাকি এক রুমে কয়েকদিন খানা পানি ছাড়া আটকে রাখা হত।

আমাকে এরপর আরেকবার নির্জন কারাবাস দেয়া হয়। প্রথমটার তুলনায় দ্বিতীয়বার শাস্তির পরিমাণ ছিল কম।

কারা কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল কাউকে একাকি নির্জন জায়গায় তালাবদ্ধ করে রাখলে তার মনের শক্তি কমে যায়। প্রতিবাদ করার সাহস হারিয়ে ফেলে সে। কিন্তু আমরা সেটি ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে দেই।

একবার আউকাম্প আমাদের সেল পরিদর্শনে আসলেন। তার আগমন উপলক্ষে আমাদের সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে বলা হয়। আমাদের পরিচয়পত্র তুলে ধরতে নির্দেশ দেয়া হল। এ সময় কথাবার্তা বলা ছিল সম্পূর্ণ নিষেধ। কিন্তু আমি এসবের তোয়াক্কা না করে সঙ্গীদের সাথে কথা বলতে থাকি। আমার উদ্দেশ্য ছিল কারারক্ষীদের এটাই বুঝিয়ে দেয়া যে শাস্তি দিয়ে কারও মনের জোর নষ্ট করা যায় না।

আমি দুজনের সামনে চলে আসলাম। কমান্ডিং অফিসার বললেন, ম্যান্ডেলা তুমি তোমার জায়গায় চলে যাও। কেউ তোমাকে সামনে আসতে বলেনি। আমি বললাম, আমি এখানেই থাকব। পেছনে যাব না। আউক্যাম্প আসলে কথা বলবো। কমান্ডিং অফিসার খেপে গেলেন। আমাকে সরিয়ে দিতে তিনি গার্ডদের নির্দেশ দিলেন। আমার বিরুদ্ধে ফের শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হল।

৬৬

যে কোন বন্দির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আইনমন্ত্রী, কারাকমিশনার বা কারাপ্রধান নন। বরং সেলের দায়িত্বে নিয়োজিত কারারক্ষীরাই তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রচণ্ড শীতের সময় একজন বন্দীর যদি অতিরিক্ত একটি কম্বলের প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি সেটির জন্য বিচার মন্ত্রণালয়ে আবেদন জানাতে পারেন। কিন্তু এতে সাড়া পাওয়া যাবে না।

স্বয়ং কারাকমিশনারের কাছে গিয়ে ওই আবদার জানালে তিনি বলবেন, দুঃখিত। আপনার অনুরোধ কারানিয়মের পরিপন্থি। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আপনাকে অতিরিক্ত একটি কম্বল দিতে পারলাম না। কারাপ্রধান বলবেন, তোমাকে অতিরিক্ত একটি কম্বল দিলে জেলের সব কয়েদিকে একটি করে দিতে হবে। কিন্তু সেলের কারারক্ষীকে কোনভাবে ম্যানেজ করতে পারলে, তার সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে সে ওই কাজটি খুব সহজে করে দিবে। তাকে কম্বলের কথা বললে, সে চলে যাবে স্টকরুমে। এরপর সুবিধামত আপনার সেলে কম্বলটি রেখে যাবে।

আমার সেকশনের কারারক্ষীদের সঙ্গে আমি সবসময় রুচিসম্মত ও মার্জিত ব্যবহার করতাম। তাদের নানা গুণের প্রশংসা করতাম। কারারক্ষীদের কাউকেই আমি শত্রু হিসেবে গণ্য করতাম না। এএনসির অন্যতম দলীয় আদর্শ ছিল মানুষকে শিক্ষা দেয়া। সে যদি শত্রু হয় তবুও তাকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আমাদের বিশ্বাস ছিল সব মানুষ এমনকি জেলের রক্ষীরাও পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তাই সবাইকে শিক্ষিত করার সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে।

সচরাচর কারারক্ষীরা আমাদের সঙ্গে যে ধরণের আচরণ করত আমরাও তাদের সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করতাম। কেউ আমাদের সম্মান করলে আমরাও তাকে সম্মান করতাম। কারারক্ষীদের সবাই অবশ্য জানোয়ারের মত ছিল না। কিছু ভালোও ছিল। এদের প্রতি প্রথম দিক থেকেই আমাদের সুদৃষ্টি ছিল।

আমাদের সঙ্গে তারা যথেষ্ট ভালো আচরণ করত। সব ব্যাপারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখত। তবে কারারক্ষীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখাটা ছিল খুবই

কঠিন কাজ। অধিকাংশ কারারক্ষী ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির। মানবিকতা বুঝত না। সর্বোপরি কালোদের তারা দেখতে পারত না। কৃষ্ণাঙ্গদের সব সময় ঘৃণা করত।

খনি এলাকায় একজন কারারক্ষী ছিল। সে সব সময় আমাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করত। নানা সমস্যার সৃষ্টি করত। তার ব্যবহার ছিল খুবই রূঢ়। কাজ করার সময় কথা বলার সুযোগ দেয়াটা ছিল আমাদের জন্য বড় রকমের একটি পাওনা। ওই ব্যাটা আমাদের কথা বলতে দিত না। একদিন আমি কয়েকজন সঙ্গীকে বললাম, তোমরা ওর সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা কর। ও যাতে আমাদের কথা বলার সময় বাম হাত দিতে না পারে। কিন্তু কাজ হল না। আমরা বন্ধুত্ব করতে চাইলেও সে তা করত না। উল্টো অমানবিক আচরণ করত। একদিন কাজ করার সময় সে আমাদের এক সঙ্গীর গা থেকে জ্যাকেটটি খুলে নিল। এরপর সেটি ঘাসের ওপর বিছিয়ে বসল। আরেকদিন দুপুরের একটি স্যান্ডউইচ সে আমাদের হাতে না দিয়ে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। এই ছিল তার বন্ধুত্বের নমুনা।

বুঝলাম স্যান্ডউইচটি মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে সে আমাদের সঙ্গে পশুসুলভ আচরণ করছে। স্যান্ডউইচটি ঘাস থেকে নেয়াটা মর্যাদার হানিকর মনে করলাম। সে সময় আমরা ছিলাম অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। তাই সেটির লোভও সংবরণ করতে পারছিলাম না। ভাবলাম স্যান্ডউইচটি নিলে তার মনের অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। এইভেবে আমি স্যান্ডউইচটি ঘাসের ওপর থেকে তুলে নিলাম।

আমার কৌশল কাজে আসল। আস্তে আস্তে সে নমনীয় হতে শুরু করল। দু' একটা কথা বলা শুরু করল। ওই কারারক্ষী এরপর থেকে প্রায়ই এএনসি সম্পর্কে জানতে চাইত। জেলখানায় যারা কাজ করে সরকার তাদের ব্রেনওয়াশ করে দেয়। তার সঙ্গে কথা বলে তেমনটি মনে হল। তার ধারণা ছিল, আমরা সন্ত্রাসী। দেশকে জাহান্নামে পাঠানোই ছিল আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু তাকে যখন বললাম, আমরা বর্ণবাদী নই। জাতিগত বিভেদে বিশ্বাস করি না। মানুষের সমান অধিকার আদায় করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য, তখন তার ভুল ভাঙ্গল।

রোবেন দ্বীপের কারারক্ষীদের সহানুভূতি আদায় করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়া ছিল আমাদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে যোগাযোগ সুবিধা আদায় করে নেয়া ছিল আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। এফ ও জি গ্রুপের সাধারণ বন্দিদের মধ্যে এএনসির নীতি ও আদর্শ ছড়িয়ে দেয়াটাকে আমাদের কর্তব্য বলে মনে করলাম। তাই রাজনীতিবীদ হিসেবে বাইরের মত জেলেও দলের জন্য কাজ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হলাম। এছাড়া আমাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া ও অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরার জন্যও সব সেকশনের বন্দিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা ছিল জরুরী। সবচেয়ে বেশি বন্দি ছিল জেনারেল সেকশনে। এখানে বন্দিদের আসা যাওয়া বেশি হত। নতুন বন্দি

আসত। শাস্তি শেষে অনেকে জেলখানা থেকে চির বিদায় নিত। সমকালীন তথ্য থাকত এই সেকশনের বন্দিদের কাছেই। বাইরে আন্দোলন কিভাবে চলছে সেটাও তারা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল জানত।

এক সেকশনের বন্দিদের সঙ্গে আরেক সেকশনের বন্দিদের যোগাযোগ করা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। তা সত্ত্বেও কিভাবে জেনারেল সেকশনের বন্দিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় সে ব্যাপারে আমরা পরিকল্পনা করতে থাকি। যেসব কারারক্ষীরা ড্রামে করে আমাদেরকে খাবার দিয়ে যেত তারা ছিল জেনারেল সেকশনের কারারক্ষী। এই কারারক্ষীদের কিভাবে ম্যানেজ করা যায় তার উপায় খুঁজে বের করতে আমরা একটি কমিটি গঠন করলাম। এতে ক্যাথি, ম্যাক মহারাজা, লালু শিবাকে রাখা হল।

অন্য বন্দিদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রথম কৌশলটি উদ্ভাবন করলেন ক্যাথি ও ম্যাক। তারা লক্ষ্য করলেন, কারারক্ষীরা প্রায়ই দিয়াশলাইয়ের খালি বাক্স ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

খালি বাক্সের তলানিতে চিঠি লিখে সেটি এক সেলে থেকে অন্য সেলে পাঠিয়ে দিতে মনস্থ করলেন তারা। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে খুব গোপনে তারা দিয়াশলাইয়ের খালি বাক্স সংগ্রহ করতে লাগলেন। লালু শিবা ভালো দরজির কাজ জানতেন। তিনি বাক্সগুলোর ভেতরের অংশ খুলে ফেলতেন। এরপর আমাদের লেখা ছোট চিঠি সে অংশে লাগিয়ে দিতেন। সাধারণ বন্দীরা যে অংশে চলাচল করত দিয়াশলাইগুলো সেখানে ফেলা হত। খাবার সংগ্রহের সময় আমরা জেনারেল সেকশনের বন্দিদের আমাদের এই পরিকল্পনার কথা ফিস ফিস করে জানিয়ে দিতাম। তারাও সুযোগ বুঝে ওই দিয়াশলাই তুলে নিত।

একই কায়দায় তারাও আমাদেরকে খবরাখবর জানাত। আমাদের তথ্য আদান প্রদানের এই পরিকল্পনা ভালো কাজে আসল। অসুবিধা হত বৃষ্টি হলে। তখন দু পক্ষের দিয়াশলাই বাক্সই ভেসে যেত।

জেনারেল সেকশনের বন্দিরা রান্নাঘরে যাবার সুযোগ পেত। তারা প্রায়ই চিঠি বা নোট লিখে প্লাস্টিকের কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে খাবারের ভিতরে ঢুকিয়ে দিত। একইভাবে আমরাও ওই প্লাস্টিক ব্যবহার করে লিখিত চিঠি মুড়িয়ে খাবারের খালি ডিশ ও ঝুটা অংশের সাথে রেখে দিতাম। এভাবে তথ্য আদান-প্রদান চলতে থাকল।

আমাদের টয়লেট ও গোসলখানার সঙ্গে ছিল বন্দিদের একাকি রাখার কক্ষটি। যেসব বন্দি অপরাধ করত তাদেরকে একাকি ওইসব নির্জন সেলে রাখা হত। আমরা যে টয়লেট ব্যবহার করতাম তারাও ওই একই টয়লেট ব্যবহার করত। আমরা কাগজে চিঠি লিখে প্লাস্টিকে মুড়িয়ে টয়লেটে রেখে দিতাম। এই চিঠি সংশ্লিষ্ট বন্দি পরে জেনারেল সেকশনে নিয়ে যেত।

আমাদের নোট বা চিঠি লিখলেও কর্তৃপক্ষ তা বুঝত না। আমরা বিশেষ সাংকেতিক ভাষায় চিঠি লিখতাম। আফ্রিকান ভাষা ব্যবহার করতাম। অনেক সময় দুধ দিয়ে চিঠি লিখতাম। সাদা কাগজে দুধ দিয়ে চিঠি লিখলে সাধারণভাবে চোখে পড়ত না। কিন্তু শুকানোর পর কাগজটা একটু ঘোরালে ফেরালে ওই লেখা বোঝা যেত। দুধ দিয়ে চিঠি লেখা ছিল সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমাদের সব সময় দুধ দেয়া হত না।

টয়লেট পেপারেও আমরা নোট লিখতাম। এ কাগজ সাইজে ছোট। সহজে গুটিয়ে রাখা যায়। সুবিধামত সময়ে অন্যের কাছে হস্তান্তর করা যায়। টয়লেট পেপারে লেখালেখির বিষয়টি জানার পর কর্তৃপক্ষ এটি দেয়া কমিয়ে দেয়। প্রত্যেক বন্দিকে তখন মাত্র ৮টি করে টয়লেট পেপার দেয়া হত।

তথ্য সংগ্রহের আরেকটি সহজ পন্থা ছিল কাউকে হাসপাতাল পাঠানো। কেউ কোনভাবে রোবেনদ্বীপের হাসপাতালে ভর্তি হতে পারলে অনেক খবর সংগ্রহ করতে পারত। কারণ হাসপাতালে বিভিন্ন সেকশনের বন্দিদের একই ওয়ার্ডে রাখা হত। তখন বি সেকশনের বন্দিরা এফ ও জি সেকশনের বন্দিদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারত। দেশের সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে, রাজনীতি সম্পর্কে অনেক খবরাখবর পেত।

বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পথ ছিল দুটি। শাস্তির মেয়াদ শেষে যেসব বন্দি বাইরে চলে যেত তাদের কাছ থেকে অন্যেরা আমাদের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানতে পারত। পরিদর্শক বা আত্মীয়স্বজনরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলে তাদের কাছ থেকে আমরা দিন-দুনিয়ার খবর জানতে পারতাম। যেসব বন্দীরা শাস্তির মেয়াদ শেষে চলে যেত তাদের কাছে আমরা গোপনে চিঠি দিয়ে দিতাম। এসব চিঠি তাদের জামা বা মাল পত্রের ভিতরে লুকানো থাকত। বাইরে থেকে যারা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তাদের সঙ্গেও চিঠির লেনদেন হত। কথা বলার সময় কারারক্ষীরা কাছে থাকত না। এ সময় আমরা আইনজীবীদের কাছে চিঠি দিয়ে দিতাম। তারাও বাইরের চিঠি আমাদের কাছে হস্তান্তর করতেন।

১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে খাবারের সঙ্গে প্লাস্টিকে মোড়ানো একটি চিঠি পাই। এটি পড়ে জানতে পারি জেনারেল সেকশনের বন্দিরা ভাল খাবার ও অন্যান্য দাবীতে অনশন করছে। চিঠি খুব সংক্ষিপ্ত হওয়ায় বুঝতে পারলাম না ধর্মঘট কবে থেকে শুরু হয়েছে। আমরাও তাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে অনশন শুরু করলাম। তথ্য আদান প্রদানে জটিলতার কারণে জেনারেল সেকশনের বন্দিরা তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের অনশনের কথা জানতে না পারলেও পরে তা জানতে পারে। এএনসি এ ধর্মঘটে সর্বাত্মক সমর্থন দিলেও প্যাক সদস্যরা দেয়নি। তারা খাবার-দাবার চালিয়ে যেতে থাকে।

ধর্মঘটের প্রথম দিনে আমাদেরকে প্রথাগত খাবার দেয়া হয়। আমরা খাবার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাই। দ্বিতীয় দিনে সব্জি-ফলসহ আরো ভাল খাবার দেয়া হয়। এদিনও আমরা খাবার নেয়া থেকে বিরত থাকি। তৃতীয় দিনে রীতিমত মুখরোচক খাবার দেয়া হয়। এ দিনের খাবারের তালিকায় মাছ-মাংস ছিল। তৃতীয় দিনও আমরা খাবার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাই। কারারক্ষীরা মিট মিট করে হাসতে হাসতে খাবার নিয়ে চলে যায়। চতুর্থ দিনে আরও মুখরোচক খাবার নিয়ে আসা হয়। এদিনও তারা আমাদেরকে খাওয়াতে ব্যর্থ হয়।

পরের দিন আমাকে হেড অফিসে ডেকে পাঠানো হল। কর্নেল ওয়েসেলস অনশনের কারণ জানতে চাইলেন। বললেন, জি ও এফ সেকশনের বন্দিরা যে কারণে ধর্মঘট করছে সেটা তুমি জানো। বললাম, জানার দরকার নেই। তারা আমাদের ভাই। তাদের যে কোন দাবির প্রতি আমাদের সমর্থন আছে।

তিনি আমার কথায় ক্ষুব্ধ হলেন। হেড অফিস থেকে চলে এলাম।

পরের দিন চমৎকার একটি খবর শুনতে পেলাম। কারারক্ষীরাও অনশন শুরু করল। আমাদের দাবির সমর্থনে নয় বরং তাদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া নিয়ে। তাদের দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল খাবারের মান ভালো করা এবং উন্নত জীবন যাত্রার সুযোগ দেয়া। কারাবন্দী ও কারারক্ষীদের ধর্মঘট একত্রে শুরু হওয়ায় কর্তৃপক্ষ দিশেহারা হয়ে পড়ল। তারা দ্রুত আলোচনার উদ্যোগ নিল। তারা প্রথমে কারারক্ষীদের সঙ্গে সমঝোতায় আসল। এরপর তারা জেনারেল সেকশনের তিনজন প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করল। অনশন ধর্মঘটের অবসান হল। এরপর থেকে শুরু হল ভালো দিনের।

এটা ছিল রোবেন দ্বীপের ইতিহাসে প্রথম সফল ধর্মঘট। বহির্বিশ্বেও খবরটি ছড়িয়ে পড়ে।

পত্রিকার বড় শিরোনামে পরিণত হয়। অনশন ধর্মঘট করার ওই প্রেরণা আমি পেয়েছিলাম মহাত্মা গান্ধীর মত মহান নেতাদের কাছ থেকে।

৬৭

অনশন ধর্মঘটের পর ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝিতে উইনির সঙ্গে দ্বিতীয়বারের মত সাক্ষাৎ হল। রোবেনদ্বীপে আসার পর উইনির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রায় দুই বছর আগে। ১৯৬৪ সালে প্রথম সাক্ষাতের পর উইনিকে নানা হয়রানির শিকার হতে হয়। তার ভাই ও বোনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরিবারের সদস্যদের তার সঙ্গে থাকা নিষিদ্ধ করা হয়। এসব খবরের

কিছুটা জানলাম উইনির মুখ থেকে। আর কিছুটা জেনেছিলাম পত্রিকা থেকে। উইনি সংক্রান্ত পত্রিকার কিছু কাটিং কে যেন আমার সেলে রেখে গিয়েছিল।

আগের মত এবারও উইনির রোবেন দ্বীপে ভ্রমণ যাতে খুব কষ্টকর হয় সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কোন ত্রুটি করেনি। উইনির এ দ্বীপে আসাটা নিরুৎসাহিত করার জন্য নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়। উইনির সব পরিদর্শন ছিল ঝক্কি ঝামেলায় পরিপূর্ণ। তাকে ট্রেন বা বাসে উঠতে দেয়া হত না। বিমানে করে রোবেন দ্বীপের পার্শ্ববর্তী এলাকা পর্যন্ত আসতে হয়। খরচ যাতে বেশি হয় সে জন্য কর্তৃপক্ষ এ ব্যবস্থা করে। বিমানবন্দর থেকে তাকে কেলডন স্কয়ারে অবস্থিত কেপটাউন থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিভিন্ন কাগজপত্রে সই করতে হয়। আগেরবারও রোবেন দ্বীপে আসার আগে এ থানায় যেতে হয়েছিল তাকে।

পত্র-পত্রিকার ক্লিপিংস থেকে জেনেছিলাম স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ আমাদের অরল্যান্ডোর বাসাটি গুড়িয়ে দিয়েছে। উইনি কাপড়-চোপড় পরার সময় একজন পুলিশ অফিসার তার বেডরুমে ঢুকে পড়ে। উইনি তাকে অপমান করে রুম থেকে বের করে দিলে ওই পুলিশ অফিসার তার বিরুদ্ধে মামলা করে। এ খবর জানার পর বন্ধু জর্জ বিজকে উইনির পক্ষে আইনি লড়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম।

দ্বিতীয় সাক্ষাতে উইনির সঙ্গে আমার দেড় ঘণ্টা আলাপ হয়। আসার পথে কেপটাউনে পুলিশ তার সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করায় সে ছিল রীতিমত ক্ষুব্ধ। এছাড়া এতটা পথ পাড়ি দিয়ে দ্বীপে আসতে আসতে বেচারি অনেকটা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ যাত্রায় উইনিকে কিছুটা শুকনো ও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল।

বাচ্চাদের লেখাপড়া ও মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে তার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করলাম। জেনি ও জিনজির পড়াশুনা ছিল আমাদের কাছে সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়। উইনি জানায়, দুই কন্যাকে ভারতীয়দের একটি স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছে। কিন্তু আফ্রিকানদের ওই স্কুলে ভর্তি করায় স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরকার ঝামেলা করছে।

সরকারি বিধি অনুযায়ী ওই স্কুলে আফ্রিকান বাচ্চাদের পড়াশুনার অনুমতি ছিল না। আমি দুই কন্যাকে সোয়াজিল্যান্ডের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে বললাম। উইনি এতে সায় দিল। তবে খুব কষ্ট পেল। কারণ দুই কন্যাকে চোখের আড়াল করা তার জন্য ছিল খুবই পীড়াদায়ক। আমি তাকে বোঝালাম। বললাম, সেখানে বাচ্চাদের লেখাপড়া ভালো হবে। উইনি একা হয়ে যাবে একথা ভেবে উদ্বিগ্নও হলাম।

পারিবারিক বিষয় ছাড়া অন্য ব্যাপারে কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। এজন্য আলাপের সময় সেসব ব্যক্তির নাম ও প্রসঙ্গ উল্লেখ করলাম যেগুলোর অর্থ আমরাই বুঝতাম। কারাপ্রহরীরা সেসব নামের কিছুই বুঝত না। এছাড়া আলাপচারিতায় কিছু সাংকেতিক শব্দও প্রয়োগ করলাম। যেমন, উইনির ব্যাপারে জানতে চাইলে বলতাম, নুটইয়ানার সাম্প্রতিক কোন খবর জান কি? সে কি ভাল আছে?

নুটইয়ানা হচ্ছে উইনির ডাক নাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এটি জানত না। উইনি তখন অবলিলায় বলে যেত নুটইয়ানা কেমন আছে। কারারক্ষীরা নুটইয়ানার বিষয়ে জানতে চাইলে বলতাম, সে আমার খালাত বোন। এভাবে নুটইয়ানার অন্তরালে উইনির নিজের সব বিষয়ে আমার জানা হয়ে যায়। এএনসির বিষয়ে জানতে চাইলে আমি জিজ্ঞেস করতাম, গীর্জার অবস্থা এখন কেমন? গীর্জার অবস্থার অন্ত রালে দেশের অবস্থা জেনে নিতাম। দলীয় সদস্যদের ব্যাপারে, তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে গেলে পাদ্রীদের খবর জানতে চাইতাম। উইনি পাদ্রীদের অবস্থার অন্তরালে এএনসির নেতাকর্মীদের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তুলে ধরত। এভাবে কারারক্ষীদের বোকা বানিয়ে উইনির সঙ্গে আমি অনেক কিছু শেয়ার করি। অনেক স্পর্শকাতর বিষয়ে আলোচনা করি। অনেক তথ্য আদান প্রদান করি। আলাপ-সালাপের এক পর্যায়ে একজন কারারক্ষী বলল, সময় শেষ। আমার মনে হল কয়েক মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে মাত্র।

গ্লাসের ভিতরে থেকেই উইনিকে চুমো দেয়ার চেষ্টা করলাম। হাত নেড়ে তাকে বিদায় অভিবাদন জানালাম। সেও হাত নাড়তে নাড়তে বিষণ্ন বিমর্ষ মনে চলে গেল।

সাক্ষাতের পুরো বিষয়টি মাথায় গেথে নিলাম। উইনি কি পড়ছিল, কি বলেছিল, আমি কি বলেছিলাম সব কিছু মাথায় রাখলাম। এর পর উইনিকে একটি চিঠি লিখলাম। এতে ভালবাসার কথা স্থান পেল। কারারক্ষীদের সামনে উচ্চারণ করতে পারিনি সেগুলো চিঠিতে লিখলাম। তাকে মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখাই ছিল আমার ওই চিঠির মূখ্য উদ্দেশ্য।

পরে শুনতে পেলাম এখান থেকে যাওয়ার পর পুলিশ তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। কেপটাউনে যাওয়ার বিষয়টি না জানানো এবং অনুপস্থিতিকালীন অবস্থানের ঠিকানা পুলিশকে অবহিত না করার অভিযোগে ওই মামলা করা হয়। অথচ সে ওই কাজগুলো করেছিল। রোবেন দ্বীপ থেকে যাওয়ার পরপরই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ না করাটাই ছিল তার বড় অপরাধ। উইনিকে গ্রেফতার করা হল। সে জামিনে মুক্তি পেল। পরে তাকে এক বছরের জেল দেয়া হয়। ফলে সামাজিক কর্মী হিসেবে উইনি একটি প্রতিষ্ঠানে যে চাকরি করত সেটা ছেড়ে দিতে হল। এতে তার আয়ের প্রধান উৎস বন্ধ হয়ে যায়।

৬৮

আমাদের এক কারারক্ষীর নাম ছিল জিথুলেল। সে ছিল খুবই ভদ্র ও সহিষ্ণু। কথা বলত কম। আমাদেরকে তেমন একটা বিরক্ত করত না। খনি এলাকায় আমাদেরকে তদারকি করত সে। আমরা কাজ করার সময় সে দূরে দাঁড়িয়ে থাকত। কি বলাবলি করি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করত না। কাজের ফাঁকে কোদাল বা শাবল মাটিতে রেখে কিছুতে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করলে বা ওই সময় কারো সঙ্গে গল্প করলে সে কিছুই বলত না। আমরা তার ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলাম।

১৯৬৬ সালের কথা। একদিন জুথুলেল আমাদের কাছে এসে বললেন, ভদ্র মহোদয়গণ বৃষ্টিতে রাস্তার লাইনের দাগ মুছে গেছে। আমাদের আজকের মধ্যে ২০ কেজি চুনা প্রয়োজন। আপনারা কি সাহায্য করতে পারেন? ওই সময় আমাদের হাতে কাজ ছিল কম। তার ভদ্র আচরণে আমরা মুগ্ধ হলাম। তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেলাম।

বসন্ত কাল। রোবেন দ্বীপে কেমন যেন একটা পরিবর্তন অনুভব করলাম। কোন কিছুতেই আগের মত কড়াকাড়ি নেই। বাড়াবাড়ি নেই। কেমন যেন একটা গা ছাড়া ছাড়া ভাব। আগের যে কোন সময়ের তুলনায় তখন বন্দি ও কয়েদীদের মধ্যে উত্তেজনা ছিল সবচেয়ে কম। মনে হচ্ছিল বাইরে কিছু একটা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাসের এক সকালে সেটি পরিষ্কার হল। খনি এলাকায় আমরা জ্যাকেট, মোজা, গ্লোভস খুলে হাত মুখ ধুয়ে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় কারাগারের এক জেনারেল খাবারের ড্রাম নিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। ফিস ফিস করে বললেন, ভারওয়ার্ড আর নেই। তিনি মারা গেছেন। ভারওয়ার্ড ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী। খবরটি দ্রুত আমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। প্রধানমন্ত্রী মারা যাওয়ার খবরটি আমাদের প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরে হল।

প্রধানমন্ত্রী কিভাবে মারা গেলেন তা প্রথমে জানতে পারিনি। পরে জানতে পারলাম। ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হয়েছেন। ভারওয়ার্ড আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের পশুর চেয়েও খারাপ ভাবতেন। এরপরও তার মৃত্যুতে খুব একটা উল্লসিত হলাম না। কারণ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে এএনসি কখনই সমর্থন করে না। এছাড়া এ হত্যাকাণ্ডের কারণে এএনসির ওপর খড়গ হস্ত নেমে আসবে সেটাও বুঝতে পারলাম।

ভরওয়ার্ড শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বিভাজন নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয় ও অইউরোপীয়দের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তৈরি করার রূপকার ছিলেন তিনি। বান্টুস্ট্যান্ট ও বান্টু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তকও ছিলেন তিনি। ১৯৬৬ সালে মরার কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে তার দল পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়। নির্বাচনে তার দল পায় ১২৬টি আসন। ইউনাইটেড পার্টি লাভ করে ৩৯টি আসন এবং প্রগ্রেসিভ পার্টি পায় মাত্র একটি আসন।

হত্যাকাণ্ডের পর পর আমাদের নিজস্ব কারারক্ষীদের মাধ্যমে দেশের অনেক রাজনৈতিক খবরাখবর জানতে পারলাম। তবে এরপর থেকে তারাও বিগড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শুরু করল। হঠাৎ রোবেন দ্বীপের অবস্থা বদলে গেল। কর্তৃপক্ষ কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকল। তারা রাজনৈতিক বন্দিদের নানাভাবে দমনপীড়ন শুরু করল। তাদের ধারণা ছিল প্রধানমন্ত্রী হত্যার জন্য পরোক্ষভাবে আমরাও দায়ী। কারণ আমাদের কারণে দেশে অস্থিতিশীলতা চলছে। আর বিদ্যমান অস্থিতিশীলতাই প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার পেছনে ইন্ধন যুগিয়েছে।

কর্তৃপক্ষ সব সময় মনে করত বাইরে তৎপর শক্তিশালী গ্রুপগুলোর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। নামিবিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকান পুলিশের ওপর ওয়েস্ট আফ্রিকান পিপলস অর্গানাইজেশন (সোয়াপো) হামলা চালায়। সোয়াপোর সঙ্গে এএনসির যোগাযোগ ছিল। তবে এটি ছিল বিভ্রান্ত ধাঁচের সংগঠন। এরা অপকর্ম করে সেটি এএনসির নামে চালিয়ে দিতে চাইত। সোয়াপোর ওই হামলার কারণে আমরা আরও বিপদে পড়ে যাই।

আমাদের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত কারারক্ষী জিখুলেলকে সরিয়ে দেয়া হল। এ জায়গায় ২৪ ঘণ্টার নোটিশে নিয়ে আসা হল ভ্যান রিসেনবার্গকে। সে ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির। অমানবিক আচরণের জন্য প্রসিদ্ধ।

ভ্যান রিসেনবার্গ ছিল খুবই লম্বাচওড়া। কথা বলত চেঁচিয়ে। তাকে এখানে নিয়ে আসা হয় মূলত আমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলার জন্য। প্রথম দিনই সে কাজে এই পারদর্শিতার প্রমাণ রাখে।

রিসেনবার্গ আসার পর আমাদের পরিশ্রম বেড়ে যায়। আমাদের কত বেশি খাটানো যায় সে চিন্তা সব সময় তার মাথায় ঘুরপাক খেত। প্রায় সময়ই সে কাজের তদারকির জন্য আমাদের একজনকে নিয়োজিত করত যাতে আমরা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে বেশি পরিশ্রম করি। একদিন সেলে ফেরার পর রিসেনবার্গ বলে উঠল। ম্যান্ডেলা শিগগিরই আমি তোমাকে দেখে নেব। কারাপ্রধানের সামনেই তোমাকে শায়েস্তা করব।

রোবেন দ্বীপে প্রশাসনিক আদালত ছিল। নিজেদের সুবিধার জন্য আমরা একটি আইন কমিটি গঠন করলাম। আমি ছাড়াও ফিকিল বাম ও ম্যাক মহারাজা এর সদস্য ছিলেন। ম্যাক আইন নিয়ে পড়াশুনা করতেন। ফিকিলের বড় বড় ডিগ্রী ছিল। আমাদের এই আইন কমিটির কাজ ছিল দ্বীপের বন্দিদের নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা যাতে তারা ভালোভাবে প্রশাসনিক আদালতে লড়তে পারে।

ভ্যান রিসেনবার্গ বিশালদেহী ও কর্কশ হলেও বুদ্ধি তেমন ছিল না। আমরা খনিতে কাজ করার সময় কখনই তার সঙ্গে তর্কে জড়াতাম না। প্রশাসনিক আদালতে যা বলার বলতাম। এতে আমাদের অভিযোগগুলো অন্য কর্মকর্তাদের কানেও পৌছত। মাঝে মধ্যে কথার মারপ্যাচে পড়ে রিসেনবার্গকে বিব্রত হতে হত। প্রশাসনিক আদালতে রিসেনবার্গ কারো বিরুদ্ধে নালিশ করলে আমি তার বিপক্ষে দাঁড়াতাম।

রিসেনবার্গের আচার-আচরণ ছিল অসভ্যের মত। খনি এলাকায় আমাদের খাবার এলে আমরা সাদামাটা কাঠের টেবিলে খেতে বসে যেতাম। রিসেনবার্গ তখন পাশেই প্রশাব করতে দাঁড়িয়ে যেত। আমি ভাবতাম, কপাল ভালো যে আমাদের খাবারের ওপর সে প্রশাব করেনি।

আমরা প্রতিশোধ নেয়া শুরু করলাম। রিসেনবার্গকে দেখলে আমরা হাসি তামাশা করতাম। তাকে আমরা স্যুটকেস বলা শুরু করলাম। যখনই তাকে আসতে দেখতাম, তখনই আমরা বলতাম স্যুটকেস আসছে। এভাবে রোবেনদ্বীপে সে স্যুটকেস হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠল। এখানে কারারক্ষীদের খাবারের বক্সকে বলা হত স্যুটকেস।

একদিন উইলটন এমকাবি, রিসেনবার্গকে দেখামাত্র স্যুটকেস শব্দটি উচ্চারণ করল। সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, আমাকে স্যুটকেস বললে কেন? উইলটন সহ আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। এরপর একযোগে হেসে ফেললাম। বললাম, এখানে কারাকর্মকর্তাদের খাবারের বক্সটি বহন করে কারারক্ষীরা। অথচ তোমার খাবারের বাক্স তুমি নিজে বহন কর। এজন্য তোমাকে আমরা স্যুটকেস বলি। এ কথা শুনে সে রাগান্বিত হয়ে ওঠে। আমরা অল্প সময়ের জন্য নিরব হয়ে থাকলেও আবার সমস্বরে হেসে উঠি। এদিন সে দারুণভাবে অপমানিত হয় আমাদের কাছে।

একদিন আমি ও ফিকিলবাম পাশাপাশি কাজ করছিলাম। রিসেনবার্গ আমাদের কাজের তদারকি করছিলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা পড়াশুনা নিয়ে আলাপ করছিলাম। কাজ শেষে রিসেনবার্গ আমার কাছে এসে বললেন, ফিকিল ও নেলসন ম্যান্ডেলা আমি তোমাদের কারাপ্রধানের সামনেই দেখে নেব।

পরদিন আমাদেরকে কারাপ্রধানের কক্ষে ডেকে পাঠানো হল। রিসেনবার্গও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে অভিযোগ করল, এই দু'জন লোক ঠিক মত কাজ করে না। আমি প্রতিবাদ করলাম। বললাম, আমি ও ফিকেল ঠিকমত কাজ করি। ফাঁকি দেই না। এর প্রমাণও আছে। আমাদের কাজ পরিদর্শন করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। কারাপ্রধান আমাদের কাজ পরিদর্শন করবেন বলে জানালেন। রিসেনবার্গ চুপ হয়ে গেল। আমরা চলে আসলাম।

ফিকিলকে আমরা ফিকস বলে ডাকতাম। পরের দিন আমি ও ফিকস সারা দিন যেসব চুনাপাথর ও চুনা সংগ্রহ করলাম সেগুলো রোজগার মত এক জায়গায় স্তুপ করে রাখলাম। কারাপ্রধান আমাদের কাজ দেখতে আসলেন। এসময় স্যুটকেস (রিসেনবার্গ) সঙ্গে ছিল। কারাপ্রধানকে আমরা সারা দিনের কাজ দেখালাম। স্যুটকেস বলল, এগুলো এক সপ্তাহের জমানো চুনাপাথর। কারা প্রধান জিজ্ঞেস করলেন তাহলে আজকের জমানো চুনাপাথর কোথায়? স্যুটকেস চুপ হয়ে গেল। কোন উত্তর দিতে পারল না। কারাপ্রধান স্যুটকেসকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। এই দুজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছ। এই বলে আমাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তিনি তৎক্ষণাৎ খারিজ করে দিলেন।

১৯৬৭ সালের এক সকালের কথা। আমরা রোজকার মত কাজ করছিলাম। এমন সময় স্যুটকেস এসে বলল, মেজর কেলারম্যান কাজের সময় আমাদের কথা বলতে বারন করেছেন। এখন থেকে খনিতে কাজ করার সময় কোন কথা বলা যাবে না। সম্পূর্ণ চুপ থাকতে হবে। এ নির্দেশ আমাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করল। কথা বলা ছাড়া কাজ করা ছিল আমাদের জন্য খুব কষ্টের।

কি করা যায় তা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। আমরা যখন প্লান করা নিয়ে ব্যস্ত ঠিক সে সময় মেজর কেলারম্যান আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন। এটা ছিল একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। এত বড় মাপের কর্মকর্তা এভাবে আমাদের কখনো দেখতে আসেননি। তিনি কাশি দিয়ে আমাদের সামনে আসলেন। বললেন, ভুলবশত তিনি ওই আদেশ দিয়েছেন। এখন থেকে ওই আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। কাজ করার সময় কথা বলা যাবে। যে যার কাজ করুন– একথা বলে তিনি চলে গেলেন। আমরা খুশিতে গদগদ হয়ে গেলাম। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, কেন তিনি কথা বলার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন না কোন কারণ আছে।

পরের কয়েকদিন ভারী কাজের ব্যাপারে আমাদের জোর জবরদস্তি করা হল না। স্যুটকেস ভালো ব্যবহার করতে শুরু করল। আমাদের বিরুদ্ধে ঝুলে থাকা সব অভিযোগ সে প্রত্যাহার করে নিল।

ওই দিন বিকালে আমাকে সেলের ৪ নম্বর কক্ষ থেকে ১৮ নম্বর কক্ষে স্থানান্তর করা হল। এ রুমের সবকিছু ছিল নতুন। অভিযোগ করার মত কিছু ছিল না। আমরা ধরে নিলাম নিশ্চয়ই কোন পরিদর্শক আমাদের দেখতে আসছেন। এজন্য সব কিছু ঠিকঠাক করা হচ্ছে। আগেও কেউ আসার আগে এ ধরণের ব্যবস্থা

নেয়া হত। ১৮ নম্বর রুমটি সেলের একেবারে প্রবেশমুখে ছিল। তাই কেউ আসলে প্রথমেই আমার রুমে আসবেন সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হলাম।

সকালে নাস্তার পর স্যুটকেস আমাদের জানাল, আজ আর খনিতে কাজ করতে যেতে হবে না। এরপর মেজর কেলারম্যান আসলেন। বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসেস হেলেন সুজম্যান আমাদের দেখতে আসছেন। সুজম্যান ছিলেন লিবারেল প্রগ্রেসিভ পার্টির নেতা। এ দলের একমাত্র পার্লামেন্ট সদস্যও ছিলেন তিনি। ১৫ মিনিটের মধ্যেই ৫ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা সুজম্যান আমাদের সেকশনে প্রবেশ করলেন। সাথে ছিলেন কারাকমিশনার জেনারেল স্টেইন। তিনি সুজম্যানকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচিত হবার সময় সুজম্যান, একে একে সবার কাছে জানতে চান তাদের কোন অভিযোগ আছে কিনা। সবাই বলেন, তাদের অনেক অভিযোগ আছে। এগুলো বলবেন তাদের মুখপাত্র নেলসন ম্যান্ডেলা। সুজম্যান আমার সেলে প্রবেশ করলেন। তিনি খুব শক্তভাবে আমার সাথে হাত মেলালেন। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রোবেন দ্বীপ সম্পর্কে বাইরে অনেক লেখালেখি হচ্ছিল। সেগুলোর সত্যতা যাচাইয়ের জন্যই তিনি এখানে আসেন।

সুজম্যান আমার পাশে বসলেন। এ সময় জেনারেল স্টেইন ও কমান্ডিং অফিসার আমাদের পাশে দাঁড়ানো ছিলেন। সুজম্যান আমাদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমাদের খাবারের মান উন্নত করা দরকার। পোশাকের মান খুব খারাপ। আমরা ভালো পোশাক চাই। পড়াশুনার পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। পত্র-পত্রিকা পড়ার সুযোগ এখানে নেই। আমরা পত্রিকা পড়তে চাই।

ভ্যান রিসেনবার্গসহ যেসব কারারক্ষীরা আমাদের জ্বালাতন করছে তাদের ব্যাপারেও সুজম্যানের কাছে অভিযোগ করি। সবকথা শুনে সুজম্যান একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর মত বললেন, ম্যান্ডেলা ভাববেন না। এ বিষয়টি আমরা অনেক দূর নিয়ে যাব। আপনাদের এসব অভিযোগ সম্পর্কে আমরা এতদিন কিছুই জানতাম না। তাই কিছু করতে পারি নি। এখন সাধ্যমত চেষ্টা করব এসব অভিযোগ মেটানোর জন্য। এসব অভিযোগ তিনি বিচারমন্ত্রণালয়ে পেশ করবেন বলে জানান। তিনি আমাদের সেলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলেন। সমস্যা নিয়ে অন্যদের সঙ্গেও আলোচনা করলেন। রোবেন দ্বীপে তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা পরিদর্শক।

সুজম্যানের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ বৈঠকের দৃশ্য দেখে রিসেনবার্গ ভয় পেয়ে যায়। সে তার অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমা চায়। কিন্তু তার অনুতাপ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। পরদিনই সে আবার ওল্টাপাল্টা আচরণ শুরু করে।

৬৯

আমাদের সংগ্রাম খুব সহজ বা সংক্ষিপ্ত হবে এমনটা আমি কখনও চিন্তা করিনি। প্রথম কয়েকটি বছর ছিল আমাদের জন্য দুঃসময়। যারা রোবেন দ্বীপে বন্দি ছিলাম এবং সংগঠনের যারা বাইরে ছিলেন উভয়কেই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। রাইভোনিয়ার পর এএনসির আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মকাণ্ড প্রায় থামিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমাদের সাংগঠনিক কাঠামো গুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। সমূলে নির্মূল করা হয়েছিল এএনসিকে। যারা গ্রেফতার হল তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল জেলে। অনেককে পাঠানো হয়েছিল নির্বাসনে। যারা গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হয়েছিল তাদের মাথায় ছিল নিষেধাজ্ঞার খড়গ। দৃশ্যত তখন এএনসির প্রত্যেক সিনিয়র নেতা হয় জেলে ছিলেন আর না হয় নির্বাসনে ছিলেন।

রাইভোনিয়া বিচারের পর এএনসির এক্সটারনাল মিশন বা বৈদেশিক শাখার ওপর বেশি দায়িত্ব বর্তায়। সংগঠনের তহবিল সংগ্রহ, কূটনৈতিক তৎপরতা, সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ যাবতীয় কাজ করত বৈদেশিক শাখাগুলো। বহির্বিশ্বে এএনসিকে জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্ডারগ্রাউন্ড তৎপরতা শুরুর ব্যবস্থা করে এই এক্সটারনাল মিশন।

এ সময় রাষ্ট্র আরো শক্তিশালী হয়। পুলিশের ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাদের হাতে আসে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, আধুনিক যন্ত্রপাতি। অপরাধী ধরার আধুনিক কলাকৌশল শেখানো হয় তাদের। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাড়ানো হয়। অর্থনীতি ছিল স্থিতিশীল। ফলে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের কোন অসুবিধা ছিল না। আমেরিকা বৃটেনের মত শক্তিশালী দেশ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র। সব মিলিয়ে দারুন সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার।

১৯৬০ সালের মাঝামাঝিতে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে সশস্ত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। নামিবিয়ায় (তখনকার দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা) সোয়াপো পুলিশের ওপর হামলা চালায়। মোজাম্বিক ও এঙ্গোলায় গেরিলা তৎপরতা বাড়তে থাকে। জিম্বাবুয়েতে (তখনকার রোডেশিয়া) সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে স্থানীয়রা রীতিমতো যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

ইয়ান স্মিথের সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকারকে দক্ষিণ আফ্রিকা জোর সমর্থন দিয়ে যেতে থাকে। এএনসি জিম্বাবুয়ে আফ্রিকান পিপলস ইউনিয়নের (জাপু) সঙ্গে যোগ দেয়। কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন জোগাতে থাকে। এ জোটের নেতৃত্বে ছিলেন জোসুয়া এনকোমো।

এ বছর তাঞ্জানিয়া ও জাম্বিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এমকের একদল সৈন্য জাম্বেজি নদী পার হয়ে রোডেশিয়ায় চলে যায়। তারা লুথুলি ডিটাচমেন্টের গেরিলা বাহিনীর

সঙ্গে যোগ দেয় এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। আগস্ট মাসে জাপু সৈন্যদের সাথে নিয়ে লুথুলি ডিটাচমেন্ট দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। রোডেশিয়া সৈন্যদের ওপর হামলা করার জন্য পরের কয়েক সপ্তাহ দু'পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। দু'পক্ষের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

রোডেশিয়ার আরও সৈন্য প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিলে ফলাফল ঘুরে যায়। লুথুলির সৈন্য পরাস্ত হয়। অনেককে আটক করা হয়। অনেকে পালিয়ে বতসোয়ানায় আশ্রয় নেয়। বতসোয়ানা তখন স্বাধীন দেশ ছিল। ১৯৬৮ সালে এএনসির আরেকটি বড় গেরিলা গ্রুপ রোডেশিয়ায় প্রবেশ করে সেখানকার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা রোডেশিয়ায় থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশদের ওপরও হামলা চালায়।

এসব যুদ্ধবিগ্রহের খবর মুখে মুখে শুনতাম। ভাসা ভাসা খবর পেতাম। এর মধ্যে অনেক গুজবও ছিল। কিন্তু যুদ্ধে অংশ নেয়া কয়েকজনকে বন্দি করে যখন রোবেন দ্বীপে আনা হয় তখন আমরা পুরো ঘটনা জানতে পারি। যুদ্ধে না জিতলেও আমাদের হাতে গড়া এমকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে পারছে– এ কথা ভাবতেই আনন্দে বুক ভরে উঠত। এমকের এসব কর্মকাণ্ড ছিল আন্দোলনের মাইলফলক। লুথুলি ডিটাচমেন্টের কমান্ডার ছিলেন পাঞ্জা। তাকে বন্দি করে রোবেন দ্বীপে পাঠানো হয়। তিনি আমাদেরকে ডিটাচমেন্টের সামরিক প্রশিক্ষণ, রাজনৈতিক শিক্ষা, এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অপারেশনের কথা শোনাতেন। এমকের সাবেক কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে আমি আমাদের সৈন্যদের জন্য গর্ব অনুভব করতাম।

দেশে দেশে এমকে সৈন্যদের অভিযানের খবরের পাশাপাশি ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে চিফ লুথুলির মৃত্যু সংবাদ পেলাম। তিনি নিজ বাড়িতে মারা যান। আমাদের কাছে তার মৃত্যু ছিল রহস্যজনক। যতদূর জেনেছি ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি মারা যান। তার বাড়ির পাশেই ছিল রেল লাইন। যেখানে তিনি রোজই হাঁটতেন। আমি লুথুলির বিধবা স্ত্রীর কাছে চিঠি লেখার অনুমতি চাইলাম। অনুমতি দেয়া হল।

তার মৃত্যুতে এএনসিতে গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হল। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এই মহান নেতা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খুবই পরিচিত ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত। এ কারণে তার গুরুত্বটা খুব বেশি ছিল। তার মৃত্যুর পর দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হল অলিভার টাম্বুকে। চিফ লুথুলির জায়গা পূরণ করতে দল এমন একজনকে খোঁজা শুরু করল।

চিফ লুথুলির স্মরণে বি সেকশনে আমরা ছোট একটি শোক সভার আয়োজন করলাম। যারা ইচ্ছুক তাদেরকে শোক সভায় যোগ দেয়ার অনুমতি দেয়া হল। সভা শুরু হল। নন-ইউরোপিয়ান ইউনিটি মুভমেন্টের নেতা নেভিল আলেকজান্ডার প্রথমে বক্তৃতা করতে চাইলেন। আমরা ভাবলাম তিনি প্রয়াত লুথুলির প্রশংসা করবেন। আমাদের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। তিনি লুথুলিকে শ্বেতাঙ্গদের দালাল হিসেবে বর্ণনা করলেন। বললেন, শ্বেতাঙ্গদের চাটুকারিতা করার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

নেভিলের বক্তৃতায় শোকসভার পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভেদ কতটা প্রকট সেটা বুঝতে পারি। রোবেন দ্বীপে বিভিন্ন দলের নেতারা আছেন। এদের সাথে আলোচনা করে বিভেদ কমানোর উদ্যোগ নেই। এটাকে একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করি। এএনসি ও প্যাকের মধ্যে বিভেদ ছিল তুঙ্গে। এ দুটি সংগঠনকে এক করতে পারলে স্বাধীনতা সংগ্রাম অনেক জোরদার হবে বলে মনে করলাম।

প্রথম থেকেই প্যাক এএনসিকে সহযোগী সংগঠন না ভেবে প্রতিদ্বন্দী মনে করত। প্যাকের কিছু বড় মাপের নেতা রোবেন দ্বীপে ছিলেন। এরা আমাদের এ দ্বীপে আসাটাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করত। তাদের ধারণা ছিল আমরা সীমা লংঘন করেছিলাম। যার পরিণতি এটা। এমনও শুনেছি আমাদের ফাঁসি না হওয়ায় প্যাকের অনেক নেতা দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

১৯৬২ সালে এ দ্বীপে যখন প্রথম আসি তখন এখানে প্যাকের সদস্য বেশি ছিল। এখন ১৯৬৭ সাল। তাদের চেয়ে রোবেন দ্বীপে এএনসি সদস্যদের সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে রোবেন দ্বীপে প্যাকের অবস্থান আগের চেয়ে দূর্বল হয়ে গেছে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্যাক সদস্যরা কমিউনিস্ট ও ভারতীয়দের দেখতে পারত না। আগের বছরগুলোতে আমি প্যাকের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিপ মথুপেংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তখন তিনি বলেছিলেন, প্যাক এএনসির তুলনায় বেশি সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে। তারা বেশি জঙ্গীধর্মী সংগঠন। রোবেন দ্বীপে তাদের সদস্যদের সংখ্যা বেশি। এজন্য এএনসির উচিত জেলখানায় প্যাকের নেতৃত্ব মেনে চলা। প্যাক নেতৃবৃন্দ জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসত না। কোন দাবি-দাওয়া জানাত না। অথচ আমরা সংগ্রাম করে যেসব দাবি দাওয়া ও সুযোগ-সুবিধা আদায় করতাম সেগুলোর সুফল নিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করত না। ১৯৬৭ সালে সেলবি এনজেনডেনের সঙ্গে দু'দলের ঐক্য নিয়ে আলোচনা করলাম। জেলখানার বাইরে থাকাকালে সেলবি ছিলেন খুবই উদ্ধত। জেলখানায় আসার পর তিনি অনেক নমনীয় হয়ে যান। তাকে রাখা হয়েছিল আমাদের সেলে।

আমরা দুজনেই জেলখানায় বসে যার যার দলের কাছে চিঠি লিখতাম। বিষয়বস্তু থাকত ভিন্ন। এএনসি ক্লারেন্স মাকওয়েতুর সঙ্গেও সদ্ভাব বজায় রাখত। ক্লারেন্স পরে প্যাকের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি এক সময় এএনসির যুব শাখার সভাপতি ছিলেন। আমরা এ দু'সংগঠনের ঐক্য নিয়ে অনেক গঠনমূলক আলোচনা করি। পরে তিনি জেলখানা থেকে মুক্তি পান। প্যাকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রোবেন দ্বীপে প্যাকের মুখপাত্র হিসেবে আলোচনার দায়িত্ব বর্তায় জন পোখেলার ওপর।

প্যাকের সঙ্গে যখন ঐক্য নিয়ে আলোচনা চলছিল ঠিক সে সময় প্রেটোরিয়া থেকে রোবেন দ্বীপে একটি নির্দেশ আসে। তাতে বলা হয় এখন থেকে আমাকে একা কাজ করতে হবে। কাজ করার সময় আমাকে কথা বলতে দেয়া হবে না। আমার জন্য আলাদা কারারক্ষী নিয়োগের জন্য প্রেটোরিয়া থেকে কারাকর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়। আমরা লক্ষ্য করলাম প্রেটোরিয়া থেকে আসা এ নির্দেশে প্যাক কর্মীরা কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছে। বিষয়টি তাদের বেশ নাড়া দেয়। কয়েকদিন পর প্যাক নেতা কর্মীরা সিদ্ধান্ত নেন, তাদের নেতা জেপ মথুপেং এখন থেকে সম্পূর্ণ একা থাকবেন। তিনি একা কাজ করবেন, একা খাবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বিচ্ছিন্ন রাখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনিও স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন থাকবেন।

রোবেন দ্বীপে এএনসির বড় বড় নেতাদের নিয়ে আমরা একটি সংগঠন গড়ে তুলি। নাম দেই হাই কমান্ড। একে হাই অরগানও বলা হত। রোবেন দ্বীপে অবস্থানরত এএনসির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বড় মাপের নেতারা ছিলেন হাই অরগানের সদস্য। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, ওয়াল্টার সিসুলু, গোভান এমবেকি, রেমন্ড এম হলবা, এবং আমি। আমাকে করা হল হাই অরগানের সর্বোচ্চ নেতা।

হাই অরগানের সদস্যরা বৈঠকে মিলিত হলাম। এএনসির নীতি বা দেশের অবস্থা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা আমরা পছন্দ করলাম না। কারণ দেশে আসলে কি হচ্ছে তার কিছুই আমরা জানি না। তাই এসবের বদলে বন্দিদের দৈনন্দিন সমস্যা, অভিযোগ, ধর্মঘট, খাদ্য, চিঠি– এসব বিষয় নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেই। সময় পেলেই আমরা হাই অরগানের মিটিং ডাকতাম। এক সাথে বসে নানা বিষয়ে কথা বলতাম। তবে এ ধরণের বৈঠক সবসময় করা ছিল খুবই বিপজ্জনক। এজন্য আমরা আলাদা আলাদাভাবে আলাপ করে বিভিন্ন বিষয়ে

সিদ্ধান্ত নিতাম। আমরা সচরাচর তিনজন তিনজন করে আলাপ করতাম। কারণ এক সেলে তিনজনের একসঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ ছিল।

প্রথম কয়েকবছর হাই অরগান দ্বীপের সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করত। ১৯৬৭ সালে আমরা প্যাক, ইউনিটি মুভমেন্ট, লিবারেল পার্টি সহ সব দলের পক্ষ থেকে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে উন্নত চিকিৎসা সুবিধার দাবি জানালাম। আমাদের এ দাবির প্রতি সবাই সমর্থন জানালেও বাধ সাধলেন শুধু নেভিল। তিনি বললেন, হাই অরগান গণতান্ত্রিকভাবে গঠন করা হয়নি। এতে সব দলের প্রতিনিধিত্ব নেই।

আমরা সব দলের সমন্বয়ে হাই অরগান গঠনের সিদ্ধান্ত নিলাম। এতে এএনসির কর্তৃত্ব বেশি হয়ে যাবে এ আশঙ্কা ছিল অনেকের, এ আশঙ্কা দূর করার জন্য আমরা বললাম, প্রথম মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করবেন ইউ চি চান ক্লাবের সদস্য ফিকিল বাম। পরে সভাপতির পদটি পর্যায়ক্রমে আমাদের সবার মাঝে এক এক করে ঘুরে আসবে। আমাদের এ কমিটির নাম হবে উলুনডি। আমাদের মূল কাজ হবে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখা।

৭০

যারা বন্দী তাদের সময় কাটতে চায় না। মনে হয় ঘড়ির কাঁটা থেমে আছে। কিন্তু বাইরে সময় দ্রুতগতিতে ঠিকই বয়ে যায়। আমার মা যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসলেন তখন বিষয়টি অনুধাবন করলাম। ১৯৬৭ সালের বসন্তে তিনি আমাকে দেখতে আসেন। রাইভোনিয়া বিচারের পর এই প্রথম তাকে আমি দেখলাম। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকলে পরিবর্তনটা তেমন চোখে পড়ে না। অনেক দিন হঠাৎ তাদের মাঝে উপস্থিত হলে বা তাদের কাউকে দেখলে পরিবর্তনটা সহজে চোখে পড়ে। আমার বেলায়ও তাই হল। অনেক দিন পর মাকে দেখে মনে হল তিনি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন।

ট্রান্সকেই থেকে আমার মা, আমার ছেলে মাগাতু, কন্যা মাখাজি এবং বোন মাবেলকে নিয়ে রোবেন দ্বীপে আসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। পরিদর্শক ৪ জন হওয়ায় কর্তৃপক্ষ কথোপকথনের সময় ১৫ মিনিট বাড়িয়ে দেয়। দেড় ঘণ্টার বদলে আমাকে দেয়া হয় পৌনে দুই ঘণ্টা।

ছেলে-মেয়েদের দেখি না অনেকদিন ধরে। বিচারের আগে শেষবার তাদের দেখেছিলাম। এখন তারা বেশ বড় হয়েছে। দ্রুত বাড়ছে। আমাকে ছাড়াই তারা বড় হচ্ছে।

মা অনেক শুকিয়ে গেছেন। তার স্বাস্থ্য দেখে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। তার চেহারায় ভাঁজ পড়েছে। বোন মেবেলকে অপরিবর্তিত মনে হল। তাদের সবাইকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হলাম। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। তবে মায়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে মনটা কেমন হয়ে গেল। মাকে দেখে কেন যেন মনে হল এটাই তার সঙ্গে আমার জীবনের শেষ দেখা। তাকে আর দেখতে পাব না। ছেলে-মেয়েকে ভালো করে লেখাপড়া করার পরামর্শ দিলাম। দেখতে দেখতে সময় শেষ হয়ে গেল। তারা বিদায় নিয়ে চলে আসল।

কয়েক সপ্তাহ পর খনি থেকে কাজ করে ফেরার পথে আমাকে হেড অফিসে যেতে বলা হল। আমাকে বলা হল, টেলিগ্রাম আছে। এটি পাঠিয়েছিল মাকাথু ট্রান্সকেই থেকে। মা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এ খবরটি টেলিগ্রামে জানানো হল। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মুসড়ে পড়লাম। ট্রান্সকেইতে মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দেয়ার অনুমতি দেয়ার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কমান্ডিং অফিসারকে অনুরোধ করলাম। তিনি অনুরোধ নাকচ করে দিয়ে বললেন, ম্যান্ডেলা তুমি এক কথার মানুষ। কথা দিয়ে কথা রাখ। তুমি পালাবে না সেটা ভাল করে জানি। কিন্তু দলের লোকদের ওপর আমার বিশ্বাস নেই। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে তুমি গেলে দলের লোকেরা তোমাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। তাই তোমাকে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার অনুমতি দেয়া গেল না। মায়ের একমাত্র ছেলে হয়ে আমি তাকে মাটি দিতে পারব না– এটা আমাকে দারুণ যন্ত্রণা দিল।

পরের কয়েক মাস মায়ের স্মৃতি আমাকে তাড়িয়ে বেড়াল। কোন কাজেই মন বসাতে পারলাম না। মায়ের বড় ছেলে হয়েও তার শেষকৃত্যে যোগ দিতে না পারাটা আমাকে বেশি যন্ত্রণা দিল।

মায়ের মৃত্যু মানুষকে পিছনে নিয়ে যায়। তার অতীতকে সামনে নিয়ে আসে। আমারও তাই হল। মা আমাদের মানুষ করতে গিয়ে কত কষ্ট করেছেন, কত সংগ্রাম করেছেন তা মনে হতে লাগল।

মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার শিক্ষা মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছি। আমার সংগ্রামী জীবনে তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণার উৎস। অবশ্য আমি কি করছি মা তার অনেক কিছুই জানতেন না।

নবম পরিচ্ছেদ

রোবেন দ্বীপ : আশার আলো

৭১

রোবেন দ্বীপে আমাদের অবস্থা ক্রমশ উন্নতি হতে শুরু করল। অনেক বাদ-বিবাদ ও সংগ্রামের পর দ্বীপের বিরূপ আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসল। আমরা না চালালেও কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে ছাড়া রোবেন দ্বীপ চালাতে অসমর্থ হল। কিছুদিনের মধ্যেই ভেন রিসেনবার্গকে বদলি করা হল। আমাদের জীবনে স্বস্তি নেমে আসল। আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

১৯৬৯ সাল। তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম আমাদের সবাইকে লং ট্রাউজার দেয়া হল। ব্যক্তিগতভাবে পরার জন্য আলাদা পোশাকও দেয়া হল। যেগুলি আমরা নিজেরাই ধোয়ার সুযোগ পেতাম। সপ্তাহের শেষ দিন জেলখানার আঙ্গিনার বাইরে ঘোরাফেরার সুযোগ দেয়া হল। আমরা দীর্ঘক্ষণ নিজের খুশিমত ওই এলাকায় ঘুরে বেড়াতে পারতাম। ইন্ডিয়ান বা শ্বেতাঙ্গদের মত ভালো খাবার তখনও আমাদেরকে দেয়া হত না।

আফ্রিকান বন্দিরা মাঝে মধ্যে সকালে রুটি পেত। আমাদেরকে যে কোন জায়গায় খাবার নিয়ে গিয়ে খাওয়ার অনুমতি দেয়া হল। এতে আমরা খাবার ভাগাভাগি করার সুযোগ পেতাম। এছাড়া অন্যত্র গিয়ে খাবার খেলে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের খাবারের বৈষম্য চোখে পড়ত না। আমাদেরকে খেলার জন্য বোর্ড গেমস ও কার্ড দেয়া হল। প্রতি শনি ও রোববার এগুলো খেলতে পারতাম।

খনিতে কাজ করার সময় কদাচিৎ আমাদের কথায় অন্তরায় সৃষ্টি করা হত। কমান্ডিং অফিসার আসার আগে কারারক্ষী বাঁশি বাজাত। এতে আমরা সতর্ক হতে পারতাম। কারারক্ষীদের ব্যবহারও আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়ে গেল।

যখন মনে চাইত তখনই আমরা পরস্পর সাক্ষাৎ করতে পারতাম। কথা বলতে পারতাম। হাই অরগানের মিটিং যতক্ষণ খুশি করা যেত। উলানদির মিটিংও অনেকক্ষণ করা যেত।

আগে জেলখানায় ধর্ম-কর্ম করার সুযোগ পেতাম না। এখন প্রার্থনার সুযোগ দেয়া হয়। প্রতি রোববার সকালটি আমাদের প্রার্থনার জন্য বরাদ্দ থাকত। এ কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করত না। ধর্মীয় কাজে বাঁধা দিতে কারারক্ষীরাও ভয় পেত।

প্রতি রোববার বিভিন্ন গীর্জা থেকে একজন ধর্মযাজক বা পুরোহিতকে রোবেন দ্বীপে আনা হত। এক রোববার আসতেন অ্যাংলিকান পুরোহিত। আরেক রোববার আসতেন ডাচ রিফর্মড পুরোহিত। মাঝে মধ্যে মেথডিস্ট পুরোহিতও আসতেন। তারা আমাদের ধর্মসভা পরিচালনা করতেন। পুরোহিতদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকতো জেলখানা কর্তৃপক্ষ। ধর্মীয় কথাবার্তা ছাড়া অন্য কথা বলা তাদের জন্য নিষেধ ছিল। কারারক্ষীরাও প্রার্থনার সময় উপস্থিত থাকত।

প্রথম দিকে আমাদের সেকশনের বারান্দায় প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হত। লোক সমাগম বেশি হওয়ায় পরে জেলখানার উঠান বা আঙ্গিনায় প্রার্থনাসভার আয়োজন শুরু হয়। আমাদের মধ্যে কিছু বন্দি মনোযোগ সহকারে প্রার্থনা করতেন। বাকিরা বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করতাম। আমিও প্রায় সময় এ দলেই থাকতাম। আমি ছিলাম মেথোডিস্ট। এজন্য প্রায় সময়ই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে থাকতাম না।

রোবেন দ্বীপে আমাদের প্রথম পুরোহিত বা ধর্মযাজক ছিলেন ফাদার হগস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মিত্র বাহিনীর একটি সাবমেরিনে নৌ সেনাদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে তিনি ধর্মযাজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। প্রথম দিন তিনি ধর্মীয় উপদেশ দেয়ার পরিবর্তে চার্চিলের একটি ঐতিহাসিক রেডিও বক্তৃতা পড়ে শোনান। তার কণ্ঠ ছিল ভাল। তাই ওই বক্তৃতা চমৎকার শোনাচ্ছিল। ওই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় চার্চিল বলেছিলেন, আমরা সমুদ্র সৈকতে, মাঠে ঘাঠে, পাহাড়ে জঙ্গলে সব জায়গায় শত্রুবাহিনীর সাথে লড়াই করবো। কখনই আত্মসমর্পন করবো না। ফাদার হগস ধর্মীয় কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে দেশের চলমান অবস্থা বলে ফেলতেন। দেশের চলমান অবস্থা তার কথাবার্তা থেকে অনেক সময় আঁচ করা যেত। অবশ্য এসব কথা তিনি ধর্মীয় আলোচনার রেশ ধরেই টেনে আনতেন। একদিন তিনি বললেন, মিশরের ফেরাউনের মত দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারও তার সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে।

মেথোডিস্ট ধর্মযাজক রেভারেন্ড জোনস্ মাঝে মধ্যে আসতেন। তিনি অনেকটা নার্ভাস ধরণের লোক ছিলেন। সুন্দর সুরে বাইবেল পড়তে পারতেন। ধর্মীয়

কথাবার্তা বেশি বলতেন। ব্রাদার সেপ্টেম্বর নামে একজন শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাজকও আমাদের সভায় মাঝে মধ্যে আসতেন। একদিন তার ব্রিফকেসে সানডে টাইমসের একটি কপি পাওয়া গেল। কর্তৃপক্ষ সেটা রেখে দিল। এরপর তিনি আর কখনও সংবাদপত্র নিয়ে আসেননি।

রেভারেন্ড এন্ড্রু শেফার ছিলেন আফ্রিকার ডাচ রিফমর্ড মিশন চার্চের ধর্মযাজক। আফ্রিকানরা এ চার্চে বেশি যেতেন। তিনি রাজনৈতিক বন্দিদের পরিবর্তে সাধারণ বন্দিদের ধর্ম শিক্ষা দিতেন। কিন্তু রোববার আমাদের সেকশন দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা দেন না কেন? তিনি অনেকটা অবজ্ঞার সাথে বললেন, তোমাদের মত মুক্তিযোদ্ধাদের আমি ঘৃণা করি। তোমরা মদ গাঁজায় বুদ হয়ে থাক। গ্রেফতারের সময়ও তোমরা নেশাগ্রস্ত ছিলে।

আমি বললাম, আপনার এ ধারণা ভুল, একদিন আপনি সময় করে সেলে আসুন। আপনার ভুল ভেঙ্গে দিব।

রেভারেন্ড শেফার আমাদের ঘৃণা করলেও আমি তাকে শ্রদ্ধা করতাম। কারণ ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন বেশ পারদর্শী। এ প্রসঙ্গে তিনজন বিজ্ঞ লোকের গল্পটির মর্মার্থ বলতে হয়। সবাই বিশ্বাস করে প্রাচ্যের ওই তিন বিজ্ঞ লোককে একটি তারকা পথ দেখিয়ে বেথেলহেম নিয়ে আসে। কিন্তু শেফার বলতেন, এটা কুসংস্কার। এখানে কোন অলৌকিকতা নেই। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টি পারিষ্কার করেন।

আস্তে আস্তে রেভারেন্ড শেফারের সাথে সম্পর্ক ভাল হতে থাকে। তিনি আমাদেরকে সহজভাবে গ্রহণ করেন। মাঝে মধ্যে আমাদের সঙ্গে রসিকতাও করতেন। একদিন বললেন, দেশের জটিল জটিল কাজগুলো করতে হয় শ্বেতাঙ্গদেরই। কৃষ্ণাঙ্গরা জটিল কাজ দেখলে *'ইনগাবিলুঙ্গো'* বলে ভয়ে পালায়। এই বলে তিনি হেসে ফেললেন। আমরাও তার সঙ্গে হাসলাম। ইনগাবিলুঙ্গো কোজা ভাষার শব্দ। এর অর্থ– 'এটি সাদাদের কাজ'।

এ বছরের বড়দিনটা আগের তুলনায় কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। এবার বড় দিনে আমাদের বেশ আরাম আয়েশ দেয়া হল। কাজ করতে খনিতে যেতে হল না। দিনটি অনেকটা ছুটির দিনের মত শুয়ে বসে আনন্দ করে কাটালাম। বড়দিনে আমরা অল্প পরিমাণ মিষ্টান্ন কিনতে পারলাম। আমাদেরকে অন্যদিনের মতই খাবার দেয়া হল। রাতে এক মগ কফি দেয়া হল।

বড়দিন উপলক্ষে আমাদেরকে সংগীতানুষ্ঠান করার অনুমতি দেয়া হল। প্যান আফ্রিকানিস্ট কংগ্রেস (প্যাক) নেতা সিলবি খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। তাকে গায়ক হিসেবে নির্বাচিত করা হল। হারমোনিয়াম তবলা ড্রামসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র জোগার করা হল। কারাপ্রাঙ্গনে বড় দিনের সকালের দিকে এ সংগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। সিবুলি বড়দিনের কিছু ইংরেজী গান

গাইলেন। এরপর গাইলেন, আফ্রিকানদের কিছু সংগ্রামী গান। কর্তৃপক্ষ অবশ্য এসব গানের মর্মার্থ বুঝতে পারল না। সবাই গান দারুন উপভোগ করলাম। আমি গান না গাইলেও ড্রাম বাজাই।

৭২

কিছু কারারক্ষী আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা শুরু করল। আমি কখনও গায়ে পড়ে কারারক্ষীদের সাথে কথা বলতাম না। তারা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে বা কিছু জানতে চাইলে তার জবাব দিতাম। বিষয়টি বুঝিয়ে দিতাম। কেউ কিছু শিখতে চাইলে তাকে সে বিষয়ে শিক্ষা দেয়াটা সহজ হয়। তারা প্রায়ই আমার কাছে জানতে চাইত, ম্যান্ডেলা আসলে তুমি কি চাও? এখানে তোমার খাবার দাবার বা থাকার কোন সমস্যা হচ্ছে না। এরপরও তুমি সমস্যা সৃষ্টি কর কেন? তখন আমি খুব শান্তভাবে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কারারক্ষীদের বুঝিয়ে বলতাম। আমাদের নীতি আদর্শ তুলে ধরতাম। এএনসি সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করতাম।

১৯৬৯ সালে তরুণ এক কারারক্ষী বদলি হয়ে রোবেন দ্বীপে আসল। সে শুধু আমার ব্যাপারে জানতে চাইত। কারারক্ষীদের সহযোগিতায় আমি রোবেনদ্বীপ থেকে পালিয়ে যেতে পারি এমন একটা গুজব বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এটি আমার কানেও আসল। একদিন ওই তরুণ কারারক্ষী আমাকে এসে বলল, সে আমাকে পালানোর ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এ ব্যাপারে সে একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। সে পরিকল্পনাটির কিছু বিবরণও আমাকে দিল। বলল, সমুদ্রের তীরে সে নৌকা ঠিক করে আসবে। রাতের অন্ধকারে এসে আমাকে সেল থেকে বের করে নৌকায় তুলে দিবে। এ কাজে সে একজন সহযোগির সহায়তা নিবে। সেই সহযোগী কাকে করা হবে সেটা এখনও নির্ধারণ করেনি। তার ডিউটি যখন আমার সেলে পড়বে তখনই সে ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। সে আরো জানায়, নৌকায় নানা সরঞ্জাম থাকবে। সেগুলি ব্যবহার করে ইচ্ছে করলে ডুব দিয়ে বা সাঁতার কেটে অনেক দূর যাওয়া যাবে। কোনমতে কেপটাউনের সমুদ্রের তীরে পৌঁছতে পারলে আমাকে স্থানীয় বিমানবন্দর থেকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

আমি মনোযোগ দিয়ে তার পরিকল্পনার কথা শুনলাম। এটি যে একটি অবাস্তব পরিকল্পনা সেটি আমি বুঝতে পারলেও তাকে বুঝতে দিলাম না। বিষয়টি নিয়ে ওয়াল্টারের সঙ্গে আলাপ করলাম। ওই তরুণ কারারক্ষীকে যে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না সে ব্যাপারে সবাই মোটামুটি একমত পোষণ করলাম। আমি পালাব না— একথা কখনও তাকে বললাম না। ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোন আগ্রহও আমি প্রকাশ করিনি। কিছু দিন পর ওই কারারক্ষীকে বদলি করা হয়। পরে জানতে পারলাম সে ছিল গোয়েন্দাদের এজেন্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার

গোয়েন্দা সংস্থা ব্যুরো অব স্টেট সিকিউরিটি (বস) তাকে পাঠিয়েছিল। তারা আমাকে নিয়ে ভয়ানক খেলা খেলতে চেয়েছিল। করেছিল গভীর ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে আমাকে ওই কারারক্ষীর মাধ্যমে রোবেন দ্বীপ থেকে নিরাপদে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হত। বিমানে ওঠার আগে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা আমাকে গুলি করে মেরে ফেলত। আমাকে শেষ করে দেয়ার এই পুরো পরিকল্পনাটি করেছিল বস।

রোবেন দ্বীপে একজন কমান্ডিং অফিসারকে তিন বছরের বেশি রাখা হত না। ১৯৭০ সালে নতুন কমান্ডিং অফিসার আসলেন। তার নাম ছিল কর্নেল ভ্যান আরাদে। তিনি ছিলেন খুব ভদ্র। আমাদেরকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দিতেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অন্যরকম পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইল। তাই তাকে সরিয়ে দ্বীপে নতুন কমান্ডিং অফিসার কর্নেল পিয়েট বাডেনহর্স্টকে পাঠানো হল।

পিয়েট ছিলেন খুবই সাংঘাতিক ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। নিষ্ঠুরতার জন্য পুরো দক্ষিণ আফ্রিকায় তার খ্যাতি ছিল। জেলখানায় সবার মুখে মুখে তার কুকীর্তির কথা প্রচলিত ছিল। তাকে রোবেন দ্বীপে পাঠানো একটি বিষয় পরিষ্কার হল যে, কর্তৃপক্ষ মনে করছিলেন রোবেন দ্বীপে আগের মত শৃংখলা নেই। তাই শৃংখলা ফেরাতে হবে। কঠোরভাবে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

রোবেন দ্বীপে যখনই কোন নতুন কমান্ডিং অফিসার আসতেন আমি তার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানাতাম। তার সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করতে বলতাম কর্তৃপক্ষকে। নতুন কমান্ডিং অফিসারের ব্যক্তিত্বকে যাচাই করে নেয়াই ছিল আমার ওই সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য। বরাবরের মত এবারও নতুন কমান্ডিং অফিসার পিয়েটের সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানালাম। তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। রোবেন দ্বীপে তিনি ছিলেন প্রথম কমান্ডিং অফিসার যিনি আমার সঙ্গে বৈঠক করতে অস্বীকৃতি জানান।

রোবেন দ্বীপে এসে পিয়েট পুরনো কারারক্ষীদের বদলি করলেন। তাদের জায়গায় অনেক তরুণ কারারক্ষী নিয়ে আসলেন। আমাদের জীবনকে বিষিয়ে তোলার জন্য এ ব্যবস্থা নেয়া হল। কয়েকদিনের মধ্যেই জোর-জুলুম শুরু হল। কোন রকম কারণ ছাড়াই অনেকের খাবার প্রত্যাহার করা হত। এতে ওই বেলা সে বন্দিকে উপোষ থাকতে হত। খনিতে কাজের পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়া হল।

পিয়েট রোবেন দ্বীপের পরিবেশকে ষাট দশকের আগের পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। এ সময় সব বিষয়ে আমাদেরকে কেবল না শুনতে হত। বন্দিরা তাদের আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তার অনুমতি দেয়া হত না। সব অভিযোগই উপেক্ষা করা হত। অভাব অভিযোগ বা কোন দাবী-দাওয়াই মানা হত না। কোন কারণ ছাড়াই আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের নির্ধারিত তারিখ বাতিল করে দেয়া হত। খাবারের মান খারাপ হতে থাকল। নিষেধাজ্ঞার পরিধি বিস্তৃত হল।

পিয়েট আসার এক সপ্তাহ পার হল। একদিন আমরা চুনাপাথরের খনিতে কাজ করছিলাম। সকালের দিকে হঠাৎ পিয়েট গাড়ি চালিয়ে ওই এলাকায় আসলেন। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। আমরা তির্যক দৃষ্টিতে আমাদের নতুন কমান্ডিং অফিসারকে এক নজর দেখে নিলাম। এমন সময় পিয়েট আমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, ম্যান্ডেলা তোমার পাছায় আঙ্গুল ঢুকাও। একথা শুনে আমার গায়ে আগুন জ্বলে উঠল। হাতের শাবল নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম। পিয়েট পেছাতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তার কাছাকাছি চলে গেলে পিয়েট গাড়িতে উঠে দ্রুত ওই স্থান ত্যাগ করেন। পিয়েট চলে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মাথায় একটি ট্রাক এসে উপস্থিত হল। আমাদেরকে বি সেকশনে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য ট্রাকটি পাঠানো হয়। সবাইকে ট্রাকে তোলা হল। সবাইকে চুপ থাকতে নির্দেশ দেয়া হল। জেলখানার খোলা প্রাঙ্গনে আমাদের সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে বলা হল। পিয়েট আসলেন। তিনি ছিলেন খুবই উত্তেজিত। ঠোঁট কাঁপছিল। কথা বের হচ্ছিল না। হঠাৎ তিনি আমাদের মায়েদের উদ্দেশ্যে অশালিন ও কুরুচিপূর্ণ একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন। আমরা ক্ষোভে ফেটে পড়লাম। কিন্তু পরক্ষণেই রাগ হজম করে ফেললাম। এর পর পিয়েট বললেন, আজ থেকে তোমাদের শ্রেণী বিভাগ মর্যাদা কেড়ে নেয়া হল। পিয়েট জানতেন না আমরা ছিলাম রোবেন দ্বীপের সর্ব নিম্ন শ্রেণীর বন্দি। তাই আমাদের বন্দির মর্যাদা কেড়ে নেয়া বা শ্রেণী বিভাগ মর্যাদা হ্রাস করলে কোন ক্ষতি হবে না। সেটা তখন তার বোধগম্য ছিল না। রোবেন দ্বীপের অধিকাংশ বন্দি ছিলেন সি শ্রেণীর। তারা পড়াশুনা করতে পারত। কিন্তু আমরা ছিলাম ডি শ্রেণীর বন্দি। আমরা পড়াশুনার সুযোগ সেভাবে পেতাম না। তাই তার ওই নির্দেশে আমাদের মনে তেমন রেখাপাত করল না।

৭৩

১৯৭১ সালের মে মাস। সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকান অর্গানাইজেশনের (সোয়াপো) কিছু নেতা কর্মীকে শাস্তি দেয়ার জন্য জেলখানার নির্জন বা বিচ্ছিন্নকরণ সেকশনে পাঠানো হল। সোয়াপো ছিল এএনসির মিত্র সংগঠন। নামিবিয়ায় এরাও এএনসির পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত ছিল। সোয়াপোর নেতা কর্মীদের নির্জন সেলে পাঠানো হয়েছিল আন্দিবা টয়ভো জা টয়ভোর নেতৃত্বে। টয়ভো ছিলেন সোয়াপোর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা। খবর পেলাম টয়ভো ও তার সঙ্গীরা নির্জন সেলে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন। আমারও অনতিবিলম্বে তার সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে অনশন ধর্মঘটে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের এই সিদ্ধান্ত পিয়েট বেডেনহর্স্টকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। আমাদের এ সিদ্ধান্ত পিয়েটের কাছে অগ্রহণযোগ্য ও জেলখানার নিয়ম ভঙ্গের শামিল বলে মনে হল।

২৮ মে। গভীর রাত। হঠাৎ কারারক্ষীরা দরজায় টোকা দিতে লাগল। জোরে জোরে চেঁচামেচি শুরু করল। ওঠ ওঠ বলে চিৎকার শুরু করল। আমাদের সবাইকে সেল থেকে বের করে উঠোনে জড়ো করা হল। সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হল। কারারক্ষীদের অধিকাংশই ছিল মাতাল। তারা গালিগালাজও করতে লাগল আমাদেরকে। এ সময় কারারক্ষীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল ফোরি। তাকে গ্যাঙ্গেস্টার বলেও ডাকা হত।

তখন ছিল গভীর রাত। প্রচণ্ড শীত। ঠাণ্ডায় আমাদের জমে যাওয়ার অবস্থা হল। এরপরও আমাদের কয়েকঘণ্টা মাঠে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। এ সময় আমাদের সেলগুলোতে পর্যায়ক্রমে তল্লাশি করা হচ্ছিল। হঠাৎ ডোভানের বুক ব্যথা শুরু হল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। এ দৃশ্য দেখে ফোরি ভয় পেয়ে গেল। আমাদের দ্রুত সেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

কারারক্ষীরা তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করার পরও সেলে কিছু পেল না। পরে জানতে পারলাম আমাদের সেকশনে তল্লাশি চালানোর আগে জেনারেল সেকশনেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল। সে সময় জেনারেল সেকশনের কয়েকজন বন্দিকে কারারক্ষীরা বেদম প্রহার করে। ওইদিন রাতে কারারক্ষীরা টয়ভোর নির্জন সেলেও হানা দেয়। তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে কারারক্ষীরা তাকেও প্রহার করে।

নির্যাতনের এই ঘটনা আমার মনে রেখাপাত করল। কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলাম। কাজ হল না। পিয়েটে বেডেনহর্স্টের বাড়াবাড়ি আর সহ্য হচ্ছিল না। একটা কিছু করার চিন্তা করলাম।

পিয়েটের কারণে রোবেন দ্বীপের অবস্থা যাতে আর খারাপ না হতে পারে সে জন্য দ্রুত উদ্যোগ নেয়ার ব্যবস্থা নিলাম। আমাদের লোকজনের মাধ্যমে বাইরে চিঠি পাঠালাম। পিয়েটের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দলের নেতাকর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানালাম। একই সঙ্গে পিয়েটের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার জন্য আমরা নিজেরা একটা কমিটি গঠন করলাম। সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে এ কমিটি গঠন করা হল। এতে এএনসির প্রতিনিধি ছিলাম ওয়াল্টার ও আমি।

আমাদের অনশন, কাজ বন্ধ করে দেয়ার হুমকিসহ নানা তৎপরতার কারণে পিয়েটে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হলেন। আলোচনার সময় আমরা নানা অভিযোগ উত্থাপন করলাম। তিনি যেসব অধিকার হরণ করেছিলেন, যেসব সুযোগ-সুবিধা হ্রাস করেছিলেন সেগুলি ফিরিয়ে দিতে বললাম। উনি রাজি হলেন। আমরা এটাকে বিজয় হিসেবে দেখলাম।

কয়েক সপ্তাহ পর বুঝতে পারলাম দ্বীপে কেউ যে পরিদর্শন করতে আসছেন। কর্তৃপক্ষের নমনীয় আচরণ থেকে এটা অনুমান করলাম। একদিন খনিতে কাজ করার সময় বৃষ্টি এল। কারারক্ষীরা আমাদের কাজ বন্ধ করে ছাউনির নিচে এসে দাঁড়াতে বলল। অন্যসময় বৃষ্টির মধ্যেই কাজ করতে হত। একদিন পর জানতে পারলাম কয়েকজন বিচারপতিদের একটি দল রোবেন দ্বীপ পরিদর্শনে আসছেন। কর্তৃপক্ষ বিচারকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বন্দিদের তাদের একজন মুখপাত্র ঠিক করতে বলল। সবাই মিলে আমাকে ঠিক করলেন।

আমি বিচারকদের সঙ্গে বৈঠক করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। এ সময় নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানতে পারলাম, এখন জেনারেল সেকশনে প্রায়ই বন্দিদের ওপর নির্যাতন করা হয়।

যে তিনজন বিচারপতি রোবেন দ্বীপ পরিদর্শনে আসলেন তাদের মধ্যে ছিলেন– বিচারপতি জেন স্টেইন, এম, ই থেরন ও মাইকেল করবেট। এরা সবাই ছিলেন কেপ প্রদেশের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি। কারাকমিশনার জেনারেল স্টেইন ও পিয়েট বিডেনহর্স্ট তিন বিচারপতিকে গার্ড দিয়ে আমাদের কাছে নিয়ে আসেন।

আমরা যেখানে কাজ করতাম তার ঠিক বাইরে বিচারপতিদের সঙ্গে আমার বৈঠক হয়।

জেনারেল স্টেইন বিচারপতিদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং বলেন বন্দিরাই আমাকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করেছে। বিচারপতিরা আমাকে বলেন, তারা আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চান।

আমি বললাম, ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে আমার কোন আপত্তি নেই। আবার সবার সামনে কথা বলতেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ আমি কোন বিষয়ে লুকোচুরি করবো না। বাড়িয়ে বলবো না। তাই কর্তৃপক্ষ এগুলো শুনলেও কোন অসুবিধা নেই। আমি স্টেইন ও পিয়েটের সামনেই বিচারপতিদের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যাতে তাদের সামনেই তারা অপদস্থ হয়। এছাড়া আমাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেলকর্তৃপক্ষ কি বলে সেটাও তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাবে।

আমি বলতে শুরু করলাম। সম্প্রতি জেনারেল সেকশনে বন্দি নির্যাতনের বিষয়টি উল্লেখ করলাম। বললাম, কারারক্ষীরা কয়েকদিন আগে অকারণে কয়েকজন বন্দিকে নির্মমভাবে পিটিয়েছে। এসময় পিয়েট ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করল।

আমার কথা শেষ না হতেই পিয়েট বলে উঠল, তুমি তো নির্যাতনের সময় সামনে উপস্থিত ছিলে না। আমি বললাম, আমি সেখানে ছিলাম না এটা ঠিক। কিন্তু যারা আমার কাছে ওই নির্যাতনের কথা বলেছে তারা খুবই বিশ্বস্ত। একথা শুনে পিয়েট আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বিচারপতিদের সামনেই আঙ্গুল উঁচিয়ে বলতে থাকে, ম্যান্ডেলা সাবধান হয়ে যাও। যেটা তুমি নিজের চোখে দেখনি সে ব্যাপারে এভাবে অভিযোগ করলে তুমি সমস্যায় পড়ে যাবে। আমি কোন প্রকৃতির লোক সেটা তুমি ভাল করে জান।

আমি পিয়েটের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বিচারপতিদের উদ্দেশ্যে বললাম, আপনারা নিজেরাই দেখছেন কেমন কমান্ডিং অফিসারের অধীনে আমাদের চলতে হচ্ছে। আপনাদের উপস্থিতিতে সে আমাকে হুমকি ধামকি দিচ্ছে। আপনাদের অনুপস্থিতিতে সে কি করতে পারে তা তো চিন্তার বাইরে। বিচারপতিরা এ সময় বললেন, এই বন্দিটি ঠিকই বলছে।

বিচারকদের কাছে খাবার-দাবার, কাজ, পড়াশুনা ইত্যাদি ব্যাপারেও নানা অভিযোগ করলাম। আলোচনা শেষে বিচারপতিরা আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। বিদায় নিয়ে চলে আসলেন।

বৈঠকের পর বিচারপতিরা কর্তৃপক্ষকে কি বলেছেন তা আমি শুনিনি। তবে এ বৈঠকের পর থেকে পিয়েট বিডেনহস্টের বাড়াবাড়ি অনেক কমে গেল। হয়রানি করাও কমিয়ে দিলেন। বিচারকদের পরিদর্শনের তিন দিনের মাথায় পিয়েটের বদলির আদেশ হল।

পিয়েট বেডেনহস্টের বিদায়ের আগে আমাকে হেড অফিসে ডেকে পাঠানো হল। কারা কমিশনার জেনারেল স্টেইন তখন রোবেন দ্বীপ পরিদর্শনে ছিলেন। কোন অভিযোগ আছে কিনা আমার কাছে জানতে চাইলেন। আমি তার হাতে একটি তালিকা তুলে দিলাম। এতে আমাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার বিবরণ ছিল। কারা কমিশনারের সাথে আলাপ শেষে পিয়েট মুখ খুললেন। আমার সঙ্গে আলাপচারিতা শুরু করলেন।

পিয়েট বললেন, তিনি এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। দ্বীপের বন্দিদের সৌভাগ্য কামনা করছেন। পিয়েট অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত ভাষায় কথাগুলো বললেন। তাকে এত ভদ্রভাবে এর আগে কখনও কথা বলতে শুনিনি। আমিও তাকে ধন্যবাদ জানালাম। তার সৌভাগ্য কামনা করলাম।

৭৪

আমাদেরকে জানানো হল কর্নেল পিয়েট বিডেনহস্টের জায়গায় কর্নেল উইলিয়াম আসছেন। আমি উইলিয়ামের সঙ্গে দেখা করার জন্য আবেদন জানালাম। আমাকে সুযোগ দেয়া হল। তিনি দ্বীপে আসার পরপরই তার সঙ্গে আমি বৈঠক করলাম। বিভিন্ন উপদেশ দিলাম। তাকে খুব খোলাসা মনের মানুষ মনে না হলেও ভদ্র ও বিনয়ী বলে মনে হল। ধারণা করলাম পূর্বসূরী পিয়েটের মত কাজ করবেন না তিনি। তার উল্টো পথে হাঁটবেন। তার নেতৃত্বে দ্বিপের অবস্থার উন্নতি হবে।

উইলিয়াম আসার পরপরই উদ্যত প্রকৃতির তরুণ কারারক্ষীদের প্রত্যাহার করা হল। খনি এলাকায় এবং আমাদের সেকশনে আবার আগের পরিবেশ ফিরে আসতে শুরু হল। কাজ করার সময় আবার আগের মত কথাবার্তা শুরু করলাম। উইলিয়াম একজন যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন। নিয়মনীতির প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। খনি এলাকায় আমরা কথাবার্তা বেশি বলতাম। এটা তাকে আশাহত করল। আমাদের এ আচরণে তিনি ব্যথিত হলেন।

খনিতে আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উইলিয়াম আমাকে হেড অফিসে ডেকে পাঠালেন। খুব খোলাখুলিভাবে বললেন, ম্যান্ডেলা, আমার আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। আমাকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। উনি বললেন, খনিতে আপনার লোকেরা কাজ করে না। আমাদের আদেশ মানে না। তাদের যা মনে চায় তাই করে। এটা জেলখানা। এখানে কিছু শৃংখলা মেনে চলতে হয়। শৃংখলা শুধু আমাদের জন্য নয়, আপনার জন্যও ভালো। আমাদের ওপরও কিছু নির্দেশনা থাকে। আমরা সেগুলো পালন করাতে না পারলে আগের মত কাউকে দ্বীপে পাঠানো হবে।

আমি মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনলাম। বললাম, আপনি যা বললেন তা সম্পূর্ণ যৌক্তিক। তবে এ ব্যাপারে এখন কিছু বলতে পারবো না। সতীর্থদের সঙ্গে বৈঠক করে আপনাকে সব কিছু জানাবো। সে সময় এক সেলের সবাইকে নিয়ে বৈঠক করা ছিল নিষিদ্ধ। আমি সেলের সবাইকে নিয়ে বৈঠক করার অনুমতি চাইলাম। তিনি সময় চাইলেন। অনেক ভেবে চিন্তে উইলিয়াম আমাকে বৈঠক করার অনুমতি দিলেন। বিকেলে কারাগারের খোলা মাঠে সবাই বৈঠকে বসলাম। কারারক্ষীরা চারদিকে দাঁড়িয়ে আমাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। কমান্ডিং অফিসার উইলিয়ামের কথা সবার কাছে তুলে ধরলাম। বললাম, আমাদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে আমাদের একটা সমঝোতায় আসতে হবে। তা না হলে আমাদের জন্যই বিপদ নেমে আসবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম,

আমরা অবশ্যই কাজ করবো। কাজে গতি সঞ্চারের জন্য যতটুকু কথা বলা দরকার ততটুকুই বলবো। এর বেশি নয়। এরপর থেকে কাজের ব্যাপারে কমান্ডিং অফিসারের কাছ থেকে আর কোন অভিযোগ আসেনি।

উইলিয়ামের মেয়াদ কাল ছিল ১৯৭১-৭২ সাল। এ সময় এমকে বিরোধী অভিযান সরকার বাড়িয়ে দেয়। ফলে রোবেন দ্বীপে বন্দি এমকে সৈন্যদের আগমন বেড়ে যায়। এএনসির লোকেরা এভাবে বন্দি হয়ে এখানে আসতে থাকায় মনটা দুঃখে ভরে ওঠে। অলিভার, আমাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প, এমকের সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পর্কে জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি।

রোবেন দ্বীপে যাদের এ সময় আসা শুরু হল তারা ছিল মূলত গেরিলা। বন্দি জীবন তাদের কাছে ছিল দুঃসহ। এ সময় যাদের দ্বীপে আনা হয় তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জিমি এপ্রিল। তিনি ছিলেন এমকের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার। জো স্লোভোর অধীনে কাজ করতেন। রোডেশিয়ায় তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়াই করেছেন। তিনি গ্রেফতার হন দক্ষিণ আফ্রিকায়।

জিমি আমাদের গেরিলা যুদ্ধের গল্প শোনাতেন। একদিন তাকে সেলের শেষ প্রান্তে ডেকে নিলাম। গোপনে এমকের আসল অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। এমকের কোন অভ্যন্তরীণ সমস্যা আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করলাম। আমাকে যখন এমকের প্রথম কমান্ডার-ইন-চিফ করা হয় তখন জিমিও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি ছাড়াও এপদে তখন আরো কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

জিমি জানালেন, এমকে শিবিরে কিছুটা অভ্যন্তরীণ কোন্দল আছে। অনেক এমকে অফিসার ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। আমি তাকে এ বিষয়গুলো নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বললাম। কাউকে বলতে বারন করলাম। খুব গোপনে জেলখানা থেকে অলিভারের কাছে চিঠি লিখলাম। এমকের ক্যাম্পগুলোতে ব্যাপক সংস্কার আনার পরামর্শ দিলাম।

একদিন হেড অফিসে কর্নেল উইলিয়ামের সঙ্গে বৈঠক করছিলাম। অফিসের অন্য রুমে অন্য একজন অফিসারের সঙ্গে জিমিকে দেখলাম। হঠাৎ জিমি আমাকে লক্ষ্য করে জোরে জোরে বলতে শুরু করলেন, তারা আমাকে আমার চিঠি দিচ্ছে না। আমি উইলিয়ামের রুম থেকে জোরে বললাম, কি হচ্ছে ওখানে। এই বলে আমি ওই অফিসারের রুমে গেলাম। দেখলাম চিঠির জন্য জিমি বাকবিতণ্ডা করছে। আমি তাকে থামালাম। অফিসার চিঠিটি আমার সামনে মেলে ধরলেন। জিমিকে ঠাণ্ডা করতে বললেন। দেখলাম চিঠিটি রাজনৈতিক। জিমিকে চিঠিটি না দেয়ার সিদ্ধান্তই ঠিক। আমি জিমিকে শান্ত করে বাইরে নিয়ে

আসলাম। এ সময় সিনেমার মত দৃশ্যের অবতারণা হল। এভাবে আমার অন্যতম কাজ হয়ে উঠল আমার লোকদের শান্ত করা। বন্দিদের নিয়ে যখনই কোন সমস্যা হত আমাকে ডাকা হত। বিশেষ করে রোবেন দ্বীপে আগত এমকে সদস্যদের শান্ত করার দায়িত্ব আমার ওপরই বর্তাতো।

এ ঘটনার এক সপ্তাহ পর ওই অফিসার নিজে সেলে এসে জিমিকে তার চিঠিটি দিয়ে যান।

৭৫

একদিন সকালে চুনাপাথরের খনিতে কাজ করতে যাওয়ার বদলে আমাদেরকে ট্রাকে ওঠার নির্দেশ দেয়া হল। ট্রাক নতুন জায়গার উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করল। ১৫ মিনিট পর সমুদ্রের তীরে থামল। আমাদের নিচে নামার নির্দেশ দেয়া হল। সে সময় ভোরের আলোয় চারদিক জ্বল জ্বল করছিল। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ছিল। সমুদ্রের শো শো গর্জন শুনছিলাম আমরা। অদূরে কেপটাউন শহরের বড় বড় অট্টালিকাগুলো দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। জানালার ওপর আছড়ে পড়া সূর্যের আলো যেন প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ছিল।

একজন সিনিয়র অফিসার আসলেন। তিনি বললেন, আমাদের এখানে আনা হয়েছে সমুদ্রের তীর থেকে সমুদ্র শৈবাল সংগ্রহের জন্য।

স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা প্রবাল বা পাথরের সঙ্গে লেগে থাকা শৈবাল সংগ্রহ করে সেগুলো ট্রাকে তুলতে বলা হল। ওখানকার শৈবাল ছিল, লম্বা লম্বা ও সবুজ বর্ণের। অনেক সময় একটি শৈবাল ৬ থেকে ৮ ফুট লম্বা এবং ৩০ পাউন্ড ওজনের হত। আমরা সমুদ্রের তীর থেকে ভেজা শৈবাল সংগ্রহ করে একটু দূরে সারিবদ্ধ করে রাখতাম। একটু শুকালে সেগুলো ট্রাকে তুলতাম। পরে জানলাম, এ শৈবাল জাহাজে করে জাপানে পাঠানো হয়। সেখানে এগুলো দিয়ে সার তৈরি করা হয়।

প্রথম দিন শৈবাল সংগ্রহের কাজ বিরক্তিকর মনে হলেও আস্তে আস্তে তা স্বাভাবিক হয়ে এল। এ কাজে প্রচণ্ড আনন্দ খুঁজে পেলাম। কাজটি করতে খুব শক্তি খরচ করতে হত। পরিশ্রম লাগত। এরপরও সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে কাজ করার আনন্দটাই ছিল আলাদা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা দৃশ্য দেখতাম। আমাদের সামনে দিয়ে বড় বড় জাহাজ চলে যেতে দেখতাম। ঢেউয়ের সঙ্গে ছোট মাছ ভেসে আসত। সেগুলো ধরতাম। নুড়ি, রং বেরঙের পাথর, শামুক, ঝিনুক এগুলোও ভেসে আসত।

আমরা এগুলো নিয়ে খেলায় মাততাম। অনেক সময় পেঙ্গুইনের ঝাঁকে চলে যেতাম। সেগুলোকে তাড়াতাম। সমুদ্রতীর থেকে টেবল পর্বত দেখা যেত। সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। মেঘ ধাক্কা খেত পর্বতের গায়। সূর্যের আলো আছড়ে পড়ত তাতে। তখন এক মনমাতানো দৃশ্যের অবতারণা হত।

গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের পানি চমৎকার মনে হত। শীতকালে ঠাণ্ডা পানি গায়ে এসে বিঁধত। কাজ করতে গিয়ে শামুক ঝিনুক বা প্রবালের সঙ্গে খোঁচা খেয়ে প্রায়ই আমাদের পা কেটে যেত। এরপরও আমরা খনি এলাকার চেয়ে সমুদ্রের তীরে কাজ করা বেশি পছন্দ করতাম। যদিও একটানা বেশি দিন এখানে কাজ করতে দেয়া হত না।

সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার সমুদ্র। কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই আমি সুন্দর সুন্দর প্রবাল ও শামুকের খোসা পেতাম। সেগুলো সেলে নিয়ে আসতাম। একদিন পানিতে এক বোতল মদ পেলাম। বোতলের ঢাকনা লাগানো ছিল। বোতলটি ছিল সম্পূর্ণ ইনট্যাক। যারা এটি পান করল তারা জানাল এর স্বাদ ও গন্ধ ছিল ভিনেগারের মত।

স্রোতের সঙ্গে অনেক কাঠ ভেসে আসত। প্যাক সদস্য জেফ মেসিমোলা ছিলেন ভালো শিল্পী ও ভাস্কর। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তিনি ওই কাঠ দিয়ে আমার জন্য একটি বুকশেলফ বানিয়ে দিলেন। এটি আমি অনেক বছর ব্যবহার করেছিলাম। পরিদর্শকরা আসলে অবশ্য কর্তৃপক্ষ বলত, তারাই এটি আমাকে দিয়েছেন।

সমুদ্র সৈকতে কাজের পরিবেশ খনি এলাকার চেয়ে বেশ আরামদায়ক ছিল। সমুদ্রের তীরে যাওয়ার সময় আমরা বড় এক ড্রাম মিঠা পানি নিয়ে যেতাম। আরেকটি ড্রাম নিয়ে যেতাম খাবার রান্নার জন্য। সামুদ্রিক মাছ, নারকেল এগুলো দিয়ে খাবার রান্না করতাম। সার্বিক পরিবেশ অনেকটা বনভোজনে পরিণত হত।

কারারক্ষীরাও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করত। এরপর সবাই এক সঙ্গে খাবার খেতাম। আমাদের খাবার তালিকায় প্রায়ই চিংড়ি, রূপচাদা ও অন্যান্য সুস্বাদু সামুদ্রিক মাছ থাকত। ১৯৭৩ সালে গোপনে আমরা একটি পত্রিকা সংগ্রহ করেছিলাম। সেখানে প্রিন্সেস এ্যানি ও মার্ক ফিলিপসের বিয়ে অনুষ্ঠানের খবর ছিল।

সাজসজ্জা ও খাবার-দাবারের বিবরণও ছিল। ওই রিপোর্টে লেখা ছিল, বিয়ের অতিথিদের সামুদ্রিক চিংড়ি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এ খবর পড়ে আমরা হাসলাম। কারণ আমরা প্রতিদিনই ওই মাছ খেতাম।

একদিন বিকেলে সমুদ্রের তীরে বসে আমাদের তৈরি খাবার খাচ্ছিলাম। এমন সময় তখনকার প্রধান কারারক্ষী লেফটেন্যান্ট টারব্লান্স আসলেন। আমরা কাজ করার ভান করলাম। তিনি বুঝতে পারলেন। একটি ড্রামে পানি আর অন্যটিতে আমাদের তৈরি খাবার ছিল। তিনি এগিয়ে খাবারের কিছু অংশ মুখে দিলেন। বললেন, চমৎকার। খুবই মজা হয়েছে।

৭৬

রোবেন দ্বীপ আমাদের জন্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মত। বই-পুস্তক পড়ে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করতে পারিনি এখানে থেকে সে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। বন্দিদের মধ্যে বিলি নায়ার, আহমেদ কাদরাদা, মাইক ডিঙ্গাকি, ইডি ড্যানিয়েল ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ ডিগ্রিধারী। রোবেন দ্বীপে তারা ভুগোল, গণিত, সাহিত্য, আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করতেন। ইংরেজি ও আফ্রিকানস ভাষায় এসব পড়াশুনা চলত। অর্জিত জ্ঞান আমরা পরস্পর শেয়ার করতাম। ফলে রোবেন দ্বীপ আমাদের জন্য বলতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এখানে বিভিন্ন বিভাগ, পাঠ্যসূচী গড়ে ওঠে। আমরা সেগুলোর অধ্যাপকে পরিণত হই।

নিজেদের প্রয়োজনেই রোবেন দ্বীপকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করি। দেখা গেল কয়েকজন তরুণ রোবেন দ্বীপে আসল অথচ তাদের এএনসি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। তখন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইতিহাস জানা ওয়াল্টার তাদেরকে এএনসির ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া শুরু করতেন। তার শিক্ষা দেয়ার ধরণ ছিল চমৎকার। তার জানার পরিধিও ছিল অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই ওয়াল্টারের শিক্ষায় মুগ্ধ হতেন সবাই। তার এই অনানুষ্ঠানিক ইতিহাস শিক্ষাই শেষ পর্যন্ত আমাদের পাঠ্যসূচীতে পরিণত হয়। আমাদের সিলেবাসে ইতিহাস ছিল দু'বছর মেয়াদী কোর্স। ওয়াল্টার এএনসির সংগ্রাম, অতীত ইতিহাস সম্পর্কে যেসব লেকচার দিতেন সেগুলিই ছিল আমাদের পাঠ্যসূচী। সিলেবাসে ক্যাথিরও একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্যাথি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দিতেন। ম্যাক পড়াশুনা করেছিলেন জার্মানিতে। তিনি আমাদের মার্কসিজম তথা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে পড়াতেন।

আমদের শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ মোটেই ভাল ছিল না। খনিতে বা সমুদ্রের তীরে কাজের ফাঁকে আমরা গোলাকার হয়ে বসতাম। তখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যিনি বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ তিনি আমাদের ক্লাস নিতেন। আমাদের অধ্যাপক বিভিন্ন তত্ত্ব বা থিওরি নিয়ে আলোচনা করতেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ওয়াল্টারের কোর্সটি ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। আমাদের সঙ্গে থাকা অনেক তরুণ বন্দির এএনসির অতীত ইতিহাস সংগ্রাম, ত্যাগ, দেশের জন্য অবদান সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। এএনসি যে সেই ১৯২০ এর দশক থেকে লড়াই করে আসছে সেটা তারা জানত না। ওয়াল্টার তাদেরসহ আমাদের সবাইকে এএনসির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২০ সাল থেকে আজ অবধি পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস চমৎকারভাবে তুলে ধরতেন। তরুণদের অনেকে ওয়াল্টারের কাছ থেকেই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে।

ইতিহাস ছিল জেনারেল সেকশনের বিষয়। এজন্য খনি এলাকায় কর্মরত জেনারেল সেকশনের অনেক বন্দিরাও এ ক্লাশে অংশ নিতেন। এভাবে এসব শিক্ষার্থী জেনারেল সেকশন আমাদের প্রতিনিধিতে পরিণত হয়। শিক্ষকরা অনেক সময় তাদের মাধ্যমে গোপনে সেখানে চিঠি পাঠাতেন। জেনারেল সেকশন থেকে আসা চিঠির উত্তর দিতেন।

শিক্ষাদানের এ কার্যক্রম সবার জন্য ভালো সুফল বয়ে আনল। যারা আমাদের সঙ্গে ক্লাসে অংশ নিতেন তাদের অনেকেরই কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। আমাদের সঙ্গে ক্লাসে অংশ নিয়ে তারা অনেক কিছু শিখতে সমর্থ হন। কঠোর কাজের ফাঁকে তাদের পড়াশুনার মত একটি মহৎ কাজ হয়ে যায়।

কয়েক বছরে অর্থনীতি সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শিখি। আদি যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্ব অর্থনীতির গতি প্রকৃতি বিবর্তন সম্পর্কে আমরা অনেক শিক্ষা অর্জন করি। পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, সমাজতন্ত্রের নাড়িনক্ষত্র জানা হয়। আমি শিক্ষক ছিলাম না। বুদ্ধিজীবীও ছিলাম না। ক্লাসের সময় আমি শুধু প্রশ্ন করতাম। লেকচার দেয়ার চেয়ে প্রশ্ন করাটাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতাম।

অনানুষ্ঠানিক পড়াশুনার পাশাপাশি আমার আইনি পড়াশুনাও চলতে লাগল। বন্দিদের আইনি সহায়তা দেয়ার জন্য আমি আমার সেলের সামনে একটি নেমপ্লেট ধাচের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়ার চিন্তাভাবনা করলাম। কিন্তু জেল কোড অনুযায়ী তা নিষিদ্ধ থাকায় ঐ কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আসামীরা তেমন একটা আইনি সুবিধা পেত না। হাজার হাজার নারী পুরুষকে বিনা বিচারে কারাগারে মাসের পর মাস থাকতে হত। খুব অল্প সংখ্যক বন্দি আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ পেত। এরাও আবার আদালতের রায়ের কপি হাতে পেত না। জেনারেল সেকশনের অধিকাংশ বন্দি আইনজীবী নিয়োগের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকত। তাদের সাহায্য করার জন্যই আমি ওই উদ্যোগ নিতে চেয়েছিলাম।

এফ ও জি সেকশন থেকে কয়েকজন বন্দির গোপন চিঠি পেলাম। তারা আমাকে আইনি সহায়তা দেয়ার অনুরোধ জানালেন। আমি তাদের কাছে মামলার বিভিন্ন নথিপত্র চাইলাম। এগুলো আস্তে আস্তে আমার কাছে আসতে লাগল। সেগুলো ছিল অপূর্ণাঙ্গ। এলোমেলো। অগুছালো। প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। আমি পরামর্শ দিয়ে মক্কেলদের কাছে চিঠি লিখলাম। বললাম, তারা যেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে চিঠি লিখে মামলার পূর্ণাঙ্গ নথিপত্র সংগ্রহ করে। চিঠি লিখলে অনেক সময় রেজিস্ট্রার দয়াপরবশ হয়ে সেসব নথি বন্দিদের কাছে পাঠিয়ে থাকেন।

আমার পরামর্শে অনেকেরই কাজ হল। মামলার কাগজপত্র পাওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে অনেকেই শাস্তি থেকে রেহাই পান। যারা এতদিন জেলখানায় নিজেদের অসহায় ভাবতেন তাদের কাছে আমি ভরসার পাত্র হয়ে উঠি।

৭৭

আমার স্ত্রীর ওপর জোর জুলুম চলতে লাগল। ১৯৭২ সালে পুলিশ উইনির অরল্যান্ডো ওয়েস্ট ব্রিকসের ৮১১৫ নম্বর বাসায় হামলা চালাল। লাথি দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ফেলল। দরজার সামনে তারা গুলিবর্ষণ পর্যন্ত করে। ১৯৭৪ সালে উইনির বিরুদ্ধে আইনভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়। গৃহবন্দি অবস্থায় যেসব আইন-কানুন মেনে চলতে হয় উইনি সেগুলো মানছেন না বলে ওই অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

ছেলে-মেয়ে ও ডাক্তার ছাড়া অন্য কাউকে উইনির সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হত না। সে সময় উইনি একটি আইন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেখানে কর্মরত তার এক বন্ধু একদিন দুপুরে জেনি ও জিনদজিকে দেখার জন্য বাসায় আসে। এ জন্য উইনির বিরুদ্ধে বিধি ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয় এবং তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। তাকে *অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের ক্রুনস্ট্যান্ড* জেলখানায় রাখা হয়। প্রিটোরিয়ার চেয়ে এ জেলখানাটি বেশ ভালো। এখানে উইনিকে অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। কারারক্ষীরা ছিল নমনীয়। ফলে উইনি বেশ স্বাধীনভাবেই এখানে ৬ মাস কাটিয়ে দেন। জেনি ও জিনদজিকে প্রতি রোববার তাদের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হত।

উইনি জেলখানা থেকে মুক্তি পান ১৯৭৫ সালে। জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েই উইনি একজন আইনজীবীর মাধ্যমে আমাকে চিঠি লেখেন। জিনদজিকে আমার সঙ্গে দেখা করানোর উদ্যোগ নেন। জেলখানার নিয়ম অনুসারে ২ থেকে ১৬ বছর বয়সি বাচ্চারা কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করতে পারে না। বাচ্চাদের মনমানসিকতার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে এ আশঙ্কায় বাচ্চাদের

আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হত না। ১৯৭৫ সালে জিনদজির বয়স ছিল ১৫ বছর। উইনি মেয়ের বয়স ১৬ দেখিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করানোর উদ্যোগ নিল। কিন্তু সার্টিফিকেটে কোন পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করেন। দরখাস্তে জিনদজিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। কর্তৃপক্ষ দরখাস্ত মঞ্জুর করেন।

ডিসেম্বরে জিনদজির সঙ্গে আমার দেখা করার দিন তারিখ ঠিক করা হয়। এর আগে উইনির মা অর্থাৎ আমার শাশুড়ি রোবেন দ্বীপে আসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। পরিদর্শন রুমে আসার পর দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়। শাশুড়িকে আমি বলি, আম্মা আমার খুব ভাল লাগছে যে জিনদজির সঙ্গে আমার দেখা হতে যাচ্ছে। শাশুড়ি ছিলেন, স্কুল শিক্ষিকা। এ কথা শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। বললেন, ওর বয়স তো ১৬ বছর হয়নি। ও এখানে আসবে কি করে? এ সময় চারদিকে কারারক্ষীরা ছিল। বিষয়টি হাল্কা করার জন্য বললাম, না এমনিতেই বললাম। কিন্তু আমার শাশুড়ির নাতনীর জন্য দরদ উথলে উঠল। তিনি বিষয়টিকে সিরিয়াসভাবে নিলেন। বললেন, ম্যান্ডেলা ওকে এখানে আনা ঠিক হবে না কারণ ওর বয়স এখানো ১৬ বছর হয়নি।

আমি তাকে চোখে ইশারা করে জিনদজি প্রসঙ্গটি না তোলার অনুরোধ জানালাম।

জিনদজির বয়স যখন ৩ বছর সে সময় তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়। সে এমনই এক দুর্ভাগা কন্যা যে তার বাবাকে এতদিন শুধু ছবিতে দেখেছে। বাস্তবে দেখতে পারেননি। জিনদজি আসার দিন আমি পরিষ্কার জামা পরলাম। মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে গেলাম। তার বাবা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে এটা তাকে বুঝতে দিতে চাইলাম না। যথাসময়ে পরিদর্শক রুমে তারা আসল। উইনিকে এক বছর পর দেখলাম। তাকে সুস্থ্য সবল দেখে বেশ আহ্লাদিত হলাম। সবচেয়ে খুশি হলাম আমার মেয়েকে দেখে। সে অনেক বড় হয়ে গেছে। দেখতেও বেশ চমৎকার। মা-মেয়ের মাঝে অনেক মিল খুঁজে পেলাম। এ যেন যৌবনকালের আরেক উইনি। জিনদজি দেখতে ওর মায়ের মতই সুন্দর হয়েছিল।

জিনদজি প্রথমে দেখে একটু লজ্জা পেল। কথা বলতে ইতস্তত করল। আমি তাকে দূর থেকে কতটা ভালবাসি সেটা তার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না– এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম।

জিনদজি চটপটে ও খিটখিটে মেজাজের ছিল। তার মাও এ বয়সে এমনটি ছিল। আমার সঙ্গে প্রথম দর্শনে সে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করবে এটা আমি জানতাম। তাই পরিবেশটা হৃদ্যতাপূর্ণ ও স্বাভাবিক করার সাধ্যমত চেষ্টা করলাম আমি। জিনদজিকে আমি নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। তার দৈনন্দিন বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চাইলাম। তার পড়াশুনা, স্কুল জীবন, বন্ধুবান্ধবদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলাম। এরপর তাকে ঘিরে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করলাম। তার

শৈশবে ফিরে গেলাম যেটা তার পক্ষে স্মরণ করা ছিল অসম্ভব। ওর মা রান্না করার সময় আমি ওকে কিভাবে সামাল দিতাম সে কথা বললাম। ছোট বেলায় ও খুব কান্নাকাটি করত। রাগ করত। সে কথাও বললাম। ওকে নিয়ে যেসব খেলাধুলা করতাম তার বিবরণ দিলাম। ওর ছোট্ট বেলার রাগ, মান-অভিমানের স্মৃতি রোমন্থন করলাম। এসব কথা শুনে জিনদজির চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।

উইনির সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারলাম ব্রাম ফিশ্চার ক্যান্সারে মারা গেছেন। জেল থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে বাড়িতে যাওয়ার পরই তিনি এই দূরারোগ্য ব্যধিতে মারা যান। তার মৃত্যু আমাকে গভীরভাবে শোকাহত করল। মরার পরও সরকার তাকে নিয়ে অনেক টানা হেচড়া করেছে। তার দেহ ভস্ম পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে দেয়নি।

রাইভোনিয়া বিচারের সময় ব্রাম জামিনে ছাড়া পান। কিন্তু তিনি আন্দোলন থেকে বিচ্যুৎ হননি। জামিনে ছাড়া পেয়েই আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে কাজ শুরু করেন। একজন জেনারেলের মত গেরিলা বাহিনীর সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন। তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেন। ব্রাম স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করলেও অন্যদের এভাবে জীবন উৎসর্গ করতে নিরুৎসাহিত করতেন।

জামিনে থাকা অবস্থায় ব্রাম আন্ডারগ্রাউন্ডে তৎপর ছিলেন। ১৯৬৫ সালে তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়। নাশকতার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে দেয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। জেলে থাকা অবস্থায় তাকে বহুবার চিঠি লেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কারণে আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে কর্তৃপক্ষ তাকে জেল থেকে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেয়। ব্লুমফন্টেইনে তার ভাইয়ের বাড়িতে তাকে গৃহবন্দি রাখা হয়। সেখানেই তিনি মারা যান।

ব্রাম ছিলেন অরেঞ্জ রিভার কলোনির প্রধানমন্ত্রীর নাতি। পুরো জীবনটা তিনি উৎসর্গ করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার নির্যাতিত মানুষের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে। এ কাজ করতে গিয়ে তাকে তার স্বগোত্রের লোকদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হয়েছিল। আমার স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎস ছিলেন এই ব্রাম। তার কাছ থেকে নানা ব্যাপারে আমি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। আমাদের শক্তি ও সাহস যোগাতেন ব্রাম ফিশ্চার।

এ সাক্ষাতের এক মাস পর উইনির একটি চিঠি পাই। তাতে সে জানায়, আমার সঙ্গে আবারও দেখা করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু তার সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। একথা শুনে আমি তাৎক্ষণিকভাবে তখনকার প্রধান কারারক্ষী লেফটেন্যান্ট প্রিন্সের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাই। প্রিন্স খুব আধুনিক হলেও অতটা খোলা মনের মানুষ ছিলেন না। প্রিন্সের রুমে গিয়ে আমি বলি, দ্বীপের সার্বিক অবস্থা খুব ভালো। এ সময় উইনিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে না দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। প্রিন্স চুপ

করে আমার কথা শোনেন। আমার কথা শেষে বলেন, মিস্টার ম্যান্ডেলা আপনার স্ত্রী প্রচার চান। সে জন্যই আবার এত অল্প সময়ের ব্যবধানে দেখা করতে চাচ্ছেন। তাকেই আমি দেখা করতে বারণ করেছি।

একথা শুনে মুহূর্তের মধ্যে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে প্রিন্সের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে নিবৃত করলাম। তাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করা থেকে বিরত থাকলাম। আসার সময় বলে আসলাম, ওই ধরণের কথা ভবিষ্যতে বললে ঠিকই তাকে হেনস্তার মুখোমুখি হতে হবে। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শেষে প্রিন্সের রুম থেকে বের হয়ে আসার সময় ক্যাথি ও এ্যাডি ড্যানিয়েলসকে বাইরে দাঁড়ানো দেখলাম। তারা আমাকে ইশারা করলেও আমি জবাব না দিয়ে সেলে চলে আসি।

পরের দিন নাস্তার একটু পরে দুজন কারারক্ষী আমার সেলে প্রবেশ করল। বলল, আমাকে হেড অফিসে যেতে হবে। হেড অফিসে যাওয়ার পর ৬/৭ কারারক্ষী আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। অফিসের এক প্রান্তে ছিলেন লেফটেন্যান্ট প্রিন্স ও একজন ওয়ারেন্ট অফিসার। তিনি কারাগারের সরকার পক্ষের আইনজীবীও ছিলেন। পরিস্থিতি ছিল বেশ উত্তেজনাকর।

ওয়ারেন্ট অফিসার বললেন, ম্যান্ডেলা গতকাল এখানে তুমি চমৎকার একটি মুহূর্ত অতিক্রম করেছ। আজকের এই মুহূর্তটি তোমার জন্য মোটেও সুখকর নয়। প্রধান কারারক্ষীকে অপমান ও হুমকি দেয়ার অভিযোগ আনছি তোমার বিরুদ্ধে? এটা খুব বড় ধরণের অভিযোগ। এই বলে তিনি সমনের কপি আমার হাতে হস্তান্তর করলেন। জানতে চাইলেন, আমার বলার কিছু আছে কিনা। বললাম, না আমার বলার কিছু নেই। যা বলার আমার আইনজীবী বলবে। এই বলে রুম থেকে চলে আসলাম। প্রিন্স চেয়ে রইলেন। কোন কিছু বললেন না।

আমার কি করতে হবে তা ভালো করে জানতাম। দুর্ব্যবহারের অভিযোগ এনে আইন মন্ত্রণালয়ে তার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করলাম। আমি জানতাম পুরো বিচার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ছিল শ্বেতাঙ্গরা। এরপরও আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে মনস্থ করলাম। জর্জ বিজোজকে আমার আইনজীবী নিয়োগ করলাম। তার সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করলাম। জর্জ আসার আগে কর্তৃপক্ষকে বললাম, তাকে কিছু লিখিত নির্দেশনা দিতে চাই। কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিল না। ফলে জর্জকে লিখিত বক্তব্য বা বিবৃতি পাঠাতে কার্যত ব্যর্থ হলাম।

প্রকৃতপক্ষে জর্জকে কর্তৃপক্ষ খুব ভয় করত। তার কাছে লিখিত বিবৃতি পাঠালে তিনি সেটা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে দিতে পারেন এমন আশঙ্কা করতেন তারা। তাদের আরও ভয় ছিল যে, জর্জের মাধ্যমে আমার সঙ্গে অলিভার টামবুর যোগাযোগ হয় কিনা তা নিয়ে। অলিভার তখন লুসাকাতে থাকতেন।

রোবেন দ্বীপের আদালতে শুনানির তারিখ ঠিক করা হল। কেপটাউন থেকে একজন ম্যাজিস্ট্রেট আসলেন বিচার পরিচালনার জন্য। আমাকে বলা হল, আমার আইনজীবী কাল রোবেন দ্বীপে আসবেন। তাকে আমি লিখিত বিবৃতিও দিতে পারব। পরদিন সকালে জর্জ আসলেন। হেড অফিসে আমাকে অল্প সময়ের জন্য মুক্ত করে দেয়া হল যাতে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি। আদালত শুরুর আগে আমরা সংশ্লিষ্ট কথাবার্তা বলি। এমন সময় খবর আসে, প্রিন্স তার অভিযোগ বা মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। বিচারক মামলা খারিজ করে দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যান। জর্জ ও আমি এ ঘটনায় বিস্মিত হই। আনন্দে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরি। এটাকে আমরা বিজয় হিসেবে ধরে নেই।

৭৮

রোবেন দ্বীপে মাঝে মধ্যে আমরা জন্মদিনও উদযাপন করতাম। কেক ও উপহারের বদলে এক কাপ কফি বা একটুকরো রুটি দিয়ে আমরা সতীর্থদের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতাম। ফিকিল বাম ও আমার জন্মদিন ছিল একদিনে। তারিখ ১৮ জুলাই। বড় দিন উপলক্ষে কিনে রাখা মিষ্টি বা চকলেটের কিছু অংশ আমি রেখে দিতাম। জন্মদিনে এগুলো শেয়ার করতাম।

১৯৬৮ সালে আমার ৫০ তম জন্মদিন কোন রাখঢাক ছাড়াই পালিত হয়। কেউ ওই দিনের কথা জানত কেউ জানত না। ১৯৭৫ সালে আমি ৫৭ বছরে পা দেই। আমার ৫৭ তম জন্মদিন ঘটা করে পালনের জন্য ওয়াল্টার ও ক্যাথি বিশাল এক পরিকল্পনা করে।

জনগণকে কিভাবে আন্দোলনে সম্পৃক্ত রাখা যায়– সে বিষয়টি সব সময় আমাদের মাথায় ঘুরপাক খেত। আগের দশক সরকার মিডিয়ার প্রতি ছিল খড়গহস্ত। এমকে, এএনসি, আন্দোলনকারী, কারাগারের বন্দি, রাজনৈতিক নেতাদের খবর, ছবি ছাপানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে সরকার। কোন সম্পাদক যদি জেলখানায় যেতেন বন্দিদের অবস্থা দেখার জন্য তাহলে পরদিন ওই পত্রিকার

প্রকাশনা বন্ধ রাখা হত। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ওই খবর বা ছবি জনগণের হাতে পৌঁছতে না পারে।

একদিন জেলখানার প্রাঙ্গনে ক্যাথি, ওয়াল্টার ও আমি গল্প করছিলাম। তারা আমাকে আমার আত্মজীবনী লেখার পরামর্শ দিলেন। ক্যাথি বললেন, আমার ৫৭ তম জন্মদিনে ওই বই প্রকাশ করা হবে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ওয়াল্টার বললেন, স্মৃতিকথায় জেল-জীবনের স্মৃতি, ও অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক সংগ্রামসহ সবকিছু ভালোভাবে তুলে ধরতে পারলে জনগণ অনেক কিছু জানতে পারবে। আমরা যে এখনও দেশ ও দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি সেটা বুঝতে পারবে। তাদের এই পরামর্শটা আমার কাছে খুব ভালো মনে হল। আমি এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

কোন কিছু করতে মনস্থ করলে আমি সেটা দ্রুত শুরু করে দেই। আত্মজীবনী লেখার ক্ষেত্রেও তাই হল। আমি রুটিন মাফিক কাজ শুরু করে দিলাম। রাতের অধিকাংশ সময় লিখতাম এবং দিনের বেলায় ঘুমাতাম। প্রথম দুই সপ্তাহ রাতের খাবার গ্রহণের পরপরই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। রাত ১০টার দিকে উঠতাম। এর পর সারারাত লিখতাম। নাস্তার সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত আমার লেখা চলত। খনিতে কাজ করার পর রাতের খাবারের আগ পর্যন্ত ঘুমাতাম। রাতের খাবার খেয়ে আবার ঘুমাতাম। উঠতাম রাত ১০ টায়। ভোর অবধি লিখতাম। এভাবে আমার কাজ চলতে লাগল। এভাবে কয়েক সপ্তাহ চলার পর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। কর্তৃপক্ষকে অসুস্থতার কথা জানালাম। তারা আমার অসুস্থতার ব্যাপারে খুব একটা খোঁজ খবর নিলেন না তবে খনি এলাকায় কাজ করানো থেকে বিরত রাখলেন। তখন সারাদিন সেলে ঘুমিয়ে কাটাতাম।

বইয়ের কাজে অন্যেরাও আমাকে সাহায্য করতেন। প্রতিদিন আমি যা লিখতাম তা ক্যাথিকে পড়তে দিতাম। ক্যাথি মনোযোগ দিয়ে তা পড়তেন। এরপর তা পড়তে দিতেন ওয়াল্টারকে। ওয়াল্টারের পড়া শেষ হলে ক্যাথি কপিগুলো আবার নিতেন। মার্জিনের পাশে মন্তব্য লিখে দিতেন। ক্যাথি ও ওয়াল্টার আমার লেখার সমালোচনা করতে কখনো ইতস্তত করতেন না। তাদের পরামর্শ আমি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতাম। এই পাণ্ডুলিপি লালু শিবার কাছে পাঠিয়ে দিতাম। তিনি আমার লেখা ছোট করে আরেকটি পাতায় লিখতেন। আমার লেখা ১০ পৃষ্ঠা তিনি একটি পাতায় নিয়ে আসতেন। এ কাজে তিনি লেখা খুব ছোট করা ছাড়াও শর্টহ্যান্ড পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। এই পাণ্ডুলিপি পাচার করে বাইরে পাঠানোর দায়িত্ব ছিল ম্যাকের।

এভাবে আমার আত্মজীবনী লেখার কাজ চলতে লাগল। আস্তে আস্তে কারারক্ষীদের মধ্যে সন্দেহ বাড়তে থাকল। তারা ম্যাকের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইল। জিজ্ঞেস করল– ম্যান্ডেলার কি হয়েছে। তিনি কি করেন। এত রাত পর্যন্ত সজাগ থাকেন কেন– ইত্যাদি। ম্যাক এক কথায় বলে দিতেন– এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না।

পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে আমি লেখার গতি বাড়িয়ে দিলাম। চার মাসের মধ্যে পুরো বইয়ের একটি খসড়া পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে গেল। আত্মজীবনীতে আমার শৈশব থেকে শুরু করে রাইভোনিয়া বিচার এবং রোবেন দ্বীপের কথা তুলে ধরলাম।

ম্যাক কপি করা পাণ্ডুলিপি তার বইয়ের স্তূফের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল। পড়াশুনার জন্য তার কাছে অনেক বইপত্র ছিল। তাই আমার বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি লুকিয়ে রাখতে তাকে বেগ পেতে হয়নি। ১৯৭৬ সালে ম্যাক মুক্তি পায়। সে সময় তিনি বইয়ের পুরো পাণ্ডুলিপিটি সুকৌশলে জেলখানা থেকে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। তার সঙ্গে কথা ছিল– কপি করা এই পাণ্ডুলিপিটি দেশের বাইরে পাঠাতে সমর্থ হলে তিনি আমাদের জানাবেন। তখন আমরা আমার লেখা ৫০০ পৃষ্ঠার মূল পাণ্ডুলিপিটি ধ্বংস করে ফেলব। এর আগ পর্যন্ত মূল পাণ্ডুলিপিটি আমরা লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেই। দুপুরে কারারক্ষীদের গা ছাড়া ভাব থাকত। এছাড়া অফিসের কাজেও এসময় তাদের ব্যস্ত থাকতে হত। সুযোগ বুঝে সে সময় আমরা জেলখানা প্রাঙ্গনের বাগানে গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে এটি লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেই। সকালে হাঁটার সময় প্রতিদিন এক নজর ওই জায়গাটি পর্যবেক্ষণ করতাম।

কোথায়, কোন গাছের নিচে গর্ত করব তা ঠিক করতে লাগলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা দু'গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কাজ করবো। দুটি গর্ত করবো। কাজ দ্রুত শেষ করে প্লাস্টিকের কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে গর্ত দুটির ভিতরে পাণ্ডুলিপি রেখে মাটি চাপা দিব। কয়েকদিনের মধ্যে আমরা কোদাল, শাবল সংগ্রহ করলাম। একদিন সকালে নাস্তার পর ক্যাথি, ওয়াল্টার, এ্যাডি ড্যানিয়েল ও আমি বাগানের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে চলে গেলাম।

আমাদের সবার শার্টের নিচে পাণ্ডুলিপি ভাগ ভাগ করে লুকিয়ে নিলাম। আমি সিগন্যাল দেয়া মাত্র অন্যরা খনন কাজে লেগে যায়। আমার গ্রুপের লোকেরা ম্যানহোলের পাশে একটি গর্ত করে প্লাস্টিকে মোড়ানো পাণ্ডুলিপি রেখে দিলাম।

এরপর মাটি দিয়ে গর্তটি ভরাট করলাম। অন্য গ্রুপটি দুটি গর্ত করে একই কায়দায় পাণ্ডুলিপি রাখল। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করে আমরা সারিবদ্ধভাবে খনিতে কাজ করার জন্য রওয়ানা দিলাম। পাণ্ডুলিপি নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখতে পেরে খুব শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করলাম। এটা নিয়ে এতদিন আমার যে চিন্তা ছিল তা দূর হল।

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। সকালে বাগানে ও মাঠের দিকে চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। হৈচৈটা ছিল অনেকটা অস্বভাবিক ধাঁচের। দেখলাম জেনারেল সেকশনের একদল বন্দিকে ওখানে জড়ো করা হয়েছে। তাদের হাতে শাবল-কোদাল। আমরা বাগানের যে অংশে পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে রেখেছি ঠিক সে অংশেই দেয়াল তৈরির জন্য তাদেরকে জড়ো করা হয়েছে। নির্জন সেলের বন্দিদের সঙ্গে অন্য কোন কয়েদি যেন যোগাযোগ করতে না পারে সে জন্য এই দেয়াল তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

মুখ ধুতে গিয়ে সেলের বাইরে এসে ক্যাথি ও ওয়াল্টারকে আমি দেয়াল তৈরির বিষয়টি অবগত করি। ক্যাথি বললেন, পাণ্ডুলিপির মূল অংশটি পাইপের নিচে রাখা হয়েছে। গর্ত করার সময় ওই পাইপ বেরিয়ে আসবে। তখন আমরা মাটি সরিয়ে পাইপের নিচেই সেটি রেখেছিলাম। তাই দেয়াল তোলার জন্য মাটি কিছুটা সরালেও পাণ্ডুলিপি কারো নজরে আসবে না। সেটি অক্ষত থাকবে। তবে পাণ্ডুলিপির অন্য দুটি অংশ অরক্ষিত হয়ে পড়বে। দেয়াল তৈরির জন্য মাটি সরাতে গেলে সেগুলি বেরিয়ে আসবে। এ পরিস্থিতিতে কি করা যায় তা নিয়ে আবারো ড্যানিয়েলের সঙ্গে আলাপ করলাম।

সবাই একমত হলাম যে, এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হচ্ছে আমরা চারজন স্বেচ্ছায় দেয়াল তৈরির কাজে লেগে যাব এবং দ্রুত মাটির নিচে রাখা পাণ্ডুলিপির দুটি কপি বের করে নিয়ে আসব। কারারক্ষীদের বলে আমরা সেখানে কিছুক্ষণের জন্য গেলাম। মাটি খুঁড়ে ছোট দুটি বান্ডেল বের করে শার্টের নিচে করে সেলে নিয়ে আসলাম।

পাণ্ডুলিপির অরক্ষিত দুটি অংশ হাতে আসায় আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। এ্যাডি ড্যানিয়েলকে পাণ্ডুলিপির দুটি অংশ সেলে আপাতত লুকিয়ে রাখতে এবং সুযোগ বুঝে ধ্বংস করে ফেলতে বললাম। এ কাজের জন্য ড্যানিয়েল অসুস্থতার ভান করে ওই দিন খনিতে কাজ করতে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন।

পাইপের নিচে থাকা পাণ্ডুলিপির মূল অংশটি শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে কিনা সেটা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। খনি থেকে কাজ করে সেলে এসে জানতে পারলাম পাণ্ডুলিপির ওই অংশটুকু কর্তৃপক্ষের হস্তগত হয়েছে। ড্যানিয়েল অবশ্য তার কাছে থাকা পাণ্ডুলিপির অন্য দুটি অংশ ওইদিনই ধ্বংস করে ফেলেন।

পরের দিন সকালে আমাকে কমান্ডিং অফিসারের অফিসে ডেকে পাঠানো হল। সেখানে গিয়ে দেখি কারা কর্তৃপক্ষের অনেক বড় বড় কর্মকর্তা উপস্থিত। এরা প্রেটোরিয়া থেকে এসেছিলেন। আমাকে কোন সম্ভাষণ না করে কমান্ডিং অফিসার বললেন, ম্যান্ডেলা আমরা আপনার পাণ্ডুলিপি পেয়েছি। আমি কোন উত্তর দিলাম না। কমান্ডিং অফিসার তার চেয়ারে গেলেন। তিনি কিছু কাগজপত্র বের করলেন।

সেখানে আমার হাতের লেখা ছিল। বললেন, এটা কি আপনার হাতের লেখা নয়? আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, এটা আপনার লেখা। আর এটা যদি আপনার লেখা হয় তাহলে ওই পাণ্ডুলিপিও আপনার কাজ। আমি বললাম, এটা বলার আগে কিছু প্রমাণ পেশ করা দরকার। উনি বললেন, তার দরকার নেই। আমাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

কমান্ডিং অফিসার ওই দিন আমাকে কোন শাস্তি দিলেন না। অল্প সময়ের মধ্যে ক্যাথি, ওয়াল্টার ও আমাকে ডেপুটি কারাপরিদর্শক জেনারেল রয়ির রুমে ডেকে পাঠানো হল। বলা হল আমরা পড়াশুনার সুযোগের সৎব্যবহার করছি না। ওই সুযোগের অপব্যবহার হচ্ছে আমাদের দ্বারা। তাই আজ থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সেলে পড়াশুনার সুযোগ স্থগিত থাকবে। এভাবে আমাদেরকে দীর্ঘ ৪ বছর পড়াশুনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

ম্যাক ডিসেম্বরে মুক্তি পান। তিনি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া আমার পাণ্ডুলিপিটি পরে লন্ডনে পাঠিয়ে দেন। মুক্তি পাওয়ার পর ছয় মাস পর্যন্ত তিনি গৃহবন্দী ছিলেন। এর পর লুসাকায় যান। অলিভার টামবুর সঙ্গে দেখা করেন। তারপর যান লন্ডনে। সেখানে তিনি ছয় মাস অবস্থান করেন। বইয়ের কম্পোজ, প্রুফ সব দেখা শেষ করে একটি কপি তিনি অলিভারের জন্য দেশে নিয়ে আসেন। অলিভার ওই কপিটি দিয়ে ঠিক কি করেছিলেন সেটা আজও আমি জানতে পারিনি। কারাগারে থাকা অবস্থায় ওই বইটি প্রকাশিত হয়নি।

৭৯

১৯৭৬ সালে খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি রোবেন দ্বীপ পরিদর্শনে আসেন। তিনি হলেন কারাগার বিষয়ক মন্ত্রী জিমি ক্রুজার। তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর খুব কাছের লোক এবং মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী সদস্য। দেশের সব কারাগারগুলোর দেখাশুনা ছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রাম কঠোর হস্তে দমনের বিষয়টিও তিনি দেখভাল করতেন।

ক্রুজারের আকস্মিক সফরের পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে বলে আমি ধারণা করলাম। অনেক ভেবেচিন্তে কারণটা খুঁজেও বের করলাম। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তখন দু ধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছিল। একটি ছিল শ্বেতাঙ্গদের জন্য। আরেকটি কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য। কৃষ্ণাঙ্গদের উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় কিছু কিছু অঞ্চলের শায়ত্ব শাসন দেয়া হয়।

কিছু অঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গদের সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এমনই একটি এলাকা ছিল ট্রান্সকেই। এর শাসক ছিলেন কে, ডি মাতানজিমান। তিনি ছিলেন আমার ভাতিজা। কৃষ্ণাঙ্গ হলেও বিরোধীদের তিনি সফলভাবে দমন করে রেখেছিলেন। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার তার ওপর বেজায় খুশি ছিল। আমি ট্রান্সকেই সরকারকে কখনই স্বীকৃতি দেইনি। ক্রুজার আমার স্বীকৃতি লাভের জন্য আসছেন বলেই ধরে নিলাম।

জিমি ক্রুজার রোবেন দ্বীপে আসলেন। আমরা বৈঠকে বসলাম। এ বৈঠককে আমাদের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরার দারুণ সুযোগ হিসেবে মনে করলাম। বৈঠকের সময় ১৯৬৯ সালে ক্রুজারকে আমাদের লেখা একটি চিঠির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। এরপর রোবেন দ্বীপে বন্দিদের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরলাম। বললাম, রাজনৈতিক বন্দিরা অপরাধী না হওয়া সত্ত্বেও তারা নানা ধরণের নিপীড়নের শিকার। ক্রুজার আমাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, তোমরা রাজনৈতিক বন্দি নও। তোমরা অবাধ্য কমিউনিস্ট।

তার কথার পর আমি বলতে শুরু করলাম। এএনসির ইতিহাস তার কাছে তুলে ধরলাম। আমরা কি জন্য সহিংসতার দিকে পা বাড়ালাম তা বিধৃত করলাম। ক্রুজারকে বললাম এএনসি সম্পর্কে ডানপন্থী পত্র-পত্রিকায় যা বলা হচ্ছে তা প্রপাগান্ডা বা অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের দল ন্যাশনাল পার্টির চেয়েও পুরনো। এ কথা শুনে তিনি অবাক হলেন। ভ্রু কুঁচকালেন। তাকে বললাম, আমাদেরকে কমিউনিস্ট বলার আগে তার উচিত স্বাধীনতা সনদ বা ফ্রিডম চার্টারটি পুনরায় পড়া।

তিনি বোকার মত আমার দিকে তাকালেন। তার হাবভাব দেখে মনে হল তিনি কখনও ফ্রিডম চার্টার পড়েননি। একজন মন্ত্রী ফ্রিডম চার্টার সম্পর্কে কিছু জানেন না এটা ভেবে আমিও অবাক হলাম। তবে ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতারা যে না জেনে অনেক কিছু বলেন, অনেক কিছুর নিন্দা করেন, সেটা আমি আগে থেকেই জানতাম।

কথার এক পর্যায়ে আমাদের মুক্তির বিষয়টি ক্রুজারের কাছে উত্থাপন করলাম। ১৯১৪ সালের আফ্রিকান ভাষীদের বিদ্রোহীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তখন এরা সহিংসতায় ইন্ধন যোগালেও পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন। বিভিন্ন সভা-সমাবেশ করতে পারতেন এবং ভোটও দিতে পারতেন। জেনারেল ডি ওয়েট ও জেনারেল কেম্প ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে অনেক যুদ্ধ, অনেক শহর দখল, অনেক লোক হত্যার পরও তাদের দুজনকে কারাগারে নিক্ষেপের কিছু দিনের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়। আমি রবি লিবরাটের কথাও তুলে ধরি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মিত্র বাহিনীর বিপক্ষে আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করেন। এজন্য তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। পরে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

ক্রুজার আমার কথাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে বলেন, এগুলো অতীতের কথা। এসব এখন বলে লাভ নেই। বরং যে কাজ করলে লাভ হবে সেটা কর। এই বলে তিনি আমাকে ট্রান্সকেই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব দেন। সরকারের পক্ষ হয়ে আমার ভাতিজার ওই সরকারকে স্বীকৃতি দিলে এবং সেখানে গিয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের ওই সরকারকে সহযোগিতা করলে আমার শাস্তি নাটকীয়ভাবে কমিয়ে দেয়া হবে বলে তিনি জানান। আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। ক্রুজার রুম থেকে বের হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর আবার আসেন। আবারও ওই একই প্রস্তাব দেন। এবারও আমি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি।

৮০

রোবেন দ্বীপে তথ্য সংগ্রহ করা ছিল খুব কষ্টের একটা কাজ। এ কারণে চলমান বা বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ছিল খুবই এলোমেলো। দেশে বা বহির্বিশ্বে যা ঘটত তা আমরা প্রথমে গুজব হিসেবে শুনতাম। কোনভাবে কোন পত্রিকা পেলে বা কোন পরিদর্শক এলে তার কাছে জেনে সে ব্যাপারে জেনে এরপর ঐ বিষয়টি সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতাম।

১৯৭৬ সালে আমরা শুনলাম দেশে জোরালো আন্দোলন চলছে। দু'এক জায়গায় সশস্ত্র বিপ্লব পর্যন্ত সংঘঠিত হয়েছে। সেনাবাহিনী বিপ্লবীদের কাছে পরাস্ত হয়েছে। সোয়েটোতে সেনাবাহিনী হাতিয়ার রেখে পালিয়েছে। ১৬ জুনের ওই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িত একজন তরুণ যোদ্ধা আগস্টে গ্রেফতার হয়ে রোবেন দ্বীপে আসার পর তার মুখ থেকে আমরা ঘটনার সত্যতা জানতে পারি।

১৯৭৬ সালের ১৬ জুন প্রায় ১৫ হাজার স্কুল শিক্ষার্থী সোয়েটোতে জড়ো হয়। তারা শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান বৈষম্যমূলক নীতি অবসানের এবং আফ্রিকান ভাষায় পড়াশুনার দাবি জানায়। ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক ও তাদের অভিভাবকরাও যোগ দেয়। এ সময় হঠাৎ পুলিশ ও সেনাবাহিনী এসে সমাবেশে হস্তক্ষেপ করে। সমবেতদের ছত্রভঙ্গ করতে তারা কোনরকম হুঁশিয়ারি ছাড়াই গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে শত শত ছাত্র নিহত ও আহত হয়। উত্তেজিত ছাত্ররা পাথর ছুড়ে দুই শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করে। ওই দিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন শহরে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।

নিহত শিক্ষার্থীদের অন্তেষ্টিক্রিয়ায় মাতম শুরু হয়। সারা দেশে আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করে। ছাত্ররা ক্লাসে যাওয়া থেকে বিরত থাকে। এএনসি ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে।

সেপ্টেম্বরে নির্জন সেলগুলো যুবকদের দিয়ে ভরে ফেলা হল। এদের সবাইকে সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় গ্রেফতার করা হয়। নির্জন সেলের বারান্দার আশপাশে দাঁড়িয়ে তাদের ফিস ফিস করে বলা কথাবার্তা শুনে দেশের চলমান অবস্থা সম্পর্কে আঁচ করার চেষ্টা করতাম। আমার মনে হল ১৯৬০ এর দশকে যেমন আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৭০ এর দশকে এসে সে ধরণের আন্দোলন পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের কথাবার্তা থেকে জানতে পারলাম, গেরিলা প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য অনেক যুবক দেশ ত্যাগ করেছে। আমরা তাঞ্জানিয়া, এঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে যেসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলাম হাজার হাজার যুবক সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। তারা সেখানে জড়ো হয়েছে গেরিলা প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য।

আগের বন্দিদের চেয়ে বর্তমানে আসা যুবকদের একটু ভিন্ন মনে হল। তারা ছিল সাহসী, প্রতিবাদী ও মারমুখী। তারা কর্তৃপক্ষের আদেশ সহজে পালন করতে চাইত না। সব সময় জোরে জোরে হৈচৈ করত। স্বাধীনতার পক্ষে স্লোগান দিত।

কর্তৃপক্ষ তাদের সামাল দিতে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়ল। রোবেন দ্বীপকে তারা আন্দোলনের মাঠে পরিণত করতে চাইল।

তাদের আচরণ দেখে আমার রাইভোনিয়া বিচারের কথা মনে পড়ে গেল। তখন আমি বলেছিলাম, বৈষম্যমূলক ও পীড়নমূলক নীতি পরিহার না করলে একদিন সরকারকে পস্তাতে হবে। আমাদেরকে দমন করা গেলেও ভবিষ্যতে আমাদের জায়গায় যেসব স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধারা আসবেন তাদের দমন করা যাবে না। রোবেন দ্বীপে আসা নতুন বন্দিদের দেখে আমার মনে হল, আমার ভবিষ্যৎ বাণী ফলতে যাচ্ছে।

রোবেন দ্বীপে আসা এসব যুবকের মধ্যে বিপ্লবের প্রচণ্ড চেতনা ছিল। এরা ছিল অনেকটা উদ্ধত ধরণের। এ ব্যাপারে উইনির কাছ থেকেও কিছুটা আভাস পেয়েছিলাম। কয়েক মাস আগে সাক্ষাতের সময় সাংকেতিক ভাষায় উইনি আমাকে এ সম্পর্কে বলে গিয়েছিল।

উইনি বলেছিল, তরুণদের মধ্যে অসন্তোষ দারুণভাবে বাড়ছে। বিশেষ করে আফ্রিকান জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ গেরিলারা বেপরোয়া হয়ে পড়ছে। আন্দোলনের গতিবিধি পাল্টে যাচ্ছে। উইনি আমাকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলে।

নতুন বন্দিরা রোবেন দ্বীপে এসেই প্রতিবাদী হয়ে উঠল। নিজেদের যা প্রয়োজন সে ব্যাপারেই তারা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাত। দীর্ঘদিন ধরে যে কঠোর পরিবেশের মধ্যে আমরা বসবাস করে আসছিলাম তারা সেটা মেনে নিতে অস্বীকার করল। আমরা তরুণ বন্দিদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম। বললাম, ১৯৬৪ সাল থেকে তারা এ দ্বীপের জুলুম নির্যাতন সহ্য করে আসছেন। ঐ অবস্থা মেনে নিয়েই তারা এতটা দিন কাটিয়েছেন। তাদেরকেও দ্বীপের অবস্থা মেনে নিতে হবে। নচেৎ অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সুশৃংখলভাবে থাকার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করলাম। তারা আমাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল।

তরুণ বন্দিদের এই উদ্ধত আচরণে কিছুটা আশাহত হলাম। তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তাদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখবো বলে ঠিক করলাম।

নবাগত তরুণ বন্দিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাউথ আফ্রিকান স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের প্রধান স্ট্রিনি মোডেলি, ব্লাক পিপলস কনভেনশনের নেতা সতিশ কাপুর। তারা একদিন আমার সেলে আসলেন। তাদের কাছে আন্দোলনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও দর্শন সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র চাইলাম। তাদের কাছে জানতে চাইলাম কেন তারা আন্দোলন করছে। তাদের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য কি?

তরুণ বন্দিরা দ্বীপে আসার কয়েকদিন পর একদিন কমান্ডিং অফিসার আমার কাছে আসলেন। তরুণদের ম্যানেজ করার ব্যাপারে তিনি আমার সহায়তা চাইলেন। তারা বন্দি, তাদের শৃংখলা বজায় রাখা উচিত, উদ্ধত আচরণ করা উচিত নয়– এ বিষয়গুলো তাদের বুঝিয়ে বলার অনুরোধ জানান আমাকে। আমি অফিসারকে বললাম, এ মুহূর্তে এ কাজটি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটি এখন করতে গেলে তরুণরা আমাকে সরকারের সহযোগি ভাববে।

তরুণ বন্দিরা বরাবরই জেলখানার নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করত। একদিন কমান্ডিং অফিসারের সঙ্গে হেড অফিসে যাচ্ছিলাম। মেজর সাহেবের সঙ্গে হেঁটে যাওয়ার সময় সামনে একজন তরুণ বন্দি পড়ল। একজন কারাকর্মকর্তা তখন ওই বন্দির কর্মকাণ্ড ও অতীত জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছিল। বলতে গেলে তার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন।

ওই তরুণ বন্দির বয়স ছিল বড়জোর ১৮ বছর। মেজরকে দেখার পরও সে কারাগারের টুপিটি পরিধান করে রেখেছিল। কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী বড় কোন কর্মকর্তা এলে টুপি খুলে তাকে সম্মান জানাতে হয়। এমনকি মেজর সাহেবকে দেখে ওই তরুণ দাঁড়াল না পর্যন্ত। এটিও ছিল কারাগারের আরেক নিয়ম ভঙ্গের শামিল। মেজর সাহেব তরুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, প্লিজ, তোমার টুপিটি খোল। তরুণ বন্দি মেজরের এ আদেশের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করল না। এরপর মেজর ধমক দিয়ে বললেন, টুপি খোল। তরুণ বন্দি এবার ক্ষেপে গিয়ে উল্টো মেজরকে প্রশ্ন করল, তুমি কি বলছ? উত্তেজিত মেজর নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললেন, তুমি যা করছ তা নিয়মের পরিপন্থী। তরুণ পাল্টা প্রশ্ন করল– কিসের নিয়ম, কিসের কি? তোমরা এসব করছ কেন? এসব নিয়মের উদ্দেশ্য কি? মেজর সাহেব এবার আমাকে বললেন, ম্যান্ডেলা আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন। কিন্তু আমি মেজরের পক্ষ হয়ে ওই তরুণ বন্দির সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত রইলাম।

তরুণ বন্দিদের মাধ্যমে আমাদের ব্লাক কনশাসনেস মুভমেন্টের বহিঃপ্রকাশ এভাবেই ঘটল। এএনসি, প্যাক ও কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ করার পর এ শুন্য জায়গাটি দখল করে ব্লাক কনশাসনেস মুভমেন্ট। তরুণরা এর সঙ্গে ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট হয়। ব্লাক কনশাসনেসে তাত্ত্বিক কথাবার্তাকে গুরুত্ব দেয়া হত না। নীতি আদর্শ বা দর্শনের চেয়ে এখানে কাজকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হত। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীন করা। তিন দশক ধরে শ্বেতাঙ্গরা যে শাসন চালাচ্ছে তার অবসান ঘটানো। শ্বেতাঙ্গদের জুলুম অত্যাচারের হাত থেকে

কৃষ্ণাঙ্গদের রক্ষা করা। ব্লাক কনশাসনেস বর্ণবিরোধী বলে নিজেদের দাবি করলেও এরা সমাজ-রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় শ্বেতাঙ্গদের রাখার ঘোর বিরোধী ছিল।

ব্লাক কনশাসনেস মুভমেন্টের উদ্দেশ্য আমার কাছে খুব একটা খারাপ মনে হয়নি। ২৫ বছর আগে এএনসি ইয়ুথ লীগ প্রতিষ্ঠার সময় আমিও এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতাম। আমরা সবক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইতাম। আন্দোলনের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের সম্পৃক্ত করতে চাইতাম না। ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্রে ব্লাক কনশাসনেসকে আমাদের চেয়েও অগ্রবর্তী মনে হল। আমরা যেসব বিষয় নিয়ে ভাবিনি তাদেরকে সেসব বিষয় নিয়ে ভাবতে দেখলাম। তাদের জঙ্গি-ধর্মী মনোভাব ও সামরিক কর্মকাণ্ড আমাকে অনুপ্রাণিত করল। কেন যেন আমার মনে হতে লাগল, ব্লাক কনশাসনেস মুভমেন্টের যুবকরাই পারবে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের রাহুর কবল থেকে মুক্ত করতে।

ব্লাক কনশাসনেস মুভমেন্টের (বিসিএম) নেতাকর্মীদের আন্দোলনের জন্য খুব যুৎসই মনে হলো। কিন্তু এরপরও তাদেরকে আমরা এএনসিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলাম না। কারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শগত ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে আমাদের অমিল ছিল। আমরা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাসী। তারা বৈরি সম্পর্কে বিশ্বাসী। আমরা শ্বেতাঙ্গদের নিয়েই কাজ করতে প্রস্তুত ছিলাম। তারা ছিল না।

বিসিএমের নেতা কর্মীদের মধ্যে এএনসি সম্পর্কে জানার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। তাদের অনেকে প্রায়ই আমাদের কাছে আসত। এএনসি সম্পর্কে জানতে চাইত। স্বাধীনতা সনদ বা ফ্রিডম চার্টার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। আমরা তাদের উত্তর দিতাম। এএনসির নীতি আদর্শ সুন্দরভাবে তাদের সামনে তুলে ধরতাম।

আমি নিজেও তাদের অনেকের কাছে গোপনে চিঠি লিখতাম। ট্রান্সকেই থেকে আগতদের কাছে আমার পুরনো বাড়ি সম্পর্কে খোঁজ-খবর জানতে চাইতাম। তাদের অনেকেই চলমান আন্দোলন সম্পর্কে বেশ অবগত ছিল। এ ব্যাপারেও জানতে চাইতাম। সাউথ আফ্রিকান স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের বীরযোদ্ধা, লেকোটা গ্রেফতার হয়ে রোবেন দ্বীপে এসেছিলেন। তাকেও চিঠি লিখলাম। রোবেন দ্বীপে তাকে স্বাগত জানালাম। লেকোটার ডাক নাম ছিল টেরর। লেকোটা খুব ভালো ফুটবল খেলতে পারতেন। মাঠে নামলে তাকে রোখা ছিল মুশকিল। এজন্য মাঠের সবাই তাকে টেরর বলত। এভাবে লেকোটার নামের সঙ্গে টেরর শব্দটি যুক্ত হয়। যুক্তিতর্কেও তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। এএনসির অসাম্প্রদায়িক চেতনার ব্যাপারে তার ঘোরতর আপত্তি ছিল।

এএনসির সঙ্গে তিনি দূরত্ব বজায় রাখতে চাইতেন। পরে তার মনোভাব পরিবর্তন হয়। টেরর এএনসিতে যোগ দেয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। কিন্তু টেরর দলে আসলে ঝামেলা হতে পারে সে আশঙ্কায় আমরা এএনসিতে যোগ দেয়ার ব্যাপারে তাকে নিরুৎসাহিত করি। কিন্তু টেরর সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজেকে এএনসির সদস্য হিসেবে প্রচার করতে থাকে। এএনসির প্রতি তার সার্বক্ষণিক আনুগত্যও ছিল। একদিন বাগানে কাজ করার সময় বিসিএমের এক সদস্য তাকে প্রহার করে। এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। তার বিচারের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু সংহতি ও ঐক্যের কথা বিবেচনা করে আমরা টেররকে অভিযোগ প্রত্যাহারের পরামর্শ দেই। তিনি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। হামলাকারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানে বিরত থাকেন। ফলে মামলাটি বিচারক খারিজ করে দেন। এ ঘটনায় বিসিএমের ওই সদস্য বুঝতে সক্ষম হয় যে এএনসির লোকজন আসলেই মহৎ ও উদার। এরপর বিসিএমের অনেক সদস্য এ এনসিতে যোগ দেয়। এর মধ্যে টেররের ওপর হামলাকারীও ছিল। জেনারেল সেকশনে টেরর এএনসির সবচেয়ে বড় নেতায় পরিণত হন। শিগগিরই তিনি এএনসির লক্ষ্য উদ্দেশ্য নীতি-আদর্শ সম্পর্কে জেনারেল সেকশনের অন্য বন্দিদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। জেনারেল সেকশনে ঐক্যের জোয়ার বইতে শুরু করে।

এএনসির নেতৃত্বে জেনারেল সেকশনে ঐক্যের সুবাতাস শুরু হলেও এফ এবং জি সেকশনে রাজনৈতিক কোন্দল বেড়ে যায়। সেখানে এএনসি, প্যাক ও বিসিএমের মধ্যে সংঘর্ষের খবর আসতে শুরু করে।

এএনসির এক সদস্যকে সেখানে নির্মমভাবে পেটানো হয়। সংঘর্ষের জন্য এএনসির অনেক সদস্যকে দায়ি করে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ দায়ের করে। রোবেন দ্বীপের প্রশাসনিক আদালতে বিচারের দিন তারিখ ধার্য করা হয়। মামলা পরিচালনার জন্য এএনসি সদস্যরা বাইরে থেকে একজন আইনজীবী নিয়োগ করে। আমি সংঘর্ষের প্রত্যক্ষদর্শী না হলেও আমাকে সাক্ষী করা হয়। এটি আমায় ঘোরতর সমস্যায় ফেলে দেয়। আমি এএনসি সদস্যদের পক্ষে সাক্ষী দেয়ার পক্ষপাতি ছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম এ কাজ করলে এএনসির সঙ্গে প্যাক ও বিসিএমের বিরোধ আরো বেড়ে যাবে।

এএনসির নেতা নয়, ঐক্যর দূত হিসেবে ভূমিকা রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। এ কারণে আমাকে দলীয় সদস্যদের তোপের মুখে পড়তে হল। তাদের ক্ষোভ উপেক্ষা করে আমি এএনসির পক্ষে সাক্ষ্য না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি এ

বিচারকে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখলাম। বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার এ সুযোগকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে এগিয়ে আসলাম। ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ দলের কয়েকজনকে বেজার করে বিরোধীদের খুশি করবো বলে ঠিক করলাম।

তাই শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিব না বলে ঠিক করলাম। আমার সহকর্মীরা এতে বেশ নাখোশ হল। আমার এ সিদ্ধান্ত ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এতে আমার প্রতি অনেকেরই বিরাগভাজন হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমার কাছে ব্লাক কনশাসনেস সদস্যদের ভুল ভাঙ্গানোটাকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল। আমি তাদের বোঝাতে চাইলাম– আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই রকম। আমরা সবাই একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছি। সবাই আমরা একই শত্রুর আঘাতে জর্জরিত।

৮১

ওইসব তরুণ সিংহদের নিয়ে কর্তৃপক্ষ বেশ ঝামেলায় পড়ে গেল। তাদেরকে আমরাও আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিলাম। তরুণ বন্দিদের সাথে নিয়ে আমরা খনি এলাকায় ধর্মঘট শুরু করলাম। সব ধরণের শারীরিক ও ভারি কাজ বন্ধের দাবি জানালাম। আমরা দিনের বেলায় হাতের কাজের বদলে পড়াশুনাসহ শিক্ষাদানের কাজের সুযোগ চাইলাম। সৃষ্টিশীল কাজের দাবি জানালাম।

চুনাপাথরের খনিতে কোনভাবেই আর কাজ করবো না বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। ১৯৭৭ সালে কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবি মেনে নেয়ার ঘোষণা দেয়। আমাদেরকে সবধরণের হাতের ও ভারি কাজ করা থেকে অব্যাহতি প্রদান করে। ওই সময়টা আমরা আমাদের সেকশনে শুয়ে বসে পড়াশুনা ও গল্পগুজব করে কাটাতাম। আমরা জেলের আঙ্গিনায় বসেই করতে পারি এমন কিছু হাল্কা কাজের ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য করে দেয়।

তিনজন বন্দির জন্য একজন কারারক্ষী রাখার বিধান থাকলেও রোবেন দ্বীপে তা ছিল না। কারারক্ষী স্বল্পতার কারণে একজন কারারক্ষীকেই অনেক বন্দির দিকে নজর রাখতে হত। তরুণ বন্দিরা আসার পর কারারক্ষী সংকট আরো বেড়ে যায়। সোয়েটো থেকে আসা টগবগে তরুণদের সামাল দিকে কারারক্ষীদের এতটাই ব্যস্ত থাকতে হত যে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদের ওপর তেমন

একটা নজরদারি করতে পারত না। তাই ওই সব তরুণ আসার কারণে আমরা একটু স্বস্তি পাই। আমাদের ওপর নজরদারি বহুলাংশে হ্রাস পায়।

শৈবাল, চুনাপাথর সংগ্রহের মত ভারী কাজ করা থেকে নিস্কৃতি পাওয়াটা ছিল আমাদের জন্য এক ধরণের স্বাধীনতা পাওয়ার শামিল। আমি ওই সময়টা এখন পড়াশুনা, লেখালেখি, সহযোগিদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে ব্যয় করার সুযোগ পেলাম। অনেক বন্দীকে আইনি পরামর্শ দিতে পারতাম। এছাড়া অবসর সময়টা আমি দুটি শখ পুরণের কাজে ব্যবহার করতে লাগলাম। একটি হচ্ছে বাগান করা। অন্যটা টেনিস খেলা।

একজন বন্দিকে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে হলে অবশ্যই দৈনন্দিন জীবনধারা ও কাজকর্মের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। দৈনন্দিন জীবনধারাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে হয়। এ জীবনে নিজের কাজ-কর্মের ওপর আনন্দ-বেদনা অনেকাংশে নির্ভরশীল। কেউ নিজের জামা-কাপড় ধুলে পরিষ্কার জামা পরতে পারে। এতে মন প্রফুল্ল থাকে। আলসেমি করে জামা কাপড় না ধুলে ময়লা পোশাক পড়তে হয়। এতে মনের ওপর প্রভাব পড়ে। আমাদের ভারি কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হলেও সেলের ভিতরে ছোটখাটো অনেক কাজ করার অবকাশ ছিল।

রোবেন দ্বীপে আসার পর থেকেই আমি জেলখানা প্রাঙ্গনে একটি বাগান তৈরি করার জন্য কর্তৃপক্ষকে বারবার তাগাদা দেই। বিগতবছর কর্তৃপক্ষ আমার সে অনুরোধের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেনি। এবার তারা নমনীয় হল। আমাকে বাগান তৈরির অনুমতি দিল। আমরা জেল প্রাঙ্গনের দেয়াল থেকে কিছুটা দূরে সংকীর্ণ পরিসরের একটি বাগান তৈরি করতে সক্ষম হলাম।

বাগান তৈরি করতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়। জেলখানার উঠানের মাটি ছিল শক্ত ও পাথুরে। মাটি খুঁড়লে অনেক বড় বড় পাথর বের হত। আমাকে সেগুলো সরাতে হল। আমার এই বাগান করা নিয়ে অনেক সহকর্মী আমার সঙ্গে মজা করত। অবসরে আমি বাগান তৈরির জন্য মাটি খনন করতাম।

জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে কোদাল, নিড়ানি সরবরাহ করল। মাটি প্রস্তুত করে টমেটো, মরিচ, পেঁয়াজ বুনলাম। প্রথম দিকে ফলন ভালো না হলেও আস্তে আস্তে ফলন বাড়তে থাকে। বাগানের বড় বড় টমেটো ও পেয়াজ কারারক্ষীদের উপহার হিসেবে দিতাম। তারা এসব পেয়ে বেজায় খুশি হত।

বাগানে কাজ করাটা ছিল আমার জন্য দারুণ উপভোগের বিষয়। এ কাজ করতে খুব ভাল লাগত। আনন্দও পেতাম প্রচুর। বাগান করার প্রথম অভিজ্ঞতা হয় ফোর্ট হেয়ারে। ইউনিভার্সিটির পড়াশুনার অংশ হিসেবে আমরা বাগানে কাজ

করতাম। বাগানে কাজ করার হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ আমি সেখানেই প্রথম পাই। একজন অধ্যাপকের অধীনে আমরা কাজ করতাম। তিনি মাটির গুণাগুণ, গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা দিতেন। বাগানের কাজ সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। এছাড়া জোহান্সবার্গে থাকার সময়ও আমি বাগানে কাজ করতাম।

ভালোভাবে বাগান করার জন্য অনেক কিছু জানা প্রয়োজন। এজন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছে বাগান ও উদ্যান বিষয়ক বইপত্র চাইলাম। আমি বাগান করার বিভিন্ন কৌশল ও সারের ধরণ-প্রকার সম্পর্কে পড়াশোনা করতে লাগলাম। বইয়ের আলোচনা অনুসারে আমার কাছে বাগান করার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি, সার ও অন্য উপকরণ ছিল না। কিন্তু এরপরও পড়াশুনায় ক্ষান্ত দিলাম না। বইয়ের অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক সময় কিছু ভুলত্রুটিও হত। একবার বাগানে চিনা বাদাম চাষের উদ্যোগ নিলাম। সে অনুযায়ী মাটি প্রস্তুত করলাম। সার দিলাম। কিন্তু ফলন আশানুরূপ হবে না- এমন আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত চিনাবাদাম চাষের চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিলাম।

জেলখানার যে অল্প কয়েকটি জিনিসের ওপর বন্দিরা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারত তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই বাগান। মাটি খনন, চারা রোপণ, সার প্রয়োগ থেকে শুরু করে ফলন ঘরে তোলা পর্যন্ত সব কাজ বাগানের তত্ত্বাবধায়ককেই দেখভাল করতে হত। অন্য কেউ এতে নাক গলাতে আসত না। এজন্য বাগানকে আমি জেলখানার দুনিয়ার একটি ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করতাম।

জীবনের অনেক বিষয়ের সঙ্গে বাগানের একটা সাদৃশ্য আছে। বাগানের মালির সঙ্গে একজন নেতাকে তুলনা করা চলে। মালি যেমন পরম যত্নে বাগান দেখাশুনা করেন, চারা রোপণ করেন, পানি দেন, সার প্রয়োগ করেন, ফসল ঘরে ওঠার আগ পর্যন্ত বাগানটি আগলে রাখেন ঠিক তেমনিভাবে একজন নেতাকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হয়। জনগণকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়। তাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে হয়।

বাগান করার বিষয়টি জানিয়ে উইনিকে দুটি চিঠি লিখলাম। আমার অক্লান্ত চেষ্টায় বাগানে যে কত সুন্দর সুন্দর টমেটো ধরেছে তার একটা চমৎকার বিবরণ দিলাম। কিন্তু ওই চিঠি লেখার কিছু দিনের মধ্যেই কোন ভুল বা অযত্নের কারণে টমেটো গাছগুলো মরতে শুরু করল। প্রথমে টমেটো গাছগুলো শুকিয়ে যেত। এরপর পাতা লতা নুইয়ে পড়ত। গাছের ফল ঝড়ে পরত। এভাবে এক সময় পুরো টমেটো বাগানটি শেষ হয়ে যায়। আমি মরে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া সব

গাছ তুলে বাগানের এক পাশে গর্ত করে চাপা দেই। বাগান থেকে টমেটো গাছের সব কাণ্ড উপড়ে ফেলি। নতুন করে অন্য কিছু রোপণের সিদ্ধান্ত নেই।

ভারি কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর থেকেই আমার ওজন বাড়তে থাকে। অল্প দিনের মধ্যে আমি আগের ওজন ফিরে পাই। খনিতে কাজ করার সময় আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হত। শরির দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরত। অনেক হাঁটতে হত। অনেক কিছু টানতে হত। এজন্য শরির তখন বেশ ঝরঝরা মনে হত।

ব্যায়াম করলে সে চিন্তা অনেকাংশে চলে যেত। জীবনে শৃংখলা প্রতিষ্ঠায়ও এটি ভূমিকা রাখে। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে বেশি কাজ করতে পারতাম। এজন্য জেলখানায় এসেও আমি ব্যায়াম করা ছেড়ে দেইনি। রোবেন দ্বীপে আসার পরও আমি বক্সিংএর চর্চা করতাম। প্রতি বৃহস্পতিবার থেকে পরের তিনদিন আমি বক্সিং প্র্যাকটিস করতাম। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত সেলের ভিতরেই ৪৫ মিনিট দৌড়াদৌড়ি করতাম। এছাড়া বুকডাউনসহ অন্যান্য ব্যায়ামও করতাম।

আমি সব সময় বিশ্বাস করতাম সুস্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক ব্যায়ামের কোন জুড়ি নেই। এটি স্বাস্থ্যকে রক্ষার পাশাপাশি মনকেও প্রফুল্ল রাখে। ব্যায়াম মানসিক অশান্তিও দূর করে। এমন প্রমাণও আমি পেয়েছি। আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করার সময় সব সময় আমার মাথায় পুলিশের চিন্তা, শত্রুদের চিন্তা ঘুরপাক খেত।

বাড়িতে বাচ্চাদের কাছে লেখা চিঠিতেও তাদেরকে ব্যায়াম ও খেলাধুলা করার পরামর্শ দিতাম। দৌড়ঝাঁপ হয় এমন খেলাধুলার প্রতি গুরুত্ব দিতে বলতাম। বিশেষ করে বাস্কেটবল, ফুটবল, টেনিস খেলার জন্য পরামর্শ দিতাম। আফ্রিকানরা বরাবরই ব্যায়ামের প্রতি উদাসীন ছিল। আমার বয়সি লোকেরা এর ধারে কাছেও ভিড়তে চাইত না। অনেক বলার পর ওয়াল্টার সকালে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করত। আমার ব্যায়াম করা দেখে তরুণদের অনেকে উৎসাহিত হত। তাদেরকে বলতে শুনতাম– ওই বৃদ্ধ ব্যায়াম করতে পারলে আমরা পারব না কেন? আমার দেখাদেখি তারাও ব্যায়াম শুরু করল।

আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার প্রথম বৈঠকের সময় থেকেই আমি কারাগারে ব্যায়াম করার পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়ার দাবি জানিয়ে আসছি। ব্যায়াম করার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম সরবরাহের অনুরোধ করেছি।

আমার এ দাবির কিছুটা বাস্তবায়ন করা হয় ১৯৭০ সালের মাঝামাঝিতে এসে। এ সময় আন্তর্জাতিক রেডক্রস ভলিবল ও টেবিল টেনিস খেলার কিছু উপকরণ আমাদের জন্য পাঠায়। ওই উপকরণগুলো পাঠানোর কিছু আগে খনি এলাকায়

কাজ করা থেকে আমাদের অব্যাহতি দেয়। এজন্য কারারক্ষীরা অনেকে প্রস্তাব করেন– খনিতে কাজ করার সময়টুকু যেন টেনিস ও ভলিবল খেলার জন্য প্রদান করা হয়। তারা খনির মাটিকে প্রকাণ্ড খেলার মাঠে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মাঠ প্রস্তুত করা হল। মাঠে নেট লাগানো হল। রোবেন দ্বীপে আমরা পেলাম উম্বলডনের মাঠ।

ফোর্ট হেয়ারে থাকাকালে আমি মাঝে মধ্যে টেনিস খেলতাম। এ খেলায় যে খুব পারদর্শি ছিলাম সেটা বলবো না। আমার কপাল বেশ শক্ত ছিল। তবে মাথার পেছনের অংশ তেমন ধকল সইতে পারত না। এরপরও আমার সেকশনে আমিই বেশি টেবিল টেনিস খেলতাম।

ভারি কাজের বোঝা লাঘব হওয়ার পর পড়াশুনায় মনোনিবেশ করলাম। দিনের অধিকাংশ সময় বই পড়ে কাটাতাম। লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে এল এল বির পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি আমার ছিল। কিন্তু মাঝখানে এক ঝামেলার কারণে আমাকে ৪ বছর পড়াশুনার সুযোগ দেয়া থেকে কর্তৃপক্ষ বিরত থাকে। এ কথা মাথায় রেখে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষও আমার পরীক্ষা দেয়ার সময় দীর্ঘ করে দেন। আমি ওই ডিগ্রী অর্জনের জন্য প্রচুর সময় পাই। আইনের বই পড়ার পাশাপাশি এসময় আমাকে উপন্যাস পড়ারও সুযোগ দেয়া হয়। যদিও রোবেন দ্বীপে বিশাল কোন লাইব্রেরী ছিল না যেখান থেকে ইচ্ছেমত বই সংগ্রহ করা যেত। এরপরও আমরা প্রচুর ডিটেকটিভ ধাঁচের নোবেল, রহস্যময় উপন্যাস পড়ার জন্য পেতাম।

তবে সমাজতন্ত্রের ওপর লেখা কোন বই আমাদেরকে কোনভাবেই দেয়া হত না। এমনকি কোন বইয়ের শিরোনাম রেড শব্দটি লেখা থাকলে কর্তৃপক্ষ সেটি আমাদের দেখতে দিত না। রেড দেখলেই তারা ধরে নিত সেটা সমাজতন্ত্রের ওপর লেখা বই। বইয়ের শিরোনাম একটু উল্টাপাল্টা মনে হলেই কর্তৃপক্ষ সে বই আমাদের পড়তে দিত না।

লিটল রেড রাইডিং হুড, দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস– এইচ জি ওয়েলসের এই ধরণের বিজ্ঞানধর্মী বইগুলো আমরা চেয়েও পাইনি শুধু সন্দেহজনক শিরোনামের কারণে।

এ সময় অনেক আফ্রিকান লেখকের বই পড়ার সুযোগ পাই। নেডিন গর্ডিমারের যেসব উপন্যাস নিষিদ্ধ হয়নি তার সবগুলিই আমাদের পড়তে দেয়া হয়। তিনি বইয়ে আফ্রিকানদের দুঃখ কষ্ট তুলে ধরলেও তা অনেকটা নমনীয় ভাষায় তুলে ধরেন। অনেক আমেরিকান উপন্যাস পড়ার সুযোগও আমার হয়। এর মধ্যে জন

স্টেইনবেকসের *দ্য গ্রাফস অব ওয়ার্থ* আমার কাছে খুব ভাল লাগে। এ বইয়ে অভিবাসীদের কঠোর পরিশ্রমের কথা লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এর সঙ্গে আমাদের জেলখানার প্রথম কয়েক বছরের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বেশ মিল খুঁজে পাই। একটি বই আমি ঘুরেফিরে বহুবার পড়েছি। সেটি হচ্ছে কালজয়ী রুশ লেখক *তলস্তয়ের ওয়ার অ্যান্ড পিস*। এ বইয়ের শিরোনাম ওয়ার বা যুদ্ধ শব্দটি থাকার পরও কর্তৃপক্ষ তা পড়তে অনুমতি দেয়। সম্ভবত কর্তৃপক্ষ বইটি সম্পর্কে বেশ ভাল জানতো।

৮২

সোয়েটো ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে উইনি ও আমার এক ডাক্তার বন্ধু এনথাটু মোটলানাও নাকি জড়িত ছিলেন। ব্লাক প্যারেন্টস এসোসিয়েশন নামে স্থানীয় পেশাজিবী ও চার্চ নেতাদের একটি সংগঠন ছাত্রদের উসকে দেয়ার ব্যাপারে ইন্ধন যোগায় বলে সরকারের তদন্তে প্রমাণ মিলে। উইনি ও ডাক্তার এনথাটু এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ তোলে।

এ কারণে সরকার প্যারেন্টস এসোসিয়েশনের ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ ছিল। ছাত্র অভ্যুত্থানের দুই মাস পর আগস্টে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে উইনিকে আটক করা হয়। জোহান্সবার্গের একটি কারাগারে তাকে ৫ মাস বন্দি করে রাখা হয়। এ সময় অবশ্য আমি উইনি ও আমার মেয়ের কাছে চিঠি লিখতে সমর্থ হই। আমার কন্যা তখন সোয়াজিল্যান্ডের স্কুলে পড়ত। উইনি ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলখানায় কাটায়। এ সময় তার ওপর অত্যাচার করা হয়নি। জেল থেকে বেরিয়ে উইনি আবার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

সোয়েটোর যুবকদের কাছে উইনি দারুণ জনপ্রিয় ছিল। এজন্য সরকার উইনিকে সব সময় চোখে চোখে রাখত।

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উইনির জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বাড়তে দেখে সরকার ভয় পেয়ে যায়। তাকে দেশের মধ্যেই নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৭৭ সালের ১৬ মে রাতে পুলিশ উইনির অরল্যান্ডো বাসভবন ঘিরে ফেলে। মালপত্র ট্রাকে তোলা শুরু করে। এ সময় উইনিকে গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি। এমনকি কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি কেউ। তাকে মালামাল সমেত

সযত্নে গাড়িতে তোলা হয়। নিয়ে আসা হয় ফ্রি স্টেটের ব্রান্ডফোর্ড এলাকায়। আমি ক্যাথির কাছ থেকে এসব খবরাখবর পাই।

ব্রান্ডফোর্ডের অবস্থান জোহান্সবার্গ থেকে ২২৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। দীর্ঘ উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে উইনি ও জিনদজিকে নিয়ে পুলিশ হাজির হয় ব্রান্ডফোর্ডে। এখানে তিন রুমের একটি টিনশেড বাড়িতে তাদের থাকতে দেয়া হয়। ব্রান্ডফোর্ড কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত একটি দরিদ্র এলাকা। এখানকার স্থানীয় ভাষা ছিল সিমোথো। এ ভাষা উইনি বুঝত। এখানকার অধিকাংশ লোক ছিল কৃষক। পড়াশুনা তেমন একটা জানতো না। ফলে উইনিকে দারুন সমস্যায় পড়তে হল।

উইনির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। সোয়েটোতে থাকাকালে ভালো ছিল বলেই ধরে নিতাম। সে বাড়িতে রান্না করে, পড়াশুনা করে, গল্পগুজব করে সময় কাটায় বলে আমি ধরে নিতাম। তাকে কল্পনা করলেই ওই ধরণের চিত্র আমার সামনে ভেসে উঠত। এটা ছিল আমার জন্য স্বস্তিদায়ক। সোয়েটোতে উইনিকে নিষিদ্ধ করা হলেও সেখানে তার অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল। পরিবারের লোকজনও আশপাশে ছিল। কিন্তু উইনিকে এখন যে নতুন জায়গায় নেয়া হয়েছে সেই ব্রান্ডফোর্ডে তাকে ও জিনদজিকে নিতান্ত অসহায় ও একা মনে হল।

ব্লুমফনটেইনে যাওয়ার সময় আমি এ শহরটি দেখেছিলাম। দারিদ্র ছাড়া এ শহরে দেখার মত কিছুই নেই। চারদিকে হাড্ডিসার মানুষ আর জির্নশীর্ণ বিধ্বস্ত বাড়িঘর। তখন হয়তো আমি জানতাম না এ শহরের ৮০২ নম্বর বাড়িটি একদিন আমার জীবনের ইতিহাসে পরিণত হবে। উইনি ও আমি একই সময়ে জেলে বন্দি থাকব সেটাও তখন কল্পনায় আসেনি।

ব্রান্ডফোর্ডের জীবনধারা ছিল খুবই কঠিন। চিঠি লিখে উইনি আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত করে। বাড়িতে তাপের পর্যাপ্ত সুবিধা ছিল না। ফলে শীতে খুব কষ্ট করতে হবে। এছাড়া বাড়িতে টয়লেট, সাপ্লাই পানিও ছিল না। শহরে দোকানপাটও ছিল না। তাই চাইলেও কোন কিছু কেনা সম্ভব হত না। মারামারি কাটাকাটি হত যখন তখন। ওই শহরের শ্বেতাঙ্গরা ছিল আফ্রিকানাস ভাষাভাষী। এটি ওলন্দাজ ধাঁচের ইউরোপিয় ভাষা। এখানকার শ্বেতাঙ্গরা ছিল খুবই রক্ষনশীল। কালোদের দুই চোখে দেখতে পারতনা।

উইনি ও জিনদজিকে সর্বক্ষণ পুলিশি নজরদারিতে থাকতে হত। পুলিশ প্রায় সময়ই তাদের হেনস্তা করত। জিনদজির ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও

পুলিশ ওর ওপরও নানারকম হস্তক্ষেপ করত। নিরাপত্তাবাহিনীর বাড়াবাড়িতে জিনদজি মাঝে মধ্যে আতংকিত হয়ে পড়ত। সেপ্টেম্বর মাসে উইনির আইনজীবীর সহায়তায় ব্রান্ডফোর্ডের পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে জুরুরি ভিত্তিতে একটি দরখাস্ত করলাম। দরখাস্তে আমার কন্যা জিনদজিকে কোন রকম হয়রানি না করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানালাম। এ ব্যাপারে আদালতেরও শরণাপন্ন হই। আদালত জিনদজিকে হয়রানি না করার নির্দেশ দেন। তাকে বাইরের পরিদর্শকদের সঙ্গে কথা বলারও অনুমতি প্রদান করেন।

উইনি সব পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারত। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। অল্প সময়ের মধ্যেই উইনি আশপাশের লোকদের মন জয় করে ফেলল। প্রতিবেশীদের সহানুভূতি সৃষ্টি হল তার প্রতি। ব্রান্ডফোর্ড শহরেও উইনির জনপ্রিয়তা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। উইনি প্রতিবেশী গরিবদের মাঝে খাবার বিতরণ করত। অপারেশন হাঙ্গার নামে একটি সংগঠন দাঁড় করিয়ে এর মাধ্যমে ক্ষুধার্তদের খাদ্য দেয়ার ক্রমাগত চেষ্টা করে যেতে থাকে। এ শহরের ছেলে মেয়েরা ছিল চিকিৎসা বঞ্চিত। এখানে হাসপাতাল ক্লিনিক ছিল না। জন্মের পর অনেক শিশু ডাক্তার চোখে পর্যন্ত দেখেনি। উইনি এদের চিকিৎসার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

জেনি ছিল আমার দ্বিতীয় মেয়ে এবং উইনির গর্ভের প্রথম সন্তান। ১৯৭৮ সালে জেনি প্রিন্স থাম্বুমুজিকে বিয়ে করে। থাম্বুমূজি ছিল সোয়াজিল্যান্ডের রাজা সবুজার ছেলে। স্কুলে আসা যাওয়া সূত্রে তাদের পরিচয়। সেই থেকে সম্পর্ক রূপ নেয় প্রেমে। মেয়ের বিয়েতে বাবার যেসব সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয় বন্দি থাকায় আমি সেসব দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই।

আমাদের সংস্কৃতি অনুসারে বিয়ের আগে মেয়ের পিতা ছেলের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। তাকে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেন। কথাবার্তা বলে মেয়ের হবু বরের যোগ্যতা পিতাই নিরূপণ করেন। বিয়ের দিন মেয়েকে জামাইর হাতে তুলে দেন পিতা। কিন্তু আমি এসবের কিছুই করতে পারলাম না। আমার বন্ধু ও আইন উপদেষ্টা জর্জ বিজোসকে প্রিন্সের সাক্ষাৎকার নিতে বললাম। আমার মেয়েকে সে কতটা ভালবাসে, কতটা সুখে রাখতে পারবে সে ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলতে বললাম। জর্জ প্রিন্সের সঙ্গে তার অফিসে দেখা করলেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করলেন। এরপর তারা রোবেন দ্বীপে আমার সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আমার মেয়ের বয়স ছিল ২১ বছরের নিচে। এজন্য আইনি ঝামেলা এড়াতে বিয়েতে আমার সম্মতি দেয়া প্রয়োজন ছিল। এ সম্মতি নেয়ার জন্য জর্জ বিজোসকে আমি রোবেন দ্বীপে দেখা করতে বলি। পরিদর্শক রুমে জর্জের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম প্রিন্স ও জেনি একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসে। আমার হবু জামাতার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলেও জর্জ আমাকে জানায়। তার বাবা রাজা সবুজা এএনসিরও একজন সদস্য ছিলেন। সে সূত্রে সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত পাকাপোক্ত হবে বলেই ধরে নিলাম। আমার হবু জামাতার পরিবারের কিছু দাবি দাওয়া ছিল সেগুলো মেটানোর পর বিয়েটা সুন্দরভাবে হয়ে যায়।

সোয়াজি রাজপরিবারের সদস্য হওয়ায় জেনির সুযোগ-সুবিধা বেড়ে গেল। সে ইচ্ছে করলে যখন তখন আমার সঙ্গে দেখা করতে পারত। বিয়ের বছর খানেক পর জেনি তার সদ্যজাত কন্যাকে নিয়ে আমার সঙ্গে রোবেন দ্বীপে দেখা করতে আসে। রাজপরিবারের সদস্য হওয়ায় জেনিকে পরিদর্শক রুমে না বসিয়ে অন্য একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসানো হয়। সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। জেনি আমাকে দেখামাত্র তার কোলের বাচ্চাকে স্বামীর কাছে রেখে দৌড়ে আমার কাছে ছুটে আসে। বাচ্চা শিশুর মত জেনি আমাকে জড়িয়ে ধরে। জেনির বাচ্চা এখন যতটুকু আমি জেলখানায় যাওয়ার সময় জেনি তখন ঠিক ততটুকু ছিল। সময় কিভাবে গড়িয়ে গেছে তখন বুঝতে পারলাম। এখনকার পুরো অবস্থাটি আমার কাছে সায়েন্স ফিকশনের চেয়েও রোমাঞ্চকর মনে হল। এরপর আমি জামাতাকে শুভেচ্ছা জানালাম। আমার নবজাতক নাতনীকে কোলে নিলাম। চুমো খেলাম। আদর করলাম। হাত দিয়ে শাবল, কোদাল, পাথর নাড়াচাড়া করতে করতে অনুভূতি অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। তাই নাতনীকে কোলে নেয়ার পর খুব হাল্কা মনে হল। বাচ্চাদের কোলে নিয়ে আদর করাটা যে কত আনন্দের অনেক দিন পর তা বুঝতে পারলাম।

আফ্রিকান রীতি অনুসারে নাতনীর নাম নানাকে রাখতে হত। আমি নাতনীর নাম জাজিবি রাখলাম। এর অর্থ আশা। এ নামের একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল। ওই কারণে আমি এ নামটি রাখি। আমার দীর্ঘ দিনের বন্দি জীবনে কখনই মনে আশার আলো জাগেনি। আমার কেন যেন মনে হতে লাগল এই শিশু হবে নতুন প্রজন্মের সেসব শিশুদেরই একজন যারা একদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন যুগের সূচনা করবে। সে জন্যই আমি ওর নাম রাখি জাজিবি বা আশা।

৮৩

সোয়েটো বিপ্লবের পর কারাগারের ভিতরে আমাদের এবং কারাগারের বাইরে পরিবার পরিজনের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসল কিনা তা ভালো করে বলতে পারব না। তবে ১৯৭৬ সালের পরবর্তী দুটি বছর আমার জন্য ছিল স্বপ্নিল বছর। বন্দি জীবনে যে কেউ তার অতীত জীবনকে পর্যালোচনার জন্য যথেষ্ট সময় পায়। এ সময় অতীতের স্মৃতি একজনের শত্রু বা বন্ধুতে পরিণত হয়।

অতিতের স্মৃতি এ সময় আমাকে আনন্দ ও দুঃখ দুটোই দিত। অনেক সময় আমি সারারাত কাটিয়ে দিতাম স্মৃতিচারণ করে।

এ সময় আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্নের মুল বিষয়বস্তু ছিল মুক্তি। আমি স্বপ্ন দেখতাম শুধু রোবেন দ্বীপ নয় জোহান্সবার্গ জেল থেকেও মুক্তি পেয়েছি। মুক্তি পেয়ে জেলখানার গেটের বাইরে পায়চারি করছি। চারদিকে শুনশান নীরবতা। আমাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বা আমার সঙ্গে দেখাকরার মত কেউ নেই। এরপর আমি সোয়েটোর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। কয়েক ঘন্টার মধ্যে অরল্যান্ডোতে পৌঁছলাম। এরপর গেলাম আমার স্বপ্নের ৮১১৫ নম্বর বাসায়। কিন্তু বাড়িতে কেউ নেই। সব কিছু খালি। মনে হল বাড়িটি ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। বাড়ির সব দরজা-জানালা খোলা। কিন্তু কেউ না থাকায় মন খারাপ হয়ে গেল।

১৯৭৬ সালে স্বপ্নের বিবরণ জানিয়ে উইনিকে একটি চিঠি লিখলাম।

২৪ ফেব্রুয়ারির রাত। স্বপ্নে দেখলাম আমি ৮১১৫ নম্বর বাড়িতে ফিরে এসেছি। এসে দেখি পুরো বাড়ি তরুণ-তরুণীতে পরিপূর্ণ। তারা আফ্রিকান *জিভে* ও *ইনফিবা* নৃত্যে ব্যস্ত। অপ্রত্যাশিতভাবে আমি তাদের মাঝে আবির্ভূত হওয়ায় সবাই অবাক হয়ে গেল। অনেকে আমাকে অভিনন্দন জানাল। অনেকে আমাকে দেখে লজ্জা পেল এবং একটু দূরে সরে গেল। বেডরুমে গিয়ে দেখি সেটা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ। তুমি বেডরুমে শুয়ে আয়েশ করছিলে। সঙ্গে ছিল আমাদের ছেলে কাগাথো। ও বিছানার অন্য প্রান্তে শোয়া ছিল।

ওই স্বপ্ন দেখার পর আমার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল সেটা জানিয়ে উইনিকে পরবর্তীতে আরেকটি চিঠি লিখি। ওই চিঠিটা ছিল অনেকটা এরকম–

২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর থেকেই আমি তোমাকে এবং সন্তানদের প্রচণ্ডভাবে মিস করতে থাকি। সারাক্ষণ তোমাদের কথা মনে উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে। পরের কয়েকদিন তোমার কথা, আমার কথা, প্রয়াত মায়ের কথা এবং বাচ্চাদের কথা মনে পড়ত। আমার মনে তোমাদের কিরকম ছবি ভেসে উঠত সেটা লিখে বোঝানো যাবে না। তোমার সুন্দর ছবিখানা এখনো আমার কাছে আছে। যখন চিঠি লিখছি তখন ছবিটি মাত্র দু'ফুট দূরে দাঁড় করানো অবস্থায় আছে। তোমাকে ও জিনদজিকে ঘিরে অতিতের অনেক স্মৃতি খুব মনে পড়ছে। নখ কাটতে গেলে জিনদজি যে ঝামেলা করত সেটা আজও ভুলতে পারিনি। তোমার একান্ত সান্নিধ্যের কথা মনে হলে এখনও মাঝে মাঝে লজ্জা পাই।

দিনের বেলায় যখন একাকি হাঁটতাম, আশপাশে ঘুরে বেড়াতাম তখন অতিতের স্মৃতি মনে পড়ত। হাঁটতে হাঁটতে অতিতের কথা ভাবতাম, খুব ভাল লাগত। স্মৃতিরোমন্থন করাটা আমার জন্য ছিল খুবই একটা আনন্দের বিষয়। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমার অনেক সময় কেটে যেত। একাকি ঘোরাফেরার সময় অনেক স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্নের কথা খাতায় লিখি। আমার স্বপ্নের কথাগুলো জানিয়ে ১৯৭৬ সালে আবার চিঠি লিখি উইনিকে।

আমার ইচ্ছা হয় তোমাকে নিয়ে দূরে কোথাও বেড়াতে যাই। যেমনটা গিয়েছিলাম ১৯৫৮ সালের ১২ জুন। তোমাকে নিয়ে দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে নির্মল নিঃশ্বাস নিতে পারবো। দক্ষিণ আফ্রিকার সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলো দেখতে সক্ষম হব। দক্ষিণ আফ্রিকায় সবুজ ঘাস, গাছ-পালা, রং বেরঙের বুনো ফুল, নানা রকমের প্রাণী, ঝর্ণা, নদী সবই আছে। আমরা একসঙ্গে বেড়াতে গেলে এগুলো দেখতে পারতাম।

বেড়াতে গেলে আমাদের প্রথম গন্তব্য হবে সে জায়গা যেখানে তোমার মা বাবা চিরতরে ঘুমিয়ে আছেন। আমরা একসঙ্গে তাঁদের জন্য প্রার্থনা করব। আমি স্বপ্ন দেখি দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে তুমি আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাবে। আমি পরমহস্তে তোমার মাথায় হাত বুলাবো। তোমাকে আদর করব।

তোমাকে নিয়ে আমার মা-বাবার পৈত্রিক নিবাসে যাব। বেড়ানো শেষে আমরা আবার ফিরে আসব পশ্চিম অরল্যান্ডোর ৮১১৫ নম্বর বাড়িতে।

কর্তৃপক্ষ ছবি গ্রহণের অনুমতি দেয়ার পর উইনি ১৯৭৭ সালে ছবির একটি এ্যালবাম আমার কাছে পাঠায়। এতে পরিবারের সবার ছবি ছিল। যখনই এ্যালবাম থেকে উইনি, মেয়ে, নাতনীর ছবি নিতাম তখনই পরম যত্নে সেগুলো বুকে জড়িয়ে ধরতাম। উইনি আমার কাছে নাতি নাতনীসহ যাদের ছবিই পাঠাতো সেগুলো এ্যালবামে রেখে দিতাম।

ছবি ও এ্যালবাম রাখার অনুমতি দিলেও কর্তৃপক্ষ প্রায়ই ঝামেলা করত। কারারক্ষীরা মাঝে মধ্যে এসে এ্যালবাম ঘেঁটে ছবি পরীক্ষা করত। উইনির ছবি পেলে নিয়ে যেত।

কে আমার এ্যালবামটি প্রথম দেখল সেটা মনে নেই। তবে আমাদের সেকশনেরই যে কেউ প্রথম এ্যালবামটি দেখার অনুরোধ জানায়। আমি তাকে এ্যালবামটি দেখাই। আমার এ্যালবামের কথা পুরো রোবেন দ্বীপে জানাজানি হয়ে যায়। এফ এবং জি সেকশন থেকেও এ্যালবামটি দেখার অনুরোধ আসতে থাকে।

৮৪

১৯৭৮ সাল। জেল জীবনের ১৮টি বছর অতিক্রান্ত হল। খবর পেলাম কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চিন্তাভাবনা করেছে। সমঝোতার একটা প্রস্তাব আমাদের দেয়া হতে পারে। আমাদেরকে খবর শোনা ও পত্রিকা পড়ার অধিকার দেয়া হল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বাইরের খবর শুনতে দেয়ার পরিবর্তে জেলখানায় তাদের নিজস্ব রেডিও সম্প্রচার শুরু করল। ওই খবরই আমাদের শুনতে দেয়া হত।

এতে পত্রিকায় যেসব খবর ছাপা হত সেগুলোর একটা সারসংক্ষেপ থাকত। বাইরের রেডিওর খবর খুব সেন্সর করে সম্প্রচার করা হত। সরকারের জন্য সুখবর এবং আমাদের জন্য বেদনাদায়ক এমন খবর রেডিওতে বেশি থাকত।

রেডিওতে সম্প্রচারিত প্রথম খবরটি ছিল রবার্ট সুবুকির মৃত্যু। অন্য খবরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রোডেশিয়ায় ইয়ান স্মিথের সৈন্যদের বিপর্যয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরোধী নেতাদের ধরপাকড়। এসব খবর আমাদের জন্য ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিষাদময়। একপেশে সংবাদ পরিবেশন সত্ত্বেও খবর শোনার সুযোগ পেয়ে আমরা খুশিই হলাম।

এ বছর আমরা জানতে পারলাম জন ভর্স্টারের জায়গায় দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন পি. ডব্লিউ বোথা। তথ্য মন্ত্রণালয়ের তহবিল তসরুফের কারণে সংবাদমাধ্যম তার ব্যাপক সমালোচনা শুরু করে। ওই সমালোচনার জন্যই তাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়তে হয়। বোথা সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল সামান্য। আমি যতটুকু জানতাম তাতে মনে হল বোথা খুব উগ্র প্রকৃতির মানুষ। ১৯৭৫ সালে এঙ্গোলায় সামরিক অভিযান চালানোর ব্যাপারে তার ভূমিকা ছিল মূখ্য। তিনি দেশে সংস্কার করবেন এমন প্রত্যাশা আমাদের ছিল না।

জেলখানার লাইব্রেরীতে ভর্স্টারের একটি আত্মজীবনী ছিল। আমি কয়েকদিন আগে সেটা শেষ করি। স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তিনি অনেক দমনপীড়ন চালান। এজন্য তার বিদায় আমাদের মধ্যে খুব একটা রেখাপাত করেনি।

রেডিওতে সম্প্রচার করা না হলেও আমরা অনেক খবর জানতে সক্ষম হই। আমরা জানতে পারি মোজাম্বিকে স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হয়েছে। এঙ্গোলা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এসব কিছু হয় ১৯৭৫ সালে।

রোবেন দ্বীপ আমাদের জন্য আরও উন্মুক্ত হল। কর্তৃপক্ষ সিনেমা দেখানোর উদ্যোগ নিল। প্রতি সপ্তাহে আমাদের সিনেমা দেখানো হত। জেলখানার বারান্দার পাশে টিন দিয়ে বড় একটি রুম তৈরি করা হয়। সেখানে আমাদের সিনেমা দেখানো হত। পরবর্তীতে সিনেমা প্রদর্শনের ব্যবস্থা আরও ভালো করা হয়। স্ক্রীন উন্নত করা হয়। সিনেমা আমাদের মনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনে। আমরা যে অন্ধকার জগতের বাসিন্দা সিনেমা দেখার সময় সেটি ভুলে যেতাম।

আমাদের দেখা প্রথম সিনেমাটি ছিল নির্বাক। এর নাম *দ্য মার্ক অব জুরো*। ১৯২০ সালে হলিউডে ছবিটি নির্মাণ করা হয়। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ অভিনীত ছবিটিতে সেকালের জীবনধারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। এতে *ডগলাস ফেয়ারব্যাকের* ভণ্ডামির বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। ঐতিহাসিক ছবিগুলোর প্রতি কর্তৃপক্ষের বিশেষ দূর্বলতা ছিল। বিশেষ করে যেসব ছবিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় থাকত সেগুলো তারা দেখানো থেকে বিরত থাকত। আরো যেসব ছবি আমরা দেখি সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নবী মুসার জীবনী নিয়ে নির্মিত *দ্য টেন কমান্ডমেন্টস, ইওল ব্রায়ানারের দ্য কিং এ্যান্ড আই, রিচার্ড বার্টন* ও *এলিজাবেথ টেইলরের ক্লিওপেট্রা*।

দ্য কিং এ্যান্ড আই ছবিটি আমাদের মধ্যে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। ছবিটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের বিরোধ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পাশ্চাত্য প্রাচ্যের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে সেটাও এখানে স্পষ্ট ছিল। এ কারণে ছবিটি আমার খুব ভাল লেগেছে।

ক্লিওপেট্রা ছবিটিও আমাদের বেশ আনন্দ দেয়। ছবির মার্কিন নায়িকা খুবই সুন্দরি। এতে প্রাচীন মিশরের জীবনধারা একেবারে হুবহু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ক্লিওপেট্রা ছিলেন মিসরের রমণী। মিসর সফরের সময় তার একটি ভাস্কর্য আমিও দেখেছিলাম। ছবির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল রানী ক্লিওপেট্রার জীবনী।

পরে আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ অভিনীত দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক স্থানীয় সিনেমাও দেখানো হয়। মুরুব্বীদের মুখে পুরনো দিনের যেসব গল্প শুনেছি তার অনেকটি সিনেমার মধ্যে দেখতে পাই। সিনেমা দেখার সময় আমরা হৈহল্লা করতাম, হাসতাম, শিষ দিতাম। যতক্ষণ সিনেমা দেখতাম ততক্ষণ বেশ আমদেই সময়টা কেটে যেত।

পরবর্তীতে আমাদেরকে ডকুমেন্টারি বেছে সেগুলো দেখার অনুমতি দেয়া হয়। ডকুমেন্টারি বাছতে গিয়ে প্রচলিত কাহিনী এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ভিত্তিক ডকুমেন্টারিকে আমি বেশি গুরুত্ব দিতাম। অবশ্য সোফিয়া লরেনের কোন ছবি বা ডকুমেন্টারিকে আমি কখনই বাদ দিতাম না। তার অভিনীত ছবি আমার পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকত সব সময়।

ডকুমেন্টারিগুলো সরবরাহ করা হতো স্টেট লাইব্রেরী থেকে। এগুলো বাছাই করতেন আমাদের সেকশনের লাইব্রেরিয়ান আহমেদ কাদরাদা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর নির্মিত ডকুমেন্টারিগুলো আমার খুব ভাল লাগত। তার মাধ্যমে এ ডকুমেন্টারি দেখার ব্যবস্থা করতাম। এসব ডকুমেন্টারির একটিতে জাপানিদের আক্রমণে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ প্রিন্স অব ওয়েলস ডুবে যাওয়ার দৃশ্য ছিল। যুদ্ধ জাহাজ ডুবে যাওয়ার খবর শুনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের কান্নাকাটি করার দৃশ্য সেখানে ছিল। একজন নেতা জনগণের দুঃসময়ে, দেশের দুঃসময়ে কি রকম আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতে পারেন, কি রকম কষ্ট পেতে পারেন সেটা আমি চার্চিলের কান্নাকাটি থেকে বুঝেছিলাম।

আমেরিকার মোটর সাইকেল গ্রুপ হেলস এঞ্জেলসকে নিয়ে নির্মিত একটি ডকুমেন্টারি আমাদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলে। এতে মারামারি ছিল। পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতা, ন্যায় পরায়ণতার বিষয়টি ডকুমেন্টারিটিতে ভালোভাবে তুলে

ধরা হয়। ডকুমেন্টারিটি শেষ হবার পর তা নিয়ে আমাদের মধ্যে রীতিমত আলোচনার ঝড় বয়ে যায়। আমাদের দেশের পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়।

রোবেন দ্বীপ আগের চেয়ে আরো উন্মুক্ত হল। সব কিছুতেই আমরা ছাড় পেতাম। এখন যেমন সুযোগ-সুবিধা পেতে লাগলাম আগে এমনটি কখনই পাইনি। এগুলোকে আমি আমাদের মুক্তির লক্ষণ হিসেবে মনে করলাম। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। জনমত ক্রমেই আমাদের দিকে বাড়ছে। এসব বিবেচনায় কেন যেন আমার মনে হতে লাগল আমার মুক্তির সময় ঘনিয়ে আসছে।

১৯৭৯ সালে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলো এখন থেকে আফ্রিকান, ইন্ডিয়ান, এবং অন্যান্যরা একই ধরণের খাবার পাবে। রোবেন দ্বীপে খাবারের এই বৈষম্য দূর হতে লেগে গেল ১৫টি বছর। প্রতিদিন সকালে সব বন্দিরা দেড় চামচ চিনি পেতাম। তবে ইন্ডিয়ান ও আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গরা আমাদের চেয়ে আধা চামচ বেশি চিনি পেত। সকালে আমাদেরকে রুটি দেয়া শুরু হল।

আমাদের খাবারের মান দু'বছর আগেই ভালো করা হয়েছিল। সোয়েটো বিপ্লবের পর খাবারের মান আরো ভাল করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দিদের জন্য রোবেন দ্বীপকে একটি নিরাপদ জায়গায় পরিণত করার উদ্যোগ নেয় কর্তৃপক্ষ। তারই অংশ হিসেবে এসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। রাজনৈতিক বন্দিদের এই প্রথমবারের মত রান্নাঘরের কাজে নিয়োগ করা হয়। ফলে আমাদের খাবার দাবারের মান ও পরিমাণ নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। রাজনৈতিক বন্দিরা রান্নাঘরের দায়িত্ব নেয়ার পর কারারক্ষীসহ অন্যদের খাবার চুরি বন্ধ হয়ে যায়। খাবারের মেন্যুতে পরিবর্তন আসে। মাছ-মাংসের টুকরোগুলো বড় হয়।

৮৫

১৯৭৯ সালের গ্রীষ্মকাল। জেলখানা প্রাঙ্গনে টেনিস খেলছিলাম। প্রতিপক্ষের ছুঁড়ে দেয়া বলে দ্রুত আঘাত করতে গিয়ে ডান হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম। খেলা বন্ধ করতে হল। পরের কয়েকদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটলাম।

রোবেন দ্বীপের ডাক্তাররা আমাকে পরীক্ষা করলেন। একজন বিশেষজ্ঞকে দেখানোর জন্য তারা আমাকে কেপটাউনে পাঠানোর পরামর্শ দিলেন।

কর্তৃপক্ষ আমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। কোন কারণে আমি জেলখানায় মারা গেলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিন্দার মুখে পড়তে হবে– এমন একটা ভয় তাদের ছিল। তাই তারা আমাকে শেষ পর্যন্ত কেপটাউনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। হাতকড়া পরিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে আমাকে একটি নৌকায় তোলা হল। সঙ্গে দেয়া হল ৫ জন সশস্ত্র কারারক্ষী। নৌকার একেবারে শেষপ্রান্তে আমাদের বসানো হল।

ওইদিন আবহাওয়া ছিল খুব খারাপ। সমুদ্র ছিল উত্তাল। নৌকা প্রচণ্ডভাবে দুলতে শুরু করল। প্রতিটি ঢেউয়ে নৌকা একবার উপরে উঠল আবার নিচে নামল। এভাবে আমরা এগিয়ে চললাম। নৌকা যখন দ্বীপ ও কেপটাউনের মাঝামাঝি জায়গায় আসল তখন সমুদ্রের উত্তালতা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল। মনে হল নৌকাটি এখনি ডুবে যাবে। আমাকে একটি লাইফ জ্যাকেট দেয়া হল। কিন্তু আমার পাশের দু'জন তরুণ কারারক্ষীর কোন লাইফ জ্যাকেট ছিল না। ওরা ছিল আমার নাতির বয়সী। আমি তাদের বললাম, এখন যদি নৌকাটি ডুবে যায় আর আমি এই লাইফ জ্যাকেট দিয়ে শুধু নিজের জীবন রক্ষা করি তাহলে এটা হবে পৃথিবীতে করা আমার শেষ পাপ। যাহোক শেষ পর্যন্ত লাইফ জ্যাকেটের আর প্রয়োজন হয়নি।

সমুদ্রের তীরে পৌঁছে দেখি সেখানে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষীতে গিজ গিজ করছে। অন্য কিছু লোকও ছিল সেখানে। সম্ভবত ওরা দণ্ডিত ব্যক্তি। তাদেরকেও কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একজন তরুণ ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করলেন। তিনি ছিলেন সার্জন। এর আগে কখনো হাঁটুতে ব্যাথা পেয়েছি কিনা তিনি জানতে চাইলেন। বললাম, ফোর্ট হেয়ারে ফুটবল খেলতে গিয়ে একবার হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছিলাম। আমাকে তখন কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। ওই ব্যথার আগে আমি কখনো হাসপাতাল যাইনি, কখনও ডাক্তার দেখাইনি। যেখানে আমি বড় হয়েছি সেখানে কোন ডাক্তার ছিল না।

ফোর্ট হেয়ারের ডাক্তার আমার হাঁটু পরীক্ষা করে অপারেশন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি রাজি হইনি। তখন আমার মনে হয়েছিল, অপারেশন করলে আমার অনিষ্ট হবে। তখন ডাক্তার বলেছিলেন, এটা তোমার ইচ্ছা। কিন্তু এখন অপারেশন না করালে বুড়ো বয়সে তোমার অসুবিধা হতে পারে। দীর্ঘদিন পর ওই ডাক্তারের কথাই সত্য হল।

কেপটাউনের সার্জন হাঁটুর এক্সরে করলেন। দেখা গেল হাঁটুর হাড্ডি ফেটে গেছে। সম্ভবত ফোর্ট হেয়ারে ব্যথা পাওয়ার পরই ওখানে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ডাক্তার বলল, আমার অপারেশন লাগবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।

অপারেশন বেশ ভালোভাবে শেষ হল। হাঁটুর প্রতি কিভাবে যত্ন নিতে হবে সেটা ডাক্তার আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এমন সময় প্রধান কারারক্ষী এসে তার কথায় বাধ সাধলেন। বললেন, ম্যান্ডেলাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিতে হবে। তাকে নিয়ে রোবেন দ্বীপে যেতে হবে। ডাক্তার অনেকটা রাগান্বিত হয়ে বললেন, এটা অসম্ভব। ম্যান্ডেলাকে আজ রাতটা অন্তত পক্ষে হাসপাতালে কাটাতে হবে। তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাকে কোন অবস্থাতেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া যাবে না। প্রধান কারারক্ষী তার কথায় নরম হলেন।

হাসপাতালে আমার প্রথম রাতটি বেশ ভালোভাবে কাটল। নার্সরা খুব ভাল ব্যবহার করল। কি করতে কি করবে তা যেন তারা বুঝে উঠতে পারছিল না। রাতে ভাল ঘুম হল। সকালে একদল নার্স পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন নিয়ে আমার কাছে আসলেন। এগুলো পরতে বললেন। বদান্যতার জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানালাম। তাদের সুন্দর আচরণের কথা আমার সহকর্মীদের বলব বলে জানালাম।

হাসপাতালে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গদের ভালো সম্পর্ক দেখে আমি রীতিমত মুগ্ধ হলাম। আমার মত হাসপাতালের অন্যান্য কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গেও নার্স ডাক্তাররা ভালো ব্যবহার করত। এটা আমাকে অবাক করল। মনে হল কোন একটা পরিবর্তন হচ্ছে দেশে। সাদা কালোর সদ্ভাব থেকে আমি অনুপ্রাণিত হলাম। মানুষ এখন বিজ্ঞানমনস্ক হচ্ছে। বিজ্ঞানের কাছে সাদা-কালো বলে কিছু নেই। এখানে এসে সেটাই মনে হল।

হাসপাতালে আসার পর একটি জিনিস আমাকে কষ্ট দিল– সেটি হচ্ছে, উইনির সঙ্গে দেখা করতে না পারা। হাসপাতালে আসার আগে উইনির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। এ কারণেই এমনটি হয়েছে। ইতিমধ্যে বাইরে গুজব রটে যায় যে, আমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায় অবস্থান করছি। এ গুজব তাকে বিমর্ষ করে তোলে। পরে উইনিকে প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে চিঠি লেখার পর তার উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান হয়।

১৯৮০ সাল। আমাদেরকে সংবাদপত্র কেনার অধিকার দেয়া হল। এটা ছিল আমাদের একটা বড় জয়। নতুন বিধি অনুসারে একদল বন্দি একটি ইংরেজি

এবং একটি আফ্রিকান ভাষার সংবাদপত্র কিনতে পারত। কিন্তু এক গ্রুপ পত্রিকা কিনলে অন্য গ্রুপ তা নিয়ে টানাহেচড়া করত। ফলে প্রায় সময়ই পত্রিকা পাওয়া যেত না।

আমরা প্রতিদিন দুটি সংবাদপত্র পেতাম। একটি *কেপটাইমস* অন্যটি *ডাই বারজার*। দুটিই ছিল রক্ষণশীল পত্রিকা। বলতে গেলে শ্বেতাঙ্গদের মুখপত্র। এর পরও এগুলোর মাধ্যমে অনেক খবরাখবর জানা যেত। কারাবিধি অনুযায়ী এসব পত্রিকায়ও কাঁচি চালানো হত। যেসব খবর আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয় সেগুলো কর্তৃপক্ষ কাঁচি দিয়ে কেটে এরপর পত্রিকা দিত।

পত্রিকার কোন অংশ কাটা দেখলেই বুঝতাম এটা এএনসি বা আমাদের সম্পর্কিত খবর। পরে স্টার, র‍্যান্ড ডেইলি মেইল ও সানডে টাইমস কেনার সুযোগ দেয়া হল। এগুলোর ওপর আরও বেশি নিষেধাজ্ঞা ছিল। এগুলোতেও যথেচ্ছা কাঁচি চালানো হত।

১৯৮০ সালের মার্চ মাসে জোহান্সবার্গ সানডে পোস্টের বড় হেড লাইনটি ছিল 'ফ্রি ম্যান্ডেলা'। আমার মুক্তি সংক্রান্ত এ রিপোর্টটি আমি নিজে না দেখলেও অন্যদের কাছে খবরটি শুনেছি। ওই রিপোর্টে বলা হয়, আমি মুক্তি পেতে যাচ্ছি। এএনসির নেতা-কর্মীরা আমার মুক্তির ব্যাপারে তোড়জোড় শুরু করেছে। গণ স্বাক্ষর অভিযান চলছে। তাতে লাখ লাখ লোক সই করেছে। আমার মুক্তির ব্যাপারে কোর্টে পিটিশন দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। সব মিলিয়ে আমার মুক্তি সংক্রান্ত ওই রিপোর্ট ছাপা হয়। তবে কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞার কারণে পত্রিকায় আমার ছবি ছাপানো যায়নি। আমার কোন মন্তব্যও তারা দিতে পারেনি।

ইতিমধ্যেই লুসাকায় এএনসি নেতা অলিভার থিম্বু 'ফ্রি ম্যান্ডেলা' আন্দোলন শুরু করে দেন। এতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। লাখ লাখ লোক এর সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে। তবে মজার ব্যাপার হলো ম্যান্ডেলা কে সেটা তাদের অনেকেই জানত না। আমি এমনও শুনেছি লন্ডনে 'ফ্রি ম্যান্ডেলা' পোস্টার দেখে অনেকে মনে করতেন আমার ক্রিশ্চিয়ান নাম হচ্ছে ফ্রি।

এর আগের বছর ভারত সরকার আমাকে সম্মানসূচক জওহরলাল নেহেরু মানবাধিকার পুরস্কারে ভূষিত করে।

কর্তৃপক্ষ অনুমতি না দেয়ায় আমি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারিনি। আমার পরিবর্তে পুরস্কার গ্রহণ করেন অলিভার। উইনিও ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এএনসি এ সময় ঘুরে দাঁড়ায়। আন্দোলন জোরদার করে। আমার

হাতে গড়া গেরিলা সংগঠন আমখান্তু উয়ি সিজউয়ি বা এমকে নড়েচড়ে বসে। সংগঠনটি আধুনিক কায়দায় নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড শুরু করে।

জুন মাসে এমকে যোদ্ধারা জোহান্সবার্গের দক্ষিণে সাসোলবার্গ রিফাইনারিতে বোমা হামলা চালায়। এ সপ্তাহে আরো কয়েকটি কৌশলগত স্থানে তারা হামলা চালায়। ট্রান্সভালের পূর্বে অবস্থিত একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, জার্মিস্টনে একটি থানায়ও এমকে যোদ্ধারা বোমা হামলা চালায়। এছাড়া নিউব্রিটন, ভরট্রেকার হুগটি এবং প্রেটোরিয়ায় সামরিক ঘাঁটির বাইরে তারা হামলা চালায়।

সরকার এতে ভড়কে যায়। এমকে যোদ্ধাদের নির্মূল করার জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল ম্যাগনাস মালান বিশেষ অভিযান শুরুর নির্দেশ দেন। এতে পি. ডব্লিউ বোথারও সমর্থন ছিল। অভিযানে বিশেষ বাহিনী নিয়োগ করা হয়। স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের দমনের জন্য বলতে গেলে দেশে সামরিক অভিযান শুরু হয়।

'ফ্রি ম্যান্ডেলা' আন্দোলনও এ সময় চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ১৯৮০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদের একজন প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করে। আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ হিসেবেই তারা ওই উদ্যোগ নেয়। এটা ছিল আমার জন্য খুবই গৌরবের বিষয়। ওই পদে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রিন্সেস এ্যানি। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জ্যাক জনস। নির্বাচনে আমি ৭১৯৯ ভোট পেলেও রানীর কন্যার কাছে আমি পরাজিত হই। এরপরও এটা ছিল আমার জন্য বিরাট পাওনা। এ ঘটনা আমার মনে আশার আলো সঞ্চার করে। রোবেন দ্বীপের এক কোণায় পড়ে থাকলেও আমাকে নিয়ে যে বিশ্বজুড়ে হৈ চৈ হচ্ছে সেটা বুঝতে পারলাম। আমার মনে হল আমি ও আমার সঙ্গীরা একদিন নিশ্চয়ই মুক্তি পাব।

৮৬

বাবার মত আমিও থিম্বু রাজার একজন পরামর্শক ছিলাম। যদিও ছাত্র জীবন থেকেই আমার পথ ছিল ভিন্ন। আমি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলাম। এরপরও বাবার মত আমাকে থিম্বু রাজার পরামর্শক হিসেবে রাখা হয়। জেলে থাকা অবস্থায় থিম্বু রাজার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সাধ্যমত চেষ্টা করতাম। তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতাম। বয়স বাড়ার সাথে

সাথে আমার মন শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত ট্রান্সকেইর দিকে ধাবিত হতে থাকল। এ জায়গাটির কথা বেশি মনে হতে লাগল। এখানকার গাছপালা, পাহাড়-পর্বত সবই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম, জন্মভূমি ট্রান্সকেইতে ফিরে যাচ্ছি। জেলে যখন ট্রান্সকেই নিয়ে আমার ভাবনা-চিন্তা চরমে তখন খবর পেলাম থিম্বু রাজা সাবাটা দালিনদিয়েবুকে হটিয়ে আমার ভাতিজা *কে. ডি মাতানজিনা* সিংহাসন দখল করেছেন। মাতানজিনা তখন ছিলেন ট্রান্সকেই এর প্রধানমন্ত্রী। সময়টা ছিল ১৯৮১ সাল। এ পরিস্থিতিতে ট্রান্সকেই গোত্রের কিছু গোত্রপতি জরুরি ভিত্তিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কর্তৃপক্ষ তাদের অনুমতি দিলেন।

এএনসিকে সামাল দেয়ার জন্য সরকার গোত্রপতিদের সমীহ করত। তাদেরকে অনেক সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা প্রদান করত। এ জন্য আমার সহকর্মীদের অনেকে গোত্রপতিদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখাটাকে পছন্দের চোখে দেখতেন না। কিন্তু আমি গোত্রপতিদের সঙ্গে এএনসির বিরোধের কিছু দেখতাম না। গোত্রপতির এএনসির সদস্য বা নেতা হওয়াকে আমি দোষের কিছু মনে করতাম না। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক বিতর্ক হয়েছে। আমাদের কেউ মনে করতেন, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আছে এমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এএনসির সম্পৃক্ত হওয়া উচিত না। অন্যরা মনে করতেন, ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত হওয়ার অর্থ সরকারের দালালে পরিণত হওয়া। আমি কৌশলে ওইসব প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণের পক্ষে ছিলাম।

একটি বিশাল পরিদর্শক রুমে থিম্বু গোত্রপতিদের সঙ্গে বৈঠকে বসলাম। গোত্রপতিরা তাদের উভয় সংকটের কথা আমাকে খুলে বললেন। তাদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। তাদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। বললাম, মাতানজিনা অবৈধভাবে সিংহাসন দখল করেছে। এভাবে রাজা হওয়াটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। তাই মাতানজিনার পরিবর্তে তাদের উচিত হবে সাবাটাকে সমর্থন করা। আমার সমর্থন সাবাটার প্রতি পৌঁছে দেয়ার জন্য তাদের প্রতি অনুরোধ করলাম। গোত্রপতিদের মাতানজিনাকে এটাও বলার অনুরোধ করলাম যে তার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই। তার কর্মকাণ্ডে আমি ব্যথিত।

পদচ্যুৎ রাজা সাবাটা ও তার পরিবারের লোকজন নিয়ে আলোচনার জন্য মাতানজিনা আমার সঙ্গে বৈঠক করতে চাইলেন। আমার ভাতিজা হিসেবে তিনি অনেক বছর ধরেই আমার সঙ্গে বৈঠকের চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনার কথা বললেও কর্তৃপক্ষ মনে করত তিনি রাজনৈতিক

বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। এজন্য এতদিন কর্তৃপক্ষ তাকে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়নি।

এ যাত্রায় মাতানজিনা আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য উঠেপড়ে লাগল। আমার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছেও জোরালো অনুরোধ জানাল। আমি বিষয়টি হাই অরগান ও এএনসির অন্যান্য সদস্যদের জানালাম। অনেকে বললেন, তিনি তোমার ভাইপো, তোমার সঙ্গে তার দেখা করার অধিকার আছে। তাই তাকে আসতে বল। কিন্তু ক্যাথি, রেমন্ড ও গোভান বললেন, তার সঙ্গে দেখা করলে বিষয়টি অন্যদিকে মোড় নিবে। মাতানজিনাকে আপনি স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে সবাই ধরে নেবে। আমার সঙ্গে দেখা করার মাধ্যমে তিনি রাজনৈতিকভাবে ফায়দা লুটবেন। তাই মাতানজিনার সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত হবে না। তাদের বক্তব্যের সঙ্গে আমিও একমত হলাম।

কিন্তু আমার মন টানছিল ভাইপোর সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমার বিশ্বাস ছিল তার সঙ্গে মুখোমুখি হলে আমি তার ধ্যান-ধারণা পাল্টাতে পারব। মাতানজিনাকে তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখতে পারব। এজন্য তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। আমার কথা শুনে আমার সেকশনের এএনসির সদস্যরা মাতানজিনার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে শেষতক সম্মতি দিল।

কিন্তু গোল বাঁধাল এফ ও জি সেকশনের এএনসি নেতারা। জেনারেল সেকশনের এএনসি নেতা স্টিভ টিসুইট বললেন, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ মাতানজিনাকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করবে। তার অবস্থান আরো শক্ত করবে। জনগণ ধরে নিবে তার অভ্যুত্থানকে আমি মেনে নিয়েছি, রাজা হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছি। নানামুখী আপত্তির কারণে শেষপর্যন্ত তার সঙ্গে সাক্ষাত না করার সিদ্ধান্ত নিলাম। জেলকর্তৃপক্ষকে বলে দিলাম, আমি মাতানজিনার সঙ্গে দেখা করব না। এটা যেন তাকে জানিয়ে দেয়া হয়।

১৯৮২ সালের মার্চ মাস। কর্তৃপক্ষ জানাল আমার স্ত্রী উইনি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। তিনি এখন হাসপাতালে আছেন। এর বেশি তারা আমাকে আর কিছুই বললেন না। ফলে তার প্রকৃত অবস্থা জানতে পারলাম না। খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমার আইনজীবীকে দ্রুত আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয়ার অনুমতি দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালাম।

কর্তৃপক্ষ সব সময় তথ্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। এ ব্যাপারে তাদের সফলতা ছিল শতভাগ। ৩১ মার্চ উইনির আইনজীবী ও আমার বন্ধু আব্দুল্লাহ

ওমর রোবেন দ্বীপে আসলেন। আমার সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ উইনির গাড়িটি উল্টে গিয়েছিল। তবে এতে উইনি কোন ব্যাথ্যা পাননি। তিনি ভাল আছেন। ওমরের মুখে প্রকৃত অবস্থা জেনে আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। তবে এরপরও উইনির জন্য মনটা আনচান করতে লাগল।

অনেকদিন ধরে সেলের মধ্যে আছি। বাইরে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না। এজন্য অস্বস্তিতে ভুগছিলাম। অনেকদিন আগে কমান্ডিং অফিসারের রুমে গিয়েছিলাম। তারপর আর সেদিকে যাওয়া হয়নি। কমান্ডিং অফিসার প্রয়োজন পড়লে বন্দিদের তার অফিসে ডেকে পাঠান। সেলে আসেন কদাচিৎ। কিন্তু হঠাৎ একদিন কমান্ডিং অফিসার সদলবলে আমার সেলে আসলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে সেলের একপ্রান্তে নিয়ে গেলেন। অন্যদের বাইরে যেতে বললেন। এরপর কমান্ডিং অফিসার বললেন, ম্যান্ডেলা আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন। বললাম কেন? উনি বললেন, আমরা আপনাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জিজ্ঞেস করলাম কোথায়?

কমান্ডিং অফিসার বললেন, আমি ঠিক জানি না। আমি জায়গার নাম জানার জন্য পীড়াপিড়ি করতে লাগলাম। আমার পীড়াপিড়িতে তিনি বললেন, প্রেটোরিয়া থেকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে যাতে আমরা আপনাকে অনতিবিলম্বে রোবেন দ্বীপ থেকে পাঠিয়ে দেই। এই বলে কমান্ডিং অফিসার আমার সেল থেকে চলে গেলেন। এরপর ওয়াল্টার, রেমন্ড এম হলবা, ও এন্ড্রু মেলাঙ্গিনির সেলে গেলেন। তাদেরকেও একই রকম নির্দেশ দিলেন। মালামাল গুছগাছ করতে বললেন।

টানা ১৮ বছর রোবেন দ্বীপে কাটানোর পর হঠাৎ আমাদেরকে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে। তাই মনে অনেক প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এসব। মনে প্রশ্ন জাগলেও উত্তর মেলানো ছিল কঠিন। কারণ জেলখানায় কেবল প্রশ্নই করা যায় উত্তর পাওয়া যায় না।

জিনিসপত্র ভরার জন্য আমাদের প্রত্যেককে একটি করে বড় বাক্স দেয়া হল। গত দুই দশক ধরে আমি যেসব জিনিস সংগ্রহ করেছি তার সবই বাক্সতে ভারলাম। আধ ঘন্টার মধ্যে জিনিসপত্র গোছানো শেষ হল।

আমাদের চলে যাওয়ার খবর শুনে রোবেন দ্বীপে হৈচৈ পড়ে গেল। আশপাশের বন্দিরা আমাদের সেলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। বহু বছরের সঙ্গীদের সাথে

শেষ দেখা করার বা তাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সুযোগ আমরা পেলাম না। বন্দি জীবনের এটা আরেকটা অমর্যাদাকর অধ্যায়। কর্তৃপক্ষের কাছে বন্ধুত্ব, আনুগত্য, আন্তরিকতার কোন মূল্য ছিল না। তারা আমাদের বন্দি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতো না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের ফেরিতে তোলা হল। এটি রওয়ানা দিল কেপটাউনের উদ্দেশ্যে। রোবেন দ্বীপের বাতিগুলো যতক্ষণ চোখে পড়ল ততক্ষণ আমি সে দিকে তাকিয়ে রইলাম। যখন দ্বীপটি অন্ধকার হয়ে গেল, তখন চোখ ফেরালাম। এ দ্বীপকে আবার দেখতে পাব বলে মনে হল না। টানা দুই দশক কাটিয়ে রোবেন দ্বীপ ছাড়ার সময় নানা কথা মনে হল। ভবিষ্যতে কি হবে তা তখনও বুঝতে পারলাম না।

ফেরি এসে কেপটাউনের সমুদ্র উপকূলে ভীড়ল। সশস্ত্র রক্ষীরা প্রহরা দিয়ে আমাদের তীরে ওঠাল। তোলা হল জানালা ছাড়া একটি ট্রাকে। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বসার জায়গা নেই। তাই দাঁড়িয়ে রইলাম। টানা দেড়ঘণ্টা চলার পর ট্রাক থামল। লোহার দরজা খুলে দেয়া হল। চারদিক অন্ধকার। একজন রক্ষীকে জিজ্ঞেস করলাম আমরা কোথায় এসেছি। উত্তর এল, পুলসমোর প্রিসনে।

দশম পরিচ্ছেদ

শত্রুপক্ষের সঙ্গে আলোচনা

৮৭

পুলসমোর খুবই সুরক্ষিত একটি কারাগার। এটির অবস্থান ছিল কেপটাউনের কয়েকমাইল দক্ষিণপূর্বে। জায়গাটির নাম ছিল টুকাই। কারাগারটির প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল খুবই চমৎকার। পাহাড়-পর্বত, সবুজ গাছপালা ছিল চারদিকে। খুব উঁচু দেয়ালে ঘেরা থাকলেও বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখে পড়ত। তবে সবচেয়ে বেশি দেখা যেত নীল আকাশ।

পুলসমোরের ভিতরের অবস্থাও ছিল ভারী সুন্দর। ভবনগুলো ছিল আধুনিক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। নানারকম বাগানে পরিপূর্ণ। বিশেষ করে স্টাফদের ভবনটি বেশ ঝকঝকে। ময়লা-আবর্জনার বালাই ছিল না এখানে। বন্দিদের কামরাগুলো অবশ্য অতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল না। তবে আমাদের কামরাগুলোর পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। বন্দিদের অন্য কামরাগুলোর মত আমাদের কামরাগুলোতে কোন ধুলিবালি বা ময়লা ছিল না। আমাদের কক্ষগুলো ছিল বেশ বড়সড় ও পরিপাটি।

অন্য বন্দিদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশে রাখা হল আমাদের চারজনকে। আমাদেরকে ভবনের তিন তলায় বিশাল এক রুমে রাখা হল। ওই তলায় আমরা ছাড়া কোন বন্দি ছিল না। সে সূত্রে বিশেষভাবে নির্মিত তৃতীয় তলাটি ছিল বলতে গেলে আমাদের দখলে। আমাদের থাকার মূল কক্ষটি ছিল ৫০ ফুট লম্বা ও ৩০ ফুট প্রশস্ত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক। পাশে ছিল আলাদা বাথরুম ও টয়লেট। সেখানে দুটি বেসিন ও দুটি ঝর্ণা ছিল। চারজনের জন্য চারটি খাট, সুন্দর বিছানাপত্র, লেপ তোষক, কম্বল ইত্যাদিও ছিল। রোবেন দ্বীপে ১৮টি বছর শুয়েছি মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে। এখানে এসব পেয়ে আমাদের মনে হল আমরা এখন পাঁচতারা বা ফাইভ স্টার হোটেলে আছি।

আমাদের রুমের চারদিকে বারান্দাও ছিল। ছিল বিশাল খোলা জায়গা যার আকৃতি ফুটবল খেলার মাঠের অর্ধেকের মত ছিল। চারদিকে ১২ ফুট উঁচু দেয়াল থাকায় খোলা আকাশ আর দূরের পাহাড়-পর্বত ছাড়া এখান থেকে কিছুই দেখা যেত না। এত সুযোগ-সুবিধা থাকার পরও এখানে কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলাম। রোবেন দ্বীপ থেকে কেন এখানে পাঠানো হল সেটা ভাবতে লাগলাম। আমাদের মনে হল, রোবেন দ্বীপে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। তরুণ বন্দিরা আমাদের দ্বারা দারুণ প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। এটা যেন বেশি দূর এগুতে না পারে সে জন্য আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে। আমাদের এখানে পাঠিয়ে রোবেন দ্বীপে এএনসিকে কার্যত নেতৃত্ব শূন্য করা হয়েছে। ওয়াল্টার, রেমন্ড এবং আমি ছিলাম হাই অর্গানের সদস্য।

এন্ড্রু হাই অরগানের সদস্য না হবার পরও আমাদের সঙ্গে তাকে পাঠানো হয়। মনে হল কর্তৃপক্ষ এটি জানত না। আমাদের সম্পর্কে তাদের গোয়েন্দা রিপোর্টে গণ্ডগোল ছিল। হাই অরগানের প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন ক্যাথি। তরুণ বন্দিদের সঙ্গে যোগাযোগের গুরু দায়িত্বটি পালন করতেন তিনি। আমরা নিশ্চিত ছিলাম ক্যাথিকেও শিগগিরই এখানে আনা হবে। অনুমান সত্য হল। কয়েক সপ্তাহ পরই ক্যাথি আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

এখানে নতুন আরেক বন্দিকে আমাদের সঙ্গে রাখা হল। তাকে আমরা চিনতাম না। রোবেন দ্বীপেও তাকে কখনও দেখিনি। তিনি হলেন তরুণ আইনজীবী প্যাট্রিক মাকুবেলা। কেপ শহরের পূর্বাঞ্চলের এএনসি নেতা ছিলেন তিনি। নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে তাকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। জোহান্সবার্গের একটি কারাগার থেকে তাকে এখানে পাঠানো হয়।

পুলসমোর ছিল আমাদের জন্য নতুন এক পৃথিবী। রোবেন দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়া এখানে সব কিছু ছিল। এখানকার খাবার ছিল খুবই উন্নতমানের। বাড়ির মত এখানেও তিনবেলা খাবার পরিবেশন করা হত। প্রতিদিনের খাবারেই মাছ, মাংস, সব্জি ইত্যাদি থাকত। সবচেয়ে সুখের বিষয় হল এখানে নতুন এক পৃথিবীর সন্ধান পেলাম আমরা যেটা আগে পাইনি। আমরা এখানে বিভিন্ন ধরণের পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পেতাম। চাইলে টাইম ম্যাগাজিন, গার্ডিয়ানের পুরনো কপিও আমাদের দেয়া হত। এতে করে গোটা দুনিয়ার খোঁজ-খবর জানার সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। আমাদেরকে রেডিও দেয়া হয়। তবে এতে স্থানীয় স্টেশনের সম্প্রচার শোনা যেত। বিবিসি শুনতে পারতাম না। আমরা বারান্দার পাশের খোলা জায়গায় সারাদিন ঘুরে বেড়াতে পারতাম।

আমাদের বড় রুমের পাশে ছোট্ট একটি রুম ছিল। আমি সেটাকে পড়াশুনার জায়গা বা স্টাডিরুমে পরিণত করি। সেখানে চেয়ার টেবিল, বুকসেলফ সবই ছিল। দিনে ওখানে লেখাপড়া করতে পারতাম।

পুলসমোরে যাওয়ার কিছু দিনের মধ্যে উইনি আসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। এখানে পরিদর্শকের সঙ্গে দেখা করার পরিবেশ রোবেন দ্বীপের তুলনায় খুবই উন্নততর। অত্যন্ত আধুনিক ও আরামদায়ক পরিবেশে উইনির সঙ্গে দেখা করতে পেরে খুব ভাল লাগল। বিশাল একটি গ্লাসের বাইরে বসে উইনির সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেয়া হল। আমাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা ছিল কাঁচের গ্লাসটি। দুজন দুজনকে দেখতে পাই। কথা বলার জন্য এখানে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা ছিল। তাই আলাপচারিতায় কোন কষ্ট হয় নি। তবে এরপরও মনে হতে লাগল কাঁচের ওই প্রতিবন্ধকতা না থাকলে কত ভাল হত।

স্ত্রী ও পরিবারের লোকজন রোবেন দ্বীপের চেয়ে খুব সহজে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। এটা ছিল আমার জন্য খুব সুখের একটি বিষয়। আগন্তুকদের সঙ্গে পুলসমোরে ব্যবহারও ভাল করা হত। উইনি আসলে তার গতিবিধির ওপর নজর রাখতেন ওয়ারেন্ট অফিসার জেমস গ্রেগরি। তিনি রোবেন দ্বীপেও কাজ করেছেন। তাকে আমি তেমন একটা চিনতাম না। কিন্তু তিনি ঠিকই আমাকে চিনতেন। রোবেন দ্বীপে আমার কাছে যত চিঠি পাঠানো হত সেগুলি পরীক্ষা করে দেখতেন তিনি। এরপর যেগুলো দেয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হত সেগুলি আমাকে দেয়া হত। সে সূত্রে ভদ্রলোক আমার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

পুলসমোরে এসে গ্রেগরিকে খুব ভাল একজন মানুষ বলে আমার মনে হল। অন্যান্য কারারক্ষীদের তুলনায় তার আচার-ব্যবহার ছিল ভাল। গ্রেগরি ছিলেন পোলিশ। স্বল্পভাষী। উইনির সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। রোবেন দ্বীপে সময় ফুরিয়ে গেলে কর্কশ ভাষায় চেঁচিয়ে তা জানিয়ে দেয়া হত। বলা হত সময় শেষ। কথা বন্ধ। গ্রেগরি সেভাবে না বলে বলতেন, মিসেস ম্যান্ডেলা আপনার হাতে আর মাত্র ৫ মিনিট আছে।

পুলসমোরে এসেও আমার বাগান করার শখ জাগলো। আমাদের ভবনের চারপাশে যেসব খোলা জায়গা ছিল সেগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। কোন কোন জায়গায় বাগান করবো তা চিহ্নিত করলাম। এরপর বাগান করার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাইলাম। মাটি ভেজানোর জন্য ১৪/১৫ গ্যালন পানি ধরে এমন একটি ড্রাম ও বাগান করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেয়ার অনুরোধ করলাম।

কর্তৃপক্ষ সানন্দে আমার অনুরোধ মঞ্জুর করলো। ৩২ গ্যালন পানি ধরে এমন একটি গ্যালন, বাগান করার পাত্র ফ্লাওয়ার পট, গ্লোভস, দা, কাঁচি, কোদাল সবই দিল। আমি বাগান করা শুরু করলাম। বাগানে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, বেগুন, কপি, গাজর, টমেটো, নানা ধরণের শাক সবজী ফলাতে শুরু করলাম। ছোট একটি বাগানে কম করে হলেও বিভিন্ন ধরণের ৯শ চারা ছিল।

বাগানের সবজির অনেক বীজ আমাকে দিয়েছিলেন স্বয়ং কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার মুনরো। তিনি আমার শখ দেখে পুলকিত হন এবং বাঁধাকপি ও গাজরের বীজ নিজে এসে দিয়ে যান। কারারক্ষীরাও আমাকে বিভিন্ন রকমের বীজ দিয়ে সাহায্য করেন। বাগানের জন্য প্রয়োজনীয় সারও তারা আমাকে দেন।

প্রতিদিন সকালে মাথায় একটি পুরনো হ্যাট বা টুপি, হাতে গ্লোভস পরে বাগানে যেতাম এবং টানা দুই ঘন্টা কাজ করতাম।

প্রতি রোববার রান্নাঘরে সবজি পাঠিয়ে দিতাম। সেগুলো দিয়ে সাধারণ কয়েদিদের জন্য বিশেষ খাবার প্রস্তুত করা হত। তাজা শাকসবজী কারারক্ষীদেরও দিতাম। তারা এগুলো পেয়ে খুব খুশি হত।

রোবেন দ্বীপে আমার বড় বড় সমস্যাও অনেক সময় কর্তৃপক্ষ আমলে নিত না। কিন্তু এখানে ছোটখাটো সমস্যাও তাদের দৃষ্টি এড়াত না। বিশেষ করে ব্রিগেডিয়ার মুনরো ছিলেন খুবই সজ্জন। সব কাজে আমাকে সহযোগিতা করতেন। আমার ছোট-খাটো কষ্টও তার দৃষ্টি এড়াত না। ১৯৮৩ সালের কথা। উইনি ও জিনদজি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। কথা প্রসঙ্গে তাদেরকে বললাম, কর্তৃপক্ষ আমাকে এমন এক জোড়া জুতা দিয়েছে যেটা আকারে ছোট। ঐ জুতা পরতে গিয়ে আমার পায়ে ফোসকা পড়ে গেছে।

একথা শুনে উইনি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। পরে জানলাম ওই খবর পত্র-পত্রিকায় পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। বাইরে তা নিয়ে রীতিমতো হুলস্থূল পড়ে গেছে। বুঝলাম খবরটি অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা হয়েছে। এর কিছু দিন পরই হেলেন সুজম্যান ছুটে আসেন বিষয়টি তদন্ত করতে। আমি পা খুলে তাকে দেখাই। এ সময় আমরা অভিযোগ করি মেঝে স্যাঁতসেঁতে থাকে। এজন্য আমাদের পায়ের সমস্যা হচ্ছে। বাইরে এ খবর বিকৃত হয়ে প্রচার হয়। পত্র পত্রিকায় বলা হয়, আমাদের এমন ঘরে রাখা হয়েছে যা বৃষ্টির পানিতে সয়লাব হয়ে যায়।

১৯৮৪ সালের মে মাস আমার জন্য স্মরণীয় একটি সময়। উইনি, জেনি ও তার বাচ্চা মেয়ে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওয়ারেন্ট অফিসার গ্রেগরি পাহারা দিয়ে আমাকে তাদের কাছে নিয়ে যান। পরিদর্শক রুমে না নিয়ে আমাকে ছোট্ট

একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। রুমটিতে ছোট একটি টেবিল ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। কোন লোকজনও সেখানে ছিল না।

গ্রেগরি বলল, কর্তৃপক্ষ আমাকে আজ সেখানেই পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। এরপর গ্রেগরি আমার মেয়ে ও নাতনীকে বাইরে নিয়ে যান। তার উদ্দেশ্য ছিল উইনি ও আমাকে নিভৃতে, ও একান্তে কথা বলার সুযোগ করে দেয়া। আমি উইনিকে একা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। তাকে জড়িয়ে ধরলাম। গভীরভাবে আলিঙ্গন করলাম। চুমু দিলাম। একে অপরকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকলাম। তখনও আমার কাছে এটা স্বপ্ন মনে হচ্ছিল। অনেকক্ষণ আমরা চুপচাপ নিজেদের জড়িয়ে ধরে রাখলাম। কথা বললাম হৃদয়ে। উইনিকে ছাড়তে মনে চাইছিল না। কিন্তু করার কিছু ছিল না। কিছুক্ষণ পর রুমে আমার মেয়ে ও নাতনী প্রবেশ করলে উইনি আমার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

দীর্ঘ ২১ বছর পর স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পেরে আমার রক্তে-শিরায় শিহরণ জাগে। মনে ভিন্ন অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

৮৮

পুলসমোর জেলখানায় বসে বাইরের সব খোঁজ-খবরই পাওয়া যেত। এসময় আন্দোলন জোরদার হয় এবং সরকারের দমন-পীড়নও বেড়ে যায়। এসব খবরই আমরা জেলখানায় বসে জানতে পারি। ১৯৮১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিরক্ষা বাহিনী এএনসির মাপুতো ও মোজাম্বিক অফিসে অভিযান চালিয়ে আমাদের ১৩ জন লোককে হত্যা করে। এর মধ্যে নারী ও শিশুও ছিল। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর কেপটাউনের বাইরে একটি নির্মাণাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে এমকে গেরিলারা বোমা হামলা চালায়। দেশের বেশ কয়েকটি সামরিক স্থাপনা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও তারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। একই মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা সেনাবাহিনী এএনসির মাসিরু ও লেসেথো কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ৪২ জন লোককে হত্যা করে। তাদের মধ্যে ১৫/২০ জন নারী ও শিশুও ছিল।

১৯৮২ সালের আগস্টে রুথ ফার্স্টের কার্যক্রম মাপুতোতে শুরু হয় নির্বাসিত থাকা অবস্থায় এখানেই রুথ এক চিঠি বোমার আঘাতে নিহত হন। রুথ ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সৈনিক জো স্লোভোর গর্বিত স্ত্রী। স্লোভোকে আন্দোলনের কারণে বেশ কয়েকমাস জেল খাটতে হয়েছিল। রুথ ফার্স্ট ছিলেন

খুবই উদ্দীপনাময় নারী। মেয়েদেরকে আন্দোলনে অনুপ্রাণীত করার যাদুকরী ক্ষমতা ছিল তার। উয়িটসে পড়াশুনার সময় তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আন্দোলন দমানোর জন্য রাষ্ট্র কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত ছিল রুথের নির্মম হত্যাকাণ্ড।

এএনসির গেরিলা সংগঠন এমকে প্রথম গাড়ি বোমা হামলা চালায় ১৯৮৩ সালের মে মাসে। ওই হামলার লক্ষবস্তু ছিল সেনাবাহিনীর গোয়েন্দাদের একটি গাড়ি। হামলায় ১৯ জন নিহত ও দুইশরও বেশি লোক আহত হয়। প্রেটোরিয়ার একেবারে প্রাণকেন্দ্রে হামলাটি চালানো হয়। বেসামরিক লোকজনের মৃত্যু ছিল দুঃখজনক। এতগুলো লোক এভাবে নিহত হওয়ায় আমি শিউরে উঠলাম, দুঃখ পেলাম। তবে এ ধরণের হামলা এড়ানোরও উপায় ছিল না। কারণ আন্দোলন দমানোর পথ হিসেবে সরকার সামরিক শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নিয়েছিল। নিষ্ঠুরতা যুদ্ধের একটি অংশ। এর জন্য মূল্যও দিতে হয় অনেক। ঝরে যায় অনেকের প্রাণ।

সংকট নিরসনে এএনসি ও সরকার সামরিক এবং রাজনৈতিক– এ দু'পথ ধরে এগুচ্ছিল। সরকারের রাজনৈতিক পথটি ছিল অত্যন্ত জঘন্য। দেশে বিভাজন সৃষ্টি করে শাসন চালিয়ে যাওয়া ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। সরকার শ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গ ও ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে পৃথক করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে সংবিধান সংশোধন করা হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনসহ পার্লামেন্টের সব ক্ষমতা দেয়া হয় শ্বেতাঙ্গদের হাতে। কৃষ্ণাঙ্গ ও ইন্ডিয়ানদের রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশূন্য করার জন্য ওই উদ্যোগ নেয়া হয়। অথচ দেশের ৮০ শতাংশ লোক ছিল কৃষ্ণাঙ্গ ও ইন্ডিয়ান। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তৃণমূল পর্যায়ে চরম অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভের দানা বাঁধতে থাকে। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর ধরে নিষিদ্ধ থাকায় এএনসির পরিবর্তে এসবের নেতৃত্ব দেয় ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)। এএনসির সঙ্গে ইউডিএফের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯৮৪ সালে নতুন পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৮০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ ও ইন্ডিয়ান ভোটার ওই নির্বাচন বর্জন করে।

ইউডিএফ এ সময় শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ স্বাধীনতাকামী ছোট বড় ৬'শটি প্রতিষ্ঠান ইউডিএফের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে।

দেশের এই চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে এএনসির জনপ্রিয়তাও হু হু করে বাড়তে থাকে। জনমত জরিপে দেখা যায় অধিকাংশ লোক এএনসিকে সমর্থন করছে। ২৫ বছর ধরে নিষিদ্ধ থাকলেও আফ্রিকানদের এএনসির প্রতি ভালবাসা একটুও কমেনি দেখে খুবই পুলকিত হই। দেশে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হতে শুরু করে। পুরো বিশ্বের নজর কাড়তে সক্ষম হয় এই বর্ণবাদ

বিরোধী আন্দোলন। ১৯৮৪ সালে বিশপ ডেসমন্ড টিটুকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কার পাওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানিয়ে জেলখানা থেকে চিঠি লিখলেও কর্তৃপক্ষ সেটা তার হাতে পৌছায়নি। বর্ণবাদী নীতি পরিহারের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ওপর দেশে বিদেশে চাপ বাড়তে থাকে। অনেক দেশ প্রেটোরিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে শুরু করে।

এ সময় সরকার আমাকে নানা প্রলোভন দিয়ে তাদের প্রস্তাবে রাজি করানোর চেষ্টা করে। তারা আমাকে ট্রান্সকেই যেতে বলে যাতে সেখানকার পদলেহী সরকারের প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধি পায়। মিনিস্টার ক্রুগার বিভিন্ন সময় আমার কাছে এসে তাদের প্রস্তাবে রাজি করানোর চেষ্টা করে। বিভিন্ন অজুহাতে ক্রুগার আমার কাছে আসত। বলতো ম্যান্ডেলা আমরা তোমার সঙ্গে কাজ করতে চাই। কিন্তু তোমার সহকর্মীদের সঙ্গে নয়। আমি এগুলোর কোন জবাব দিতাম না। ভালো করে জানতাম, সরকার আমাকে পরীক্ষা করছে। আমার সঙ্গে আলোচনা শুরুর আগে তারা আমাকে বাজিয়ে নিতে চাইছে। ১৯৮৪ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে দু'জন বিখ্যাত পশ্চিমা ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এদের একজন নিকোলাস বেথেল। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ বা হাউস অব লর্ডসের সদস্য। তিনি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টেরও সদস্য ছিলেন। অন্যজন হলেন স্যামুয়েল ড্যাশি। তিনি ছিলেন জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক। তারা আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের নেতা ও নতুন আইনমন্ত্রী কোবেই কোয়েটসির অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

জেলখানার কমান্ডিং অফিসারের রুমে লর্ড বেথেলের সঙ্গে আমার বৈঠক হয়। ওই কক্ষে তখন প্রেসিডেন্ট বোথার একটি বিশাল ছবি শোভা পাচ্ছিল। বেহেল ছিলেন বেশ হাসিখুশি ও আমুদে মানুষ। তার কণ্ঠস্বর ছিল খুবই ভালো। প্রথম দর্শনে হাত মেলানোর সময় আমি তাকে লক্ষ্য করে বলি, আপনি দেখতে অনেকটা চার্চিলের মত। তিনি হেসে ওঠেন।

বেথেল পুলসমোরে আমি কেমন আছি সেটা জানতে চান। আমি সব কিছু খুলে বলি। এখানে আমাদের অবস্থা তুলে ধরি। দেশজুড়ে চলমান সশস্ত্র আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হয়। আমি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেই, এতে আমাদের করার কিছুই নেই। এটা হচ্ছে সরকারের দমন-পীড়ন ও নির্যাতনের ফসল। বেহেলকে জানাই, আমাদের লক্ষ্য সামরিক স্থাপনা, সাধারণ মানুষ নয়। আমাদের লোকেরা হত্যাকারী হয়ে উঠুক সেটা আমরা চাই না।

বেথেলের সঙ্গে আলোচনার কয়েকদিনের মাথায় আমার সঙ্গে বৈঠক করতে আসেন প্রফেসর ড্যাসি। কেমন দক্ষিণ আফ্রিকা চাই সেটা তার কাছে তুলে ধরি। তাকে বলি ধর্ম বর্ণ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকাই আমার স্বপ্ন। আমরা সবার সমান রাজনৈতিক অধিকার চাই। গায়ের রঙের কারণে কারো রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ন হবে। কেন্দ্রিয় পার্লামেন্টে সে অধিকার বঞ্চিত হবে এমনটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। একজনকে একটি ভোটাধিকার দিতে হবে। তার ভিত্তিতে পার্লামেন্ট গঠন করতে হবে। বর্ণবাদ বিরোধী দুর্ণাম ঘুচানোর জন্য মিশ্র বিবাহ বা সাদা কালো বিয়ে অনুমোদন করে সরকার যে আইন করেছে সেটা সমর্থন করি না সে ব্যাপারে জানতে চান ড্যাসি। তাকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেই, শ্বেতাঙ্গ রমণীদের বিয়ে করার উচ্চাভিলাষ আমাদের নেই। আমরা শুধু সমান রাজনৈতিক অধিকার চাই। সরকারের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে সে ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই।

এর কিছুদিন পর রক্ষণশীল সংবাদপত্র ওয়াশিংটন টাইমসের দুজন সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকার নিতে আসেন। তাদের কথাবার্তা আচার-আচরণ ছিল দুঃখজনক। দেশের প্রকৃত অবস্থা, আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত জানার পরিবর্তে আমাকে একজন সন্ত্রাসী ও কমিউনিস্ট প্রমাণ করাই যেন ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

ওই দুই মার্কিন সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল কুরুচিপূর্ণ ও আপত্তিকর। তারা প্রমাণ করতে চাচ্ছিল আমি খ্রিস্টান নই। মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নেতা লুথার কিং কখনোই সন্ত্রাসকে সমর্থন করেননি ইত্যাদি। আমি তাদের বলি, মার্টিন লুথার কিং যে পরিস্থিতিতে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকায় সংগ্রাম করেছেন সে পরিস্থিতি আর দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি এক নয়। এখানকার অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। মার্টিন লুথার কিং এর আন্দোলনের সময় আমেরিকা ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সংবিধানে নাগরিকদের সমান অধিকারের গ্যারান্টি ছিল। কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে সামাজিক বৈষম্য ও সন্ত্রাস থাকলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন অনাচার ছিল না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় এসবের কিছুই নেই। এটা পুরোপুরিভাবে একটি পুলিশি রাষ্ট্র।

তাদেরকে আরো বলি, আমি পুরোদস্তুর একজন খ্রিস্টান। আগেও ছিলাম, এখনও আছি। আমাকে কমিউনিস্ট মনে করা হলেও আমি তা নই। সন্ত্রাসকে আমরা সমর্থন করি না। এখন যেসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হচ্ছে সেগুলো আক্রমণাত্মক নয় রক্ষণাত্মক। নিজেদের রক্ষার জন্য আফ্রিকায় নিপীড়িত মানুষের সামনে এটা ছাড়া এখন কোন পথ নেই। আমার কথায় তারা প্রভাবিত হয়েছে– এমনটি অবশ্য মনে হল না।

১৯৮৫ সালের ৩১ জানুয়ারি। রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি নিয়ে প্রেসিডেন্ট পি ডব্লিউ বোথা আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তির প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটি ছিল শর্ত সাপেক্ষে। পার্লামেন্টে বক্তৃতার সময় প্রেসিডেন্ট বলেন, নিঃশর্তভাবে সহিংসতা প্রত্যাখ্যান করলে সরকার আমাকে মুক্তি দেবে। ওই প্রস্তাব মেনে নেয়া হলে শুধু আমাকেই নয় অন্য রাজনৈতিক বন্দিদেরও ছেড়ে দেয়া হবে। ওই প্রস্তাব দিয়ে বোথা আমাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেন। আমি যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সমর্থক সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেন। বোথা পার্লামেন্টে বলেন, ম্যান্ডেলার মুক্তির বিষয়টি এখন সরকারের ওপর নয় তার নিজের ওপর নির্ভর করছে।

রেডিওতে ওই বক্তৃতা শুনে আমি কমান্ডিং অফিসারকে অনতিবিলম্বে স্ত্রী উইনি ও আমার আইনজীবী ইসমাইল আইয়ুবকে আমার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করতে বললাম। কিন্তু এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও তারা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাননি। এর মধ্যে আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিক বোথাকে চিঠি লিখে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। কারণ ওই প্রস্তাবটি ছিল দূরভিসন্ধিমূলক। এএনসির নেতা কর্মীদের সঙ্গে আমার বিরোধ সৃষ্টির জন্য ওই প্রস্তাব দেয়া হয়। এছাড়া ওই লোভনীয় প্রস্তাব মানলে সেটি হত এএনসির নীতির পরিপন্থি।

বোথা দেশের চলমান সহিংসতার দায়ভার আমার কাঁধে চাপাতে চাইলেন। কিন্তু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিশ্ববাসীকে আমি জানিয়ে দিলাম, আমাদের ওপর যে জুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছে তার ফসল হচ্ছে ওই সহিংসতা।

শুক্রবার উইনি ও ইসমাইলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। রোববার ইউডিএফ সুয়েটো জুবিলিয়ান স্টেডিয়ামে জনসভার আয়োজন করে। ওই জনসভায় মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান সম্বলিত আমার পাঠানো বিবৃতি পড়ে শোনানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ওই বিষয়টি নিয়েই উইনি ও ইসমাইলের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। কয়েকজন কারারক্ষী আমাদের আলাপচারিতা পর্যবেক্ষণ করেন। এদের কাউকেই আমি চিনতাম না। কথা চলাকালে একজন তরুণ কারারক্ষী বলল, পারিবারিক বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। তাকে উপেক্ষা করে আমি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলাম। কয়েক মিনিট পর ওই কারারক্ষী আরেকজন সিনিয়র রক্ষীকে নিয়ে আমার কাছে এলেন। তাকে আমি চিনতাম। তিনি এসে বললেন, আমাকে অবশ্যই রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে কথা বলা বন্ধ করতে হবে। তাকে বললাম, রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমি কথা বলছি। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং আমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, প্রেসিডেন্ট যদি স্বয়ং আমাকে এ বিষয় নিয়ে কথা বলা বন্ধের আদেশ দেন তাহলে আমি থামব। তুমি এখনই প্রেসিডেন্টকে ফোন করে বিষয়টি জিজ্ঞেস

কর। এটি না পারলে দয়া করে বিরক্ত করো না। তিনি ফোনও করলেন না। আমাদের কথায় আর ব্যাঘাতও সৃষ্টি করলেন না।

আলোচনা শেষে ইউডিএফের জনসভায় পাঠ করার জন্য তৈরি করা বক্তৃতার কপিটি ইসমাইল ও উইনির হাতে তুলে দিলাম। বক্তৃতায় সরকারের প্রস্তাবের জবাব দেয়ার পাশাপাশি আর্চবিশপ টিটুকে নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় অভিনন্দন জানালাম। ইউডিএফকে এ ধরণের জনসভার আয়োজন করায় ধন্যবাদ জানালাম। ১৯৮৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি রোববার আমার মেয়ে জিনদজি হাজার হাজার মানুষের সামনে ওই বিবৃতিটি পড়ে শোনায়।

মায়ের মত সেও চমৎকার ভঙ্গিমায় কথা বলতে পারত। দীর্ঘ ২০ বছর পর আমার সরাসরি লেখা কোন বক্তৃতা শুনে দক্ষিণ আফ্রিকার হাজার হাজার জনতা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বিবৃতিটি পাঠের সময় জিনদজি বলেন, জেলে না থাকলে আমার বাবা নিজে হাজির হয়ে আজকের এই বিশাল জনসভায় এ কথাগুলো বলতেন। আমার লেখা বক্তৃতাটি ছিল এরকম–

আমি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (এএনসি) একজন গর্বিত সদস্য। আমি সব সময় এএনসির সদস্য ছিলাম। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ সংগঠনেরই সদস্য থাকব। অলিভার থিম্বু আমার কাছে ভাইয়ের চেয়েও আপন জন। আমরা ৫০ বছরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী। কেউ যদি আমার মুক্তি চান, তাহলে তিনিই সবার আগে চাইবেন। আমার মুক্তির জন্য তিনি তার জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করতে পারেন– এ কথাও আমি জানি।

সরকার যে শর্তে আমাকে মুক্তি দিতে রাজি হয়েছে তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি মোটেও সহিংসপরায়ণ মানুষ নই। প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও প্রতিরোধের সব দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই আমরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছি। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আমাদের বিকল্প কোন পথ খোলা ছিল না। এখন আমাদের করার কিছুই নেই। যা করার তা মিস্টার বোথাকেই করতে হবে। তাকে বলুন দমন-পীড়ন ও সহিংসতার পথ পরিহার করতে। তিনি যে বর্ণবাদী নন সেটি কথায় কাজে প্রমাণ করতে বলুন। বোথাকে জনগণের প্রাণের সংগঠন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বলুন। আফ্রিকার বিগত বর্ণবাদী নেতা মালান, স্ট্রিজডোম ও ভারওয়ার্ডের চেয়ে তিনি ব্যতিক্রম সেটা প্রমাণ করতে হবে। জনগণকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে বলুন। তখন জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে কারা দেশ শাসন করবে।

আমি নিজের মুক্তি চাই না। আমি আপনাদের মুক্তি চাই। আপনারা আপনাদের অধিকার ফিরে পান সেটাই আমার বড় কাম্য। আমি জেলখানায় যাওয়ার পর অনেকে দেশের জন্য সংগ্রাম করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে অকাতরে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। আমি তাদের বিধবা স্ত্রী, এতিম সন্তান ও মমতাময়ী মায়ের কাছে চিরঋণী, চির কৃতজ্ঞ। দীর্ঘ বছর ধরে জেলখানায় শুধু আমিই কষ্ট করছি না, দেশের জন্য আপনারাও কষ্ট করছেন। আমি নিজের জন্মগত অধিকার, জনগণের মুক্তির অধিকারকে বিক্রি করে দিতে পারি না।

এএনসি নিষিদ্ধ করার সময় আমি যে স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, কারাগারে যাওয়ার সময় জনগণের যে অধিকার চেয়েছিলাম, এখনও সেই স্বাধীনতাই চাচ্ছি।

আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, একমাত্র মুক্ত মানুষই আলোচনায় বসতে পারে। কোন বন্দি আলোচনায় বসতে পারে না। জনগণের অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারে না। আমি ও আমার জনগণ যেখানে স্বাধীন নই সেখানে কোন আলোচনা হতে পারে না। আপনাদের ও আমার মুক্তি একই সুতোয় গাথা। এ দুটোকে আলাদা করার সুযোগ নেই।

৮৯

১৯৮৫ সাল। পুলসমোর জেলখানায় আমাদের নিয়মিত মেডিকেল চেকআপ করা হত। আমাকে মেডিকেল চেকআপ করার পর একজন ইউরোলজিস্টের কাছে পাঠন হল। ওই ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন, আমার মুত্রথলি বা প্রোস্ট্যান্ট গ্লান্ড বড় হয়ে গেছে। তিনি অনতিবিলম্বে আমাকে অপারেশন করানোর সুপারিশ করেন। আমি পরিবারের লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে অপারেশন করানোর ব্যাপারে সম্মতি দেই।

আমাকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে কেপটাউনে ভলকম হাসপাতালে নেয়া হল। খবর শুনে উইনি ছুটে এল অপারেশনের আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে সমর্থ হল সে। আমার সঙ্গে দেখা করতে অপ্রত্যাশিতভাবে হাসপাতালে আরেকজন ছুটে আসেন। তিনি হলেন স্বয়ং আইনমন্ত্রী কোবে কোয়েটসি। তিনি কাউকে কোন কিছু না বলেই হাসপাতালে আসেন। একজন পুরনো বন্ধুকে দেখার জন্য মানুষ

যেভাবে হাসপাতালে ছুটে আসে তার আগমনটা ছিল অনেকটা সেরকম। তার আগমনে আমি বিস্মিত হলেও আমি এটাকে স্বাভাকিভাবেই নেই। সরকার এএনসির সঙ্গে একটা সমঝোতা চাচ্ছে। কোবের আগমনকে তারই সবুজ সংকেত হিসেবে মনে করলাম।

আইনমন্ত্রী কোন রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করলেন না। শরীরের খোঁজ-খবর নিলেন মাত্র। এ সময় আমি একটি স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। সেটা হল আমার স্ত্রী উইনির রাজনৈতিক মর্যাদা নিয়ে।

আগস্টে আমি হাসপাতালে ভর্তির কিছুদিন আগে চিকিৎসার জন্য উইনি ব্রান্ডফোর্ড থেকে জোহান্সবার্গ যায়। শুধু ডাক্তারের কাছে যাওয়া এবং আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি ছিল তার। জোহান্সবার্গ থাকার সময় ফায়ার বা আগুন বোমার আঘাতে তার ব্রান্ডফোর্ডের বাসভবন এবং সংলগ্ন ক্লিনিকটি বিধ্বস্ত হয়। ব্রান্ডফোর্ডে থাকার মত কোন জায়গা না থাকায় সে জোহান্সবার্গ থাকতে চাইছিল। কিন্তু সরকার তার বাসভবনটি ঠিক করে দেয় এবং তাকে ব্রান্ডফোর্ড ফিরে আসার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ব্রান্ডফোর্ড ফিরতে উইনি অস্বীকৃতি জানায়। আমি এ প্রসঙ্গটি আইনমন্ত্রীর কাছে উত্থাপন করি। তাকে যেন জোহান্সবার্গ থাকার অনুমতি দেয়া হয় সে অনুরোধ জানাই আইনমন্ত্রীর কাছে। কোবে আমাকে কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে শুধু বলেন, তিনি বিষয়টি দেখবেন। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই।

অপারেশন হওয়ার পর কয়েকদিন আমাকে হাসপাতালে থাকতে হল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মনরু আমাকে জেলখানায় না ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিলেন। আসার সময় মনরু আমাকে বললেন, ম্যান্ডেলা আমরা আপনাকে আপনার বন্ধুদের মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না। আমি তাকে বললাম, কি বোঝাতে চাচ্ছেন। তিনি বললেন, এখন থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ একা থাকতে হবে। কারণ জিজ্ঞেস করলে মাথা নেড়ে তিনি বললেন, তিনি কিছুই জানেন না। হেডকোয়ার্টার থেকে তার প্রতি যে নির্দেশ এসেছে তিনি সেটা পালন করছেন মাত্র।

আমাকে পুলসমোর জেলখানার নতুন একটি সেলে নিয়ে যাওয়া হল। এ সেলটি ছিল নিচ তলায়। এর পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। আমাকে ব্যবহারের জন্য তিনটি রুম ও আলাদা একটি টয়লেট দেয়া হল। একটি রুম ছিল শোয়ার জন্য, আরেকটি পড়াশুনার জন্য এবং অন্যটি ব্যায়াম করার জন্য। একজন বন্দির মর্যাদা অনুসারে এগুলো ছিল পর্যাপ্ত। কিন্তু আমার রুমগুলো ছিল কিছুটা স্যাঁতসেতে। আলো ছিল অপর্যাপ্ত। আমি এ বিষয়গুলো কমান্ডিং অফিসারকে বলিনি। কারণ আমি জানতাম যা কিছু করা হচ্ছে তার সবই হচ্ছে উপরের নির্দেশে। তবে কর্তৃপক্ষ হুট করে কেন আমাকে আলাদা করে ফেলল তা জানার বড় ইচ্ছে হল।

আমার নতুন অবস্থা প্রথমে আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হল। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দিন ও সপ্তাহের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল কেন আমাকে ওই অবস্থায় রাখা হয়েছে। আমাকে যে নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হল সেটা সরকারের কোন দায়বদ্ধতা থেকে দেয়া হয়নি। সেটা ছিল আমাকে দেয়া এক ধরণের সুযোগ। সহকর্মীদের থেকে আলাদা করায় আমি মোটেই খুশি হইনি। আমার বার বার বাগানের কথা মনে পড়ছিল। তৃতীয় তলার খোলা জায়গায় বসে সহকর্মীদের সঙ্গে রোদ পোহানোর কথাও ভুলতে পারিনি। নতুন সেলে লাইব্রেরী ছিল। অবসর সময়টা বই পড়ে কাটাতাম।

আমার মনে হল আন্দোলন জোরদার হওয়ায় সরকার দৃশ্যত আলোচনার দিকে এগুচ্ছে। আর সে কারণেই হয়ত আমাকে আলাদা করা হয়েছে। আমার এও মনে হল। এখন আলোচনা জরুরি। খুব শিগগিরই আলোচনা শুরু করতে না পারলে দু পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আন্দোলনকারীদের ওপর সরকারের দমন-পীড়ন বাড়বে। আবার একইসঙ্গে দেশে সহিংসতা ও যুদ্ধও বেড়ে যাবে।

শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করে আসছি দীর্ঘ তিন দশক ধরে। সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে ২০ বছর ধরে। দুই পক্ষের অনেক লোক ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে। শত্রুরা আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছে। তাদের মনোবলও বেশ দৃঢ়। হাজার সৈন্য, ট্যাংক, যুদ্ধ বিমানসহ নানা কিছু থাকা সত্ত্বেও তারা ছিল ভুল পথে। তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিয়েই এগুচ্ছিল। আমরা ছিলাম সঠিক পথে। ইতিহাসের শিক্ষা ছিল আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা। সামরিক কায়দায় আমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয় সে ব্যাপারে আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম। যুদ্ধ সহিংসতায় হাজার হাজার লোকের প্রাণহানী কোন পক্ষের কাছেই মনে প্রাণে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই এখন আলোচনার সময়— এমন একটা মনোভাব শত্রু পক্ষের মধ্যে জোরালোভাবে মাথা চাড়া দিতে লাগল।

আলোচনার বিষয়টি ছিল খুবই স্পর্শকাতর। দু'পক্ষই আলোচনাকে নিজেদের দূর্বলতা হিসেবে দেখত। অন্যপক্ষ ভালোভাবে সাড়া না দিলে আরেক পক্ষ আলোচনার টেবিলে আসত না। সরকার বারবার বলে আসছিল আমরা কমিউনিস্ট পার্টির সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। তাই তারা কখনোই সন্ত্রাসী বা কমিউনিস্টদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে না। এটা ছিল তাদের একটা অন্ধ বিশ্বাস। অন্যদিকে এএনসি বারবার বলে আসছিল সরকার বর্ণবাদী ও গোড়াপন্থী। এএনসির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও দমন-পীড়ন থেকে সরে না আসা পর্যন্ত কোন আলোচনা নয়। এছাড়া সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তিও ছিল এএনসির আরেকটি শর্ত।

সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসাটাকে আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হল। তবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অলিভারের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা ছিল

খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অলিভার থাকতো লুসাকায়। তার সঙ্গে যোগাযোগ করাটা ছিল সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমি সময় ক্ষেপণ না করে তার সম্মতি ছাড়াই আলোচনায় বসার ব্যাপারে মনস্থির করলাম। তবে এর আগে বাইরে যারা আছেন এএনসির এমন অনেক নেতার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত স্থির করবো বলে ঠিক করলাম। এ কাজটা সে সময় আমার জন্য করা ছিল বেশ সহজ।

সম্পূর্ণ একাকি আমার সময় কাটতে লাগল। আমার সহকর্মীরা তিন তলায় থাকলেও মনে হত তারা জোহান্সবার্গ আছেন। তাদেরকে দেখতে হলে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে হলে আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করতে হত। এ অনুরোধ যেত প্রেটোরিয়ায় হেড অফিসে। সেখান থেকে অনুরোধ পাশ হলে এরপর সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হত। অথচ তারা থাকতেন আমার তিন ছাদ ওপরেই। হেড অফিস থেকে সাড়া পেতে অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ লেগে যেত। হেড অফিস আবেদন মঞ্জুর করলে ভিজিটিং রুম বা দর্শনার্থীদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতে হত। 'এটা ছিল আমাদের জন্য এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। একই ছাদের নিচে যারা থাকতাম এখন তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমাদেরকে পরিদর্শক হয়ে যেতে হত। কথাবার্তা পর্যবেক্ষণ করা হত। সারা বছর মিলিয়ে আমরা ২৪ ঘন্টারও কম সময় কথা বলতে সমর্থ হই।

নতুন সেলে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে আমি সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। তিনি আমাদের মধ্যে একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা ৪ জন এক সঙ্গে বসে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। আলোচনার মূখ্য বিষয় ছিল আমার ট্রান্সফার বা অন্যরুমে স্থানান্তর। আমাকে অন্য রুমে পাঠিয়ে দেয়ায় ওয়াল্টার ক্যাথি ক্ষোভ প্রকাশ করল। তারা এর প্রতিবাদ করল এবং আমাদেরকে পুনরায় একসঙ্গে রাখার জোর দাবি জানাল। আমি অবশ্য নির্বাক রইলাম। বিচ্ছিন্নতাকেই সমর্থন করলাম। বললাম, আমি এখন বেশ ভালো পরিবেশে আছি। এছাড়া আমাকে বিচ্ছিন্ন করার পেছনে কোন রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে। মনে হচ্ছে ভালো কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমি যেখানে আছি সেখানে সরকার ইচ্ছে করলেই যেকোন প্রস্তাব আমাকে দিতে পারবে। যে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারবে।

আমি কি করতে যাচ্ছি তা কাউকে বললাম না। কয়েক তলা উপরে থাকা বন্ধুদের এ ব্যাপারে কিছু বললাম না। লুসাকাকেও কিছু জানালাম না। এএনসির অন্য নেতাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার মত নিরাপত্তা ও সুযোগ আমার ছিল না।

আমি জানতাম, আমার উদ্যোগের কথা তারা জানতে পারলে তার নিন্দা করবে। ফলে অংকুরেই বিষয়টি নষ্ট হয়ে যাবে। যেমনটা আগে হয়েছিল। আমি উদ্যোগটা নিলাম এএনসির প্রতিনিধি নয়, একজন প্রবীন মানুষ হিসেবে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কোবে কোয়েটসিকে চিঠি লিখলাম। আলোচনার প্রস্তাব দিলাম। কোন উত্তর পেলাম না। আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে ফের কয়েকটি চিঠি লিখলাম। এ যাত্রায়ও কোন উত্তর পেলাম না। সরকারের এ কাজকে নৈতিকতাবিবর্জিত মনে হল। আলোচনার জন্য ভিন্ন পথ বেছে নিতে মনস্থ করলাম। একই সঙ্গে রইলাম সুযোগের অপেক্ষায়। অবশেষে সে সুযোগ এলো ১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে।

নাসুতে ১৯৮৫ সালের অক্টোবরে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর আরোপিত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞায় কমনওয়েলথ দেশগুলো অংশ নিবে কিনা তা নিয়ে সম্মেলনে ব্যাপক আলোচনা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের বিরোধীতার কারণে নেতারা সে ব্যাপারে মতৈক্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হন। সবশেষে সিদ্ধান্ত হয় কমনওয়েলথ দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করবে। সরকারের বর্ণবাদী নীতি ও আচরণ পরীক্ষা নীরিক্ষা করে ওই কমিটি সিদ্ধান্ত নিবে দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর কমনওয়েলথ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে কি করবে না, ১৯৮৬ সালে সাত সদস্যের সমন্বয়ে ওই কমিটি গঠন করা হয়। নাম দেয়া হয় এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপ। এর নেতৃত্বে ছিলেন নাইজেরিয়ার সামরিক নেতা ওলুসিগান ওবাসানজু ও অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম ফ্রেজার। তারা সার্বিক অবস্থা জানার জন্য জানুয়ারির শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা এসে পৌছান।

ফেব্রুয়ারি মাসে জেনারেল ওবাসানজুর সঙ্গে আমার বৈঠক হয়। ওবাসানজু তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। তিনি পুরো গ্রুপ নিয়ে আমার সঙ্গে বৈঠক করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সরকারের অনুমতি নিয়ে মে মাসে ওই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। আমার সাথে বৈঠক করে এমিনেন্ট গ্রুপ মন্ত্রিসভার সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি এটাকে আলোচনা শুরুর একটা সুযোগ হিসেবে নেই। আমি তাদের মাধ্যমে সরকারকে ফের আলোচনার প্রস্তাব দিতে মনস্থ করি।

এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপের সঙ্গে বৈঠকের দু'দিন আগে ব্রিগেডিয়ার মুনরু আমার রুমে আসেন। সঙ্গে করে নিয়ে আসেন একজন দর্জিকে। মনরু আমাকে বলেন, ম্যান্ডেলা এমিনেন্ট গ্রুপের সদস্যরা যে ধরণের পোশাক পরে আসবেন আপনাকেও আমরা ওই ধরণের পোশাকে দেখতে চাই। আপনি কারাগারের পুরনো কাপড়-চপড় পরে তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন এটা আমরা চাই না। এই

দর্জি আপনার মাপ নিয়ে যাবে এবং আপনার জন্য স্যুট তৈরি করে দিবে। বৈঠকের আগে আমার জন্য স্যুট, শার্ট, টাই, জুতা, মোজা ও আন্ডারওয়্যার পাঠিয়ে দেয়া হয়। এগুলো পরার পর কমান্ডার মুনরু বলেন, ম্যান্ডেলা আপনাকে ঠিক প্রধানমন্ত্রীর মত লাগছে।

এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপের সঙ্গে বৈঠকের সময় পর্যবেক্ষক হিসেবে দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বৈঠকে যোগদান করেন। এদের একজন ছিলেন কোবে কোয়েটসি ও কারাপরিদর্শক লে. জেনারেল ডব্লিউ. এইচ. উইলেমসি। কিন্তু বৈঠক শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে তারা দুজন চলে যান। বিষয়টি আমাদের মধ্যে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করে। আমি তাদেরকে বৈঠকে থাকার জন্য চাপাচাপি করি। বলি, আমার কোন গোপন কথা নেই। সব কিছুই খোলামেলাভাবে সবার সামনে বলতে প্রস্তুত। এরপরও তারা দু'জন চলে যান। তারা চলে যাওয়ার আগে আমি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলি, এখন আলোচনার সময়, সংঘাতের নয়। সরকার ও এএনসির এখন আলোচনায় বসা উচিত।

বৈঠকের সময় এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপের সদস্যরা চলমান সহিংসতা, আলোচনা ও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কথা বলেন। তারা আমার কাছে অনেক বিষয়ে জানতে চান। আমি তাদেরকে বলি, আমি এএনসির প্রধান নই। চলমান আন্দোলনের নেতৃত্বও আমি দিচ্ছি না। এএনসির প্রধান অলিভার টিম্বু। তিনি এখন লুসাকায় আছেন। আপনারা ইচ্ছে করলে সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। তার মনোভাব জানতে পারেন। আমার মনোভাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি এখানে আমার মতামত বলতে পারব। আমার যেসব সহকর্মী বন্দি অবস্থায় আছেন তাদের মতামতও আমি জানাতে পারব না। আমি শুধু আমার কথা বলতে পারব। ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই এএনসি সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করুক।

এএনসি ও দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ ও চিন্তাধারার কথা শুনে এমিনেন্ট গ্রুপের সদস্যরা কিছুটা উদ্বিগ্ন হন। তাদের উদ্বেগ নিরসনের জন্য আমি বলি— আমি একজন দক্ষিণ আফ্রিকান। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। আমি কমিউনিস্ট নই। সাদা কালোর বৈষম্যে বিশ্বাস করি না। আমি ফ্রিডম চার্টারে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হোক আমি সেটা চাই। এমন সমাজ ব্যবস্থা চাই যেখানে সামাজিক বৈষম্য থাকবে না, সবাই সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করবে। নতুন দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদের সব ধরণের নিরাপত্তা থাকবে বলেও মন্তব্য করি। এনিমেন্ট পারন্স গ্রুপের সদস্যদেরকে পারস্পরিক আলোচনার বিষয়টি যে কত

গুরুত্বপূর্ণ সেটা বুঝিয়ে বলি। তাদেরকে জানাই, সরকার ও এএনসির মধ্যে যোগাযোগের অভাবেই সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। দু'পক্ষ আলোচনায় বসলে এসব সমস্যা অবশ্যই নিরসন করা যাবে।

বৈঠকে আমাকে সহিংসতার ব্যাপারে প্রচণ্ডভাবে জিজ্ঞেস করা হয়। এ পর্যন্ত কেন সহিংসতার নিন্দা করিনি সেটাও জানতে চাওয়া হয়। আমি পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেই, সন্ত্রাসের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার চলমান সমস্যার সমাধান কোনভাবেই সম্ভব নয়। একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাদেরকে এটাও বলি, এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত অভিমত। এএনসির নয়। তাদেরকে বলি, সরকার শহরের রাস্তাঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে সৈন্য ও পুলিশ সরিয়ে নিলে এএনসি সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধের ব্যাপারে সম্ভবত রাজি হবে। আমাকে মুক্তি দিলেই দেশে সহিংসতার অবসান হবে না। সহিংসতার অবসান চাইলে আলোচনা শুরু করতে হবে।

আমার সঙ্গে বৈঠক শেষ করার পর এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপ লুসাকায় অলিভারের সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া প্রেটোরিয়ায় পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। অভিমত জানিয়ে এ দু'স্থানেই আমি বার্তা পাঠাই। সরকারকে আমি বুঝাতে চাইলাম, সঠিক পথে এগুনোর ইচ্ছা থাকলে আমাদের আলোচনায় বসতে হবে। অলিভারকেও আমার এ মনোভাব জানিয়ে দেই। যতটুকু জানতে পারি, তাতে মনে হল অলিভারের চিন্তাধারাও ছিল আমার মত।

মে মাসে এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপ ফের আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে জানায়। আমি আশাবাদী হয়ে উঠলাম। তারা লুসাকা ও প্রেটোরিয়ায় দু'পক্ষের সঙ্গেই বৈঠক করেছে। এজন্য ভাবলাম, আলোচনার দরজা বোধ হয় খুলতে চলল। কিন্তু আলোচনা শুরুর আগে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে সরকার দমন পীড়ন অভিযান শুরু করে। প্রেসিডেন্ট বোথার নির্দেশে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিরক্ষা বাহিনী এএনসির বতসোয়ানা, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে ঘাটিতে কমান্ডো অভিযান চালায়। ফলে আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপের সদস্যরা আলোচনা না করেই দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়েন। আমি কিছুটা মুষড়ে পড়ি। মনে হল আলোচনার দরজা বোধ হয় খুলল না।

আলোচনার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অলিভারসহ এএনসির শীর্ষ নেতারা জনগণকে দুর্বার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুরোধ জানান। সরকারকে

অকার্যকর করে ফেলার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকানদের প্রতি অনুরোধ করেন। ফলে দেশ আবার অশান্ত হয়ে ওঠে। বেড়ে যায় সহিংসতা। শহরে বন্দরে গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রতিদিন বাড়তে থাকে। আন্দোলন বাগে আনার জন্য ১৯৮৬ সালের ১২ জানুয়ারি সরকার দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে।

এ পরিস্থিতিতে আমি কারা কমিশনার জেনারেল উইলেমসির সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। এ ব্যাপারে তাকে অনুরোধ করে খুব সাদামাটা একটা চিঠি লিখলাম। চিঠিতে বললাম, দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আশা করি আপনি রাজি হবেন। চিঠিটি তুলে দেই ব্রিগেডিয়ার মুনরুর হাতে। চিঠিটি প্রদান করি বুধবার। শনিবারই জেনারেল উইলেমসি আমার সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তুতি নেন। তিনি আমার সঙ্গে বৈঠক করার জন্য প্রেটোরিয়া থেকে পুলসমোর এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। বৈঠকখানার পরিবর্তে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল তার বাসভবনে। সেখানেই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

উইলেমসের সঙ্গে বৈঠকের সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তার এক পর্যায়ে আইনমন্ত্রী কোবে কোয়েটসির সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করি। তিনি কারণ জানতে চাইলে একটু ইতস্তত করে বলি সরকার ও এএনসির মধ্যকার আলোচনার বিষয়টি উত্থাপন করার জন্যই তার সঙ্গে বৈঠক করতে চাই।

তিনি কিছুটা সময় ভেবে বললেন, ম্যান্ডেলা আপনি জানেন আমি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নই। এসব বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে পারি না। এগুলো আমার এখতিয়ার বহির্ভূত। তবে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে আপনার বৈঠকের একটা চেষ্টা করে দেখব। তিনি এখন কেপ টাউনে আছেন।

জেনারেল আমার সামনেই আইনমন্ত্রীকে ফোন করলেন। দুজনে কয়েক মিনিট কথা বললেন। ফোন রেখে জেনারেল আমাকে বললেন, মন্ত্রী আপনাকে এক্ষুণি তার কাছে নিয়ে যেতে বলেছেন। আমরা দুজনে হাল্কা নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গাড়িতে করে কেপটাউনে মন্ত্রীর বাড়ির দিকে ছুটলাম।

কোয়েটসি আমাকে তার সরকারি বাসভবনে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। তার বৈঠকখানায় খুব আরামদায়ক চেয়ারে আমরা বসলাম। আমার পরনে ছিল কয়েদী পোশাক। এ পোশাক ছাড়বার সময় না দেয়ার জন্য মন্ত্রী আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। আমরা টানা তিন ঘণ্টা আলোচনা করি। কোন পরিস্থিতিতে

আমরা অস্ত্র সমর্পণ করবো সেটা তিনি জানতে চাইলেন। আমার পরবর্তী পরিকল্পনাও তিনি জানতে চান। বললাম, আমি প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি সেটা লিখে নিলেন। এরপর হাত মিলিয়ে আমরা সেলে ফিরে এলাম।

৯১

কোবে কোয়েটসির কাছ থেকে সরাসরি কোন সাড়া পেলাম না। তবে আমার ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নমনীয় হবার বেশ আভাস পেলাম। আমার জীবনধারা ক্রমেই উন্নততর করা ছিল তার সুস্পষ্ট লক্ষণ। বড়দিনের ঠিক আগের দিন পুলসমোর জেলখানার ডেপুটি কমান্ডার কর্নেল গাই মার্ক্স হঠাৎ আমার রুমে আসলেন। আমি তখন মাত্র নাস্তা সেরেছি। তার আগমনে আমি রীতিমত বিস্মিত হলাম। তিনি চুপি চুপি আমাকে বললেন ম্যান্ডেলা আপনি কি শহরটা ঘুরে দেখতে চান? তার মনে কি আছে ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে হ্যাঁ বলাতে কোন দোষ আছে বলে মনে করলাম না। হ্যাঁ সূচক জবাব দিতেই মার্ক্স বললেন, খুব ভালো। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আমি কর্নেলের সাথে একে একে ১৫টি লোহার দরজা পার হয়ে বাইরে এলাম। এসে দেখি একটি গাড়ি আমাদের জন্য তৈরি হয়ে আছে।

আমরা সমুদ্রসংলগ্ন রাস্তা দিয়ে কেপটাউন শহরের দিকে রওয়ানা দিলাম। কর্নেলের নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য ছিল না। তাই বলতে গেলে আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবেই ঘুরতে লাগলাম। বহু বছর পর শহরের দৃশ্য দেখে পুলকিত হলাম। শহরের অবস্থা ফিরে গিয়েছিল। চাকচিক্য ছিল দেখার মত। মানুষের পোশাক-আশাক ও জীবনধারাতেও বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। বৃদ্ধরা রোদ পোহাচ্ছে। মেয়েরা কেনাকাটা করছে। অনেকে কুকুর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি পর্যটকের মত সব কিছু অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম।

একঘণ্টা চলার পর কর্নেল মার্ক্স ছোট একটি দোকানের সামনে গাড়ি থামালেন। বললেন, ম্যান্ডেলা কোন পানীয় চলবে? আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলে তিনি আমাকে সম্পূর্ণ একাকী গাড়িতে রেখে দোকানের ভিতরে চলে গেলেন। দীর্ঘ ২০ বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি প্রহরীমুক্ত হলাম। আমার মনে শিহরণ সঞ্চারিত হল। অন্যরকম অনুভূতি জাগল, মনে মনে একবার ভাবলাম গাড়ির দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে যাই। মনে হল কেউ যেন আমাকে পালিয়ে যেতে বলছে। চেয়ে দেখলাম আশপাশে অনেক বনজঙ্গল। এখানে লুকিয়ে থাকা খুব সহজ বলে মনে

হল। আমি উত্তেজনায় ঘামতে লাগলাম। কর্নেল কোথায় দেখতে লাগলাম। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করলাম। বুঝলাম এ ধরণের কাজ করা হবে নিতান্ত পাগলামী ও বোকামি। আমি যেন পালিয়ে গিয়ে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনি, নিজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করি তার জন্য সরকারের এটা একটা কৌশলও হতে পারে বলে ধরে নিলাম। কয়েক মিনিট পরই দেখলাম কর্নেল গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন। তার হাতে দুই ক্যান কোক।

এ ঘটনার পর পরবর্তী কয়েক মাস কর্নেলের সঙ্গে কেপটাউন ছাড়াও আরও অনেক জায়গায় গিয়েছি। সমুদ্র সৈকত, পর্বত, বাগানসহ অনেক সুন্দর প্রকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করেছি। পরে কিছু জুনিয়র অফিসারকেও আমার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। তারাও আমাকে মাঝে মধ্যে নানা জায়গায় নিয়ে যেত। জুনিয়র অফিসারদের সঙ্গে 'গার্ডেনস' নামে একটি জায়গায় প্রায়ই যেতাম। জেলখানার কিছু দূরেই ছিল জায়গাটি। জেলখানার জন্য প্রয়োজনীয় শাক সব্জী ও তরিতরকারি এখানে ফলানো হত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে খুব আনন্দ দিত।

একদিন একজন জুনিয়র অফিসারের সঙ্গে সেখানে গেলাম। বাগানে হাঁটাহাঁটি করার সময় দুজন শ্বেতাঙ্গ রমণীকে চোখে পড়ল। তারা ঘোড়ার পরিচর্যা করছিল। আমি তাদের কাছে গেলাম। ঘোড়াগুলোর নাম জানতে চাইলাম। তরুণীদ্বয় নার্ভাস হয়ে গেল। কোন উত্তর দিল না। এমনকি আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

আসার সময় একজন ক্যাপ্টেন আমাকে বললেন, ওই দুজন শ্বেতাঙ্গ তরুণি কারাবন্দী। অফিসারদের উপস্থিতিতে কেউ তাদেরকে প্রশ্ন করে না। তাই আপনার প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিল। কোন উত্তর দেয়নি।

তরুণ কারারক্ষীরা মাঝে মধ্যে আমাকে দূরের মাঠে নিয়ে যেত। আমি ঘুড়ে বেড়াতাম। অনেকসময় সমুদ্রের তীরে নিয়ে যেত। আমি প্রাণ ভরে সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতাম। এসব স্থানে ঘুড়ে বেড়ানোর সময় আমি লক্ষ্য করতাম কেউ আমাকে চিনতে পারে কিনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, কেউই আমাকে চিনত না। আর চিনবেই কেমন করে। পত্রিকায় আমার সর্বশেষ ছবি ছাপা হয়েছিল সেই ১৯৬২ সালে।

এসব ভ্রমণের সময় অনেক কিছু আমার নজরে আসে। সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের জীবনধারা বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গদের জীবনধারা কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে তা আমি নিজের চোখে দেখতে পারি। শ্বেতাঙ্গরা কিভাবে অঢেল সম্পদ উপভোগ করছে

তা দেখে রীতিমত বিস্মিত হই। একদিন ওয়ারেন্ট অফিসার আমাকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে যান। তার স্ত্রী ও বাচ্চাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর থেকে প্রতি বড় দিনে আমি তাদেরকে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠাতাম।

আমাকে এ ধরণের স্বাধীনতা দেয়ার একটা উদ্দেশ্য ছিল সরকারের। সে উদ্দেশ্যটা আমি পুরোপুরি বুঝতাম। সরকার চাইছিল আমি যেন দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারি। পাশাপাশি আমার মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রচণ্ডভাবে জাগ্রত হয়। এটা হলে আমি আলোচনায় কিছুটা নমনীয় হব বলেই তাদের বিশ্বাস ছিল।

৯২

১৯৮৭ সালে কোবে কোয়েটসির সঙ্গে ফের যোগাযোগ শুরু করলাম। এসময় তার বাসায় বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত বৈঠক করি। বছরের শেষ নাগাদ সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট একটি প্রস্তাব আসে। কোয়েটসি জানান, সরকার পদস্থ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করবে। ওই কমিটি আমার সঙ্গে আলোচনা করবে। তিনি নিজে হবেন ওই কমিটির প্রধান। এ কমিটিতে কারা পরিদর্শক জেনারেল উইলেমসি, কারা বিভাগের মহা পরিচালক ভানিয়ে ভ্যান ডার মারউয়ি, এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ড. নিয়ল বার্নার্ডও থাকবেন। বার্নার্ড এক সময় জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন।

কমিটির প্রথম দুইজন ছিলেন কারাগার সংশ্লিষ্ট লোক। এদের সঙ্গে পরিচয় ও সখ্য দুটোই ছিল। কিন্তু কমিটিতে ড. বার্নার্ড এর উপস্থিতি আমার কাছে বেশ বিরক্তিকর মনে হল। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার গোয়েন্দা সংস্থার পাশাপাশি সি আই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। আমি সংগঠনের সব ব্যাপারে অন্যদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তুত থাকলেও বার্নার্ডের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তার উপস্থিতি আলোচনাকে সমস্যার দিকে ঠেলে দিবে বলে মনে হল। কোয়েটসিকে বললাম, প্রস্তাবটি নিয়ে ভাবতে চাই।

রাতে আমি প্রস্তাবটি নিয়ে নানাভাবে চিন্তা করলাম। আমি জানতাম প্রেসিডেন্ট বোথা নিজের ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য নানা উদ্যোগ নিচ্ছেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন। আমলা, সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের নিয়ে তিনি ওই কমিটি গঠন করেছিলেন। ড. বার্নার্ড ছিলেন ওই

কমিটির অন্যতম সদস্য। বলতে গেলে প্রেসিডেন্টের প্রধান পরামর্শক। ভাবলাম, বার্নার্ডকে প্রত্যাখ্যান করলে বোথা ক্ষুব্ধ হবেন। তিনি বিগড়ে গেলে আলোচনা ভেস্তে যাবে। তাই পরদিন সকালে কোয়েটসিকে বললাম, আমি সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। মেনে নিলাম বার্নার্ডকে।

আলোচনা শুরুর আগে আমি কর্তৃপক্ষের কাছে তিনটি দাবি পেশ করলাম। প্রথমটি ছিল, তিন তলায় থাকা আমার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেয়া। দুই নম্বর দাবি ছিল লুসাকায় অবস্থানরত অলিভারের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেয়া। আর তিন নম্বর দাবিটি ছিল আমার ব্যক্তিগত অভিমত ও এএনসির প্রধান দাবিগুলো জানিয়ে প্রেসিডেন্ট পি. ডব্লিউ বোথাকে একটি স্মারক লিপি দেয়া। এই স্মারক লিপি আলোচনাকে সুনির্দিষ্ট পথে ধাবিত করবে বলে মনে করলাম।

তিন তলায় অবস্থানরত বন্দিদের সঙ্গে আলোচনার অনুরোধ জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলাম। আমাকে অনেকটা অবাক করে দিয়ে কর্তৃপক্ষ ওই আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। পরে কারাগারের সিনিয়র কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ করলে আমার আবেদনে সাড়া দেয়া হয়। তবে সবার সাথে এক সঙ্গে নয় বরং একজন একজন করে বৈঠকের অনুমতি দেয়া হল।

পরিদর্শক রুমে তাদের সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ করলাম। ভেতরে অনেক বিষয়ই গোপন করলাম। শুধু এটুকু বললাম যে, সরকার আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের সম্মতি আছে কিনা। আমার সঙ্গে আলোচনার জন্য সরকার যে একটি কমিটি গঠন করেছে সেটা তাদের বলিনি। আমার সঙ্গে প্রথম বৈঠক হয় ওয়াল্টারের সঙ্গে। কারা কমিশনারকে চিঠি লেখা ও কোয়েটসির সঙ্গে বৈঠকের কথা তাকে খুলে বলি। আমার সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে সরকারের আগ্রহের কথা তাকে জানাই। এ ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাই।

ওয়াল্টার আমার চেয়ে অনেক শুকিয়ে গিয়েছিলেন। ওয়াল্টার ছিলেন খুবই বিজ্ঞ ও যৌক্তিক। তিনি আমাকে যতটা চিনতেন, জানতেন, বুঝতেন অন্য কেউ তা বুঝত না। তার মতামতকে আমি বরাবরই গুরুত্ব দিতাম। এতটা গুরুত্ব অন্য কারো পরামর্শকে দিতাম না। তার প্রতি আমার অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তিনি বললেন, আমি আলোচনার বিরোধী নই। তবে আমি চাই আলোচনার উদ্যোগটা সরকার নিক। আমাদের পক্ষ থেকে আলোচনার উদ্যোগ নেয়াটাকে আমি পছন্দের চোখে দেখছি না।

আমি বললাম, তুমি যদি আলোচনার বিরোধী না হয়ে থাক তাহলে এর উদ্যোগটা কাউকে না কাউকে নিতে হবে। সরকার এ ব্যাপারে এগিয়ে না আসলে প্রথম উদ্যোগটা আমাদেরকেই নিতে হবে। আলোচনার দরজায় কে

প্রথম টোকা দিল সেটা বড় কথা নয়। আলোচনা শুরু হওয়াটাই বড় কথা। আমি আলোচনার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছি ওয়াল্টার সেটা বুঝতে পারলেন। তাই বললেন, যা ভালো মনে হয় কর। তোমাকে থামাব না।

এরপর আলোচনা করলাম রেমন্ড এল হলবার সঙ্গে। পুরো পরিস্থিতি তাকে বুঝিয়ে বললাম। ওয়াল্টারের সঙ্গে আমার কি ধরণের কথা হয়েছে সেটাও তাকে খুলে বললাম। রেমন্ড বরাবরই কম কথা বলতেন। তিনি আমার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ ভাবলেন। এরপর বললেন, ম্যান্ডেলা, তুমি কি এর জন্যই অপেক্ষা করছিলে। আমরা ইচ্ছে করলে বহু বছর আগেই এ কাজ করতে পারতাম। এন্ড্রু মালাঙ্গিনিও একই ধরণের কথা বললেন। সবশেষে আলোচনা করি ক্যাথির সঙ্গে। তিনি আলোচনার বিরোধীতা করেন। আমি তাকে ওয়াল্টার, রেমন্ড ও এন্ড্রুর মত বোঝালাম। কিন্তু ক্যাথি নরম হলেন না। তিনি সোজা বললেন, আমি ভুল পথে পা বাড়াচ্ছি। এ পথে এগুলে তিনি আমার সঙ্গে থাকবেন না।

এর কিছুদিন পর অলিভার টিম্বুর কাছ থেকে ছোট একটি চিঠি পেলাম। তার একজন আইনজীবীর মাধমে ওই চিঠিটি আমার কাছে পাঠানো হয়। আমি সরকারের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করতে যাচ্ছি এমন খবরে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আমাকে অন্য সহকর্মীদের কাছ থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে সেটাও তিনি জানতেন। চিঠিতে অলিভার বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ম্যান্ডেলা আপনি সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে যাচ্ছেন বলে যে খবর শুনছি সেটি কি আসলে সত্যি? আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে আপনি ওই কাজ করতে যাচ্ছেন। আমি সরকারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কোন আলোচনা করেছি কিনা সেটাও তিনি জানতে চান।

আমি অলিভারকে খুব ছোট একটি চিঠি লিখি। তাতে উল্লেখ করি, সরকারের সঙ্গে একটি বিষয় নিয়ে আমার আলোচনা হচ্ছে। সেটি হল এএনসির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সঙ্গে সরকারের আলোচনার ব্যবস্থা করা। পত্রবাহকের ওপর আস্থা রাখতে না পারায় চিঠিতে এর বেশি কিছু লিখলাম না।

৯৩

ওয়ার্কিং গ্রুপের সঙ্গে ১৯৮৮ সালের মে মাসে প্রথম গোপন বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। পুলসমোর জেলখানার অফিসার্স ক্লাবে ওই বৈঠকটি হয়। কোয়েটসি ও উইলেমসিকে ভালোভাবে চিনলেও মারউয়ি ও ড. বার্নার্ডকে কখনও দেখিনি। ভ্যান ডার মারউয়ি ছিলেন খুব স্বল্পভাষী লোক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া কোন কথা বলতেন না তিনি। ড. বার্নার্ড ছিলেন বলতে গেলে যুবক। বয়স ছিল ৩৫ এর কাছাকাছি। লম্বা চওড়া ফর্সা এ লোকটি ছিলেন খুবই সংযত ও সুশৃংখল।

প্রথমদিকের বেশ কয়েকটি বৈঠক ছিল বেশ পানসে। নানা জটিলতা ও আনুষ্ঠানিকতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু আস্তে আস্তে বৈঠকের প্রাণ ফিরে আসে। আমরা খোলামেলা ও সরাসরি আলোচনা শুরু করি। প্রথম কয়েকমাস প্রতি সপ্তাহে তাদের সঙ্গে আমার বৈঠক হত। এরপর বৈঠক অনিয়মিত হয়ে পড়ে। কখনও একমাস পর, কখনও বা এক সপ্তাহ পর বৈঠক হত। বৈঠকের সময় ও তারিখ সচরাচর সরকার নির্ধারণ করত। আমার ইচ্ছা অনুসারেও অনেক সময় বৈঠক হত।

প্রথম দিকের বৈঠককালে মনে হল, কমিটির সদস্যদের মধ্যে ড. বার্নার্ড ছাড়া অন্যরা এএনসি সম্পর্কে বলতে গেলে তেমন কিছুই জানেন না। ড. বার্নার্ড এএনসি সম্পর্কে অল্প কিছু জানলেও অন্যেরা ছিলেন অন্ধকারে। অথচ তারা সবাই ছিলেন ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত সুশিক্ষিত আফ্রিকান। আলোচনা কমিটির সদস্য এই কয়জন শ্বেতাঙ্গ খোলা মনের মানুষ ছিলেন। এরপরও এএনসি সম্পর্কে তাদের এই অজ্ঞতা আমাকে আশাহত ও বিমর্ষ করল। বুঝতে পারলাম, তারা অপপ্রচারণার শিকার। ড. বার্নার্ড এএনসি সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা করলেও তার মধ্যেও এএনসি সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা ছিল। এএনসি সম্পর্কে তিনি যেসব জেনেছিলেন মূলত গোয়েন্দা ও পুলিশের বিভিন্ন ফাইলপত্র থেকে যেগুলোতে ছিল মিথ্যের ছড়াছড়ি।

বৈঠককালে প্রায়ই আমি এএনসির ইতিহাস তাদের সামনে তুলে ধরতাম। ভুল জানার কারণে এএনসি নিয়ে তাদের মধ্যে যে ভয় সংশয় ছিল সেটা দূর করার চেষ্টা করতাম। যে স্পর্শকাতর বিষয়গুলো এএনসি ও সরকারের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তৈরি করে রেখেছিল সেগুলো খোলাসা করার চেষ্টা করতাম। বিশেষ করে এএনসির সশস্ত্র আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ও পার্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরকে একটা পরিস্কার ধারণা দিতে চেষ্টা করতাম।

বৈঠককালে প্রায়ই এএনসির সশস্ত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গটি উঠত। দীর্ঘ একমাস আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। এএনসি কেন সহিংসতার নিন্দা এবং অস্ত্র ত্যাগ করছে না এ প্রশ্ন আমাকে করা হয়। তারা এও বলে প্রেসিডেন্ট বোথার সঙ্গে আমি বৈঠকে বসতে চাইলে এএনসিকে সশস্ত্র আন্দোলন বন্ধের ঘোষণা দিতে হবে।

এর জবাবে আমি বলি, চলমান সহিংসতার জন্য এএনসি নয়, সরকারই দায়ী। সরকার আমাদের ওপর যে জুলুম অত্যাচার করছে তার ফসল হল এই সশস্ত্র আন্দোলন। অত্যাচারীরা অত্যাচারের হাতিয়ার হিসেবে সহিংসতা ও দমন পীড়ন বেছে নিলে অত্যাচারীতদের প্রতিরোধ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। সেক্ষেত্রে অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করতে হলে অত্যাচারীতদের সহিংস হওয়াটা স্বাভাবিক। আমরা যা করছি তা সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক। সরকার জুলুম-নির্যাতন ছেড়ে শান্তির পথে পা বাড়ালে এএনসিও শান্তির পথে ফিরে আসবে। সদস্যদের

আমি আরও বলি, এখন সব কিছু নির্ভর করছে আপনাদের ওপর। এখানে সহিংসতাকে নিন্দা করাটা মূখ্য কিছু নয়।

আমার মনে হল বিষয়গুলো তাদেরকে ভালোভাবে বুঝাতে পেরেছি। এ বিষয়ে এতদিন তাদের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা সম্ভবত বদল হয়েছে। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের বিষয়টি বাস্তবতা ছেড়ে শিগগিরই তাত্ত্বিক বিষয়ে পরিণত হল। আইনমন্ত্রী কোবে ও ড. বার্নার্ড জানালেন, ন্যাশনাল পার্টি বারবার বলেছে, তারা এমন কোন সংগঠনের সঙ্গে আলোচনায় বসবে না যারা সহিংসতার ইন্ধন যোগায়, সহিংসতাকে সমর্থন করে। তাই এ মুহূর্তে এএনসির সঙ্গে আলোচনা শুরুর ঘোষণা দেয়াটা কিভাবে সম্ভব। এএনসির সঙ্গে আলোচনার ঘোষণা দেয়া হলে ন্যাশনাল পার্টির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হবে। তাই এএনসিকে একটা সমঝোতায় আসতে হবে। এটা করা হলে জনগণের সামনে সরকারের মুখ রক্ষা হবে।

তাদের যুক্তিটা ছিল বেশ ভালো। এটা আমিও বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু সন্ত্রাসের নিন্দা বা সহিংস কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আমি বললাম, আপনারা যে উভয় সংকটে পড়েছেন সেটা থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব আমার নয়। এটা আপনাদের কাজ। তবে আপনারা শুধু জনগণকে এটা বলতে পারেন যে, এএনসির সঙ্গে আলোচনায় বসা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যেসব সমস্যা সরকারকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে সেগুলো থেকেও উত্তরণ সম্ভব নয়। জনগণ অবশ্যই বুঝবে।

এএনসির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির একটি যোগসূত্র ছিল। এটা খুব বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াল। এএনসির সশস্ত্র সংগ্রাম যত বড় ছিল, এ সমস্যাটা ছিল অনেকটা তত বড়। ন্যাশনাল পার্টি মনে করত কমিউনিস্ট ৫০-এর দশকের স্নায়ুযুদ্ধের আদর্শ এখনও ধরে আছে। তাই ন্যাশনাল পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নকে শয়তানদের নেতা এবং কমিউনিজমকে শয়তানের কর্মকাণ্ড হিসেবে গণ্য করত। ন্যাশনাল পার্টির ধারণা ছিল কমিউনিস্ট পার্টিই এএনসিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কমিউনিস্টদের প্রভাবে পরিচালিত হয় এএনসি। সে জন্য ন্যাশনাল পার্টি সব সময় চাইত আলোচনা শুরুর আগে এএনসি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ত্যাগ করুক। ন্যাশনাল পার্টির এ বদ্ধমূল ধারণা ভাঙ্গার জন্য আমি বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বললাম, এএনসির নেতা-কর্মীরা লড়াই করছে মানুষের স্বাধীনতার জন্য, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।

কোন স্বাধীনতাকামী কখনও অন্যের দিকনির্দেশনা অনুসারে চলতে পারে না। তারা চলে নিজেদের মত। তাই এএনসি কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে চলছে বলে যে কথা বলা হচ্ছে তা মোটেও ঠিক নয়। এএনসি চলে নিজেদের মত করে। তবে এটা ঠিক এএনসির কিছু লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মিল

আছে। এএনসির মত কমিউনিস্ট পার্টিও বর্ণবাদের অবসান চায়। সমাজে চলমান শোষণ বৈষম্যের অবসান চায়। দুই দলের স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক হলেও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা।

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এএনসির সম্পর্কের বিষয়টি নিয়েও আমাদের মধ্যে মাসখানেক আলোচনা চলে। ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত অধিকাংশ আফ্রিকানের মত আলোচনা কমিটির সদস্যরাও মনে করতেন এএনসির কমিউনিস্টরা শ্বেতাঙ্গ ও ইন্ডিয়ান। তারাই এএনসির কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ন্ত্রণ করছেন।

আমি তাদের বললাম, এ ধারণাটি মোটেও ঠিক নয়। এএনসি ও কমিউনিস্ট পার্টির নীতি আদর্শ আলাদা। আর যাদেরকে এএনসির মধ্যে প্রভাবশালী বলে মনে করা হচ্ছে সেটিও ঠিক নয়। আমি তাদেরকে বললাম আপনারা এত ক্ষমতাধর হওয়ার পরও আমাকে প্রভাবিত করতে পারেননি। আমার ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতে পারেননি। তাহলে কমিউনিস্টরা কিভাবে পারবে?

ফ্রিডম চার্টার নিয়েও তাদের মধ্যে সংশয় ছিল। তারা মনে করত এএনসি ক্ষমতায় গেলে সব কিছু জাতীয়করণ করবে। এতে শ্বেতাঙ্গরা পথে বসবে। তাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমি তাদের বললাম, ১৯৫৬ সালে প্রণীত ফ্রিডম চার্টার অনেকটা সমাজতন্ত্রের মত মনে হলেও আসলে এটা আফ্রিকান স্টাইলের পুঁজিবাদ। এএনসি ক্ষমতায় আসলে কিছু এলাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হলেও সবকিছু আগের মত থাকবে।

আমাদের আলোচনার আরেকটি প্রধান বিষয় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। তারা মনে করত সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গরা ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদের অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হবে। এএনসি শ্বেতাঙ্গদের অধিকার কিভাবে রক্ষা করবে সেটা তারা আমার কাছে জানতে চাইল। আমি বললাম, দক্ষিণ আফ্রিকার কোন সংগঠনের সঙ্গে এএনসির তুলনা করা চলে না। এএনসির মূল আদর্শই হল জাতীকে ঐক্যবদ্ধ রাখা। সাদা-কালোর ভেদাভেদ তারা কখনোই করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না।

এএনসির সংবিধান বা ফ্রিডম চার্টারের উদ্ধৃতি দিয়ে বললাম, দক্ষিণ আফ্রিকায় যারা বসবাস করেন তারা সবাই দক্ষিণ আফ্রিকান। সবাই এদেশের নাগরিক। তাদের মধ্যে সাদা কালো বলে কিছু নেই। সবাই সমান। আমি বললাম, সাদারাও আফ্রিকান। ভবিষ্যতের সংখ্যা গরিষ্ঠ সরকার তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে না। বরং তাদের যে অধিকার আছে সে অধিকার তাদের যথাযথভাবে ভোগ করতে দেয়া হবে।

৯৪

বৈঠকের ফলাফল ইতিবাচক হল। ১৯৮৮ সালের শীতকালে আমাকে জানানো হল, প্রেসিডেন্ট বোথা আগস্টের আগেই আমার সঙ্গে বৈঠক করার পরিকল্পনা করছেন। এ সময় দেশের অবস্থাও টালমাটাল হয়ে উঠল। সরকার ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে ফের দেশে জরুরি অবস্থা জারি করল। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার পরিধি বিস্তৃত হল। সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ পাহাড়সম হল। অনেক বিদেশী কোম্পানী দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে চলে গেল। মার্কিন কংগ্রেস নিষেধাজ্ঞা বিল অনুমোদন করল। ১৯৮৭ সালে এএনসি ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করল। এ উপলক্ষে বছরের শেষ দিকে তাঞ্জানিয়ায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হল, এতে বিশ্বের ৫০টিরও বেশি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান অংশ গ্রহণ করল। অলিভার ঘোষণা করলেন সরকার দমন-পীড়ন ও বর্ণবাদী নীতি অবসানের জন্য আলোচনা শুরুর আগ পর্যন্ত তারা সশস্ত্র সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন। তিনি আন্দোলন আরো জোরদার করার আহ্বান জানালেন। অবশ্য, এর দু'বছর আগে জাম্বিয়ায় ফ্রিডম চার্টারের ১৩ তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কনফারেন্সে এএনসির নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, এএনসির নেতাদের মুক্তি দেয়া না পর্যন্ত তারা সরকারের সঙ্গে কোন আলোচনায় বসবে না।

দেশজুড়ে সহিংস আন্দোলন জোরদার হলেও ন্যাশনাল পার্টির অবস্থা খুব একটা শক্তিশালী ছিল না। ১৯৮৭ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতীয়তাবাদীরা বিপুলভোটে জয়ী হয়। কনজারভেটিভ পার্টির সঙ্গে বিরোধের কারণে প্রগ্রেসিভ ফেডারেল পার্টির অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না।

গোপন আলোচনার ব্যাপারে আশাবাদী হলেও তখন সময়টা ছিল খুব খারাপ। এ সময় উইনির সঙ্গে আমার দেখা হয়। উইনি জানাল আমাদের অরল্যান্ডো ওয়েস্টের ৮১১৫ নম্বর বাসাটি কারা যেন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এতে বাড়িতে রক্ষিত মূল্যবান কাগজপত্র, ছবি, আসবাবপত্র ভস্মিভূত হয়েছে। আমার মুক্তির আশায় উইনি বিবাহ বার্ষিকীর কেকের যে টুকরাগুলো এতদিন ধরে সংরক্ষণ করে আসছিল সেগুলোও ভস্মিভূত হয়েছে। আমি প্রায়ই ভাবতাম একদিন আমি নিশ্চয়ই মুক্তি পাব। তখন সংরক্ষিত ছবিসহ স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন জিনিসপত্রের মাধ্যমে আবার আগের জায়গায় ফিরে যাব। কিন্তু নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডে সব কিছু তছনছ হয়ে যাওয়ায় আমার সে আশা আর পূরণ হল না।

এ সময় আমার শরির খারাপ হয়ে যায়। ঠাণ্ডা-কাশিতে আক্রান্ত হই। শরির দূর্বল হয়ে পড়ে। এজন্য ব্যায়াম করতে পারতাম না। আমার কক্ষগুলোর ড্যাম্পিং সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে বহুবার অবগত করলেও তারা আমার কথায় কর্ণপাত করেনি। একদিন পরিদর্শক রুমে আমার আইনজীবী ইসমাইল আইয়ুবের সঙ্গে বৈঠক করার সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। বমি করে দেই। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আমার সেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

একজন ডাক্তার এসে চিকিৎসা করল। কিছুটা স্বস্তি বোধ করলাম। ডাক্তার আমার কিছু পরীক্ষার কথা বললেন। এজন্য আমাকে কেপটাউনের হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি তৈরি হয়ে নিলাম। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সামনে পেছনে ছিল সেনাবাহিনীর গাড়ি। আমার সঙ্গে ছিল কমপক্ষে এক ডজন কারারক্ষী।

আমাকে টাইগারবার্গ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। এটা ছিল স্টিলেবেঞ্চ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস সংলগ্ন। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি যেন বিশেষ সহানুভূতি দেখাতে না পারে সেজন্য আমাকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি কক্ষে রাখা হল। কারারক্ষীরা প্রথমে সে কক্ষে প্রবেশ করে সবাইকে সরিয়ে দেন। তারপর চারদিকে কড়া প্রহরা বসান। এরপর আমাকে ওখানে রাখা হয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আমাকে ল্যাবে নিয়ে যাওয়া হল। ওই মেডিকেল ইউনিভার্সিটির একজন তরুণ অধ্যাপক আমার গলা পরীক্ষা করলেন। কফ, রক্ত এগুলোও পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করলেন। এরপর একগাল হেসে বললেন, আপনার কোন সমস্যা নেই। কালই আপনাকে ছেড়ে দিব। তার কথায় খুব খুশি হলাম। কারণ হাসপাতালে আসার কারণে গোপন আলোচনা ব্যাহত হয় কিনা তা নিয়ে রীতিমত শঙ্কিত ছিলাম। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ডাক্তার বললেন, চা খাবেন? আমি সম্মতি দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন নার্স ট্রেতে করে চা, পানি, বিস্কুট নিয়ে আসলেন। কিন্তু আমার চারপাশের সশস্ত্র কারারক্ষীদের দেখে তিনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন। কাঁপতে কাঁপতে তার হাত থেকে ট্রে পড়ে গেল। আমার বিছানা চা আর পানিতে সয়লাব হয়ে গেল।

হাসপাতালের খালি ওয়ার্ডে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আমার ওই রাতটি কাটল। সকালে নাস্তা খাওয়ার আগে হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান আমাকে দেখতে আসেন। পরীক্ষার কাগজপত্র দেখে এবং বুঝে সামান্য চাপ দিয়ে তিনি বলেন, আপনার ফুসফুসে পানি জমেছে। ডাক্তারকে বললাম, আগের ডাক্তারতো

বললেন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি বললেন, ম্যান্ডেলা আপনার বুকের দিকে তাকান। তিনি দেখালেন, আমার বুকের একদিকের অংশ একটু ফোলা। সম্ভবত এখানেই পানি জমেছে। ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ম্যান্ডেলা আপনি কি নাস্তা করেছেন? বললাম, না। তিনি বললেন, খুব ভালো। এক্ষুণি আপনাকে অপারেশন করতে হবে। এই বলে তিনি একজন নার্সকে অপারেশন থিয়েটারে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন।

আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হল। অজ্ঞান করা হল। এরপর যখন হুঁশ হল দেখি একজন ডাক্তার আমার সামনে দাঁড়ান। তিনি জানালেন আমার ফুসফুস থেকে দুই লিটার পানি অপসারণ করা হয়েছে। রোগের খুব প্রাথমিক অবস্থায় অপারেশন করা হয়েছে বিধায় ফুসফুসের কোন ক্ষতি হয়নি। তিনি এও জানালেন আমার মধ্যে যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা গেছে। এ রোগ থেকে সম্পূর্ণ সারতে ৬ মাস লাগবে। হাসপাতালে থাকতে হবে মাস দুইয়েক। আমার রুমের স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের কারণেই আমার যক্ষ্মা হয়েছে বলে ডাক্তার জানান।

টাইগারবার্গ হাসপাতালে আমাকে ৬ সপ্তাহ চিকিৎসা নিতে হল। ডাক্তার ও নার্সরা আমার সেবা করেন সাধ্যমত। ডিসেম্বরে আমাকে পুলসমোর জেলখানার নিকটবর্তী একটি অত্যাধুনিক ক্লিনিকে পাঠানো হয়। এর নাম ছিল কনসটেইনবার্গ ক্লিনিক। এটি ছিল বিলাসবহুল ক্লিনিক। এর ডাক্তার ও নার্স সবাই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত বিনয়ী। সেখানে যাওয়ার পরদিন কোবে কোয়েটসি আমাকে দেখতে যান। সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি কমান্ডার মেজর মরিস। আমরা একসঙ্গে নাস্তা করি। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করি।

শারীরিক অসুস্থতা ও উচ্চ রক্তচাপের কারণে আমাকে কোলেস্টরেল যুক্ত খাবার দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। কনসটেইনবার্গ ক্লিনিকে ওই নিষেধাজ্ঞা সম্ভবত তখনও পৌঁছেনি। তাই আমাদেরকে যে নাস্তা পরিবেশন করা হয় তাতে কোলেস্টরেলযুক্ত অনেক সুস্বাদু খাবার ছিল। ডিশে শুকুরের মাংস, ডিম, মাখন, রুটি এসব ছিল। অনেক দিন পর এ জাতীয় সুস্বাদু খাবার পেয়ে বেশ পুলকিত হলাম। আমি ডিম নিয়ে মুখে দিব এমন সময় মেজর মরিস বললেন, ম্যান্ডেলা দু:খিত, ওটা মুখে দিবেন না। আপনার জন্য এসব খাবার সম্পূর্ণ নিষেধ। এই বলে তিনি খাবারের ট্রেটি উঠিয়ে নিলেন। আমি বললাম, মেজর আমি দুঃখিত। এসব খাবার খেয়ে আজ যদি আমি মরেও যাই তবুও এগুলো খেতে চাই। তিনি থামলেন না। ট্রে টা নিয়ে গেলেন।

কনসটেইনবার্গ ক্লিনিকে কোবে কোয়েটসি ও গোপন কমিটির সঙ্গে আমার বৈঠক

হয়। বৈঠকের এক পর্যায়ে কোয়েটসি বলে ফেলেন, ম্যান্ডেলা আমরা আপনাকে এমন এক পরিবেশে রাখতে চাই যাতে আপনি অর্ধেক স্বাধীন-অর্ধেক পরাধীন অবস্থায় থাকতে পারেন। সরকার যে আমার মুক্তির ব্যাপারে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে তার এ কথা থেকে তখনও কিছু বুঝতে পারিনি।

এর মধ্যে ক্লিনিকে আসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। আমি যাতে আরামে থাকতে পারি কর্তৃপক্ষ তার সব ব্যবস্থা করে। আমার জন্য অতিরিক্ত পোশাক, লেপ, তোষক বালিশ সরবরাহ করা হয়। মন খুলে ডাক্তার নার্সদের সঙ্গে গল্প করলেও কেউ কিছু বলত না। ডাক্তার ও নার্সরা সর্বক্ষণ আমার সেবা যত্ন করত। কাজের সময়ের বাইরেও নার্সরা এসে আমাকে দেখে যেতেন। আমার সেবায় নিয়োজিত ডাক্তার ও নার্সদের সবাই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ অথবা ইন্ডিয়ান। কোন কৃষ্ণাঙ্গ তাদের মধ্যে ছিল না।

একদিন একজন নার্স এসে বললেন, মিস্টার ম্যান্ডেলা, আজ রাতে আমাদের একটি পার্টি আছে। তাতে আপনাকে আমরা দেখতে চাই। আমি রাজি হলাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাকে পার্টিতে যাওয়ার অনুমতি দিল না। তাই নার্সরা অনুষ্ঠানটি আমার রুমে করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাতে ডজনখানেক তরুণী নার্স আমার রুমে এসে জড়ো হয়। তারা কেক কেটে নেচে গেয়ে আনন্দ করে। আমার জন্য অনেকে উপহারও নিয়ে আসে।

৯৫

১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে আমার ওয়ার্ডের নিরাপত্তা বাড়ানো হল। নিরাপত্তারক্ষীদের অন্য সময়ের তুলনায় বেশি তৎপর মনে হল। ৯ ডিসেম্বর বিকেলে মেজর মরিস আমার রুমে আসলেন। আমাকে এখনি থেকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যেতে হবে? তিনি বলতে পারলেন না। আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। আমার ভক্ত নার্সদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে না পারায় আশাহত হলাম, মনে কষ্ট পেলাম।

আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করল। এক ঘন্টার মধ্যে গাড়ি একটি জেলখানায় প্রবেশ করল। সেটির নাম ছিল ভিক্টর ভারস্টার। পুরনো কেপ ডাচ শহরের পার্ল এলাকায় ছিল এর অবস্থান। কেপটাউন থেকে ৩৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে ছিল ভিক্টর ভারস্টার জেলখানাটি। আধুনিক সুযোগ-সুবিধার জন্য ঐ জেলখানাটির

বেশ সুখ্যাতি ছিল। আমাদের গাড়ি জেলখানার প্রশস্ত সড়ক ধরে একেবারে শেষপ্রান্তে এক তলা একটি ভবনের কাছে এসে থামল। ভবনটির চারদিকে ছিল উঁচু গাছ পালা। প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল ভারি সুন্দর।

আমাকে নিয়ে মেজর মরিস ওই ভবনে প্রবেশ করলেন। ভবনটির একদিকে বিশাল বারান্দা ছিল। এছাড়া রান্নাঘর, বিশাল বাথরুমসহ আনুষঙ্গিক সবকিছুই তাতে ছিল। জায়গাটি ছিল পরিপাটি ও বেশ আরামদায়ক। তবে আমার আসার আগে রুমটিতে সম্ভবত ঝাড়ু দেয়া হয়নি। এজন্য অনেক পোকামাকড় ও ধুলিবালি ছিল রুমে। আমি ঝাড়ু দিয়ে তা পরিষ্কার করি। নতুন এ জায়গায় রাতে আমার বেশ ভালো ঘুম হয়। পরদিন সকালে আমার নতুন জায়গাটি একটু ঘুরে দেখি। আশপাশে তাকাতেই একটি সুইমিংপুল দুটি বেডরুম চোখে পড়ে। চারদিকে ছিল সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ। সব মিলিয়ে নান্দনিক পরিবেশ। ভবনে প্রবেশের গেট ছাড়া অন্য কোন জায়গায় কারারক্ষী ছিল না। মোট কথা জায়গাটি ছিল অর্ধেক বাড়ি অর্ধেক কারাগারের মত।

বিকেলে আইনমন্ত্রী কোবে কোয়েটসি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমার ঘর সাজানোর জন্য সঙ্গে করে বেশ কিছু উপহার নিয়ে আসেন। নতুন জায়গাটি পছন্দ হয়েছে জেনে তিনি দারুণ খুশি হন। তিনি ভবনের চারপাশ ঘুরে দেখেন। ভবনের চারদিকের দেয়াল ছিল নিচু। এ কারণে আমার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নষ্ট হতে পারে বলে কোয়েটসি মন্তব্য করেণ। তিনি জানান, মুক্তি পাবার আগে সম্ভবত ভিক্টর ভারস্টারের এ ভবনটি হবে আমার জন্য শেষ আবাস।

নতুন এ কুটিরে আমি স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করলাম। ইচ্ছে করলে আমি ঘুমোতে পারতাম, বাইরে হাঁটাহাঁটি করতে পারতাম। মন চাইলেই সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে পারতাম। ক্ষুধা লাগলে নিজের ইচ্ছেমত করে সুস্বাদু খাবার খেতে পারতাম। এখানে জেলখানার মত কোন লোহার দরজা, শিক-জানালার বালাই ছিল না। নিষেধ করার মতও কেউ ছিল না।

জেলখানা কর্তৃপক্ষ আমাকে একজন বাবুর্চি দিয়েছিল। বাবুর্চির কাজ করতেন ওয়ারেন্ট অফিসার স্টুয়ার্ট। তিনি ছিলেন লম্বা-চওড়া একজন শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান। একসময় রোবেন দ্বীপে তিনি কারারক্ষী হিসেবে কাজ করেছেন। আমি তাকে মনে না রাখলেও স্টুয়ার্ট ঠিকই আমাকে মনে রেখেছিলেন। রোবেন দ্বীপে খনিতে কাজ করার সময় যে কয়জন কারারক্ষী আমাদের ওপর নজরদারি করতেন তাদের একজন ছিলেন স্টুয়ার্ট। আমি মিষ্টিভাষী এ লোকটিকে ছোট ভাইয়ের মত দেখতাম।

স্টুয়ার্ট সকাল ৭টায় আমার কাছে আসতেন যেতেন বিকেল ৪টায়। এ সময়ের মধ্যে তিনি আমার জন্য সকালের নাস্তা, দুপুরের ও রাতের খাবার তৈরি

করতেন। খাবার-দাবারের ব্যাপারে ডাক্তার আমাকে যে পরামর্শ দিয়েছিল স্টুয়ার্ট খাবার তৈরির সময় সে নির্দেশনা পুরোপুরি অনুসরণ করে চলতেন। তার রান্নাবান্না ছিল চমৎকার। আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন সবসময়। বিকেলে বাড়িতে যাওয়ার আগে খাবার-দাবার হটপটে রেখে যেতেন যাতে আমি রাতে গরম খাবার খেতে পারি।

স্টুয়ার্ট আমার জন্য নিজের হাতে রুটি তৈরি করতেন। খাবার সুস্বাদু করার জন্য অনেক সময় বাড়ি থেকে মরিচ ও মসলা নিয়ে আসতেন। আমার সাথে লোকজন দেখা করতে আসলে স্টুয়ার্ট তাদের খাবার পরিবেশন করতেন। সবাই তার রান্নার প্রশংসা করত। কর্তৃপক্ষ এ সময় এএনসির মেস ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (এমবিএম), ও ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউডিএফ) নেতাকর্মীদের আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়। তারা আসার সময় প্রায়ই খাবার-দাবার নিয়ে আসত। এতে আমি বিরক্ত হতাম। কারণ স্টুয়ার্ট এর রান্নাই আমার বাড়ির রান্নার অভাব পূরণ করত।

স্টুয়ার্ট আমার দিকে খুব খেয়াল রাখতেন। একদিনের ঘটনা। টেবিলে সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত। আমি প্লেট ধুতে রান্নাঘরে যেতে উদ্যত হলাম। স্টুয়াট বললেন, প্লেটটা আমাকে দিন। আমি ধুয়ে দেই। এটা আমার কাজ। কিন্তু স্টুয়ার্ট বারবার আপত্তি করা সত্ত্বেও আমি শুনলাম না। নিজের প্লেট নিজেই ধুলাম। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আমি বিছানাপত্র গুছিয়ে রাখতাম। স্টুয়ার্ট এটাও পছন্দ করতেন না। বলতেন, এটা আমার কাজ। আপনি করবেন কেন।

স্টুয়ার্ট আফ্রিকানাস বা ওলন্দাজ ধাঁচের ভাষায় কথা বললেও ইংরেজির প্রতি দারুণ আগ্রহ ছিল। তিনি ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করতেন। এ কাজে আমার সাহায্য চাইতেন। ইংরেজি শেখার ব্যাপারে তাকে আমি সাধ্যমত সহযোগিতা করতাম।

বিশেষ দিন বা বিভিন্ন উপলক্ষে স্টুয়ার্টকে আমি বিশেষ খাবার রান্না করতে বলতাম। ছোট বেলায় সিমের ভর্তা দিয়ে গরম ভাত খেতাম। একদিন স্টুয়ার্টকে ভাত রান্না করতে ও সিমের ভর্তা বানাতে বললাম, তিনি অনেকটা অবাক হলেন। রান্নাঘরে গিয়ে তাকে দেখিয়ে দেবার পর স্টুয়ার্ট ঠিকই সেগুলো যথাযথভাবে তৈরি করতে সক্ষম হন।

আমি মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলাম না। অবশ্য শ্বেতাঙ্গ অতিথিরা আসলে তাদের জন্য মদ পরিবেশন করতাম। তখন অতিথিদের অনুরোধে একটু আধটু পান করতাম। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার তৈরি এক ধরণের মিষ্টি জাতীয় মদ আমার খুব পছন্দ ছিল। এটা আমি সহ্যও করতে পারতাম।

ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আমার গোপন বৈঠক চলতে লাগল। কয়েকটি ইস্যুর কারণে আলোচনা দৃশ্যত থমকে ছিল। সশস্ত্র আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টি ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন– এ তিনটি ইস্যুর সুরাহা না হওয়ায় আলোচনা মূলত সামনে এগুতে পারছিল না। এ পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট পি, ডব্লিউ বোথার সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্য আমি কোয়েটসিকে চাপ দিতে থাকি। এ সময় কর্তৃপক্ষ আমাকে পুলসমোর, রোবেন দ্বীপ ও লুসাকায় থাকা আমার রাজনৈতিক সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের অনুমতি প্রদান করে। তবে তা সত্ত্বেও আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি সেই মুহূর্তে এড়িয়ে চলি। নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে রাখি।

১৯৮৯ সালের মাসে জানুয়ারি পুলসমোর জেলখানায় অবস্থানরত আমার চার বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। প্রেসিডেন্টকে আমি যে স্মারক লিপি দেয়ার পরিকল্পনা করছি সেটা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। গোপন বৈঠকে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় স্মারক লিপিতে সেগুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্মারকলিপিতে সহিংসতার নিন্দা না জানানোর প্রসঙ্গে বলি, সন্ত্রাসের নিন্দা করা কোন সমস্যা নয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে সরকার কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে প্রস্তুত নয়।

কমিউনিস্ট পার্টি প্রসঙ্গে বলি, এটা নিয়ে উচ্চবাচ্চ করার কিছুই নেই। কারণ আমরা কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণে নই। আমাদের ওপর তাদের কোন প্রভাব নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্টকে লিখি, এটা ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার একটা হীন মানসিকতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমি তাকে বাস্তবতা মেনে নেয়ার পরামর্শ দেই। আমি স্পষ্ট ভাবে বলি, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন আর দেশের শান্তি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

একটা ছাড়া অন্যটি কোনভাবেই সম্ভব নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কখনই শান্তি আসবে না। চিঠির শেষে আলোচনার একটা কঠিন কাঠামো তার সামনে পেশ করি। আমি প্রেসিডেন্টকে বলি, দুটি রাজনৈতিক ইস্যু নিয়েই আমাদের মধ্যে মূলত আলোচনা হওয়া উচিত। একটা হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদের নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি,

সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা সমুন্নত রাখা। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানে এই নয় যে, কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে চলবে। এএনসি শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়েই দেশ চালাবে।

আমি প্রস্তাব করি, এগুলো দুইভাবে অর্জন করা সম্ভব। প্রথমটি হচ্ছে আলোচনার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে একটা সমঝোতায় আসা। প্রেসিডেন্ট শিগগিরই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন বলে আমি আশা প্রকাশ করি।

সরকারের সঙ্গে দরকষাকষির এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রেসিডেন্ট বোথা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। জানুয়ারি মাসে তিনি স্ট্রোক করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে কিছুটা সুস্থ হলেও তার মেজাজ বেজায় খিটখিটে হয়ে যায়। এ সময় তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষমতাসীন ন্যাশনালিস্ট পার্টির দলীয় প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তবে প্রেসিডেন্টের পদটি ঠিকই আগলে রাখেন। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সংসদীয় পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হতেন রাষ্ট্রের প্রধান। বোথা এখন রাষ্ট্রের প্রধান হলেও পার্টির কেউ ছিলেন না। এটা ছিল বেশ একটি ইতিবাচক লক্ষণ। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যিকারে পরিবর্তন আনার জন্য তিনি রাজনীতির উর্ধ্বে থাকতে চেয়েছিলেন।

রাজনৈতিক সহিংসতা ও আন্তর্জাতিক চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকল। দেশের সব রাজনৈতিক বন্দিরা মুক্তির দাবিতে একযোগে অনশন ধর্মঘট শুরু করল। সরকার তাদের দাবীর কাছে মাথা নত করল। ১৯৮৯ সালে ৯শ বন্দিকে ছেড়ে দেয়া হল। ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) এ সময় কংগ্রেস অব সাউথ আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়নস এবং মেস ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্টের (এমডিএম) সঙ্গে জোট গড়ে তোলে। তারা রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও বর্ণবৈষম্য অবসানের দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জনমত গঠনের কাজ করে যেতে থাকেন অলিভার টেম্বু। তিনি ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন সরকারের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় আমেরিকা এএনসিকে স্বীকৃতি দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা নিরসনে এএনসির সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য সরকারকে চাপ দেয়।

রাজনৈতিক সহিংসতা এ সময় অনেক দুঃখজনক ঘটনার জন্ম দেয়। সোয়েটোতে সহিংসতা মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ায় একদল যুবককে উইনি বডিগার্ড হিসেবে নিযুক্ত করে। এরা ছিল বেপরোয়া। কোন প্রশিক্ষণও তাদের ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে অনেকে সম্পৃক্ত ছিল। উইনির

দেহরক্ষীদের একজনকে পুলিশ খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করে। ওই মামলায় উইনিও জড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়টি আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়। আমি উইনির সহযোগিতায় এগিয়ে যাই। আইনি সহায়তা দিয়ে তাকে ওই মামলা থেকে মুক্ত করি।

এ বছর জুলাই মাসে ছিল আমার ৭১ তম জন্মদিন। পরিবারের সব সদস্যরা আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে ভিক্টর ভারস্টার জেলখানার কুটিরে জড়ো হয়। এই প্রথম আমি স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নাতি নাতনীকে একজায়গায় নিয়ে জন্মদিন উদযাপন করলাম। এটা ছিল আমার জন্য খুব আনন্দের একটা ঘটনা। ওয়ারেন্ট অফিসার স্টুয়ার্ট খাবার-দাবারের আয়োজন করে। আমার নাতনী পুডিং পছন্দ করত। এটা তৈরি করতেও সে ভুল করেনি। খাওয়া-দাওয়া শেষে আমরা ভিডিওতে ভূতের ছবি দেখি। পরে বারান্দায় বসে একসঙ্গে খোশগল্প করি। আমিও আমার পুরো পরিবার এদিন বলতে গেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। এ আনন্দের কথা আমার বহু বছর মনে ছিল।

৯৭

৪ জুলাই জেনারেল উইলেমসি জানান, পরের দিন আমাকে প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। সাক্ষাৎ হবে নিতান্ত সৌজন্য সাক্ষাৎ। আমাকে ভোর সারে ৫টায় তৈরি থাকতে বলা হল। জেনারেলকে বললাম, আমি শুধু সৌজন্য সাক্ষাৎ নয় প্রেসিডেন্টের সাথে রীতিমত বৈঠক করতে চাই। এছাড়া মিস্টার বোথার সাথে দেখা করার জন্য আমার স্যুট-টাই দরকার।

জেনারেল আমার কথায় রাজি হলেন। বিকেলের মধ্যে স্যুটের মাপ নেয়ার জন্য একজন দর্জি এলেন। দুপুরের মধ্যে আমি একটি স্যুট, টাই, শার্ট, মোজা পেয়ে গেলাম। যাওয়ার আগে জেনারেল আমার রক্তের গ্রুপ জানতে চাইলেন। আসা যাওয়ার মাঝখানে কোন অঘটন ঘটে যাওয়ার আশঙ্কায় আমার রক্তের গ্রুপ জেনে নেয়া হয়।

বৈঠকের জন্য যতটা প্রস্তুতি নেয়া দরকার তার সবই নিলাম, বৈঠকের বিষয়ে আমি যেসব কথাবার্তা গুছিয়ে রেখেছিলাম সেগুলি একটু মনে করে নিলাম, বৈঠকের বিষয়ে টুকে রাখা নোটগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। ওইদিনের সবগুলো সংবাদপত্র ও সাময়িকী মোটামুটি দেখে রাখলাম। আমি সাম্প্রতিক সব বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি জানি– এমন একটা প্রস্তুতি শেষ করলাম।

বোথা পদত্যাগের পর ন্যাশনাল পার্টির প্রধান হন এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক। ক্লার্ক ও বোথার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বেশ মত পার্থক্য ছিল। বোথাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয়ার ব্যাপারে অনেকে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করছে বলেও খবর পেলাম। কিন্তু এতে মোটেও উদ্বিগ্ন হলাম না। কেননা আমি জানতাম বোথা তখনও দেশের প্রেসিডেন্ট। তিনি আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করতে পারবেন।

বোথাকে দেখার জন্য খুব আগ্রহ ছিল। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাই ড্রুট ক্রোকোডাইল বা খ্যাপা কুমির হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার বদমেজাজের কথা সবার জানা ছিল। তার পোশাক-আশাক ছিল অনেকটা পুরনো ধাঁচের। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম শ্বেতাঙ্গ নেতারা সচরাচর কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে যে ধরণের আচরণ করে বোথা আমার সঙ্গে বৈঠকের সময় ওই আচরণ করলে বা আমাকে লক্ষ্য করে আঙ্গুল নাড়িয়ে নাড়িয়ে কথা বললে আমি উঠে যাব। তার মুখের ওপর বলে ফেলব, এ ধরণের অসৌজন্যমূলক আচরণ অগ্রহণযোগ্য। এটা আমি মেনে নিতে পারি না। এই বলে বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসব।

কথা অনুসারে পরের দিন ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে ভিক্টর ভারস্টার জেলখানার কমান্ডার মেজর মরিস আমার কুটিরে এসে হাজির হলেন। আমি নতুন স্যুট পরে বারান্দায় দাঁড়ানো ছিলাম। তিনি সরাসরি সেখানে আসলেন। আমার পোশাক পরা দেখতে লাগলেন। তার সঙ্গে হাত মেলালাম। বারান্দার চারদিক হেঁটে চক্কর দিলাম। আমার পোশাক পরাটা তিনি দেখে নিলেন। মরিস বললেন, ম্যান্ডেলা এভাবে চলবে না। আপনার টাই কোথায়? বললাম, জেলখানায় এসে টাই পরা হয়নি বহু বছর ধরে। তাই টাই বাঁধা ভুলে গেছি। কয়েকবার চেষ্টা করেও ভালোভাবে বাঁধতে পারিনি। তাই এটা আর শেষ পর্যন্ত পরলাম না। মরিস বললেন, টাই নিয়ে আসুন। আমি বেঁধে দেই। সেটা নিয়ে যাওয়ার পর মরিস শার্টের কলার উঠিয়ে টাইটা পরালেন। এরপর সুন্দরভাবে বেঁধে দিলেন। বললাম, চমৎকার হয়েছে মরিস। তিনিও বলেন, ম্যান্ডেলা স্যুটে আপনাকে বেশ মানিয়েছে।

আমরা গাড়িতে করে ভিক্টর ভরস্টার থেকে পুলসমোরের দিকে যাত্রা করলাম। সেখানে জেনারেল উইলেমসির বাসায় নাস্তা করলাম। জেনারেলের স্ত্রী আমাদের নাস্তা পরিবেশন করলেন। নাস্তা শেষে মোটামুটি ছোটখাটো একটি গাড়ি বহর নিয়ে আমরা টুইনহাউসে প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের দিকে রওয়ানা দিলাম। আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে গাড়ি পার্ক করলাম। টুইনহাউস কেপ-ডাচ স্টাইলের চমৎকার একটি ভবন। আমি ভবনটির চারদিক ভাল করে দেখার সুযোগ পাইনি। এর আগেই প্রেসিডেন্টের রুমে প্রবেশ করতে হয়।

গ্রাউন্ডফ্লোর থেকে লিফটে করে প্রেসিডেন্ট অফিসের বিশাল প্রাঙ্গনে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে কোবে কোয়েটসি, নীল ব্রান্ডসহ আরো অনেক পদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। কোয়েটসি ও ড. বার্নার্ডের সঙ্গে বৈঠকের ব্যাপারে একান্তে কিছুক্ষণ আলাপ করি। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার সময় তারা আমাকে বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। আমরা অপেক্ষা করছিলাম। ড. বার্নার্ড নিচের দিকে তাকালেন এবং দেখলেন আমার জুতা ভালো করে পরা হয়নি। সেটা একটু ঢিলা ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ নুয়ে আমার জুতা ঠিক করে দিলেন। বুঝলাম সবাই বেশ ভয়ের মধ্যে আছেন। দরজা খুলে গেল। বহু প্রতিক্ষিত মানুষটির পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম।

প্রেসিডেন্ট বোথা রুমে প্রবেশ করলেন। হেঁটে আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। এ সময় বোথা ছিলেন বেশ হাসি-খুশি, প্রাণোচ্ছল ও বন্ধু ভাবাপন্ন।

আমরা ছবি তোলার জন্য পোজ দিলাম। বোথা ও আমি হাত মেলালাম। এ সময় আমাদের দুজনের মুখেই ছিল ভুবন ভোলানো হাসি। এরপর লম্বা টেবিলে আলোচনার জন্য বসলাম। টেবিলে আমি ও বোথা ছাড়াও কোবে কোয়েটসি, জেনারেল উইলেমেসি, ও ড. বার্নার্ড উপস্থিত ছিলাম। চা পরিবেশন করা হল। শুরু হল আলোচনা। উত্তপ্ত রাজনৈতিক বিষয়ের পরিবর্তে হাল্কা মেজাজের বিষয় দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করলাম। হাসি মশকরাও হল বৈঠকে। আমি বললাম, কিছুদিন আগে একটি ম্যাগাজিনে ১৯১৪ সালের মহান বিপ্লব সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ পড়েছি। শ্বেতাঙ্গ বিপ্লবীরা ফ্রি স্টেট কিভাবে দখল করেছিল তার চমৎকার বিবরণ আছে তাতে। ওই মহান বিপ্লবের সঙ্গে আমাদের চলমান আন্দোলনের যথেষ্ট মিল আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা-কালোর ইতিহাস ভিন্ন মনে হলেও ওই বিপ্লব থেকে মনে হয়েছে মৌলিক বিষয়ে সাদা-কালোর মধ্যে কোন বিভেদ নেই।

বৈঠক দেড়ঘণ্টা স্থায়ী হল। পুরো সময় জুড়ে ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ। বৈঠকের এক পর্যায়ে আমি মি. বোথাকে সব রাজনৈতিক বন্দিকে ছেড়ে দেবার অনুরোধ জানাই। পুরো বৈঠকের মধ্যে এ সময়টি ছিল একটু বিব্রতকর। মিস্টার বোথা বললেন, তার আশঙ্কা তিনি বোধ হয় ওই কাজ করতে পারবেন না। বৈঠকের খবর কোনক্রমে ফাঁস হয়ে গেলে কি করা হবে তা নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত সবাই সিদ্ধান্ত নেন, খবর ফাঁস হয়ে গেলে বলবেন, দেশের

শান্তি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে আমরা চা-চক্রে বসেছিলাম। বৈঠক শেষে প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে হাত মেলালেন। বললেন, এ বৈঠকে বসতে পেরে তিনি আনন্দিত। এই বলে তিনি চলে গেলেন। আমি রওয়ানা দিলাম কুটিরের দিকে।

এর একমাস পর ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে পি ডব্লিউ বোথা টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ওই ভাষণেই তিনি প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। বিদায়ী ভাষণে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা ও তাকে অসহযোগিতার জন্য মন্ত্রীদের ভর্ৎসনা করেন। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (এএনসি) সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারে তাদের অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন, পরের দিন এফ. ডব্লিউ. ডি ক্লার্ক অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন এবং দেশে সত্যিকারের পরিবর্তন আনার অঙ্গীকার করেন।

মিস্টার ডি ক্লার্ককে আমরা গুরুত্বহীন ব্যক্তি মনে করতাম। পার্টির প্রধান হওয়ার পরও প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি কাজ করতেন না। দেশে সংস্কার আনার জন্য তাকে তেমন উদ্যোগী মনে হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষার্থীদেরকে শ্বেতাঙ্গদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পার্টির প্রধান হওয়ার পর আমি তার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করি। তার সব বক্তৃতা আমি শুনতাম। তার লেখা পড়তাম। এসব থেকে মনে হল তিনি খুব বাস্তববাদী মানুষ। শপথ নেয়ার পর একদিন তাকে একটি চিঠি লিখলাম। বৈঠকে বসার অনুরোধ জানালাম।

উদ্বোধনী ভাষণে প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্ক দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন দলের সঙ্গে বৈঠকে বসার অঙ্গীকার করেন। আলোচনার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন।

৯৮

ডি ক্লার্ক প্রেসিডেন্ট হবার পরও আমি গোপন আলোচনায় অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখলাম। আলোচনায় নতুন করে যুক্ত হলেন সাংবিধানিক উন্নয়নমন্ত্রী গেরিট ভিলজোয়েন। তিনি ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। খুবই মেধাবী। পুরো আলোচনাকে তিনি একটা সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসেন। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা প্রমাণের জন্য আবারো পুলসমোর ও রোবেন দ্বীপে বন্দি আমার সহকর্মীদের মুক্তি দেয়ার জোর দাবি জানালাম।

আমি ওয়ার্কিং কমিটিকে বললাম, আমার সহকর্মীদের নিঃশর্তভাবে মুক্তি দিতে হবে। তাদের মুক্তি দেয়া হলে তারা বিশৃংখলার সৃষ্টি করবে না বলেও গ্যারান্টি দিলাম। যেমনটা করেনি গোভান এমবেকি। সরকার তাকে ১৯৮৭ সালে মুক্তি দিলেও তিনি কোন অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ করেন নি। বরং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তার ভূমিকা ছিল বেশ গঠনমূলক।

১৯৮৯ সালের ১০ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্ক ওয়াল্টার সিসুলুসহ আমার ৭ জন সহযোগিকে মুক্তির ঘোষণা দেন। মুক্তিপ্রাপ্ত অন্য সহযোগিরা হলেন– রেমন্ড এমহলবা, আহমেদ কাদরাদা, এন্ড্রু মেলাঙ্গিনী, ইলিয়াস মোতসোয়ালেদী, জেফ মেসেমোলা, উইলটন মাকায়ি এবং অস্কার এমপেথা। ওইদিন সকালে ওয়াল্টার, কোয়ে রেমন্ড ও এন্ড্রুর সঙ্গে দেখা করি। এরা পুলসমোর জেলখানা থেকে মুক্তি পান। আমি তাদের জেলখানা থেকে বিদায় জানাই। বিদায় নেয়ার সময় তারা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। আমি তাদের সান্ত্বনা দেই। আমিও শিগগিরই মুক্তি পাব বলে ধরে নেই। পরে জোহান্সবার্গ কারাগার থেকেও কয়েকজনকে মুক্তি দেয়া হয়। সিসুলু মুক্তি পান রোবেন দ্বীপ থেকে। আমার সহযোগিদের মুক্তি দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ডি. ক্লার্ককে চিঠি লিখি। তাকে ধন্যবাদ জানাই।

ওয়াল্টারসহ অন্যরা মুক্তি পাওয়ায় আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। এদিনটির জন্য, এ সময়টির জন্য আমরা বছরের পর বছর সংগ্রাম করেছি। দীর্ঘ প্রায় তিনদশক ধরে অপেক্ষা করেছি। ডি ক্লার্ক কথা রাখলেন। তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে চললেন। যাদের মুক্তি দেয়া হল তাদের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা রইল না। তারা অবাধে চলাফেরা করতে পারতেন, এএনসির হয়ে কথা বলতে পারতেন। আমাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে এএনসি তখন শক্ত অবস্থায় পৌঁছে যায়।

সাদা-কালোর বৈষম্য অবসানে এ সময় প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্ক নানা ধরণের পদক্ষেপ নেন। যেসব ভবনে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল তিনি সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্র সৈকতগুলি সব বর্ণের লোকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। রিজারভেশন অব সেপারেট এমিনিটিস এ্যাক্ট বাতিল করেন। এ আইনের কারণে ১৯৫৩ সাল থেকে কৃষ্ণাঙ্গরা পার্ক, সিনেমা হল, রেস্টুরেন্ট, বাস, পাঠাগার এমনকি টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হত।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমাকে জানানো হয়, ১২ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের সঙ্গে আমার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এ সময় পুরনো ও নতুন বন্ধু এবং সহকর্মীদের সঙ্গে আমার কুটিরে একাধিক বৈঠক করার সুযোগ পেলাম। মেস ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট ও ইউডিএফ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলাম। এএনসির সব এলাকার আঞ্চলিক নেতাদের সঙ্গেও পরামর্শ করলাম। বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতা এবং রোবেন দ্বীপে আমার অনেক সহকর্মীদের সঙ্গেও ডি ক্লার্কের সঙ্গে আসন্ন বৈঠক নিয়ে আলোচনা করি।

বন্ধু ও সহকর্মীদের পরামর্শ অনুসারে আমি প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্ককে একটি চিঠি লিখি। যেমনটি লিখেছিলাম সাবেক প্রেসিডেন্ট পি ডব্লিউ বোথাকে। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল সরকার ও এএনসির মধ্যে আলোচনা। চিঠিতে উল্লেখ করি, বর্তমানে সহিংসতা চরম আকার ধারণ করেছে। এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে আলোচনা। আমি বললাম এএনসি কোন পূর্বশর্ত মেনে আলোচনায় যাবে না। আলোচনা হবে নিঃশর্ত। আলোচনার আগে সশস্ত্র সংগ্রাম ত্যাগের কোন শর্ত মেনে নেয়া যাবে না। সরকার আমাদের শান্তির পথে ফেরার যে আহ্বান জানিয়েছে আমরা তাতে ফিরতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তবে এজন্য আলোচনার কোন বিকল্প নেই।

চিঠিতে ডি ক্লার্কের ভুয়সী প্রশংসাও করলাম। বললাম, উদ্বোধনী বক্তৃতায় ঐক্য, সংহতি ও মিমাংসার যে আহ্বান তিনি জানিয়েছেন তা আমাকে রীতিমত মুগ্ধ করেছে। তার ওই বক্তৃতা শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার লাখ লাখ জনতাকেই নয় বিশ্বের কোটি কোটি মানব দরদি মানুষকে মুগ্ধ করেছে। নতুন প্রজন্মের আফ্রিকানদের মাঝে আশার আলো জাগিয়ে তুলেছে। তার মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকা নতুন করে জন্ম নিতে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করলাম। তিনি যে সব পদক্ষেপ নিয়েছেন তাতে সাদা কালোর ভেদাভেদ দূর হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করলাম।

চিঠিতে আলোচনার ওপর আবারো গুরুত্ব আরোপ করলাম। সরকারের সাথে দুইস্তরে আলোচনার প্রস্তাব দিলাম। এএনসির ১৯৮৯ সালের হারারে ঘোষণার কথাও এতে জুড়ে দিলাম। ওই ঘোষণায় সরকারের প্রতি আলোচনার আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে একমাত্র অন্তরায় হিসেবে সরকারের কথা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া সব রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তি, সব দল ও ব্যক্তির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া, শহর থেকে সৈন্য প্রত্যাহারসহ আরো কিছু দাবি জানানো হয়। চিঠিতে এও বলি, দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে সবার আগে প্রয়োজন একটা যুদ্ধ বিরতি।

এর জন্য আলোচনার বিকল্প নেই। যুদ্ধ বিরতি হলে অন্য কাজের পথ খোলাসা হয়ে যাবে। বৈঠকের একদিন আগে চিঠিটি ডি ক্লার্কের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

১৩ ডিসেম্বর সকালে আমাকে পুনরায় টুইনহাউসে নিয়ে যাওয়া হল। এর আগে যে রুমে বসে আমরা চা খেয়েছিলাম, বৈঠক করেছিলাম আজও একই রুমে প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হলাম।

এবারও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ছিলেন কোবে কোয়েটসি, জেনারেল উইলেমসি, ড. বার্নার্ড ও মাইকলো। প্রেসিডেন্ট হওয়ায় আমি ডি. ক্লার্ককে অভিনন্দন জানালাম। আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারবো বলেও আশা প্রকাশ করলাম। তাকে খুবই আন্তরিক ও উৎফুল্ল মনে হল। তার ভাবসাব দেখে মনে হল তিনি আমাদেরকে কিছু দিতে চান এবং আমাদের থেকেও কিছু নিতে চান।

বৈঠককালে লক্ষ্য করলাম, আমার কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। এটা ছিল খুব ভালো লক্ষণ। ন্যাশনাল পার্টির নেতারা কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে বৈঠকে সচরাচর খুব একটা মনোযোগী হতেন না। একটা গা ছাড়া ভাব থাকত। যেটা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হত সে কথাই তারা শুনতেন। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম হল। আমি যাই বলতাম মিস্টার ক্লার্ক তাই যেন লুফে নিতেন। আলোচনার এক পর্যায়ে আমি সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিষয়টি টেনে আনলাম। সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ ছিল। অধিকার রক্ষার নামে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদের হাতে সব ক্ষমতা অর্পন করা হয় ওই পরিকল্পনায়। এতে রাজনীতিতে শ্বেতাঙ্গদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। আমি এ বিষয়টির ঘোর বিরোধিতা করি।

প্রেসিডেন্টকে বললাম, সরকার ওই নীতি বহাল রাখলে কখনই দেশ থেকে বর্ণবাদ উচ্ছেদ করতে পারবে না। অথচ বহির্বিশ্বের ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল পার্টির সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বেশ আশার সঞ্চার হয়েছে। তারা বর্ণবাদকে কবর দিতে যাচ্ছে বলেই বিশ্ববাসী মনে করছে। প্রেসিডেন্টকে বললাম, এএনসি কখনই বর্ণবাদের পক্ষ নয়। গায়ের রং দিয়ে তারা কিছু বিচার করে না। এএনসি সবার সমান অধিকার চায়।

মিস্টার ডি ক্লার্ক ওই দিন তেমন কিছুই বললেন না। তিনি আমার কথা, দাবি ও যুক্তিতর্ক শুনে গেলেন শুধু। তিনি কোন বিতর্কে জড়ালেন না। শুধু বললেন, আপনাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমার কোন দ্বিমত নেই। আপনারা যা চান আমিও তাই চাই। তার কথায় আমি মুগ্ধ হই।

এরপর আমার মুক্তির বিষয়টি উল্লেখ করে বলি, তিনি যদি মনে করেন আমি মুক্তি পেয়ে ঘরে বসে থাকব তাহলে বড্ড ভুল করবেন। যে অবস্থায় আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে অবস্থা বহাল রেখে আমাকে মুক্তি দেয়া হলে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা আমার কাছে থাকবে না। আমি তাকে এএনসির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি এবং নির্বাসিতদের দেশে প্রত্যাবর্তনের দাবি জানাই। আমার মুক্তির পরও যদি এএনসি নিষিদ্ধ থাকে তাহলে মুক্তির পর ফের আমি নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব। তখন আপনি ফের আমাকে গ্রেফতার করতে পারবেন।

এ কথাগুলোও তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, আমার উপদেশে তিনি মোটেও বিস্মিত হলেন না। বৈঠক শেষের আগে ক্লার্ক আমাকে বললেন, তিনি সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। তবে এ মুহূর্তে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না। তবে তার সঙ্গে মিসেস থ্যাচার ও গর্বাচেভ কাজ করছেন। এ ব্যাপারে তারা তাকে সহযোগিতা করবেন।

৯৯

১৯৯০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক পার্লামেন্টে ভাষণ দেন। এটা ছিল প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর পার্লামেন্টে তার প্রথম ভাষণ। এই ভাষণে তিনি এমন কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন যা এর আগে কোন প্রেসিডেন্ট করেননি। তিনি মনে প্রাণে বর্ণবাদের অবসান চাইতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতন্ত্র চাইতেন। প্রথম ভাষণে তারই প্রতিফলন ঘটান। নাটকীয়ভাবে তিনি এএনসি, প্যাক ও দক্ষিণ আফ্রিকান কমিউনিস্ট পার্টিসহ নিষিদ্ধ আরও ৩১টি রাজনৈতিক দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। রাজনৈতিক বন্দিদের ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দেন। মৃত্যুদণ্ড রহিত করেন। জরুরী অবস্থা আংশিক প্রত্যাহার করেন এবং আলোচনা শুরুর ঘোষণা দেন।

এটা ছিল একটা শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত। তার ঘোষণার পরপরই যেন গোটা দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। রাতারাতি আমাদের পৃথিবীতে পরিবর্তন আসে। ৪০ বছর পর এএনসি আবার বৈধ দল হিসেবে মাঠে আত্মপ্রকাশ করে। প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পর আমিসহ এএনসির অন্য নেতাদের

বন্দি রাখার আর কোন অবকাশ ছিল না। সারা দেশ এএনসির সবুজ-হলুদে ছেয়ে যায়। ব্যানারে ফেস্টুনে ভরে যায় দেশ। ৩০ বছর পর আবার আমার ছবি শোভা পায় নানা জায়গায়। দক্ষিণ আফ্রিকার পত্র-পত্রিকায় আমার ও আমার সহযোদ্ধাদের ছবি ছাপা শুরু হয়। এ সাহসী পদক্ষেপ নেয়ায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের ভুয়সী প্রশংসা করে।

ডি ক্লার্ক পার্লামেন্টে ভাষণ দেয়ার ৭ দিন পর ৯ ফেব্রুয়ারী আমাকে ফের টুইনহাউসে যেতে বলা হল। সন্ধ্যা ৬টায় প্রেসিডেন্টের অফিসে পৌছলাম। তিনি একগাল হেসে আমাকে স্বাগত জানান। জড়িয়ে ধরেন। এরপর জানান, আগামীকাল আমাকে মুক্তি দেয়া হবে। অবশ্য এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্ব মিডিয়ায় আমি শিগগিরই মুক্তি পাব বলে প্রচার করা হয়। প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় আমি বিস্মিত হই। স্বল্প সময়ের জন্য ভাষা হারিয়ে ফেলি। আমি ভাবতেই পারিনি প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্ক এই খবরটি বলার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ডি ক্লার্ক আমাকে বলেন, কাল থেকে আপনাকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে দেখতে চাই।

ডি ক্লার্কের মুখে মুক্তির কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। রক্তে শিহরণ জাগল। মাথা যেন ঘুরতে শুরু করল। মনে হল তখনি কারাগার থেকে বেরিয়ে আসি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম ওই কাজ করা উচিত হবে না। পরে ক্লার্ককে ধন্যবাদ জানালাম। বর্ণবাদের অবসান ঘটানোর মত বিশাল ঝুঁকি নেয়ায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তখন মুক্তি দেয়া হলে ঝামেলা হতে পারে। এছাড়া মুক্তির ব্যাপারে পরিবারের লোকজন ও দলীয় সদস্যদের একটা প্রস্তুতির ব্যাপার ছিল। তাই প্রেসিডেন্ট ক্লার্ককে আমার মুক্তির সময় এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিতে বললাম। ভাবলাম, ২৭ বছর যখন জেলখানায় থাকতে পেরেছি তখন আরও ৭টা দিনও পারব।

ডি ক্লার্ক আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না। এর পরিবর্তে তিনি আমার মুক্তির পরিকল্পনা বলতে থাকেন। তিনি জানান, সরকার আমাকে জোহান্সবার্গ নিয়ে যাবে। সেখান থেকে আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি দেয়া হবে। ক্লার্ক আরেকটু এগুনোর আগেই আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। বললাম, আমি ভিক্টর ভারস্টার জেলখানা থেকেই মুক্তি পেতে চাই। ওখান থেকে মুক্তি পেলে এতদিন যারা আমার দেখা শুনা করেছেন তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারব। এছাড়া কেপটাউনের লোকজনকেও আমি শুভেচ্ছা জানাতে পারব। আমি জোহান্সবার্গের

লোক হলেও কেপটাউনে তিন দশকের বেশি সময় কাটিয়েছি। আমি জোহান্সবার্গ যাব। তবে সরকারের কথা মত নয়। আমার ইচ্ছে অনুসারে।

এবার ডি ক্লার্ক আমাকে থামিয়ে দিলেন। অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য রুমের বাইরে গেলেন। ১০ মিনিট পর ফিরে এলেন। বললেন, ম্যান্ডেলা এখন আর পরিকল্পনা বদলানোর অবকাশ নেই। আমি বললাম, আপনাদের ওই পরিকল্পনা মেনে নেয়া সম্ভব না। আমি এক সপ্তাহ পর ভিক্টর ভারস্টার জেল খানা থেকেই মুক্তি পেতে চাই। জোহান্সবার্গ থেকে নয়।

ডি ক্লার্ক আবারও আমার কাছে বলে সামান্য সময়ের জন্য রুমের বাইরে গেলেন। সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ১০ মিনিট পর রুমে ফিরে এলেন। বললেন, হ্যাঁ, আপনাকে ভিক্টর ভারস্টার জেলখানা থেকেই আমি মুক্তি দিব। তবে মুক্তির সময় পেছানো যাবে না। সরকার ইতিমধ্যেই দেশী-বিদেশী মিডিয়াকে জানিয়ে দিয়েছে যে আপনি আগামীকাল মুক্তি পাচ্ছেন।

এখন আর মুক্তির সময় নিয়ে যুক্তিতর্ক করা চলবে না। আমিও ভাবলাম এখন আর দরকষাকষি করা ঠিক হবে না। আমরা দুজনে শেষে একটা সমঝোতায় পৌছলাম। আমাদের জন্য অনেক হুইস্কি নিয়ে আসা হল। দুজনেই গ্লাসে ঢেলে তা পান করলাম। ওই সময় আমার অবস্থা ছিল খুবই ভালো।

মধ্যরাত পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে আড্ডা দিলাম। আমার কুটিরে গেলাম মধ্যরাতের পরে। এরই মধ্যে আমার সহকর্মীদের জানিয়ে দিলাম যে কাল আমি কেপটাউন শহর থেকে মুক্তি পাচ্ছি। উইনিকেও খবরটি পৌছাতে সক্ষম হলাম। জোহান্সবার্গে অবস্থানরত ওয়াল্টারের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করলাম। পরদিন তার চার্টার্ড বিমানে উড়ে এলেন কেপটাউনে। এরই মধ্যে এএনসি আমাকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য জাতীয় সংবর্ধনা কমিটি গঠন করে। ওই রাতে আমার বেশ ঘুম হল। মুক্তির আগে সেটা ছিল জেলখানায় আমার শেষ রাত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মুক্তি

রাতে কয়েকঘণ্টা ঘুম হল। ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে ঘুম থেকে উঠলাম। কেপটাউনে ১১ ফেব্রুয়ারির ওই সকাল ছিল রোদ ঝলমল। ঘুম থেকে উঠে রোজকার মত আজও হাল্কা-পাতলা ব্যায়াম করলাম। হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা সারলাম। এরপর এএনসি ও ইউডিএফের কয়েকজন নেতাকে ফোন করলাম। মুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও বক্তৃতার কপি তৈরির কাজটি শেষ করার পর তাদেরকে আমার কুটিরে আসতে বললাম। এরই মধ্যে কারাগারের ডাক্তার আসলেন। আমাকে আগাগোড়া চেকআপ করলেন।

আমাকে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলির ব্যাপারে একটা সমাধানেও পৌঁছতে হল। সংবর্ধনা কমিটির সদস্য ক্রিল রামাফোসা ও ট্রেভর ম্যানুয়েল সকাল সকাল আমার কুটিরে চলে এলেন। মুক্তির পর প্রথম বক্তৃতাটি আমি পার্লে দিতে চাইলাম। পার্লের অধিবাসীরা শ্বেতাঙ্গ হলেও আমার প্রতি তাদের প্রচণ্ড সহানুভূতি ছিল। কিন্তু সংবর্ধনা কমিটির সদস্যরা এতে আপত্তি করলেন, তারা বললেন, পার্লে প্রথম বক্তৃতা দেয়া হলে তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিতে পারে। সন্দেহ উঁকি ঝুঁকি দিতে পারে। তার চেয়ে বরং কেপটাউনের বিশাল সমাবেশে বক্তৃতা করাই ভালো।

মুক্তির আগে আরেকটি বিষয় সুরাহা করতে হলো। সেটি হলো মুক্তি পাওয়ার পর প্রথম রাতটি কোথায় কাটাব। আমার ইচ্ছে ছিল কেপটাউনের লোকদের প্রতি সংহতি প্রকাশের জন্য ওই রাত এ শহরেরই কোন ফ্লাটে কাটানো। কিন্তু আমার সহকর্মী এমনকী স্ত্রী উইনি পর্যন্ত এতে আপত্তি করলেন। তারা বললেন, নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে আমার আর্চবিশপ ডেসমন্ড টিটুর বাসায়ই রাত্রি যাপন করা উচিত। টিটুর বাসা ছিল শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত বিশপকোর্টে। জেলে যাওয়ার আগে এখানে কিছুদিন ছিলাম।

জেলখানার লোকজন আমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দিল। জেল জীবনের প্রথম ২০ বছর আমার তেমন কিছু ছিল না। পরবর্তী কয়েক বছরে অনেক জিনিসপত্র জমে যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বই ও সংবাদপত্র। সব মিলিয়ে ১০/১২টি বাক্স ভরে যায় এসব জিনিসপত্রে।

আমার মুক্তির নির্ধারিত সময় ছিল বিকেল ৩টা। কিন্তু দুপুর দুটা বেজে গেলেও তখন পর্যন্ত ওয়াল্টার ও উইনি চার্টার্ড বিমানে করে জোহান্সবার্গ থেকে এখানে এসে পৌছেনি। এরই মধ্যে জেলখানা এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। চারদিকে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়। তারা সবাই আমাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে।

ওয়ারেন্ট অফিসার স্টুয়ার্ট আমাদের জন্য শেষ খাবার তৈরি করে। বিগত দুই বছর ধরে আমার রান্নাবান্না ও সঙ্গ দেয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ দেই। আরেক ওয়ারেন্ট অফিসার জেমস গ্রেগরিও সেখানে ছিলেন। তিনিও আমার যত্ন নিতেন। তাকে জড়িয়ে ধরে বিদায় নেই। পুলসমোর থেকে ভিক্টর ভারস্টার পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। এ সময় আমরা রাজনীতি ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে আলোচনা করতাম। দীর্ঘ সাড়ে ২৭ বছরের বন্দি জীবনে স্টুয়ার্ট, গ্রেগরি ও ওয়ারেন্ট অফিসার বার্নার্ডের মতো লোকেরা আমার মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও মানবিকতাকে আরও শক্তিশালী করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

আমাকে বিদায় জানানোর প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ দীর্ঘ। অথচ হাতে সময় ছিল খুব কম। পরিকল্পনা ছিল উইনি ও আমি জেলখানা গেটের সামনে থেকে গাড়িতে করে রওনা দেব। জেলখানার প্রহরী, কারারক্ষী ও অন্য যারা আমার দেখাশুনা করেছেন তাদেরকে যেন বিদায় জানাতে পারি সে ব্যবস্থা করে রাখার জন্য আমি আগেই বলেছিলাম। আমি তাদের ছেলে-মেয়ে বউকে পর্যন্ত জেলখানার গেটে থাকতে বলি যাতে তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারি।

তিনটা বাজার কয়েক মিনিটের মাথায় একটি চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ফোন করা হয়। এসএবিসি নামের ওই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয় আমি যেন জেল গেট থেকে বেরিয়ে এক-দেড়শ ফুট হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠি। কারণ ওই দৃশ্য তারা ফিল্মে সংযোজন করবেন। আমি তাদের প্রস্তাবে রাজি হই।

বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। আনুষঙ্গিক আনুষ্ঠানিকতাও আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। সংবর্ধনা কমিটির লোকদের বললাম, আমার লোকেরা দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে আমাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে

অপেক্ষা করছে। তাদেরকে আমি আর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি না। চারটা বাজার কিছুক্ষণ আগে ছোট একটি মোটর গাড়িতে করে আমি ও উইনি রওনা দিলাম। গেটের সিকি মাইল আগে গাড়ি থামল। উইনি ও আমি গাড়ি থেকে নেমে জেল গেটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

সামনে কি হচ্ছে প্রথমে তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু গেটের ১৫০ ফুট বা কাছাকাছি পৌঁছে আমি বিশাল জনতা দেখে অবাক হয়ে যাই। রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের শত ক্যামেরাম্যানে চারদিক গিজ গিজ করছিল। হাজারো জনতার হর্ষধ্বনি আমার কানে আসতে লাগল। আমার জন্য এ ধরণের সংবর্ধনা অপেক্ষা করছে সেটা আমি ভাবতেও পারিনি।

গেটের ২০/২৫ ফুট কাছে পৌঁছামাত্র ক্যামেরার ক্লিক শুরু হল। ফ্লাশের ঝলকানিতে চারদিক যেন আলোকিত হয়ে উঠল। জয়ধ্বনিতে চারদিক প্রকম্পিত হতে থাকে। শুরু হয় সাংবাদিকদের প্রশ্নবান। একের পর এক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকে তারা। টেলিভিশন ক্যামেরাম্যানরা ছুটাছুটি শুরু করে। আমার দৃশ্য ধারণের জন্য তারা বলতে গেলে মরিয়া হয়ে ওঠে।

এএনসির সমর্থকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে শ্লোগান জয়ধ্বনি শুরু করে। অনেকে ধরে গান। নাচে গানে মুখরিত হয় গোটা এলাকা। টিভি ক্যামেরাম্যানরা যখন আমার মুখের সামনে লম্বা ও কালো একটি জিনিস এনে ধরে তখন আমি কিছুটা বিব্রত হই। জেলখানায় থাকা অবস্থায় এই নতুন যন্ত্রটি আবিস্কৃত হল কিনা উইনির কাছে জানতে চাইলাম। উইনি বলল, ওটা মাইক্রোফোন।

জনতার মাঝে পৌঁছে আমি দু'হাত উঁচু করলাম। সবাই শ্লোগান শুরু করল। মানুষের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আমাকে অভিভূত করল। তাদের মাঝে কতক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এর পর কেপটাউনে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠলাম। এই গণসংবর্ধনা আমাকে দারুণভাবে অভিভূত করল। আমার বয়স ৭১ বছর হলেও আমার মনে হচ্ছিল আমি এইমাত্র নতুন করে জন্ম নিলাম। আমার জেলজীবনের হাজার দিন এখন অতীত। কেবলই স্মৃতি।

জেলখানা থেকে কেপটাউন শহর ছিল ৩৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে। জেলগেটে এলাকায় অপ্রত্যাশিত ভীড়ের কারণে ড্রাইভার বিকল্প পথে শহরের দিকে যেতে শুরু করল। আমরা জেলখানার পেছন দিক দিয়ে সরু রাস্তা বেয়ে শহরের দিকে যাত্রা করলাম। চারদিকের সবুজ গাছপালা আমাকে মুগ্ধ করল।

আমাদের মোটর শোভাযাত্রা চলতে লাগল। রাস্তার দু'দিকে মানুষের ভীড়। শ্বেতাঙ্গরাও জড়ো হল সে ভীড়ে। অনেক স্থানে রাস্তার দু'পাশে শ্বেতাঙ্গরা

সপরিবারে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিনন্দন জানালো। তাদের বদান্যতা আমাকে মুগ্ধ করল। আমরা বিকল্প পথে যাচ্ছি রেডিওতে এ খবর শুনে তারা এ রাস্তায় এসে জড়ো হয়। তাদের অনেকের হাতে ছিল আমার বড় ছবি।

রক্ষণশীল একটি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় আমি গাড়ি থামাতে বলি। গাড়ি থেকে নেমে সমবেত অনেক শ্বেতাঙ্গকে জড়িয়ে ধরি। আমার প্রতি সমর্থন প্রকাশ করায় ধন্যবাদ জানাই। তাদের সমর্থন আমাকে কতটা অনুপ্রাণিত করেছে সেটা বলি। শ্বেতাঙ্গদের ভালবাসা দেখে মনে হল আমি ভিন্ন এক দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে এসেছি।

শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে জনস্রোত চোখে পড়ল। সবাই ছুটছিল কেপটাউনের গ্রান্ড প্যারেড স্কয়ারের দিকে। সংবর্ধনা কমিটি এখানে আমার জন্য বিশাল এক গণসংবর্ধনার আয়োজন করে। এটি পুরনো সিটি হলের সামনের বিশাল এক খোলা প্রাঙ্গন। সিটি হলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার ভাষণ দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। এখানে সকাল থেকে লাখ লাখ লোক আমার বক্তৃতা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল। জনস্রোতের ধকল সামাল দিতে সামনের দিক দিয়ে না গিয়ে আমরা পেছনের দিক দিয়ে সিটি হলে প্রবেশের পরিকল্পনা করি।

কেপটাউনে পৌঁছতে আমাদের ৪৫ মিনিট লেগে গেল। গ্রান্ড প্যারেড স্কয়ারের সামনে পৌঁছতে দেখি মানুষ আর মানুষ। জনসমুদ্র দেখে ড্রাইভার অন্যদিকে গাড়ি বাঁক নেয়ার চেষ্টা করতেই হাজার হাজার জনতা ছুটে আসে গাড়ির দিকে। মুহূর্তের মধ্যে জনতার মাঝে গাড়ি যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। তারা গাড়ি ঘিরে নাচানাচি করতে থাকে। অনেকে গাড়ির ওপরে উঠে লাফালাফি করতে থাকে। জনতার ভীড় দেখে ভয় পেয়ে যাই। মনে হচ্ছিল মানুষের বাধভাঙ্গা ভালবাসা হয়তো এখন আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

উইনি ও আমার চেয়ে ড্রাইভার বেশি আতংকিত হয়ে পড়ল। মানুষের ভীড়ের চাপে গাড়িটিই চ্যাপ্টা হয়ে যায় কিনা সে ভয়ে এক পর্যায়ে ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে এল। আমি তাকে শান্ত এবং গাড়ির ভিতরে থাকতে বললাম। গাড়ির পেছনে থাকা অন্যেরা আমাদের উদ্ধারে এগিয়ে এল। এ্যালান বোয়েসাক ও অন্যরা ভীড় সরিয়ে আমাদের গাড়ি চলার পথ পরিষ্কার করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু খুব যে সফল হলেন তা বলা যাবে না।

আমরা ভিতরে বসে রইলাম। একবার গাড়ির দরজা ফাঁক করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। জনতার চাপে দরজাও খোলা সম্ভব হল না। এভাবে দীর্ঘ এক ঘণ্টা হাজারো জনতার ভীড়ের মাঝে বন্দি হয়ে রইলাম। মঞ্চে বক্তৃতা করার সময় পার হয়ে গেল অনেক আগেই।

পরে দলের কয়েক ডজন যুবক কর্মী এগিয়ে এলেন। তারা প্রানান্তকর চেষ্টা করে ভীড় সরিয়ে গাড়ি চলার একটা পথ করলেন। পথ পরিষ্কার হওয়া মাত্র ড্রাইভার দ্রুত বেগে ছুটলেন। ড্রাইভারকে রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাচ্ছ? সে বলল জানি না। কথাটা বলল বেশ রাগান্বিত স্বরে। গাড়ি চলতে লাগল অজানা গন্তব্যের দিকে। ড্রাইভারের উত্তেজনা কমার পর আমি তাকে ওই শহরের একটি ভারতীয় অধ্যুষিত এলাকায় যেতে বললাম। সেখানে আমার বন্ধু আবদুল্লাহ ওমর থাকতেন। সৌভাগ্যবশত তখন ওমর ও তার স্ত্রী বাসায়ই ছিলেন। আমাকে দেখে তারা অবাক হলেন। ২৭ বছর পর তাদের সঙ্গে আমার দেখা হল। অথচ আমাকে শুভেচ্ছা না জানিয়ে তারা বললেন, তোমার না এখন গ্রান্ড প্যারেড স্কয়ারে থাকার কথা।

আমরা কিছু কোল্ড ড্রিংকস পান করলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে আর্চবিশপ টুটু ওমরের বাসায় ফোন করলেন। আমার এখানে থাকার খবর তিনি কিভাবে পেলেন ঠিক বুঝলাম না। টুটু কিছুটা বিরক্ত হয়েই বললেন, ম্যান্ডেলা কি করছ। তাড়াতাড়ি গ্র্যান্ড প্যারেডে চলে আস। জনতা তোমাকে দেখার জন্য, তোমার কথা শোনার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছে। তুমি এই মুহূর্তে না আসলে কি যে হবে তা বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়, তুমি এখানে না এলে লংকাকাণ্ড হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি এক্ষুণি আসছি।

আমাদের সমস্যা হল ড্রাইভারকে নিয়ে। সে কিছুতেই গ্রান্ড প্যারেডের দিকে ফিরতে চাচ্ছিল না। যাহোক তাকে ম্যানেজ করে স্বল্প সময়ের মধ্যে সিটি হলে ফিরলাম। এসে দেখি ভবনের চারদিকে মানুষ আর মানুষ। আমি ভবনের উপরে বারান্দায় চলে আসি। এখানে বক্তৃতার জন্য নির্ধারিত স্থানে এসে উপস্থিত হই। জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ি। হাজারো জনতা এ সময় উল্লাসে ফেটে পড়ে। স্লোগানে গোটা এলাকা মুখরিত করে তোলে। করতালির শব্দে কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। ব্যানার পতাকায় ছেয়ে যায় গোটা এলাকা।

জনতার উচ্ছাস-আবেগ কিছুটা কমার পর বক্তৃতা শুরু করি। তাদের উদ্দেশ্যে বলি, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ আজকের এই শান্তি, সংহতি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য আপনাদেরকে শুভেচ্ছা। আমি এখানে কোন মহামানব হয়ে হাজির হইনি। আপনাদের সেবক হয়ে হাজির হয়েছি। আপনাদের নিরলস চেষ্টা ও বীরোচিত ত্যাগের ফসল আজকের এই দিনটি।

আমার জীবনের বাকিটা সময় আপনাদের জন্যই ব্যয় করতে চাই। আমার জীবন আপনাদের জন্য উৎসর্গ করলাম। আমার মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করায় বিশ্বের

সব দেশের লোকদের ধন্যবাদ জানালাম। কেপটাউনের লোকেরা আমার মুক্তির জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তাদের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। অলিভার টিম্বু, আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি), আমখান্তু উয়ি সিজউয়ি (এমকে), সাউথ আফ্রিকান কমিউনিস্ট পার্টি, ইউডিএফ, সাউথ আফ্রিকান ইয়ুথ কংগ্রেস, মেস ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট, কোসাটু, ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকান স্টুডেন্টস, ব্লাক শাসসহ সব দলকে তাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের জন্য ধন্যবাদ দিলাম। আমার জন্য দীর্ঘদিন অনেক কষ্ট করায় হাজারো জনতার সামনে উইনিকে ধন্যবাদ জানাই।

সরকারের সঙ্গে আমার আলোচনার বিষয়টি জনতার কাছে খোলাসা করা প্রয়োজন বলে মনে করলাম। তাই বক্তৃতায় বললাম, সরকারের সঙ্গে আমার আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেশের রাজনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক করা। সশস্ত্র সংগ্রাম অবসানের জন্য শিগগিরই সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করি। এএনসির ১৯৮৯ সালের ঘোষণা বাস্তবায়নের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করি। সরকারের উদ্দেশ্যে বলি, তাদেরকে অবশ্যই জরুরি অবস্থা পুরোপুরি তুলে নিতে হবে এবং সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে। জনতার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের ভূয়সী প্রশংসা করে বলি, দেশের অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য তিনি যা করছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য কোন রাষ্ট্রনেতা এ পর্যন্ত তা করেননি। তিনি ঐক্য ও সংহতির প্রতিক। একজন অসাধারণ মানুষ। আন্দোলনের ব্যাপারে বলি, আমাদের আন্দোলন শেষ হয়ে যায়নি। তবে এবার আন্দোলন হবে ভিন্ন কায়দায়। আমি এএনসির একজন সুশৃংখল সদস্য। তাই আমাদের আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখলভাবে।

বক্তৃতা শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। গাড়িতে করে বিশপকোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। গাড়ি বহর যাওয়ার সময় রাস্তার দু'ধারে হাজারো জনতা আমাকে শুভেচ্ছা জানান। এসময় তাদের কন্ঠে ছিল জাতীয় সংগীত। দেখতে দেখতে আর্চবিশপ টুটুর বাসায় এসে হাজির হই। পরিবারের লোকজন আমাকে স্বাগত জানান। এমন সময় বলা হল, আমার ফোন এসেছে সুদূর স্টকহোম থেকে। বুঝলাম এটা অলিভার টিম্বু ছাড়া অন্য কারো ফোন নয়। টিম্বুর গলা ছিল চিকন। তিনি স্টকহোমে গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে। ১৯৮৯ সালের আগস্টে স্ট্রোক করার পর থেকেই তিনি ওখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শিগগিরই আমাদের সাক্ষাৎ হবে বলে তাকে জানাই।

১০১

মুক্তি পাবার পর বিকেলে প্রেস কনফারেন্স করলাম। সকালে আমার সহকর্মীরা এলেন। পরবর্তী কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করলেন। আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে হাজার হাজার অভিনন্দন বার্তা ও টেলিগ্রাম আসতে লাগল। সেগুলো গ্রহণ করতে করতে রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীরাও শুভেচ্ছাবার্তা পাঠালেন। এত সব অভিনন্দন বার্তার মধ্যে কেপটাউনের এক গৃহিণীর বার্তাটি আমার আজও মনে পড়ে।

তিনি লিখেছিলেন, আপনি মুক্ত হওয়ায় আমি ভীষণ খুশি। আপনি আবার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের মাঝে ফিরে এসেছেন দেখে আমি পুলকিত। কিন্তু গতকাল আপনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন সেটা আমার ভালো লাগেনি। অনেকটা বিরক্তিকর মনে হয়েছে।

আমি সেদিন যে সংবাদ সম্মেলন করলাম জেলে যাওয়ার আগে এ ধরণের সংবাদ সম্মেলন করিনি। পুরনো দিনের সংবাদ সম্মেলনে টেলিভিশন ক্যামেরা ছিল না। এছাড়া এএনসির সংবাদ সম্মেলন হত গোপনে। ওই বিকেলের সংবাদ সম্মেলনে অনেক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সাংবাদিকরাও এতে অংশ নেন। কোন সাংবাদিকের প্রশ্ন রেখে কোন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব দিব তা ভেবে উঠতে পারছিলাম না।

সরকারের সঙ্গে কোন গোপন সমঝোতা করে বেরিয়েছি কিনা সে ব্যাপারে অনেকের সন্দেহ ছিল। সরকারের সঙ্গে আলোচনায় আমার ব্যক্তিগত ভূমিকাটা কেমন ছিল সেটা নিয়েও অনেকের বেশ আগ্রহ ছিল। আমি সাংবাদিকদের জানাই, এএনসি বাইরে থেকে যে ভূমিকা রেখেছে জেলে থাকা অবস্থায় আমিও অনেকটা সে ধরণের ভূমিকা পালন করেছি। এএনসি ও আমার কাজের মধ্যে কোন ফারাক নেই।

সাংবাদিকদের জানাই সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি আমার সমর্থন এখনও আছে। আবার সরকারের সঙ্গে আলোচনাকেও আমি প্রচণ্ডভাবে সমর্থন করি। এ দুয়ের মধ্যে আমার ভূমিকা নিয়ে কোন বিরোধ নেই। সশস্ত্র সংগ্রামের কারণে সরকারের সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে যেতে পারে বলে অনেকে মন্তব্য করেন। জবাবে আমি বলি, সরকার এএনসির উপর সহিংসতা চাপিয়ে না দিলে তারা কখনও সহিংস আন্দোলন করবে না। শান্তির পথে এগুবে।

এএনসির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলেও কৃষ্ণাঙ্গদের রাজনৈতিক অধিকার তখনও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিষয়টির প্রতি নজর দেয়ার জন্য এবং জেল থেকে সব বন্দিকে ছেড়ে দেয়ার জন্য আমি সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাই। শ্বেতাঙ্গদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও ভীতি নিয়েও আমাকে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে বলি, অনেকেই মনে করতে পারেন শ্বেতাঙ্গরা দীর্ঘদিন আমাকে বন্দি করে রাখায় আমি তাদের ওপর বেজায় খেপা। আসলে বিষয়টি ঠিক নয়। জেলে থাকা অবস্থায়ই শ্বেতাঙ্গদের ওপর থেকে আমার রাগ-ক্ষোভ পড়ে যায়। দেশের প্রয়োজনে কোন শত্রুকেও আপন করে নিতে আমার আপত্তি নেই।

সংবাদ সম্মেলনে আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেই, মুক্তি পাওয়ার আগেও আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার অকল্যাণ চাইনি। দেশকে ধ্বংস করতে চাইনি। এখনও চাই না। শ্বেতাঙ্গদের দেশ থেকে তাড়ানো হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে গলা টিপে হত্যা করার শামিল। শ্বেতাঙ্গরাও দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা। এদেশের সুখ-দুঃখ, ভালো মন্দের শামিল। তাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, তারা এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। শ্বেতাঙ্গরা দেশের যে প্রভূত উন্নতি করেছে তার জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের ভয় পাবার বা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগার কোন অবকাশ নেই। বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাস করেন না এমন লোকদের নিয়েই আমরা এগিয়ে যেতে চাই।

আমাদের আন্দোলন হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য। বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্য। শ্বেতাঙ্গদের সাথে নিয়ে আমরা বর্ণবৈষম্যহীন এমন এক দক্ষিণ আফ্রিকা গড়ে তুলব যেখানে সবাই নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে লক্ষ্য করলাম সাংবাদিকরা প্রথম থেকেই আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারা জানার জন্য বেশ উদগ্রীব ছিলেন। অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এএনসি কিভাবে সমন্বয় করবে সেটাও তারা জানতে চাইছিলেন। তাদের প্রশ্ন শুনে আমি অতীতে ফিরে গেলাম। আমাকে জেলখানায় নেয়ার সময় সাংবাদিকরা তেমন কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারেননি সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে। এমনকি আমার স্ত্রী ও পরিবারের লোকজন সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করতে পারতেন না।

সংবাদ সম্মেলনের পর জোহান্সবার্গ থেকে আর্চবিশপ টুটুর স্ত্রী আমাকে টেলিফোন করলেন। আমাদেরকে জোহান্সবার্গ যেতে বললেন। উইনি ও আমার পরিকল্পনা ছিল কেপটাউনে কিছুদিন কাটানো। বুঝলাম জোহান্সবার্গের লোকজন

আমাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। শিগগিরই না গেলে বিশৃংখলা দেখা দিবে। ওই দিন বিকেলে আমরা জোহান্সবার্গের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম।

এরই মধ্যে আমাকে জানানো হল আমাদের ওরল্যান্ডো ওয়েস্টের ৮১১৫ নম্বর বাসার আশপাশে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে। তারা আমাকে দেখতে চায়। আমাদের ওরল্যান্ডোর ওই বাড়িটি ঠিকঠাক করা হয়েছিল। তাই ওই রাতটা পুরনো বাড়িতেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। মুক্তি পাবার পর আমার দ্বিতীয় রাতটি কাটল এই বাড়িতে। পরের দিন সকালে হেলিকপ্টারে করে সোয়েটোর ন্যাশনাল ব্যাংক স্টেডিয়ামে পৌঁছলাম। কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত এ শহরে তখনও বৈষম্যের ছাপ ছিল। অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানকার রাস্তাঘাট বাড়ি ঘর ছিল অনুন্নত।

স্টেডিয়ামে আমার বক্তৃতা শোনার জন্য ১ লাখ বিশ হাজার লোক জড়ো হয়েছিল। আমাকে পেয়ে জনতা উল্লসিত হল। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলি। সোয়েটোতে ফিরতে পেরে আজ আমার মন আনন্দে ভরে গেল। একই সঙ্গে আপনাদের বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশার কথায়ও বেশ কষ্ট পেলাম। আমি শুনেছি আপনারা এখনও মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এখানে পর্যাপ্ত বাড়ি ঘর নেই। নেই প্রয়োজনীয় স্কুল কলেজ। বেকারত্বের হার অনেক বেশি। এখানে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডও বেশি। সুয়েটোর একজন হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আপনাদের এসব সমস্যার কথা শুনে সত্যিই ব্যথিত হয়েছি। আমি জরুরী ভিত্তিতেই এ শহর থেকে সব রকম অপরাধ দূর ও আপনাদের জীবন-মান উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেব।

রাতে উইনিকে নিয়ে ওরল্যান্ডোর ৮১১৫ নম্বর বাড়িতে গেলাম। জেলখানায় থাকা অবস্থায় এ বাড়িতেই আমার মন পড়ে থাকত। চার রুমের ওই বাসাটি চমৎকারভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। বাড়িটি দেখে প্রথমে অনেকটা চমকে গেলাম। এটা ছিল অনেকটা ভিক্টর ভারস্টার জেলখানার সেই কুটিরের মত যেখানে আমি থাকতাম।

ওই রাতটা ছিল খুবই আনন্দের। রাতের অধিকাংশ সময় ঘুমুতে পারলাম না। অনেক সময় পর্যন্ত গান গাইলাম। আনন্দফুর্তি করলাম।

আমার প্রথম দায়িত্ব ছিল এএনসি নেতৃবৃন্দের কাছে রিপোর্ট পেশ করা। মুক্তি পাবার দুই সপ্তাহ পর ২৭ ফেব্রুয়ারি আমি লুসাকায় যাই। সেখানে এএনসি নির্বাহী কমিটির বৈঠকে যোগ দেই। এটা ছিল এএনসি নেতৃবৃন্দের চমৎকার মিলন মেলা। কয়েক দশক ধরে যাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই তাদের সঙ্গে এ মিটিংএ দেখা হল।

বৈঠকে আফ্রিকার কয়েক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানও যোগদান করেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জিম্বাবুয়ের রবার্ট মুগাবে, জাম্বিয়ার কেনেথ কাউন্ডা, বতসোয়ানার কোয়েট মাসির, মোজাম্বিকের জোয়াকিম সিজানো, এঙ্গোলার হোসে এডওয়ার্ড জোস সান্তোষ এবং উগান্ডার উইরি মুসেভিনি।

আমার মুক্তিতে এএনসির নির্বাহী সদস্যরা দারুণভাবে খুশি হল। তাদের চোখে মুখে নানা প্রশ্নের ছাপ দেখতে পাই। তারা যেন বলতে চাচ্ছিলেন– এটা কি সেই ম্যান্ডেলা যিনি ২৭ বছর আগে কারাগারে গিয়েছিলেন না কি পরিবর্তিত ম্যান্ডেলা। তিনি কি আগের মতই আছেন না অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছেন।

সরকারের সঙ্গে গোপন আলোচনার কথা তাদের অনেকেই শুনেছেন। এ ব্যাপারে তারা তখনও রীতিমত উদ্বিগ্ন ছিলেন। ১৯৮৪ সাল থেকে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। এমনকি কারাগারে যেসব বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল না। এজন্য আমাকে নিয়ে তাদের সন্দেহ-সংশয় তৈরি হয়েছিল।

আমি খুব শান্ত ও বিনীতভাবে সরকারের সঙ্গে আমার আলোচনার বিষয়টি ব্যাখ্যা করি। তাদেরকে জানাই, যেসব দাবি আমি করেছিলাম তার সব কিছুই আদায় করে নিতে পেরেছি। বোথা ও ক্লার্কের সঙ্গে যে স্মারক সই করেছিলাম তারা সেটিতে চোখ বুলায়। এএনসির নীতির সঙ্গে স্মারকের কোন বিরোধ ছিল না। বরং এএনসির দাবি-দাওয়ার প্রতিফলন ছিল ওই স্মারকে। আমি জানতাম আমার আগে যারা মুক্তি পেয়েছেন তারা নিশ্চয়ই সরকারের সঙ্গে আমার আলোচনার বিষয়টিকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। তাই এএনসির ওই বৈঠকে আমি সব কিছু খোলাখুলি আলোচনা করি।

নির্বাহী কমিটির বৈঠকে আমাকে এএনসির ডেপুটি প্রেসিডেন্ট বানানো হল। দলের সাধারণ সম্পাদক আলফ্রেড এঞ্জিওকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব অর্পণ করা হল। অলিভার টিম্বু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আলফ্রেড প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন বলে সিদ্ধান্ত হল। বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলন হল। এএনসির দীর্ঘদিনের সমর্থক জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. কাউন্ডা জানতে চাইলেন, এএনসি সশস্ত্র সংগ্রাম ত্যাগ করবে কিনা।

জবাবে বললাম, যে উদ্দেশ্যে আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম তা এখনও পুরোপুরিভাবে অর্জিত হয়নি। তাই সশস্ত্র আন্দোলন ত্যাগের বিষয়টি এত আগেভাগে বলা যাবে না।

এরপর আমি আফ্রিকা সফর শুরু করি। মুক্তির প্রথম ৬ মাসে অনেক দেশ সফর করি। এ সময় যেখানে গেছি সেখানেই আমাকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানানো হয়। দারুস-সালামে প্রায় ৫ লাখ লোক সমবেত হয় আমাকে এক নজর দেখার জন্য।

কায়রোতে মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের সঙ্গে দেখা করার পরদিন স্থানীয় একটি হলে আমার বক্তৃতা করার কথা ছিল। সমাবেশ প্রাঙ্গনে হাজারো লোক জড়ো হয়। আশপাশের বাড়িগুলো লোকে ছেয়ে যায়। ভবনের উপরে অনেক লোক থাকায় পুলিশ আমাকে সরাসরি হলে যেতে বারণ করে। উইনি ও আমাকে হলের পেছনে একটি কক্ষে একঘণ্টা বসিয়ে রাখে। পুলিশ জানায়, ভবনের ওপর থেকে লোক সরানো না পর্যন্ত তার বের হওয়াটা নিরাপদ হবে না। পুলিশ পরে কর্ডন দিয়ে আমাকে সম্মেলন কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছামাত্র শত শত লোক আমার দিকে ছুটে আসে আমাকে আলিঙ্গন করার জন্য। আমার সঙ্গে করমর্দন করার জন্য। জনতার ভীড়ে পুলিশ কর্ডন ভেঙে যায়। হুড়োহুড়িতে আমি পড়ে যাই। আমার একটা জুতো হারিয়ে যায়। জনতা শান্ত হবার পর আমি জুতো খুঁজলেও পাইনি। উইনিকেও তার আসনে দেখতে পেলাম না। আধঘণ্টা পর উইনি স্টেজে আসে। উইনি জানায়, সেও তার জুতা হারিয়ে ফেলেছেন। চেঁচামেচির কারণে তখনও আমি বক্তৃতা শুরু করতে পারিনি। চারদিকে তখনও উচ্চস্বরে ম্যান্ডেলা ম্যান্ডেলা স্লোগান চলছিল। জনতার চেঁচামেচি কিছুতেই না থামায় আমি ও উইনি চুপচাপ মঞ্চ ছেড়ে চলে আসি। দুজনের পায়েই তখন জুতা ছিল না।

কায়রোতে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে সশস্ত্র আন্দোলন সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে আমি বলি, বিষয়টি সরকারের ওপর নির্ভরশীল। সরকার আন্তরিকতা দেখালে আমরা নিশ্চয় এ পথ ছেড়ে দিব। এএনসি ও সরকার আলোচনার একটি চমৎকার পরিবেশ তৈরি করেছে, আশা করা হচ্ছে ওই আলোচনায় অবশ্যই সফলতা আসবে। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য জরুরী অবস্থা পুরোপুরি প্রত্যাহার, সব রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি এবং নীপিড়ন ও বৈষম্যমূলক সব আইন বাতিলের দাবি জানাই। সরকার এসব দাবি মেনে নিলে এএনসি সশস্ত্র আন্দোলন ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত হবে বলে উল্লেখ করি।

আফ্রিকা সফর শেষে অলিভারের সঙ্গে দেখা করার জন্য স্টকহোমে যাই। আমার বহুদিনের পুরনো বন্ধু। আইনি পার্টনার এই মানুষটিকে দেখে মন ভরে ওঠে। অলিভারের স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো ছিল না। এরপরও দীর্ঘক্ষণ আলাপ করি। পুরনো দিনের অনেক বিষয়ে স্মৃতিচারণ করি। সংগঠনের ব্যাপারে আলোচনা করি। আলোচনার এক পর্যায়ে অলিভার আমাকে বলেন, ম্যান্ডেলা তোমাকে অবশ্যই এএনসির প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিতে হবে। তুমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করলে খুবই আনন্দিত হব।

আমি তার প্রস্তাবে সায় না দিয়ে বলি, প্রবাসে থেকেও আপনি যথেষ্ট ভালোভাবে এএনসির নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। আপনার জায়গায় আমি হলে এত ভালভাবে দলকে পরিচালনা করতে পারতাম না। এছাড়া এভাবে দায়িত্ব অর্পন করাটা গণতান্ত্রিকও নয়। আপনি দলের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। দায়িত্ব অর্পন করতে হলে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অলিভার যে আমাকে এএনসির প্রেসিডেন্ট করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন সেটা তার কথাবার্তায় বুঝলাম। তার উদারতা, মহত্ব, বিচক্ষণতা আমাকে মুগ্ধ করল।

১৯৯০ সালের এপ্রিলে লন্ডনে গেলাম। ওয়েম্বলিতে আমার সম্মানে কনসার্টের আয়োজন করা হয়। এতে অনেক আন্তর্জাতিক শিল্পী অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি বিশ্বজুড়ে প্রচার করা হয়। কনসার্টের অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আমাদের প্রতি সমর্থন ও সংহতি প্রকাশের জন্য বিশ্ববাসীকে ধন্যবাদ জানাই। বর্ণবাদ অবসানে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

১০৩

আমি জেলখানা থেকে বের হবার পর ইকনামা ফ্রিডম পার্টির প্রধান ও কোয়াজুলুর প্রধানমন্ত্রী চিফ মঙ্গোসুথু বুথেলজি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক অঙ্গনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। কিন্তু এএনসির তুলনায় তার জনপ্রিয়তা ছিল খুব কম। বুথেলজি ছিলেন মহান জুলু রাজা সেটি ওয়াইয়োর উত্তরসুরী। সেটি ওয়াইয়ো ১৩৭৯ সালে ইসানদাল ওয়ানার যুদ্ধে ব্রিটিশদের পরাজিত করেছিলেন। বুথেলজি যুবক বয়সে এএনসি ইয়ুথলীগে যোগ দিয়েছিলেন। যুবকদের একটি মিছিলে তাকে একবার দেখেছিলাম। এএনসির সমর্থন নিয়েই তিনি কোয়াজুলুর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। পরবর্তী বছরগুলোতে বুথেলজি এএনসি থেকে দূরে আসেন। তিনি এএনসির সশস্ত্র আন্দোলনেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন।

১৯৭৬ সালে সংগঠিত সোয়েটোগণ অভ্যুত্থানেরও একজন কড়া সমালোচক ছিলেন এই বুথেলজি। তবে তিনি আমার মুক্তি বহুবার দাবি করেছেন। সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে আলোচনারও বিরোধী ছিলেন তিনি।

মুক্তির পর যে কয়জন লোক প্রথমে আমাকে টেলিফোন করেন তাদের অন্যতম ছিলেন বুথেলজি। মতপার্থক্য দূর করার জন্য তার সঙ্গে বৈঠক করার একান্ত ইচ্ছা ছিল আমার। লুসাকা থেকে ফিরে আমি চিফ বুথেলজি ও রাজাকে ফোন করলাম। বললাম, ওয়াল্টার চাচ্ছেন উলানজির পরিবর্তে ননগোমায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

রাজা বললেন, রাজবাড়ি ছাড়া অন্য কোন জায়গায় তিনি ওয়াল্টারের সঙ্গে দেখা করবেন না। কারণ তিনি রাজা। তাকে উলানজিতেই আমন্ত্রণ জানালাম ওয়াল্টারের সঙ্গে বৈঠক করতে। তাকে বললাম, মহামান্য রাজা আমাদের মাঝে একটা বিভেদের দেয়াল তৈরি হয়েছে, আমরা এ দেয়াল ভাঙতে চাই। কিন্তু তিনি ওয়াল্টারের সঙ্গে বৈঠকে বসতে রাজি হলেন না।

এরপর থেকে এএনসির সঙ্গে রাজার সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করল। মে মাসে এএনসি নেতাদের বললাম, আমি রাজা ও বুথেলজির সঙ্গে বৈঠক করতে চাই। এএনসি আমাকে অনুমতি দিল। বৈঠকের এক সপ্তাহ আগে রাজার কাছ

থেকে একটি চিঠি পেলাম। তাতে তিনি বললেন, আমি যেন সম্পূর্ণ একা তার কাছে যাই। এএনসির নির্বাহী পরিষদ আমাকে একা যেতে দিতে রাজি হল না। ফলে আমার সেখানে যাওয়া হল না।

এর মধ্যে নাটাল বধ্যভূমিতে পরিণত হল। ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ইনকাথা সমর্থকরা এএনসির শক্ত ঘাটি নাটাল মিডল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিল। কয়েক ডজন লোক মারা গেল। শত শত লোক আহত হল। বাড়ি ঘর হারাল হাজার হাজার লোক। একমাত্র ১৯৯০ সালেই ওই সংঘর্ষে ২৩০ জন লোক নিহত হল। নাটালে জুলুরাই জুলুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইনকাথারা মারতে শুরু করল এএনসি সদস্যদের।

আমার মুক্তির মাত্র দু' সপ্তাহ পর আমি ডারবান যাই। সেখানকার কিংস পার্কে ১ লাখের বেশি জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করি। এদের অধিকাংশই ছিল জুলু। আমি জুলুদের অস্ত্র ফেলে শান্তির পথে ফেরার আহ্বান জানাই। আমি তাদের বলি, আপনাদের দা কাঁচি ছুরি বন্দুক এগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করুন। মৃত্যুর কারখানা বন্ধ করুন। এখনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। এখন বুঝতে পারছি আমার ওই আহ্বান মাঠে মারা গেছে। লড়াই চলতে লাগল। পড়তে লাগল লাশ।

১০৪

মার্চ মাসে সরকার ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এএনসির আলোচনা শুরু হল। প্রথম মুখোমুখি বৈঠক হয় মিস্টার ডি ক্লার্ক ও সরকারের সঙ্গে। আলোচনা চলা অবস্থায় ঘটে যায় অঘটন। ২৬ মার্চ জোহান্সবার্গের ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত সিবোকেং শহরে কোনরকম উসকানি ছাড়াই পুলিশ এএনসির একটি সমাবেশে গুলিবর্ষণ করে। এতে ২২ জন নিহত ও কয়েক'শ লোক আহত হয়।

যারা গুলি খায় তাদের অধিকাংশের গুলি লাগে পেছনের দিকে। এতে একটি জিনিস স্পষ্ট হয় যে আক্রমণাত্মক নয় বরং পলায়নপর জনতার উদ্দেশ্যে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের পক্ষ থেকে যদিও বলা হয়, নিজেদের জীবন রক্ষার তাগিদে তারা ওই কাজ করে। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশের কাছে কোন অস্ত্র না থাকায় এবং তারা পিছনের দিকে গুলিবিদ্ধ হওয়ায় একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে ওই কাজ করে। পুলিশের ওই গুলিবর্ষণ

আমাকে ও দেশবাসীকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করে তোলে। সংবাদ সম্মেলনে আমি খোলাখুলি বলি, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিটি শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কৃষ্ণাঙ্গদের জঙ্গি ধাঁচের কিছু একটা মনে করে। নির্বাহী কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে আমি সরকারের সঙ্গে চলমান আলোচনা স্থগিত ঘোষণা করি। প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্ককে এই বলে সতর্ক করে দেই যে হাতে রক্ত নিয়ে কোন আলোচনা হতে পারে না। হত্যাকাণ্ড ও আলোচনা এক সঙ্গে চলতে পারে না।

সরকারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা বন্ধ হয়ে গেলেও প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখি। আলোচনা আবার শুরুর ব্যাপারে কেপটাউনে ক্লার্কের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হই। আমাদের আলোচনার মূখ্য বিষয় ছিল স্থগিত আলোচনা ফের শুরুর দিন তারিখ ঠিক করা। আমরা মে মাসে ফের আলোচনা শুরুর সিদ্ধান্ত নেই। আমি পুলিশ ও কৃষ্ণাঙ্গদের সংযত থাকার অনুরোধ জানাই।

প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্ক পরিস্থিতি উন্নতির ব্যাপারে আন্তরিক হলেও শ্বেতাঙ্গ শাসন অবসানে রাজি ছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে। এমন একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করতে যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের পাশাপাশি শ্বেতাঙ্গদের সমান ক্ষমতা থাকে। ক্লার্ক সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটে পার্লামেন্ট গঠনেও রাজি ছিলেন তবে ভোটের মূল ক্ষমতা রাখতে চাচ্ছিলেন শ্বেতাঙ্গদের হাতে। বরাবরই আমি এ ধরণের পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী ছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম সংখ্যা গরিষ্ঠদের ভোটে ব্রিটেন ধাঁচের পার্লামেন্ট করতে। যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোটেই সব কিছু নির্ধারিত হবে।

এর মধ্যে সরকারও নানা খেলা শুরু করল। ইনকাথা ফ্রিডম পার্টি এবং মিশ্রবর্ণের আফ্রিকানদের নিয়ে তারা এএনসি বিরোধী একটি জোট দাঁড় করাল। সরকার মিশ্রবর্ণের লোকদের বোঝাতে চেষ্টা করে যে এএনসি তাদের দেখতে পারে না। এএনসির নীতি তাদের স্বার্থের পরিপন্থী।

মে মাসের প্রথম দিকে সরকারের সঙ্গে প্রথম রাউন্ডের আলোচনা হয়। আলোচনা চলে টানা তিন দিন। আলোচনায় এএনসির প্রতিনিধি দলে ছিলেন ওয়াল্টার সিসুলু, জো স্লোভো, আলফ্রেড এনজিও, থাবো এমবেকি, আহমেদ কাদরাদা, জো মোডিস, রুথ, মমপাথি প্রমূখ। আলোচনা শুরু হয় অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে। তিন দশক ধরে যারা একে অপরের সঙ্গে দৃশ্যত যুদ্ধে লিপ্ত তারা

আলোচনার আগে পরস্পর হাত মেলান, অনেকেই উচ্চস্বরে বলতে থাকেন এ আলোচনা কেন আরো আগে হল না। আলোচনার স্বার্থে সরকার সাময়িকভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জো স্লোভো এবং এমকে কমান্ডার জো মডিসকে ক্ষমা ঘোষণা করে। আলোচনার আগে এই নেতা ও ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল পার্টির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে করমর্দন করেন। অথচ এদেরকে আগে চরমপন্থী তথা দেশের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা হত। প্রথম দিকের আলোচনা শেষে থাবো এমবেকি সাংবাদিকদের জানান আলোচনা অত্যন্ত সফল হয়েছে।

এ আলোচনা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। দেশের ইতিহাস ভিন্ন দিকে বাঁক নেয়ার আলোচনা। আলোচনাকালে আমি বলি। এএনসি এখানে তার দীর্ঘদিনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য পুরণের জন্যই আসেনি, আমরা এসেছি প্রভু-ভৃত্যের অবসান ঘুচাতে। সাদা-কালোর বৈষম্য দূর করতে।

প্রথম দিকের আলোচনা ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে। আমি জানাই এএনসি প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১২ সালে। সেই থেকে আজ অবধি এএনসি আলোচনার দরজা সব সময় খোলা রেখেছিল। প্রতিপক্ষের উদাসীনতার কারণে সে আলোচনা এতদিন হয়নি। জবাবে প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্ক বলেন এজন্য তারা দুঃখিত।

তিনদিনের আলোচনা শেষে উভয়পক্ষ সামনে আরো আলোচনা করার অঙ্গীকার করে। সরকার জরুরি অবস্থা পুরোপুরি তুলে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সংঘাতপ্রবণ নাটাল ছাড়া অন্যসব এলাকা থেকে কয়েকদিনের মধ্যে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়। যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে সেগুলি নিরসনের জন্য যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরিরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সাংবিধানিক ইস্যুতে সরকারকে বলি, আমরা নতুন সংবিধান চাই। ওই সংবিধানে মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতিফলন থাকতে হবে। নির্বাচিত পার্লামেন্ট প্রণয়ন করবে ওই সংবিধান। পার্লামেন্ট নির্বাচনের আগে অন্তবর্তী সরকার গঠন করতে হবে যাতে তারা নির্বাচন পরিকল্পনা করতে পারে। সরকার এখানে খেলোয়াড় বা রেফারি কোন ভূমিকা পালন করতে পারবে না। সব দলকে ডেকে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এরপর অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করতে হবে।

মুক্তির পরপরই আমি কুনুতে যেতে চাইলাম। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে এপ্রিল অবধি সেখানে যাওয়া সম্ভব হল না। জেনারেল বান্টু হলোমিসা এবং ট্রান্সকেই এলাকার নেতাকর্মীরা এপ্রিল মাসে আমার ওখানে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে। কুনুতে আমার মা শুয়ে আছেন। মায়ের কবর দেখার জন্য আমি দীর্ঘদিন ধরে ছটফট করছিলাম।

ট্রান্সকেই যাওয়ার পথে প্রথমে কুনুতে যাই। যেখানে আমার মা ঘুমিয়ে আছেন সে কবরস্থানে প্রবেশ করি। মায়ের কবরটি ছিল খুবই সাদামাটা। চারদিকে তেমন বেষ্টনি ছিল না। সামান্য পাথর ও ইট দিয়ে কবরটি বাঁধানো ছিল কুনুর অন্য কবরের চেয়ে এটি আলাদা কিছু ছিল না। মায়ের মৃত্যুর সময় আমি তার কাছে থাকতে পারিনি। এ কথা মনে হলে আজও আমার বুক বেদনায় ভরে ওঠে। তার জীবদ্দশায় আমার পুরো জীবনটা ছিল অন্যরকম।

নিজের গ্রামে পা রাখলাম বহু বছর পর। গ্রামে কি পরিবর্তন হল কি পরিবর্তন হল না সে চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমার যুবক বয়সে কুনোর লোকজন রাজনীতির সঙ্গে এতটা সম্পৃক্ত ছিল না। আফ্রিকানদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম সম্পর্কে তারা ছিলেন অন্ধকারে। পূর্বপুরুষদের মত জীবনধারণ করত তারা। পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখত না। কিন্তু এখন গ্রামে এসে শুনেছি, স্কুলের বাচ্চারাও নাকি অলিভার টিম্বু ও এমকে যোদ্ধাদের নিয়ে গান গায়। আফ্রিকার আনাচে-কানাচে রাজনৈতিক সচেতনতা কতটা বেড়েছে সেটা দেখে রীতিমত অবাক হয়ে যাই।

গ্রামের মানুষের মধ্যে তখনও সরলতা ছিল। তাদের সরলতা আমাকে শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু গ্রামের মানুষের দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্র আমাকে দারুণভাবে পীড়া দেয়। মনে হল এ অবস্থা থেকে তারা আজও মুক্তি পায়নি। অধিকাংশ লোক এখনও জীর্নশীর্ণ কুটিরে বসবাস করেন। তাদের বিদ্যুৎ নেই, সাপ্লাই পানি নেই। আমার যুবক বয়সে গ্রামের পরিবেশ ছিল ভাল। চারদিক ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পুকুরের পানি ছিল নির্মল। সবুজ গাছপালায় ঘেরা ছিল চারদিক। ছিল বিস্তীর্ণ মাঠ। এখন মনে হল সবকিছু বদলে গেছে। পুকুরে পানি দূষিত হয়ে গেছে। গাছপালা আগের মত চোখে পড়ে না। ক্ষেতের জমিগুলো

ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এখন প্লাস্টিকের বোতলে পানি পাওয়া যায়। আমাদের সময় তা ছিল না। ছেলে বেলায় আমি প্লাস্টিক দেখিনি।

এ মাসে আমি আরেকটি খুব পরিচিত জায়গা পরিদর্শন করি। সেটা হচ্ছে রোবেন দ্বীপ। ২৫ জন এমকে সদস্যের জন্য সরকারের ঘোষিত বিশেষ ক্ষমা প্রস্তাব নিয়ে আমি সেখানে যাই। আট বছর আগে রোবেন দ্বীপ ছাড়লেও এ দ্বীপের স্মৃতি আজও আমার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট। তাড়াহুড়োর কারণে দ্বীপটি ঘোরা হয়নি বললেই চলে। কারণ সরকারি প্রস্তাব নিয়ে এমকে সদস্যদের সঙ্গে আমার দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে হয়। তাদের বোঝাতে হয়।

সরকারের ক্ষমা প্রস্তাবের সঙ্গে এমকে সদস্যদের অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেন। তারা এও অভিযোগ করে যে, এএনসি হারারে ঘোষণা থেকে দূরে সরে গেছে। ওই ঘোষণায় নিঃশর্তভাবে সব রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি ও নির্বাসিতদের দেশে ফেরার দাবি জানানো হয়েছিল। একজন এমকে যোদ্ধা আমাকে বলেন, মাদিবা (ম্যান্ডেলা) আমি সারা জীবন সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। এখন কিভাবে তাদের কাছে ক্ষমা চাইব।

আমি তাদের যুক্তিতর্ক মনোযোগ দিয়ে শুনি। তাদের কথাবার্তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি। তবে তারা যে যুক্তি প্রদর্শন করছে সেটাকে অবাস্তব বলে আখ্যায়িত করি। তাদেরকে বলি, প্রত্যেক সৈনিক যুদ্ধের ময়দানেই তার শত্রুকে পরাস্ত করতে পছন্দ করে। কিন্তু ওই শত্রুকে যদি অন্যভাবে পরাজিত করা যায় সেটা গ্রহণযোগ্য। এখন যুদ্ধ হচ্ছে আলোচনার টেবিলে। সেখানে আমাদের বিজয়ী হতে হবে। জেলে থাকলে কিছুই করা যাবে না। বাইরে গিয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অবশেষে তারা আমার সঙ্গে একমত পোষণ করে এবং সরকারের ক্ষমা প্রস্তাব মেনে নেয়।

জুনের প্রথম দিকে ৬ সপ্তাহের সফরে আমি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা যাই। যাওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের সঙ্গে বৈঠক হয়। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর আরোপিত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেন। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার জন্য আমাকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানানোর অনুরোধ করেন। ডি ক্লার্কের নানা সংস্কারের কারণে ইউরোপ ও আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল– এটা আমি জানতাম। এরপরও ডি ক্লার্ককে বললাম, সাদা-কালোর ব্যবধান পুরোপুরি অবসান না হওয়া পর্যন্ত এবং অন্তবর্তীকালীন সরকার দেশের দায়িত্ব না নেয়া পর্যন্ত ওই আহ্বান আমি জানাতে পারি না। এএনসির নেতাকর্মীরা আমাকে সে অধিকার দেয়নি। আমার এ কথায় ডি ক্লার্ক আশাহত হলেও বিস্মিত হননি।

বিদেশ সফরের শুরুতে উইনি ও আমি যাই প্যারিসে। ফ্রাঙ্কো মিটারেন্ড ও তার সুন্দরী স্ত্রী ড্যানিয়েল আমাদের জন্য বিশাল সংবর্ধনার আয়োজন করেন। তারা দীর্ঘ দিন ধরেই ছিলেন এএনসির সমর্থক। প্যারিস আগের চেয়ে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রাতে শহর জুড়ে যেন আলোর বন্যা বয়ে যায়। ফ্রান্স সফরের সময়ই সে দেশের সরকার জরুরী অবস্থা পুরোপুরি তুলে নেয়ার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। তাদের এই আহ্বান আমাকে বেশ পুলকিত করে।

সুইজারল্যান্ড, ইতালি ও নেদারল্যান্ডে যাত্রাবিরতীর পর আমি ইংল্যান্ডে যাই। এখানে দু'দিন অবস্থান করি। এ সময় ওলিভার ও এ্যাডেলেইডের সঙ্গে দেখা করি। আমার পরবর্তী গন্তব্য ছিল আমেরিকা। সেখানে যাওয়ার আগে মিসেস থ্যাচার আমাকে ফোন করে বলেন, মিষ্টার ম্যান্ডেলা আপনার শিডিউল কাটছাঁট করে আমাদেরকে কিছু সময় দিন। ইউরোপ সফর শেষে তিনি ফের আমাকে লন্ডন আসার অনুরোধ জানান। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করি। কয়েকটি সেমিনারে বক্তৃতা করি।

যুবক বয়সে নিউইয়র্ক সিটি সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছি। এখানে তার বাস্তবতা খুঁজে পেলাম। ইট-পাথর আর গ্লাস ছাড়া এ শহরে অন্য কিছু আছে বলে মনে হল না। লাখ লাখ মানুষ দেখে মনে হল এ শহর কখনও ঘুমায় না বা থামে না। আমি শুনেছি, বর্ণবাদ বিরোধী অনেক সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ হয়েছে এ শহরে।

পরের দিন হারলেম শহরে গেলাম। ১৯৫০ সালে আমি যখন যুবক তখন এ শহর সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছিলাম। হারলেম ছিল মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের তীর্থ ভূমি। দক্ষিণ আফ্রিকান বংশোদ্ভুত অনেক কৃষ্ণাঙ্গ বাস করত এ শহরে। উইনি অনেক কৃষ্ণাঙ্গ দেখে বলল, এটা হচ্ছে আমেরিকার সোয়েটো। এখানকার ইয়াংকি স্টেডিয়ামে বিশাল সমাবেশে আমি ভাষণ দেই। দক্ষিণ আফ্রিকান বংশোদ্ভুত ও মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ ছাড়াও সর্বস্তরের লোকজন সমাবেশে যোগদান করেন। এখানকার পরিবেশ দেখে মনে হল দক্ষিণ আফ্রিকার কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছি। বক্তৃতায় আমি বলি ডব্লিউ. ই. বি. ডু বোয়িস, মার্কাস গার্ভে, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এর মতো মহান নেতারা ছিলেন আমার অনুপ্রেরণার উৎস। জেলখানায় থেকেও বর্ণবাদ, বৈষম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। সমবেত জনতার অনেকের গায়ে বিভিন্ন শ্লোগান লেখা টি-শার্ট ছিল। তাতে লেখা ছিল, কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ায় আমি গর্বিত, কৃষ্ণাঙ্গরা খোদারই সৃষ্টি ইত্যাদি।

মেমফিস ও বোস্টন সফরের পর আমি ওয়াশিংটন যাই। ওখানে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে বক্তৃতা করি। প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশের সঙ্গে একান্তে বৈঠকে মিলিত হই। বর্ণবাদ বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য আমি মার্কিন কংগ্রেসকে ধন্যবাদ জানাই। বর্ণবৈষম্যহীন নতুন দক্ষিণ আফ্রিকা গড়ার ব্যাপারে আমেরিকার সহযোগিতা কামনা করি। মার্কিন কংগ্রেসে আমি বলি, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জর্জ ওয়াসিংটন, আব্রাহাম লিংকন, টমাস জেফারসনের দেখানো পথকে সমর্থন করি। বুশ প্রশাসন দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শিথিলের যে চিন্তাভাবনা করছে তার বিরোধীতা করি। বর্ণবৈষম্য পুরোপুরি বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসকে ওই ধরণের সিদ্ধান্ত না নেয়ার অনুরোধ জানাই।

প্রেসিডেন্ট বুশের সঙ্গে বৈঠকের আগেই তার সম্পর্কে আমার একটি ভাল ধারণা ছিল। মুক্তি পাওয়ার পর যে কয়জন রাষ্ট্রনেতা আমাকে প্রথম দিকে ফোন করেছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট বুশ বরেণ্য ব্যক্তিদের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করেছিলেন তাতে আমার নাম ছিল। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করলেও রাগ হতেন না। তার মতের বিরোধীতা করলেও আসার সময় করমর্দনের আগে হাতটা বাড়িয়ে দিতেন।

আমেরিকা থেকে এরপর যাই কানাডা। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মালরোনির সঙ্গে বৈঠক করি। পার্লামেন্টে ভাষণ দেই। এরপর রওয়ানা দেই আয়ারল্যান্ডের পথে। আটলান্টিক অতিক্রমের পথে আমাদের ছোট্ট বিমানটি জ্বালানী নেয়ার জন্য আর্কটিক সার্কেল নামে একটি প্রত্যন্ত জায়গায় থামে। এখানে তখন ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। বিমানবাহিনীর কিছু লোক ভারী পোশাক গায়ে দিয়ে দাঁড়ানো ছিল। কানাডিয়ান অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম লোকগুলো কারা। উনি বললেন, এরা এস্কিমো। আমার ৭২ বছরের জীবনে এই প্রথম এস্কিমোদের দেখলাম।

ডাবলিন সফর শেষে আবার লন্ডন ফিরে আসি। এখানে মিসেস থ্যাচারের সঙ্গে দীর্ঘ তিন ঘণ্টা বৈঠক হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারে আলোচনা করি।

উগান্ডা, কেনিয়া ও মোজাম্বিকে সংক্ষিপ্ত সফর শেষে জুলাই মাসে দেশে ফিরে আসি। মি. ডি ক্লার্কের সঙ্গে বৈঠকে বসার অনুরোধ জানাই। এ সময় সহিংসতা চরম আকার ধারণ করেছিল। ১৯৯০ সালে সহিংসতায় মৃতের সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়ে যায়। আগের বছরগুলোতে সহিংসতায় যত লোক মারা যায় এ সংখ্যা ছিল তার সমান। এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার তীব্র তাগিদ অনুভব করলাম। দেশ রক্তে ভাসতে লাগল। আমরাও দ্রুত এগুলাম সমস্যা নিরসনের জন্য।

আলোচনায় গতি আনার জন্য জুন মাসে ডি ক্লার্ক জরুরী অবস্থা পুরোপুরি তুলে নিলেন। কিন্তু জুলাই মাসেই নিরাপত্তা বাহিনী এএনসির ৪০ জন সদস্যকে গ্রেফতার করল। এদের মধ্যে ম্যাক মহারাজা, পারভিন গর্ডহ্যান, সিপাহি নায়ানডা ও বিলি নায়ারও ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়ার অভিযোগ আনা হয় তাদের বিরুদ্ধে। ডি ক্লার্ক জরুরি ভিত্তিতে আমার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। ষড়যন্ত্রের পক্ষে নথিপত্র দেখান। তাদের গ্রেফতার যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেন।

বৈঠকের পর আমি সরকারের যুক্তির বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানোর জন্য জো স্লোভোকে অনুরোধ জানালাম। জো স্লোভো বললেন, ডি ক্লার্ক যে অভিযোগ তুলেছেন সেটা ভিত্তিহীন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এএনসির একটা জোরালো বিরোধ তৈরি করাই এর উদ্দেশ্য। ডি ক্লার্ককে পুলিশ বিভ্রান্ত করছে। আলোচনা থেকে জো স্লোভকে সরিয়ে দেয়ার জন্য তারা ওই নাটক সাজিয়েছে।

জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে জাতীয় নির্বাহী কমিটির বৈঠক ডাকা হল। বৈঠকের আগে জো স্লোভো একটি প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে আসলেন। বললেন, আলোচনাকে গতি দেয়ার জন্য আমরা যেন সশস্ত্র আন্দোলন থেকে সাময়িকভাবে সরে আসার ঘোষণা দেই। এটা করলে আলোচনার পরিবেশ আরো ভালো হবে। ডি ক্লার্কের মুখরক্ষা হবে। তিনি তার সমর্থকদের বলতে পারবেন যে, তার উদ্যোগ কাজ দিতে শুরু করেছে। আমি জো স্লোভোর প্রস্তাবে সাড়া দিলাম না। বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়ার সময় এখনও আসেনি।

জো চলে যাওয়ার পর তার প্রস্তাবটি নিয়ে আরো ভাবি। ভেবেচিন্তে দেখলাম জো এর প্রস্তাবটি খারাপ নয়। সশস্ত্র আন্দোলন থেকে সরে আসাটাই আমাদের উচিত। জো দলের মধ্যে উদার ও সংস্কারপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সরকারও তার ব্যাপারে অবগত ছিল। তাই প্রস্তাবটি তার মাধ্যমে দলের নীতি নির্ধারকদের কাছে তুলে ধরাটাই সর্বোত্তম হবে বলে মনে করলাম। পরদিন জোকে বললাম, এএনসির নির্বাহী কমিটির বৈঠকে তিনি প্রস্তাবটি তুললে আমি সমর্থন করব।

পরের দিন দলের নির্বাহী কমিটির সভায় জো স্লোভো প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। অনেকেই এর তীব্র বিরোধীতা করলেন। তারা বললেন, সশস্ত্র আন্দোলন থেকে সরে আসার অর্থ হবে ডি ক্লার্ক ও তার সমর্থকদের পুরস্কৃত করা। আমাদের লোকদের নয়। আমি প্রস্তাবের পক্ষ সমর্থন করে বলি, আমাদের সশস্ত্র সংগামের উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসা। এ উদ্দেশ্য ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে। এখন সশস্ত্র আন্দোলন থেকে সরে আসলে আমাদের প্রতি সরকারের আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে। কয়েক ঘণ্টার আলোচনা শেষে আমরাই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হলাম।

৬ আগস্ট প্রেটোরিয়ায় সরকার ও এএনসির মধ্যে শান্তিচুক্তি সই হয়। চুক্তির নাম দেয়া হয় প্রেটোরিয়া মিট। এই চুক্তির আওতায় এএনসি সশস্ত্র আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করে। আমি বারবার এএনসি সমর্থকদের এ চুক্তি মেনে সশস্ত্র আন্দোলন বন্ধ করার অনুরোধ জানাই। চুক্তিতে সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেয়ারও একটি সময় সীমা উল্লেখ করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী সব রাজনৈতিক বন্দিকে ১৯৯১ সালের মে মাসের মধ্যে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনেও সংশোধনি আনার ঘোষণা দেয়া হয়।

দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নানা উদ্যোগ নেয়া হলেও সহিংসতা বন্ধ হল না। বরং আরও ঘনীভূত হল। চারদিকে মারামারি কাটাকাটি চলতে লাগল।

আমাদের আশা ছিল আলোচনা চলছে, তাই এ সময়ে সহিংসতা কমে যাবে। কিন্তু তার উল্টোটা ঘটতে দেখে রীতিমত নিরাশ হতে হল। পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী এ সময় গ্রেফতারের পরিমাণ কমিয়ে দিল। পুলিশ সরাসরি সহিংসতায় না জড়িয়ে সহিংস কর্মকাণ্ডে ইন্ধন যোগাতে লাগলেন বলে অনেকে অভিযোগ করলেন।

সেপ্টেম্বরে আমি এক বক্তৃতায় বললাম, সরকার ও এএনসি কেউ এখন সহিংসতা চায় না। অথচ সহিংসতা চলছে। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন রহস্য রয়েছে। কারো ইন্ধনে এগুলো হচ্ছে। অন্য বা তৃতীয় শক্তি দেশে অশান্তি জিইয়ে রাখার পায়তারা করছে। তাদেরকে খুঁজে বের করে প্রতিহত করতে হবে। তৃতীয় শক্তির সদস্যদের কথা জানলেও তাদের পরিচয় প্রকাশ করলাম না।

সাম্প্রতিক সহিংসতার সঙ্গে কারা জড়িত বা কারা এর পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে সেটা বোঝাতে গিয়ে আমি দুটি ঘটনার উল্লেখ করি। ১৯৯০ সালের জুলাইয়ে আমরা খবর পাই ভাল ট্রায়াংগালের সিবোকেং শহরে ইনকাথা ফ্রিডম পার্টি এএনসির নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার পরিকল্পনা করছে। খবরটি আমরা স্থানীয় প্রশাসনসহ পুলিশ কমিশনারকে অবগত করি এবং হামলা বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাই।

ইনকাথাকে প্রতিরোধ করতে বলি। কিন্তু ২২ জুলাই পুলিশি গাড়ির প্রহরায় প্রকাশ্য দিবালোকে ইনকাথার সদস্যরা মিছিল সহকারে সিবোকেং শহরে প্রবেশ করে। মিছিল শেষে তারা চড়াও হয় এএনসির ওপর। সেদিন ইনকাথার সশস্ত্র গুণ্ডাদের হামলায় এএনসির কমপক্ষে ৩০ জন সদস্য নিহত হয়। পরের দিন আমি ওই এলাকা পরিদর্শনে যাই। তাদের লোমহর্ষ হত্যাকাণ্ড দেখে আমি শিউরে উঠি। আমার জীবনেও এত ভয়াবহ দৃশ্য দেখিনি। হাসপাতালের মর্গে ছিল সারি সারি লাশ। নারি ও শিশুও ছিল সে সারিতে। একজন মহিলার দুই স্তন কেটে ফেলা হয়েছিল। মনে হল হত্যাকারীরা কোন মানুষ নয়, হিংস্র জানোয়ার বা তার চেয়েও জঘন্য।

পরের দিন প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হই। আমি ক্রুদ্ধ ভাষায় হত্যার নিন্দা জানাই এবং হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সরকারের ব্যাখ্যা চাই। প্রেসিডেন্টকে বলি, এ হামলার ব্যাপারে আগে থেকে আপনাদের জানানো হয়েছিল। এরপরও ব্যবস্থা নেন নি। কেন ব্যবস্থা নিলেন না? এত বড় হত্যাকাণ্ডের পর কেন এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হল না। আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, ত্রিশজন লোককে মেরে ফেলা হল। আর দেশের প্রেসিডেন্ট সামান্য দুঃখ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকলেন। কোন জাতির জীবনে এর চেয়ে বড় ট্রাজেডি আর কি হতে পারে? আমি ডি ক্লার্ককে আরো অনেক প্রশ্ন করলেও তিনি তার কোনটির জবাব দিতে পারেন নি।

দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা ঘটল নভেম্বরে। জোহান্সবার্গের পূর্বে জামিস্টন শহরে ইনকাথার সদস্যরা এএনসি সমর্থকদের ওপর হামলা চালাল। অনেক এএনসি সদস্যকে হত্যা করল। তাদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। তাদের বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করল। শেষমেষ এএনসি সদস্যদের ওই এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিল। এসব কিছুই হয় পুলিশের ছত্রছায়ায়। পুলিশ দেখেও না দেখার ভান করে।

এ ঘটনার পরও আমি প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করি। এ সময় তার আইনমন্ত্রী আদ্রিয়ান ভল্কও ছিলেন। ডি ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করি এত কিছুর পরও পুলিশ কেন কোন ব্যবস্থা নিল না। অপরাধীদের গ্রেফতার করল না কেন? আমি তাদের বলি, হামলাকারীদের খুঁজে বের করা কোন ব্যাপারই নয়। তারা আমার লোকদের হত্যা করে বিষয়সম্পত্তি দখল করে ওই এলাকাতেই আছে। ক্লার্ক তার মন্ত্রীকে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে বললেন। ভল্ক ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, এএনসির লোকেরা নাকি এ এলাকা দখল করে রেখেছিলেন। আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, সেটা দখলি সম্পত্তি নয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষই তাদেরকে ওই জায়গা বরাদ্দ দিয়েছে। তবে মিস্টার ডি ক্লার্ক সুর নরম করে বলেন, তিনি ঘটনার তদন্ত করবেন। দোষীদের বিচার করবেন যা কোন দিনই করা হয়নি।

এ সময় সরকারের আরেকটি পদক্ষেপ আগুনের মধ্যে ঘি ঢালার মত কাজ করে। জুলুদেরকে নাটাল ও এর আশপাশে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দেয়া হয়। তাদের ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র-শস্ত্রও বহনের অনুমতি দেয় সরকার। এসব অস্ত্রের মধ্যে দা, কুড়াল, টেটা, তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম এগুলো ছিল। এই অস্ত্র দিয়ে ইনকাথার সদস্যরা এএনসির লোকদের আগে হত্যা করেছি। শান্তির ব্যাপারে যে ডি ক্লার্ক আন্তরিক নয় তার এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অনেকে বুঝে ফেললেন।

যারা আলোচনার বিরোধী ছিলেন তারা সহিংসতার মাধ্যমে লাভবান হলেন। এএনসি সরকারের সঙ্গে শান্তি চাইলেও সরকার ইনকাথাকে উস্কে দিয়ে শান্তির পথকে কলুষিত করতে লাগল। ইনকাথাকে সরকার দাঁড় করাল তৃতীয় শক্তি হিসেবে। ফলে সহিংসতা চলতে লাগল। আমরা সশস্ত্র আন্দোলন স্থগিত রাখার পূর্ব ঘোষণা থেকে সরে আসার চিন্তা ভাবনা শুরু করলাম। সেপ্টেম্বরে এক সংবাদ সম্মেলনে এএনসি নেতারা জানিয়ে দেন, এভাবে সহিংসতা চলতে থাকলে এএনসি আবার অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হবে।

দীর্ঘ তিন দশকের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে অলিভার টিম্বু দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে এলেন। তাকে কাছে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। দেশে ফিরে তিনি বিশাল সংবাদ সম্মেলন করেন। এতে দেশী সাংবাদিক ছাড়াও ৪৫টি দেশের ১৫০০ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

সংবাদ সম্মেলনে আমি অলিভারের ভুয়সী প্রশংসা করি। এএনসির দুর্দিনে দলটিকে আগলে রাখায় তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এএনসির শিখা ঝড়ঝাপটার মধ্যেও জ্বালিয়ে রাখার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। তার নেতৃত্বে আমরা নতুন দিনের পথে এগিয়ে যাব বলে আশা প্রকাশ করলাম। আমার কারা জীবনের ২৭ বছরে অলিভার এএনসিকে আগলে রাখেন। এটিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত করে তোলেন। দেশে বিদেশে অবস্থানরত এএনসির সব নেতাদের নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি। তিনি ছিলেন একজন সৈনিক, কুটনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব। সব মিলিয়ে একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয়, গ্রহণযোগ্য ও অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন অলিভার।

সংবাদ সম্মেলনে অলিভার নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি পুনর্মূল্যায়নের আহ্বান জানান। কেননা বৃটেন আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশ ডি ক্লার্কের সংস্কার কাজে খুশি হয়ে নিষেধাজ্ঞা শিথিলের উদ্যোগ শুরু করে দিয়েছিল। ডি ক্লার্ককে সংস্কারের ব্যাপারে আরও উৎসাহিত করার জন্য পশ্চিমারা ওই উদ্যোগ নেয়। পশ্চিমাদের এই কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রকারান্তে অলিভার সমর্থন জানান। নিষেধাজ্ঞা পুনর্মূল্যায়নে অলিভারের আহবান দলে রীতিমত ঝড় তোলে।

অলিভারের প্রস্তাব নিয়ে পরে এএনসির নির্বাহী কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয়। কিন্তু এএনসির সামরিক শাখার লোকজন নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার জোর অনুরোধ জানায়। শেষে এএনসির বৈঠকে সরকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আগের মত বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এসময় আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়। অনেকেই বলতে থাকেন, আলোচনার সময় আমি তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মতামতের প্রতিফলন ঘটাই না। নিজস্ব মতামতের প্রতিফলন ঘটাই। এমনকি দলকে ডিঙ্গিয়ে অনেক সিদ্ধান্ত নেই। এসব সমালোচনার কারণে এএনসির মত গণমুখী একটি দলের

নেতা হিসেবে আমি আলোচনার সব বিষয় সাধারণ মানুষকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেই। তবে এটাও ঠিক সফল আলোচনার জন্য গোপনীয়তা একটি বড় বিষয়। এরপরও আলোচনার উন্নতি-অগ্রগতি জনসাধারণের কাছে প্রকাশের সিদ্ধান্তে স্থির থাকি।

প্রতিদিনের সংবাদপত্রে এ সময় সহিংসতার খবর আসতে থাকে। এএনসি অধ্যুষিত শহরগুলোতে প্রতিদিনই রক্ত ঝরত। সে খবর পত্রিকায় ছাপা হত ফলাও করে। তখন সহিংসতা দেশের এক নম্বর সমস্যায় পরিণত হয়। নাটাল ও রিফ এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে খুন খারাবির মাত্রা ছিল বেশি। দল-উপদলের ছড়াছড়ি থাকায় এখানে সহিংসতা হত মাত্রাতিরিক্ত।

সহিংসতা কমানোর উপায় খুঁজে বের করার জন্য আমি চিফ বুথেলজির সঙ্গে যোগাযোগ করি। তার সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করি। জানুয়ারিতে ডারবানের রয়েল হোটেলে দুজনে মিলিত হই। বৈঠককে ঘিরে হোটেলে শত শত সাংবাদিক জড়ো হন।

বৈঠকে বুথেলজি সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কথাবার্তা না বলে এএনসিকে বিষোদগার করতে থাকেন। এএনসি সরকারের সঙ্গে যে আলোচনা করছে সে ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা করেন। আমি কথা বলতে গিয়ে বুথেলজির সব অভিযোগের জবাব দেই। কথা বলতে গিয়ে অত্যন্ত সংযত থাকি। কারণ আমার দীর্ঘ কারাগার জীবনে বুথেলজি আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি একাধিকবার আমার মুক্তি চান।

আলোচনার সময় আমি বুথেলজির সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করি। বিভক্ত না থেকে দুটি সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা বলি। আমাদের এই একান্ত বৈঠক শেষ পর্যন্ত ফলদায়ক হয়। বুথেলজি ও আমি একটি চুক্তিতে সই করি। চুক্তিতে সংযত আচরণ করার অঙ্গীকার করা হয়। কিন্তু এ চুক্তি সত্ত্বেও ইনকাথা সদস্যরা অসংযত আচরণ ও মারামারি-কাটাকাটি অব্যাহত রাখে।

এএনসি ও ইনকাথার মধ্যে সংঘর্ষ চলতে লাগল। প্রতি মাসে শত শত লোক নিহত হতে থাকল। মার্চে জোহান্সবার্গের উত্তরে আলেকজান্দ্রা শহরে ইনকাথার হামলায় এএনসির ৪৫ জন সমর্থক নিহত হয়। এ যাত্রায়ও পুলিশ নিশ্চুপ থাকে। কাউকে গ্রেফতার করা থেকে বিরত থাকে পুলিশ।

সহিংসতা চলতে থাকায় চিফ বুথেলজির সঙ্গে আবার বৈঠক করার উদ্যোগ নিলাম। এপ্রিলে আমরা ডারবানে ফের বৈঠক করলাম। আরেকটি শান্তি চুক্তিতে

সই করলাম। এবার এ চুক্তিপত্র রক্তে রঞ্জিত হল। এবার আমার মনে হল এসব সহিংসতার পেছনে আসলে সরকারই ইন্ধন যোগাচ্ছে। সবকিছুর জন্য সরকারই দায়ী।

এপ্রিলে এএনসির নির্বাহী কমিটির দু'দিন ব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আমি প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করি। বৈঠকে আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলি, চলমান সহিংসতার পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে সরকার। আলোচনাকে নিষ্ফল করাই এর উদ্দেশ্য। আমরা সরকারের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি লিখি। এতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মানগাস মালান ও আইনমন্ত্রী এ্যাড্রিয়ান ভলকের পদত্যাগ দাবি করা হয়। এছাড়া প্রকাশ্যে অস্ত্র-শস্ত্র বহন, অভিবাসী শ্রমিকদের হোটেলে অবস্থান নেয়া ইনকাথা সদস্যদের বহিস্কার এবং নিরাপত্তা সমস্যার সমাধানে একটি কমিশন গঠনের দাবিও করা হয়।

এসব পুরণের জন্য সরকারকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেয়া হয়। মে মাসে ডি ক্লার্ক সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেন। আমরা এর প্রতি অনাস্থা জানাই। সর্বদলীয় বৈঠকের আগে সরকারকে সহিংসতার সুনির্দিষ্ট কারণ বের করে তা নিরসনের দাবি জানাই। মে মাসে আমরা সরকারের সঙ্গে আলোচনা স্থগিতের ঘোষণা দেই।

১৯৯১ সালের জুলাইয়ে এএনসির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ৩০ বছরের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে এটি ছিল এএনসির প্রথম সম্মেলন। সম্মেলনে এএনসির ২২৪৪ জন ডেলিগেট অংশ নেন। এদেরকে দলের তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীরা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। সম্মেলনে কোন বিরোধীতা ছাড়াই আমি এএনসির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হই। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ক্রিল রামফোসা। তিনি ছিলেন তরুণ প্রজন্মের নেতা। জেল থেকে বের হবার পর তার সঙ্গে একবার আমার বৈঠক হয়েছিল।

আমার স্ত্রী উইনির বিচার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। জোহান্সবার্গের একটি আদালতে বিচার শুরু হয়। বিচার চলাকালে নিয়মিত কোর্টে যেতাম। উইনি অপহরণের সঙ্গে জড়িত ছিল না এটা আইনজীবীরা বেশ ভালোভাবে বিচারকের কাছে উপস্থাপন করেন। কিন্তু কাজ হল না। তাকে ৬ বছর জেল দেয়া হল। অবশ্য উচ্চ আদালতে আপিল করার পর উইনি জামিনে বেরিয়ে আসে।

দেড় বছরের দরকষাকষি ও টালবাহানার পর ১৯৯১ সালের ২০ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যিকারের আলোচনা শুরু হল। সরকার ও এএনসির মধ্যে অনুষ্ঠিত এ আলোচনায় এএনসির প্রতিনিধিত্ব করে কনভেশন ফর এ ডেমোক্রেটিক সাউথ আফ্রিকা বা কোডেসা। আগের সব আলোচনাকে ভিত্তি করে জোহান্সবার্গের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আলোচনা শুরু হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বাঘা বাঘা রাজনীতিক, জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ইউরোপিয়ান কমিউনিটি এবং আফ্রিকান ইউনিটির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রতিনিধিদলটি গঠিত ছিল। এর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮ জন।

এটা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ রাজত্বকালে কেপটাউন, নাটাল ও বোয়ের প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যে আলোচনা হয় তারপর এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। ওই আলোচনায় যারা তখন উপোস্থিত ছিল ১৯৯১ সালের আজকের এই আলোচনায় সেই কৃষ্ণাঙ্গরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে অংশ নিচ্ছে।

আলোচনায় আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন ক্রিল রামফোসা, জো স্লোভো ও ভিলা মোসা। দীর্ঘ এক সপ্তাহ আলোচনা চলে। এ সময় নির্বাচন, সংবিধান, পার্লামেন্ট ও অন্তবর্তীকালীন সরকারের মত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়। এ আলোচনায় ২২টি দলের প্রতিনিধিও অংশ নেয়।

এএনসি বহুদলীয় সরকার গঠনের ষড়যন্ত্র করছে এ অভিযোগে প্যাক আলোচনা বর্জন করে।

এ সময় প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট ও এএনসির মধ্যে জোট গড়ে ওঠে। আজানিয়ান পিপলস অর্গানাইজেশনের সঙ্গে পাল্টা জোট গঠন করে প্যাক। চিফ বুথেলজিও আলোচনা বর্জন করেন। আলোচনায় ইনকাথা, কোয়াজুলু সরকার ও রাজা জুয়েলিথিনিসহ মোট তিনজন প্রতিনিধির অংশগ্রহণ দাবি করেছিলেন বুথেলজি। সেটা গ্রহণ না করায় তিনি আলোচনা বর্জন করেন। আমাদের আশঙ্কা ছিল এই তিন গোত্র থেকে তিনজন প্রতিনিধিকে আলোচনার জন্য নিলে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য গোত্রপ্রধানরাও তাদেরকে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাবেন। আলোচনায় ডি ক্লার্ক ক্ষমতার ভাগাভাগির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক উপায়ে একটি

অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের ওপর জোর দেন। আলোচনায় ন্যাশনাল পার্টির প্রতিনিধি দাউয়ি ডি ভিলার এতদিনের বর্ণবাদী আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেন।

আলোচনায় আমি বলি, সরকার ও এএনসির মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফল হচ্ছে কোডেসা। কোডেসা নতুন পার্লামেন্ট নির্বাচন, সংবিধান প্রণয়ন বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। ১৯৯২ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হবারও কোন কারণ আমি দেখছি না। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি জোরদার এবং নির্বাচন তদারকির জন্য আমি একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের জোর দাবি জানাই। বর্ণবৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকা গড়ার ক্ষেত্রে এর বিকল্প নেই বলেও উল্লেখ করি।

কোডেসা সম্মেলনের প্রথম দিনের আলোচনা শেষে রাতে মি. ডি ক্লার্কের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ টেলিফোনে আলাপ করি। ডি ক্লার্ক আমার কাছে জানতে চান, পরদিন শেষ বক্তা হিসেবে তিনি বক্তৃতা করলে আমার কোন আপত্তি আছে কিনা। শিডিউল অনুসারে ওইদিন শেষ বক্তা হিসেবে আমার বক্তৃতা করার কথা ছিল। আমি বললাম, নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে তাকে জানাব। আমি পরিষদের সদসদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। ডি ক্লার্ককে দিনের শেষ বক্তা হিসেবে কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানালাম।

আলোচনার একটি পর্যায়ে আমি ও ডি ক্লার্ক পরস্পর বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি। ডি ক্লার্ক তার বক্তৃতায় এ আলোচনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ দুর করার কথা বলেন। এর পরক্ষণেই তিনি তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। কড়া ভাষায় এএনসির সমালোচনা শুরু করেন। সরকারের সঙ্গে আমরা যে চুক্তি করেছিলাম সেটা তোয়াক্কা না করেই কথাবার্তা বলতে থাকে।

দুষ্ট ছাত্রের সঙ্গে স্কুলের হেড মাস্টার মশাই যে ধরণের আচরণ করেন তার আচরণ ছিল অনেকটা সে রকম। তিনি এএনসির সামরিক ঘাটি ও অস্ত্র গুদামের স্থান প্রকাশ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে। এখনও এমকে বহাল রাখারও তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি এএনসির সামরিক কর্মকাণ্ডকে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে সম্পাদিত চুক্তির বরখেলাপ হিসেবে বর্ণনা করেন। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে তার কথা শুনলাম। ডি ক্লার্কের বক্তৃতার পরপরই বৈঠক শেষ হবার কথা ছিল। তাই তার বক্তৃতা শেষ হবার সামান্য আগে উঠে দাঁড়ালাম এবং তার প্রতিটি অভিযোগের জবাব দিতে শুরু করলাম। এ সময় আমি ছিলাম বেশ রাগান্বিত।

আমি বললাম, ডি ক্লার্কের আজকের আচরণে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। তিনি অকপটে এএনসির বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তার সামান্য নৈতিকতা বোধ থাকলে সংখ্যালঘুদের নেতা হয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে এভাবে কথা বলতে পারতেন না। আমার শেষ কথায় সবাই হতচকিত হয়ে যান। ডি ক্লার্ক নিজেও ভাবতে পারেননি যে তার বক্তৃতার পর আমি উঠে দাঁড়াব এবং তাকে ঠিক এভাবে সায়েস্তা করব।

কেডসা পরদিন চূড়ান্ত অধিবেশনে বসল। এদিন ডি ক্লার্ক ও আমি দুজনেই ছিলাম মনঃক্ষুণ্ন। বৈঠক শুরুর আগে আমরা দুজন করমর্দন করি। কিন্তু নিজেদের মধ্যে আস্থা উড়ে যাওয়ায় এ আলোচনাও দৃশ্যত মূল্যহীন বলে মনে হল।

কেডসা বৈঠকের ৬ সপ্তাহ পর একটি উপনির্বাচন হয়। নির্বাচনী এলাকা ছিল ট্রান্সভালের একটি ছোট শহর। এটা ছিল ক্ষমতাসীন ন্যাশনালিস্ট পার্টির ঘাঁটি। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্বাচনে ডানপন্থী কনজারভেটিভ পার্টির কাছে ন্যাশনালিস্ট পার্টির প্রার্থী বিপুল ভোটে ধরাশায়ী হন। কনজারভেটিভ বা রক্ষণশীলরা এএনসির সঙ্গে সরকারের আলোচনার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এ দলের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত আফ্রিকান। নির্বাচনের ফলাফল আলোচনায় প্রভাব ফেলবে বলে মনে হল। কারণ আলোচনাকে ভণ্ডুল করার অজুহাত হিসেবে এ নির্বাচনের ফলাফলকে সরকার ব্যবহারের চেষ্টা করবে।

যা আশঙ্কা করা হয়েছিল তাই হল। ডি ক্লার্ক এএনসিকে নিয়ে জুয়া খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। ক্লার্ক তার সংস্কার কাজের ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গদের মতামত জানার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৭ মার্চ দেশব্যাপী শ্বেতাঙ্গদের জন্য গণভোটের আয়োজন করা হল। গণভোটে ১৮ বছরের ওপরের শ্বেতাঙ্গদের কাছে প্রশ্ন রাখা হল, ১৯৯০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তিনি যে সংস্কার শুরু করেছেন সেটা তারা সমর্থন করে কিনা। ডি ক্লার্ক জানালেন, গণভোটে পরাজিত হলে তিনি পদত্যাগ করবেন।

এএনসি এ গণভোটের বিরোধীতাকরল। কারণ এতে শ্বেতাঙ্গ ছাড়া অন্যদের ভোট দেয়ার সুযোগ ছিল না। শ্বেতাঙ্গ ভোটাররা মি. ডি. ক্লার্কের এতদিনের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিক সেটাও আমরা চাইলাম না। তবে এরপরও শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের হ্যাঁ ভোট দেয়ার জন্য আমরা উদ্বুদ্ধ করে যেতে লাগলাম।

মিস্টার ক্লার্ক ও তার দল ন্যাশনাল পার্টিও সংস্কারের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাদের প্রচারণার ধরণ ছিল অনেকটা মার্কিন স্টাইলের। সভা

সমাবেশের পাশাপাশি রেডিও টেলিভিশনেও সংস্কারের পক্ষে বহু টাকা খরচ করে প্রচারণা চালানো হয়।

গণভোটে ৬৯ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ ভোটার আলোচনার পক্ষে ভোট দেন। এ বিশাল জয় ডি ক্লার্ককে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে। তার হাত শক্ত হয়। ফলে ন্যাশনালিস্ট পার্টি আলোচনার পক্ষে জোরালো অবস্থান নেয়। এটা ছিল খুবই ভাল সিদ্ধান্ত।

১০৯

১৯৯২ সালের ১৩ এপ্রিল আমার দুই বন্ধু ওয়াল্টার ও অলিভারকে নিয়ে জোহান্সবার্গে এক সংবাদ সম্মেলন করি। এতে উইনির সঙ্গে আমার বিচ্ছেদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেই। এএনসির বৃহত্তর স্বার্থেই আমাকে এভাবে খবরটি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে জানাতে হয়। সংবাদ সম্মেলনে আমি স্পষ্ট করার চেষ্টা করি যে, আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে। এখানে এএনসির কোন ভূমিকা নেই। সংবাদ সম্মেলনে একটি লিখিত বিবৃতি পড়ে শোনাই যেটা ছিল এরকম–

আমার স্ত্রী কমরেড নোমজামো উইনি ম্যান্ডেলার সঙ্গে আমার সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে এখন মিডিয়াতে ঝড় বইছে। অনেক গালগল্প বলে বেড়ানো হচ্ছে। এ বিবৃতি দিয়ে আমি বিষয়টি খোলাসা করতে চাই। সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি ও সন্দেহ দূর করতে চাই।

দেশের এক সংকটময় মুহূর্তে আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছিল। আমরা দেখেশুনেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। এএনসির প্রতি অঙ্গীকার রক্ষা ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আমরা স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারিনি। তবে ভালোবাসার কমতি না থাকায় আমাদের দাম্পত্ত জীবনেও কোন সমস্যা হয়নি।

দীর্ঘ ২০ বছর আমি রোবেন দ্বীপে বন্দি ছিলাম। এ সময় আমার সাহস, অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল উইনি। ছেলে-মেয়েদের মানুষ করতে তাকে

অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। অনেক বোঝা বহন করতে হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের অনেক দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আর তাই আমরা পৃথক হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

উইনির সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা দিতে গিয়ে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। অতীতের অনেক স্মৃতি রোমন্থন করি। আমি তাকে কতটা ভালবাসতাম, জেলের ভেতরে ও বাইরে থাকা অবস্থায় তার প্রতি কতটা খেয়াল রাখতাম সেটাও বিবৃতিতে তুলে ধরি। বিবৃতিতে আরো বলি, ভদ্রমহোদয়গণ আমার কথা শুনেই বুঝতে পারছেন উইনিকে আমি কতটা ভালবাসি।

কিন্তু কিছু বিষয়ে আমি অন্ধের মত। সেখানে স্ত্রী ও সন্তানরা সেগুলোর উর্ধ্বে। আমি জেলে থাকা অবস্থায় উইনির জীবন ছিল বেশ কঠিন। আমার মনে হচ্ছে, জেল থেকে বেরুনোর পর উইনির জীবন আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। সম্ভবত এ কারণেই এ বিবাহ বিচ্ছেদ।

১১০

চারমাস বিরতির পর ১৯৯২ সালের মে মাসে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে দ্বিতীয় বহুদলীয় সম্মেলন শুরু হল। এ বৈঠক পরিচিত পেল কোডেসা-টু সম্মেলন হিসেবে। এএনসি, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গোপন আলোচনার ভিত্তিতে সম্মেলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। এতে মধ্যস্থতাকারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কোডেসা-টু সম্মেলনের আগে প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের সঙ্গে আমার গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম কোডেসা সম্মেলনের পর ডি ক্লার্কের সঙ্গে এটাই ছিল আমার প্রথম বৈঠক।

কোডেসা-টু সম্মেলন শুরুর দিন কয়েক আগে দেশ জুড়ে দু'টো গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এতে সরকারকে বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। প্রথম গুজবটি ছিল সরকারের উন্নয়ন বিভাগের ঘুষ ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া সংক্রান্ত। সরকারের ওই বিভাগ দুর্নীতির মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গদের বাড়িঘরসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবৈধভাবে ব্যবস্থা নেয় বলে দেশ জুড়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। অন্যটি ছিল সরকারের একজন পদস্থ নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে ১৯৮৫ সালে সংঘটিত

হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়ানো সংক্রান্ত। দ্বিতীয় কোডেসা সম্মেলনের আগে এ গুজব দুটি সরকারকে বেশ বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়।

বহুদলীয় এ আলোচনায় অনেক বিষয় উঠে আসে। বিগত মাসে গোপনে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তার আলোকেই বহুদলীয় আলোচনা চলতে থাকে। গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকা গড়ার জন্য দুই স্তরের অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা ছিল এক অন্যতম কারণ। প্রথম স্তরের মূল কথা ছিল, কোডেসায় অংশ নেয়া রাজনীতিকদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে বাছাই করে অন্তবর্তীকালীন নির্বাহী পরিষদ গঠন করা। এর কাজ হবে লেভেল প্লেইং ফিল্ড ঠিক করা। যাতে সবাই সমান সুযোগ পায়। এছাড়া অন্তবর্তীকালীন সংবিধান প্রণয়নের গুরু দায়িত্বও অর্পিত হয় এ পরিষদের ওপর। দ্বিতীয় স্তরের অন্তবর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব ঠিক করা হয় নির্বাচন পরিচালনা করা। নির্বাচনে যেসব রাজনৈতিক দল ৫ শতাংশের বেশি ভোট পাবে তাদেরকেই মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেয়ার কথা বলা হয়। আরও বলা হয় পার্লামেন্টের অর্ধেক সদস্য আসবে জাতীয় নির্বাচনের ভিত্তিতে আর বাকি অর্ধেক আসবে আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে। নির্বাচিত পার্লামেন্ট চূড়ান্ত সংবিধান প্রণয়ন করবে। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করবে।

দ্বিতীয় কোডেসা সম্মেলনের কয়েকদিন আগ পর্যন্ত নানা বিতর্ক চলতে থাকে। এএনসি শতকরা হিসেবে ভোট পেয়ে পার্লামেন্ট সদস্য হবার বিরোধিতা করে। সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোটে ক্ষমতা দাবি করে। ১৯৯২ সালের ১৫ মে দ্বিতীয় কোডেসা সম্মেলন শুরু হয়। কিন্তু বিভিন্ন ইস্যুতে বেশ হতাশার সৃষ্টি হয়। মি. ডি ক্লার্ক যা চাইতেন আমি তার বিরোধীতা করি। আবার আমি যা চাইতাম ডি ক্লার্ক তার বিরোধীতা করতেন। মনে হচ্ছিল সরকার আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছে।

প্রথম দিনেই আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো। দুজন বিচারক আমাকে ও ডি ক্লার্ককে বিকেলে বৈঠক করে একটা সমঝোতায় আসার অনুরোধ জানান।

বিকেলে আমরা বৈঠকে বসলাম। রাত পর্যন্ত আলোচনা চললেও মতৈক্যে পৌছতে পারলাম না। তবে এ ব্যাপারে একমত হলাম যে, আলোচনাকে ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকাসহ গোটা বিশ্ববাসী আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ডি ক্লার্ককে বললাম, আসুন আমরা শান্তি প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ন

রাখি। কিছু বিষয়ে সমঝোতায় উপনীত হই। অন্ততপক্ষে আগামী আলোচনার তারিখটা ঠিক করি। আমরা অঙ্গীকার করলাম যে, পরের দিন আমরা খুব গঠন-মূলক কথা বলব।

পরের দিন আমরা কোডেসা প্রথম সম্মেলনের আলোকে গঠনমূলক কথাবার্তা বলা শুরু করলাম। ডি ক্লার্ক তার ভাষণে বললেন, ন্যাশনাল পার্টি সংখ্যালঘুদের ভোটের ক্ষমতা চায় না তবে এমন একটি পদ্ধতি চায় যাতে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠরা যাতে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ না পায়। তার কথা শুনে আমার মনে হল, ক্লার্ক এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তার বক্তৃতার পর আমি বলি– আমাদের উচিত গঠনমূলকভাবে কাজ করা যাতে উত্তেজনা না বাড়ে এবং আলোচনার পথ রুদ্ধ না হয়।

আলোচনার দ্বিতীয় দিনেও বলতে গেলে অচলাবস্থাই ছিল। ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল পার্টির কারণেই এই অচলাবস্থা চলতে থাকে। তারা তখনও সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসনের ব্যাপারে আপত্তি জানানো অব্যাহত রাখে।

কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের সুরাহা না হওয়ায় কোডেসা দ্বিতীয় সম্মেলন কার্যত ব্যর্থ হল। সরকার পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ণে অস্বীকৃতি জানাল। অগণতান্ত্রিকভাবে একটি অনির্বাচিত সিনেট কমিটি রাখতে চাইল। পার্লামেন্টের যে কোন বিষয়ে এদেরকে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা দেয়ার পক্ষে কথা বলল। একটি অন্তবর্তী কমিশনের মাধ্যমে দেশের পরবর্তী সংবিধান প্রণয়ন করতে চাইল। আমরা চাইছিলাম দেশের সবকিছু হবে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে। এ ইস্যুতে কোডেসা সম্মেলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। এএনসি সরকারের সঙ্গে পরবর্তীতে আরো আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করল। কিন্তু সরকারের একরোখা মনোভাবের কারণে আলোচনা খুব একটা কাজে আসবে বলে মনে হচ্ছিল না। তাই এএনসি সরকারের সঙ্গে আলোচনা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল। আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিল। এ সময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পেল। দক্ষিণ আফ্রিকার আপামর জনসাধারণও নিজেদের অধিকার ফিরে পাবার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল। তাদের যেন আর দেরী সইছিল না। এএনসি দূর্বার গণআন্দোলন শুরু করল। এর মধ্যে ছিল বয়কট, বিক্ষোভ ও ধর্মঘট।

১৯৯২ সালের ১৬ জুন দেশজুড়ে গণআন্দোলন শুরু হল। ১৯৭৬ সালে সংগঠিত সোয়েটা বিপ্লবের বার্ষিকী উপলক্ষে আরো আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়। ৩ ও ৪ আগস্ট দেশজুড়ে দুদিন ব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। এ ধর্মঘটের আগে আরো কিছু ঘটনা ঘটে যা সরকার ও এএনসির মধ্যে দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়।

১৯৯২ সালের ১৭ জুন ভারী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ইনকাথা সদস্যরা ভ্যাল শহরের বইপাটং এলাকায় রাতের অন্ধকারে হামলা চালায়। এতে ৪৬ জন লোক নিহত হয়। এদের অধিকাংশই ছিল নারী ও শিশু। এটা ছিল এএনসির বিরুদ্ধে চতুর্থ গণহত্যা। এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডে দেশবাসী শিউড়ে ওঠে। হত্যাকাণ্ড বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ায় তারা সরকারকে দোষারোপ করে। এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

হত্যাকারীদের গ্রেফতারে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এ ঘটনার কোন তদন্ত পর্যন্ত পুলিশ করেনি। প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের মুখ থেকেও এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোন শব্দ বোরোয়নি। এ ঘটনায় আমার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হল। কারণ সরকার আলোচনার পথ রুদ্ধ করে দেয়ার পাশাপাশি আমাদের লোকদেরকে হত্যা করা শুরু করল।

এ হত্যাকাণ্ডের চারদিন পর এএনসির ২০ হাজার বিক্ষুব্ধ সমর্থকের উদ্দেশ্যে আমি বক্তৃতা করি। আমি এএনসির সাধারণ সম্পাদক ক্রিল রামাফোসাকে সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বন্ধের নির্দেশ দেই। জাতীয় নির্বাহী কমিটির জরুরী বৈঠক ডাকার ঘোষণা দেই। ওই বৈঠকেই আমাদের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে উত্তেজিত জনতাকে জানাই।

আমি সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেই, বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে তাতে এএনসি আবার অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হবে। ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল পার্টিকে আমি জার্মানির নাজির সঙ্গে তুলনা করি। ডি ক্লার্ক যদি সভা-সমাবেশ মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করেন তাহলে পরিণতি ভালো হবে না বলে হুঁশিয়ার করে দেই।

এ সময় সমাবেশ থেকে শ্লোগান উঠতে থাকে– ম্যান্ডেলা আমাদেরকে অস্ত্র দাও, আলোচনা নয় যুদ্ধ করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনব। জনগণ যে কতটা হতাশ হয়ে পড়েছে এসব কথাবার্তা থেকে তা বুঝতে পারি। আলোচনায় তারা কোন ফলাফল পায়নি। হতাশাটা জন্মেছে মূলত এ কারণেই। তারা ধরে নিল বর্ণ বৈষম্য অবসানের একমাত্র পথ হল হাতে অস্ত্র তুলে নেয়া।

বইপাটিংয়ের জনসমাবেশের পর নির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রশ্ন ওঠে আমরা কেন সশস্ত্র আন্দোলন ত্যাগ করলাম? সরকার কখনই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করবে না। আমি কট্টরপন্থীদের এসব কথাবার্তার প্রতি বেশ সহানুভূতি প্রকাশ করি। কিন্তু এর পরও আমার মনে হতে থাকে সমস্যার সমাধানে আলোচনার কোন বিকল্প নেই।

সারা জীবন আলোচনার কথা বললেও বর্তমান পরিস্থিতিতে আলোচনায় ফিরে যাবার কোন অবকাশ নেই। আমি গণআন্দোলনের পক্ষে মত প্রকাশ করি। সশস্ত্র সংগ্রাম ও আলোচনার মধ্যবর্তী অবস্থা হচ্ছে গণআন্দোলন। এর মাধ্যমে জনগণ তাদের রাগ-ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। সরকারও জনগণের আবেগ উপলব্ধি করতে পারে আন্দোলন দেখে।

আলোচনা থেকে সরে আসার কথা আমরা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেই। মিস্টার ডি ক্লার্কের কাছে লেখা এক স্মারক লিপিতে আলোচনা থেকে সরে আসার কারণগুলো জানিয়ে দেই। কারণ হিসেবে কোডেসা সম্মেলনে সাংবিধানিক জটিলতার কথা উল্লেখ করি। সহিংসতার ব্যাপারে সরকারের পক্ষপাতমূলক আচরণের নিন্দা জানাই। যারা এএনসি সদস্যদের নির্বিচারে হত্যা করছে তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দাবি জানাই।

রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সহিংসতার বিরুদ্ধে ৩ ও ৪ আগস্ট দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হল। ৪০ লাখের বেশি শ্রমিক এ ধর্মঘটে যোগ দেয়। তারা কাজে না গিয়ে বাড়িতে অবস্থান করে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে এত বড় শ্রমিক ধর্মঘট এর আগে কখনও হয়নি। ধর্মঘট চলাকালে দেশজুড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। এতে হাজার হাজার লোক অংশ নেয়।

প্রেটোরিয়ায় ইউনিয়ন বিল্ডিং এর সামনে বিশাল সমাবেশে আমি বলি, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে একদিন এ ভবনের নিয়ন্ত্রণ আমরাই গ্রহণ করব।

এএনসির ধর্মঘট বিক্ষোভে বেসামাল হয়ে মি. ডি ক্লার্ক বলেন, এএনসি দেশে এভাবে অরাজকতা বজায় রাখলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। আমি ক্লার্ককে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলি, শক্তি প্রয়োগ করা হলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। দেশের মঙ্গল চাইলে, শান্তি চাইলে এক্ষুণি অন্তবর্তীকালীন সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন।

ধর্মঘটসহ গণআন্দোলনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এএনসি কেপের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কিসকেই শহরের রাজধানী বিশোতে লং মার্চের কর্মসূচী ঘোষণা করে। কেসকেই ছিল এএনসির ঘাঁটি। ১৯৯১ সালে এখানে জেনারেল ব্রিগেডিয়ার জিগোবো এএনসি সদস্যদের ওপর চরম নিষ্ঠুরতা চালান। এখানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করেন। ১৯৯২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বিশোর প্রধান স্টেডিয়ামে প্রায় ৭৫ হাজার লোক জমায়েত হয়। সমাবেশ শেষে এই বিশাল জনতা শহরের প্রধান সড়কে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য বের হলে পুলিশ তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। এতে ২৯ জন নিহত ও দু'ইশ'র বেশি লোক আহত হয়। বইপটাংয়ের মত বিশোও বধ্যভূমির খাতায় নাম লেখায়।

আঁধার শেষে আলো আসে– প্রচলিত এই কথার বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায় বিশোর গণহত্যার পর। বিশো হত্যাকাণ্ডের পর আলোচনার দরজা অপ্রত্যাশিতভাবে ফের খুলে যায়। বিশোর মত এমন দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সে উপায় খুঁজে বের করতে প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের সঙ্গে আমি ফের বৈঠকে বসি। আমাদের আলোচনা চলতে থাকে। ২৬ সেপ্টেম্বর আমার ও ডি ক্লার্কের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়।

ওই দিন আমরা একটি চুক্তিতে সই করি। এর নাম দেয়া হয় রেকর্ড অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আগের সব চুক্তি ও আলোচনার বিষয় খতিয়ে সমঝোতার নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুতের অঙ্গীকার করা হয় এতে। এছাড়া পুলিশের ভূমিকা পর্যালোচনা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র বহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তবে রেকর্ড অব আন্ডারস্ট্যান্ডিংএ সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় কোডেসা সম্মেলনে সাংবিধানিক বিষয়গুলো নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো নিরসনের ওপর। সরকার অবশেষে একটি নির্বাচিত পার্লামেন্ট মেনে নেয়ার ইঙ্গিত দেয়। এছাড়া ওই পার্লামেন্ট নতুন যে সংবিধান অনুমোদন করবে সেটাও তারা মেনে নেবে বলে জানায়। বাকি ছিল পার্লামেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা। এটাও সবাই একসঙ্গে বসে ঠিক করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

রেকর্ড অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইনকাথাকে খেপিয়ে তোলে। তারা এ চুক্তির বিরোধীতা করে। আলোচনা থেকে বেরিয়ে যায়। সরকার ও এএনসির সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করে। এ চুক্তি চিফ বুথেলজিকেও খেপিয়ে তোলে। তার ধারণা ছিল সবকিছু এএনসির ফর্মুলা মোতাবেক হচ্ছে। সরকার ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল পার্টি, ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত আফ্রিকানদের সঙ্গে তার বেশ

দহরমমহরম ছিল। তাই তিনি কিছুতেই রেকর্ড অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং মেনে নিতে পারছিলেন না।

সশস্ত্র আন্দোলন সাময়িকভাবে ত্যাগের ঘোষণা দেয়ার আগে জো স্লোভোর একটি প্রস্তাব দেশে রীতিমত ঝড় তোলে। অক্টোবর মাসে পত্রিকায় তার একটি লেখা প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি জাতীয় সরকার গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলেও এক বছরের আগে দেশ সামাল দেয়ার ক্ষমতা এএনসি অর্জন করতে পারবে না। প্রশাসনের অনেক স্তরেই এএনসির লোকজন নেই। এ পরিস্থিতিতে ক্ষমতা ভাগাভাগির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকার গঠন করা যেতে পারে। তার যুক্তি মেনে নিলে সরকারের অংশ হবে ন্যাশনাল পার্টি। এটা আমরা অনেকেই চাইছিলাম না।

অনেক বিতর্কের পর আমি জো স্লোভোর প্রস্তাব সমর্থন করলাম। ১৮ নভেম্বর এএনসির জাতীয় নির্বাহী পরিষদ ও ক্ষমতা ভাগাভাগির বিষয়টি অনুমোদন করল। ভেটো ক্ষমতা ছাড়া অন্য অনেক বিষয়ে সংখ্যালঘু দলগুলোকে প্রচুর ক্ষমতা দিতে রাজি হলাম আমরা। ডিসেম্বরে সরকারের সঙ্গে নতুন করে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শুরু হল।

টানা ৫দিন আলোচনা চলে। এ বৈঠকে আমরা ৫ বছরের জন্য জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনে একমত হলাম। ৫ বছর পর জাতীয় ঐক্যর সরকার আর থাকবে না। তখন সংসদে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে তারাই সরকার গঠন করবে। সাধারণ নির্বাচনে যেসব দল ৫ শতাংশের বেশি ভোট পাবে তাদের নিয়েই জাতীয় ঐক্যমত্যের সরকার হবে বলে ঠিক হল। ফেব্রুয়ারীতে জাতীয় সরকার গঠনে সরকার ও এএনসির ঐকমত্যের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে নির্বাচন হবে বলে জানানো হয়।

১১১

আমি সব সময় বিশ্বাস করতাম একজন যেখানে জন্মগ্রহণ করছে তার বাড়িটা সেখানেই হওয়া উচিত। জেল থেকে মুক্তির পর আমি আমার জন্মস্থান কুনুতে নিজের বাড়িটি তৈরি করতে মনস্থ করলাম। ১৯৯৩ সালের হেমন্তে আমার

বাড়িটি তৈরি শেষ হয়। ভিক্টর ভারস্টার জেলখানায় আমি যে ভবনে থাকতাম এ বাড়িটা অনেকটা সে আদলে তৈরি করা হয়।

লোকজন বাড়িতে এসে প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করত আমি কেন এই ধাঁচের বাড়ি নির্মাণ করলাম। জবাবে বলতাম, জেল জীবনে ভিক্টর ভারস্টারে আমি প্রথম শান্তি ও স্বস্তি ফিরে পাই। এ বাড়িতে আমি প্রায়ই থাকাতম। রান্নাঘর ছিল আমার প্রিয় জায়গা।

এপ্রিল মাসে আমার ট্রান্সকেই এর বাসভবনে অবস্থান করছিলাম। সকাল ১০টার দিকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেলাম। ট্রান্সকেই পুলিশের রাগবি দলের কয়েকজন সদস্যকে স্বাগত জানানোর জন্য আমি সেখানে যাই। এমন সময় আমার বাড়ির পরিচারিকা এসে জানান, টেলিফোনে জরুরি খারাপ খবর এসেছে। এই বলে তিনি কাঁদতে থাকলেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও এমকের সাবেক প্রধান ক্রিস হানিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

জোহান্সবার্গের বুকসবার্গে নিজ বাসভবনের কাছে তাকে হত্যা করা হয়। ঐ এলাকাটি ছিল শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত। ক্রিস হানি কমিউনিস্ট নেতা হলেও এএনসির সমর্থকদের কাছেও তার জনপ্রিয়তা ছিল।

ক্রিস হানির মৃত্যু ছিল আমার জন্য একটি চরম আঘাত। চলমান আন্দোলনের ওপরও এ ঘটনা প্রভাব ফেলে।

হানি ছিলেন মহান নেতা। অসাধারণ বক্তা। বক্তৃতা শুরু করলে পিনপতন নিরবতার মধ্যে দিয়ে সবাই তার কথা শুনত। তরুণদের ঐক্যবদ্ধ করার এবং তাদেরকে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করার যাদুকরি ক্ষমতা ছিল তার। তার মৃত্যুতে মনে হল, দক্ষিণ আফ্রিকা একজন মহান সন্তান হারাল। জাতি হারাল একজন অসাধারণ নেতা। হানির মৃত্যুতে পুরো দেশ থমকে গেল। অসন্তোষ বাড়তে পারার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে তরুণরা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠতে পারে এমন আশংকা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। ক্রিস হানির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং তার ৮২ বছর বয়স্ক পিতাকে সান্ত্বনা জানাতে আমি হেলিকপ্টারে করে ট্রান্সকেই ছুটে যাই। গ্রামে পৌঁছে দেখি সেখানে বিদ্যুৎ নেই। পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। লোকজন বাস করে জীর্ণ-শীর্ণ কুটিরে। অধিকাংশ মানুষ খুবই গরীব। ক্রিস হানি এই হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্যই

সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। হানির মৃত্যুতে স্থানীয় লোকজন মুষড়ে পড়ে। তার জন্য শোক প্রকাশ করতে রাস্তায় নেমে আসে। বাড়িতে লোকের ঢল নামে। ক্রিস হানির পিতা সন্তানের মৃত্যুতে মুষড়ে পড়েন। ছেলে হারানোর শোকে পাগল হলেও তিনি এই বলে সান্ত্বনা খুঁজে পান যে, তার ছেলে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। আন্দোলন করতে গিয়ে শহিদ হয়েছে।

জোহান্সবার্গ ফেরার আগে খবর পেলাম পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেফতার করেছে। সে ছিল ডানপন্থি আফ্রিকানার ওয়ারসস্টান্ডওয়েডিং (এ ডব্লিউ বি) এর সদস্য। জাতিতে সে ছিল পোলিস। ক্রিস হানির শেষকৃত্য অনুষ্ঠান শেষে আমাকে জাতির উদ্দেশ্যে কিছু বলতে বলা হল। এএনসির পক্ষ থেকে জাতিকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানানো হয় আমাকে। জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে আমি বলি– আজ রাতে আমি কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গসহ প্রতিটি দক্ষিণ আফ্রিকান নাগরিকের সামনে অত্যন্ত ব্যাথাতুর হৃদয় নিয়ে হাজির হয়েছি। একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি এমন এক কাজ করেছে যার কারণে পুরো জাতিকে আজ কাঁদতে হচ্ছে। শোক সাগরে ভাসতে হচ্ছে। একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা, যিনি ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত আফ্রিকান– তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই কাজ করেছেন। তাকে এতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। তাই হানির হত্যাকাণ্ড নিয়ে এখন বাড়াবাড়ির অবকাশ নেই। এখন সময় একসাথে চলার। শান্তি বজায় রাখার। ক্রিস হানি জীবন দিয়ে গেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। অরাজকতা করে তার স্বপ্নভঙ্গ করা যাবে না।

ক্রিস হানির হত্যাকাণ্ড শ্বেতাঙ্গদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। তারা ধরে নেয় এর ফলে দেশে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। সহিংসতা বন্ধে এএনসি সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়। আমরা সপ্তাহব্যাপী সভা-সমাবেশ ও র‍্যালির আয়োজন করি। এগুলোর মাধ্যমে জনগণ সহিংসতার পরিবর্তে নিজেদের রাগ ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ পায়। এসব সভা সমাবেশে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

হানির হত্যাকাণ্ড যাতে আলোচনার পরিবেশ নষ্ট না করে সে ব্যাপারে আমি ও ডি ক্লার্ক একমত হই।

কিছুদিন পর ক্রিস হানির হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে পুলিশ রক্ষণশীল দলের কর্মী ক্লিভ ডাবি লুইসকে গ্রেফতার করে। ফলে ওই হত্যাকাণ্ডে তৃতীয়পক্ষের

জড়িত থাকার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রিস নিজেও নিহত হবার আগে একটি বিশাল ঘাটি থেকে অস্ত্র খোয়া যাবার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। পুলিশ জানায়, ক্রিসকে যে বন্ধুক দিয়ে গুলি করা হয় সেটা ছিল চুরি যাওয়া অস্ত্রের একটি।

এর দু'সপ্তাহ পর আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনা ক্রিস হানির হত্যাকাণ্ডের মত গোটা দেশকে নাড়া না দিলেও আমাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। অলিভার টিম্বু হঠাৎ করেই স্ট্রোক করে মারা যান। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তার হঠাৎ এভাবে চলে যাওয়াটা আমার জন্য ছিল মস্তবড় আঘাত। তার স্ত্রী এডেলেইডের ফোন পেয়ে আমি দ্রুত অলিভার টিম্বুর শয্যাপাশে চলে যাই। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। তাকে শেষ বিদায় জানানোর সৌভাগ্যটুকু পর্যন্ত আমার হয়নি। আমি যাওয়ার আগেই অলিভার চিরতরে পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।

প্লেটো ধাতুকে স্বর্ণ রৌপ্য ও শিসা– এ তিনভাগে ভাগ করেছিলেন। আমার কাছে অলিভার টিম্বু ছিলেন একটি সোনা। মেধা, প্রজ্ঞা, দক্ষতা, সহিষ্ণুতা, সৌজন্যতা ভদ্রতা– সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন অসাধারণ। সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন দেশের জন্য, মানুষের জন্য। একজন নেতা হিসেবে তাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম। একজন মানুষ হিসেবে তাকে ভালবাসতাম।

আমি দীর্ঘদিন জেলে ছিলাম। এ সময় অলিভার আমার চিন্তা-চেতনায় সব সময় জুড়ে থাকতেন। আমরা দু'জন দু জায়গায় থাকলেও যোগাযোগ রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতাম। সম্ভবত এ কারণেই তার মৃত্যু আমাকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। তার প্রতি আমার যতটা আনুগত্য ছিল পৃথিবীর আর কোন মানুষের প্রতি ততটা ছিল না। তার কফিনের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, আমি নিজেই যেন মরে গেছি।

আমরা ক্ষমতায় না থাকলেও অলিভারের শেষকৃত্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় করার উদ্যোগ নিলাম। সোয়েটোর স্টেডিয়ামে অলিভার টিম্বুকে কফিনে রাখা হল। এএনসির প্রতি সমর্থন ছিল এমন অনেক দেশের শীর্ষ ব্যক্তিরা শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। এম কে সৈন্যরা তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করল। ২১বার আকাশে গুলি ছুঁড়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাল। সারা জীবন দেশের জন্য সংগ্রাম করেও শেষ বেলায় এসে গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকা তিনি দেখে যেতে পারলেন না– এই দুঃখ এখনও আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

১১২

১৯৯৩ সালের ৩ জুনের কথা খুব কম লোকেরই মনে আছে। অথচ এটা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের সবচেয়ে ঐতিহাসিক দিন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কয়েকমাসের বহুদলীয় আলোচনা শেষে ওইদিন দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের প্রথম জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। তারিখ ছিল ২৭ এপ্রিল ১৯৯৪। এটা ছিল অসাম্প্রদায়িক নির্বাচন। একজন ভোটারের এক ভোট দেয়ার নির্বাচন।

ওই দিন সিদ্ধান্ত হয় ভোটাররা ৪শ জন পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচন করবে। এরা পার্লামেন্টে গিয়ে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবেন। পার্লামেন্টের প্রথম কাজ হবে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা।

এপ্রিলে আলোচনা পুনরায় শুরু হল। এবার ইনকাথা, প্যানপ্যাসিফিক কংগ্রেস (প্যাক), কনজারভেটিভ পার্টিসহ ২৬টি রাজনৈতিক দল এতে অংশ নিল। জুলাই মাসে বহুদলীয় ফোরাম অন্তবর্তীকালীন সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করতে সম্মত হল। এছাড়া আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে পার্লামেন্ট হবে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। এর সদস্য সংখ্যা হবে ৪শ জন। জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলো থেকে আনুপাতিক হারে এদের নির্বাচন করা হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করা হবে সিনেট সদস্যদের।

আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়ের পার্লামেন্ট নির্বাচন এবং জাতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন একই দিন অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আঞ্চলিক পরিষদের সংবিধান প্রণয়ন করা হবে।

চিফ বুথেলজি নির্বাচনের আগেই সংবিধান চূড়ান্ত করতে চাইলেন। সংবিধান চূড়ান্ত হবার আগে নির্বাচনের তারিখ ঠিক করার প্রতিবাদে তিনি আলোচনা থেকে ওয়াকআউট করলেন।

আগস্টে অন্তবর্তীকালীন সংবিধানের আরেকটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়। এতে বিভিন্ন অঞ্চলকে অধিকতর ক্ষমতা দেয়া হয়। কিন্তু তারপরও চিফ বুথেলজি ও রক্ষণশীল দল এর প্রতি তেমন একটা আগ্রহ দেখায়নি।

১৮ নভেম্বর মধ্যরাতে বহুদলীয় কনফারেন্সের প্লেনারী সেশন বা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অন্তবর্তীকালীন সংবিধান অনুমোদন করা হয়। বিদ্যমান অবশিষ্ট মতৈক্য

দূর করার ঘোষণা দেয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, দুই তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ীদের বদলে যেসব রাজনৈতিক দল কমপক্ষে ৫ শতাংশ ভোট পাবে তারাই মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পাবেন। ১৯৯৯ সালের আগে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না। ফলে জাতীয় ঐক্যের সরকার কমপক্ষে ৫ বছর দেশ শাসনের সুযোগ পাবে। নির্বাচনে আমরা একটি ব্যালট পেপার ব্যবহারের কথা বললেও সরকার দুটি ব্যালট পেপার ব্যবহারের ওপর জোর দেয়। শেষ পর্যন্ত দুটি ব্যালটই ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একটি জাতীয় পার্লামেন্টের জন্য, অন্যটি স্থানীয় পর্যায়ের পার্লামেন্টের জন্য। অন্তবর্তকালীন নির্বাহী কাউন্সিল সুষ্ঠু পরিবেশে ভোট অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা দেয়। ২২ ডিসেম্বর থেকে ২৭ এপ্রিল নির্বাচনের দিন পর্যন্ত এই কাউন্সিলই সরকারের দায়িত্ব পালন করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। নির্বাচনের সব দায় দায়িত্বঅর্পণ করা হয় একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের ওপর।

জীবনে আমি তেমন কোন পুরস্কার পাইনি। পুরস্কারের আশা থাকলে কেউ মুক্তিযোদ্ধা হতে পারে না। তবে এরপরও ১৯৯৩ সালে আমি প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্কের সঙ্গে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাই। এ পুরস্কারের আলাদা একটি অর্থ ছিল আমার কাছে। এর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস জড়িত ছিল।

নোবেল বিজয়ী আমি তৃতীয় দক্ষিণ আফ্রিকান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমার আগে আরেকজন দক্ষিণ আফ্রিকান নোবেল পুরস্কার পান। চিফ আলবার্ট লুথুলি নোবেল পান ১৯৬০ সালে। দ্বিতীয় দক্ষিণ আফ্রিকান হিসেবে ১৯৮৪ সালে নোবেল পান আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অবদান হিসেবে তাকে এই পুরস্কার দেয়া হয়।

নোবেল পুরস্কারটি ছিল সব দক্ষিণ আফ্রিকানের জন্য। বিশেষ করে যারা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করছে তাদের পক্ষ থেকে আমি পুরস্কারটি গ্রহণ করি। নোবেল পুরস্কার ছিল একটা এটা আমি কখনও ভাবিনি। আমার মনে হল দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিটি সংগ্রামী জনতাই একটি করে নোবেল পেল। আমরা সব সময়ই শান্তিবাদী ছিলাম। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এটা বুঝত। আমি রোবেন দ্বীপে বন্দি থাকা অবস্থায় এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কখনই প্রচার করে বেড়াত না যে আমরা সহিংসতাকে সমর্থন করি। সম্ভবত একারণেই নোবেল কমিটি আমাকে এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে।

নরওয়ে ও সুইডেনে বরাবরই আমাকে দারুণ সম্মান করত। ১৯৫০ ও ১৯৬০ সালে এএনসির প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য আমরা পশ্চিমা দেশগুলো সফর

করি। সে সময় নরওয়ে ও সুইডেন সরকার আমাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তারা আমাদের আর্থিকভাবে সাহায্য করে। অনেককে বৃত্তি প্রদান করে। রাজনৈতিক বন্দিদের আইনি সহায়তায় এগিয়ে আসে।

নরওয়েতে পুরস্কার নেয়ার আগে দেয়া বক্তৃতায় পুরস্কার দেয়ার জন্য নোবেল কমিটিকে ধন্যবাদ জানাই। নতুন দক্ষিণ আফ্রিকা গড়ার জন্য আমরা যেসব পদক্ষেপ নিয়েছি তা তুলে ধরি। নতুন দক্ষিণ আফ্রিকা বিনির্মাণে ডি. ক্লার্কের ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।

বক্তৃতায় ডি ক্লার্কের আরও প্রশংসা করে বলি, দেশ এতদিন ভুল পথে চলেছে–এ কথা মি ডি ক্লার্ক তার কাজেকর্মে স্বীকার করে নিয়েছেন। বর্ণবাদ প্রথা অবসানেও পদক্ষেপ নিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যৎ গঠনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যা বেরিয়ে এসেছে সেটা তিনি মেনে নিয়েছেন।

আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় বিভিন্ন সময়ে মি. ডি ক্লার্কের প্রচণ্ড সমালোচনা করা সত্ত্বেও এখন আমি তার সঙ্গে যৌথভাবে কেমন করে পুরস্কার গ্রহণ করব। জবাবে বলি, আমি শুধু ডি ক্লার্কের সমালোচকই নই, প্রশংসাকারীও বটে। দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে ডি ক্লার্কের অসাধারণ ভূমিকাকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। শত্রুর সঙ্গে শান্তি চাইলে, তার সঙ্গে কাজ করতে হয়। তখন শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়।

জাতীয় নির্বাচনের প্রচারণার সময় নির্ধারণ করা হয় ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু এর আগেই আমরা প্রচারণা শুরু করে দেই। অবশ্য ন্যাশনাল পার্টি প্রচারণা শুরু করেছিল তারও আগে। আমাকে যেদিন জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয় এক অর্থে সেদিনই তারা নির্বাচনী প্রচার শুরু করে।

বিভিন্ন জরিপে এএনসি এগিয়ে থাকলেও আমাদের বড় ধরণের কোন বিজয়ের আভাস দেয়া হয়নি। এরপরও আমি বড় ধরণের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলাম। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছিলেন সুপরিচিত, অভিজ্ঞ ও বিত্তবান।

আমাদের নির্বাচনী প্রচারণার দায়িত্বে ছিলেন *পোপো মোলিফি*, *টেরর লেকোটা* এবং *গোয়াস্তো গর্ডহ্যান*। এ দায়িত্বটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের হিসেব অনুসারে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি। এদের বেশিরভাগই এর আগে কখনও ভোট দেননি। আমাদের অধিকাংশ ভোটার ছিল অশিক্ষিত।

ভোটের গুরুত্ব তাদের কাছে তেমন একটা ছিল না। নির্বাচন কমিশন ১০ হাজার ভোট কেন্দ্রে ভোট নেয়ার ব্যবস্থা করে। ভোটারদেরকে ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করতে আমরা হাজার হাজার তরুণকে প্রশিক্ষণ দেই।

নির্বাচনে বিজয়ের জন্য আমরা পিপলস ফোরাম গঠন করলাম। এএনসি প্রার্থীরা দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরতে লাগলেন। মানুষের দ্বারে দ্বারে গেলেন। ভোট চাইলেন। শহর-গ্রামে সভা-সমাবেশ সমানে চলতে লাগল। এএনসি গ্রামের লোকজনকে একসঙ্গে জড়ো করে তাদের দাবি-দাওয়া চাহিদার কথা শুনত। এএনসি প্রার্থীদের ব্যাপারে কোন আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞেস করত। বিল ক্লিনটন আমেরিকায় যে ধাঁচের প্রচারণা চালিয়েছিলেন। পিপলস ফোরাম ঠিক সে আদলে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে লাগল। পিপলস ফোরাম ছিল জনগণের পার্লামেন্ট। এখানে জনগণের কথা শোনা হত। সেভাবে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হত। নেতারা ছিল সাধারণ দর্শকদের মত।

নির্বাচনকে সামনে রেখে পিপলস ফোরামের কার্যক্রম জোরেসোরে চলতে লাগল। নভেম্বরে আমি নাটাল, ট্রান্সভ্যাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট নির্বাচনী প্রচারণায় এলাম। এ সময় এসব অঞ্চলে প্রতিদিন পিপলস ফোরামের অন্তত পক্ষে তিনটি সভায় বক্তৃতা করতাম। পিপলস ফোরামের প্রতিটি সভাই ছিল উপভোগ্য। লোকজন নিজেদের মনের কথা বলতে পারত। নেতাদের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করত। দেশের জন্য তাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইত। ফোরামের কথা বার্তা থেকে যেসব পরামর্শ উঠে আসত সেগুলো আমরা পালনের চেষ্টা করতাম। আমরা পুরো দেশ চষে বেড়াতে লাগলাম। আমাদের বার্তা জনগণের কাছে পৌছে দিতে শুরু করলাম। জনগণের উদ্দেশ্যে আমরা বলতাম– যোগ্য লোককে ভোটদিন। এএনসিকে ভোট দিন। এএনসি দীর্ঘ ৮০ বছর ধরে বর্ণবাদ, অন্যায়-জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে– এএনসিকে এজন্য ভোট দিবেন না। বরং এএনসিকে এজন্য ভোট দিবেন যে, এ দলের লোকেরা যোগ্য। দেশের সত্যিকারের পরিবর্তন তারাই আনতে পারবে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করতে এএনসিকে ভোট দিন।

এএনসির নির্বাচনী ইশতেহার ছিল ১৫০ পৃষ্ঠার। ক্ষমতায় গেলে দল যা-যা করবে তার বিবরণ ছিল এতে। ইশতেহারে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সবার জন্য স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা, দুস্থদের জন্য ১০ লাখ নতুন বাড়ি নির্মাণ, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, ১০ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, আদালতের মাধ্যমে ভূমি বন্টন সহ

বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। ইশতেহারের নাম দেয়া হয় এ *বেটার লাইফ ফর অল* বা সবার জন্য উন্নত জীবন। এএনসির নির্বাচনী স্লোগানও ছিল এটা।

আমরা যা করতে পারবো নির্বাচনী প্রচারণার সময় আমরা জনগণকে তাই বলতাম। যা পারব না তা বলতে প্রার্থীদের নিষেধ করে দিলাম। অনেকেই ভাবত নির্বাচনের পর রাতারাতি তাদের জীবন বদলে যাবে। কিন্তু এটা সম্ভব ছিল না। জনগণকে আমি প্রায়ই বলতাম– নির্বাচনের পর রাস্তা দিয়ে মার্সিডিস গাড়ি চালাবেন– এমন আশা কেউ করবেন না। বরং নির্বাচনের পর বাড়ির পেছনের পুকুরেই সাঁতার কাটবেন এমন আশাই করবেন।

আমি জনগণকে বলি, নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে না পারলে, নিজেদেরকে মানব সম্পদ হিসেবে গড়তে না পারলে রাতারাতি জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন হয়ে যাবে এমন আশা করাও ঠিক হবে না। আপনাদের অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে। দিনবদলের পালা দেখার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই ৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে। ভালো কিছু পেতে হলে আপনাদেরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তবে আপনারা না খেয়ে না পরে থাকবেন এমনটাও আমরা হতে দিব না।

শ্বেতাঙ্গদের উদ্দেশ্যে বলি, তারা দেশ ছেড়ে চলে যাক এটা তিনি কখনই চান না। আমাদের মত তারাও দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা। এটা তাদেরই বাসভূমি। বর্ণবাদের বিষবাষ্প আমরা কিছুতেই ছড়াব না। কৃষ্ণাঙ্গদের নিরাপত্তা ও সুন্দর ভবিষ্যত নির্মাণে তারা মনোযোগী হবেন।

প্রত্যেক সমাবেশে জনগণকে শিখিয়ে দেয়া কিভাবে তারা ভোট দিবে। ব্যালট কি, তাতে কি থাকবে, কোথায় সিল হতে হবে। ব্যালট কিভাবে ভাজ করতে হবে। এসব ব্যাপারে সবাইকে ধারণা দেয়া হয়।

১১৩

স্বাধীনতা এখন দ্বারপ্রান্তে। অন্তবর্তীকালীন নির্বাহী পরিষদ কাজ শুরু করল নতুন বছরের শুরুতে। কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিল। ইনকাথা নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে প্রতিরোধকারীদের দলে ভিড়লো। চিফ বুথেলজির সমর্থনে রাজা জুয়েলিথিন কোয়ালুজুর স্বায়ত্বশাসন দাবি করলেন। তার প্রদেশের

ভোটারদেরকে তিনি ভোট দিতে নিরুৎসাহিত করলেন। শ্বেতাঙ্গদের ডানপন্থী কিছু দলও নির্বাচন বয়কটের ডাক দেয়।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সাল ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধিত হওয়ার শেষ দিন। কিন্তু ওইদিন ইনকাথা, কনজারভেটিভ পার্টি ও আফ্রিকানার ফক্কসফ্রন্ট ভোটের জন্য নিবন্ধন করা থেকে বিরত থাকে। বপুথাটসাওয়ানা এলাকার আঞ্চলিক সরকারও নির্বাচন করবে না বলে ঘোষণা দেয়। এসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়ায় আমি বেশ বিব্রত বোধ করি। তাদেরকে নির্বাচনে আনার জন্য আমরা বেশ ছাড় দিয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেই। আমরা জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিষদের জন্য আলাদা আলাদা ব্যালট পেপার ব্যবহারে সম্মত হই। প্রদেশগুলোকে আরও ক্ষমতা দেয়া হবে বলে জানাই। নাটাল প্রদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে সাংবিধানিকভাবে মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেই।

১মে চিফ বুথেলজির সঙ্গে ডারবানে আমি বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নিলাম। বৈঠকের আগে এক বিশাল সমাবেশে বললাম, দেশের শান্তির জন্য আমি তাদের হাতে পায়ে পর্যন্ত ধরতে রাজি আছি যারা বিভিন্ন সময়ে দেশে রক্ত বইয়ে দিয়েছে।

সাংবিধানিক বিষয়ে ঐকমত্য হবার পর বুথেলজি নির্বাচনের জন্য নিবন্ধন করাতে রাজি হন। এটা ছিল খুবই ইতিবাচক ও আনন্দের ঘটনা। নিবন্ধনের শেষ দিনে জেনারেল ভিলজোয়েন তার নবগঠিত ফ্রিডম ফ্রন্ট পার্টির নিবন্ধন করান। তবে স্বায়ত্বশাসিত বপুথাটসাওয়ান এলাকার প্রেসিডেন্ট লুকাস মেঙ্গোপি নির্বাচন না করার ব্যাপারে অনড় থাকলেন। আমি তাকে বললাম, নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে জনগণকে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দিন। দেখেন তারা নির্বাচনের পক্ষে রায় দেয় কিনা। আমি নিশ্চিত জনগণকে মতামত প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ দেয়া হলে তারা নির্বাচনের পক্ষে মত দিবে। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। আমার এ আহ্বানের পর নির্বাচনের পরে ঐ এলাকায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। নির্বাচনে যোগ দেয়ার সমর্থনে রাস্তায় সভা-সমাবেশ হয়। ছাত্ররা পথে নামে। রেডিও-টিভির কর্মীরা ধর্মঘট শুরু করে। মঙ্গোপি নিরুপায় হয়ে রাস্তায় সেনা নামান। মার্চে তার সেনাবাহিনীই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ব্রিগেডিয়ার জিকুজো প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দেন।

এরই মধ্যে নাটালের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে ওঠে। ইনকাথা সমর্থকরা নির্বাচনী সভা-সমাবেশে বাধা দিতে থাকে। এএনসির পোস্টার লাগাতে গিয়ে নাটালে ইনকাথা কর্মীদের হাতে এএনসির ৫০ জন নির্বাচনী কর্মী নির্মমভাবে নিহত হয়। মার্চে বিচারপতি জোহাম ক্রিগলার আমাকে ও মি. ডি ক্লার্ককে জানান, কোয়াজুলু সরকারের সহযোগিতা ছাড়া অথবা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া ঐ এলাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। নিজেদের শক্তিমত্তা প্রদর্শনের জন্য নাটালের রাজধানী ডারবানে এএনসি এক বিশাল সমাবেশ করে। আমাদের দেখাদেখি ইনকাথা জোহান্সবার্গে বিশাল সমাবেশ করার ঘোষণা দেয়।

২৮ মার্চ ইনকাথার হাজার হাজার সমর্থক রাজধানী জোহান্সবার্গে জড়ো হতে থাকে। ইনকাথার একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এএনসির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শেল হাউসে আক্রমণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু সশস্ত্র রক্ষীদের কারণে তাদের হামলা দৃশ্যত ব্যর্থ হয়। অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা এএনসির সদর দপ্তরকে লক্ষ্য করে দূর থেকে গুলি বর্ষণ করে। এতে ৫৩ জন লোক নিহত হয়। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। নির্বাচন বানচালের জন্য ইনকাথা সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু আমি ও ডি ক্লার্ক নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ছিলাম অনড়।

ইনকাথাকে নির্বাচনে অংশ নিতে রাজি করাতে আমি আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারীদের শরণাপন্ন হলাম। ১৩ এপ্রিল মধ্যস্থতাকারীরা আসলেন। এদের মধ্যে ছিলেন, সাবেক ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্যারিংটন, সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার।

ইনকাথা নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা বলতে প্রথমে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু চিফ বুথেলজি যখন দেখলেন নির্বাচন ঠেকানোর কোন রাস্তাই নেই তখন তিনি নমনীয় হন। ১৯ এপ্রিল বুথেলজি জুলু প্রদেশের অধিকতর স্বায়ত্বশাসনের শর্তে নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দেন।

নির্বাচনের কয়েকদিন আগে মি. ডি ক্লার্ক ও আমি বিতর্কে অবতীর্ণ হই। টেলিভিশনে এটা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ফোর্ট হেয়ারে অনুষ্ঠিত ওই বিতর্ক ছিল খুবই প্রাণবন্ত ও পরিচ্ছন্ন। আমার বিতর্ক করার অভ্যাসটা গড়ে উঠেছিল রোবেন দ্বীপে থাকাকালীন। চুনাপাথরের খনিতে কাজের ফাঁকে আমরা নানা বিষয় নিয়ে বিতর্ক করতাম। সে দক্ষতা এ বিতর্কে কাজে লাগাই। বিতর্ক অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল পার্টি থেকে আমাকে খোঁচা মেরে অনেক কথা বলা হয়।

আমি সাবলিলভাবে সেগুলির জবাব দেই। পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের বর্ণবাদী নীতি, সহিংসতার ইন্ধনসহ নানা অপকর্ম কৌশলে তুলে ধরি। এএনসির বিরুদ্ধে যেসব বিষোদ্গার করা হচ্ছে সেগুলোর জবাব দেই। বিতর্কের এক পর্যায়ে মি. ডি ক্লার্ককে লক্ষ্য করে বলি, যে কয়জন লোকের ওপর আমি আস্থা রাখতে পারি তার অন্যতম হলেন আপনি। আপনার হাত ধরেই আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। আমার এ কথায় ক্লার্ক রীতিমত বিস্মিত হন।

১১৪

২৭ এপ্রিল আমি ভোট দিলাম। ভোট হয় মোট চারদিনে। আমি ভোট দেই দ্বিতীয় দিন। বয়স্ক প্রতিবন্দী এবং প্রবাসী আফ্রিকানরা ভোট দেন ২৬ এপ্রিল। ভোট দেয়ার জন্য আমি নাটালকে বেছে নেই। সংঘাতপ্রবণ ও বিচ্ছিন্ন এ প্রদেশটিতে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হচ্ছে বিশ্ববাসীকে এটা বোঝানোর জন্যই আমি ভোট কেন্দ্র হিসেবে নাটালকে বেছে নেই।

নাটাল প্রদেশের রাজধানী ডারবানের উত্তরে অবস্থিত ইনানডা এলাকায় আমি ভোট দেয়ার জন্য যাই। সেখানকার ওহলাঙ্গি হাই স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেই। এ শহরে শুয়ে আছেন এএনসির প্রথম প্রেসিডেন্ট জন ডিউব। এই দেশপ্রেমিক আফ্রিকান ১৯১২ সালে এএনসি প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ৮২ বছরের দীর্ঘ জীবন তিনি উৎসর্গ করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য।

দক্ষিণ আফ্রিকার ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের মাত্র দু'বছর আগে এ দু'নিয়া ছেড়ে চলে যান। ভোট দেয়ার আগে আমি তার কবরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

ওই ছোট্ট স্কুলের পাশে তার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। দক্ষিণ আফ্রিকার অতীত ও বর্তমান আমার স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়। ভোট দিতে যাওয়ার আগে ডিউবের মত মহান নেতাদের অবদানের কথা মনে পড়তে থাকে। মনে হল তাদের ত্যাগের ফসল আজকের এই দিন। অধিকার আদায়ের আজকের দিনটির জন্য যেসব নারী পুরুষ জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের কথা মনে পড়তে থাকল। অলিভার টিম্বু, ক্রিস হানি, চিফ লুথুলি ও ব্রাম ফিশ্চারের কথা প্রচণ্ডভাবে আমার মনে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকল। এসব মহান নেতাদের আত্মত্যাগের ফলে আজ আফ্রিকানরা ভোট দিচ্ছে।

জোশিয়া গাম্বিডি, জি. এম নাইকার, ড. আব্দুল্লাহ আব্দুর রহিম, লিলিয়ানস এনগোয়ি, হেলেন জোসেফ, ইউসুফ দাদু, মোসে কাত্তানি এদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলাম, মনে হল আমি একা ভোট কেন্দ্রে যাচ্ছি না, তাদেরকে সাথে নিয়েই যাচ্ছি। আমার বারবার মনে হল সবাইকে নিয়েই যেন ২৭ এপ্রিল ভোট দিলাম।

ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের সময় সাংবাদিকরা আমাকে ঘিরে ধরল। কাকে ভোট দিব জানতে চাইল। আমি হাসলাম। বললাম, সকালেই ঠিক করে ফেলেছি কাকে ভোট দিব। আমি এএনসি প্রার্থীকে ভোট দিলাম। ব্যালট বাক্সে ব্যালট পেপার ফেললাম। এটা ছিল আমার জীবনের প্রথম ভোট।

দক্ষিণ আফ্রিকার ঐতিহাসিক ওই নির্বাচনের কথা আমার স্মৃতিতে আজও জ্বলজ্বল করছে। সব ভোট কেন্দ্রে ছিল লম্বা লাইন। ছোট রাস্তা ছাপিয়ে সে ভীড় বড় রাস্তায় গিয়ে ঠেকেছিল। শহর-গ্রাম সব জায়গায় ছিল ভোটারদের প্রাণোচ্ছল পদচারণা। এক বৃদ্ধ মহিলা আমাকে বললেন, ৫০ বছর ধরে তিনি আজকের এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ভোট দেয়াটা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা।

ভোটের দিনটি ছিল উৎসবের দিনের মত। নির্বাচনের দিন সামান্য সহিংসতা হলেও গোটা পরিবেশ ছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ। মনে হল এ যেন আরেক আফ্রিকা। আফ্রিকানরা নবজন্ম লাভ করে ভোট কেন্দ্রে এসেছে। যদিও ভোট কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, বিশৃংখলা, জালভোট, গুজব- এসব কিছু থাকলেও গণতন্ত্রের জয়কে রোখার মত তা যথেষ্ট ছিল না।

ভোটের ফলাফল তৈরি করতে কয়েক দিন লেগে গেল। আমরা ৬২ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট পেলাম। দুই তৃতীয়াংশের চেয়ে এটা সামান্য কম। এরপরও সংবিধান এককভাবে অনুমোদনের আশা ছাড়লাম না। ছোটখাট কিছু দলের সমর্থনে পার্লামেন্টে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারব বলে আশা জিইয়ে রাখলাম।

শতকরা হিসেবে জাতীয় পার্লামেন্টের ৪০০ আসনের মধ্যে আমরা ২৫২টি আসন লাভ করলাম। ট্রান্সভালের উত্তর ও পূর্বাঞ্চল, কেপ শহরের কিছু জায়গা ও ফ্রি স্টেটে আমরা নিরঙ্কুশ জয় পাই। কেপ শহরের পূর্বাঞ্চলে আমরা পাই ৩৩

শতাংশ ভোট। এখানে অবশ্য জয় পায় ন্যাশনাল পার্টি। এখানে শ্বেতাঙ্গসহ মিশ্রবর্ণের লোকজন বেশি ছিল।

নাটাল ও কোয়াজুলুতে আমরা ভোট পাই ৩২ শতাংশ। এখানে জয় পায় ইনকাথা। নাটালে অবশ্য সহিংসতার আশংকায় অনেক ভোটার ঘর থেকে বের হননি। এজন্য আমাদের পক্ষে ধারণার চেয়ে কম ভোট পড়ে। এখানে ভোট কারচুপি ও জালভোটেরও অভিযোগ ছিল। তবে দুই তৃতীয়াংশ আমরা না পাওয়ায় এএনসির অনেক নেতাকর্মী হতাশ হন। কিন্তু আমি মোটেই তা হইনি। বরং ফলাফলে আমি বেশ সন্তুষ্ট ছিলাম। এই ভেবে যে, পরবর্তী সংবিধান সবাইকে নিয়ে করতে পারব যাতে কেউ না বলতে পারে ওটা এএনসির সংবিধান। আমি চাচ্ছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য একটি সংবিধান। একটি সত্যিকারের জাতীয় ঐক্যের সরকার।

২ মে বিকেলে মি ডি. ক্লার্ক জাতীর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত বিনয় বিনম্রভাবে ভাষণ দেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে তিন দশক দেশ শাসনকারি শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের পরাজয় তিনি মেনে নেন। ওইদিন বিকেলে জোহান্সবার্গের কার্লটন হোটেলে এএনসি বিজয় সমাবেশ করে। আমি ওই দিন জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম। ডাক্তার আমাকে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেন। আমি স্টেজে যাই রাত নয়টায়। এ সময় আমার মুখে ছিল বর্ণিল হাসি।

জনতার উদ্দেশ্যে আমি বলি ডাক্তার আমাকে অসুস্থতার কারণে এ অনুষ্ঠানে আসতে বারণ করেছিলেন। আশা করছি আমার এখানে আসার খবর ডাক্তারকে বলবেন না। পরাজয় মেনে নেয়ায় এবং অত্যন্ত আন্তরিকতা প্রদর্শন করায় আমি মি. ডি ক্লার্ককে অভিনন্দন জানাই। এএনসির জন্য যারা জান-প্রাণ দিয়ে খাটাখাটি করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে কৃষ্ণাঙ্গদের মহান নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের স্ত্রী মিসেস কোরেটা স্কট কিংও উপস্থিত ছিলেন। তার মহান স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি অনুষ্ঠানে আরো কিছু কথাবার্তা বলি। বক্তৃতায় আমি বলি–

আমাদের দেশের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন আজ। সাধারণ মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা অনেক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। এখন জয় আপনাদের পদতলে। আমরা অবশেষে স্বাধীন হলাম। আপনাদের ভালবাসা নিয়ে আমি আপনাদের পাশেই থাকতে চাই। আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তে এএনসির মহান নেতাদের

শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। আমি আপনাদের সেবক ছাড়া অন্য কিছু নই। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সব ক্ষেত্রেই আপনাদের সেবা করে যেতে চাই। পুরনো ক্ষত মুছে এখন নতুন দক্ষিণ আফ্রিকা গড়ার সময় এসেছে।

ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই সবাই ধরে নিয়েছিল এএনসিই সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। দেশের ক্ষত নিরসনে আমি সবাইকে নিয়েই সরকার গঠন করতে চাচ্ছিলাম। আমি জানতাম শ্বেতাঙ্গ, ইন্ডিয়ান ও মিশ্রবর্ণের অনেকে ভবিষ্যতে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। এ অবস্থার অবসানে আমি তখনি পদক্ষেপ নিতে চাইলাম। আমি জানিয়ে দিলাম সবাইকে নিয়ে আমরা এ দেশ গড়তে চাই। ঐক্যবদ্ধভাবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সামনে এগিয়ে নিতে চাই।

১১৫

১০ মে। ভোরের আলো জ্বলজ্বল করছিল। কয়েকদিন ধরেই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তায় ভাসছিলাম। আফ্রিকার ইতিহাসের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে তারা আমাকে শুভেচ্ছা জানান। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেশ বিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসতে শুরু করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটি আন্তর্জাতিক নেতাদের বড় এক মিলন মেলায় পরিণত হয়।

প্রেটোরিয়ার অনিন্দ্যসুন্দর ইউনিয়ন বিল্ডিংয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিগত সময়ে এটা ছিল শ্বেতাঙ্গদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এখন এটা পরিণত হল দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। যেখানে সাম্প্রদায়িকতা নেই। নেই বর্ণবাদ। সব বর্ণের সব সম্প্রদায়ের ঠাঁই এখন এক কাতারে।

শরতের ঝরঝরা দিনে মেয়ে জিনানিকে সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠান স্থলে পৌঁছলাম। দ্বিতীয়-ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হিসেবে মি. ডি ক্লার্ক প্রথমে শপথ নিলেন। এরপর থাবো এমবেকি প্রথম ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। তারপর আসলো

আমার পালা। সংবিধানকে যে কোন মূল্যে সমুন্নত রাখা, রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণের অঙ্গীকারের মধ্যে দিয়ে আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলাম।

দেশ বিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আমার শপথ নেয়া অবলোকন করলেন। শপথ অনুষ্ঠানে আমি বলি– আজ আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি তারা সবাই নতুন স্বাধীনতা ও আশার আলোয় আলোকিত হলাম। অমানবিকতার করুণ অধ্যায় আমরা দীর্ঘ সময় ধরে প্রত্যক্ষ করেছি। এখন আমরা এমন এক সমাজ গড়বো যেখানে মানবিকতাই হবে মূখ্য বিষয়। কয়েকদিন আগেও আমরা যারা বন্দি ছিলাম আজ তারাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দকে এখানে স্বাগত জানাতে পেরেছি। এ অনুষ্ঠানে আসার জন্য বিভিন্ন দেশের মহামান্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা এমন এক সময়ে এখানে আসলেন যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ন্যায়ের জয় হয়েছে, শান্তি, মানবিকতা ও সাধারণ মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমরা রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করেছি। জনগণকে আমরা দারিদ্র, বঞ্চনা, পীড়াসহ সব ধরণের বৈষম্য থেকে মুক্তি দেয়ার অঙ্গীকার করছি।

এই সুন্দর দেশে আর কখনই অত্যাচার-নিপীড়নের খড়গ নেমে আসবে না। আমরা যে মহান মানবিকতা অর্জন করেছি তার বাইরে সূর্য কখনও অস্ত যাবে না। আমাদের অর্জিত স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী হোক। ঈশ্বর দক্ষিণ আফ্রিকার মঙ্গল করুন।

আমার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরপরই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান শুরু হল। দক্ষিণ আফ্রিকার জেট বিমানগুলো আকাশ দিয়ে উড়ে গেল। জঙ্গি হেলিকপ্টারগুলো মহড়া শুরু করল। সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীর সদস্যরা ইউনিয়ন বিল্ডিং এর সামনে কুচকাওয়াজ শুরু করল। এটা শুধু সশস্ত্র বাহিনীর কুচকাওয়াজই ছিল না এটা ছিল নতুন সরকার ও গণতন্ত্রের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শনের অনুষ্ঠান।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেনারেল, পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তারা মার্চপাস্টের সময় আমাকে স্যালিউট দিয়ে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করল। এ সময় আমি আনমনা হয়ে পড়লাম। আগের স্মৃতি মনে পড়ে গেল। এক সময় তারা আমাকে স্যালিউট দিত না বরং গ্রেফতার করত। সবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গি বিমানগুলো আকাশে কালো, লাল, সবুজ, নীল রঙের বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন পতাকা তৈরি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল।

এদিন দু ধরণের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। শ্বেতাঙ্গদের জন্য গাওয়া হল 'নাকোসি সিকেলি আই আফ্রিকা'। কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য গাওয়া হল 'ডাই স্টিম'।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মানুষের ভালবাসায় সিক্ত হলাম। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস বিবেচনায় এ দিন আমি অনন্য সাধারণ ব্যক্তিতে পরিণত হই। আমার জন্মের আগে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা গড়ে তোলে বর্ণভিত্তিক সমাজ। শোষন নির্যাতন ছিল এর হাতিয়ার। অন্ধকার ওই যুগে কৃষ্ণাঙ্গরা জমির কর্তৃত্ব হারায়। নিজদেশে পরবাসী হয়। শ্বেতাঙ্গরা যে সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তুলেছিল তা ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে নীপিড়নমূলক ও অমানবিক।

বিশ শতকের এই শেষ বেলায় সেই অন্ধকার যুগের অবসান হল। মানুষ তার অধিকার ফিরে পেল। সাদা-কালোর ব্যবধান ঘুচল। মানুষ পরিচয় পেল মানুষ হিসেবে। গায়ের রং বিবেচনায় নয়।

এ দিনটির জন্য কত ত্যাগ-তিতীক্ষা, কত প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কত লোক কতভাবে নিপীড়ীত হয়েছেন তারও কোন হিসেব নেই। অধিকার আদায়ের জন্য, নিজেদের স্বাধীনতার জন্য আমরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছি তারও তুলনা নেই।

আন্দোলন সংগ্রামের যে দীর্ঘ পরিক্রমা শুরু হয়েছিল তার আপাতত অবসান হল আমার হাত দিয়ে। আর আমার হাত দিয়ে শুরু হল নতুন আরেক সংগ্রাম দেশ গড়ার সংগ্রাম। সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের সংগ্রাম।

দীর্ঘদিনের বর্ণবাদী নীতি সমাজে এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। আমাদের লোকজন সমাজের সব দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। আজকের অর্জনের মধ্যে দিয়ে বর্ণবাদীদের সৃষ্ট ক্ষতের অবসান হল। এ ক্ষত অবসানে যারা বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অলিভার টিম্বু, ওয়াল্টার সিসুলু, চিফ লুথুলি, ইউসুফ দাদু, ব্রাম ফিশ্চার, রবার্ট সাবুকি। তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম, বিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞোচিত কর্মকাণ্ডের কারণেই আজকের এই দিনটি আমরা পেলাম। তা না হলে এ অর্জন কখনই সম্ভব হত না।

আমাদের দেশ খুবই ধনী। হীরা, স্বর্ণসহ নানা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু এতদিন এসব সম্পদ গুটি কয়েক লোকের হাতে কুক্ষিগত থাকায় এ সম্পদ আমার মনে তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। কিন্তু আজ মনে হল এগুলো সাধারণ আফ্রিকানদের সম্পদ। এটা সবার কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে।

দেশে বড় ধরণের পরিবর্তন আসার ব্যাপারে আমি বরাবরই আশাবাদী ছিলাম। যেসব মহান নেতাদের নাম উল্লেখ করলাম তাদের অবদানের জন্যই বরং আফ্রিকার আপামর সাধারণ নরনারী যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তার জন্যই এ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। আমি মানুষের মনের অবস্থা সম্পর্কে সব সময়ই অবগত ছিলাম। আমি জানতাম কেউ অন্যকে ঘৃণা করার বা কৃষ্ণাঙ্গদের ঘৃণা করার মানসিকতা নিয়ে জন্মায় না। মানুষকে ঘৃণা শেখানো হলে সে ঘৃণা করতে শেখে। ভালোবাসা শেখানো হলে সে অন্যকে ভালোবাসতে শেখে। জেল জীবনের অন্ধকার যুগেও অনেক কারারক্ষীর মাঝে আমি মানবিক গুণাবলী খুঁজে পেয়েছি।

মানুষের অন্তরে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসার অগ্নিশিখা কিছু দিনের জন্য দমিয়ে রাখা গেলেও একেবারে নিভিয়ে দেয়া যায় না।

আমরা আন্দোলন শুরু করেছিলাম খুব বড় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। এখানে কোন সংকীর্ণতা ছিল না। যুবক বয়সে আমি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগদান করি। তখনই সহকর্মীদের বিশ্বাস, সুউচ্চ দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে মুগ্ধ করেছে।

শত দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও আন্দোলন নিয়ে আমি কখনও হতাশ হইনি। আন্দোলনে সম্পৃক্ত হবার জন্য কোন দুঃখ-শোক তাপ আমার মনের ধারেকাছেও ভীড়তে পারেনি। বরং সব সময় ছিলাম আন্দোলনের জন্য নিবেদিত প্রাণ। সব সময় যে কোন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতাম। অবশ্য আমার এ আন্দোলনের জন্য আমার পরিবারকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

জীবনে সব মানুষের দু'টি নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকে। একটি পরিবার, মা বাবা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি। অন্যটি দেশের প্রতি দেশের মানুষের প্রতি, তার সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি। যেকোন সভ্য ও মানবিক সমাজে সামর্থ থাকলে মানুষ এ দুটি বাধ্যবাধকতা বা নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য এ নৈতিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না।

দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ বা মিশ্রবর্ণের মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করা ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এখানে চাইলেও পরিবারের জন্য কিছু করা যেত না। বরং রাষ্ট্র মানুষকে প্রায়ই নানা অজুহাতে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখত। মনে মনে স্থির করলাম যেসব দক্ষিণ আফ্রিকান এতদিন পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্য কিছু করতে পারেননি তাদেরকে সে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়া হবে আমার প্রথম কাজ।

আমি জন্মেছিলাম এক মুক্ত সমাজে। যেখানে ক্ষুধা ছিল না। আমি জন্মেছিলাম এমন এক সমাজে যেখানে অবাধে বিচরণ করতে পারতাম। মায়ের কুটিরের সামনের খোলা মাঠে ঘুরে বেড়াতাম। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট নদীতে মনের আনন্দে সাঁতার কাটতাম। রাতে খোলা প্রান্তরে শুয়ে আকাশের তারা গুনতাম।

একটু বড় হবার পর বাবার শাসন চাপল। আরেকটু বড় হবার পর গোত্রের নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হত। এসব নিয়ম-কানুন মানতে খুব একটা অসুবিধা হত না।

যখন যুবক হলাম দেখলাম বাল্যকালের সেই স্বাধীনতা কোথায় যেন ধোঁয়ায় মিশে গেছে। চারদিকে শুধু পরাধীনতার শৃংখল। ক্ষুধা দারিদ্র বেড়ে গেল উল্লেখযোগ্যভাবে।

ছাত্র অবস্থাতেই আমি ছিলাম স্বাধীনচেতা। অন্যদের কিভাবে স্বাধীন করা যায় সে চিন্তা সর্বক্ষণ ঘুরপাক খেত আমার মাথায়। পরে জোহান্সবার্গ গিয়ে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা নিলাম। আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলাম। এক পরিবারে বিয়ে করলাম। এমন এক পরিবারে যারা স্বাধীনতার জন্য ছিল নিবেদিত প্রাণ।

আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারলাম শুধু আমাকেই স্বাধীন হলে চলবে না। আমার ভাই-বোন সবাইকে স্বাধীন করতে হবে। আমার মনে হল দেশবাসীকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত করতে না পারলে নিজের স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। এসব দিক চিন্তা করেই আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে (এএনসি) যোগ দেই। এ সময় শুধু আমি নই দেশের বহু জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে।

দিনে দিনে জনগণের স্বাধীনতার আগ্রহ বাড়তে থাকে। এর জন্য তারা পাগল হয়ে ওঠে। এ সময় অত্যাচার নির্যাতনও বাড়তে থাকে। তবে আমি জানতাম কি কৃষ্ণাঙ্গ, কি শ্বেতাঙ্গ কেউ অত্যাচার-জুলুমকে মনে প্রাণে সমর্থন করতে পারে না। যেটা ন্যায় সেটাকে মেনে নেয়ার এক ধরণের মানসিক দূর্বলতা সবারই থাকে। আমি জানতাম, স্বাধীনভাবে কথা বলতে না পারাটা পরাধীনতারই শামিল। আরেকজনকে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার দিতে না পারাটা নিজের পরাধীনতার শামিল।

জেল থেকে বের হবার পর আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশের অত্যাচারিত ও নির্যাতিত মানুষকে স্বাধীন করা। অনেকে বলছেন, আমার সে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু আমি জানি আমার সে লক্ষ্য আজও পুরা হয়নি। সত্য বলতে কি আজও স্বাধীন হতে পারিনি। পরাধীনতার শৃংখল থেকে সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছি। আমরা এখনও চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌছতে পারিনি। এখনও আমাদের অনেক কাজ বাকি। মানুষকে ক্ষুধা দারিদ্র অন্যায় অবিচার থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত আমরা নিজেদের পুরোপুরি স্বাধীন বলতে পারব না।

স্বাধীনতার জন্য আমাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমি স্বাধীনতার সুউচ্চ পাহাড়ে আরোহন করেছি। পাহাড়ে উঠে আমি দেখতে পেলাম, আশেপাশে আরো অনেক পাহাড় আছে। সেগুলোতেও উঠতে হবে আমাকে। আমি এখন যে পাহাড়ে আছি সেটা একটু বিশ্রাম নেয়ার জায়গা মাত্র। আমাকে ছুটতে হবে আরো অনেক দূর। এ পথে আসবে অনেক বাধা বিপত্তি। তবুও আমাকে ছুটতে হবে। বিশ্রাম নেয়ার কোন অবকাশ নেই। স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একরাশ দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালন করতে আমাকে আরো অনেক দূর যেতে হবে। আমার পথ এখনও শেষ হয়নি।

এক নজরে নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন

১৯১৮ : দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ছোট্ট কুনু গ্রামে এক আদিবাসি ঝোসা গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন রলিহলাহলা নেলসন ম্যান্ডেলা।

১৯১৯ : শ্বেতাঙ্গ এক ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে নিজের বেশিরভাগ অর্থ, ভূ-সম্পত্তি আর গবাদিপশু হারালেন ম্যান্ডেলার বাবা।

১৯২৭ : বাবার মৃত্যুর পর ম্যান্ডেলার দেখাশোনার দায়িত্ব পেলেন থেমবু গোত্রের সর্দার জগিনথাবা ডালিনডিয়েবো।

১৯৪৩ : সাধারণ একজন কর্মী হিসেবে যোগ দিলেন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা এএনসিতে।

১৯৪৪ : ঘনিষ্ঠ বন্ধু অলিভার টিম্বু আর ওয়াল্টার সিসুলু এএনসির যুবদল গঠন করলেন। এ বছরই বিয়ে করেন তাঁর প্রথম স্ত্রী ইভলিনকে। ১৯৫৭ সালে বিয়েবিচ্ছেদের আগে তাঁদের ঘরে জন্ম নেয় তিনটি সন্তান।

১৯৫৫ : শ্বেতাঙ্গদের সমান সম্পত্তির অধিকার ও মানবাধিকার চেয়ে স্বাধীনতা সনদ উপস্থাপিত হলো কংগ্রেস অব দ্য পিপলে।

১৯৫৬ : রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হলো নেলসন ম্যান্ডেলাসহ আরও ১৫৫ জন রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে। অবশ্য চার বছরের বিচার শেষে তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বাতিল করে দেওয়া হয়।

১৯৫৮ : বিয়ে করলেন উইনি মাডিকিজেলাকে।

১৯৬০ : কালোদের অধিকার খর্ব করে— এমন একটি আইনের প্রতিবাদ করার সময় নারী-পুরুষ ও শিশুদের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। এতে মারা যায় ৬৯ জন। এএনসিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং গুপ্ত সামরিক শাখা গঠন করলেন ম্যান্ডেলা।

১৯৬৪ : এক বছরের বেশি সময় পালিয়ে বেড়ানোর পর পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। দেশদ্রোহ আর অন্তর্ঘাতের অভিযোগে আজীবন কারাদণ্ড হলো তাঁর এবং অন্তরিণ করে পাঠানো হলো রোবেন দ্বীপে। তাঁর মুক্তির জন্য প্রচারণা শুরু করলেন স্ত্রী উইনি ম্যান্ডেলা।

১৯৬৮-১৯৬৯ : ম্যান্ডেলার মা এবং গাড়ি দুর্ঘটনায় তার ছোট ছেলে মারা যায়। কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়নি ম্যান্ডেলাকে।

১৯৮০ : ম্যান্ডেলার মুক্তির দাবিতে তাঁর নির্বাসিত বন্ধু টেম্বো এক আন্তর্জাতিক প্রচারণার আয়োজন করলেন।

১৯৮৬ : আন্তর্জাতিকভাবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাহায্য ও ঋণ দিতে কঠোরতা আরোপ করা হলো।

১৯৯০ : আন্তর্জাতিক চাপের মুখে এএনসির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক। বহু গোত্রভিত্তিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা শুরু করল এএনসি আর শ্বেতাঙ্গ ন্যাশনাল পার্টি।

১৯৯২ : অপহরণ ও সন্ত্রাসী হামলায় সহযোগিতা করার জন্য অভিযুক্ত হওয়ায় স্ত্রী উইনিকে তালাক দিলেন ম্যান্ডেলা।

১৯৯৩ : রক্তাক্ত ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক অবস্থা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরণে প্রচেষ্টা চালানোর জন্য যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন নেলসন ম্যান্ডেলা এবং এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক।

১৯৯৪ : দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বহু জাতির অংশ গ্রহণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। জাতীয় সংসদে ৪০০ আসনের মধ্যে ২৫২টিই লাভ করল তাঁর দল এএনসি।

১৯৯৮ : আশিতম জন্মদিনে বিয়ে করলেন মোজাম্বিকের সাবেক প্রেসিডেন্টের বিধবা স্ত্রী গ্রাশা ম্যাশেলকে।

১৯৯৯ : প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দিলেন ম্যান্ডেলা।

২০০০ : বুরুন্ডির গৃহযুদ্ধ নিরসনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মনোনীত করা হলো তাঁকে।

২০০১ : ৮৩ বছর বয়সে প্রোস্টেট ক্যান্সার ধরা পড়ল তাঁর শরীরে।

২০০৪ : ১৫ জুলাই ব্যাংককে ১৫তম আন্তর্জাতিক এইডস কনফারেন্সে ভাষণ দেন। এখানেই ৪৬৬৬৪ ক্যাম্পেইনের ঘোষণা দিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। বললেন, আপনার জীবনের একটি মিনিট এইডস ক্যাম্পেইনের জন্য ব্যয় করুন।

২০০৭ : ব্রিটেনের পার্লামেন্ট স্কয়ারে পৃথিবীর মহত্তম নেতা হিসেবে ভাস্কর্য স্থাপন করা হলো তাঁর।

২০০৮ : নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নব্বইতম জন্মদিন উদযাপন।

২০০৯ : জীবনে চতুর্থবারের মতো ভোট দিলেন। ৯ মে নতুন প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমার শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

২০১০ : ১১ জুন নাতির মেয়ে জেনানি খুন হন। ওইদিনই তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এতে হাজির ছিলেন ম্যান্ডেলা।

২০১২ : ২৫ ফেব্রুয়ারি তলপেটের পীড়ার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন। ২৬ ফেব্রুয়ারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান।

২০১৩ : ৯ মার্চ হাসপাতালে ভর্তি হন, ১০ মার্চ ছাড়া পান। ২৭ মার্চ আবার ভর্তি হয়ে ৬ এপ্রিল ছাড়া পান। ৮ জুন আবার ভর্তি হন। ১৮ জুলাই হাসপাতালের বিছানায় ৯৫তম জন্মদিন কাটান। ১ সেপ্টেম্বর হাসপাতাল থেকে তাঁকে বাড়িতে নেওয়া হয়।

২০১৩ : ৫ ডিসেম্বর সারা বিশ্বের ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে পরলোক গমন করেন।

ট্রান্সকেইর
উমতাতায় ১৯
বছর বয়সে।

১৯৫২ সালে অলিভার
এবং আমি ফক্স স্ট্রীটে
প্রথম আফ্রিকান ল'
অফিস খুলি। ওই
অফিসে তোলা ছবি

ডেফিয়্যান্স ক্যাম্পেইন চলাকালীন আদালতের বাইরে আমি, ড. জেমস মোরোকা ও ইউসুফ দাদু।

ট্রান্সভাল সুপ্রীম কোর্টে প্যাট্রিক মোলোয়া ও রবার্ট রেশার সংগে
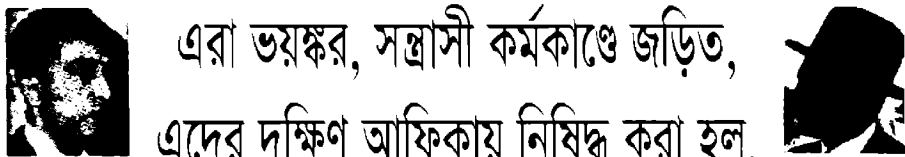
আমাদের নিষিদ্ধ করে সরকারের ঘোষণাপত্র

চিফ লুথুলির (বামে) কাছে প্রেসিডেন্সি হস্তান্তরের পর ড. মোরোকা

কুইন্সটাউনে বার্ষিক সম্মেলনে চিফ লুথুলি

যুবনেতা
পিটার
এনথিটের
সংগে ১৯৫৫
সালে তোলা
ছবি

১৯৫৫ সালে সোফিয়াটাউন
উচ্ছেদ হচ্ছে

উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনে আমাদের বিক্ষোভ

পাশ ল'র বিরুদ্ধে বক্তব্যরত আমি

১৯৫৬ সালের উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে

১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা জোহান্সবার্গ থেকে প্রেটোরিয়ায় স্থানান্তর হওয়ার সময়কার ছবি

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার সময় আদালতের বাইরে

১৯৫৮ সালে প্রেটোরিয়া আদালতের বাইরে নেতাকর্মী পরিবেষ্টিত আমি

জেরি মোলোয়ির সংগে বক্সিং প্র্যাকটিসরত

আদালতের বাইরে রুথ ফার্স্টের সংগে

১৯৫৯ সালে মোসেস কোটানির সংগে

দ্বিতীয়বার বিচারের পর আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার সময়

১৯৬২ সালে পলাতক অবস্থায়

১৯৬২ সালে দারেস সালাম এয়ারপোর্টে অলিভার ট্যাম্বো (বামে) ও রবার্ট রেশা (ডানে)

প্রেটোরিয়া
জেলে জামা
সেলাই করছি

রোবেন দ্বীপের
কারাগারে এই
বইগুলো আমাকে
সঙ্গ দিয়েছে

১৯৬৬ সালে কারগারে ওয়াল্টার সিসুলুর সংগে

১৯৯০
সালে মুক্তির
পর

মুক্তির পর
অরল্যান্ডোতে
নিজের বাসায়
তরুণ তরুণীদের
সংগে

আর্চবিশপ দেসমন্ড টুটুর সংগে

অলিভারের সংগে

৩০ বছরেও বেশি সময় নির্বাসনে থাকার পর ১৯৯০ সালে দেশে ফিরে অলিভার টিম্বু

অলিভারের প্রত্যাবর্তনে আমাদের শুভেচ্ছা বাণী
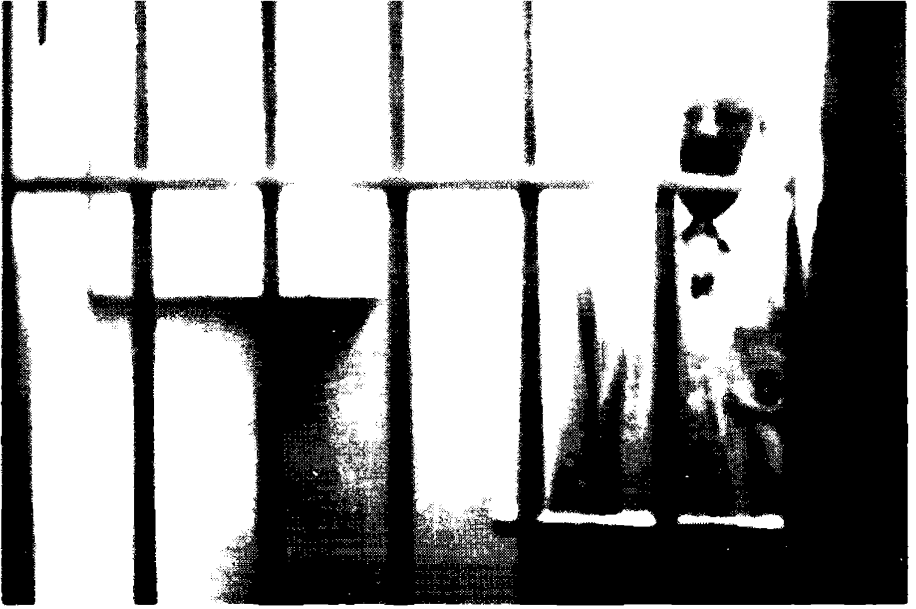
যে সেলে আমার ২৭ বছর কেটেছে

রবিন দ্বীপের অপর দিগন্তে

প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর আর্চবিশপ রেসমন্ড টুটুকে জড়িয়ে ধরলাম

আমার চার সন্তান জিনজি, জেনানি, মাকাজিউ ও মাকাগাথো (বাম থেকে)

দক্ষিণ আফ্রিকার
প্রথম সাধারণ
নির্বাচনে আমার
প্রথম ভোট

থাবো এমবেকি ও কন্যা
জেনানির সংগে জাতীয়
সংগীতের প্রতি সম্মান
প্রদর্শনরত আমি

আর্চ বিশপ টুটুর সংগে

এফ. ডব্লিউ. ডি. কে ক্লার্কের সংগে

অরল্যান্ডোর হানি মেমোরিয়াল স্টেডিয়ামে

১৯৯৪ সালে আবার আমি রবিন দ্বীপের কারাগার দেখতে গেলাম

১৯৯৪ সালে
নাতির
মেয়ের
সংগে

আমার বি-শা-ল পরিবার

আমার নাতি বামবাতাকে কো

১৯৯০ সালে ওয়াল্টার ও উইনির সংগে

নতুন সংবিধান রচনার ব্যাপারে আলাপরত ক্রিল রামফোসা (বামে) ও জো স্লোভো

আমার তৃতীয় স্ত্রী গ্রাশা ম্যাশেলের সঙ্গে

রোবেন দ্বীপে কারাবাসের সময় চুনাপাথর খনিতে কাজের সময় তোলা

বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় জেনানি, নেলসন ম্যান্ডেলা
বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও বেগম সাহাবুদ্দীন

হাইড পার্কের ৪৬৬

চিরবিপ্লবী নেত্রী রোজা পার্ক এর সাথে আমি ও উইনি

পপসম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের

কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট এর সাথে

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এর সাথে

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এর সাথে

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এর সাথে

ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে

একটি পারিবারিক ছবি

জেলখানায়
থাকা
অবস্থায়